

ত বিগত; এবং বলোছেন—এই আচার্যের শিকার
সমূহ এই ব্যক্তিচারিত্রের গুণাবলী, যা মানব-
জীবকে উচ্চে উত্তোলন করবার জন্য সত্য নিয়োজিত।

আমেরিকান স্বামীজীর কাৰ্ণাবলীৰ চেহাৱাৰ সন্মুখ
স্বদেশৰ কৰ্মেৰ চেহাৱাৰ কিহুটা তফাত ছিল।
শুভ তাৰ কাৰ্যকালৰ ব্যাপ্তি অল্প এবং আমেৰিকাৰ
তান যেমন নাটকীয় আবিৰ্ভাব ইংলেণ্ডে তেনে নয়।
স্বামীজী ইংলেণ্ডে ধীৰে সূত্ৰে কাজ আৰম্ভ
কৰেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি জনসভায় বহুতাব
বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছেন। সাধারণ সভায় বহুতা
শ্রোতাদের কিছু সময়ের জন্য মনুষ্য করার চেয়ে
যা ক্লাসে বথার্থ জিজ্ঞাসুর চিত্তে স্থাবীভাবে
বহুতৰ আলোকসম্পাত কৰাকে তিনি অনেক বড় কাৰ্য
কৰেছিলেন। সূত্ৰাং ইংলেণ্ডে বড় সভায় বহুতা
অপেক্ষা ঘৰোয়া ক্লাসে তাঁকে বেশি নিমন্ত্ৰ দেখা যায়।
তাঁৰ স্বামীজী কাৰ্যৰ ব্যাপারে আপোষৰহিত বিশেষ
সম্পাতী ছিলেন না। তিনি তাঁৰ বন্ধুদের সাহায্য
কৰে কিন্তু কোনো সম্প্ৰদায়ের সাহায্য চান নি বা
নি, যেমন ধৰা থাকে, কেশবচন্দ্র সেন নিয়োজিত।
চন্দ্র ইংলেণ্ডে গিয়ে ভিক্টোরিয়া ও ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্যের
কৰেছিলেন, খৃষ্টধৰ্মের কাহে নিজ আনুগত্য
না কৰেছিলেন উচ্চকণ্ঠে, ফলে তাঁৰ সমাদরের সৰ্ব-
আসোজন কৰে দিয়েছিল ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টান
দায়। ম্যাকমুলার প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণের
সহ তাঁৰ পক্ষে ছিল। কিন্তু অপর দিকে সাম্ৰাজ্যবাদ
ভিক্টোরিয়ান মহিমাভীৰ্তন বিবেকানন্দেৰ পক্ষে
নাতিত ব্যাপার। তাঁৰ বেদান্তে সৰ্ব মতেৰ সমন্বয়-
রচিত হয়েছিল বলে তাঁৰ মধ্যে খৃষ্টান ধৰ্মেৰ বোধ্য
ছিল, কিন্তু বিবেকানন্দ ভারতীয় বেদান্তেৰই প্রচাৰক
ছিলেন। সেজন্য অনেক উদারমৈত্ৰিক খৃষ্টান চিন্তনাতী
তাঁৰ বন্ধু হয়ে উঠলেও কোনো সংঘবন্ধ গোষ্ঠী বা
সম্প্ৰদায় তাঁৰ পক্ষে প্রচার চালায় নি। স্বামীজী তা
নিও। তথাপি আশ্চৰ্যের বিষয়, স্বামীজী ইংলেণ্ডে
এ প্রভুত সাফল্যলাভ কৰেছিলেন এবং তা হুটিছিল
দিনের মধ্যে। ইংলেণ্ডেৰ সংবাদপত্ৰ, আমেৰিকান
পত্ৰেৰ অনুরূপ পরিমাণে না হলেও যেসব সংবাদ
ছিল তাদের মধ্যে প্রশংসিত অল্প ছিল না এবং
ল ভারতীয় সংবাদপত্ৰে অতীব আনন্দের সঙ্গে
খুশত হয়েছিল। একথা না বললেও চলে, ভাবতবাসীর
আমেরিকান সংবাদপত্ৰেৰ বিবরণ অপেক্ষা ইংলেণ্ডেৰ
পত্ৰেৰ বিবরণেৰ গুরুত্ব ছিল বেশি। আমেৰিকা
দেশ, চিন্তা ও উৎসাহে ফুটন্ত, অপবিসৰ্গ তাঁৰ
সে এক অপূৰ্ব কম্পলোক—সেখানকার মানুষ
পরাধীন দেশেৰ এক মানুষেৰ গলায় মালা পরিয়ে
য, হাতের পিঠে চড়িয়ে, সিংহাসনেৰ দিকে সঙ্গে নিয়ে
—তাহলে সেটা রূপকথার জগতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়
আমেৰিকা প্রায় রূপকথার জগতই হয়ে উঠেছিল
তাঁৰ কাহে। ইংলেণ্ডে অপরপক্ষে কিন্তু ভারতের প্রভু
হাতে ধরা আছে ভারতের কণ্ঠেৰ শিকল, ইংলেণ্ডেৰ
তম মানুষও ভাবতবাসীর কাহে 'সাহেব', সেখানকার

প্রত্যেকটি লোকের চামড়া সাদা এবং প্রত্যেকটি
ইংবেলি বলে। ভারতীয় সংবাদপত্ৰগুলি
জুড়ে থাকত ইংরেজ এবং ইংরেজ-স্ব
কথা। শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে ইংরেজ-
প্রশংসা—স্বয়ং ইংবরেৰ (যাৰ কাহে থেবে
ভারতের শাসনাধিকার পেয়েছে) নৈবদ্য
গুরুত্ব ছিল না।

পূন্যাব বিখ্যাত ইংলেণ্ডে না হিক
সংশ্লিষ্ট সংবাদচৰিত্ৰ এনে নিদেখা
এই কাগজটির তৎকালীন সম্পাদক
বালগ-গাধব তিলক। স্বামীজী
সম্মুখসীৰূপে ভারতব্রমণ কৰেছিলেন
বাড়িতে কয়েকদিনেৰ অন্য আশ্রয় নিদেখি
তরুণ সম্মুখসীৰ পাতিতহা প্রাচীন
হয়েছিলেন; কিন্তু অপরদিকের
চাম্ভল্য সৃষ্টি কৰেছেন, তিনিই যে তাঁৰ
অন্য ঠাই নিয়োজিত, তা বহুতে পাতেন
ভারতের বহু সংবাদপত্ৰ যখন গেজেট
স্বামীজীর সাফল্যসংবাদ বিস্মৃত আকা
তখন তিলকের পরিবার পক্ষে একই কা
ছিল। তা কিন্তু হয় নি। এককালে
তিলকের কাগজ অপেক্ষাকৃত নবীন
একবার (১৮৯৪-এর ৩ মে) স্বামীজীর
গতাব বিশেষ প্রশংসা করা হয়।

পরবর্তী দুই বৎসরে, ১৮৯৫ ও ১৯
গাৰহাট্টায় স্বামীজীর সংবাদ ও তাৰ
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেই
সবই স্বামীজীর ইংলেণ্ডেৰ কাৰ্ণাবলী

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমেৰিকা
প্রশংসাপূৰ্ণ বিবেকানন্দ-সংবাদমা
পরবর্তী দুই বৎসরে ইংলেণ্ডেৰ সং
সংঘত সংবাদগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে
কি? তিলক সম্বন্ধে তো বলা
শিক্ষিত ভারতবাসীর মত তিনি
ছিলেন! একেদ্রে আমাদের মনে
সম্বন্ধে তিলকের মোহ না থাকলে
শ্রীর বিচারশীলতার প্রতি তাঁৰ
তিনি বিবেকানন্দের আমেরিকান সমাদর
উৎসাহ বলে ধরেছিলেন। তাঁৰ অবস্
করতে ও যাচাই করতে চাইছিল।
সহজে-ভাঙে-না জনবলের দ্বারা
তিলক আকর্ষণ বোধ করার হেতু
দেখা গেল মারহাট্টায় এইকালে
প্রাচুর্যের মধ্যে। তিলক আলাব
ছিলেন। তিনি জানতেন, ভারতীয়
প্রতি প্রভু-জাতির শ্রম্য তাঁৰ
বাম্পিব সহায়ক হবে। তাঁৰ
কারণ ছিল—ইংলেণ্ডে স্বামীজীর
যোগাযোগ হয়েছিল এবং ম্যাকমুলার
গ্রীষ্মকালের উপর বিস্মৃত প্রবন্ধ

১৭৭ মন্তব্যটির মধ্যে কোটিক আছে, প্রচ্ছন্ন শুদ্ধ-
করণ নেই, তাও নয়।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে রণজি-প্রশস্তিতে তবু কিছু সংযম
১৮৯৬ খৃস্টাব্দে সেটা ঘুচে গেল, ভারতীয় ও
রাজ উভয় পক্ষেই। এই বছর রণজি ইংলন্ডের ক্রিকেটে
প্রতিসংখ্যক রান করলেন এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে
শ্রেণি পক্ষে টেস্ট খেলায় নির্বাচিত হলেন। অবশ্য
ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হতে পারেন, তাঁকে
তু চামড়ার রঙের জন্য প্রথম টেস্টে জায়গা দেওয়া হয়
বিপদে পড়ে দ্বিতীয় টেস্টে সেই ঠাই মিলেছিল এবং
মহান প্রতিশোধ নিয়েছিলেন অপূর্বতম খেলা
খায়ে। সে খেলাব পরে ডবলিউ জি গ্রেসের সংগে
নাও রণজির পক্ষে সামান্য কথা হয়ে দাঁড়াল।*৩
কট সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন পাঠকদের
করিয়ে দিতে পারি, ডবলিউ জি গ্রেসকে ইংলিশ
কটের প্রতীক বলা হয় এবং রণজি জিগোরিয়া ও
ডবলিউ গ্রেসের পরেই নাকি ইংলন্ড তাঁর জনপ্রিয়তা।
গ্রেসের জনপ্রিয়তাকেও রণজি অতিক্রম করেছিলেন,
এক লন্ডন ডেইলি ক্রনিকল পর্যন্ত লিখেছিলেন।*৪
তরাং রণজির জনপ্রিয়তা স্যাদস্টোন বা লর্ড সলস-
বেরীর জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল, একথা অমৃত-
জাব পত্রিকাব লন্ডন-সংবাদদাতা লিখে পাঠাতে স্মিধা
গলেন না।*৫

স্বভাবতই প্রশ্ন-ওঠে, ভারতীয় ক্রিকেটবেব এমন
জিনিস সত্ত্বাতি ইংরেজ-চরিত্রের কোন দিক উদ্ঘাটিত
করেছে, এবং রণজির সাফল্যের দ্বারা ভারত ও ইংলন্ডের
সম্পর্কের উন্নতি হয়েছিল কিনা? এই প্রশ্নগুলির
মধ্যে উত্তর পাই সমকালীন ইংলন্ডের সংবাদপত্রের মন্তব্য
থেকে, যার অনেকগুলিই সাদরে পুনঃপ্রকাশিত
হয়েছিল ভারতের কাগজগুলিতে। রণজির সাফল্যের
জন্য কোম্পানি এক ডিনারে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

*৩ "He is already named and accepted
the Indian Grace, and shere wd men
ve forecasted that he may in course of
the outgrace the English Grace himself."
(*Mahratta*, July 26; 1896)

*৪ লন্ডন ডেইলি ক্রনিকলের মন্তব্য ইন্ডিয়ান নেশন
৮ জুন, ১৮৯৬-তে উদ্ধৃত করে:

"W. G. Grace has always been, and
always will be, a popular figure on the
cket field, but it is doubtful whether
the admirers of the Indian Prince amongst
cricketers are not even more numerous."

*৫ ২০ অক্টোবর, ১৮৯৬-তে অমৃতবাজারে তার
লন্ডন-সংবাদদাতার লেখাব মধ্যে ছিল:

"The most popular personality in
land to-day is neither Mr. Gladstone
: Lord Salisbry, but the renowned and
zed Prince Ranjit Sinji."



বিবেকানন্দ

সেই "উজ্জ্বল টেলিগ্রাফ" বা "লিখোঁহল তার" মধ্যে
আমাদের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর আছে:

"গত রাতে (২৯ সেপ্টেম্বর) প্রিন্স রণজি সিংহ
জন্য যে-উল্লাস ও উৎসাহপূর্ণ ব্যাঙ্কোয়েটের আয়োজন করা
হয়েছিল—সেখানে ইংলন্ড ও ভারতের হৃদয় যতখানি মিলে
হয়েছিল এমন আর কখনো হয় নি। ঐ সম্বন্ধে অর্থাৎ
(রণজি) স্যাব জন গট্টের যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—
সে কথাগুলি অতীব সত্য—সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্বার্থের
উন্নতি ঘটতে হবে। তার সংঘর্ষে বঙ্গের রাষ্ট্রবাহু তন্য
যে-কোনো প্রয়াসের তুলনায় উভয় দেশের জনগণের
সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের উপর বেশি জোন দিতে হবে।
ক্রিকেট মাঠেই এই সন্ধের সংঘর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রস্তুত হয়েছিল।
ইংলন্ডের কাছে ভারতবর্ষ অবশ্য সর্বদাই খুব দুর্বল-
পূর্ণ একটি নাম ও অস্তিত্ব। খুব অল্প ইংলন্ডে হালুই
জানে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব ও বিপত্তি এতদূর
এশিয়ার ঐ প্রধান দেশটির উপর আমাদের সান্নিধ্য ও
অপূর্ব অভিভাবক্য থেকে। ভারতের রণজি ও অন-
দারের বিপুল মূল্য, তার প্রাকৃতিক সম্পদের বিস্তারিত
প্রাচুর্য, উপচীষমান জনসংখ্যা, বহু বিচিত্র উপজাতি ও
তাদের বিস্তৃত ভাষা, তার সামরিক মনোভাবপূর্ণ
জাতিগুলির দ্বারা সংগঠিত অনবদ্য সৈন্যবাহিনী—হাব
ম্যাজেস্টির সমস্ত হাজার নিপুণতম শ্রেণি

সহযোগে যাবা উক্ত উপস্থাপনের শান্তিরক্ষা করে এবং
 তাকে দুর্ভেদ্য বাধা—স্বল্পজ্ঞাত ইংরেজ ও ঐ সব বিষয়ে
 মোটামুটি একটা ধারণা রাখে। তাদের কাছে সাম্রাজ্যিক,
 রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, সামরিক এবং অন্যান্য
 দিক দিয়ে এই হল ভারতবর্ষের রূপ। কিন্তু যদি সমগ্র
 ব্রিটিশ জনগণকে ভারতের জনগণ সম্বন্ধে আগ্রহী করে
 তোলার প্রশ্ন ওঠে? যদি হিন্দু ও মুসলমানের
 প্রভেদ, জাতিপ্রথা ও পোষাক-পরিচ্ছদের গড় তত্ত্ব, ধর্মীয়
 ও সামাজিক আচরণের সুক্ষ্ম পার্থক্য বা
 তাদের দৈনন্দিন জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সাধারণ
 ইংরেজকে অবহিত করে তোলার প্রশ্ন ওঠে? এসব ক্ষেত্রে
 ইংলন্ডের সাধারণ লোক সেই ক্রান্তিকর প্রচেষ্টা ত্যাগ
 কবে কতকগুলি শিথিল স্থূল সাধারণীকরণের আশ্রয়
 নেয়। সুতরাং বলতে হয়, যেসব বুদ্ধিজীবীরা
 ভারতবর্ষকে জানেন ও ভালবাসেন, তাঁদের মধ্যেই কেবল
 সেই অপূর্ণ দেশ ও ততোধিক অপূর্ণ জনগণ সম্বন্ধে
 আগ্রহ সঞ্চারিত রয়েছে। বিশ্বজনেরা জেনেছেন এবং
 তা স্বীকারও করেন—আমাদের সকল অধ্যাপক, লেখক,
 পৌরাণিক ও কাব্যিক কথাকাহিনী, জ্যোতিষ, বীজ-
 গণিত এবং ধর্মের প্রধান অংশ ভারত থেকে এসেছে—
 মেসোপটেমিয়া, পারস্য, মিশর, গ্রীস ও অন্যান্য অর্ধ-
 জ্ঞাত প্রণালী ঘুরে। আর্ষদের প্রাচীন মহাকাব্য ও
 নাটকগুলির মধ্যে যে অপূর্ণ প্রতিভার বিকাশ হয়ে-
 ছিল তার সঙ্গে এদেশের মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ
 পরিচয় রয়েছে। 'লাইট অব এশিয়া' ও অন্যান্য সূত্র
 থেকে তারা বৌদ্ধধর্মের প্রশান্ত মহান নীতির কথা
 জেনেছে। স্বয়ং শৃঙ্গারম্ ঐ বৌদ্ধধর্মের কাছে গভীর
 ঋণী। এই সব বিষয় অবশ্য আমাদের দেশের সংস্কৃত
 জনগণের কাছে জনপ্রিয় হতে পারে না। তাদের কাছে
 মুসলমান, হিন্দু, পার্শী, রাজপুত, শিখ, মারাঠা,
 জামিন, ভীল, টোডা, ব্রাহ্মণ, গোঁদ, বাঙালী, বালুচ—
 সকলেই 'ভারতীয়' এবং 'নিগার'। তাদের মধ্যে কেউ
 কেউ লড়াই করতে, লিখতে, শাসন করতে, আন্দোলন
 করতে এবং বিচিত্র ভাষার কথা বলতে পারে। কিন্তু
 তাবা কি ইংরেজ হয়ে উঠতে পারবে? তারা কি পাশ্চাত্য
 জীবনরীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারবে? তারা কি,
 ধরা থাক, ক্রিকেট খেলতে পারবে?

"তারা তা পারবে—পেবেছে। প্রিন্স বর্জিজ সিংজী
 দুই মহাদেশকে একটি খেলাব মাঠে—যে খেলাটিকে
 ইংরেজ ভালবাসে ও বোঝে—মিলিয়ে দিয়ে মহান কাজ
 করেছেন। ক্রিকেট-জগতের উপর তিনি প্রচোর
 তারকার গত খসে পড়েছেন।...ইংলন্ডে যে-কেউ এই প্রিয়
 খেলাটির বিষয়ে কিছু জানে, সেই প্রিন্স বর্জিজ
 সিংজীকে ভালবাসে, প্রশংসা ও সম্মান করে এবং তাঁর
 খ্যাতিতে অন্ততঃ শেষ পর্যন্ত সানন্দে ভারতীয়দের উপর
 আস্থা রাখে। সাধারণের ধারণা—ভারতীয়রা যদি
 বর্জিজ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে তারা সবকিছু
 পারে। বর্জিজের আনন্দদায়ক স্টাইল, মনোরম 'কাট',
 নিপুণ 'প্রেসিং', ক্রীজে অদম্য সাহস—এই সব জিনিস
 ছিল প্রাথমিক প্রশংসার কারণ। তার সঙ্গে জনগণ
 দেখেছে তাঁর নম্রতা, আচরণের শালীন সৌন্দর্য, সরলতা,

বন্ধুত্বাবাসম্ প্রকৃতি এবং প্রাচ্য পৌরুষের রূপ, যা
 আমাদের থেকে পৃথক হলেও খাঁটি এবং উচ্চাঙ্গ
 ইম্পাতের তুল্য নির্দিষ্ট উত্তাপে প্রস্তুত। গড় রাষ্ট্র
 পার্টিতে প্রদত্ত বক্তৃতা তাঁর জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত পর্ব
 দেখিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে আমাদের জনগণ তাঁর
 বিষয়ে এতই খুশী যে, তাঁর আকাশকার কোনো জিনিসই
 উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলে মনে হবে না। অনেক নির্বাচক-
 মন্ডলীই তাকে পার্লামেন্টে আগ্রহের সঙ্গে নির্বাচন
 করবে; কেম্ব্রিজ অন্ততঃ শ' খানেক বিদ্যা-
 শিক্ষা-ঘটিত প্রয়োজন আবিষ্কার করে তাঁকে সেখানে
 ধরে রাখতে চাইবে; ইংলন্ডের কোনো সৌন্দর্য্যার্থী
 কিংবা আমেরিকার কোনো অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনীকে
 তিনি বিয়ে করতে পারেন। গতকালকার ব্যাস্কেয়েটের
 বিশেষ চারিত্র, সেখানকার অসীম উদ্দীপনা, আমাদের এই
 ভারতীয় বিজ্ঞেতার উদ্দেশ্যে স্বতোৎসারিত বীরবন্দন
 হৃৎকোমরে তা প্রমাণ করে। এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক
 মঙ্গলও কম ঘটে নি। মনোহারী তরুণ প্রাচ্য রাজকুমার
 সেই মঙ্গল ঘটিয়েছেন—আমাদের মনের বন্ধ বিরোধী
 সংস্কারকে পিটিয়ে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে। সেই
 সঙ্গে ইংলন্ডে তিনি আনন্দ, গৌরব ও প্রীতিপূর্ণ প্রাস্থ্য
 রেকর্ড অর্জন করে গেছেন।"

বিলেতী সংবাদপত্রের ঐ সব উক্তি ভারতীয় সংবাদ
 পত্রে প্রকাশিত হয়ে প্রভূত চম্পলের সৃষ্টি করেছিল
 ভারতের জন্য বর্জিজের দান বিশেষ আলোচনার বিষয় হা-
 ওঠে। এ বিষয়ে ডিগবি অমৃতবাজারে কি লিখেছেন
 আগেই জানিয়েছি। কেম্ব্রিজের আর একটি ভোক্তসভায়
 'মাস্টার অব ট্রিনিটি' ডাঃ বাটলার বলেছিলেন : "ভারতীয়
 ছাত্রদের মননশীলতা নিঃসন্দেহে খুবই সুক্ষ্ম ও গভীর
 ধরনের। সুতরাং ভারতবর্ষ যদি অতঃপর সিনিয়ার
 র‍্যাংলাব এদেশে পাঠায়, কিংবা কোনো দিন কোনো
 ভারতীয় বিচারপতি যদি ট্রিনিটি হল লঞ্চে ডাইনিং হলে
 নিরাপদে অবতীর্ণ হন, ব্যাপারটা অশ্রুত বিস্ময়কর হলে
 দাঁড়াবে না। কিন্তু একথা কে ভাবতে পেরেছিল
 একজন ভারতীয় ছাত্র এসে আমাদের মহান জাতীয় খেল
 ক্ষেত্রে আমাদের হারিয়ে দেবে? সুতরাং আজ
 অতিথির কীর্তি সর্বসাধারণের মনের উপরে বি-
 প্রভাব বিস্তার করবে তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নে-
 ঐক বলতে পারি না, ইনি সিনিয়ার ক্রিকেটার না,
 নিনিয়াব র‍্যাংলার হলে ইংরেজ-জনসাধারণ একই প্রক-
 উদ্দামনা বোধ করত কি না। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে
 এই কীর্তি সাধারণের মধ্যে যে-আগ্রহ জাগিয়েছে তা-
 যথার্থ মূল্য কতখানি? আমার ধারণা, মূল্য যত
 আছে। অভিযোগ করে বলা হয়, আমাদের দেশে
 সাধারণ লোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায় কিছু জানে না
 আজকের অতিথির সৃষ্টি এই, তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে
 ঐকসূচ্য সৃষ্টি কবেছেন, কেবল ইংলন্ডে নয়, সাম্রাজ্যে
 দূরতম প্রান্তেও।" (অমৃতবাজার, ২৩ অক্টোবর
 ১৮৯৬)

৬৭ দুই বৎসরের মধ্যে একজন ভারতীয় মা-
 ছার (পরাজপে) সিনিয়ার র‍্যাংলার হন।

অমৃতবাজারের লন্ডন-সংবাদদাতার প্রেরিত উক্ত পত্রের শেষের দিকে অধিকন্তু লেখা হয়েছিল, “এদেশে পর্যন্ত যত ভারতীয় এসেছেন তাঁদের সকলের ক্ষাণ্ড প্রিন্স রণজিৎ সিংজী বৃটিশ জনগণের কাছে হীন্দের সামর্থ্য সম্বন্ধে অধিক পরিচয় প্রকাশ করে-”।” রণজি ভবিষ্যতে ভারতের জন্য বাস্তব উপকারিতা সত্ত্বেও সম্ভব কববেন তা অমৃতবাজারের ৭ নভেম্বরের লন্ডন-সংবাদ থেকে পাই: “প্রিন্স রণজিৎ সিংজীকে পার্লামেন্টে দাঁড় করাবার জন্য উদারনৈতিক মহলে প্রচুর আলোচনা লেছে। সমুদ্রতীরবর্তী বৃহৎ শহর ব্রাইটনে তিনি বাস করেন—সেখান থেকেই তাঁর নির্বাচনপ্রার্থী হবার কথা আছে।...ব্রাইটন টোবি ঘাট, তাহলেও আদরের ‘রণজি’ মে বৃটিশ জনসাধারণ যাকে ডেকে থাকেন তিনি ব্রিটিশ লিমেন্ট ভেঙে দেওয়ার মত্নে কয়েকটি সেতুরী করে দিতে পারেন, তাহলে তিনি বর্তমান সদস্যের পক্ষে লক্ষ্যটা গন্ডগোলের করে তুলবেন। তাঁর বিষয়ে যত-দূর শুনছি তা থেকে বুঝছি, যে-ক্ষুদ্র ও ক্রমবর্ধমান নৈতিক গোষ্ঠী ভারতীয় শাসনসংস্কারের পক্ষে ভাব ও শক্তি প্রয়োগ করে থাকেন, সেই দলে তিনি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়ে দাঁড়াবেন।”

এই সব শব্দ চিন্তায় ভারতবর্ষে ব্যক্তিদের মাথা খান ভরপূর, তখনো বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁরা কতন হয়ে ওঠে নি তা নয়। যে-রণজি সম্বন্ধে অমৃত-বাজারের লন্ডন-সংবাদদাতা লিখেছিলেন—রণজির মৃত্যুর সব কিছুই, পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া থেকে হিন্দুর জন্য বৃটিশ অভিজাত পরিবারের শত শত ন্যা লাভ করা পর্যন্ত—সেই রণজি ভারতে ফিরলে তাঁর ধ্যান কি দাঁড়াবে তাও উক্ত সংবাদদাতা লিখেছেন: “প্রাসবাই ইয়াট (yacht) ক্লাবের কোনো সদস্য দি রণজিকে ঐ ক্লাবের পবিত্র প্রাঙ্গণে এক কাপ কালী চায়ের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চান, সে অনুমতি তিনি পাবেন না। কারণ যতই যা হোক, স্বদেশে রণজি ইংলো-ইন্ডিয়ানদের কাছে নিগার ছাড়া কিছু নন।”

—ভারতশাসন ব্যাপারে স্বদেশে উদার ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদের রাখাল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের উপরই বেশি নির্ভর করত।

যাই হোক, রণজি রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কবেছেন, একথা ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির ইংরেজ-সংবাদদাতারা পুনঃপুনঃ লিখে পাঠাতে কখনই ক্রান্ত হন নি। সংবাদগুলি ভারতীয় পাঠকদের পক্ষে খুবই যথোচিত। সুযোগ বুঝে ভারতীয় সংবাদপত্রে ঐ সব বারদের উপরে প্রচুর সম্পাদকীয় লিখিত হয়েছিল। (*৭)

*৭ বেঙ্গলী ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০১-এর একটি সম্পাদকীয় রচনার কিছু অংশ:

RANJI'S SERVICE TO INDIA

Many of our orthodox and stay at home people will say with a shrug of the shoulders, what is there in running to and fro, putting oneself out of breath and submitting to all the fatigue and discomfort

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলিও রণজির সংবাদ প্রকাশে পেছিয়ে থাকে নি। শেষোক্ত সংবাদপত্রগুলি কিন্তু রণজির সাফল্য কোনোভাবে ইংরেজের সাম্রাজ্য স্বার্থে নাড়া দেবে, এমন দৃষ্টিভঙ্গি কাতর হয় নি, কারণ তাঁরা জানতেন, of violent exercise on a summer day, as the game of cricket involves? Much less will they appreciate the service, rendered to India through cricket. To them it would be impossible to imagine that cricket could ever make any difference as regards one's opinion in England. Perhaps it would be so if the English had not been a sporting nation. The famous saying of the great General that Waterloo was won on the cricket field of merry England, was more a truth than a hyperbole. The Britisher is one who delights in out-door games and values his neighbour according to his powers of holding his own in sport. There is another characteristic point about John Bull. Be a coward, and he despises you. This is much more so in his native game of cricket. W. G. as he was affectionately known was the most popular man in England—greater than even Gladstone. To day it is the Indian Prince, styled ‘Ranji’ and often nick-named ‘Smith’. India has loomed very large to the average Britisher since Ranji sported the willow and ‘gave beans’ to his British rivals. England won India on the fields of Plassey. India has had her bloodless revenge, for she has won England three times over at Lords. India and the Indians have been very much elevated by Prince Ranjit Singji; for what Paranjpe has done at the Cambridge Tripos, has been out-rivalled by Ranji. Even women, who have nothing to do with cricket matches have flocked to see the Prince at play. One woman it is related, was not so much concerned with the huge score he had knocked up that afternoon, but was most anxious to know ‘how many babies the Indian gentleman had for breakfast that morning.’ ”

উদ্ধৃতির শেষের বসিকতাটি উপাদেশ। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কহীন আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে, আমবা জানি, ভাবত বিষয়ে নানা উদ্ভট ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ভারতকে শোষণ করে পুষ্টি ইংল্যান্ডও যে, ধারণা, বিহীন উদ্ভদের ছিল না, তা রণজি সম্বন্ধে কৌতূহলী ইংরেজ

ক্রিকেট সম্বন্ধে ইংরেজের উদ্দীপনা ক্রিকেট-মাঠ হািপ্পো রাজনীতির ময়দানে প্রবেশ করে না। তাছাড়া রণজি 'ভারতীয়' নন, 'ইংলিশ ক্রিকেটার'—এটাও তাঁদের জানা ছিল। তাঁদের জানা ছিল যে, ভারতের শাসনসংস্কারের রণজি অংশ নেওয়া ব্যাপারটা কথার কথা, দাদাভাই নৌরজির ভূমিকাও (যিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন) এই ২৪ বছরের প্রকল্প ছোকরাটি নিতে পাববে না। যে-রণজি ইংলন্ডে এত জনপ্রিয়, তাঁকেই ইংলন্ডে স্বেচ্ছানিবাসনের জীবন কাটাতে হচ্ছে, তাঁর প্রাপ্য জামনগরের সিংহাসন তখনই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় নি (যা পেতে তাঁকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল)—সুতরাং ভারতের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি শাসনসংস্কারের ব্যাপারে রণজির ক্ষতিকর ভূমিকার সম্ভাবনার কথা একেবারে তুলে গিয়ে সানন্দে ক্রিকেটে তাঁর সাফল্যসংবাদ ছেপে নিজেদের ক্রিকেটপ্রীতি এবং সাংবাদিক নিরপেক্ষতা যুগপৎ প্রকাশ করেছিল।

রণজিব ক্রিকেট-কৃতিত্ব থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি কেবল রাজনৈতিক ন্দবিধা সন্ধান করেছিল—একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। রণজির শারীরিক সামর্থ্যের ও সাহসের দৃষ্টান্ত থেকে হীনবীর্য ভারতবাসীর শিক্ষা নেওয়া উচিত, রণজির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় ভাবত-বাসীর এগিয়ে যাওয়া উচিত,—এমন কথাও লেখা হয়েছিল। (*৮) তা হলেও বলতে হবে, শেষ পর্যন্ত রণজির

মাহিমার জিজ্ঞাসা থেকে বৃদ্ধিতে পারি, যিনি জানতে চেয়েছিলেন, ভাবতীয় ভ্রমলোকটি প্রাতঃরাশের সময়ে কণ্ঠি শিশু ভেজেন করে থাকেন। এই ধরনের ধারণা সৃষ্টি সাম্রাজ্যরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। তাব শ্বারা পবাবীনবা অধীনস্থ থাকার উপকারিতা বোঝে এবং যারা পরাধীন কবে রেখেছেন, তারা অধীনস্থদের কাঁধে উঠে 'স্বৈত মনুষ্যের বোঝা' বহিতে বহিতে বিরক্ত হলে বেত হাতে নেবার সময়ে বিবেকদংশন বোধ কবেন না।

বিখ্যাত ভারতীয় রাজনৈতিক নেতার সরলতাও উপভোগ্য। বেঙ্গলীর সম্পাদক সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাস—আমরা তাঁর লেখায় দেখলাম—ইংরেজ এমনই স্পোর্টিং নেশন যে, ক্রিকেট-মাঠে ভাবতের পক্ষে প্রায় রক্তহীন বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন রণজি। ইংরেজ-চারিত্র অনুধাবনে এই সভ্যত্ব ভ্রান্ত ভারতীয় রাজনীতিককে বহু দিন বৃথা ঘুরপাক খাইয়েছে।

*৮ বোম্বাইয়ের বিখ্যাত দ্বিভাষী 'গুজরাটি' পত্রিকা ৯ আগস্ট, ১৮৯৬-তে এ সম্পর্কে লিখেছিল:

"Ranjit Singji (the victorious lion) vindicated the glory of his name.... We Indians feel immensely flattered by the reflection that it is one of us who is likely to be the champion of all England cricket in the near future. This is another signal instance of how opportunity and fair field enable Indians to shine and out-shine all others. We hope, however, that this brilliant example will advance the cause of

সাফল্য থেকে খেলাধুলার উৎসাহলাভ অপেক্ষা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উৎসাহ এদেশীয় সংবাদপত্রে অধিক। জাতীয় গৌরবের অনুরোধেই তিনি বেশী সা-
করেছিলেন এবং রণজির সূত্রে অন্যান্য ভারত-
কৃতিত্বের প্রসঙ্গেও এসেছিল।—ভারতীয়রা তাহলে যে-
বলা হয় সেবকম অধঃপতিত মানুষ নয়, সুযোগের অভা-
ব তাদের হীনাবস্থা—ভারতীয় সংবাদপত্রে এসব কথা বহুভা-
লেখা হয়েছিল। এই সূত্রে অমৃতবাজারের ১৬ই আগ-
স্ট ১৮৯৬-এর সম্পাদকীয়ের বড় অংশ উপস্থিত করছি:

physical education in our Presidency.. But the complaint is that, Hindus of emine-
and wealth are not backing it up with the
influence and purse.. In the annual pro-
competition held under the auspices of al-
Bombay High School Athletic Associa-
it is such a humiliating spectacle to see
few Hindus compete.. We do not believe
that it is bad physique that is at the root
of this evil. The real evil lies in the
positive discouragement for which Hindu
parents are responsible in the matter
sports. The sooner the latter realise the
sucidial character of their attitude toward
their children, the better."

গুজরাটিব এই রচনার হিন্দু অভিভাবকদের খেলাধু-
বিষয়ে উদাসীনতার পাশে পাশী অভিভাবকদের খেলা-
ধুলাপ্রীতিকে তুলে ধরা হয়েছিল। এখানে স্মরণ করি-
দিতে পারি, হিন্দু অভিভাবকদের খেলাধুলা সম্ব-
উদাসীনতার বিরুদ্ধে গুজরাটি পত্রিকার উক্ত ম-
বোম্বাই অপেক্ষা ভারতের অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে অ-
সত্য। বোম্বাইয়ে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অধিক ছিল
সেখানে খেলাধুলার চর্চা অধিক ছিল। তবে ফ-
ইত্যাদি শারীরিক শক্তিপ্রকাশক খেলার চল কলকাতা
ছিল বেশী।

বোম্বাইয়ের পাশী সমাজসংস্কারক মালাবারির ক-
ইন্ডিয়ান স্পোর্টস্টোরের ৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ তারি-
সম্পাদকীয় মন্তব্যে দোষ, খেলা মাঠের খেলাধ-
হিন্দুদের উৎসাহের অভাব নিয়ে ক্লোভ করা হ-
সম্পাদক বলেছিলেন, রণজির দৃষ্টান্তেও এ বিষয়ে হি-
প্রণোদিত হয় নি। হিন্দুদের মধ্যে যারা ঐতিহ্যগত
সাময়িক জাতি, সেখানে শরীরচর্চা ও অ্যাডভেঞ্চার
বিষয়ে শোচনীয় উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে। ইং-
শিক্ষিতবা এখন বড় বড় পদ পাচ্ছেন, মস্তিস্কের
তাঁরা যথেষ্ট কবছেন, কিন্তু তাব সঙ্গে দৈহিক শক্তি
সমন্বিত করতে পারছেন না। ফলে জাতটা মেরুলি
যাচ্ছে। সবশেষে সম্পাদকের সতর্কবাণী: "নিছক বর্ধ-
বড়াইয়ে পূর্ণ কোনো জ্ঞাত পরিবারীতে সমৃদ্ধিশালী হ-
পারে না—রাজনৈতিক ক্ষমতাও বেশী দিন ধরে রাখ-
পারে না—হিন্দুরা এই সভ্যটি যত শীঘ্র পরিপাক কর-
পারে, ততই মঙ্গল।"

“বর্ণাঙ্কং সিংয়ের ব্যাটিং অ্যাভারেজ ৫৭ এবং ডাঃ গ্রেসের ৪৬—এই ঘোষণা আমাদের আর একবার দেখিয়ে দেয়, ভারতের অনেক ইংবেজ যেমন বলে থাকেন ভারতীয়রা নে রকম নিম্নতর জাতি নয়। ভারতীয়দের কেবল সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন, তাহলেই তারা নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণ করতে পাবে। সে সুযোগে কিন্তু তারা বঞ্চিত। বর্ণাঙ্কং সিং-ই একমাত্র ভারতীয় যিনি ইংবেজের খেলাধুলায় আগ্রহ বোধ করতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি এই খেলার মধ্যে গিয়ে পড়েন এবং দেখেন যে, অন্য যেকোনো মানুষের মতই তিনি ব্যাট ধরতে পারেন। নিজ জাতির পতিত অবস্থা তাঁর বুদ্ধি যন্ত্রণা দিয়েছে—যে-যাভনা পাশাঁদেব পবিত্র অগ্নির মত অনিবার্ণ জ্বলছে প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয়ে—তাঁর মনে গোপন উচ্চাশা জেগেছিল, হিন্দুকে যেখানে গ্রামের চৌকিদার পদের যোগ্য পর্যন্ত বিবেচনা করা হয় না সেখানে ক্রিকেটের একমাত্র ভারতীয় অনুশীলনকারীরূপে আমি দেখিয়ে দেব, এই সম্পূর্ণ ইংরেজী খেলায় শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কিভাবে উঠে দাঁড়াতে পারি। স্বদেশে সুযোগ নেই—এই নৈরাশ্যই সুরেশ বিশ্বাসকে দেশত্যাগে প্রণোদিত করেছিল। প্রতিদিন তিনি দেখেছেন, তাঁর দেশবাসীকে বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে ‘বাঙালী বাবু’, অর্থাৎ অপদার্থ সবকিছুর প্রতীক তারা। এই অপমানের প্রতিবাদেব সুযোগ তিনি নিয়েছিলেন। যখন সৈনিক হিসাবে তিনি বহু বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন, তখন গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, “ওরা দেখুক, হিন্দুস্থানের পবিত্র ভূমি থেকে আগত একজন হিন্দু কী করতে সমর্থ!” হ্যাঁ! বখার পিঠে বলে নিই, সুরেশ ধর্ম খুঁস্টান, তাব মানে নিতান্ত বালক বয়সে তিনি খুঁস্টখমে ধর্মাস্তরিত হন, তবু তাঁর পবিত্র ভূমি প্যালেস্টাইন নয়, হিন্দুস্থান। যাই হোক, সুরেশ বিপক্ষের মধ্যে ধেয়ে গিয়ে কামান অধিকার করেন, এবং এই ঘটনাটি বুদ্ধিবল গতি ফিরিয়ে দেয়। সুরেশ বিদেশী এবং পদমর্যাদায় কেবল লেফটেন্যান্ট হলেও ব্রিজলের সৈন্যবাহিনী তাঁকে মহাবীরের সম্মান দিয়েছে—আমাদের পঠিকায কিছুদিন আগে ব্রিজলের জটনৈক প্রধান ব্যক্তিত্ব মন্তব্য থেকেই তা বোঝা যায়। অথচ নৃবেশ, একবার শব্দ ভেবে দেখুন, সারা পৃথিবীতে একমাত্র আর্মি-কমিশন-প্রাপ্ত ভারতীয়!... সুরেশ এরকম ঘটতে পারলেন কেন? কারণ আর কিছু নয়, সুরেশের বুদ্ধি এই যন্ত্রণা নাড়া দিয়েছিল—তিনি এমন এক জাতির অন্তর্ভুক্ত পৃথিবীতে যার কোনো মর্যাদা নেই, অবিরত সে জাতিকে শাসক ইংরেজেরা অপদার্থ বলেছে। এই মনোভাব নিয়েই তিনি দেশত্যাগ করে অনার্য জাতি স্থান করেছেন। একই অনুভূতি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বসু ও অধ্যাপক রায়কে স্বজাতির জন্য কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা একথা কদাপি বলি না যে, উক্ত দুই বিজ্ঞানী অনুভূত প্রতিভাবান, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাভাজন, বিবাত বৈজ্ঞানিকের মস্তিস্ক সমৃদ্ধ। না তা নয়, তাঁরা কেবল বুদ্ধিমান দুই যুবক, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজারে হাজারে যেসব বি-এ, এম-এর দল বেরুচ্ছে তাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান কদাপি তাঁরা নন। কিন্তু একটি আবেগে তাঁরা চালিত হয়েছিলেন—পতিত দেশের জন্য তাঁদের কিছু করতেই হবে,



জগদীশচন্দ্র

হিন্দুরা অপদার্থ জাতি সত্ত্বেও স্বৈরাচারীর দ্বারা নিষ্ঠুর ভাবে শাসিত হবার যোগ্য—এই কুৎসাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে হবে। স্যার চার্লস ইলিয়টের সহায়তায় আলরা প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছি। এই দুজন হিন্দু অধ্যাপক সেই সুযোগকে ব্যর্থ হতে দেন নি। বয়সে তরুণ হলেও তাঁরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছেন, ভারতীয়রা কেবল পবীন্দ্রতাই গাস করে না, সুযোগ পেলে বিজ্ঞানে স্বাধীনভাবে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারে। ভাগ্যবশে যদি কোনো ভারতীয় উপযুক্ত পদ পেয়ে যায় সে তৎক্ষণাৎ মনে হবে তার নিজের কর্তব্য আছে এক্ষেত্রে। বিচারপতি ছাবকানাথ মিশ্র বলতেন, তাঁর একটি মিশন আছে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্যদের জন্য অনুসরণের পথ তৈরি করে দিয়েছিল।”

উদ্ধৃত সম্পাদকীয়টি আমাদের বর্ণনার পক্ষে বিনোদ প্রয়োজনীয়। এব মধ্যে পরাধীন দেশের আহত মর্যাদাযে আত্মচীৎকার করে উঠেছে। উদ্ভূতির মধ্যে আবও কয়েক জন ভারতীয়ের নাম পাই যারা একালে নিজেদের কৃতিত্বের দাবী দেশে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন। তাঁদের অন্যতম সুরেশ বিশ্বাস—ব্রিজলে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখিয়ে যিনি মর্যাদালাভ করেছিলেন—তাঁর কাহিনী তরুণ বাঙালী ও ভারতীয়ের রোমাণ্টিক কল্পনাকে চম্পক করেছিল। তাছাড়া নাম পাচ্ছি জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের—যাঁদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি বিদেশে প্রশংসা পেয়েছিল। এই সঙ্গে আর একজনের নাম যোগ করতে হবে—তিনি অভুলচন্দ্র চ্যাটার্জী।

অভুলচন্দ্র চ্যাটার্জী ভারতীয় ছাত্রদের স্বদেশ চাকুরি

ইন্ডিয়ান-সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। “অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি..... স্বর্গতঃ বাবু হেমচন্দ্র চ্যাটার্জির পুত্র।...স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে তিনি ইংলন্ডে যান, সেখানে কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে ভর্তি হন। সেখানে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে ইন্টার কলেজিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং স্কলারশিপ পান। তিনি বিরাট কৃতিত্বের সঙ্গে ট্রাইপোস পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছেন।” (*১) অতুলচন্দ্রের চূড়ান্ত কৃতিত্ব অবশ্য আই সি এস-এ প্রথম হওয়া, যে-পরীক্ষায় কেবল ভারতের নয় ইংলন্ডের বহু প্রতিভাবান ছাত্র অবতীর্ণ হতেন। আই সি এস ‘কঠিনতম একটি পরীক্ষা’— ইংরেজ ছাত্রদের তুলনায় ভারতীয় ছাত্ররা অনেক বেশী অসুবিধার মধ্যে এই পরীক্ষা দিতেন। তথাপি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে অতুল চ্যাটার্জি আই সি এস-এ প্রথম হয়েছিলেন। (*১০)

চাকুরি-ধ্যান চাকুরি-জ্ঞান ভারতীয়গণের কাছে অতুল চ্যাটার্জির পরীক্ষা-কৃতিত্ব যতই বড় মনে হোক, আসল

*১ অমৃতবাজার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬।

*১০ কেম্ব্রিজের ইন্ডিয়ান মজলিশের দেওয়া ভোক্তা সভার সভাপতি মিঃ হাফিজ জি সারউইর এই পরীক্ষায় ভারতীয় ছাত্রদের অধিক অসুবিধার উল্লেখ করে বলেছিলেন:

“The year 1896, the 60th year of Her Majesty's most gracious reign was unique also in the history of India, for, it witnessed the successes of Rajit Sinha on the one hand and Atul C. Chatterjee on the other. Ranjit Sinha had broken records in one of the most difficult of sports and Atul Chatterjee had done the same in the most difficult of examinations. The brilliant successes of the guests of the evening as far as India was concerned were to be considered epoch-making. One marked feature of their successes was that they both had attained them in a marvellously short period of time. In the Indian Civil Service, Indians had to labour under various disadvantages; subject to the maximum of 2300 marks they are totally debarred from taking. Serious though it had been Mr. Chatterjee 'got the first place with ease.’”

ইংরেজ ছাত্রদের তুলনায় ২৯০০ নম্বর পেছিয়ে থেকেও অতুল চ্যাটার্জি অবহেলায় প্রথম হয়েছেন—সকৌতুকে এই ঘটনায় উত্তর করে রণজি বলেছিলেন: “আমার অপেক্ষা মিঃ চ্যাটার্জির সাফল্য অনেক বেশী, কারণ তিনি ২৯০০ নম্বর পেছিয়ে থেকেও ‘সহজেই প্রথম স্থান পেয়েছেন’, সেখানে আমাকে যদি ২৯০০ রান বাধ দিয়ে বাধা করতে হত তাহলে ‘সহজেই শেষ স্থান’ অধিকার করে বসতাম।”

গৌরবের ক্ষেত্র ছিল অন্যত্র—জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক সাফল্যের মধ্যে। জগদীশচন্দ্র বসু দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে পুত্র জগদীশচন্দ্রকে ইংলন্ডে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আই সি এস হতে নয়, যদিও পিতার কষ্ট দূর করার জন্য পুত্র তাই হতে চেয়েছিলেন। পিতা, পুত্রকে বিদ্বান দেখতে চেয়েছিলেন, শাসক নয়। পারদর্শিতার সঙ্গে ইংলন্ডে বিজ্ঞান শিক্ষা সমাপ্ত করে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরেছিলেন, অনেক কষ্টে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা তাঁকে শিক্ষাবিভাগের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কর্তারা দিতে চায় নি, গবেষণার কোনো সুবিধাও নয়। জগদীশচন্দ্র কিন্তু ‘জ্ঞানের সম্মানে এবং প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে’ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তিনি অপারিসম্মি পরিগ্রহ করতে পারতেন, প্রতিভাও ছিল কনুদূর্য্য পরিমাণে; সুতরাং আধুনিক ভারতের প্রথম মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ থেকে এবং তার ধারাবাহিক সাফল্য থেকে কোনো বাধাই তাঁকে সরিয়ে দিতে পারল না।

হিট্‌জ্যান ওয়েভ-এর উপর জগদীশচন্দ্রের প্রথম রিসার্চ। এই ক্ষেত্রে ফ্যারাডে, ক্লার্ক, ম্যাক্সওয়েল ও হার্টস্‌ গবেষণা করে যে-পথ উন্মুক্ত করেছিলেন, জগদীশচন্দ্র সেই পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। গবেষণাফল তিনি প্রকাশ করেন এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেংগলের বিজ্ঞানপত্রে—মে, ১৮৯৫ সংখ্যায়। এই পেপারটি ‘ভারতে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি করেছিল।’ জগদীশচন্দ্রের বিদ্যাবীর্ণ বিজ্ঞানপত্র প্রকাশিত হয় ইংলন্ডের ‘ইলেকট্রিসিয়ান’ পত্রিকায় ডিসেম্বর, ১৮৯৫-তে। তৃতীয় পত্রও লর্ড র্যালের সুদৃঢ়াংশে রয়্যাল সোসাইটি প্রকাশ করে। একই সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং টাউন হলে বেতারবার্তা প্রেরণের পরীক্ষা দেখান সাফল্যের সঙ্গে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডন থেকে ডি এস সি ডিগ্রি পান এবং তাঁর গবেষণা লর্ড কেলভিন প্রমুখের প্রভূত প্রশংসা লাভ করে।

ডাঃ বসুকে ইংলন্ডে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শিক্ষাবিভাগের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আমলাদের বাধাদান সত্ত্বেও তিনি ইংলন্ডে যেতে পেরেছিলেন, যাকে “একালের কোনো ভারতীয়ের প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রা” বলে গণ্য করা হয়েছে। লিভারপুলের ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উপরে তাঁর ভাষণ বিখ্যাত পদার্থবিৎ লর্ড কেলভিনকে এমনই মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি ভারতে পুণঃ-সম্মিত বিজ্ঞানাগার স্থাপনের জন্য ভারতসচিবকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। টাইমস পত্রিকায় ডাঃ বসুর বহু প্রশংসা করা হয়েছিল এবং রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে কৃষ্ণতার পর স্পেকটোব পত্রিকা অভ্যন্ত ভারতবিশেষ সাময়িকভাবে ত্যাগ কবে ডাঃ বসুকে জ্ঞানসাধনব সন্মাসী পূর্বন্ত বলে ফেলেছিল। (*১১) এবং ইংলন্ডের বিজ্ঞানীসমাজ যুগান্তাবে

*১১ ভারতের সন্মাসী মন বিজ্ঞানে নিয়োজিত হলে কী অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটাবে সে বিষয়ে স্পেকটোবের উদ্দীপ্ত বিবরণ:

“Nothing would seem laborious to him” (Bose) in his enquiry, nothing insignificant, nothing painful, any more than it

তৎকালীন বিজ্ঞানাগার স্থাপনের জন্য আবেদন জানিয়ে ছিলেন। (*১২)

১৮৯৫ খৃস্টাব্দ থেকেই ভারতীয় সংবাদপত্রে ডাঃ বসু সংবাদ বিস্তৃত আকারে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এইসব সংবাদের মধ্যে একদিকে দেখি, ইংলন্ডের বৈজ্ঞানিক মহলে ডাঃ বসুর সমাদরের উল্লেখ এবং তদনুযায়ী গৌরব-বোধে উদ্দীপিত মন্তব্য, অন্যদিকে ডাঃ বসু স্বদেশের আগলাভব হাতে উপযুক্ত মর্যাদা লাভ না করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে, ভারতে প্রদর্শিত জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার কিতাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা থিরজিফিস্ট পত্রিকার নিম্নের মন্তব্যে পাই:

“For the honour of India, let us hope the rumour is true that Professor J. C. Bose, of the Bengal Presidency College, has made an original discovery which, if demonstrated to be all that is claimed for it, will place him in the front rank among modern scientists. It is said that Prof. Bose has been experimenting on the theory that the etheric waves may be used for telegraphing and all conducting wires dispensed with. It is alleged that he has achieved the result of sending signals of sound and light between two points with the help of ether only.” (১৬ই মার্চ, ১৮৯৫-এর বেঙ্গলীতে উদ্ধৃত)

ভারতীয় ইতিহাসের পক্ষে এটি অত্যন্ত মূল্যবান একটি সংবাদ—জগদীশচন্দ্রের প্রথম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সংবাদ।

১৮৯৭-এর ২৫শে এপ্রিল পূন্য মারহাট্টা “ইয়োরোপে অধ্যাপক বসুর জয়যাত্রা” নাম দিয়ে যে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন, তার মধ্যে ইংলন্ড থেকে আমন্ত্রণক্রমে অধ্যাপক বসুর জার্মানী ও ফ্রান্সে গমন ও সেখানে তাঁর গবেষণার

would seem to the true *sanyasi* in the pursuit of his enquiry into the ultimate relation of his own spirit to that of the Divine. Just think what kind of addition to the means of investigation would be made by the arrival within that sphere of enquiry of a thousand men with the *sanyasi* mind, the mind which utterly controls the body and can meditate and enquire endlessly while life remains, never for a moment losing sight of the object, never for a moment letting it be obscured by any terrestrial temptation.”

*১২ জগদীশচন্দ্রের জীবনের একালীন বৈজ্ঞানিক লেখকৃত নিবেদিতা লোকমাতা গ্রন্থের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও বহু তথ্য এই গ্রন্থে পাঠক পাবেন।

বিপুল সমাদরের কথা ছিল। সেই সঙ্গে অন্য, বিজ্ঞান ইংরেজের উদারতার পাশে রাজনৈতিক ইংরেজের সংকীর্ণতা সমালোচনাও করা হয়েছিল।

স্বদেশে ডাঃ বসুর প্রতি আবিষ্কারের বিষয়টি ভারতীয় সংবাদপত্রের আলোচনার বিষয় হলেও * (১৩) তাঁর গৌরবগানই প্রাধান্য পেয়েছিল। তাৎক্ষণিক রচনাধীন মধ্যে, বিশেষতঃ স্যার উইলিয়াম হান্টারের মত বিখ্যাত ব্যক্তি বহু ভারতীয় নবজাগরণ জগদীশচন্দ্রের ভূমিকার কথা আদেশ-ভরে লিখেছিলেন। এইসব সম্পাদকীয় রচনায় বিভিন্ন ভারতীয়ের কৃতিত্বকে একত্রে তুলে ধরা হত। স্যার উইলিয়ামের মন্তব্য উদ্ধৃত করার আগে নন্দলাল গুপ্তা আমাদের বোম্বাইয়ের গুরুরাটি পত্রিকার ৯ নভেম্বর, ১৮৯৬-এর মন্তব্য কিয়দংশে উদ্ধৃত করছি:

“মিঃ অতুল চ্যাটার্জি গত আই সি এস পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ক্রিকেট মাঠে প্রিন্স রণজিৎ সিংহীর কীর্তি জীড়াজগৎকে বিস্মিত করেছে। ...মাদ্রাজ স্ট্যাডিয়ামের লন্ডন-সংবাদদাতা বলেন, ইংলন্ডে এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি মিঃ স্যার ডব্লিউ বা লর্ড সলস্বেবেরী নন, সুবিদিত ও বস্ফিত প্রিন্স রণজিৎ সিংহী। ...এই দাতব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন অধ্যাপক বসু বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়ে উৎসাহপূর্ণ সমাদরের ভাষায় কথা বলেছেন। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকার বিভাগের সামনে অধ্যাপক বসু যে-পেপারটি পড়েছেন তা স্রোতাদের উপর এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাঁদের কৌতূহল এমনভাবে উদ্ভূত করেছে যে, অধ্যাপক বসুকে গোটা পেপার পড়বার তাগিদ দিয়ে তাঁর নির্ধারিত সময়ের অনেক পর পর্যন্ত অপেক্ষা করে ছিলেন। বিদ্রোহ-তরঙ্গের প্রকৃতি পবীক্ষার জন্য অধ্যাপক বসু যে-চমৎকার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন সেটিতে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার সময়ে লর্ড কেলভিন ক্রমাগত হর্ষধ্বনি

*১৩ বোম্বাইয়ের ইংরেজ দৈনিক পত্রিকা ‘ব্রিটিশ গেজেট’ ৪ নভেম্বর, ১৮৯৬-তে ডাঃ বসু সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতার কথা বলেছিল। গোড়ায় বিস্মৃতভাবে ডাঃ বসুর পাশ্চাত্য সমাদরের কথা বারংবার পত্রিকার লেখক বসুই দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞানের প্রয়োজনে ডাঃ বসু যখন ইউরোপবাস কিছুদিন বাতিলে নিতে চান তখন সে সুযোগ তাঁকে দেওয়া হচ্ছে না। ‘বিজ্ঞানের নামে কিছু চাওয়া হলে তাকে অগ্রাহ্য করার মত ফিলিস্টাইন হোয়াইট-হলে যথেষ্ট সংখ্যায় রয়েছে’—পত্রিকাটি তাঁর বিদ্বেষের সঙ্গে লিখেছিল। সেই সঙ্গে বলেছিল—অন্য সরকারের আক্ষেপের সীমা নেই, ভারতীয় ছাত্রের জীবন ব্যবসা বা চিকিৎসা-ব্যবসা ছাড়া আজ কিছু নিতে চান না। পত্রিকাটি সবকিছুর ভণ্ডামীর চেহারা একেবারে খুঁজে দিয়েছিল।

অমৃতবাজার পত্রিকার ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৬-এর একটি সংবাদে পাই, পাজারের কোনো বিদ্যায় ইংবাজ অধ্যাপকের জায়গায় বাস্তব বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসুকে বসাবার কথা উঠলে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মন্ত্রপত্র এলাহাবাদের ‘পায়েরলিয়ার’ ঘৃণায় আঁতকে উঠেছিল।

করে গেছেন। ...স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ব্যাপ্ততা ও অপূর্ব আলোচনার দ্বারা ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে অভূতপূর্ব আগ্রহের সৃষ্টি করেছেন। দাদাভাই নৌরজি ইংল্যান্ডে আত্মত্যাগপূর্ণ, দেশপ্রেম-যুক্ত পবিত্রতার দ্বারা ইতিমধ্যেই নিজেকে অমর করেছেন। আমরা আরও বিখ্যাত ভারতবাসীর নাম উল্লেখ করে প্রমাণ করতে পারি, এই দেশ মানবসাধনার নানা বিভাগে সর্বোচ্চ শ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টিতে সমর্থ।”

ভারতীয় পত্রিকা গুজরাটির পক্ষে যেকথা লেখা স্বাভাবিক, সেই ধরনের কথা যখন স্যার উইলিয়াম হাম্টারেব মত বিখ্যাত সিভিলিয়ান ইংরেজ লেখেন, তখন সেটা আর নিছক দেশভক্তির উচ্ছ্বাস থাকে না। লন্ডন টাইমস-এ ৯ অক্টোবর, ১৮৯৬ তারিখ স্যার উইলিয়াম যা লিখেছিলেন, তার বড় অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি:

“এ বৎসর ইংলিশ ক্রিকেটের প্রধান ব্যক্তি এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রধান ব্যক্তি—উভয়েই হিন্দু। বিশ্বকীড়ায় প্রিন্স রণজিৎ সিংজীর কীর্তির তুলনায় মানস্বতার কীড়াঙ্গণে মিঃ চ্যাটার্জির কীর্তি কম চমকপ্রদ নয়। যে-সকল বৃটিশজীবন আমাদের কাছে উন্মুক্ত রয়েছে তাদের মধ্যে আমাদের পাবলিক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বৃষ্টিমান যুবকরা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের চাকুরি অপেক্ষা প্রবলতর আকর্ষণ অন্য কোনো চাকুরি সম্পর্কে বোধ করে কি না সন্দেহ। এই চাকুরির পরীক্ষার জন্য পরীক্ষকগণ যতখানি কঠিন পরীক্ষার্তীত কল্পনা করতে পারেন, তাই প্রয়োগ হবে থাকেন। প্রথম স্থানান্বিকারী মিঃ চ্যাটার্জির পিছনে যে ৮১ জন ভদ্রলোক রয়েছেন তাঁদের বিশিষ্ট ছাত্রজীবনের রূপ দেখিয়ে দেয় কি ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তাঁকে প্রথম স্থান অধিকার করতে হয়েছে।”

প্রিন্স রণজিৎ সিংজী ভারতীয় হয়েও আমাদের জাতীয় কীড়ায় সর্বোচ্চ সাফল্য দেখিয়েছেন—এটাই ভারতের জন্য তাঁর শ্রুতকর্ম নয়; আসল কথা, তাঁর ঐ কীড়াকীর্তির দ্বারা তিনি ভারতকে সমগ্র বৃটিশ জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে পূর্বে থেকে বিশেষভাবে অবহিত কিছু ইংরাজ সহজেই মেনে নেবেন—রাজপুতেরা সাহসী ও কীড়া-পারদর্শী এবং ব্রাহ্মণেরা বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে বৃষ্টিমান। কিন্তু এদেগে যারা টিকেট কেটে দলে দলে মাঠে ঢোকে, তাদের অধিকাংশের কাছে প্রিন্স রণজিৎ সিংজীর কীড়াকীর্তি ভারতবর্ষের নতুন আবিষ্কারের মত। এর দ্বারা তাবা প্রথম জানল যে, এশিয়াবাসী তাদের প্রজ্ঞা-দ্রাভগণের মধ্যে—যে কোটি কোটি প্রজ্ঞা বৃহৎ সংখ্যা ছাড়া তাদের কাছে আর কিছু নয়—এমন মানুষ আছেন, যিনি তাদের প্রিয় ও পরিচিত জাতীয় খেলায় নৈহৃত্য নিতে পারেন। রণজিৎ সিংয়ের জয়ের ফলে সাধারণ ইংরেজ ভারতবর্ষকে চিনেছে, ভারতবাসীকে তারা এমনভাবে সম্মান করতে শিখেছে যা অন্য কোনো জয়ের দ্বারা সম্ভব হত না। কিন্তু এই ব্যাপারটি আকস্মিক নয়, দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে যে-আন্দোলন চলেছে তারই শীর্ষতরঙ্গ। ভারতবর্ষে ঐ আন্দোলন চমকপ্রদ ফল প্রসন্ন করেছে। সে

আন্দোলন, প্রাচীন প্রাচ্য ধারার অনুসরণ থেকে নবীন পাশ্চাত্যধারার উত্তরণের জন্য। অর্ধ শতাব্দী আগে কোনো বিষয়ে উৎকর্ষের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ, আধুনিক ভাবধারার দ্বারা সামান্যই প্রভাবিত ছিল। বেদে পণ্ডিত হওয়া ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল; রাজপুত-প্রধানদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিজের ক্ষুদ্র প্রাসাদ-প্রহরীদলের সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যাওয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকাশ্যে ফুটবল খেলায় অংশ নেওয়া রাজপুত রাজার কাছে মর্যাদাহানিকর ছিল, ব্রাহ্মণের পক্ষে শারীরিক অনুশীলনও ছিল তাই। প্রিন্স রণজিৎ সিংজী এবং মিঃ চ্যাটার্জির সাম্প্রতিক সাফল্য ইংল্যান্ডের কাছে ভারতের পরিবর্তনের রূপ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে—যে-পরিবর্তনের রূপ সম্পর্কে ভারতবর্ষ বেশ কিছুদিন ধরে যথেষ্ট সচেতন—উচ্চ বর্ণসমূহ তাদের পুরাতন গুণোৎকর্ষের সাধনা ত্যাগ করে সেখানে নতুন গুণোৎকর্ষলাভের চেষ্টায় নিরত। এই নতুন গুণ-মান ইংরেজ যে-দেশেই গেছে সেখানেই বহন করে নিয়ে গেছে। এই পরিবর্তনকে প্রথম দিকে নিছক অনুকরণ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু বহুদিন হল সেই অনুকরণের যুগ অতিসম্পন্ন। প্রিন্স রণজিৎ সিংজীর খেলায় সর্বোপরি চোখে পড়ে তাঁর মৌলিকতা, শিল্পীর প্রেরণা এবং ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য। দ্বিতীয় স্থানান্বিকারীর সঙ্গে মিঃ চ্যাটার্জির বিরূপ ব্যবধান তাঁর অসাধারণ সামর্থ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি কম আকর্ষণ করে না।

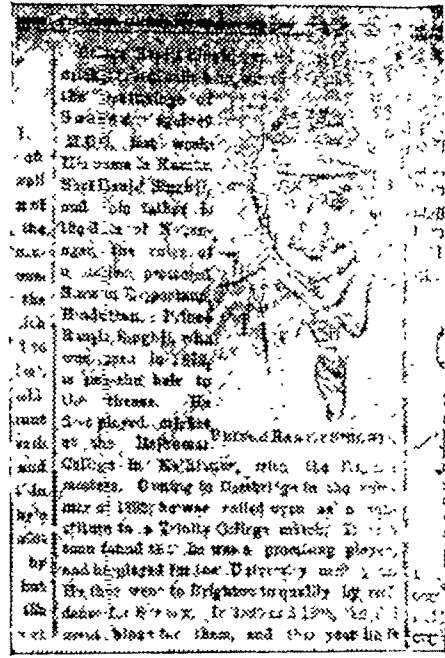
সাফল্য কেবল এঁদেরই নয়। এই বৎসর বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঘটনা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উপরে অধ্যাপক জে সি বসুর পেপার পাঠ। এই ভদ্রলোক—কেম্ব্রিজের এম এ, লন্ডনের ডক্টর অব সায়েন্স এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—ইতিমধ্যে ‘পোলারাইজেশন অব দি ইলেকট্রিক ওয়েভস’-এর উপর অদ্ভুত মৌলিক গবেষণা করে বৈজ্ঞানিক জগতের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। ‘ইলেকট্রিক রিফ্রাকশন’ এবং ইলেকট্রিক রেডিয়েশনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তাঁর পরবর্তী পেপারগুলি উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ‘এই সকল কঠিন বৈজ্ঞানিক সমস্যার অভিনব প্রায়োগিক সমাধান দেশে আমি একেবারে চমৎকৃত’—লর্ড কেলভিন বলেছেন। তাঁর মৌলিক সাফল্যের গোবব বৃষ্টি পেয়েছে আরও এইজন্য যে, তাঁকে কলকাতায় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে নিরন্তর দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে এবং তাঁর কর্মস্থলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিতান্তই অপ্রচুর। যেসব যন্ত্র কাজ করতেন সেগুলি তাঁকে নিজেই তৈরী করে নিতে হয়েছে। সেদিন বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সামনে On a Complete Apparatus for the Study of the Properties of Electric Waves নামক যে-পেপারটি পড়েছেন তা তাঁর দুই জাতীয় পারিশ্রম দেখিয়ে দিয়েছে—এক, গবেষণা, দুই যন্ত্র নির্মাণ। অধ্যাপক বসু, ভারতের পুরাতন পণ্ডিতদের তত্ত্ব ও দর্শন অনুশীলনের পথ যারা ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের প্রয়োগ-বিজ্ঞানের পথ গ্রহণ করেছেন, কেবল তাঁদের

প্রতিনিধিগণের একই মনোভাবের সর্বকারকে সেই পরিবর্তন মেনে নিতে কার্যতঃ বাধ্য করেছেন। ইউরোপের প্রধান গবেষণাগারগুলি দর্শনের জন্য সরকারী নিয়োগ-তিনি লাভ করেছেন। এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য কলিকাতায় পান্থ বিজ্ঞান ও বৈদ্যুতিক বিষয়ের গবেষণার জন্য উপযুক্ত বিজ্ঞানাগার নির্মাণ। অন্য বোবনের কর্মশক্তি বজায় থাকতে থাকতেই অধ্যাপক বসু বৃটিশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে-সম্মানের আসন অধিকার করেছেন, তা প্রিন্স রণজিৎ সিংজী ও মিঃ চ্যাটার্জি ভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সাফল্য দেখিয়েছেন, তারই মত তাৎপর্যপূর্ণ।

নতুন পরিবর্তনের সম্ভবতঃ আরও চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত লেফটেন্যান্ট এস সি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে, যিনি ব্রজেশের গত সামরিক অভ্যুত্থানের সময়ে ধুবই গরিমার ছুমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রবল গোলাবর্ষণের রাতে—৬ ঘণ্টা ধরে যখন তা চলেছে—পদাতিক বাহিনীর ফাস্ট লেফটেন্যান্ট হিসাবে কামান ও তায় সন্ত্রাসমূলক স্থানটি তাঁকে অধিকার করতে এলা হয়। ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হবার কালে তিনি ফাঁদে পড়ে যান—তাঁকে হয় অস্ত্রসমপর্ণ নয় সাক্ষাৎ মৃত্যু। কোনো একটাকে বেছে নিতে বলা হয়। তখন নিজস্ব সৈন্যদলের দিকে তাকিয়ে তিনি আহ্বান করে বলেছিলেন, ‘বন্দুগের তোমরা দেখ, কিভাবে পবিত্র হিন্দু স্থানের সন্তান এসব কামানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এসো, ঝাঁপিয়ে পড়ি।’ যে-কোনোভাবেই হোক তিনি অশ্লিষ্টবর্ণের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন; ফলে গোলাবর্ষণকারীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং কামানগুলি তাঁর পক্ষে অধিকার করে নেওয়া সম্ভব হয়। গত মার্চ মাসে এই বিবরণ লিখেছেন ব্রজেশের জনৈক লেখক। মিঃ চ্যাটার্জি ও অধ্যাপক বসুর মত লেফটেন্যান্ট বিশ্বাসও বাঙালী। প্রিন্স রণজিৎ সিংজী-সহ এদের সাফল্য দেখিয়ে দেয়, ভাবতবর্ষ পুরনো রীতি ছেড়ে নতুন রীতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতবাসীরা নতুন পৃথিবীতে বাস্তব-কীর্তির ক্ষেত্রে উচ্চ স্থান অধিকার করার পাথে অগ্রসর, যেমন তাদের পূর্বপুরুষগণ মহান আলেকজান্ডারের কাল থেকে আরম্ভ করে বহুদিন পর্যন্ত পুরাতন পৃথিবীর তাত্ত্বিক চিন্তাক্ষেত্রে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল।*

১৩৪

উপরিউক্ত রচনায় স্যার উইলিয়াম হান্টার তাঁর উদারতা এবং সীমাবদ্ধ দৃষ্টি ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। ভারতবাসীর সাফল্যকে তিনি সোৎসাহে অভিনন্দন জানাতে পারেন, কিন্তু সে ভারতবর্ষ ইংরেজের সৃষ্টি হওয়া চাই। পুরাতন ভারতবর্ষ স্যার উইলিয়ামের ধারণায় কেবলই তর্কচিন্তা করে গেছে, আব-কিছু করে নি। ইতিহাস অবশ্যই সেকথা বলে না। পুরনো ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই ক্রিকেট খেলে নি, স্তুতঃ রণজিৎ সৃষ্টি করতে পারে নি, কিন্তু লেফটেন্যান্ট সুবেশ বিশ্বাসের অনুরূপ বীরের ভারতবর্ষের ইতিহাসে



রণজিৎ

খৃষ্টতে বেশী পরিগ্রহের প্রয়োজন নেই—স্যার উইলিয়াম অন্ততঃ যদি নিকট-অতীতের সিপাহী ব্রিগেডের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি ওলটাতেন, তা দেখতে পেতেন। ভারতবর্ষে অতীতে বিজ্ঞানচর্চাও যথেষ্ট হয়েছে, এবং পবীক্ষার কৃতিত্ব ব্যাপারটা অন্ততঃ কিছু নয় এদেশে—যদিও পরীক্ষাটা আই সি এস ছিল না। সহানুভূতিশীল স্যার উইলিয়ামের রচনাটি ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজের সহৃদয় মূর্খস্বয়নার চেহারা দেখিয়ে দেয়। একথা সত্য, ভারতবর্ষে বিজ্ঞান বা বীজ্যসাধনার অব্যাহত ধারা থেকে জগদীশ বসু বা সুব্রহ্মণ্য বিস্বাসের উদয় ঘটে নি, এবং মধ্যবর্তীকালে পাশ্চাত্য প্রভাব ভারতবর্ষকে উদ্বেগিত করবেছিল—কিন্তু ঐহিক বিষয়ে উজ্জ্বলিত সব কিছু পাশ্চাত্য সংগ্রহে ঘটেছে, এই প্রচারের পিছনে ইংরেজের রাজনৈতিক স্বার্থ যথেষ্ট ছিল। ঐ প্রচার-বিষয়কে সত্য বলে মেনে নিলে ভাবতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতার সংশ্লিপ্ত এই নব উত্থান ঘটেছে—এই কথাতে অগ্রাহ্য করা হয়, এবং আধুনিক ভাবতবাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার সাক্ষাৎ-সৃষ্টি হয়ে ওঠে। জাতীয় আত্মদর্শনাদায় পক্ষে এম থেকে ক্ষতিকর বস্তু আর কিছু নেই। স্বামী বিবেকানন্দ এই ধরনের প্রচারের বিরোধিতা করেছেন সর্বপ্রকারে এবং লক্ষ্য করার বিষয়, স্যার উইলিয়ামের রচনায় স্বামীজীর উল্লেখ নেই। থাকতেই পারে না কারণ তিনি ভাবতবাসীর আধুনিক কৃতিত্বকে অতীত-বাহিনী কান্ড মনে করতেন না, কখনো মনে করতেন না যে, ভারতবর্ষ অতীতে ঐহিক বিষয়ে কোনো কৃতিত্ব দেখায় নি। তাঁর চেষ্টা ছিল অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করা—সেই প্রচেষ্টায় তিনি অবশ্যই গ্রহণের হাত বাড়িয়ে রেখেছিলেন—পাশ্চাত্যের ঐহিক সাহসের কাছ থেকে শিক্ষণীয় সম্ভার গ্রহণের জন্য। সমাজসংস্কারকগণের মধ্যে কেউ কেউ যেমন মাধব গোবিন্দ রান্নাতে

প্রভৃতি, প্রাচীন ভারতবর্ষ যে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে সাফল্যের মত বস্তুবিজ্ঞানেও যথেষ্ট উন্নতি দেখিয়েছিল—সে বিষয়ে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ কবে গেছেন।

স্যার উইলিয়াম যদিও রণজি, বিশ্বাস, চ্যাটার্জি ও বসুর কৃতিত্বকে সমপর্যায়ের মধ্যে করেছেন—সে বিচারপ্রান্টি স্বামীজীর অবশ্যই ছিল না। তাঁর পরিমাণ-বোধ নিঃসন্দেহে জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্বকে সর্বোচ্চে স্থাপন করেছিল, বসুর মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানের অভ্যুদয়কে দর্শন করেছিলেন—নিশ্চয় তার সমতুল ছিল না ব্যাট-হাতে ক্রিকেট-মাঠে ইংরেজের প্রশংসা কুড়ানো কিংবা পরীক্ষা-হলে ইংরেজ ছাত্রদের হারিয়ে দিয়ে তারিফ কুড়ানোর ব্যাপার। এই পর্যায়ে ইংল্যান্ড থাকাকালে স্বামীজীর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের কোনো পাক্ষিক হইছিল বলে আমবা সংবাদ রাখি না, কিন্তু স্বামীজী জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অসচেতন ছিলেন হতেই পারে না, অপরপক্ষে জগদীশচন্দ্র স্বামীজীর বিষয়ে উৎসুক ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে স্বামীজীর পবিত্র যোগাযোগ আমরা পরে বিশেষভাবে আলোচনা করব।

ক্রিকেটার রণজি সিংয়ের সাফল্যে স্বামীজী কিছু হৃষ্টিবোধ করতে পারেন কিন্তু সে হৃষ্টি সীমাবদ্ধ। ক্রিকেট মাঠে ভারতের মূর্তি—এমন উন্মত্ত চিন্তা বিবেকানন্দের অন্ততঃ থাকতে পারে না। রণজি, সাধারণ ইংরেজের কাছে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা বোধ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, এটুকু তিনি নিশ্চয় স্বীকার করতেন, কিন্তু ভারতের মূর্তি ইংবেজের প্রমাণতায় বা দাক্ষিণ্যে নয়, ভারত-বাসীর স্বকীয় শক্তিতে ঘটবে—এ বিষয়ে তাঁর ধারণায় কোনো বিধা ছিল না। জনসভায় আবেদনের রেজল্যুশন পাস করে শাসকদের বিরক্ত করা বা খেলার মাঠে সুকৌশলে ব্যাট চালিয়ে তাদের মুগ্ধ করার দ্বারা যে, ভারতবর্ষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি হবে না—এ কথা বুদ্ধিতে বিবেকানন্দকে তাঁর বিরাট প্রতিভার বহু-কিছু খরচ করতে হয় নি। তবে হয়ত রণজির সাফল্য দেখে ভারতের যুব-চিন্তে খেলাধুলায় উৎসাহ জাগতে পারে, শরীরচর্চায় আগ্রহ আসতে পারে—এ কথা তাঁর মনে হয়েছিল। এখানেও কলতে হবে, ক্রিকেট নিয়ে সম্ভবতঃ স্বামীজী অধিক উদ্দীপিত ছিলেন না, কারণ তিনি জানতেন, ক্রিকেট শাসিতের নয়, শাসকের খেলা। অথচ স্বামীজী বাল্যে যৌবনে ক্রিকেট খেলেছেন (টোউন ক্লাবে নাকি খেলতেন!), মনে হয় ভালই খেলতেন, নিশ্চয় গ্র্যান্ড ব্যাটসম্যান ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ তিনি অধিনায়কও ছিলেন (বেহেতু তখন বিবেকানন্দ না হলেও তিনি ‘নরেন্দ্রনাথ’)—তবু জাতীয় প্রয়োজনের দিক দিয়ে ক্রিকেট নিয়ে তিনি কখনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি।

স্বামীজীর জীবনীপাঠকের জানা আছে, তিনি কি পরিমাণে ব্যায়াম ও খেলাধুলায় উৎসাহী ছিলেন। স্কুল ও কলেজ-জীবনে ফুটবল ক্রিকেট খেললেও তাঁর উৎসাহ ছিল শরীরচর্চার নানা বিষয়ে এবং যথার্থ সাহসিকতার নানা অনুশীলনে। সুতরাং কুস্তি, সাঁতার, বাইচ, বক্সিং, তলোয়ার খেলা, অস্ত্রারোহণ, জিমনাস্টিকের বিবিধ খেলা,

বিশেষতঃ প্যারালাল বার ও রিংগেব খেলা। শেষোক্ত খেলায় প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছেন। ব্যায়াম তাঁর সারা জীবনের সংগী, শেষ পর্যন্ত ডাম্বেল কষেছেন। আর ঘোড়ায় চড়া সম্বন্ধে বলা যায়—এর বিষয়ে তাঁর বেপরোয়া ভালবাসা ছিল। শেষ জীবনে, ডাঙা স্বাস্থ্য ফেরাতে যখন পাহাড় গিয়েছেন, তখনো একাদিক্রমে ২০।৩০ মাইল ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে রাস্তার ছুটেছেন, তার দ্বারা শরীর আরো খারাপ কবেছেন এবং সভয়ে শিষ্য গুডউইনকে স্তানের কথা লিখেছেন—আর পাহাড় নয়, কারণ পাহাড় মানে ঘোড়ায় চড়া এবং শরীর খারাপ করা। অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর স্মৃতিকথায় এই ঘোড়াসওয়ার সন্ন্যাসীর উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন প্রজ্ঞার বুদ্ধে চিরতাবুদ্যকে বহন করেছিলেন, মৃত্যু অবধি।

স্বামীজী খেলাধুলা চাইতেন, নিঃসন্দেহে, কিন্তু খেলা এমন হবে যাতে সর্বসাধারণ সহজে অংশ নিতে পারে। বিবেকানন্দের ভাবনার প্রধান অংশ জনগণকে নিয়েই। সুতরাং তিনি কিভাবে জাতিকে ক্রিকেট খেলতে বলাবেন যখন জানেন যে, ক্রিকেট পরশ্রমজীবী অবসবভোগী সুখী সম্প্রদায়ের খেলা। এ খেলা যে-সময় ও অর্থ দাবী করে, নিরক্ষ ভারতবাসী তা সংগ্রহ করবে কি করে? ক্রিকেটের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের কৌলীন্যসম্পর্কও তিনি দেখেছিলেন, দেখেছিলেন—রণজিবা ক্রিকেট খেলেন, তাঁরা রাজকুমার, স্বদেশে প্রজ্ঞাদের শোষণ করেন এবং সেই পয়সায় বিদেশে শাসকদের সঙ্গে হাত ধরাধরি কবে খেলাধুলা, নাচা-গান্য করেন। সুতরাং বিবেকানন্দ যদি ভারতবাসীকে কোনো বিদেশী খেলা নিতে বলেন, তা হবে ফুটবল। এখানে মনোযোগ দিয়ে দিতে পারি, উনিশ শতকের শেষ ভাগে ফুটবল এখনকার মত ভারতের জাতীয় খেলা হয়ে ওঠে নি। ফুটবলের মধ্যে তিনি ব্যায়াম ও অ্যাডভেঞ্চার, দুইই দেখে-ছিলেন। ফুটবলে সময় বেশি যায় না এবং এর খরচ সামর্থ্যসীমার একেবারে বাইরে নয়। স্বামীজীর নানা উক্তির মধ্যে ফুটবলের উল্লেখ আছে। আধ্যাত্মিক ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তাঁর বিখ্যাত কথ্যগুলি কাব না জানা আছে—“যাও, ফুটবল খেলো, শরীরের পেশী শক্ত করে তৈরি করো, বল-শালী হও, তবেই গীতাভ শিক্ষা বৃদ্ধিতে পারবে।” এই কথা স্বামীজী একাধিকবার বলেছেন।

ফুটবল এখন সর্বজনীন খেলা। এই খেলায় বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়, এমন মনে হয় না। সুতরাং স্বামীজীর ফুটবল সম্বন্ধীয় উক্তিতে কিছু আতিশয্য আছে মনে হতে পারে। কিন্তু যদি আমরা স্বামীজীর কালে চলে যাই, ভিষ্ণু চিত্রই দেখব। ১৮৯০-এর কিছু আগে থেকে কলকাতায় বাঙালী-সমাজে ফুটবলের চল হতে আরম্ভ করে এবং পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে তা বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জনৈক পত্রলেখক অমৃতবাজার পত্রিকায় ২২ জুন, ১৮৯৭ তারিখে প্রকাশিত এক পত্রে বাঙালী ছেলেরা ফুটবল খেলতে শুরু করেছে তাব জন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে লেখেনঃ “বীর্ষশালী জাতিগণ তাদের

(শেষাংশ ২৩০ পৃঃ দ্রঃ)

শরদীয় সাপ্তাহিক বঙ্গমতী : ১০৭৭

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের একটি অপ্রকাশিত পত্র প্রমথনাথ স্মরণে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

কোন একটা দেশের উন্নতির পথে অনেকেরই সাধনা প্রয়োজন হয়। এই সব সাধনারত কর্মীরা নীরবেই কাজ করে যান। বাহ্যিক হৈ-হুল্লোড়ের পশ্চাতেই তারা থাকেন। বাংলা দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে অর্থাৎ ভারতের মুক্তি-সাধনকক্ষে যেসব কর্মী রত্নী ছিলেন তাঁদের কাজ-কর্ম লোকচক্ষুর অন্তরালেই সংসাদিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকের নাম ইতিহাসে স্থান পায় নি। প্রমথনাথ মিত্র বার অ্যাট ল এঁদেরই একজন।

প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় যাকে আমরা স্বদেশীষুদের আগেকার ফ্যাশানে স্যুধারণতঃ মিস্ত্রি সাহেব বলতাম, তিনি নৈহাটীর মিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বংশের পূর্বপুরুষ একজন মোগলযুগে রাজপুরুষ ছিলেন। মিস্ত্রি সাহেব যখন ইংলন্ডে পড়তেন, সেই সময় মুরশিদাবাদের শেষ নবাব ইংলন্ড যান। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলে তখনও তাঁর খ্যাতি ছিল। মিস্ত্রি সাহেব তাঁর স্বাভাবিক-পাগড়ি পরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান এবং নিয়মানুযায়ী কুণিগণ করতে করতে নবাবের সামনে উপস্থিত হন। লন্ডনে এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই নবাব সাহেব বিস্মিত হন। তখন মিস্ত্রি সাহেব নিজের পরিচয় দিয়া বলেন যে, নবাবের পূর্বপুরুষ যখন বাংলায় সুবাদাব ছিলেন, মিস্ত্রি সাহেবের পূর্বপুরুষ ছিলেন হুগলীর ফৌজদার।

বাংলায় বিপ্লবান্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন খৃষ্টান—এমন কথা কোথাও কোথাও শুনেনি। কিন্তু একথা ঠিক নয়। প্রমথনাথ সে যুগে বিলেত গিয়াছিলেন। এজন্য নৈহাটীর অধিবাসীরা মিত্র পরিবারটিকে একঘরে করে রাখে। মিস্ত্রি সাহেবের পিতা বিপ্রদাস মিত্র এতে ক্ষুব্ধ হয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু যে পুত্রের জন্য তিনি এ কাজ করলেন তিনি কিন্তু খৃষ্টান হন নি। তিনি চিরকালই রক্ষণশীল হিন্দুর

বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। চট্টগ্রামের চন্দ্রশালায় স্বামী পূর্ণানন্দের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মিস্ত্রি সাহেব তাঁর জীবনে হিন্দুধর্মে এই বিশ্বাসের সুফল পেয়েছিলেন। তাঁর জীবিতকালেই হিন্দুধর্মে তাঁর পর-কন্যার বিয়ে হয়। পিতার সঙ্গে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তাই বলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পিতার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। পিতার সঙ্গে একাত্মভূতই ছিলেন। বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনে আমরা তাকে পেয়েছিলাম। তিনিই একমাত্র লোক যিনি প্রকৃত স্বাধীনতার হোমাস্পিন জেদে রেখেছিলেন। দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁর বেঙ্গলী কাগজে মিস্ত্রি সাহেব অনেক সময় লিখতেন। মিস্ত্রি সাহেব ওজস্বিনী ইংরাজীতে লিখতেন। তিনি বহুতাত্ত্বিক গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায়। তিনি কংগ্রেসে কখনও যোগ দেন নি, যদিও সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু হিসেবে তাঁর সে সুযোগ ছিল। তিনি নেতা হতে চান নি, তিনি চেয়েছিলেন কাজ। তিনি মনে করতেন, সমগ্র সংগ্রাম ব্যতীত ভারতের মুক্তি সম্ভব নয়। এজন্য একটা বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর রাজনীতি ছিল বৈপ্লবিক রাজনীতি। বহুব্যবহারীকে বলতে শুনেনি, “আমরা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা তিনবার গড়েছি, তিনবার ভেঙে গেছে। এবার জমল।” শেষবারের প্রচেষ্টার ঘটনাবলি বঙ্গোপাখ্যায় বারীন্দ্র এবং অরবিন্দ প্রভৃতির যোগাযোগের পরের বিপ্লবী সংগঠনের কথাই তিনি বলেছেন। এর আগের কথা আমরা জানি না। তবে একটা ঘটনার কথা অনেক সময় তিনি বলতেন। যান-হানিব দায়ে সুরেন্দ্রনাথের যখন কারাদণ্ড হয়, মিস্ত্রি সাহেব তখন বরিশালে ব্যারিস্টারী করছেন। তিনি বরিশাল থেকে সাত হাজার নমুদ্রে ল্যাঠিয়াজ নিয়ে

এসে জেল ভেঙে সুরেন্দ্রনাথকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বলকাতার নেতারা এ প্রস্তাব সমর্থন করেন নি বলে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়।

১৯০২ সালে বাংলায় বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপিত হয়। অরবিন্দের বরোদা থেকে আসার আগেই এই সমিতি স্থাপিত হয়। সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্রটি বরোদা থেকেই আনা হয়েছিল বলে আমার ধারণা। প্রতিজ্ঞাপত্রটি অরবিন্দই এনেছিলেন। ভাষা ছিল সংস্কৃত। সর্বভারতীয় সমিতির নামও ছিল সংস্কৃত ভাষায়। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল—ধর্মরাজ্য সংস্থাপনার অর্থাৎ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমিতিটিকে আমরা নিজেদের ভাষায় বলতাম ‘গুপ্ত সমিতি’। আমাদের বাংলা দেশের সমিতিতে বলা হত বাংলা সমিতি—নিখিল ভারত সমিতির অঙ্গ। বাংলা সমিতি প্রতিষ্ঠায় পরে ভগিনী নিবেদিতা যখন বরোদা যান তিনি সেখানে অরবিন্দকে সংগ্রহ করেন। অরবিন্দ পূর্বেই মহারাষ্ট্র সমিতিতে যোগ দিয়াছিলেন। নিবেদিতা বাংলা সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অরবিন্দের যোগদানের পূর্বে বাংলা ও মহারাষ্ট্র সমিতির মধ্যে সংযোগ ঘটে। মিস্ত্রি সাহেব ছিলেন বাংলা সমিতির প্রেসিডেন্ট। সমিতির লিখিত কোন গঠন-তন্ত্র ছিল না। কিন্তু একটা কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা সমিতির সকল সদস্যকেই মেনে চলতে হত। স্থানীয় কর্মীতে তার উপরস্থ কর্মীর নিকট কাজের হিসেব দিতে হত। এইভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে সমিতির সমগ্র কাজ-কর্মের হিসেব মিস্ত্রি সাহেবের নিকট পৌঁছত। কোন সদস্যের কাজের হিসেব তার সহকর্মী জানতে পাবত না। তবে কে কি কাজ করত সকলে অবগত ছিল। কাজ চলত গুপ্ত কারবোনারী প্রথায়।

মিস্ত্রি সাহেব ব্যঙ্গালীর শাব্যবিক

ব্যায়ামের ওপর বিশেষ জোর দিতেন। জাতীয় মহামেলা বা হিন্দু মেলাব সময় থেকে এই ভাবধারা চলে আসছিল। শারীরিক ব্যায়াম কর এবং জাতীয়ভাব অর্জন কর—এই ছিল আদর্শ। মিস্ত্রির সাহেব বলতেন, লাঠি বাঙালীর জাতীয় হাতিয়ার। তিনি নিজে লাঠিখেলা জানতেন। সমিতির সদস্যদের তিনি লাঠিখেলা শেখাতেন। মিস্ত্রির সাহেবের এই লাঠিখেলা সম্পর্কে একটা ইতিহাস আছে। ছোটবেলায়ই তিনি লাঠিখেলার প্রতি আকৃষ্ট হন। পাড়ার বাগদী প্রতি ছিলেদের সঙ্গে মিশে তিনি লাঠি খেলতেন।

১৮৫০ সালের ৩০শে অক্টোবর কালীপুজার দিন মধ্যরাতিতে প্রমথনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। এজন্য মাতা চপলাদেবীর আশঙ্কা ছিল ছেলে ভুলী নিশ্চয়ই বড় হয়ে ডাকাত হবে। পাড়া-প্রতিবেশীরাও এইরূপ বলত। তার উপর ছেলে বাগদী ছেলেদের সঙ্গে মিশে লাঠি খেলছে। মাতা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ছেলেকে তিব্বতের করে তার লাঠিখেলা বন্ধ করে দিলেন।

মিস্ত্রি সাহেবের পিতা বিপ্রদাস মিত্র ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। সরকারী কার্য উপলক্ষে তিনি বাইবেই থাকতেন। ছেলের উপর মাতার এই উপাধীন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। কিন্তু বালক ভুলী বিনা প্রতিবাদে মার কথা মেনে নিলেন। কিছুদিন পরে বিপ্রদাসবাবু বাড়িতে এলে সব জানতে পেয়ে স্ত্রীকে বুদ্ধিরে আবার বালকের লাঠিখেলার ব্যবস্থা করে দেন। বালক পরমোৎসাহে আবার সঙ্গীদের নিয়ে লাঠিখেলায় মেতে গেল। মিস্ত্রির সাহেব খুব দক্ষ লাঠিয়ার হয়েছিলেন। শব্দ সমিতির ছেলেদের নয়, নিজের ছেলেকেও তিনি লাঠিখেলা শিখিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে গদকাও চমৎকার লাঠি খেলত। সমিতির ছেলেদের সঙ্গে মিস্ত্রি সাহেবের বাড়ির লন-এ এই লাঠিখেলা হত। একদিন বাবীন্দ্রকুমার লাঠি খেলছিল এই গদকাব সাংগ। এক অসতর্ক মর্মেতে গদকাব লাঠির আঘাতে বাবীন্দ্রকুমারের কপালটা গেল গোজালার মত ফুলে। সম্ভবতঃ সেদিন থেকেই লাঠিখেলার প্রতি বাবীন্দ্রকুমার বিমুগ্ধ হন।

মিস্ত্রি সাহেবের একান্ত বন্ধু দলে ছিলেন—চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু), অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। এঁদের তিনিই গুরু সমিতিতে এনেছিলেন। সমিতির প্রতিষ্ঠা থেকেই চিত্তরঞ্জন ছিলেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। সমিতিতে মিস্ত্রির সাহেব সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস পড়াতে।

মিস্ত্রি সাহেব অসীম শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। একবার তিনি দিল্লী যাচ্ছিলেন। বেলগাতি সকালবেলা দানা-পুর্ পৌঁছল। সকালবেলা ঘুম ভেঙেই দেখলেন দু'জন হাইল্যান্ডার সৈন্য তাঁর রিজার্ভ কামবায় উঠবার চেষ্টা করছে। তিনি আপত্তি করলেন। কিন্তু একজন কালো আদমীর কথায় তাবা কর্পাস করবে কেন? জোব কবে উঠবার চেষ্টা কবায় মিস্ত্রির সাহেব দু'জনকেই পর পর লাঠি মেরে বিমুগ্ধ কবলেন। কিন্তু ওরাও হঠাৎ পায় নয়। আরও জঙ্গী সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসতেই মিস্ত্রির সাহেব ঘুটির পব ঘুটিতে তাদের আপ্যায়িত কবলেন। লন্ডনে অধ্যয়নকালে এক সৈনিকের নিকট একদিন তিনি মার খান। এর পরেই লন্ডনের সেরা বক্সিং শিক্ষক বেছে তিনি বক্সিং শেখেন। হাইল্যান্ডার সৈন্যদল অপমানিত হয়ে সেবাবও ফিবে যান এবং অন্যান্য সৈন্যদের উত্তেজিত করে নিয়ে আসবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের অধিনায়ক যখন জানতে পারেন, একজন সাধারণ বাঙালীর কাছে কয়েকজন সৈন্য বার বার হেরে গিয়েছে, তিনি তাদের আর যেতে দেন না।

সেবারই দিল্লীতে গিয়ে তিনি গেলেন কুতুবমিনারে। সেখানে বসে বিভোর হয়ে ভাবছিলেন অতীত ভারতের কথা। এই সেই দিল্লী, যেখানে একদিন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রমুখ। কত গৌরবময় ভারতের সেই অতীত দিনগুলি। হঠাৎ দেখলেন, একদল অশ্বারোহী চসছে সামনে দিয়ে; তারা মূর্খে বলছে—জননী বিন্দনী ঠর তুমি অভী ব্যাঠে বো? বহুবীর তিনি এই দৃশ্যের কথা বলেছেন। তিনি বলতেন, সমগ্র ছবিটি আজও যেন আমার সম্মুখে জাজ্জল্যমান।

সমিতির সাকুলার রোডের কেন্দ্রে এখনও মিস্ত্রি সাহেব ক্লাশ নিতেন। ১৯০৩ সালের পর সাকুলার রোডের কেন্দ্রে ভেঙে গেল। ব্যায়ামের আড্ডা গেল স্ট্রীটে। রামবাগানের রাধিকার friends union ক্লাব ছিল গিরিশ পার্কে। এখানে ব্যায়ামের জন্য ছেলেদের

পাঠানো হত। ডাঃ তারকানাথ দাস এখানে ব্যায়াম শিখাতেন। ১৯০৪-৫ সালে সতীশ বসু সিমলার আখড়া স্থাপন করেন। আমি ও কালীঘাটের হরিদাস হালদার একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, অনুশীলন সমিতি নাম তুমি কোথায় পেলে? তিনি বলেন; জেলের ল' এসেম্বলী কলেজে এই নামে আমাদের একটা ক্লাব ছিল।

১৯০৬ সালে মিস্ত্রির সাহেব ঢাকা গিয়ে বৈপ্লবিক সমিতির একটি শাখা স্থাপন করেন। ঐ কেন্দ্ররও নাম দেন তিনি অনুশীলন সমিতি। এখানে তিনি পলিন দাসকে আবিষ্কার করেন। পলিনবাবু পরে কলকাতা এসেছিলেন। কানাইধন গেনে যুগান্তর অফিসে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়।

একদল লোকের খারপা আছে মিস্ত্রি সাহেব শব্দ সমিতির ব্যায়াম বা লাঠিখেলা শাখায় প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু এ ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে মিস্ত্রি সাহেব ছিলেন নিখিলবঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতির প্রেসিডেন্ট। যুগান্তর পত্রিকাও ছিল এই নিখিলবঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতির মুখপত্র। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের আধিবেশন সময়ে নিঃবঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতির আধিবেশন হয়। বাংলার সব জেলা থেকেই প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। মিস্ত্রি সাহেবই সভাপতিত্ব করেন। আধিবেশনে তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। উপস্থিত সদস্যদের তিনি প্রশ্ন করেন—আপনার Discipline মানতে রাজি আছেন কি? সকলেই উত্তর দেন যে, যে-কোন প্রকার discipline তাঁরা মেনে নেবেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে; একটি নিভৃত স্থান স্থির করে সেখানে যুগ্মবিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন, গড়িমসী আমাদের প্রধান দোষ? উপস্থিত সকলের নিকট তিনি যুগান্তর পত্রিকার জন্য সাহায্য চান। তিনি বলেন, ছেলেরা যুগান্তর প্রকাশ কবেছে, এদের সাহায্য করা প্রয়োজন। ঐ সম্মেলনে আমি প্রথম যতীন যুগান্তরকে দেখি। তিনি আমাদের নদীয়ার প্রতিনিধি; তাঁর মামা ললিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এসেছিলেন। (ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ)



এ অঞ্চলের সবাই জানেন, আমি যেখানে থাকি, সেটা বিদ্যের পাড়া। অর্থাৎ দক্ষিণ কলকাতার এই দক্ষিণতম অংশে—আমার আশপাশের বসতিতে, জ্বর-দখল জমির যেন-তেমন ঘরে, যারা থাকে—তাদের ঘরের বোঁ-বিরা। একদিন খম'ঘট করলে—বালীগঞ্জের অস্তত দু'-তিনশো ভালো ভালো বাড়ির গিঞ্জীরা চোখে অন্ধকার দেখবেন।

আমি থাকি আভিজাত্যের ব্যাক স্টেজে। সন্ধ্যায় বাড়িতে বাড়িতে চিৎকার, ঝগড়া-ঝাঁট, কর্পোরেশনের সবেধন নীলমণি টিউবওয়েলটিকে নিয়ে প্রমীলা-সুন্দর, সামনের ছোট রাস্তাটিতে উলঙ্গ এবং আধা-উলঙ্গ শিশুদের দাপাদাপি (ছাঁটব দপ্পুরে কার সাধ্য এক সেকেন্ডের জন্যে চোখ বোজে) এ সব আমার দৈনন্দিন। তবে আমার সব চাইতে বড়ো সঙ্কল্পনা এই : আমাদের পাড়া থেকে কি সাপ্লাই না দিলে দক্ষিণ কলকাতার দু'-তিনশো সুখী গহিণী কেঁদে ভাসাবেন। এইখানেই আমার গর্ব, আমি ডিস্টিংগিশ।

একদিন স্ত্রীকে বলছিলাম, যদি তেমন বিপদকে কখনো পড়িত—ততাল

তুমি অস্তত বাসন মেজেও আমাকে খাওয়াতে পারবে।

কিন্তু দেখলাম, তাঁর মুখ অন্ধকার হল।

‘কিগিরি করবার জন্যেই তো তোমার সংসারে আছি—’ এই উদার আত্মপরিচয় ঘোষণা করে তিনি এক-জলায় নেমে গেলেন। লক্ষ্য করলাম, আকারে ছোটখাটো হলেও কখনো কখনো তাঁর পায়ে বেশ জোরাহালো আওয়াজ ওঠে।

ভোরে যেদিন ঘুম ভাঙে, সেদিন জানসায় দাঁড়িয়ে ওদের কাজে বেরতে দেখি। কখনো কখনো দু'-একটি উলঙ্গ শিশু কাদতে কাদতে কারো পেছনে ছোট্ট—কোনো মা বিরক্ত হয়ে চড় বসিয়ে ফেরৎ পাঠায়—বিশগুণ চিৎকার জুড়ে সে ঘরের দিকে রওনা হয় : কেউ বা ‘তুই আমার হাড়-মাস জ্বালিয়ে খেলি’—এই তক্তুটি জানিয়ে শিশুকে টাঁকে নিয়েই কাজে চলে যায়। মাড়ে নটা-দশটা থেকে ফিরতে আরম্ভ করে, আবার ‘নিমটেয় নিম্ভগণ’

পূর্ববেলা ছোটখাটো কাজকর্ম করে, এক-আধ টুকরো দোকান-পাতিও

আছে কারো কারো। স্বভাবতই, এ বাজারে সংসার চলে না। মেয়েরা বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে, বাটনা বেটে এরই ভেতরে যা পারে সামাল দিতে চায়। আর অবধারিত উপেক্ষা—শিশুদেরই।

ঠিক আমার পাশেই একফালি জ্বর-দখল জমিতে যেন-তেমন প্রকারে তালি দিয়ে একটি ঘর। তাতে বর্ষার দিনে বাঙা ঢোকে এবং চোঁড়া সাপ তাকে তাড়া করে আসে। আটটি সন্তান। মেয়েটি বড়ো হয়ে কি, বড়ো ছেলেটা—মানে কিশোর বয়সের কোথাও কার-খানায় কাজ শেখে বোধ হয়। বাপ ছাটাই শ্রমিক—এখন হালদৈকরদের ঠিকে হয়ে কালে-ভদ্রে কিছু আনে। আর পাঁচটি বাচ্চা—কখনো একটা ফালি গোছেব জড়িয়ে, কখনো দিগম্বর হয়ে—প্রকৃতির কাছে মানুষ হচ্ছে।

মা রাতদিন একটা মোয়ের মতো খাটে। কী খেতে পায় আমি জানি না, তবে গ্রামের চাষীর মেয়ের খাঁচে আটো-শাটো শরীর—একটা ধানী রঙের শাড়ি পরে চরুকিপ মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রায় ছটমত ভাগিতে ঘরে আসে, চুরি করা কিংবা চেয়ে আনা

ক'টা রুটি বাচ্চাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েই আবার বেগে প্রস্থান।

তার একটি বাগা-মাস ছয়কের হবে বোধ হয়-ঘরে সামনে একটা চটের ওপর পড়ে থাকে-কখনো চিং হয়, কখনো উবুড় হয়। মা মধ্যে মধ্যে এসে চকিতে তাকে হয়তো একটু বকেব দুধ দিয়ে যায়, কখনো থাবড়ে থাবড়ে আদর করে : 'বাপো-আমাব ছোট বাপো।' বাস-ওই পর্যন্তই। এব বেশি সময় কোথায়?

বাচ্চাটা কান্দে কখনো কখনো, ছোট ভাইবোনবা তাদের মতো করে থামাতে যায়, কাশ্মার পরিমাণ হয়তো তাতে আবো বাড়ে। শীতের দিনে দেখি, নরম রোদের মধ্যে হাত-পা মেলে নিজের মনে খেলা করছে।

আমার স্ত্রী শিউরে ওঠেন কখনো কখনো।

'এই ঠান্ডার মধ্যে-ওই ছেঁড়া জামা জড়িয়ে ফেলে যায়। কেমন মা।'

আমি শুনি। মা-র হৃদয়হীনতা। আমারও খারাপ লাগে।

'আশ্চর্য এদের বাঁচবার শক্তি।'— আমার স্ত্রীর বিস্ময় বাড়তে থাকে : 'আমাদের ছেলেপুলে হলে তো দুর্দিনে মরে যেত।'

আমার সর্দিবাত, বৃকে ব্র্যকিয়াল প্যাচ আছে, ঠান্ডা লাগলে ব্যথা হয়। বলি, 'ওই ঠান্ডা মাটিতে উত্তরে

হাওয়ায় দুর্দিন শয়ে থাকলে আমিও টিকতুম না।'

'হয়েছে-থায়ো।'

ঠিক কথা-আশ্চর্য এদের বাঁচবার শক্তি। জন্ম থেকেই নীলকণ্ঠ। নইলে ভবিষ্যতের এত দুঃখের মোকাবেলা করবে কী করে।

কিন্তু গরুর ঘরে এ ছেলেটি বোধহয় একটু বেশি শোঁখিন। একদিন অসুখে পড়ল। মা ভাবল, কিছু না, গরীবের ছেলে এসব হয়ই। আপনিই সারবে। তারপর কাঁজে দৌড়োলো।

রোগ সারল না-বাঁকা হতে লাগল। সন্দেহ কব্বি, ব্র্যকো-নিউমোনিয়া। আমার জানলা থেকে ওদের ঘরের সব খবর তো পৌঁছোয় না। একদিন কেবল মেয়েটাকে কেমন চিন্তিত দেখলাম। ওরও যে চিন্তা করবার সময় আছে— এও একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

শুনলাম, বস্তির কাকে বলছে : 'ছেলেটা যেন কেমন করছে দিদি-কী হবে?'

'হাসপাতালে নে যাও।'

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় কই-কত কাজ। স্বামীর কাঁদন দেখা নেই-বিয়ের মাস-হালইকরের জোগান দিচ্ছে। রোজা অদুরেই ছিল, ঝাড়ফুকের জন্যে ডেকে আনল তাকেই।

বিশ্বাস করুন, এই উনিশ শো সত্তর সালে-দক্ষিণ বালীগঞ্জের এই সর্বোত্তম আধুনিকতার দুর্দিন শো গজ পেছনে এখনো বোজার জমাট পশার। লোকটাকে চিনি ঝাঁকড়া চল, সর্বদাই তাড়-টাড়ি খায়, কুকুরে কামড়ালে পিঠে থালা বসিয়ে বিষ নামায়, বন-চাঁড়ালের গাছের কাছে হাততালি দিয়ে-তার স্পন্দন জাগিয়ে লোককে বিমূঢ় করে, বলে, 'এই গাছে আমাব পোষা ভূত নামিয়েছি।' বিচিত্র চরিত্র একটি।

কিন্তু রোজা বোকা নয়। ব্যাপার দেখেই বুঝল। বলল, 'ওর হয়ে গেছে। আমি আর কী কবব।' তখন কান্দতে কান্দতে দৌড়োলো হাসপাতালে।

বিকলে কলেজ ফেরৎ দেখছি— দাপিয়ে দাপিয়ে কান্দছে মেয়েটা : 'ওরে আমার ছোট বাপো রে, তুই কোথায় গেলি রে।'

মানে শেষ হয়ে গেছে।

স্ত্রী দাঁতে দাঁতে ঘষে বললেন,

'ডাইনি নিজের হাতে মেরে ফেলল ছেলেটাকে।'

পরের অধ্যায়ে দোরে দোরে বেরুল সাহায্যের জন্যে। চোখের জল মুছতে মুছতো। খবর পেয়ে স্বামীও এসে পৌঁছেছে। রোগা, অনুহারজীর্ণ, কালো কাঁকলাশের মতো, চেহারা-চলতে ফিরতে পারে পায়ে ঘষা লাগে।

বস্তির যে-মা পারে দিল। ভালো ভালো বাড়ি থেকে কিছু মিলল, আমাদেরও দিতে হল সামান্য কিছু। স্বামী-স্ত্রী চলল হাসপাতাল থেকে মরা ছেলে তুলে নিয়ে তার সদগতি করতে।

সন্ধ্যার পরে স্ত্রী বললেন, 'কান্ড দেখেছ?'

'কী?'

'ছেলে পোঁতবার খরচ দিলুম না সবাই? পুঁজেছে, না ছাই। ডোমেদের দিগে এসেছে নিশ্চয়। দ্যাখো না-থলে ভরে বাজার করে আনল।'

হয়তো সত্যি-হয়তো সত্যি নয়। কিন্তু এর আগে এরকম বাজার ওদের এসেছে বলে মনে হল না।

স্ত্রী আবার তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'জন্তু।'

রাত নটা-দশটা পর্যন্ত থেকে থেকে কামা আসতে লাগল : 'ওরে আমার বাবা রে, ওরে আমার ছোট বাপো রে— স্ত্রী বললেন, 'এদিকে কামা, ওদিকে রান্নাটোলা চলছে কিন্তু।'

চপ করে রইলুম।

'বাচ্চাটা মরেছে, বাঁচল।' একটা ঝগড়া কমে গেল ওর। যা কান্দছে— পাড়ার লোককে জানান দেবার জন্যে। নইলে বলবে কি সবাই।'

নিভুল। বেঁচেছে তো নিশ্চয়ই। এবং পরদিন দেখলাম, শোকের চিহ্নমাত্র নেই। ভোরে আগের আমার ঘুম ভেঙেছিল। জানলা দিয়ে দেখি, সেই ধানী রঙের শাড়ি পরে একটা ছটন্ত ঘোড়ার মতো বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে তীক্ষ্ণ গলায় বড়ো মেয়েকে কী শাসনও করে গেল যেন।

কী করা যাবে? জীবনের চেহারা-টাই তো এই।

শোকেও একটা বিলাস। তার জন্যে অবসর দরকার। সে অবসর ওরা কোথায় পাবে?

শারদীয়ার সাদর সন্তোষ গ্রাহকদিগকে জানাইতিছি—

ইঞ্জিনের পার্টস, পাম্পিং সেট, ইলেকট্রিক মোটর ও সুইচ, ধানকল, আটকল, চিড়া-কুটা, মৌসিন ও তাহার পার্টস আমরা সর্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত রাখি, কটনমিল, জুটমিল ও কোলিয়ারির যাবতীয় ফ্রেটস সরবরাহ করি। মফস্বলের রেলস্টেশনের একমাত্র প্রের্যতম পণ্যবিশেক। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

ওরফাজ মৌসিনারী সাপ্লাই এজেন্সী

২০, নেতাজী সুভাষ রোড (একতলা)

কলিকাতা-১

ফোন : ২২-২৮৫৫



অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম। মনে বিস্তর প্রশ্ন, কিন্তু কোনো মানুষের কাছে তার ঠিক মতো উত্তর পাই না। দর্শনশাস্ত্র সবই প্রায় পড়েছি, অত্যন্ত দর্শন বিষয়ে মোটা-মুটি একটা ধারণা হয়েছে, কিন্তু সে সবই আকাদেমিক, মন ভরে নি তাতে।

তারপর বিজ্ঞান পড়তে আরম্ভ করলাম। তত্ত্বকথা কিছু কিছু জানা গেল কিন্তু বিজ্ঞান প্রায় সবটাই ব্যক্তি-নির্বাপেক্ষ। একমাত্র মনোবিজ্ঞান কিছু পরিমাণ ব্যক্তির সংগ সম্পর্ক রাখে, কিন্তু আর একদিক থেকে মনো-বিজ্ঞানের মতো নির্বাস্তিক বিদ্যা আর আছে কি না সন্দেহ হয়।

অনেক চেষ্টা করলাম ঈশ্বরকে জানতে, বিধাতাকে জানতে। অনেক গুরুর শিষ্য গ্রহণ করলাম একের পর এক। উজ্জনখানেক গুরু, ত্যাগের পর ঠিক করলাম বই পড়েও কিছু হবে না, গুরু নামক আর এক অস্ত্র ব্যস্তির সাহায্যেও কিছু হবে না, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় সৃষ্টির মূল রহস্য ভেদ করতে হবে। অত্যন্তপক্ষে আমরা কেন, এর উত্তরটা আমাকে জানতেই হবে এবং সোজাসজি।

ঘুরতে লাগলাম মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে। একটা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে চলছি আমি। সে বিশ্বাস কোনো একজন প্রচীর ওপরে বিশ্বাস, কোনো একজন জগৎবিধাতা অবশ্যই কোথাও আছেন, এই বিশ্বাস। শোনা গিয়েছিল তিনি সবগুণই আছেন এবং আমার মধ্যেও আছেন। এই শেষের কথাটি আমার বিশ্বাস হয় নি কখনো। গলা খব লম্বা হলে মাথা বোঁকিয়ে বকে কান রেখে বসতে চেষ্টা করতাম বিধাতা পুরুষ আমার মধ্যেও আছেন কি না। কবি মতো আমি লম্বগ্রীব নই, হলে কি আব আমি গাইতে পারতাম না—“আমি কান পেতে বই,

আপন হৃদয় গহন খান্না?” তাহলে তো সোজাসজিই কিছু অনুভব করা যেত।

ইন্ডাইরেট মেশড অর্থাৎ গৌণ উপায়ে, ঘোরা-পথে জানবার একমাত্র উপায় আমার ব্যবহারের মধ্যে বিধাতার কোনো অস্তিত্ব বোঝা যায় কি না। কিন্তু নিজের ব্যবহারে নিজেই অত্যন্ত লক্ষিত হয়ে আছি, এব মধ্যে বিধাতার কোনো অংশ থাকতে পারে এমন সন্দেহমাত্র মনে জাগে না। যখন এককালে ম্যালেরিয়ার ভুগোছি আর সেই সঙ্গে কুইনিন মিকসচার খেয়েছি, কম্পনাও করা যায় না যে, বিধাতাও আমার ভিতরে বসে সেই ততো কুইনিন মিকসচার খেয়েছেন এবং খেয়েও টিকে আছেন। আমি জ্বরের ঘোরে যখন অজ্ঞান হয়েছি, তখন বিধাতা আমার মধ্যে থেকে আমারই সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন এবং মাথায় বরফ দেওয়াতে দু'জনেই একসঙ্গে চেতনা ফিরে পেয়েছি। এমন কথা তাঁর সম্পর্কে ভাবতেও লজ্জা বোধ হয়।

অতএব তিনি অন্য যার মধ্যেই থাকুন, আমার মধ্যে যে নেই, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে আমি তাঁকে বাইরে খুঁজতে বোরখোঁছিলাম। বারনার্ড শয়ের ব্রাক গার্ল গডের সম্মানে বোরখোঁছিলাম, আমারও প্রায় তাই। তবে পথ ভিন্ন।

মনে বিশ্বাস ছিল কোথাও না কোথাও তাঁকে পাবই পাব। শহর ছেড়ে বোরখোঁছি বেশ কিছুদিন। ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যে এসে পড়েছি খোঁজাল নেই। লক্ষা স্থির থাকলে পথের খোঁজাল থাকে না।

তারপর একদিন কি কান্ড ঘটল। একটা ঝোপের পাশ দিয়ে হেঁটে চলছি। সামনে বেশ কিছু দূবে ঘন জঙ্গল। মনে হ'ল যেন ঝোপের মধ্যে কেউ নড়ছে। যেন কেউ লুকোচ্ছে।

মানুষ, সন্দেহ ছিল না, কাণ চড়া দেখা গিয়েছিল। চ্যালেঞ্জ করাই ঝোপের নড়াচড়া থেমে গেল। তখন আব সন্দেহ রইল না—নিশ্চয় কোনো অপরাধী—আইনের ভাষায় ক্রিমিন্যাল। হঠাৎ বাঁপিয়ে পড়লাম অপরাধীর ওপর। এ কাজটি আমি ভেবে চিন্তে কবি নি, কাণ আমার যে লক্ষ্য, তা থেকে দ্রষ্ট হওয়া আমার পক্ষে দ্রুত-কর এবং তা লক্ষ্যদ্রষ্ট হওয়া ছাড়া আর কি?

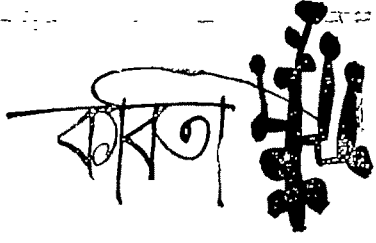
কিন্তু “কি ছিল বিধাতার মনে”—আমি আমার অজ্ঞাতসারে স্বয়ং বিধাতাকেই ধরে ফেলেছি এই ঝোপের মধ্যে। পরিচয় পেয়ে তবে বোঝা গেল। প্রথমে নানাভাবে পরিচয় এঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই ছাড়ব না বরং তিনি সব প্রকান করলেন। তবে এখানে তিনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন এবং আমাকে দেওয়া লুকনোর চেষ্টা কেন করেছেন, তা কোনো মতেই প্রকাশ করলেন না। আমিও ওসব অবান্তর কথা জিজ্ঞাসা করে সময় নষ্ট না করে আমার প্রশ্ন, তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ, তবে এত দূরে দিচ্ছ কেন? তোমার উদ্দেশ্য কি?

বিধাতা এক চোখ বন্ধ করে আমার দিকে একটুখানি তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, কোনো কথাই বললেন না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন আমিও তাঁকে চিন্তা করার মধ্যেই সময় দিলাম, কিন্তু তবু তিনি কিছু বললেন না।

আমি তখন তাঁর ডান হাতখানা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম চুপ করে আছ কেন? আমার সব কথাই উত্তর না দিলে আমি হাত ছাড়ব না।

বিধাতা গম্ভীরভাবে গুটা চঃ বুজিয়ে



চক্রান্ত

প্রমেন্দ্র মিত্র

আমিই শাসন
আমিই বিদ্রোহ।
শিরায় শোণিত, সত্তায় চেতনায়
নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বেড়াই বয়ে
গোচরে অগোচরে।

এই চক্রান্তই আমার ইতিহাসকে ছোটায়,
‘হাঁ’ আর ‘না’-এর ঠোকাঠুকিতে।
নগর বসায়
আবার ধসায়,
আর কত না ধুবতায়
উষ্কার মত দেখ খসিয়ে।

প্রাণের গহণে এ চক্রান্ত
বে রং রাখে মাথিয়ে,
তা মূহলেই নাকি মোক্ষ।
পেঁছোবার সেই নাকি এক ম্যাজিক
এ সৃষ্টির সব ধাঁধার পেছনে।

তাই যদি হয়, তবে
জিজ্ঞাসা নিজেই হোক ঘাবাব।
কেনই বা তলিয়ে খোঁজা?

ভেসে-ই থাকি এ ধাঁধার তরণে!

মনে হল, আসলে বোধ হয় মনে মনে
হাসিছিলেন) জিজ্ঞাসা করলেন, কি
বলব, বল। কোন কথা জানতে চাও?

জানতে চাই অনেক কথা। কেন
আমাদের এত ব্যাধি, এত যন্ত্রণা,
কেন বাজারে মাছ পাওয়া যায় না, কেন
চালে কঁকর? কেন শৈয়াল সৃষ্টির
পরে শিয়াল কাটা সৃষ্টি করেছে? কেন
এত যশ, নরহত্যা, পরীক্ষার প্রশ্ন-
পত্র কঠিন, কেন এত পিকেটিং, এত
ধর্মঘট, এত বোমা, এত বন্দ? কেন
ছাত্র বিক্ষোভ? কেন এত দলাদলি?
কেন এত ফারনিচার ভাঙা, বই
পোড়ানো? কেন এত কাব্য-ছোট-
গল্প-উপন্যাস-নাটক? কেন বোমার
দাম ৩৫ পরস্যা থেকে তিন টাকা
হল? কেন? কেন?—প্রায় হাজার-
খানেক কেন এক নিশ্বাসে উচ্চারণ
করে বিধাতাকে কাবু কবলাম। তাঁর
হাতখানা শক্ত করে আমার হাতে ধরাই
রইল।

বিধাতা বললেন, যদি এ সব
সিদ্ধিযাসুচি জিজ্ঞাসা করে থাক,
তবে একটি সত্য কথা বলি। মাছেব
অভাব কিংবা চালে কঁকর, কিংবা
ছাত্র বিক্ষোভ ইত্যাদি মিলিয়ে যত
প্রশ্ন করলে, তা পৃথকভাবে করার
দরকার ছিল না। মানুষের আবি-
র্ভাবের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক

অচ্ছেদ্য। এ সব পৃথক সৃষ্টি করে
মানুষের ঘাড় চাপানো হয় নি।

তবে মানুষ সৃষ্টি করলে কেন?
এইবার ঠিক প্রশ্ন করেছে। আমার
কথা বিশ্বাস কর, আমি মানুষ সৃষ্টি
করি নি, মানুষ সৃষ্টি আমার লক্ষ্যই
ছিল না।

কি লক্ষ্য ছিল?

আমার লক্ষ্য ছিল বাদির সৃষ্টি।

তবে কি করে মানুষ এলো, কে
সৃষ্টি করল তাকে?

বিধাতা আত্মগতভাবে বললেন,
হঠাৎ কি করে ‘মিউটেশন’ ঘটল
বুঝতে পারছি না। হয় তো আমার
কোনো একটা অসতর্ক মূহুর্তে
কোনো একটা ধাপ ভুল হয়ে গেছে।
নইলে মিউটেশন ঘটবার আর তো
কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। মিউ-
টেশন মানে জান তো, একটা বংশ-
ধারা বেশ চলছে, একই প্যাটারনে,
হঠাৎ তার মাঝখানে একটা বদল ঘটে
গিয়ে আর একটা জাতের সৃষ্টি হল।
তোমাদের বেলায় যেমন হয়েছে।
বাদির থেকে হঠাৎ মানুষ জন্মে গেছে,
অথচ আমার শেষ লক্ষ্য ছিল বাদির
গড়া। প্রাণী সৃষ্টি উপরের দিকে
এখানেই শেষ করে দেওয়াই ছিল
আমার উদ্দেশ্য। আমার ডায়ারিতেও

লেখা আছে “সবার ওপরে বাদব সত্য,
তাহার ওপরে নাই।”

কিন্তু বিধাতা, আমার কিন্তু
বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার কথা। তুমি
নিশ্চয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভরে
আমাকে ধাম্প দিচ্ছ। তুমি—

আর বলা হল না। আমার
অক্যামনস্কতার সুযোগ নিয়ে বিধাতা
এক হেঁচকা টানে তাঁর হাতখানা
আমার মূঠো থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে
ঘন জঙ্গলের দিকে ছুটে লাগলেন।
আমিও ছুটে লাগলাম তাঁর পিছনে।
তিনি ছুটে ছুটেই বলতে
লাগলেন, ধাম্পা দিই নি, ঠিক কথাই
বলছি। কিন্তু তোমাদের আর ভয়
নেই, আমি আমার ভুল সংশোধনের
কাজ আরম্ভ করেছি, মূল লক্ষ্যে ফিরে
যাচ্ছি আবার, এবারে আর ভুল হবে
না।

বিধাতা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে
গেলেন। আমিও ছুটে গিয়ে তাঁকে
ধরব, এমন সময় সেই জঙ্গলের বড় বড়
গাছ থেকে প্রায় দৃশ হনুমান
লাফিয়ে পড়ে আমার পথ রোধ করল।
সে বাহু ভেদ করা আর আমার পক্ষে
সম্ভব হল না।

শব্দ শুনতে পেলাম সেই
বাহুর পিছনের জঙ্গল থেকে বিধাতা
হাসছেন—খিক খিক খিক।

গাছতলার খাঁটি দুধ



আমি নতুন এসেছি এ-পাড়ায়। কাউকে চিনি না জানি না। তার ফলে যা হয়। এখানকার ঘর বাড়ি মানুষ গাছপালা—সব কিছুই আমার কাছে নতুন। আমি কৌতূহল নিয়ে চারিদিক তাকাই। ভাল লাগে।

ভাল লাগে এই জন্য; কোনো কিছুই ভিতরটা আমি দেখি না জানি না। সং কি অসং সাদা কি কালো, তেতো কি মিষ্টি কিছুই যখন জানা থাকে না, অন্তত যতক্ষণ কেবল ওপরের দৃশ্যটাই আমার কাছে সব, ততক্ষণ সব মানুষ আমার কাছে ভাল, সব আম আমার কাছে মিষ্টি, সব ফুল সব গাছ আমার কাছে প্রীতিপ্রদ। কোন ফুলের ভিতর কীট লুকিয়ে আছে, কোন গাছের গাড়ির গোপন রম্ভের মধ্যে সাপের বাসা এই নিয়ে মন খারাপ করার কোনো কারণই এখন পর্যন্ত আমার ঘটল না।

সত্যি, কেবল ওপর দেখে তৃপ্ত থাকা, কেবল বাইরের চেহারা দেখে মুগ্ধ হবার মতন জগতে আর কিছু নেই। ঈশ্বরের আশীর্বাদ এটা। যতদিন এমন থাকে ততই ভাল।

তা ছাড়া, একটা পুরোনো পাড়ার



জ্যোতিষিন্দ নন্দা

বাসিন্দা হলে বা হয়, রাস্তার দেখা হলেই রামবাবু আপনার কাছে শ্যামবাবুর নিন্দা করবেন, শ্যামবাবুর সঙ্গে দেখা হলে নির্বাণ তিনি নজনীবাবুর নিজের না হোক তার পরিবারের আর পাঁচটি মানুষের নিন্দার পণ্ডমুখ হয়ে উঠবেন। কেন না রামবাবু শ্যামবাবুকে এত বেশি জানেন, তাঁর ভিতরটা এত বেশি দেখা হয়ে গেছে ভ্রলোকের যে, তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আব্রুস্ত করা মাত্র তিনি শ্যামবাবুর নিন্দা না করে পারেন না। তেমনি শ্যামবাবু রজনীবাবুর অথবা তাঁর পরিবারের নিন্দা করতে সর্বদা উৎসুক। কেন না ঐ পরিবারের গভীর গভীর সব ব্যাপার তাঁর জানা হয়ে গেছে। এখানে সে-সব নেই।

কারো নিন্দা কারো মূখে আমাকে শুনতে হয় না। অন্তত দিনকতক এমন থাকবে আমি জানি। ততদিন আমার কাছে এখানে সবাই ভাল, সব আম মিষ্টি, সব ফুল পোকাহীন, সব পাখি সরেলা, সব কিছু ভাল লাগে, সবাইকে ভাল চোখে দেখি বলে অনেক কিছু দৃশ্য সকালে-বিকেল আমার দেখা হয়ে যায়।

এটা কম লাভ না। কোনো কিছুই দিক থেকে আমাকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয় না। গাছ হোক, মানুষ হোক, এখানকার ঘর-বাড়ি, গরু-ছাগল, সকলি এমন কি রিজাওয়ালটাও আমার কাছে সর্বদাই তারা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

হুঁ, গাছে পাখি আছে, এই জন্য পাড়ার নতুন আমার চোখে একটু বেশি ঠেকে।

আমি বেড়াই, দু'বেলা খুব করে রাস্তায় হাঁটি। রিটার্ড জীবন। সময় কাটে না। তাই রাস্তার যারের দৃশ্য-গাঢ়ি প্রাণভরে দেখি।

বেশ নতুন নতুন বাড়ি হয়েছে এই তলাটে। এবং পল্লস্য খুঁচ করে যে দেগুদলি বানান হয়েছে পরিষ্কার বোঝা যায়। মাঝে মাঝে সবুজ মাঠ। গাছ-

গাছালি। আর নীল আকাশ তে আছেই।

কিন্তু একটা জাম্বাগায় পৌঁছে আমাকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

বড় ভালো লাগে দৃশ্যটা।

বিশেষ করে সকালের দিকে। পূর্ব আকাশে সূর্য খানিকটা উঠে বদল গাছটার আড়ালে পড়ে যায়। ডাই মাঠের মতন জাম্বাগায় রৌদ্র-ছায়ায় চমৎকার আলপনা পড়ে। বেশ বাকড়া মতন কদম গাছ একটা।

গাছতলার কটা হাড় জিরাজিরে গরু-বাহুর ও ছাল-বাকল ওঠা কটা মোম দাঁড়িয়ে থাকে।

তা মাঠ বলে কি আর তেপান্তরের মাঠ। এখানে ওখানে উঁচু উঁচু বাড়ি মাথা জাগিয়ে আছে। তখন পরিষ্কার বোঝা যায় এই যে রোজ সকালে কদম গাছটার নিচে ঘটি বাটি মগ বালানি নিয়ে মানুষগাঢ়ি দাঁড়িয়ে থাকে তারা এই সব সুন্দর সুন্দর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

হুঁ, দুধ। সামনে থেকে চোখে দেখে দাঁড়িয়ে থেকে দুইয়ে নেয়া। এক ফোটা জল থাকবে না। প্রোটিন। বড় দুর্লভ এই খাদ্য।

শব্দবাদের প্রত্যেকেই যে পল্লস্য-ওয়াল তাদের জামা-কাপড় জুতো পনের চামড়া দেখে বোঝা যায়। উঁহু, ঝি-চাকরকে দিয়ে বালানি জগু পাঠিয়ে দুধ নেওয়াবে কেন—ঝি-চাকরকে দিয়ে বিশ্বাস কি, ওই তো রাস্তার পাশে কল থেকে অনবরত ঝিঝির করে জল পড়ছে, দেড় সেরকে দু' সের করে নিতে তাদের আটকার কে, দু' সেরকে আড়াই সের করে নিতে বাধা দেয় কে।

দরকার নেই এই ঝিঝির নিয়ে।

তেল গুড় ঘি মাখন থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু ভেজালই তো যাওয়া হচ্ছে, আর এই গম্বলা যখন একেবারে বাড়ির দোরগোড়ায় গাছতলার গরু-বাহুর মোষ বেঁচে বাবুদের চোখে

সামনে দুধ দুইয়ে দিচ্ছে এই সুবোধ
কেউ হারায়?

কাজেই ছগ মগ ঝালতি হাতে
ঝুলিয়ে সকাল হতে বাবুরা নিজেরাই
চলে আসেন। গিন্নীরা আসেন। ঝল-
মল শাড়ি রাউজ। উজ্জ্বল গায়ের রং।
চোখে-মুখে পরিহৃষ্ট।

কেন না তাঁরা খাঁটি দুধ খাচ্ছেন।
চোখের সামনে গয়লা দুইয়ে দিচ্ছে।

এমনি খাবাব বস্তু গরুর দুধ।
ছানা পায়ের দৈ করার জন্য মোষের।
গাছতলায় রৌদ্র-ছায়া ঝিলমিল করে।
বাবুদের সংখ্যা গিন্নীদের সংখ্যা বাড়তে
থাকে।

হাতে হাতে চকচকে দুধের ভাণ্ড।
এ যেন মন্দিরের পূজা দেবার জন্য
নিজের হাতে নৈবেদ্য নিয়ে যাওয়া।
ঝি-চাকর কি বাইরের লোক দিয়ে
হবে না।

তা ছাড়া আর কি। দেহ তো
মন্দিরই। এই মন্দিরের জন্য পবিত্র
ভোগ, যার নাম কিনা দুধ, সম্পন্ন খাদ্য,
প্রোটিন, নিজেদেরই দিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
যাতে এখানে কোনোরকম ফাঁক ভেজাল
কারচূর্ণ না চলে।

অন্য সব কিছুর মধ্যে ফাঁক থাকলে
চলে, ফাঁক থাকলেও তুমি সামলে নিতে
পার। কিন্তু দুধের বেলায়—না মায়ের
দুধে, না গাইয়ের দুধে ফাঁক থাকলে
চলে না, শরীর নির্মাণ ভেঙে পড়বে,
আয়ু সংক্ষিপ্ত হবে।

তাই দুধ নিয়ে বাবুদের ও গিন্নী-
দের এত দৃষ্টিভঙ্গি। সূর্য ওঠার মুখে
নরম শয্যা ছেড়ে উঠতে হয়, তার পর
কাঁচা সড়কটাব জল-কাদা মাড়িয়ে গাছ-
তলায় ছুটে আসতে হয়।

অবশ্য সকালের হাওয়াটা গায়ে
লাগলে, একটু প্রাথমিক কান্ড হয়।
যাই হোক, দুধটাই হল লক্ষ্য। মন্দিরের
ভোগটাই এখানে প্রধান।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুশাটা দেখি।

আমাব অবশ্য হরিণঘাটার বোতলেই
চলে। দু টাকা সেরের খাঁটি দুধ
খাওয়ার পয়সা নেই।

কিন্তু একটা জিনিস দেখে অবাক
হই।

দুপ্ত স্বাস্থ্য নথর দেহ নিয়ে বড়-
লোকেরা, তাঁদের গিন্নীরা—হুঁ, আঁচল
উড়িয়ে বেশী দুলায়ে বিনোদিনীরাও
আসে দুধ নিতে, কচি কচি মেয়ে, বোঁ।

এই রূপের হাতে, চাঁদের মেলায়
ফুল স্বাস্থ্য, অমিত লাবণ্য ও অগাধ
পয়সার ভিড়ে ওই শীর্ণকায় রুদ্র
মানুষটা কেন আমাব মতন বড়ো হয়ে
গেছে, হাঁটুর ওপব ময়লা কাপড়, ছেঁড়া
গোঁজ এবং খালি পা। মাথায় টাক,
কানের দু'পাশে কটা সাদা চুল এখনও
লেগে আছে। প্রথম দিন আমি রাস্তার
ভিড়-ক'টিস্ক-ক'টিস্ক ভেবেছিলাম।

কিন্তু তা নয়।

রোজ একটা এলুগিনিয়ামের গেলাস
হাতে চূপ করে ভিড়ের পিছনে বসে
থাকে।

ভিখির কি আব রোজ দুধ খেতে
পারে। হয়তো খেটে খাওয়া মানুষ।

কিন্তু কি ভয়ংকর করুণ বিষয়
চেহারা। ঘোলাটে চোখ দুটো দিয়ে
বড়লোকদের ভাণ্ড ভরতি করে দুধ
নেওয়া দেখে। একজনের পর আব এক-
জন পাগ বাড়িয়ে দেয়। হাঁটু উঁচু করে
মেরুদাঁড়া টান করে বসে শক্ত হাতে
গয়লা পালান টিপতে থাকে, সোঁ সোঁ
কবে দুধের ধাবা অমৃতের খারা হয়ে
বালাতির মধ্যে পড়তে থাকে। একটা
পাগ শেষ হতে আর একটি পাগ। বাবুরা
গিন্নীরা বোঁ-ক'রা হুঁচটিচটে একের পর
এক অমৃতের ভাণ্ড তুলে নিয়ে সরে
যায়।

কিন্তু এ বড়ো? কতক্ষণ অপেক্ষা
করবে? আমি রোজ ভাবি। কিন্তু
আমার চেয়ে মানুষটাব ধৈর্য যে হাজার-
গুণ বেশি সেকথা কি আমার জানা ছিল।
উঁহু, গয়লা এ হেঁজিপেজি উটকো
মানুষটার দিকে তাকাতে কেন। অধ-
পোয়া দুধ আবার একটা দুধ নাকি।

কাজেই বাহুস্বরে বড়ো ঘণ্টার পর
ঘণ্টা একটা কোণায় চূপ করে বসে
থাকে। বাবুরা ছায়ায় দাঁড়ায়। তার
মাথাটা বোঁদে পড়তে থাকে।

কিন্তু তার যে অমৃতের অংশ
একটু চাই। নিশ্চয় ভক্তারের বকুনি
থেকে বেচাটা টোল। খাওয়া পুরোনো
গেলাসটা হাতে বসে খুঁকতে খুঁকতে
এখানে আসে। বাপু হে, যদি আব কটা
দিন বাঁচতে চাও একটু করে দুধ খাও,
চিরকাল তো খেটে খেটে মরলে এ শরীরে
একটু ভিটামিন প্রোটিন না পড়লে আর
যে চিকিৎসা রাখতে পারছে না।

তাই তো, ভাবি, পৃথিবীতে কটা
দিন বেশি বাঁচতে কার না সাধ হয়।

একটা ভাল জামা গায়ে নিতে পাবে
না, একটা চটি কেনার ক্ষমতা নেই। আশ
পো দুধের দামই কি কম। চার আনা।
ত্রিশ দিন সাড়ে সাভটাকা।

একটা গাচ নিবাস ফেলে করুণ
বিষয় মানুষটার দিকে আব একবার অন-
কম্পব দৃষ্টি বালিয়ে রোজ আমি
কদমতলা ছেড়ে চলে আসি। কেন না
এটা আমাব জানা হয়ে গিয়েছিল,
সকালের পাগ যখন পূর্ণ হবে, সবাই যখন
চলে যাবে তখন হয়তো গয়লা মহাদাঙ্ক
বহুদৃষ্টি হেনে প্রায় সহায় সম্প্রহীন
রুদ্র ক্রান্ত মানুষটাব দিক তাকাবে।
দয়া করে তার পাঠে দু'ফোটা খাঁটি দুধ
ডেলে দেবে। তখনি যে ডেলে দেবে
তার বিশ্বাস কি। আগের মাসের
পাওয়া দাম যদি এখনও মিটিয়ে না দিয়ে
থাকে তো কাল থেকে দুধ দেবে না বলে

আগে আছা করে বড়োকে শাসাবে।

বলতে কি, এত সব দেখতে জানতে
দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার ধৈর্য,
আমার ছিল না।

কিন্তু একদিন কেন মন মানল না।
দেখলাম, বড়ো ঠিক সকলের

পিছনে চূপচাপ বসে আছে। কিন্তু
তার ঘোলাটে চোখ দুটো থেকে থেকে
জলে ভরে উঠছে। জলটা যখন বেশি
ছমে উঠছে তখন কাঁধের ময়লা গামছাটা
দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলছে।

কেবল আমিই জিনিসটা লক্ষ্য কর-
ছিলাম। যেন আর কারো সৈদিকে
চোখ ফেরার মতন যথেষ্ট সময় বা
কারুণ্য কোনটাই ছিল না।

একে একে বাবুরা দুধ নিয়ে
চলে গেল। গিন্নীরা চলে গেল।
গাছতলা ফাঁকা হয়ে গেল।

এবার গয়লা হেঁজিপেজি মানুষটার
দিকে তাকাল। গামছা দিয়ে চোখটা
আর একবার ভাল করে মুছে বড়ো
হাতের গেলানটা বাড়িয়ে দিল।
দেখলাম ঠিক আশপো দুধই নিল সে।

দুধ নিয়ে হাঁটতে লাগল।

আমি পিছনে। মানুষটা যে পাকা
বাড়িগুলির দিকে যাবে না আমি জান-
তাম। একটা দুটো কাঁচা রাস্তাব মতন
দু'একটা বসন্ত এখনও এই তপ্পটে রয়ে
গেছে। বড়ো সৈদিকে চলেছে।

তার আস্তানাটা একবার উঁকি দিয়ে
দেখে আসতে দোষ কি। চিন্তা করে
আমিও একটু একটু করে সৈদিকে
এগুতে লাগলাম।

দেখলাম প্রকাণ্ড একটা কাঠ-বাদাম
গাছের নিচে বড়োর টালির ঘর। ঘরে
টোকর আগে ওপাশের একটা মন্দি-
দোকান থেকে বড়ো একটা পাউরুটি
কিনল। তারপর নিজের ঘরের দাওয়ান
উঠে গেল। ভিত্তবে চুকলো না, রুটি ও
দুধের গেলস নিয়ে দোরগোড়ায় বসে
পড়ল। কুকুরটা দাঁড়িয়ে আনন্দে লেজ
নাড়ছে। বড়োব পায়ের কাছে কুকুরটাব
দুটো বাস্কা কাঁই কাঁই করে ছুটে এসেছে।
হাতের পাউরুটিটা হিঁড়ে হিঁড়ে দুধে
ভিজিয়ে বড়ো তাদের যত্ন করে
খাওয়ানত লাগল। দেখলাম তার
ঘোলাটে চোখের কোথায় আবার জল
দাঁড়িয়েছে।

দুশাটা আমাকে অভিবৃত্ত করল।

বড়ো দাঁকি কুকুরকে খাওয়াতে
রোজ দুধ আনতে যায়? মূর্খদিকে প্রশ্ন
কবলাম।

মূর্খ হাসল। মাথা ঝাঁকাল।

হুঁ, কখনো কখনোব জন্য কখনো
বোজালের জন্য বড়োব যে অনেক
পুঁথি।

আহা, এদিনে এমন বড় একটা দেখা
যায় না।

[শেষাংশ ২২৬ পৃষ্ঠায়]



অনুমতিব বুদ্ধদেব গুহ জন্মো

ভূমিভা সর্পিণীর মত স্বপ্নেরী
দ্রেনটা এসে দাঁড়াল প্রতাপপড় স্টেশনে।

দশটা-এগারোটো বেলা। দরজা
খুলতেই মনে হলো রাস্ট-ফারনেসের
সামনে দাঁড়িয়ে আছি বৃষ্টি। বিস্তীর্ণ
দশ প্লাটফর্ম কেমন নিশ্চর্য্য চোখে
তাকালো। নিরুপায় হয়ে তখনকার মত
নাঁবড়েই হলো। কারণ, এরপর যাওয়ার
উপায় নেই পথে।

রানিং কারের জাল ঢাকা দরজা খুলে
ভেতরে ঢোকার কিছুক্ষণ পরেই উচ্চ
নিশ্বাস ফেলে নড়ে উঠলো দ্রেনটা।
তারপর ফোঁপাতে-ফোঁপাতে শাসাতে-
শাসাতে ছোট্ট লাগালো তার লক্ষ্যায়ালো
দিল্জানের দিকে।

বেয়ারাকে বললাম, পনের স্টেশন
কতক্ষণ?

বললে, দু' ঘন্টার কাছাকাছি।

যাবার নিয়ে বসলাম। বাইরে তাকানো
যায় না। আঁধি চলেছে অবিরাম হৈ-হৈ

করে ঘূর্ণি নাচে। বাদামী শরীরীণের
উপর নিলক্ষ্য নিসংকোচে। চোখ চাইলেই
চোখে পড়ে বাবুলাগাছ। রোদে শোড়া
মেটে ঘর; নব্বত কাঁচং ছায়ার বাঁধা চিত্তা-
শীল উট। মানে সব মিলে ট্যাঙ্গানিকা,
উগান্ডা কি উত্তরপ্রদেশ, বোকা দুশ্চর।
আর আঁধিটা অবিকল সেই তোমাদের
কুমরী-তিলাইয়ার মতো। সেই কলিটা
নেচে নেচে বারে বারে ফিরে আসছে—
“দুর্গা হাওয়ার ঘুরিয়ে দিল সুখতারাকে,
আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, ক্ষেপিয়ে
বেড়ায়—ক্ষেপিয়ে বেড়ায় বো।”

পরের স্টেশনে গিয়ে স্ব-কামরায়
উঠলাম। সহযাত্রী তিনজনের অবস্থা
বেশ ঘোরালো মনে হলো। সদাঁরজী
সামরিক বাহিনীর মেজরসদৃশ সমস্ত
ঔষাসিকতা বিসর্জন দিয়ে অনাবৃত—
তনু হয়ে রুদ্ধ-হৃদয় কামরায় ফ্যানের
পাখায় কীটং স্থান্টি ঝুঁজছিলেন। আর
দু' জনের তেমন খুব একটা ভাবান্তর লক্ষ্য

করলাম না। ভাবটা এমন, যেন ঠোট
উল্টে বলতে চান। ‘গরু মি ভো থোরী!’
ভাবটা বিচিত্র নয়। খাস লক্ষ্যায়ালার
কাছে এ ত বসন্তকাল। দেখলাম বেশ
দু' জন চুলবুল করছেন আব মাঝে মাঝে
কারদুময় বাটা খুলে পান মুখে দিচ্ছেন
এবং রপোলী কৌটো থেকে জর্দা। জাহা,
কি খুশ্বদ। যেন উর্বশীর ঠোঁটের গন্ধ।
তুমি তুলনা শুনে ঈর্ষা করো না। উর্বশীর
সঙ্গে সব পুরুষেরই কম্পলোকে বিস্তর
অন্তরঙ্গতা। তোমরা সব সুগন্ধি
শরীরীণিই কম্পলোকের উর্বশীর মিল-
কিউল।

কায়দামাফিক শৃঙ্খলোম, লক্ষ্যী-এ
গরম কেমন?

গুঁরা একটু চম্‌কালেন, তারপর মিষ্টি
হেসে বললেন, ক্যা ভাই সাব!

যেমন জর্দার গন্ধ; তেমন তাষার।
এই নইলে উদ্‌। পাকা বলিষের মুখে
পড়লে শ্রেষ্ঠতম অরসিকবুদ্ধকেও গজল

গাইয়ে তবে ছাড়বে। আবার শূধোলাম, উত্তরে একজন বললেন, কাফি গরম। 'কাফি' কথাটার অর্থটা ঠিক হৃদয়শূণ্য হলো না। তাই ঘুরিয়ে বললাম, নৈনিতালে ঠান্ডা কেমন? উত্তরে আবার বললেন, কাফি ঠান্ডা। অগত্যা নিরুপায় হয়ে কাফির অর্থ কফি করে মানেরটা সোজা করে নিলাম। অন্যজন সায় দিয়ে বললেন, তিন কমলিকা তো হোগাই।

এবার জলবৎ। মাগটা কেমন পুরো-পুরি ভারতীয়। বোলা তো? ব্যারো-মিটারের প্রয়োজন নেই। শূধু কমলি ধরে ঠান্ডা হিসাব।

হঠাৎ দেখি, সর্দারজী উঠে দাঁড়ালেন। বিশাল রোমশ শরীরে থাকী অস্তবাসটা কেমন লাজুক লাজুক দেখাচ্ছিল। মনে হলো, সর্দারজীর অসহ্য হয়েছে। খড়খড়িটা ভুলে ধরে বাইরে হাত বাড়তেই গত যুদ্ধের জাপানী ক্যাম্পে গিয়ে পড়ার মতোই আঁকে উঠলেন। হাতটা ঢোকাতেই দেখলাম; অমন কৃষ্ণ-কেশা হাতটা একেবারে বেগুনি পোড়া হয়ে গেছে।

সেকেন্ড কয়েক কি ভাবলেন সর্দারজী, তারপর সোজা টয়লেটে গিয়ে ঢুকলেন। ভেতর থেকে বৃষ্টিপাতা জলের শব্দ শুনতে পেলাম। দিব্যচক্ষে ভেসে উঠলো অমৃত-সরবৎ এক বাড়িতে কান্নার রোল উঠছে। কিন্তু হঠাৎ দরজা খুলে গেলো। সিল্ক শরীর সর্দারজী বেরিয়ে এলেন, হাতে এক-বাল্টি জল। সোজা আমার কাছে এসে বললেন, উড ইউ প্রীজ...। আর কিছু বলতে হলো না তার আগেই ভয়ে ভয়ে জায়গা ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম। যিনি ১১৪ ডিগ্রী গরমে চা-গরম জলে চান করতে পারেন, তিনি সমুদ্রা কলকাতা-ওয়ালার প্রস্থার ব্যক্তি। সরে দাঁড়াতেই, সর্দারজী ফচাং করে ঢেলে দিলেন বাল্টি ভর্তি জল আমার জানালায় খড়খড়িতে। মৃদুভাবে ভেজা কাঠ চিড়িবাড়িয়ে শূধুকিয়ে গেল আবার। আমার উপর অমন দয়া! কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থে বললাম, থ্যাংকস্।

সর্দারজী বাল্টিটা দোলাতে দোলাতে বললেন, নিডস্ নো মেনশান্।

এমনভাবে বললেন, যেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্টকে অর্ডার কচ্ছেন। মনে মনে বললাম, ভগবান, অমৃতসরের সেই বাড়ির সবাইকে হাসিমুখে রাখো আর রেশমী শালোয়্যারে আগুন-পারা-তন্দ্র ঢাকা একজনকে রাখো সর্দারজীর রোমশ দেহ ঘিরে স্বর্ণলতার মতো।

লক্ষ্মী স্টেশনে যখন গাড়ি ঢুকলো তখন বেলা আড়াইটে-তিনটে। প্রাটফর্ম অপারিচিতি। অদেখা মদ্র, না-শোনা ভাষা, অজানা মন, কত যে জন-জলের কুঞ্জো, কাজ করা মাদর। কিন্তু তাকাত টিফিন ক্যারিয়ার, ঢোলা পায়জামার নীচে জরিদার চিটি; নয় তো রেশমী শালোয়্যার কিংবা সুব্রহ্ম-পর্যায় মারাবী চোখ। এ সব

কিছুতে লক্ষ্মীকে চিনি ফেললাম এক-নিমেষে।

ওয়েটিং রুমে মালপত্রের জিম্মাদারী দিয়ে শরীরটাকে একটু সংস্কারসাধন করে, নীচে নামলাম। নতুন স্টেশনটা এমন করে তৈরি, গোলাকৃতি খিলানে খিলানে পারাবত পরিবার এমন মদ্র, হঠাৎ মনে হল পুরোনো দিনের কোনো নবাবের অম্বরমহলের উঠানে দাঁড়িয়ে আছি।

স্টেশনের সামনেই সারি সারি টাঙ্গা। এরা খানদানী কিন্তু ইদানীং সাইকেল-রিক্সার দলে ভারী। ডেমোক্রেসীয় চাপে পড়ে বিনয়দায়ী টাঙ্গারা সব গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। টাঙ্গা কিংবা একা এদের সঙ্গে তোমার বুদ্ধি-বিস্ময় মারিসিডিসের তুলনা? না; আমি তো ভাবতেই পারি না। তুমিও তো দেখেছ, মিস্ত্রীপুত্রে কিংবা বিন্যাসচলে যখন সূর্য্য চোখে টাঙ্গা-ওয়ালা ভেজী ঝড়ু ঘোড়াসমেত সুস্থ সবল টাঙ্গা এনে দাঁড় করায়। তারপর নির্জন পথের অন্ধকারে যখন মিস্ত্রীপুত্রে পথে চলতো টাঙ্গা ঝড়ুঝড়ু বাজতো ঝড়ুঝড়ুয়ে। আর শাদা ঘোড়ার পায়ের শব্দে মনে হতো, দৌড়ে না কি আমরা উড়েই চলেছি কোনো নিরুদ্দেশ ইশিত লোকের পানে কম্পমানা নীলাভ তারাদের আলোয় আলোয়। মনে হতো। তাই না? ভেজী ঘোড়া আর এই একা বা টাঙ্গা আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। আমাদের সংস্কারে, আমাদের কাব্যে, আমাদের অহংকারেও। পৃথিবীরাজ, শিবাজী কিংবা রাণাপ্রতাপকে কি আমরা তাঁদের বাহনদের থেকে পৃথক করে ভাবতে পারি? পারি না। তুমি হয়তো চোখ ঠেরে বলবে, এ তোমার অস্বকুলের প্রতি দূর্বলতা। কিন্তু এ সত্যি যে, শক্তিশালী শ্বেতাশ্ব পেলে এবং তার যোগ্য সমাদর করবার উপযুক্ত হলে আমি খুলোয় ভরাতাম লেফট্যান্ট-জেনারেল কনভার্টিবল গাড়ি।

সে কথা যাক। চাকার ঘোড়া-গাড়ি-ওয়ালাদের যেমন, তেমন লক্ষ্মীর টাঙ্গা-ওয়ালাদেরও বিশেষ নাম আছে। নাম কথাটা ম্যাকক। হয়, স্, নয়-ফু। লক্ষ্মীর টাঙ্গা-ওয়ালারা বলে না,—আন্তে কয়েন বাবু, ঘোড়ায় শূইন্যা হাসব। বা বলে তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, আপনি আমার গাড়িতে চড়েছেন তাতে আমি ধন্য। ভাড়া? ছিঃ ছিঃ, হুজুর, আপনার সেবা করে গরীব লোক আনন্দ পাচ্ছি, তার জন্যে ভাড়া কি? ও আমি জানি না। হুজুরের ইচ্ছে হলে বক্শিশ করবেন, নইলে করবেন না।

ঘোড়া দুটো পা ঠুকে চলতে শূধু করলো উল্লস পথে। এক এক করে হাসনাবাদ, আমিনাবাদ, ইমামবাড়া আর চাঁদনীচকে। দৃশ্য বিকেলে এক্সা টাংগু

চক্র মারলো। আর গাড়োয়ান-কাম-গাইড যথোপযুক্ত রং লাগলে ভুলে ধরলো সেই ভেঙ্গে-পড়া, ধরেনা ধরে ক্ষয়ে যাওয়া উপবাসী হলুদ ঘাসে ভরা দালান আর খিলান, মসজিদ আর গম্বুজগুলো মনের চোখের সামনে।

হামেসা চোখ পড়ে ভ্রূণবিশিষ্ট প্রাসাদোপমে। আর চমকে চমকে উঠি রোমাঞ্চে। অজ্ঞ থেকে একশ বছর আগে এলে হয়তো এই গহবরাকৃতি আলন্দে আলন্দে কত সুগন্ধি স্মৃতি, কত রামধনু কম্পনা। স্বচ্ছ ওড়না-ঢাকা কত এনাক্ষী আগুন-বরণী। যাদের কালো পুণীর সীমানাতে চোখের অন্তলান্তিক আকর্ষণ। তখন হয়ত হারিয়ে যেতাম, -ডুবে যেতাম, কোনো কদম্বগন্ধী কৃষ্ণকেশার সিন্ধু সান্নিধ্যে।

শামিনা শা রোড ঘুরে আবার ফিরলাম। এক-ওয়ালা বললে, আপনাকে খাস গোলাপ বাস সরবৎ খাওয়ারো। যে দোকানটায় নাবল্য সেটিকে একনজরে খুব অভিজাত বলে মনে হলো না। কিন্তু যখন ভেতরে গিয়ে বললাম দেওয়ালে হেলান দিয়ে, মনে হলো কোনো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সম্মেলনে গেছি। পনেরো থেকে পঁচিশ বছর যৌবনের সুন্দর ফুলে টেঁকলগুলো ভর্তি। গিলে-করা আন্দের কাজ-করা পাজারবী আর ঢোলা পায়জামা তার উপর পান-খাওয়া লাল চৌটে এমন বলন্তবাহার নক্সতো রামকোলি গুন-গুন, মনে হলো অমৃতসুধা করেছি পান।

তারপর সরবৎ যখন রূপালী মিনে-করা গেলাসে নামিয়ে রেখে গেল, তখন একনজরে চেরেই ভাল লাগলো। অথবা তাঁর রক্তের বাহুল্য নেই; দেখে ভাবলাম আমার গৌরীপুত্রী বৌদির আনপোড়া সরবৎ নয়তো? এক চমক দিয়ে বসিক লাগতে লাগলো নিজেকে। আর অমন গুন-গুন গাম্ভীর্যে চমক চমক সরবৎ। টাঙ্গাওয়ালায় কাছে অনেক ঋণ হয়ে রইলো। স্টেশন অবধি সারা রাস্তা আমার নিজের ঠোঁটের গন্ধে পাগল হয়েছিলাম। কম্ভুর্নামগ যেন নিজের গন্ধে পাগল হয়ে ওঠে; আমিও তাই।

কাঠগোদামের গাড়ি ছাড়বে রাত দশটা নাগাদ। হয়তো চাঁদনীচকের সামান্য প্রসাধনটা স্বচ্ছন্দে দেখে আসতে পারতাম। কিন্তু ওয়েটিং রুমের বেয়ারার হিতোপন দেশনন্দনারে সাহস পেলাম না। আসবার আগে বলেছিল, হুজুর চাঁদনীচকে জ্ঞাড়া বেড় মং কিজিয়ে।

শূধিরেছিলাম, কেন? তোমার কাঠগোদামওয়ালা গাড়ি তো ছাড়বে রাত দশটায়।

গোলাম কুর্নিশ করে বলেছিল, গাড়ি খুলেগী দশ বাজে লেবিন সাত বাজেনেকো পইলে পইলোই ই পিলাটফর্ম খুদই চাঁদনীচক বন জাউগী।

অগত্যা গাড়ি প্রাচ্যক্ষে লাগতেই
দ্বাবধেমত জায়গা করে নিলাম। কিন্তু
তখন কি শ্যাম্পির সেই ছড়াটা মনে-
ছিল—আগে গেলে বাধে শ্যাম, পরে
গেলে সোনা পায়? সত্যি সত্যি সাতটা
বাজতে-না-বাজতে প্রাচ্যক্ষে যেন রথের
মেলা। তবে এ মেলার অস্বুত কলতান
মিটি গজলের সুরে বাঁধা।

রাতের ষাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে
গাড়িতে বসলাম জ্ঞানালার পাশে। আমার
খাওয়া কৈলাশ কামরায় ভীড় ক্রমে সহ্য
থেকে অসহ্য হতে লাগল। গাড়ি ছাড়বার
দেরী নেই বেশ, এমন সময় কানে এলো,
ও নলিনী হ্যাঁ হ্যাঁ ওঠ মা এটাতেই
ওঠ।

তারপরই কিছু বোঝবার আগেই
সৌদরবনের ঝোড়ো হাওয়ার মতো কাবা
যেন ঢুকে পড়লেন। সর্বাগ্রে একজন
চাঁদ্রশোৰ্ণ মহিলা। ঢুকেই বললেন, ই
বিস্তারা সিটের উপরে কাহে? আশ্ব
সরাও নয়তো ফেল্ দেগা।

সে ভদ্রলোকের হোল্ডলটা অস্থায়ী-
ভাবে কুস্থানে শোভা পাচ্ছিল তিনি হিন্দী
শব্দে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে
রইলেন। তারপর রাষ্ট্রভাষার এরকম
দূর্ধৰ্ষ জনপ্রিয়তা দেখে রীতিমত প্ৰলম্বিত
হয়ে তড়িৎ-তড়িৎ সরিয়ে ফেললেন। ভদ্র-
মহিলার পেছন পেছন ত্রিকন্যা আর তার
পেছনে গোবেচারী অধঃপা। এমন জ্বলন্ত
দৃষ্টিতে ভদ্রমহিলা তাকালেন, মনে হলো
মালাপত্রের মধ্যে এই মালাটিই তাঁকে সব-
চেয়ে জ্বালাচ্ছে।

অনেক মেয়ের হাতে থাকে তাঁদের
স্বামী নাকি তাঁদের কাছে “দি রায়স্ব”
হয়ে থাকবেন। দি রায়স্ব-এর কনসেন্সানটা
আমো পরিষ্কার ছিল না। এই এখন
একেবারে কংক্রীট এক্সাপল দেখলাম।
ভদ্রমহিলা আধেক গায়ের জোরে আধেক
রাষ্ট্রভাষা হত্যা করে নিমেষে নিজের
জায়গা করে নিলেন। শঙ্কোওয়ালা
সাধারণত বিনয়ী এবং নির্বিরোধী। কিন্তু
আমি হলপ্ করে বলতে পারি তাদের
স্বচ্ছ পাজাবীর ফাঁকে ফাঁকে পরিষ্কার
দেখলাম তাদের কল্জের রাগোমিটারের
পারারটা দপ্‌দপাচ্ছে। ভাগ্যে জেনানা
নইলে সেদিন রক্তপাত ঘটে যেত।

সঙ্গেব অশ্লীলপ্রিত জীবটিকে দেখলাম,
সবাই বেশ অনুকম্পার চোখেই দেখছেন।
তাকে কেউ গালাগালি কিংবা অন্য কিছু
দিবেও তাঁর লাঞ্ছিত পুরুষকে বিদ্‌মাত্র
সম্মান দেখালেন না।

অফিস-ফেরত প্রামগুণের গভীপ্রয়ীরা
যেমন পার্ক স্ট্রীটের মোড় নাগাদ এসে
ক্লিকাক্লিকর পুর বেশ স্বস্থানে এটে যান,
আমাদের কামরাগিহরও এখন তেমন।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে আধঘন্টা প্রায়।
ভদ্রমহিলা বললেন, কোথেকে আসছ
স্বাভা?



গর্ভ, সেই সুন্দরী প্রেমী কেমন করুণ নয়নে

ঐতিবৃত্ত বললাম। আধেক ভয়ে আর
আধেক বিদেশে বাঙালী প্রীতিতে গহি-
গুই না করে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে
দিলাম।

মহিলা তারপর বাটা খুলে বললেন,
পান বাও।

হাই বলো বেশ সপ্রতিভা মহিলা
কিন্তু। এদিকে খান্ডার টু দি পাওয়ার
এন্ ওদিকে বিনতা বগললনা। ত্রিকন্যার
সঙ্গে পরিচয় হলো। একজন তোমার
চেয়ে ঢের সুন্দরী। আমার কি একটা
ছোট স্টেশন থেকে শাণ্ডিয়া লাঙ্গু কিনে
খাওয়ালেন। ওরা চলছেন রাণীক্ষেত।

হাত বাড়ল। গাড়ির নিচু-নিচু আলো
আর জ্ঞানালার দিবে আসা কলক্ কলক্
ঠান্ডা হাওয়ার কেমন আসেজ লাগে।
আর আবেশ লাগে পায়ে পা ছুঁইয়ে বসে
থাকতে। কানের সঙ্গে জান? সুন্দরী
বুঝতী ত্রিকন্যার ভালোই লাগছিল
কসে থাকতে। কিন্তু বরবার তোমার

কথা মনে হাচ্ছিল। এখন সাড়ে এগারোটা
বাজে। তুমি হয়তো ঘুমের মাঝে এমন
সাংঘাতিক স্বপ্ন দেখে আঁধা আঁধা
উঠছো। তারপর শাণ্ডিয়া লাঙ্গুর ঝণও
তো শোধনীয়। অতএব বললাম, আপনা-
দের খুব অসুবিধে হচ্ছে, এত অল্প
জায়গায়, আমি বরষ পেছনে গিয়ে দরজার
পাশে বসি হোল্ডলের উপর। বিশেষ
আপত্তি উঠলো না ও তরফ থেকে। শব্দ
সেই সুন্দরী-প্রেমী কেমন করুণ নয়নে
তাকালেন যেন ধূমিয়ে থাকা তোমার
মনে খোঁচা দেবার জন্যেই।

হোল্ডলে বসে জ্ঞানালার মাথা রেখেই
কখন জানি না নিজের অজান্তে নিচু-
নিচু আলোর কামরার ধিক-ধিক রাত
শেষ হয়ে এলো। কি একটা ছোট স্টেশন
গাড়ি দাঁড়ালো। তাঁড়ের চা কিনলাম।
তুমি থাকলে হয়তো মৃদু আপত্তি করতে,
বলতে, কি দরকার কেশনার কি কলভদাঁস
কি অন্য ক্যাটারার, কিছ, কি?

কিছুই নেই। আর ভাড়ের চায়ের মতো হালসত তরলিমা আর ঠিক থাকতে পারে। মাটির ভাড়ের সোদা সোদা গন্ধ, মাথো-মাথো রাত-শেবের চোখে দুটোকে টোলগ্রাফের তারে কিংবা নিতান্ত অবহেলিত কিন্তু অত্যন্ত স্বতন্ত্র একটা লাইন-ঘেঁষা বাবুলা ফোপের উপর বিছিয়ে মৃদু মৃদু চুমুক। ইচ্ছে করলে লেজ-নাচানো ফিফেটার ভাষা অনুধাবন করবার চেষ্টাও চলতে পারে।

পথের ধারে এখন কেমন নুড়িময় ছবি। শূন্যে যাওয়া, গত-যৌবনা পাহাড়ী নদী, শূন্য শূন্য নুড়ির হাড়ে প্রথম সকালের রোদ পোয়াচ্ছে। দুটো একটা অশোক, শিশু, শালও হয়তো বা মাঝে মাঝে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে আসামের গোয়ালপাড়ার আলোকঝারি। এখানে-সেখানে লম্বা-গলা মসৃণাঙ্গী সারসী, নয়তো বাঙ্গালোরী শাড়ির মতো ময়ূর-ময়ূরী। আমরা যখন কাঠগোদামের আরো কাছাকাছি তখন মাঝে মাঝে একটু কচ-জল আর বেশিই নুড়ি আর গাছ।

কাঠগোদামে যখন ঢুকলো গাড়ি তখন বেশী আটটা হবে। সারি সারি বাস দাঁড়িয়ে স্টেশনের বাইরে। রাষ্ট্রীয় পরিবহন এবং বেসরকারী সংস্থার অফিস মুখোমুখি।

আলমোড়ার ভাড়া বেশ চমকে দেবার মত। কলকাতার পাঁচ সাত পয়সা কি বড় জোর চোন্দ পয়সা থেকে এক লাফে আট টাকায়। টিকিট নিলাম ফাস্ট ক্লাশেরই, নিরানন্দই মাইল পাহাড়ী পথ। আর এ ত' বসিষ্ট-ভেজা শিলং পাহাড় কিংবা কুয়াশাসিক্ত দার্জিলিং নয়? এ রুক্ষ দর্ম; এবং প্রধানত ছায়াহীন।

বাস স্ট্যান্ডে সহযাত্রী ভদ্রলোক হলেন, আমাদেরও প্রাণে আছে আলমোড়া অবধি চুঁ মারা, দেখি কি হয়। ভদ্র-মহিলার সিঁদুরহীন কপালের শূন্যতাটা আমাদের বেশ কৌতূহলী করে তুললো।

বাস ছাড়ার দেরি আছে কিছু। এখানে চিত্ত-শান্তকর কোনো রেস্টোরাঁ বা এরকম কিছু চোখে পড়লো না। দেখলাম এব বঙ্গালী নবদম্পতী কিংবা প্রতিশ্রুত-যুগল বৃকে স্টাইলে স্টেশনের চান্টলেই ব্রেকফাস্ট সারছেন। গতান্বিত না দেখে আমিও গিয়ে যোগ দিলাম। ব্রেকফাস্টের মেনু না হয় নাই শুনলে।

ভদ্রমহিলা কার্ণ করা চলে সেনেহে আগলে ছইয়ে বললেন, আপনি বন্ধি... নৈনিভাল...?

বললাম, না, আপাততঃ আলমোড়া। পরে নেমে আসবার ইচ্ছে আছে।

বোধ হয় সাইকো-এনালিস্টের মতো ভদ্রলোক মিচকি হেসে বললেন, ভবিষ্য-অধীর্ণাঙ্গী।

দেখলাম ভবিষ্য কথাটা নেহাই নড়বড়ে। এক কপেতে এলে, এক সীটেতে

বাসে যাবে, এক ঘরেতে হোটলে শোবে তবুও ভবিষ্য কেন? না কি পুরুতস্য ফরম্যালিটির প্রয়োজন? যাক এ শূন্যবার নয়, তাই বললাম, কনগ্রাটস।

ভদ্রমহিলা কিউটেস করা আঙুলে এবার মৃদুস্তর মালাটার শূন্যতাকে কলঙ্কিত করে লিপস্টিক-টোটে এমন একটা গোপন হাসি হাসলেন যার সমীকরণ কবলে দাঁড়ায় "আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি।"

ভদ্রলোকের নাম পিনাকি রায়। এয়ার-ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের পাইলট। কিন্তু আমাদের আলাপ আর বেশি এগুনোর আগেই চাপা পায়জামা পরা টুপি-মাথায় হ্যান্ডম্যান এসে বললে, বাস আন্ডি ছোডেগী সাব।

অতএব বিচ্ছেদ। ঠুন্দের বাস-এর দেরি আছে। কথা হলো, নৈনিতালে কিংবা আলমোড়াতে দেখা হলেও হতে পারে।

শ্রীরায় বললেন, আচ্ছা। আবাব দেখা হবে, বলে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। ভবিষ্য-শ্রীমতী একটা অহেতুক এবং ষিয়েটারী হাসি হেসে হাতের আডাই-থানা আঙুল নেড়ে বললেন, উইশ য়ু এ প্রজেক্ট জার্নি।

হায় রে। এই এঁদের সঙ্গে তোমাদের যেন কোথায় অমিল। তোমাদের অবিন্যস্তকেশা হাসনুহানা-হাসির সহজিয়া অনুপ্রেরণার সিন্ধু আনন্দ এঁদের কাছে আশা করা যায় না। এঁরা এক উন্মত্ত কম্পরাজ্যের নাগরিক।

হ্যান্ডম্যান হ্যান্ডেল মারল। বাস আবার মাসের মেঘের মতো গড়গড়িয়ে উঠলো। ফাস্টো কেলাশের প্যাসেঞ্জার। দেখলাম, আমি এবং আর একজন কুমার, রেঞ্জমেন্টের ক্যাপ্টেন। ঘাড় ফিঁরিয়ে দেখলাম, পেছনের যাত্রীদের মধ্যে বেশির ভাগই অলিভারি পোশাকে কুমার, রেঞ্জমেন্টের নায়ক আর হাবিগদার ছুটি কাটাতে চলেছে দেশে। মুখে শাদা সরল খুশির কিকিমিকি। আর যারা আছেন, তারা ট্র্যাডিশনাল কুমার্দি বোশে, খাস কুমার্দি।

শিলিগুড়ি কিংবা গোহাটি থেকে বাস ছাড়ার পর অনেকক্ষণ সমতলের উপর দিয়ে ছুটেতে হয়। এই হিমালয়, এই পাহাড়, এই উঠর, করতে করতে। কিন্তু এখানে দেখলাম বাসটা কিছুক্ষণ চললই বাকি বাকি ছড়ানো হিমালয়ের সবুজ ঘাঘরার গায়ে ছোট লাল শোকার মতো ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তরাই-এব জগন্দের সুগন্ধি আব-হাওয়ায় গাড়িটা গুন্গুন্ করে। বাণী সৌম্যছবি মত নিজের আনন্দে নিজে পাগল হয়ে উঠলো।

ভাইনে বায়ে তাকাছি; তিস্তুফ যেমন

ভাতের দিকে চায়। অনেকদিন মাস্ত না পাওয়া মনটা আর মনের দুর্ভাগ্য এত চোখ দুটো আনন্দে নেচে উঠে। বুনো চাঁপার গন্ধের মতো একটা কিসের পাগল করা গন্ধ।

ঘন্টাখানেক চলে ধামলে; গাড়ি একটা ঝগার পাশে। ঝগটার উপর মানসিক অত্যাচার করে তাকে সিমেন্ট দিবে খাঁধা হয়েছে।

হ্যান্ডম্যান নেমে ক্যান্সটারা করে জল ঢালতে লাগলো রেডিওটোবে। সেই ঝগার পাশে ঠান্ডা ঝরঝরে হাওয়ায় আব অল্প অল্প রোদের চিন্তে কাপতে থাকা ছাওয়ায় নানা রকমের ফল নিয়ে বসেছে ছেলে-মেয়েরা। রান, পীচ, আপেল, আড়, খোবানি আরো কত কি? নাম জানি কি সবার? প্রামেদের ঊটবুদর রক্তমা দেখে প্রথমে যতটা প্রেম জন্মেছিল এক চুমু দিয়ে দাঁত টেকে যাওয়াতে ততটা রইল না। তবু গোটাকত পকেটস্থ করে রাখলাম। বমি পেলে উপকাবে দেবে। হাজারো পাখী নানান সুরে এ জায়গাটিতে ভিড় করেছে। ওদেব চিকন গলার চেচামেচিতে মনে হচ্ছে একদল তন্তবগী এই সোনালী সকালের ভৈরবী সুরে কোমল 'রে'-টা ঠিক লাগছে কি লাগছে না এই নিয়ে নানা অভিমত প্রকাশ করেছে।

কিন্তু ওদের চঞ্চলতার মাতলে আমাদের চলবে না। নামনে পড়ে আছে অনেক পথ—সর্পিণ, আতপ্ত ক্ষীণ ছারা পশ্চিমী হিমালয়ের বৃকে। তাই এঞ্জিনটা আবার গুঞ্জরণ কবে উঠলো। লাল পোকাটা আবার ঘুরঘুর করতে লাগল একে-বোঁকে সবুজ ঘাঘরার উচু-নীচু ভাঁজে।

চলন্ত গাড়িটার গতিবেগ নিজের মনের মধ্যে যে একটা গতির সঞ্চার করেছিলো সেটা আরো বৃদ্ধি পেলে ক্যাপ্টেন পুরান সিং-এর শিকারের গল্পের উত্তেজনায়। তিনি এবং তাঁর ছোটভাই কি করে ভাওয়ালীর জঙ্গলে একটা দশ-হাতী কেঁদো বাঘ মেরেছিলেন তার গল্প এবং পাহাড়ী খুরালের পশ্চাৎধাবন করতে গিয়ে তাঁর পা ভাঙার গল্প। আমিও পুরোনো তেঁতুলের আচারের মত খাঁটি অকৃত্রিম সুন্দরবনের গল্প করলাম, তারপর ময়ূরভঞ্জে বাইসন মারার। ক্যাপ্টেন সাহেব খুব উৎসাহী মনে হলো এ বিষয়ে। বললেন, ছোটবেলায় বাবার কাছে গল্প শুনতেন, কুমার্দিতে মানুষ-থেকোর অত্যাচার যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিলো, তখন সরকার থেকে সমস্ত সৈন্যদের স-রাইফেল ছুটি দেওয়া হতো। তখনো জিম কববেট সাহেব মানুষ-থেকো বাঘেদেব। ঠান্ডা করার ভার নেন নি। অতীতে শোনা গল্পে বেশ চড়া সুর লাগিয়ে করবেট সাহেবের কীর্তিকলাপ বলতে লাগলেন। কিছু কিছু তাঁর বই

হাট থেকে আমারও পড়া ছিল। তবুও ভাবতে ভাবি ভাল লাগলো, আজ থেকে অনেক বছর আগে সেই 'দুঃসাহসী' শিকারিকে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত মানুষ-থেকে বাঘ কিংবা চিতার পিছু পিছু। ভাবতে ভাল লাগলো ক্ষুধাতামাখা কুমায়বাসীদের চোখ-গুলো, এই এতদিন পরেও। পৌরুষময় মানবতার জন্যে করবেট সাহেব এদের মনোরঞ্জে চিরস্থায়ী হয়ে আছেন।

হাবে-ভাবে বুকলাম বাঘ মারার জন্যে রাইফেল সমেত সৈন্যদের দেশে পাঠানোর ফল আর কিছু হোক না হোক, তার ফলে জঙ্গলের তাবৎ হরিণ সম্প্রদায় বেশ বিধ্বস্ত হয়েছিলো। তদুপরি এই সুযোগে জঙ্গল জোয়ানের ভাই-বোরাবর সবারই রাইফেল হাতেখড়ি হয়ে গেলো।

দু' গায়ে এসে বাস দাঁড়ালো কিছুক্ষণ। তাবপর আবার চলা শুরু। হঠাৎ পেছন থেকে একটা বেটোফোনিক কল-তান কানে এলো। চমকে পিছনে চাইতেই দেখলাম নাথেক আর হাবিলদার সাহেবরা সবাই সম্মুখাসে কালো কালো বাঁশের বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছেন। মানে, ফুঁজাচ্ছেন। তাদের পা-গুলি 'মধ্যবর্তী' বেগের উপর উচ্চাসনে শোভা পাচ্ছে। বাঁশিসমূহ থেকে যে শব্দ বোঝাচ্ছে তাকে 'ডিসেম্বর মাসে দার্জিলিং-এ চান করে বেরুনোর পর গলার বহুদুখী স্ববের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তবে সমগ্র ঐক্যতানিক রেশের মধ্যে বেশ একটা কমনীয়তা আছে। যদিও সে বেশ ছন্দ গয়ের বিচাবে শূন্য পাবারও অযোগ্য। বৈশ্বময়ী স্বাধীন-সুবে বেজে চলেছে বহু বাঁশ আর তাদের সেই বিচিত্র ধ্বনি শির শির করে তব্বী পাইন-দের গা কাঁপিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে খাদে, ম্যাগনোলিয়া স্যামিডিকোরার বনের দিকে।

পুত্রান সিং আমার মন বুঝে বললেন, আপাততঃ সূরে একটু মাথাতিরিষ্ঠ স্বাধীনতা এবং বৈষম্য থাকলেও আল-মোড়ায় এমন ক'জন বাঁশিওয়ালা আছেন, যাঁদের বাঁশি শুনলে মনে হবে আপাঁনি নিজেই বাঁশির সূরে কাঁপতে কাঁপতে মিশিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে আর পাহাড়ী ফুলের মনে মনে।

পরে সত্যিই দেখেছিলাম যে, বাঁশের বাঁশি এ অঞ্চলে সবার নিত্য সঙ্গী। সূর অসূরের কোনো বর্ষাবর্ষি নিয়ম নেই। কিন্তু মনের সরল ভাব-সে আনন্দেরই হোক আব দুঃখেরই হোক, এ বৃক্ষ পাহাড়ের দুর্দশতার মাঝে কেমন সহজীয়া রেশ আনত। সত্যিই মনে হতো হরতো দড়াড়ি দিয়ে কষে-বাঁধা মনটাকে ছেড়ে দিলে ঐ বাঁশির সূরে কাঁপতে কাঁপতে পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে হারিয়ে যাবে চিড়বনে, নয়তো ম্যাগনোলিয়াদের তীর মধুগন্ধে।

দেখতে দেখতে আমরা ভাওয়ালী ছাড়িয়ে এলাম। এখানের টি-বি স্যানা-টোরিয়াম অনেকবই জানা। বেলা যখন ১টা প্রায়, সূর্যটা যখন একশ' দু'-শ' সূর্য হয়ে আদিগন্ত বিরলবনা পাহাড়ে পাহাড়ে জ্বলছিল আব আমাদের জ্বলছিল, তখন লাল বাসটা এসে দাঁড়াল ধরম্পানিতে। সে জায়গাটাতে রাস্তার দু'পাশে খাড়া হয়ে উঠে গেছে পাহাড় অনেকখানি; সোজা চাইলে ঘাড়ে ব্যথা ধরে। আর লক্ষ্যের বিষয় হচ্ছে যে, এ অঞ্চলটা ন্যাড়া নয়, বেশ শ্যামল, নানান গাছ-গাছালিতে।

সে কথা থাক। তুমি হয়তো ভাবছো, বাসে চড়েছি সকাল আটটায় এতখানি পথ—হাওয়া-দাওয়া? সেই কথাই তো বর্ণিছি। ধরম্পানিতে বোধ হয় পৃথিবীর সবচাইতে সস্তা অথচ আশ্চর্য রকম রসনা-ভীষ্টকর খাদ্য মেলে। অত্যন্ত হীপ্ত করে খেয়েও সাড়ে ন' আনার বেশি বিল তুলতে পারলাম না।

শিলং যাবার পথে যেমন নংপো রানীক্ষেত, আলমোড়ার পথেও তেমন ধরম্পানি। মিড স্টেশান। যাত্রীদের হাওয়া-দাওয়ার জন্যে এখানে সব বাসই থামে। যে দোকানটায় গিয়ে বসলাম, তার পার্শ্ববর্তী একজন পনেরো বছরের ছেলে। টকটকে কামরাঙার মতো রঙে গায়ের সুমুগি কালো জামাটা কেমন বেথাপ্পা। দোকানের মাঝখানে একটা চিতাবাঘের ডাঁমি। চামড়াটা এ অঞ্চলে ট্যান করা, তাই আমাদের ডার্টবিন-বেশা কোল-কাতাওয়ালা কুত্তার মতো গায়ের লোম-গুলো হাওয়ার সওয়ার হয়ে উড়ে চলেছে এক এক করে। আর শরীর আন্দাজে অতিবিস্তৃত বড় কাঁচের চোখদুটো কেমন ড্যাবড্যাব্ কবে চেয়ে আছে। মাঝখানে একটা নড়বড়ে টেবিল। গোটাকর চেয়ার। দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার, তাতে বোম্বের চিত্রাভিনেত্রীর 'আয়না দৌখি' গোছের একটা ছবি। ছোকরা খাঁটি ঘিয়ে গরম গরম ফুলকা ভেজে দিলে। তার সঙ্গে একটা সস্কী আব রইতা। এমন রইতা তো আমাদের ওয়ালডফ' কি ফিবপোতে মাখা বড়লেও পাবে না। এরকম প্রাচীন প্রথায় দই পচাতে কেউ পাববে না। সেই দই ভাব সঙ্গে ডাল আর মশলা। ককটেল করলে হরিদ্রাবর্ণ যে তরলিমার সৃষ্টি হলো তার সঙ্গে কিছু তুলনা চলে না। সত্যি, খেতে কিন্তু বেশ। বিশেষ করে অনেক মাইল পাহাড়ী পথ পেরিয়ে আসার পর প্রথমবার রইতা খেতে একটু আশ্চর্যরকম ভালো লাগে। সবশেষে পাতে পড়লো চাটনি। এ আমাদের বাংলাদেশের তেল-সমৃদ্ধ ভাসমান অম্লখন্ড নয়, শুকনো খড়খড়ে, ঝাল-ঝাল, 'মিস্টি-মিস্টি'—সে এক অনির্বচনীয় জিনিস। আমার চিঠির উপর লাল ফেলে না তা বলে।

গাড়ীটা আবার যখন ছাড়লো, তখন

একটা পান মুখে দিয়ে পায়ে উপর পা তুলে বসে জানালার হাতটা, আব নীচের উপর মাথাটা বেখে বেশ আবাম। এবার পথে কোথাও জঙ্গলী আপেলের ধোপ, নয়তো আর কিছু। মাঝে মাঝে নীচে খাড়া খাদে কোশী নদী বুপোলী কটাফ হেনে পালিয়ে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন সিং জানালেন এ নদী নাকি সারা পথ এমনি দনে দকে মাঝবে আমাদের, এমন কি আলমোড়া গিয়েও শান্তি নেই। সেখানেও কেশী সুন্দরী তাব বুপোলী তনুর তনিমায় জড়িয়ে রেখেছে শহবটাকে।

দুর্দিকে পাহাড়ের গায়ে কিছু কিছু জায়গায় খাঁজ কেটে চাষাবাদ করা হয়েছে। খয়েরী কিংবা কালো পাহাড়ে সবুজ কিংবা হলদে বুটির মতো গম কিংবা অন্য কিছু দুপূর্বের একলা হাওয়ার দুলছে।

রাস্তাটা এখন বেশ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। ডানদিকে, বাঁদিকে সবদিকে মাথাঘোরা খাদ, নয়তো ঘাড়-বাঁধা পাহাড়। আর বাঁকগুলো যেন পর্বত-করেই সেকেন্ডে সেকেন্ডে হাজির হয়ে বমি বমি ভাবের সঞ্চার করছে। পর্বতের প্লাম সুন্দরীদের শরণাগত হানা। ডাইনে-বাঁয়ে খাদগুলো সত্যি বড় ভীষণ। চেরাপঞ্জীর পথেও তো সেই বিখ্যাত খাদ দেখছি, কিংবা সিকিমের পথে, কিন্তু সেখানে বেশি জায়গাতেই সবুজ গাছ-পালার আশ্রয় এবং রিমকিম কুশা-ভেজা বলে এমন বুকের মধ্যেটা শূন্য হয়ে ওঠে না।

এখানের খাদগুলো যেন কী। এদের দিকে তাকালে মনে হয় নিজেই বুকের কেন রুদ্ধ নৈরাশ্যের গহবরে তলবীছি। আমাদের জাইভার সাহাব কিন্তু বিন্দুল বহাল তবিয়ে। তার বড় ভাইয়ের শ্রীক নিয়ে তার শালা হাওয়া হয়েছে—কোই গল্প এবং খান্দানী কুমারনী ভারত শালাবাবুকে শাপান্ত কবে চলেছে হ্যাণ্ড-ম্যানের সঙ্গে। এদিকে প্রতি বকি আমাদের যে প্রাণান্ত, সে খবরটা তার শিভালিয়ারাস কলজায় মোটেই পৌঁছতে না।

একটা বাঁক ঘুরতেই হঠাৎ চোখে পড়লো। সামনের পাহাড়টাতে চিড়বন। কেমন সুগন্ধি ঠান্ডা হাওয়া আনছে একটা শুদিক থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি চুকলো সেই চিড়বনে। কিছু সবুজ আব কিছু খয়েরী চিড়বা শীতের মধ্যাহ্ন বেলায় হাওয়ার কাঁকই দিয়ে দীর্ঘ চুনের গোছ আচড়াচ্ছে। তাদের পায়ে নীচে গোছা গোছা রাশি রাশি পড়ে আছে শুকনো স্বয়েরী পাতার দল।

আমরা বেশ উপরে উঠছি মনে হলো। পুত্রান সিং বললেন, বানীক্ষেতের কাছাকাছি এসেছে গাড়ি। রানীক্ষেত এ

অণুলে সবচেয়ে উচু। রানীক্ষেত থেকে চালু পথে আলমোড়া।

রানীক্ষেত আসলে ফৌজী জায়গা। ক্যান্টনমেন্টেব জনৈক এ জায়গার উন্নতি। কিছুই চোখে পড়লো না। বাসটা যেখানে দাঁড়ালো, সেখানটাতে বাজার। দু'ধারে সারি দেওয়া দোকান। ফলের, কাপড়ের, বাসনপত্রের আরো কত কিসের। এক-তলাতে দোকান; দোতলাতে হোটেল। এক কথায় হোটেল এবং বাজারপাড়া বলা চলতে পারে।

বাসে তেল নেওয়া হলো। তারপর আবার চললো গাড়ি। তারপর ধীরে গড়াতে গড়াতে নাকতে লাগলো উচু থেকে। সারা পথটা চিড়ের ছায়ায় সন্নিবিড়। ইচ্ছে হয় বাস থেকে নেমে কোনো গাছের গুঁড়িতে পিঠ লাগিয়ে বই নিয়ে বসে যাই পা-ছাড়িয়ে। মাইল কয়েক যাবার পর চিড়বনেরা বিদায় নিলো। তারপর আবার রুদ্ধতা। অবশ্য এখন মাঝে মাঝেই চিড়দের দেখা যেতে লাগলো এখানে-ওখানে জট-পাকানো অবস্থায়। কিন্তু বিস্মৃত জায়গা জুড়ে নয়। আরো কিছুদূর যাবার পর আবার উঠতে লাগলো গাড়ি। পথে ধামতে হলো চুঙ্গীতে। টোল দিতে হবে। রানী-ক্ষেতের আগেও আছে দেখেছি। শহরে তোকবার আগে মাথাপিছু কিছু ধরে দিতে হবে শহরবিশেষে, তবেই ঢুকবার ছাড়পত্র মিলবে। মরশুমী আগলুকদের কাছ থেকে উত্তরপ্রদেশের এই শহরগুলোর অবিস্বাস্য রকমের একটা মোটা আর হয়। শহব থেকে বাইরে যাবার বেলাতেও লাগে টোল।

চুঙ্গী পেরোনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর থেকে চোখে পড়লো। সামনে ইতস্ততঃ ছড়ানো নানান খাঁচের নানান রঙের বাড়ি পাহাড়ের গায়ে গায়ে। আলমোড়া শহরটাকে আর যাই বলি প্ল্যামারাস বলবো না। দার্জিলিং কিংবা শিলং-এর মতো এর চটক নেই। আর কতটুকুই বা শহব।

গাড়ির সেই দু'বার গতি এখন মৃদু। বসতির মধ্যে দিয়ে চলেছে ধীর গতিতে। যেখানে এসে থামলো বাসটা, সেইটাই স্টেশন। রেলের নয়, বাসের। নানা যাত্রীর ভিড়। অনেকগুলো বাস দাঁড়ালো। একটা অনেকদিনের পুরোনো বাংলা মতো কাঠের বাড়ি, সেইটেই বুকিং-অফিস-কাম-ওয়েটিং রুম। বাস স্টেশনে পৌঁছবার আগেই পুরুর হোটেলওয়ালা কিংবা বদিনাথধামের পাণ্ডাদের মতো ডুটো-স্বালোরা ছেকে ফেললে বাসটা। দম বন্ধ হবার উপক্রম। এরাই এখানকার কুলী। বেস্টেখাটো চেহারা। গায়ের রং অতি-ঘবে লাল টুকটুকে ছিলো এখন কালি পড়ে পড়ে বামনাঙ্গির কড়াইয়ের মতো অবস্থা হয়েছে। পরনে শর্টস্লিঙ্গ দর্শন

পোশাক। হয় হাফ-প্যান্ট, নয়তো সেই চাপা চুরিদার পায়জামা। গায়ে ওদেশী কুর্তা। বিপ্লবফলের মতো হলুদ দাঁতে নরলতা হাঙ্গ। মাথা থেকে একটা পাকানো দড়ির রিং ঝুলছে। ব্যবস্থাটা দার্জিলিং-এর সমগোত্রীয়দের চেয়ে কিছুটা অভিনব। হাবে-ভাবে মনে হয়, তারা ভাবং গন্ধমাদন পর্বতটাই বয়ে নিয়ে যাবার তাগৎ রাখে।

আমার চামড়ার সন্টকেশটা আর হোল্ডলটা যে মাথায় তুললো তাকে বললাম ভাল হোটলে চলো। এ ছাড়া বলবার কিছু ছিলো না। নিতান্ত অপরিচিত জায়গায় এ ছাড়া কী-ই বা বলতে পারতাম। বড় রাস্তার নাম ম্যাল রোড, যেমন সব পাহাড়ী শহরের প্রধান রাস্তারই হয়ে থাকে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর নাম বদলে গান্ধীমার্গ করা হয়েছে। নতুন নামটা অবশ্য গোচরিত দোকানের সাইনবোর্ডেই সীমিত আছে। চলতি আছে সেই পুরোনো নামটাই। সে রাস্তায় কিছুটা চড়াই ভাঙ্গার পরই ডুটোয়াল থেমে দাঁড়াল।

ডাইনে চেয়ে দেখলাম ডাকবাংলোর পথ নেমে গেছে। দেখাও যাচ্ছে ডাক-বাংলো। আর রাস্তার উপরেই ডাক-বাংলোতে যাবার পথের পাশেই কাঠের বারান্দা এবং টিনের ছাদওয়ালা একটি বাংলো ছাঁদের বাড়ি। ম্যাজেস্টা-রঙা বোগনভোলিয়া লতায় ছেয়ে গেছে বাইরের বারান্দাটা একেবারে। উপরে একটা ছোট সাইনবোর্ড হোটেলের নামটা নিয়ে ফুল-গুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। এক-নজরে হোটেলটাকে আহা মরি গোছের কিছু মনে না হলেও আমার মতো লোকের পক্ষে নিতান্ত অভদ্র মনে হলো না। তার উপর শরীরের ক্লান্তি এ তিন দিনে বেশ কাবু করে ফেলেছে। এখন যা হোক একটা আশ্রয়স্থল চাই অস্তিত্বে।

সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ। অদেখা লোকজন, অজানা পরিবেশ, অননুভূত আবহাওয়া। এই হোটলেই উঠবো কিনা ভাবছি এমন সময় কানের কাছে কে বেন বলে উঠলেন—“বাংলায় বসেই মনে হচ্ছে। তা ধর্মিত-পাঞ্জাবীর এমন হাল করলেন কি কবে মশায়? রাগুবী-ফাগুবী খেলেন না কি?”

চমকে চোখ চাইতেই দেখি হোটেলের ঠিক উল্টোদিক দিয়ে যে রাস্তাটাটা উঠে গেছে উপরে, সে রাস্তায় এক ভদ্রলোক পরগে ছাইরঙা গ্যাবার্ডিন আর আশমানি-হাফ-শার্ট, মুখে চরুট, সুগঠিত শরীর। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে। কিছু বলবার আগেই বললেন, এ হোটলে উঠছেন? তা ঠিকন। এব চেয়ে ভালো হোটেল যদিও পাবেন, তবে সর্বদিক দিয়ে এটি বেশ—মানে একেবারে অন দি হার্ট অব আলমোড়া। এখানেই উঠুন, তা ঠান্ডা জলে

নাইবেন না, আবার গরম জলে গা-হাওয়া মুছে ফেলুন। ইউ লুক ভেরি টায়ার্ড, এখন আমারও একটা কাজ আছে, কাল আপনার কাছে ভেরে আসব'খন। আলাপ হবে ভালো করে।

ভদ্রলোক যেমন ধূমকেতুর মতো এলেন, অমনি গেলেন। তাও এই বিদেশে একজন বাংলাদেশীর মুখ দেখে আনন্দ হলো।

আনমনা হয়ে ঢুকলাম হোটলে। লম্বা মতো একজন লোক এসে সেলাম করে দাঁড়ালো, মাথায় টুপি, পরগে কুমায়ুনী বেশ। বললাম, ঘর দেখাও। এঘর-ওঘর ঘুরে দেখলাম কুয়ে ছ'-সাত-খানি ঘর হোটলে। একেবারে রাস্তার উপরের সেই বোগনভোলিয়া ছাওয়া ছোট ঘরটিকেই মনে লাগলো। ঘরটা অত্যন্ত ছোট হলেও দু'দিক পুরো বোলা। এক-দিকে ডাকবাংলোর পথ, অন্যদিকে ম্যাল রোড। এই শেষ বিকলেও ম্যাজেস্টা-রঙা বোগনভোলিয়ার একটা বেগুনি ছায়া কাঁচের জানালাগুলোকে স্ফিল্ল করে তুলেছিলো।

বললাম, এই ঘরই নেবো। তোমার নাম কি?

হাত জোড় কবে লোকটি বললে, মোহান সিং।

বললাম, ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দাও।

মোহান সিং নড়ে না।

বললাম, কি হলো?

আবার হাত জোড় করে বললো, হুজুর ম্যায়ই ম্যানেজার হ'ন।

ঢোক গিলে, তার সঙ্গেই দাম-দর ঠিক করে নিলাম। ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে বললাম, ঝাড়ুদারকে পাঠিয়ে দাও; ঘরটা ঝেড়ে দিক।

মোহান সিং হাত জোড় করে বললে, জী হুজুর। বসেই, চলে গেল।

হোল্ডলটা বিছিয়ে একটু ধাতুপ হবার চেষ্টা করছি এমন সময় মোহান সিং স্বয়ং বাঁটা হস্তে উপস্থিত।

বললাম, ঝাড়ুদার গেল কই?

মোহান সিং এবার লজ্জাব হাসি হেসে আবারও হাত জোড় করে বলল, হুজুর, ম্যাস ঝাড়ুদারভি হ'ন।

মনে মনে ভাবলাম, তাঙ্গব কি বাত। যে ম্যানেজার, সে-ই ঝাড়ুদার। মালিক কি না তাই বা কে জানে? আবার বললাম, ঠিক হয়। কই বাত নেই।

আমার মুখের কথাটাকে কেড়ে নিয়ে মোহান সিং বললে, কই বাত নেই হুজুর, আপকো কুছি তকলিফ নেই হোগা।

হোটেলওয়ালার খাওয়া-দাওয়ার বন্দো-বস্ত নেই। সংলগ্ন দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা। দোকানের বেয়ারা এসে দাঁড়ালো। দেখে মনে হলো ইয়ক'শায়ারের ছোঁড়া তেল-কালি মেখে গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এলো। গা দিয়ে পচা পচা গন্ধ

কিন্তু মন্দের হাসিটা সুন্দর। বললাম, চাটা কিছু খাওয়াও। তারপর কোতুহলী হয়ে শুধোলাম, দুধ কি

বললে, চাই-আনা

মানে বুঝতে মোহান সিংকে তলব করতে হলো। মোহান সিং ভাবার জট ছাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল চাই-আনা পাও অথবা আড়াই আনা পোয়া। অতএব দশ আনা সের।

সে বিকেলে বেয়োবার অবস্থা ছিলো না। তার উপর সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে শীতটা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। এখানের লোকেরা তো সদা-সর্বদা গরমজামা আব কোট চাপিয়েই আছে। আসলে এ সময় তোমার বুনে-দেওয়া নৌভ-রু সোয়েটারটাই প্রজেক্ট। আর কিছুই প্রয়োজন নেই।

শরীরটাকে শোধন কবে খাটটার উপর হোল্ডলটাকে যথাসম্ভব আরামদায়কভাবে বিছিয়ে টেকটিকিগুলো টেবিলে আর দেয়ালের র্যাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাল্য-পোষট গায়ে টেনে শুলাম। বেশ হিমেল আয়েজ। কম্বল গায়ে দিলে এই আমেজকে অপমান করা হবে; আর সুগন্ধি ময়ূর-বস্ত্রী বাল্যপোষে যোগ্য সমাদব।

সন্ধ্যা হচ্ছে তখন। আদিগন্ত বৃক্ষ পাহাড়ে শেষ সুবর্ণে স্থানিয়া। আমার নোগেনভেলিয়র ছাওয়া কাঁচের ঘরের জানালায় জানালায় তাব সাতবস্তা প্রতিফলন। বাইরের রাস্তা থেকে রোড়ে নানান লোকের যাওয়া-আসার চাপা আওয়াজ। জানালা দিয়ে চোখ দুটোকে পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে দিয়ে মনটাকে ইচ্ছে করে হারিয়ে দিতে হয় এখন এখানে। লাগাম খুলে বলতে হয়—সুটে নৈরে বেলা শেষের আনন্দ-ভান্ডার। জানালায় সাত-রঙা আলোতে যদি মনে করি নামাগার পাশের কোনো হোটেলের ঘরে শুয়ে আছি কেউ বাবণ করবে না কিংবা ময়ূর-কণ্ঠী বাল্যপোষের সুন্দর সুগন্ধে যদি ভাবি—আছি কোনো কৃষ্ণকেশা সুগন্ধি সান্ন্যায়। এই নিরপরাধ আনন্দতেও কেউ বাদ সাধতে আসবে না।

এক কথায় এই ভাবনার সময়। এই তিন দিনের মস্তগতি মনটা যখন এখানে এসে একটু অবকাশ পেয়েছে, একটু একলা-ঘরের তন্ময়তা পেয়েছে, অমনি ভাবতে বসেছে। পুরোনো কথা, পথের কথা আরো কত কথা যা ভাবা যায়, যা ভাবতে ভালো লাগে, যা ইচ্ছে করে ভাবতে ইচ্ছে কবে কিন্তু যা প্রকাশ করা যায় না, তেমন সব কথা। তাই ভাবছি, তাই ভাবছি; তাই ভাবছি। আর শেষ সুবর্ণে রঙিন স্থানিয়া অন্ধকারের প্রকৃতির ভয়ে কেঁপে-কেঁপে আমার এই হারিয়ে দেওয়া মনটাকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে চলেছে, চালু পাহাড়ের গা বেয়ে কৌশী নদীর আঁচলা ছুঁয়ে বড় বড় কালো আর তামাটে পাথরগুলো

ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ওপারে, যেখানে এখানের চোখ পৌঁছয় না।

পরদিন ভোরে একটা ছিমছাম রেন্তোরার বসে রেকফাস্ট সারছি। পেছন দিকে একটা ঝোলা বারান্দা। হিমালয়ের পর হিমালয়—সুন্দর প্যানোরামিক ভিউ। নীচে একটা মেয়েদের স্কুল। আর আঁকাবাঁকা উচু-নীচু পাহাড়ী পথ চলে গেছে এদিকে-ওদিকে। কোনটা যে কোথেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে তা যেন কোনো বড়ো শব্দের ভাবনার মতো অনিশ্চয়।

কফিটা সতিই ভাল করে এরা। আমার হোটেলের দোকানের শাওয়াটা সহ্য করা গেলেও সকাল-বিকেলের চা-কফিটা অসহ্য ওখানে। রেকফাস্ট সেরে কালরের পর্দা সবিয়ে বাইবে বেরুতেই রাস্তার কালকের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। বললেন, বেশ লোক মশায়। হোটলে গিয়ে দেখি বেরিয়ে পড়েছেন। আঁচ করে-ছিলাম ঠিকই। বঙ্গ-নন্দন, এমন কফি হাউস ছেড়ে যাবেন কোথায়?

বোসসাহেব আই-এ-এফের পাখি। কানপুরে আছেন ইদানীং। বঙ্গোদ্য, দেখেন নি তো এখানের কিছুই!

নেতিবাচক ঘাড় নাড়লাম।

আবার বললেন, চলুন গ্রানাইট হিলে। আলাপটা একটু বেশি অলিটচুড়ে জমে ভাল।

গ্রানাইট হিলের উপর থেকে চিল্কা-পেটের রামকৃষ্ণ মিশানের আগ্রম দেখা যায়। গেরুয়া পতাকাটা পত পত করছে। আরো নীচে কৌশী সুন্দরী বুপোলী জর্জেটে কাঁপন তুলে চলকে চলকে চলেছে।

চিল্কাপেট পেরিয়ে আরো আগে কুষ্ঠাপ্রম আর বর্দিক ঘেঁষা দেখা যাচ্ছে টি বি স্যানাটোরিয়ামের পেছন।

গ্রানাইট হিলে চিড়ে-ছাওয়া। বন বিভাগের নোটিশ ঝুলছে—ধূমপান কিংবা কোনোরকম আগুন নিয়ে যাওয়া নিষেধ।

বোসসাহেব যেন ইচ্ছে করে অবজ্ঞা করবার জন্যেই নোটিশটার নীচে দাঁড়িয়ে চুরট ধরালেন। উপরের দিকটাতে শূকনো পাতা পড়ে পড়ে পাথরগুলো ঢেকে গেছে। বড় পিছল হয়েছে। শূকনো পিছল। সাবধানে উঠলাম। চুড়ো থেকে নন্দাদেবী আর বিশাল পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর। ভুয়ারমৌলি মহিষসী এবং মহিয়ান। দার্জিলিং-এর কাগুনজ্ঞা নয়। এ অন্য-রকম। হঠাৎ চাইলে মনে হবে নতুন কোনকাতার নতুন সেক্টোরিয়েট বিল্ডিংটা আচমকা বরফ হয়ে গিয়ে চিড়বনগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে আবছা আবছা দেখাচ্ছে। তাদের উপর সকালের আলো পড়ে একটা গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে। হঠাৎ-লক্ষ্য-পাওয়া সুন্দরীর গালের মতো।

বসলাম দু'জনে একটা পাথরে। ততক্ষণ বোসসাহেব আর সাহেব নেই।

নামকর্তন হয়েছে। রয়েছে শূধু দাদা। বললাম, আপনিও এয়ারফোর্সে তাহলে? কাঠগোদামের পিনাকি রায়ের কথা বললাম।

দাদা চুরটটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, তাই নাকি? সে ব্যাটা গাড়োয়ান প্র পাহাড়ে কেন আবার?

বললাম, গাড়োয়ান মানে? তাহলে, কেনে নাকি?

দাদা বললেন, সিভিল এ্যাভিয়েশন গরুর গাড়ি চালানো ছাড়া কি হে? আমা-দেব গিটে গিটে বাত ধরবে আদাব বস্তা, ময়না পাখি কিংবা ঐ দামী শাড়ি-মোড়ো মেদের বস্তা বইলে। পিনাকি যদিও আমাদের ক্ষেত্রে জুনিয়র, কিন্তু ও তো ছিল এয়ারফোর্সেই। পবে অবস্থা বিভাদিত হয়। চালু ছেলে হে। অবিবাহিত রকম চালু, দোষের মধ্যে যাবে নাকি? শাড়িতে হোট খায়, তবে সে হোট দীর্ঘমেয়াদী নয়।

পিনাকি রায় যে চরিত্রের মতোই হন না কেন, দাদা যে বিশেষ মতনসী লোক এ আধঘন্টার সঙ্গদানেই তা প্রমাণ করেছেন। পিনাকি রায় প্রসঙ্গ চপা দিয়ে তখনকাব মতো প্রসঙ্গান্তর ঘটনা হলো।

নীচে চিল্কাপেট থেকে যে রাস্তা অজগবীর মতো একেবারে নেমে এসেছে চিড়ের ছায়া আব দেওড়ের মায়ায় মনো-সেটা একটা হঠাৎ বাঁক নিয়ে ফুরা গেল ঠিক গ্রানাইট হিলের নীচেই—যুটলে গেছে বর্দিকে কোথাব না জানি কোথায়; সে পথ দিয়ে মন্দের গতিতে উঠে আসে কুমায়ুনী মেয়েরা। মেয়েরা পাচ থেকে পচাশ বছরের; মাথার ক্ষুদ্র গম্বুজ নন্দন শূকনো চিড়পাতাল বোঝা। তাদের পথ দেখা যাচ্ছে না। চিড়ের খাঙ্গানী তুলে সব ছেয়ে গেছে। শূধু ঘাবান নীচের অনাবৃত অংশটুকু আর কোনদ দৃষ্টিতে চলার মনোহাবী ভিগমার তারতম্য দেখে বয়স বিচার করতে হয়।

কেউ উঠে আসছে অশ্রুত মন্দ হিম্রোল, কোমরের সেই দোলান আর চিড়পাতার বোঝাসমেত নীচের পথ থেকে চড়াই-এ ধীবে ধীরে উঠে আসা, এই নব-টুকু মিলে আঁচ করতে হচ্ছে ইনি কোনো পঞ্চদশী পাম্বনী।

কোনো স্থলা নিভান্বনী তত্বত প্রবলবেগে কটিদেশে ঝড় উঠিবে আসছেন। আন্দাজ করা যেতে পারে ইনি মন-তিবিশা। আর কেউ বা কণী দেওড় খটখটানি তুলে আসছেন, দোবার তাই সামনে ঈষৎ ঝুঁকে, পরিষ্কার বস্তা তলে ইনি গতযৌবনা।

রাস্তাটার ঠিক নীচেই, অনেক নীচে, শূধা শিখানীর মতো জড়িয়ে উড়িছে

সূর্যতামসী

সরোজ কুমার রায়চৌধুরী

তখন অপরাহ্ন তিনটের কাছাকাছ।
ক্লান্ত দেহে ডাক্তার অসীমা রায়
এসে তার গাড়িতে বসল। একজন
ড্রাইভার আছে, কিন্তু গাড়ি সাধারণতঃ
সে নিজেই চালাতে ভালবাসে।
পিছনের সীটে গিয়ে বসতে ড্রাইভার
বুকেলে গাড়ি আজ তাকেই চালাতে
হবে। জিজ্ঞাসা করবার কিছু ছিল না।
হাসপাতাল থেকে গাড়ি বরাবর বাড়িতে
ঘায়।

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।
অনেকগুলি উৎকণ্ঠিত লোক,
পুরুষ ও নারী, অসীমার গাড়ীর
কাছে এসে ভিড় করেছিল। তাদের
দিকে অসীমা চাইতে পারছিল না।
গাড়ি ছেড়ে দিতে সে যেন হাঁপ ছেড়ে
বাঁচল। সীটে এলিয়ে পড়ে একটা
সিগারেট ধরাল।

পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে একটা গলির
অগ্ণে তার ফ্যাট। নিচে চেষ্টার। সে-
খানে রোগী দেখে। উপরে সে থাকে।
একা।

একটা চাকর আছে। আর আছে
নিলিনী। সে একাধারে কি এবং রাধুনী।
কিন্তু বন্দেও বলা যেতে পারে।

অসীমা যখন ডাক্তারী পড়ত,
নিলিনী তখন ছিল নাস। অসীমা
প্র্যাকটিশ করতে শুরু করলে নিলিনী
প্রায় অকর্মণ্য অবস্থায় তার কাছে এসে
জুটল। সে আজ অনেকদিনের কথা।
তারপর থেকে এইখানেই রয়েছে। ছোট
মন্ড হয় নি। অসীমারও কেউ নেই,
নিলিনীরও কেউ নেই। দু'জনে বেশ
আছে।

একা নিলিনী নিজে নাস ছিল।
সুতরাং অসীমার মুখ দেখেই বুকেলে,
একটি রোগিনী আজ গেছে। এমন
মাকে মাঝেই যায়। মাঝে মাকেই অসীমা
এমনি শূন্য মুখে ক্লান্ত দেহে বাড়ি
ফেরে। নিলিনী তখন আর অসীমার
সঙ্গে হাসি-গল্প করে না। স্নানঘরে
গরম জল, ঠান্ডা জল, সাবান-তোয়ালে
ঠিক করে রাখে। অসীমা সটন বাথ-
রুমে চলে যায়। ফিরে এসে খাবার
টেবিলে বসে। নিঃশব্দে খেয়ে নিজে
শোবার ঘরে খাটে গিয়ে শূন্য পড়ে।

ঘুম আসে না। চোখ বন্ধ করে
নিঃশব্দে পড়ে থাকে। হয়ত ভাবে,
কেন রোগীর মৃত্যু ঘটল। ওই জিনিসটা

ওই রকমে না করে এই রকম করলে
কি হতে পারত। কিংবা অপারেশনটা
আর কয়েকদিন আগে করলে।

অন্যদিন - নিলিনী এ সমস্ত তার
কাছে এসে বসে। দু-চারটে গল্প করে।
কিন্তু এরকম দিনে নিলিনী আসে না।
জানে, অসীমা এ সময় একা থাকতে
চায়।

তার হাতের রোগী মারা গেলে
গোড়ায় গোড়ায় অসীমা আরও কাতর
হত। এখন সে ভাবটা অনেক কমেছে।
ঘন্টা দু-তিন বিশ্রাম পেলে এই অবস্থা
সে কাটিয়ে ওঠে।

বিকলে নিলিনী যখন চা নিয়ে
এল, অসীমা তখন অনেকটা সুস্থ।

নিলিনীকে দেখে অসীমা হাসল।

নিলিনীও হাসল। বললে, রোগী
মারা গেল ত ?

—হ্যাঁ। কিন্তু শূন্য রোগী বলে
নয়, কি সুন্দর মেয়েটি! বয়স উনিশ-
কুড়ির মধ্যে। আর বাঁচবার কি ইচ্ছে!
অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাঁচাতে
পারলাম না।

অসীমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লে
নিলিনী হেসে বললে, এতদিনে এত
রোগী ঘেঁটেও এ দুর্বলতা তোমার
গেল না। ডাক্তারের পক্ষে এটা কিন্তু
ভাল নয়।

—তা জানি।—চায়ে একটা চমক
দিয়ে অসীমা বললে,—তবে তোমাদের
হিতোপদেশে অনেকটা সামলছি। আর
শতখানেক রোগী মারতে পারলে
একবারে সামলে নোব।

অসীমা হাসতে লাগল। বললে, মদ-
কিল কি জান। আমি নিজে মেয়েমানুষ
তাই বোধহয় মেয়েদের এই সময়কার
অবশ্যম্ভাবী দুঃখস্বপ্না ও বিপদ
আমাকে শানিকটা নাড়া দেয়। নিজেকে
আমি সামলাতে পারি না। আজকের
কথাটা বলি।

চায়ে একটা চমক দিয়ে অসীমা
বলতে লাগল : ছোট একটা মেয়ে। এই
প্রথম সন্তান! খবর জানবার জন্যে
বাইরে শূন্য মুখে বসে আছে তার
স্বামী, শব্দর-শব্দড়ি এবং আরও
অনেকে। যন্ত্রণার কাতরাচ্ছে মেয়েটি।
মুখে একফোঁটা রক্তের চিহ্ন নেই। তারই
মধ্যে তার বাঁচবার কি আগ্রহ। চেষ্টা
করেছিলাম স্বাভাবিকভাবে প্রসব
করানোর জন্যে। জানতাম হবে না,
হওয়া সম্ভবও নয়। তবু চেষ্টা করে-
ছিলাম। অঘট হাতে সম্মত নেই।
তাড়াতাড়ি কিছু না করলে মেয়েটিকে
বাঁচানো যাবে না। অপারেশন করলাম।
কিন্তু তাতেও বাঁচাতে পারলাম না।
অসীমা চুপ করে কি যেন ভাবতে
লাগল।

তার পিছনে বসে নিলিনী তার চুল
বাঁধতে লাগল। নিলিনীও অনেকদিন
নাসগিরি করছে। অনেক রোগীর মৃত্যু
দেখেছে। তার চোখের সামনে অনেক
দুঃখ পেয়েও ধীরে ধীরে মারা গেছে।
কিন্তু কাছে তোকোর প্রথম কয়েক মাসের
পরেই তার মন শান্ত হয়ে গিয়েছিল।
অল্পক্ষণের জন্যে একটা ধাক্কা হয়ত
পেত। তারপরেই যারা বেঁচে আছে,
তাদের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

অসীমার কিন্তু তা নয়। সেই দিনের
একটি রোগীর বাঁচা-মরার দায় তার
হাতে। নোটিকে বাঁচাতে পারলে
আনন্দ পায়, না পারলে দুঃখবোধ করে।

অসীমা বললে, কাঁকড়া কিংবা
কাঁকড়ার বিছে। বাচ্চাগুলো তাদের
পেটে কিংবা পিঠে থাকে। কুরে কুরে
মাকে খায়। মা মরে গেলে বাইরে
বেরিয়ে আসে। অন্য জন্তুদের এতটা
নয়। কিন্তু এই নীতি একটা স্বতন্ত্র-
ভাবে মোটামুটি জীবজগতের সর্বত্রই
কাজ করে। সন্তানের হাতে মায়ের মৃত্যু
কম ঘটে না।

অসীমা চুপ করলে। তার চিন্তা
বোধহয় জীববিজ্ঞানের একটি জটিল
তত্ত্বের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।
চল বঁধা হয়ে যেতে সে বাথরুমে
গেল।

বাথরুম থেকেই অসীমা টেলি-
ফোনের রিং শুনতে পেলো। সে জানে,
কে রিং করছে এবং কেন। কিন্তু সে
বাস্তব হল না।

নিলিনী টেলিফোন ধরেছিল। সে
বাস্তবভাবে বাথরুমের দরজার গোড়ায়
এসে ফিসফিস করে বললে, ডঃ
মহলানবীশ ফোন করছেন।

ফিসফিস করে বলবার কোন দরকার
ছিল না। বাড়িতে কৃত্রিম কোন ব্যক্তি
নেই যে, ডঃ মহলানবীশের নামটা
শুনতে পাবে। কিন্তু নিলিনীরও দোষ

নেই। এ রকম ক্ষেত্রে গলাটা স্বভাবতঃ নেমে আসে।

বাধরুদের ভিতর থেকে অসীমা সহজ সুরেই বললে, ওঁকে আসতে বল।

অসীমার শ্রান এবং প্রসাধন শেষ হতেই ডাঃ মহলানবীশ এসে উপস্থিত হলেন। ইনি অসীমারের বিভাগের বড় কর্তা। অসীমার দ্রুত পদোন্নতির ব্যাপারে, বিভাগের গোকেরাই কানা-ঘদসা করে, এঁর নাকি ষথেষ্ট হাত আছে।

ডাঃ মহলানবীশের বয়স ষাট পার হয়ে গেছে। মাথার চুলের বারো আনাই পেকে গেছে। কিন্তু মৃদুখানি মাংসল, গোলগাল।

অসীমার সদ্য প্রসাধিত মুখের দিকে সিন্ধু দৃষ্টিতে তিনি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

অসীমার গালে একটা লাল আভা

সুটে উঠল। হেসে জিজ্ঞাসা করলে, কি লক্ষ্যেছেন ?

ডাঃ মহলানবীশ হেসে বললেন, তোমার বয়স বাড়ছে না অসীমা। যদিও দেখি, আগের দিনের চেয়ে কম বয়স মনে হয়।

—বৈথছেন তো অনেকদিন থেকে অথচ কথাটা আজ মনে হ'ল কেন ?

—কি জানি। বোধহয় রিটারার

করতে যাচ্ছ বলে। জানো অসীমা, সামনের মাঠে আমাকে রিটারার করতেই হচ্ছে। আর এক্সটেনশন নেবো না।

—হুকুম এসে গেছে ?

—আসে নি। আমি ভেতর থেকে যা খবর পেলাম তাতে মনে হয় দু'-এক দিনের মধ্যেই এসে যাবে।

ডাঃ মহলানবীশের মৃদুখানি বিস্ময়।



অসীমারও। এখানে তার চাকরীর স্থান বিজ্ঞাপিত। আবার কে কতী হয়ে আসবেন, কাকে তোলার করতে হবে, তিনি কেমন লোক হবেন, সে একটা দ্রুত বড় সমস্যা।

প্রথম স্বপ্ন, ডাঃ মহলানবীশের কার্যকাল শেষ হয়, তখন তার মনে এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তবিরের জোরে তিনি একটা এক্সটেনশন পেয়ে যান। সেটা শেষ হতে আর একটা। পর পর দু'বার চাকরীর মেয়াদ বাড়ায় সমস্যাটা অসীমার মন থেকে প্রায় মুছেই গিয়েছিল। তার কেমন আশা হয়েছিল ডাঃ মহলানবীশ থাকবেন, আরো অনেকদিন থাকবেন, অন্ততঃ অসীমার কার্যকাল পর্যন্ত। তবিরে কি না হয়।

তাই খবরটা নতুন কিছু না হলেও অসীমার উপর যেন কিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই উপস্থিত হল। বিশেষ চাকরীর মেয়াদ আর কোনোমতেই বাড়বে না শুনেন। তার যে এখনও উপরে ওঠার অনেক সিঁড়ি বাকি।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, চাকরী শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য দুঃখ নেই। বয়স হচ্ছে আর খাটতে ভালো লাগে না।

—তবে দুঃখটা কিসের ?

—কিসের বন্ধুতে পারছ না ?

—না।

ইঙ্গিতপূর্ণ হেসে ডাঃ মহলানবীশ বললেন, তোমাকে দেখতে পার না বলে।

—কেন ? আপনি কি বাইরে চলে যাচ্ছেন ?

—বাইরে আর কোথায় যাব ?

—তবে ?

—পরিষ্কার করে বলতে হবে ?

—বলুন, অসুবিধা কি ?

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, তখন আর কি সূত্রে তোমার সঙ্গে এমন ঘন ঘন দেখা হবে ?

বন্ধুতে অসীমা বেশ পারছিল। কিন্তু ডাঃ মহলানবীশও স্পষ্ট কথাটা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। অসীমাও সেই অপ্রীতিকর কথাটা শুনতে চায় না, যদিচ জানে কথাটা অনেকখানি সত্য।

বললে, যে সূত্রে এখন দেখা হচ্ছে, সেই সূত্রে তখনও দেখা হবে। আপনি তো জানেন না, বিকেলে আপনার টেলিফোনটির জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকি। টেলিফোনের রিং বাজলে আমি বন্ধুতে পারি আপনি ফোন করছেন।

ডাঃ মহলানবীশ হো-হো করে হেসে উঠলেন : এটা নতুন কথা শোনালে অসীমা। আমি ফোন করলে রিং কি অন্যরকমে বাজে ?

এবারে অসীমা হেসে ফেললে। বললে, বাজে। কিন্তু টেলিফোন ফন্টায় নয়, আর একটা বন্ধু আমার বন্ধুর মধ্যে আছে সেইখানে।

অসীমা অভিনয় করতে জানে।

ডাঃ মহলানবীশ তার চোখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ওর চোখে একটা আশ্চর্য জ্যোতি।

ওর একখানি হাত দুই হাতের মধ্যে নিয়ে অনুতপ্ত সুরে বললেন, জানি অসীমা, জানি। আমি পরিহাস করে বলেছিলাম। তুমি ব্যথা পাবে জানলে বলতাম না। তারপরে যাকে বলে 'জেলারিস', তাও হয়ত আছে।

—কার ওপর জেলারিস ?

—ডাঃ ঘোষের ওপর, যিনি তোমাদের নতুন কর্তা হচ্ছেন।

ডাঃ ঘোষের নাম শুনে অসীমা লাফিয়ে উঠল : অবশেষে ডাঃ ঘোষ। ডাঃ দাশগুপ্ত নয় ?

ডাঃ মহলানবীশ হেসে বললেন, যোগ্যতার দিক দিয়ে ডাঃ দাশগুপ্তেরই হওয়া উচিত। কিন্তু এদেশে যোগ্যতার চেয়ে তবিরের মূল্য বড়। ডাঃ ঘোষের তবিরের ক্ষমতা আছে, মনুষ্যবিরোধ জোর আছে। সুতরাং শিক্কাটা তাঁর ভাগ্যেই ছিঁড়ল। ওতে অবাক হবার কিছু নেই। এইটাই এখন রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, ডাঃ দাশগুপ্তকে আমি কতবার বলেছিলাম, হাতের কাজ ফেলে রেখে ওপর মহলে একটা ঘোরাঘুরি করুন। আপনার হয়ে যাবে। কিন্তু ভদ্রলোক কেমন এক-কগা। কিছুতেই রাজি হলেন না।

ডাঃ মহলানবীশ উত্তোজিতভাবে বলতে লাগলেন : আরে বাবা, একি ইউরোপ পেরেছিছ ? তারা জাত-স্বাধীন। সেখানকার হাওয়াই আলাদা। আর আমরা হলাম জাত-পরানীন। কালে ভদ্রে যখন স্বাধীন হই তখনও পুরোনো অভ্যাসগুলো ছাড়তে পারি না।

তবির! তবির! আমরা মোক্ষ পর্যন্ত তবিরের সাহায্যে পাবার চেষ্টা করি।

ডাঃ মহলানবীশ হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

ডাঃ ঘোষের কথা শুনে অসীমা দ্রুতরমত উৎসববোধ করতে লাগল। লোকটি অত্যন্ত কুটীল এবং কুচক্রী। নিজের লোকদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে থাকে। ডাঃ মহলানবীশের অনেক দোষ আছে কিন্তু স্বভাবটি মিষ্ট এবং পারতপক্ষে কারো অনিষ্ট করেন না। মোটামুটি সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করার চেষ্টা

করেন। ডাঃ ঘোষ তার ঠিক উল্টো। এর সঙ্গে কাজ করতে, শুধু অসীমার কেন, ডাঃ ঘোষের জনককে পেটেরা লোক ছাড়া সকলেরই অসুবিধা হবে।

অসীমা নলিনীকে জিজ্ঞাসা করলে, নলিনীদ, তোমার ডাঃ ঘোষকে মনে পড়ে ?

নলিনী বললে, তা আর পড়বে না? ভদ্রলোক আমার মনে গাঁথা রয়েছে।

অসীমা অবাক : মনে গাঁথা রয়েছে ? ওর সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল নাকি ?

—স্বপ্ন দশা! আমার সঙ্গে আলাপ থাকতে যাবে কেন ?

—তবে ?

—ওর জন্যেই তো নির্মলাদি আত্মহত্যা করলে। মনে নেই ? তোমরা তখনও বোধহয় ডাক্তার হয়ে বেরোও নি।

—মনে পড়ল : হ্যাঁ, হ্যাঁ একটি নার্স আত্মহত্যা করেছিল বটে। আমরা তখন কলেজে পড়ি। সে কি ডাঃ ঘোষের জন্যে ?

—তবে আর কোন মনুষ্যপোড়ার জন্যে ? ওই ভেে সর্বনাশের মূল। ডাঃ ঘোষ।

অসীমা বললে, ব্যাপারটা রেকর্ড-ভাবে চাপা দেওয়া হয় তাতে আমাদের সন্দেহ হয়েছিল বটে। তবে এর পেছনে যে ডাঃ ঘোষ, তা জানতাম না।

নলিনী বললে, বিধবা হলেও ছেলেটাকে নষ্ট করার ইচ্ছা নির্মলাদির ছিল না। কিন্তু ডাঃ ঘোষ এমন কান্ড আরম্ভ করলেন যে, মনের ক্ষোভে নির্মলাদি আত্মহত্যা করলেন। তোমরা জানো না অসীমাদি, ডাঃ ঘোষের বদলি হওয়ার কারণও তাই।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা সাধারণভাবে জানাজানি না হলেও ওপরওয়ালাদের কানে উঠেছিল। সেখানে ডাঃ ঘোষের খোঁটার জোর ছিল, তাই চাকরীটা রয়ে গেল। কিন্তু বদলি করে দেওয়া হল।

খোঁটার জোরের কথা ডাঃ মহলানবীশও বলেছিলেন। সে খোঁটার জোরেই এতদিন পরে ডাঃ ঘোষ ফিরে আসছেন একেবারে বড় কর্তা হয়ে। অসীমা জিজ্ঞাসা করলে, ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন ?

—তখন তো করেন নি। এখন কি করেছেন জানি না। মনে হয় করেন নি।

—মনে হয় কেন ?

নলিনী হেসে বললে, কি দুঃখ করবেন ?

অসীমা বললে, কিন্তু ডাঃ মহলানবীশ তো করেছেন।

নলিনী বললে, তিনি করেছেন।

একটু এঁদিক-ওঁদিক থাকলেও মান্দুঘটা আসলে গেরস্ত মানুষ।

—আর ডাঃ ঘোষ ?

—সে একটা চাঁজ। তার মায়ী নেই, মমতা নেই, ধর্মধর্ম জ্ঞান নেই। সে না পারে হেন কাজ নেই।

কী সর্বনাশ!

অসীমা বললে, জানো নলিনীদি, ডাঃ মহলানবীশ চলে যাচ্ছেন। তার জায়গায় আসছেন ওই ডাঃ ঘোষ।

নলিনী গালে হাত দিলে : তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। ডাঃ মহলানবীশের কাছে আগেই শুনিয়েছিলাম। আজ হাসপাতাল থেকেও শুনিয়ে এলাম। সবাই ভয়ে অস্থির। লোকটা কি সত্যিই এত খারাপ।

নলিনী বললে, লোকে যা জানে তার চেয়েও খারাপ। নির্মলাদির সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। ডাঃ ঘোষের ন্যাউনক্ষর আমি জানি। তুমি সাবধানে থেকে দাঁদিমণি।

বলে নলিনী হাসলে।

দিন কয়েকের মধ্যে ডাঃ ঘোষের কর্ম-উৎসাহ ও কর্মকুশলতার পরিচয় পেয়ে সবাই খুব বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে উঠল। ডাঃ ঘোষের সম্বন্ধে একটা ভয় সকলের মনেই অল্পবিস্তর ছিল। তা নয় হয়ে যেতে বিলম্ব হল না। ডাক্তার ও কর্মীদের প্রত্যেকের সুবিধা-অসুবিধার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বেধে তিনি কাজ করতেন। মহিলা ডাক্তারদের সম্বন্ধে খুব গ্রন্থাপবায়ণ।

অসীমা যতই দেখছিল, ততই অবাক হাচ্ছিল। বরে-বাইরে সকলের কাছ থেকে ডাঃ ঘোষের সম্বন্ধে এতদিন যা সে শুনিয়েছিল, তা কি সত্য নয়? অথবা কি ডাঃ ঘোষের চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে? অসীমা এবং কেউই বুঝতে পারছিল না।

শুধু অসীমাই নয়, যারা ডাঃ ঘোষের সঙ্গে আরো বেশ পরিচিত ছিল তাঁরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কেবল নলিনী অবিশ্বাসের হাসি হাসছিল। অসীমাকে বলতঃ দাঁড়াও না, চিতাবাঘ রঙ বদলায় বলে আমাব ধারণা নেই।

অসীমাও হেসে বলতঃ দাঁড়িয়ে ত' আছি। কতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তা তো জানি না।

নলিনী হাসতে হাসতে বললে, ইচ্ছে করে, একদিন ডাঃ ঘোষের কাছে যাই। নিজের চোখে দেখে আসি, চিতাবাঘ রঙ বদলালে কি না।

অসীমা বললে, যাও দেখে এসো। দেখলে মনে হবে, তোমার নির্মলাদির ঘটনাটা মায়ী ছাড়া আর কিছুই নয়।

নলিনী উত্তেজিতভাবে বললে, যা চোখে দেখেছি। একদিন নয় দু' দিন নয়,



ওর জলেই তো নির্মলাদি আত্মহত্যা করলো। মনে নেই

দিনের পর দিন, অনেকদিন ধরে দেখেছি, তাকে মায়ী ব'লে উড়িয়ে দিতে বখনও পারব না।

এমন সময় ডাঃ মহলানবীশের কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ মিসেস ব্রায় ত'ছেন?

অসীমা লাফিয়ে উঠলঃ আছেন, আছেন। এখনও পর্যন্ত আছেন। নির্ভয়ে চলে আসুন।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একবার খবরটা নিয়ে যাই। আছ কেমন বল?

অসীমা হেসে বললে, অর্থাৎ নতুন রাজসে আছি কেমন?

—তা বলতে পারো।

—তার আগে বলুন, চিতাবাঘ রঙ বদলায় কি না।

—চিতাবাঘ এলো কোথেকে?

—এসে পড়েছে একটা। কিন্তু তার গায়ের দাগগুলো নেই। এরকম কি হয়?

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি গোপন করে ডাঃ মহলানবীশ বললেন, ভগবানের রাজসে কি যে হয় আর কি যে হয় না, তা কে বলতে পারে? অন্ততঃ আমি ত' বলতে পারি না। চিতাবাঘ কি হলছ, বেড়ালের সম্বন্ধে পর্যন্ত আমার অনিজ্ঞতা কম।

অসীমা বললে, আপনি বলতে চান, আপনি আদার ব্যাপারী।

—ঠিক তাই। জাহাঙ্গীর খবর রাখি না।

একটু পরে ডাঃ মহলানবীশ বললেন, আমিও শুনিয়েছি, ডাঃ ঘোষ কারো সম্বন্ধেই তা খারাপ ব্যবহার করেন না। অনেক গুরুত্বের অপরাধও হাসতে হাসতে ক্ষমা করেন।

অসীমা জিজ্ঞাসা করলে, আপনার
রূপে দেখা হয়েছে?

—হয়েছে। চার্জ বৃদ্ধি দেবার দিন।

—কি রকম দেখলেন?

—চাহানটা কি রকম, লাগল। তা
আমার দেখার ভুলও হতে পারে। তার
কারণ, আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার
করবার কি থাকতে পারে? আমি তাঁর
চোরে সিনিয়র। এখন রিটারার করছি।
তার সঙ্গে শত্রুতার কোন উপলক্ষ ঘটবে
না। তোমার কেমন লাগছে বল।

—ভাল। খুব ভাল। মানে, অভিযোগ
করবার কিছু নেই। তবে আমরা খুব
সতর্ক হয়ে আছি। কিন্তু ডাঃ সেন
বলছিলেন, সংঘর্ষ যদি বাধে, এই
সতর্কতার জন্যেই বাধতে পারে।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, ডাঃ সেন
ঠিক কথাই বলেছেন। সতর্ক থাকার অর্থ
হচ্ছে শিগ্গি বাকিয়ে থাকা। দু' পক্ষই শিগ্গি
বাকিয়ে থাকলে ইচ্ছা না থাকলেও সংঘর্ষ
বেধে যায়।

—সতর্ক না থেকেও উপায় নেই।

ডাঃ মহলানবীশ হেসে বললেন, তাও
ঠিক। একটা কাল্পনিক খল্ল ডাঃ ঘোষ সব
সময়ই উঁচিয়ে রয়েছেন। কখন কার
কাঁধে পড়বে, কেউ জানে না। সেই অদৃশ্য
কাল্পনিক খল্লের দিকে তোমাদের সব
সময় সতর্ক হয়ে থাকতে হবে।

অসীমা বললে, সেও ত' কম বিড়ম্বনা
নয়।

—নয়ই ত'। কিন্তু এটা ত' রাখতেই
হবে। কেন না, প্রতিপক্ষ ডাঃ ঘোষ। চল
না একটু বৌড়িয়ে আসবে।

ডাঃ মহলানবীশ উঠে দাঁড়ালেন।

অসীমা হেসে বললে, না।

ডাঃ মহলানবীশ অসীমার দিকে
অবাক হয়ে চাইলেন।

অসীমা হেসে বললে, আপনি অমন
করে চাইছেন কেন? আপনি কি জানেন
না, ডাঃ ঘোষ আমার স্যামার বন্ধু?
অফিসের বিদ্রোহের সঙ্গে আর পারিবারিক
বিদ্রোহ ঘোঁড়াতে চাই না।

পিছনের ইতিহাসটি এই রকম:

ছাত্রাবস্থাতেই অসীমার সঙ্গে বিশ্ব-
তোষের ভালবাসা হয়। বিশ্বতোষ অসীমার
দু' ক্লাস ওপরে পড়ত। যথার্থিত হ'উস-
সার্জেণ্ট হওয়ার পর বিশ্বতোষ বিলাত
গেল উচ্চতর শিক্ষালভের জন্য। বিলাত
থেকে যখন ফিরে এল, অসীমারও ছাত্র-
জীবন শেষ হয়েছে। কথা পাকা হয়েই
ছিল, উভয়ের বিবাহ হয়ে গেল। আরও
কয়েক বছর পর অসীমা বিলাত গেল
একই উদ্দেশ্য নিয়ে।

এতদিন বেশ গেল। বিরোধ বাধল
এইবার। বিলাতে অবস্থানকালে অসীমা
ধূমপানের অভ্যাস করেছিল। ফিরে এসে
সেই অভ্যাস ছাড়তে পারল না। বিশ্বতোষ

কোনরূপ নেশা পছন্দ করত না। সে
অসীমার ধূমপানে আপত্তি জানাল।

প্রথম প্রথম অসীমা এই অভ্যাস
ছাড়বার জন্যে কিন্তু চেষ্টা করছিল।
কিন্তু বিশ্বতোষ চাপ দেওয়ার বড়াবাড়ি
করায় অসীমারও জেদ চড়ে গেল। সে
সাবধানে দিল, সিগারেট সে ছাড়বে
না। অধিকন্তু একদিন সে মদ্যপান করে
মস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরল।

সেইদিন বিশ্বতোষের সহায় সকল
বাঁধ ভেঙে গেল। পরদিন সকালে চা না
থেকে সে বোরিয়ে পড়ল বাড়ির সম্মানে।
কিন্তু বাড়ি পাওয়া সহজ কথা নয়।
বিশ্বতোষের ডাক্তারবন্ধু সুকান্ত একটা
ফ্ল্যাট নিয়ে একাই থাকত। তাকে ধরে-
পেড়ে তার ফ্ল্যাটেই বিশ্বতোষ নিজের জন্যে
একটা জায়গা করে নিল। সুকান্তের
জায়গা দেবার ইচ্ছা ছিল না। প্রথমতঃ
জায়গা বেশ নয়। মাত্র দু'টি ঘর। তার
ওপর দাম্পত্যকলহের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার
ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিশ্বতোষ তাকে
কথা দিলে যে, যথার্থই সম্ভব সে অন্য
বাড়ি খুঁজে নিয়ে চলে যাবে।

সুকান্তের ওখানে চা থেকে এবং
খাবারের ব্যবস্থা করে দুই কক্ষতে
হাসপাতাল চলে গেল। সুকান্তের ভয়
করাছিল পাছে অসীমার চোখে পড়ে যায়।
সৌভাগ্যক্রমে পড়ল না। সেদিন অসীমার
চোখে কি যেন একটা পড়েছিল। অসীমার
সব সময় চোখ ছিলল করছিল। দৃষ্টি
আবছা হয়ে গিয়েছিল। কিছুই যেন তার
চোখে পড়ছিল না।

কিন্তু আর সবার চোখে ত কিছু
পড়ে নি। তারা ব্যবহৃত পারছিল যে,
দু' জনের মধ্যে একটা কিছু হয়েছে।
বাঙালীসুলভ কৌতুহলবশে ব্যাপারটা
জেনে নিতে দেরি হল না। একটা একটা
করে সেসব সবই তারা অসীমার গোচরেও
আনলে। স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ যে এতবড়
লজ্জাকর ব্যাপার, তা অসীমা এই প্রথম
উপলব্ধি করলে। প্রথম প্রথম সে
বিচ্ছেদটাকে লজ্জাভাবে উড়িয়ে দেবার
চেষ্টা করতে লাগল। বোকাতে চাইল যে,
ব্যাপারটা নিছক বিশ্বতোষের পাগলামি।
দু' দিনেই সেরে যাবে।

দু' দিনেই সেরে যাবে। এই আশা
বিশ্বতোষেরও মনে ছিল। তাই ঘনিষ্ঠ
বন্ধুত্বমহলে সে স্থায়ী ধূমপানের কথাটা
বলতে পারত না। যত দিন যেতে লাগল,
দু' জনের মধ্যে বিচ্ছেদটা তত বিস্তৃত হতে
লাগল। দু' জনে সংঘর্ষের ভয়ে পক্ষপরের
সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে। তার ফলে সংঘর্ষ
অবশ্য বাধে না, কিন্তু দু' জনেই মনের
মধ্যে বিষ জমে। এই অবস্থায় বিশেষ
করে বিশ্বতোষেরই দুঃসহ ঠেকতে
লাগল। মেডিকেল কলেজের আবহাওয়াটা
সে সহ্য করতে পারছিল না। এমন সময়
পার্টনার মেডিকেল কলেজে একটা চাকরী

পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চাকরীটা
স্বীকার করে নিয়ে বিশ্বতোষ পার্লিয়ে
বাটল।

পার্টনার বাঙালীর আগে বিশ্বতোষের
বন্ধুবান্ধবদের কেউ কেউ পরামর্শ দিয়ে-
ছিল, বিবাহ-বিচ্ছেদ করবার জন্যে।
বিশ্বতোষ রাজি হয় নি। বললে, ও
কলকাতায় আর আমি পার্টনার, এখ
চেয়ে বিচ্ছেদ আর কি হতে পারে? আর
বিবাহ? তাতে আমার দিক থেকে কোন
বাধা ত' নেই। আইন হচ্ছে বটে, কিন্তু
এখনও হয় নি। আইন হওয়ার আগে
আমি বিয়ে করে ফেলব। অসীমা যদি
বিয়ে করতে চায়, তাহলে তাকেই বিবাহ-
বিচ্ছেদের মামলা আনতে হবে। আনুক
না সে, আমার গরজ নেই।

বছর পার হবার আগে বিশ্বতোষ
একটা বিয়ে করলে। ম্যাট্রিক ফেল করা
একটি গেরুপ বস্ত্রের মেয়ে।

খবরটা কলকাতা মেডিকেল কলেজে
পৌঁছতে সোরগোল পড়ে গেল। কেউ
বাহবা দিলে, কেউ বা ছি-ছি করলে।
অসীমা কিছু করলে না। শব্দ মথ টিপে
মুচুকি একটু হাসলে। সেদিন তা' একটা
কঠিন অপারেশন ছিল, কিন্তু অপারেশনটা
পিছিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

নিলিনী জানত, আজ একটা কঠিন
অপারেশন আছে। যেদিনই কঠিন
অপারেশন থাকে, হাসপাতালে বেরবার
আগে, অসীমা তা নিলিনীকে বলে যায়।
আজও বলে গিয়েছিল। সুতরাং অসীমাকে
সকাল সকাল ফিরতে দেখে নিলিনী অবাক
হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আজ সকাল সকাল
ফিরে এলে কে? শরীরটা কি ভাল নেই?

অসীমা ক্রান্তভাৱে বললে, না।
শরীর ভালই আছে।

একটা দুঃসংবাদের ছাপ অসীমার
মুখের ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই
দেখে নিলিনী উদ্ভিন্ন: কণ্ঠে জিজ্ঞাসা
করলে, তবে?

যে কথা মেডিকেল কলেজের সকলেই
জেনে ফেলেছে, তা নিলিনী কাছে গোপন
করা নিরর্থক। অসীমা বললে, 'ভর'
আর কি। একটা বিয়ে করেছে।

চোখ কপালে তুলে নিলিনী জিজ্ঞাসা
করলে, কে গো? কে বিয়ে করেছে?

বিরক্তভাবে হেসে অসীমা বললে, ক
আবার। কার বিয়ে করার সঙ্গে আমার
সম্পর্ক আছে?

উৎকণ্ঠায় নিলিনীর তালু শক্তিয়ে
গেছে। বললে, বল কি গো! ডাঃ র
আবার বিয়ে করেছেন?

অসীমা বললে, তাই ত' শুনছি।
—কার কাছে শুনলে?

—উনি নিজেই কাউকে একখানি
নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন। সেই স
সবাই জেনেছে।

মিলিনী শূন্য মূখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বললে, অনেক সময় পেয়েছিলাম। তার মধ্যে মিটমিট করে নিতে পারতে।

—অতঃ কি হত?

এই কেলেকারীটা হত না।

তিস্তকণ্ঠে অসীমা বললে, কেলেকারী ত' আমার নয়, যে বিষে কবেছে তার। আমি কি করব?

বলে তোলাগোটা কাঁধে ফেলে বাথরুমে চলে গেল।

এর কয়েকদিন পরে ডাঃ মহলানবীশকে নিয়ে অসীমা ড্রাইংরুমে গিয়ে বসল। তার মূখে একটা গর্ভিত ভাব। মিলিনী লক্ষ্য করলে। বন্ধুত্ব, এটা বিশ্বতোষের কাজের বদলা। এইসব কথা বাতাসের আগে ছোট। সুভরাং বিশ্বতোষের কানে পৌঁছতে বিলম্ব হল না।

এরপর সাত বছর কেটে গেছে। ইতি-মধ্যে কেউ কারও খবর বাসে নি। কখনও কখনও লোকমুখে কিছু সংবাদ পায়, কিন্তু সে এতই সামান্য যে ফেটেই এই-সংবাদে উৎসাহিত হত না।

ইতিমধ্যে অসীমার কাছে খামে একখানি চিঠি এল। খামের ঠিকানাটা দেখে অসীমা চমকে উঠল। এ তো বিশ্বতোষের হাতের লেখা? সে হাসপাতালে যাচ্ছিল, তখন পড়ুয়া সময় নেই। চিঠিখানা ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়ল।

বিকলে হাসপাতাল থেকে ফিরে ফ্রান্স করে দুটি খেয়ে নিলে। তারপর চিঠিখানা খুলে শূন্যে শূন্যে পড়তে লাগল:

সন্ধ্যাতাস্

অনেক দিন পর তোমার চিঠি লিখছি। তার মানে এই নয় যে, রাস্তার গহ্বর থেকে হঠাৎ তুমি আমার সামনে উঠে এলে। তার মানে এই যে, আমার মনের গভীরে বরাবর তুমি ছিঁপে। হঠাৎ তুমি উঠে আস নি। মাঝে মাঝেই তোমার সঙ্গে দেখা হতো, কথা হয়েছে: অবশ্য স্বপ্নে। ফেরত ডাকে তুমি আমার সব খবর দেবে। আমার খবরের মধ্যে একটি খবর, দিন পচ-ছয় হল আমার একটি মেয়ে হয়েছে।

ইতি

শূন্যখণী

বিশ্বতোষ

অসীমার এই চিঠির উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এতদিন পরে তার রাগ কিছুটা কমে গিয়েছিল। সে একটা মামুলী জবাব দিল। বিশ্বতোষ তার যে জবাব দিল তাকে কোনমতেই শ্রদ্ধালী বলা চলে না। অসীমা চিঠিখানা ডাঃ মহলানবীশকে দেখাল।

ডাঃ মহলানবীশ দেখে বললেন, পথ

অনেকটা মসৃণ হয়ে এসেছে। যা কিছু প্রতিবন্ধক, ভদ্রলোকের স্ত্রী।

—আপনি কি সত্যি তাই মনে করেন?

—তোমার চিঠি আমি লেখি নি, বিশ্বতোষের যে কয়েকটি চিঠি দেখলাম, তা খুব আন্তরিকতাপূর্ণ। ভদ্রলোককে দেখতে ইচ্ছে করে।

অসীমা বলে উঠল, বেশ ত', যান না। পাটনা ত' আর দূরের রাস্তা নয়। এখন থেকে একটা শনিবার সন্ধ্যায় টেনে উঠবেন, ভোরবেলায় ওখানে পৌঁছবেন। আবার রবিবার সন্ধ্যাবেলায় চড়বেন, সকালে এখানে পৌঁছবেন। আপনার মূখে কত গল্প শুনতে পাওয়া যাবে।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, যেতে ইচ্ছে তা হচ্ছে, কিন্তু ভয়ও করছে।

—ভয়ের কি আছে?

মুচর্চক মুচর্চক হাসতে হাসতে ডাঃ মহলানবীশ বললেন, ভয়ের কারণ কিছু আছে।

বলে অসীমার দিকে চাইতেই অসীমার মূখে কে যেন এক্সক্লক আঁবির মাখিয়ে দিল।

অসীমা তাড়াতাড়ি বললে, তবে থাক। আপনাকে যেতে আমি বাঁধি নি। আব দরকারও ত' কিছু নেই। আইনের সাহায্য না নিলেও বিচ্ছেদ সম্পর্কে ইয়ে গেছে।

বলে অসীমা আর একবার হাসলে।

কাছে যোগ দেওয়ার প্রথম ছ' মাস ডাঃ ঘোষ কাউকে কিছু বলতেন না। সবার দোষদুর্ভাগ্যে যে তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি, তা তিনি হাঁপাতে সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন। বোকা যেত, লোকটি অত্যন্ত ধূর্ত। একদিন ডাঃ অসীমার সঙ্গে গল্প করছিলেন। করতে করতে এক সময় বললেন, মিসেস রাধ, আপনার কাছে আমার মাফ চাইবার আছে।

অসীমা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমার কাছে? মাফ চাইবার আছে? কি ব্যাপারটা বলুন ত'।

ডাঃ ঘোষ বললেন, আমার কেমন যেন ধারণা ছিল যে, আপনি বিধবা।

অসীমা হু কঁচকালে।

এ ধারণা আপনার মাথায় কে ঢুকিয়ে দিল বলুন ত'।

ডাঃ ঘোষ বললেন, কেউ ঢুকিয়ে দেয় নি। আমার মাথায় কথাটা আপনিই জেগেছিল। আমার মাথায় মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত কথা আসে।

—তারপরে গেল কি করে?

—গেল এক আশ্চর্য রকমে। হায়দ্রাবাদ কনফারেন্সে বিশ্বতোষের সঙ্গে দেখা। আপনি জানেন বোধহয়, বিশ্বতোষ আর আমি একসঙ্গে পড়েছিলাম। একসঙ্গেই বিলেত গিয়েছিলাম।

অসীমা নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

ডাঃ ঘোষ সবিম্বয়ে বললেন, বিশ্বতোষ কোনদিন বলে নি এ কথা?

—না।

—আশ্চর্য! তারপর বললেন, সেখানে শুনলাম, তাব বিবাহের ইতিহাস। দু' দুটো বয়ে। পাগল আর কাকে বলে! আচ্ছা, দ্বিতীয় বিবাহের আগে কি আপনার সম্মতি নেওয়া হয়েছিল?

ডাঃ ঘোষের অন্তরঙ্গ হবার এই চেষ্টা অসীমার ভাল লাগছিল না। কিন্তু বিরক্তি গোপন করে সে উত্তর দিলে, আমার সম্মতি নেবেন কেন? হিন্দু সমাজে পুরুষের ত' যতগুলি খুশী বিয়ের অধিকার আছে।

ডাঃ ঘোষ হেসে উত্তর দিলেন, ছিল, এখন আর নেই। এখন হলে পরে বাছা-ধনকে হাজত ঘরে আসতে হত।

এই প্রসঙ্গ অসীমার ভাল লাগছিল না। প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বললে, ছাত্রী নম্বব বেডের অপারেশনটা কি আপনিই করবেন?

ডাঃ ঘোষ বাধা দিয়ে বললেন, না, না। আপনিই করবেন। আমি বলেছিলাম আমাকে খবর দিতে যাতে আমি উপস্থিত থাকতে পারি।

অসীমা বললে, আপনিই কবুন না। আপনি করলেই ভাল হবে। আমরা দেখতাম।

ডাঃ ঘোষ সবিম্বয়ে হেসে বললেন, না, না। এই সব অপারেশনে আপনার খুব সুখ্যাতি শুনছি। আপনিই করবেন, আমি দেখব।

ডাঃ ঘোষ নামজাদা সার্জন। মূখে তিনি যা-ই বলুন, আঁজ অসীমার এতটা মস্তবড় পরীক্ষা। অথচ এমন মোলায়েম ভাষায় পবীক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে যে, আপত্তি করার কিছু নেই। অসীমার বুকের ভিতর কাঁপুনি শুরু হয়েছে।

বললে, আপনি থাকলে আমি অপারেশন করতে পারব না। ভয় করবে। ভুল হবে। শেষ পর্যন্ত রোগিনীর মৃত্যু হবে। সবচেয়ে ভাল হয়, যদি আপনি অপারেশন করেন। অপারেশনে আপনার নামই শনিছে, কখনও চোখে দেখি নি। আপনি রাজি হোন।

মৃদু হেসে ডাঃ ঘোষ রাজি হলেন।

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র হয়ে গেল। এবং এই বিভাগের মহিলা এবং পুরুষ সমস্ত ডাক্তার ডাঃ ঘোষের অপারেশন দেখবার জন্যে অপারেশন থিয়েটারে এসে ভীড় করল।

ডাঃ ঘোষ যেন তাঁরই হয়েছে এসেছিলেন। অস্ত্রগুলো একবার দেখে নিয়ে অপারেশন আরম্ভ করলেন। কি দ্রুত তার



‘আমার কেমন যেন ধারণা ছিল যে, আপনি বিধবা’

গতি! কয়েক মিনিটের মধ্যে অপারেশন শেষ হয়ে গেল। একদিকে শিশুটিকে নিয়ে একটি নার্স মৃদু কণ্ঠে বলে দিলে তাকে নাচাচ্ছিল, অন্যদিকে ডাঃ ঘোষ তার পেট সেলাই করে দিলেন। সকলে স্বীকার করলে, এমন দ্রুত এবং নিখুঁত অপারেশন দেখা যায় না।

বাড়ি ফিরে দরজায় বেল টিপতেই নলিনী দরজা খুলে দিল। আজকের অপারেশনটা কঠিন ছিল। অসীমা তা বলেই গিয়েছিল। সন্ধ্যায় নলিনী প্রত্যাশা করেছিল, অসীমাকে ক্লান্ত দেখাবে। তার বদলে অসীমার হাসি হাসি মুখ দেখে নলিনী অবাক হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলে, আজ অপারেশন হয় নি?

অসীমা জুতো খুলতে খুলতে বললে, হবে না কেন? খুব ভাল হয়েছে। দেখবার মত।

নলিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অসীমাকে আত্মপ্রশংসায় এমন উৎসাহী কখনও দেখা যায় নি। সন্ধ্যায় অসীমার কথার মানে বুঝতে নলিনীর দেরি হচ্ছিল।

বিছানায় গিয়ে বসতে বসতে অসীমা বললে, অপারেশন করা সাধক। অপারেশন করতে হয় তা অমনিভাবেই কবতে হয়।

অসহিষ্ণু নলিনী জিজ্ঞাসা করলে, কার কথা বলছ তুমি? কে তমন অপারেশন করলে?

অসীমা বললে, কে তমন অপারেশন করতে পারে? জানলে নলিনীদি, আমাদের হসপিটালে ডাঃ ঘোষ ছাড়া তমন অপারেশন কেউ করতে পারে না।

নলিনী নিঃশব্দে বিরক্তভাবে অসীমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অসীমার সৌদিকে লক্ষ্য নেই। আপন মনেই বলে চলেছে: আমরাও তা কর্তৃদীন ধরে অপারেশন করছি, কঠিন অপারেশনও যে না করছি, তাও নয়, কিন্তু এ অপারেশনের সঙ্গে কারও অপারেশনের তুলনা হয় না। ছদ্ম কখন কোথায় গিয়ে বসছে, বুঝতে পারছি না। লোকটার যত দোকান থাক, অপারেশন করে ভাল।

নলিনী অসীমার জন্যে চা আনতে গেল।

মিনিট দশেকের মধ্যে নলিনী চা ও খাবার নিয়ে এল।

সন্ধ্যার সময় একখানা হালকা বেতের চেয়ারে অসীমা বসেছিল। এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। অসীমা গিয়ে টেলিফোনটা ধরল : হ্যালো!

—হ্যালো, মিসেস রায়?

—হ্যাঁ, আমি কথা বলছি।

—আমি ডাঃ ঘোষ। আজ অপারেশনটা কি রকম লাগল?

—ওয়াটারফুল! আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছি।

—না, আশ্চর্য হবার কি আছে! এ রকম আগনারাগ পারেন।

অসীমা খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, কি যে বলেন। আপনি আজ আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এতক্ষণ এই কথাই বসে বসে ভাবছিলাম।

ডাঃ ঘোষ এক মৃদুত নীরব থেকে বললেন, আপনার হাসি কি ওয়াটারফুল! আমাকে নিশ্চল করে দিয়েছিল। আপনি কি এখন ব্যস্ত আছেন?

—ব্যস্ত, না, হ্যাঁ। এমন কিছু ব্যস্ত নয়। কেন বসুন তা?

—তাহলে একবার যেতাম।

অসীমা স্তম্ভভাবে রিসিভারটা কানে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। ডাঃ ঘোষের এতটা সাহস কি করে হল, তা সে ভেবে পেল না। ডাঃ ঘোষকে সে বললে, একটু পরে আমার একটা এ্যাপপ্রেন্টমেন্ট আছে। আমি খুব দক্ষিণত ডাঃ ঘোষ। অন্য কোন দিন পছন্দ করেন।

স্বলিত কণ্ঠে ও-প্রান্ত থেকে উত্তর এল, আচ্ছা। সেই ভাল। তাই হবে।

নলিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল। বললে, এই ওর ধরণ। লোকটি মনে জ্বকের মতন, ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন। নিম্নলিখিত কয়েকটি দেখে কি না।

ফলে সে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। আর অসীমা সেইখানে স্তম্ভভাবে বসে রইল।

পরাদর্শ উঠতে অসীমার বেশ বেশা-
হল। রাঁঠে ঘুম আসে নি। যতবার
ঘুমোতে চেষ্টা করেছে, ততবার
দুঃস্বপ্নের ধাক্কায় তা ভেঙে গেছে।
জ্বরের তাপ নেই, তবে মাথাটা খুব ভার
হয়ে আছে।

ওকে উঠতে দেখে নলিনী এক-
পেয়লা চা নিয়ে এল। চাটা খেয়ে
অসীমা একটু সুস্থ বোধ করলে। কিন্তু
তবু হাসপাতাল যেতে সাহস করলে না।
টেলফোনে জানিয়ে দিলে যে, তার শরীর
ভাল নেই। আজ আর সে যাবে না। ভাল
থাকে ত' কাল যাবে।

চাটা খেয়ে অসীমা আবার পাশ
ফিরে শুলে পড়ল। এমন সময় ডাঃ মহলা-
নবীশ ফোন করলেন। নলিনী ফোনটা
যেরো ছিল, সে ডাঃ মহলানবীশকে জ্বরের
খবরটা দিলে। পনের মিনিটের মধ্যে ডাঃ
মহলানবীশ চলে এলেন। তাঁকে দেখে
অসীমা অবাক হয়ে গেল। সবিস্ময়ে
জিজ্ঞাসা করলে, আপনাকে খবরটা দিলে
কে?

ডাঃ মহলানবীশ সহাস্যে বললেন, কেউ
দেয় নি। জানো না, আমি হাত দেখতে
জানি। তুমি যেমন আমার টেলফোনের
রিং শুনলে বুদ্ধিতে পার, কে ফোন করছে।
আমি তোমার সকালে উঠেই বুদ্ধিতে
পারছি, তুমি কেমন আছ।

বলে অসীমার হাতখানা নিয়ে নাড়ী
দেখতে লাগলেন। বললেন, জ্বর তা
বেশি হয় নি।

—বেশি হবে কেন?

—তা বটে। ভালো লোকদের
টেম্পারেচার বেশি ওঠে না।

অসীমা হাসতে হাসতে বললে, জানেন
দেখছি।

—জানব না? দু' একটি ভালো
লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে যে।

—কি থাকে বলুন ত'?

—সাগরু থাকে। জ্বর বেশি না হলেও
খন্টগাটা বেশি কি না।

—না, ঠাট্টা করবেন না। বলুন না, কি
থাকে?

ডাঃ মহলানবীশ হেসে বললেন, ভাত
থাকে আবার কি থাকে? তোমার হয়েছে
কি? আপসে জানিয়েছ?

—জানিয়েছি।

—বেশ করেছ। আমি যাবার সময় ডাঃ
যেথেকে বলে যাচ্ছি যে, ওব কিছু হয়
নি।

অসীমা বললে, তা বলবেন বৈকী।
আর কিছু করবেন না পারেন, বাড়ি
ফেরবার পথে আমার ওই উপকারিট করে
থাকেন। বসুন, পালাবেন না। আমি
আসছি।

হাত-মুখ ধুয়ে অসীমা ঘরে এসে
বসল। নলিনী তখন সুযোগ পেয়ে
ডাঃ মোষের হাতবুঁটা ডাঃ মহলা-
নবীশকে শোনাচ্ছিল। অসীমাকে
হাসতে দেখে ডাঃ মহলানবীশ ব্যস্তভাবে
বললেন, অসীমা, তুমি শুলে পড়। নলিনী
একটা কম্বল ওর গায়ে চাপিয়ে দাও।
ওকে ধর, টলছে দেখছ না।

অসীমা হাসতে হাসতে বললে, দিন
পেয়েছেন, ঠাট্টা করুন।

—এটা কি ঠাট্টা হল?

—না তো কি হল? একটা টেল-
ফোন তোমার স্নায়ুশিরা খনন করে
উঠেছে। সেই কথাটা বলতে গেলে ঠাট্টা
হয়?

—হয়। দেখুন, ওই লোকটিকে আমি
স্বপ্না করি। মানব হিসেবে ও এত ছোট।
ওর সমস্ত প্রতিভা সম্বন্ধে সেই লোকটার
লোভের বস্তু হওয়া যে কি শাস্তি, তা
আপনি বুঝবেন না। তাই ঠাট্টা করছেন।
বলতে বলতে অসীমা উত্তেজিত হয়ে
উঠল।

ডাঃ মহলানবীশ অপ্রস্তুত। কি করে
যে অসীমাকে সাস্থ্য দেবেন, ভেবে
পেলেন না। নলিনী ভাড়াতাড়ি তাঁর
সাহায্যে এগিয়ে এল।

বললে, তুমি কাদছ দিদিমণি? কিন্তু
এ তো হাসিরই ব্যাপার। হাসিরও নয়,
আরশুলা বর্ষন গায়ের ওপর উড়ে আসতে
যায়, তখন সেটা আর হাসির ব্যাপার
থাকে না। মেঘের ব্যাপার হয়ে ওঠে।

অসীমা চাপ করে বসে রইল। ডাঃ
মহলানবীশ উঠতে উঠতে বললেন, তাহলে
আজ আমি আসি।

নলিনী ভাড়াতাড়ি তাঁকে বাঁধা দিয়ে
বললে, উঠবেন না। আমার চা হয়ে
এসেছে। পাঁচ মিনিট বসুন।

বিশ্বতোষ অতীদীন পরে হঠাৎ কেন
যে অসীমাকে একখানা চিঠি দিল, তার
কারণ সেও বলতে পারে না। যখন সে
চলে যায়, তখন অসীমার সম্বন্ধে তার
মনে বিশেষ হাড়া আর কিছু ছিল না।
সেই বিশেষ দিন-রাতি তার হৃদয়ে

স্ট্রীমের মত ফুটত। তার উত্তীর্ণ হওয়া
এক মুহূর্ত শান্তি পেত না। তার পরে
বিয়ে করলে। তার ফলে তার মনটা
অন্যমনস্ক হওয়ার একটা উপলব্ধি
পেল।

বিশ্বতোষ এই বিবাহ ভালবেসে
করে নি। ভালবেসে বিবাহ করার ওপর
তার বিক্ষোভ জন্মে গিয়েছিল। করুণা
উচ্চশিক্ষিতাও ছিল না। বিশ্বতোষ
সকালে হাসপাতাল যেত। সেখান থেকে
বেরিয়ে রোগী দেখতে যেত। এর মধ্যে
একবারও তার অসীমাকে মনে পড়ত না।
সাঁভা কথা বলতে কি, করুণাকেও মনে
পড়ত না।

বিয়েটা হঠাৎ হল। এত ঠোং যে,
যখন সে বর সেজে বন্ধু-বান্ধবদের
নিয়ে বিবাহ করতে যাচ্ছে, তখন সে
নিজের বিশ্বাস করতে পারছিল না যে,
সে বিয়ে করতে যাচ্ছে। অসীমার সঙ্গে
তার বিবাহ হিন্দু মতে হয় নি।
খ্রীষ্টান মতেও না। অত্যন্ত সতর্কভাবে
রোজিন্সি করে। দু'জনে দু'টি দু'টি
চারটি বন্ধু নিয়ে বোজিন্সি
অফিসে গিয়েছিল। সেখান থেকে
রোজিন্সি করে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল
যায়। হুজনে খাওয়া-দাওয়া কবে নিজের
নিজের বাড়ি ফেরে।

এটা শ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ বটে,
কিন্তু হৈ চৈ কম হয় নি। কনের বাড়ির
একপ্রস্থ ভূরিভোজন, তাবপরে বরের
বাড়িতে আর এক প্রস্থ। বিশ্বতোষ
ধুমধামের খুব ভক্ত নয় কিন্তু এই
ধুমধামটা তার মন থেকে অসীমার
ছবিটা মুছিয়ে দিল। প্রথম পক্ষের
বিবাহটা বিশ্বতোষ মোটেই গোপন
করতে চায় নি। ফুলশয্যার রাতে তার
প্রথম প্রশ্ন, 'তুমি শুনচ আমাব আর
একটা বো আছে?'

করুণা প্রথমটা চমকে উঠল। কথাটা
সে শোনে নি। তার মনে তার বাড়ির
লোকজন এ কথাটা শুকে বলতে চায়
নি। সে অশাক হয়ে বিশ্বতোষের দিকে
চোরে রইল।

বিশ্বতোষ ব্যাপারটা বুঝল।
বললে, আমি কিন্তু তোমার বাড়ির



লোকদের সমস্ত কথা আগেই বলেছি।
তারা কথাটা তোমার কাছে গোপন
করলেন কেন বুদ্ধলাম না। বোধ করি,
তোমার মনে একটা ধাক্কা লাগবে বলে।
তারপর আদ্যপ্রান্ত সমস্ত কথা

করুণাকে বললে। বলা শেষ হলে হৈপে
জিজ্ঞাসা করলে, ভয় করছে? করুণা
প্রথমে চুপ করে রইল। তারপর বিশ্ব-
তোষের জেদাজেদিত্তে স্বীকার করল,
হ্যাঁ, ভয় করছে।

বিশ্বতোষ কিছুক্ষণ চুপ করে
রইল। তার মুখে স্পষ্ট একটা বেদনার
ছায়া পড়ল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে-
বলল, জানি না কাজটা ভালো করলাম
কি মন্দ করলাম। কিন্তু তোমার কাছে
আজ আমি অঙ্গীকার করছি, যাই কেন
হোক না তোমার কাছে আমি কখনও
প্রতারণা করব না।

সে কথা আজ পর্যন্ত রক্ষা করে
এসেছে। এই কব্জসর অসীমার সঙ্গে
কোন সম্পর্ক রাখে নি।

কিন্তু অসীমাকে এতদিন পরে কেন
সে চিঠি লিখতে গেল? অসীমার
জীবন এল সহজ সরল ভাষায় যেন অস্প-
পরিচিত কেউ কাউকে লিখেছে। অনু-
তাপ নেই, ক্রোধ নেই, অভিমান নেই,
যেন প্রাপ্ত স্বীকার মাত্র। চিঠিখানা যেন
বিশ্বতোষের মুখে চাবুক মার।

বিশ্বতোষ নিজেকে সাময়িক দিলে
যে, সেও একঘানা মামুলী চিঠি লিখে-
ছিল। পুত্রের জন্ম সংবাদ দিয়ে। এটা
এমন কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু সত্যি
কি তাই? তার মনের পিছনে কি আর
কিছুই ছিল না? বিশ্বতোষের মনে
হল কেন যে, খবরটি অসীমাকে দেওয়া
দরকার? তার মন প্রশ্ন করে নি, কোন
উত্তরও তৈরী করে নি। এককথায়
বিনা তর্কে যেন মেনে নিয়েছিল যে,
অসীমার এই নবজাত সন্তানের মা।
আর কাউকে না হোক, তাকে এই
খবরটা দেওয়া দরকার। এবং তার
বিশ্বাস অসীমার চিঠিখানা ওইভাবেই
গ্রহণ করেছিল। যদিচ তা করে নি।

বস্তৃত অসীমা কিছুই ভাবে নি।
একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে চিঠিখান
এক পাশে ঠেলে রেখে দেওয়াই তার
উচিত ছিল। তাও সে করে নি! আসলে
ব্যাপারটা হয়েছিল, দু'জনে দু'দুয়ে
আছে। তার বলে বিরোধের বিষ কারও
মনেই তেমনভাবে দানা বাঁধতে পারে
নি।

বিয়ের পর তিন-চারমাস কেটে
গেল। করুণাকে বেশ খুশী খুশীই
মনে হয়। করুণাদের যে সমস্ত নিকট
আত্মীয় এই মিতব্যয়ী পক্ষের বিবাহে
আপত্তি করেছিল, তারাও নিজেদের
ভুল স্বীকার করলে। প্রথম প্রথম তারা
ভেবেছিলেন, করুণা সেই বিবাহের কথা
জানে না বলেই খুশী। কিন্তু তাবপর
যখন বুদ্ধিতে পারলে যে, করুণা সমস্ত
কথা জানে এবং জেনেও খুশী, তখন
তারা অবাক হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে
বলাবলি করলে, সুখ ভাগ্যের কথা।
করুণার ভাগ্য ভাল।

একদিন আকাশে খুব কালো হয়ে
মেঘ ঘনিষে এল। বৃষ্টি আসল।
করুণার হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে,
বিশ্বতোষ কয়েকমাইল দূরে শহরের



-এটা কি ঠাট্টা হল?

শৈলেশ দে-র

আগ্নি স্ফোটাঘ বর্নাহ

প্রথম পর্ব : পনের টাকা : দ্বিতীয় পর্ব : পনের টাকা

এই শতাব্দীর সূচনাতেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক রণমাঠে যে আগুন জ্বলবে উঠেছিল, সেই আগুন বাংলাদেশের চোখের ছাড়াই ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র ভারতে। তারপর সেই আগুন ভারতের সীমান্তে পেরিয়ে জ্বলবে উঠলো সুদূর বালিনে, সিঙ্গাপুরে এবং.....

দ্রষ্টব্য : প্রতি খণ্ডের দরুন আগ্নেয় পনের টাকা পাঠালে ভি. পি. খরচ লাগে না।

এই লেখকের আর একটি কালজয়ী গ্রন্থ :

শপথ নিলাম ৫

বিখ্যাত বিপ্লবী ছপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের

ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব

“...লেখক নিজে একজন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী, বিপ্লবীদের সাহচর্যেই তাঁর জীবন কেটেছে।...তিনি এই বিরাট গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে বাংলা সাহিত্যের এবং বর্তমান যুগের ভারত-ইতিহাসের একটি বড় অত্যাশ্চর্য করেছেন।...এমন সহজ সরললিত ভাষায় তিনি নিজের অনুভূতি দিয়ে বিবৃত করেছেন যে, একবার পড়তে আরম্ভ করলে চিত্তাকর্ষক উপন্যাসের মত উহা শেষ পর্যন্ত না পড়ে তৃপ্তিলাভ হয় না।”—প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

দাম : আঠারো টাকা মাত্র

লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের

ইনক্কার জিন্দাবাদ

...হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে কত বীর যে প্রাণ দিলেন দেশ-মাতৃকার মুক্তি-কামনায় আমরা তাঁদের কজনকে চিনি? তাঁদের সেই রক্ত-রঞ্জিত জীবনোৎসর্গের কী-ইবা জানি আমরা? এইসব বীর সেনানীর মধ্য থেকে একজনের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম বেরিয়েছিল—“ইনক্কার জিন্দাবাদ” ধ্বনিটি...প্রখ্যাত লেখক লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের লেখনী থেকে বীরশ্রেষ্ঠের জীবন-কাহিনী শুনতে পাবেন...যা গল্পের চাইতেও রোমাঞ্চকর। ...অথচ সত্যিকারের প্রত্যক্ষ ঘটনা।...স্বাধীনতা আন্দোলনের এ-এক অপূর্ণ জীবনালেখ্য।

দাম : সাত টাকা

বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেনের

বক্সার পরে দেউলী

বাংলার বিপ্লবী তরুণদল সৈয়দ দুর্জোদা বক্সা দুর্গে বন্দী। তাতেও নিশ্চিন্ত নয় ইংরেজ সরকার। তাই তাদের দলে দলে পাঠানো হল রাজপুতানার মরুভূমিতে অবস্থিত সুদূর বেউলী বন্দী নিবাসে। বাংলার যুবশক্তি কি এতটুকু পিছিয়ে গিয়েছিল তার ফলে! সেই রক্তঝরা কাহিনী...লিখেছেন বক্সা ও দেউলী ক্যাপ্টেন বন্দী বিপ্লবী নায়ক নিকুঞ্জ সেন।.....

দাম : পাঁচ টাকা

রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : : ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

বাইরে একটা গ্রামে রোগী দেখতে গেছে। তার বৃষ্টি হঠাৎ কেঁপে উঠল। এই বড়-বৃষ্টিতে যদি বিশ্বতোষ মাঠের মধ্যে থাকে, তাহলে ভয়ানক বিপদ ঘটতে পারে। সে ছুটফুট করতে লাগল। একবার বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তার দু'দিকটা বেধে, আরার ভিত্তরে চলে যায়।

এমন সময় বৃষ্টি নামল। প্রথমে বড় বড় করে ক ফোঁটা, তারপরে মুষল-মায়ে বৃষ্টি।

ভয়ে করুণা কেঁদে ফেললে। দাই ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে, কি হল?

করুণা কাঁদতে কাঁদতে বললে, চন্দ্রখিস না কি হল?

দাই এদিক-ওদিক চাইলে, কিছু দেখতে পেল না।

করুণা বললে, সাহেব বাইরে রোগী দেখতে গেছেন। কোন একটা গায়ে যে বৃষ্টি নামল, এ বৃষ্টিতে যদি তিনি মাঠে থাকেন, তাহলে ত' সর্বনাশ।

দাই তথ্যটি বিপদটা বুঝতে পারলে না। বিস্মিতভাবে বললে, মাঠে থাকবেন কেন?

করুণা রেগে বললে, মাঠে থাকবেন কেন? মাঠে পড়ে গেলে করবেন কি?

এমন সময় একটা মোটর এসে বাড়ির দরজায় দাঁড়াল।

মোটরের হর্ণের শব্দে করুণার বুঝতে ব্যাকি রইল না, কে এল। চোখের জল লুকোবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু দাই সব কথা বিশ্বতোষকে বলে দিল : আপনি বর্ষাকালে গায়ে রোগী দেখতে যাবেন না, সায়েব।

বিশ্বতোষ বিস্মিতভাবে মৃদু হেসে বললে, কেন বলত?

—না সায়েব, বর্ষাকালে পানি-উর্নি আসে। তো দিদিমণি ভয়ে মরেই পড়ে থাকবে।

বিশ্বতোষ বললে, তাই হবে। বরী রমণী কোথায়?

হাঁগতে শোওয়ার ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে দাই সরে গেল।

বিশ্বতোষ ঘরে ঢুকে দেখলে, বিছানায় আপাদমস্তক একখানি চাদরে ঢাকা দিয়ে করুণা ভয়ে কিংবা হাসিতে, কাঁপছে।

বিশ্বতোষের একখানি হাত তার গায়ে পড়তেই সে তড়াক করে লাফিয়ে বসে পড়ে হাসতে হাসতে বললে, তুমি দাই-এর কথা শুনেই নাচছ। ওটাকে কাল আমি তাড়াবে।

বলেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

তুমি রাগে কি দুর্যোগ! যেমন মেঘের ডাক, তেমনি বাতাসের আত-নাদ! আর, তেমনি বর্ষা! করুণার ঘুম এল না। মেঘের গর্জনে বারে বারে ঘুম ভেঙে যায়। তার নিজের চোখেও

ঘুম নেই, বিশ্বতোষকেও ঘুমকে ঘেঁষে না।

একথা সে কথার পরে বললে, তুমি দিদির গল্প করো আমি শুন।

বিশ্বতোষ অবাক হয়ে, জিজ্ঞাসা করলে, দিদি আবার কে?

করুণা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললে, ন্যাকা সেজো না। বলো।

বিশ্বতোষ দিদি কে সত্যিই বুঝতে পারল না। বললে, দিদি কে আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে পারছ না?

—না। করুণা মূঢ়াচি হেসে বললে, অসীমাকে জানো না? তিনিই তো আমার দিদি।

বিশ্বতোষ বললে, সে কথা আর একদিন বলব। আজ নয়। রাত অনেক হয়েছে। ঘুমোও।

বলে নিজেই পাশ ফিরে, শুয়ে।

ডাঃ ঘোষকে নিয়ে অসীমা মহা মৃদুশিকলে পড়ল। হাসপাতালে বেথানে অসীমা যাবে ডাঃ ঘোষ তার পাশে পাশে চলেবেন।

একদিন অসীমা থাকতে পারল না। সুযোগ পেয়ে ডাঃ ঘোষকে বললে, ডাঃ ঘোষ, আমি এ চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি। শুনছেন রাখছেন?

ডাঃ ঘোষ আকাশ থেকে পড়লেন। ধতমত খেয়ে বললেন, ছেড়ে দিচ্ছেন? কই শুনিনি তো। এখানে, কোন অসুবিধা হচ্ছিল? বলুন আমি কি করতে পারি?

অসীমা বলল, আপনি ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন। সত্যিকথা বলতে কি অসুবিধাটা আপনাকে নিয়েই।

—আমাকে নিয়ে! কি রকম?

অসীমা বললে, রকমটা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। আপনি আমার জীবন আভিষেক করে ছুঁলেন।

ডাঃ ঘোষ গুম হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, এজন্যে যদি হয়, তাহলে আপনি যাবেন না। আমার বা করবার আমি করব। অর্থাৎ আর আপনাকে বিরক্ত করব না।

বলে দুঃস্থ দৃষ্টি করে পা ফেলে চলে গেলেন।

অসীমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। কিন্তু কয়েকদিন পরে অন্য বিদ্রাট। অসীমার সঙ্গে যারা কাজ করত অপ-দিনেই তারা বুঝতে পারলে ডাঃ ঘোষ আর অসীমার পিছ পিছ ঘোরেন না।

একজন তো জিপোসই করল, ঘোষের সঙ্গে তোমার কি হয়েছে হে?

অসীমা অবাক হয়ে বললে, ডাঃ ঘোষের সঙ্গে! আমার! কিছু হয়নি তো!

কোয়টি আর কিছু বললে না। মূঢ়াচি হেসে চলে গেল।

আর কেউ কিছু বললে না বটে কিন্তু অসীমা বুঝলে, হাসপাতালে সহকর্মীদের কাছে তার সম্মান অনেক কমে গেছে।

চীফের প্রিয়পাত্রের একটা সম্মান আছে। অফিসারদের পক্ষে সটান চীফের কাছে গিয়ে কাজ হাসিল করে নিয়ে আসার অনেক অজুবিধা আছে। চীফের প্রিয়পাত্রের মারফৎ সাধারণতঃ তারা সেই সব কার্য উদ্ভার করেন। প্রিয়পাত্রের সাহায্যে এইখানেই। কিন্তু এই মর্মানার থেকে মুক্ত হয়ে অসীমার কিন্তু দুঃস্থ হল না। বরং একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে। ডাঃ মহলানবীশের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ স্বতন্ত্র ছিল। তিনি অন্যায় আদার কোন ক্ষেত্রেই বরদাস্ত করতেন না। এবং প্রত্যেকেরই ন্যায়সঙ্গত আদার মজুর করতেন। তাঁর পক্ষাপক্ষ ছিল না। সে জন্যে অসীমাকে কখনই কারণ সুপারিশ চীফের কাছে বহন করে নিয়ে যেতে হত না।

ডাঃ মহলানবীশ এসে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে?

অসীমা ছবাব দিলে, কিসের লড়াই?

—মর্মানার লড়াই। অসীমা হেসে বললে, না স্যার, লড়াই-টুড়ায়ের মধ্যে আমি নেই।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, কিন্তু আমি শুনলাম, তুমি লড়াই। এবং ভাল লড়াই করছ।

—ও কথা এখন বলবেন না। সব ভাল যার শেষ ভাল। জানেন, আমাকে দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে একে একে সরিয়ে আনা হচ্ছে।

—হোক না। মাইনে ত' আর কমছে না।

অসীমা হেসে বললে, আপনিও তাই বলেন?

—সবাই তাই বলবে।

—বলুক। কিন্তু সেইটেই সমস্ত শক্তি নয়। শৃঙ্গ অর্থের জন্যেই আমরা চাকরী করছি না। বিশেষ করে ডাক্তার-দের সম্পর্কে এ কথাটা বলা যায়।

ডাঃ মহলানবীশ ওর মূখের দিকে কিছুক্ষণ নির্বাক চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার এই উত্তির সত্যতা আমিও অস্বীকার করি না। বেথানে ন্যায়-নীতি কাজ করে, সেখানে এইটেই সত্য।

আর যেখানে তা করে না?

ডাঃ মহলানবীশ মূঢ়াচি হেসে বললেন, সেখানে কি তা তো আগেই বলেছি। তোমার মন আজ উত্তেজিত হয়ে আছে। চল একটু ঘুরে আস।

রোড-গোড়ের ওপর দিয়ে যখন ডাঃ মহলানবীশের গাড়ি চলছিল, অসীমা অন্যমনস্কভাবে ওদিকে চেয়েছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করলে, ডাঃ মহলানবীশ যেন হাত তুলে কাকে নমস্কার করলেন। দুটি-গাড়িই খুব জোর চলছিল। ডাঃ মহলানবীশ যে কাকে নমস্কার করলেন, অসীমা তা লক্ষ্য করে নি।

জিজ্ঞাসা করলে, কে উনি?

ডাঃ মহলানবীশ হাসি চেপে উত্তর দিলেন, চিনতে পারলে না?

—না, আমি ঠিক খেয়াল করি নি।

ডাঃ মহলানবীশ গম্ভীরভাবে বললেন, ডাঃ ঘোষ।

—কি সর্বনাশ!

অসীমার মূখ্য শূন্য হয়ে গেল। কিন্তু পরমুহুর্তেই সে অট্টহাস্য ফেটে পড়ল।

ডাঃ মহলানবীশ জিজ্ঞাসা করলেন, হাসছ কেন?

অসীমা হাসতে হাসতে বললেন, হাসব না? কতবড় হাসির ব্যাপারটা শুধু, আমাকে-আপনাকে এক গাড়িতে ডাঃ ঘোষ দেখে ফেললেন।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, তথাপি ব্যাপারটা হাসির নয়।

অসীমা নিরুত্তরে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, কোন পুরুষকেই অনুগ্রহ করবার আগে পর্বত মেয়েরা তার সম্বন্ধে যথেষ্ট লক্ষ্যশীলা থাকে। অনুগ্রহ করার পর সেই লক্ষ্যের চিহ্নও থাকে না।

—কেন এমন হয় বলতে পারেন?

—না।

—আমার মনে হয়, মেয়েরা ঘাটের নৌকা পড়িয়ে দিয়ে আসে। ফেরবার আর উপায় রাখে না বলেই এ রকমটা হয়।

—আর পুরুষেরা ফেরবার পথ খুলে রেখে আসে, এ কথা ভূমি বল?

—হ্যাঁ। সমুদ্রের ধারের কাছে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ, একটু দূরে গেলে সমুদ্র শান্ত। মেয়েদেরও গোড়ার দিকে যত লক্ষ্য-সন্স্কাচ, সেটুকু পার হলেই আর ঢেউ নেই। শান্ত সমুদ্র-জল। বরুতে পারছেন?

—না। তারপরে একটু থেমে ডাঃ মহলানবীশ বললেন,—চল, চাঁদপাল ঘাটের অদূরে গাছতলায় যে বৈষ্ণুগোষ্ঠে প্রথম দিন বসেছিলাম, সেই বৈষ্ণুগোষ্ঠে গিয়ে বসি।

অসীমা আপন মনেই বললেন, সেই বৈষ্ণুগোষ্ঠা আর নেই।

—নেই?

—না। আমি দেখেছি, কিছুই থাকে না।

ডাঃ মহলানবীশ হঠাৎ চিৎকার

করে বললেন, ওই সেই বৈষ্ণুগোষ্ঠা খালি আছে।

অসীমা হেসে বললে, ওটা সেটা নয়।

ডাঃ মহলানবীশও হেসে বললেন, সেটা নয় ত' কোনটা?

—অন্য একটা। সেটা সেইদিনই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, ওরা কি রোজ রোজ বৈষ্ণু বদলায়? তাহলে আর ভাবনা থাকত না।

গাড়িখানা সেই বৈষ্ণুর কাছে এসে গড়ল। নদীর জলে সূর্যাস্তের সিন্দুর রেখা প্রায় মুছে এসেছিল। গাড়ি থেকে নেমে বৈষ্ণুগোষ্ঠায় বসতে বসতে ডাঃ মহলানবীশ বললেন, সেই বৈষ্ণুগোষ্ঠা। আঃ, সেই বৈষ্ণুগোষ্ঠা।

অসীমা হেসে বললে, সেই বৈষ্ণুগোষ্ঠাই?

—হ্যাঁ। এই দেখ, বৈষ্ণুর ওপরে সেই যে কারা ছুরি দিয়ে কেটে নিজেদের নাম লিখে গিয়েছিল, সেটা এখনও রয়েছে।

অসীমা বললে, আপনি বড় ভাগ্যবান।

—কিসের?

—পূরনো জিনিষ খুঁজে পান। আমি পাই না। যা হারিয়ে যায়, একেবারেই হারিয়ে যায়।

অসীমার কণ্ঠস্বরে কি যেন একটা হিল। ডাঃ মহলানবীশ চমকে উঠলেন। অসীমা সেটা লক্ষ্য করলে বলে মনে হল না।

বাড়ি ফিরে এসে অসীমা একখানি চিঠি পেলে, শ্বশুরের চিঠি। হস্তাক্ষর সুন্দর, কিন্তু কাটা।

অসীমার চিঠি কম আসে। আত্মীয়-স্বজন সবই প্রায় কলকাতায়। সুতরাং চিঠির আদান-প্রদান বড় একটা হয় না। খুলবার আগে চিঠিখানি উল্টে-পাল্টে দেখলে, অপরিচিত হস্তাক্ষর। খুলে দেখলে, করুণার চিঠি। করুণা তাকে কখনও চিঠি লেখে নি। এমন কি তার নামটাও দৈবাৎ জানতে পেরেছে। চিঠিখানা সে পড়তে লাগল। চিঠির বারো আনাই খোকনের কথায় ভর্তি। এবং

ভাষাটিও এমন যে, পড়লে মনে হয় যেন উভয়ের কতকালের পাক চিঠিখানি (সীমা একবার-দুবার তিনবার পড়ল। বড় ভাল লাগল।) নিজে সে খালি বিশারদ। কিন্তু শিশুদের সঙ্গে পিঁচির কয়েক মূহুর্তের জন্যে। অন্যপক্ষে শিশুকে ভূমিষ্ট করিয়েই শুধু শেষ। কোন একটা শিশুর কথা শুনেতে হয় না। তখনই তার জীবন লিখতে বসল। লিখলে করুণার চিঠিখানি পড়তে অসীমার খুব ভাল লেগেছে। করুণা মাঝে মাঝে চিঠি দেয় না কেন? খোকনের একটা ফটো যেন পাঠায়। অসীমার খোকনকে দেখতে বড় ইচ্ছা করছে। যদি কখনও কোন কাজে করুণা কলকাতায় আসে, খোকনকে যেন দেখিয়ে নিয়ে যায়। আবেল-তাবেল অনেক কথার মধ্যে অসীমা কোথাও চিঠিতে বিশ্বতোষের নাম উল্লেখ করলে না। শুধু উপসংহারে লিখলে 'তোমরা আমার ভালবাসা জেনো'।

করুণা চিঠি পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। হাসপাতাল থেকে বিশ্বতোষ ফেরা মাত্র গদগদকণ্ঠে বললে, দিদি আমাকে চিঠি দিয়েছেন, জান?

বিশ্বতোষ বললেন, দিদি কে?

করুণা বললে, বার বার দিদি কে, দিদি কে বল কেন? আমার ত' একটাই দিদি। দেখ গে, কি সুন্দর চিঠি লিখেছেন। বলে চিঠিখানি বিশ্বতোষের হাতে দিল।

বিশ্বতোষ চিঠিখানি উল্টেপাল্টে বেখে সেটি চৌবলের ওপর নামিয়ে রাখলে। বললে, পরের চিঠি আমি পড়ি না।

দুজনে খেতে বসল। করুণার প্রশ্ন অজ্ঞান ধারায় বিশ্বতোষকে বিধ্বস্তে লাগল :

—হ্যাঁগা, দিদি কি খুব বড় ডাক্তার?

—খুব বড় ডাক্তার।

—তোমার চেয়ে ত' বড় নয়?

—হ্যাঁ, আমার চেয়েও বড়।

—রোজগারও তেমন বেশী করে?

—সে তো নিশ্চয়।



—তোমরা দু'জনে ত' বেশ ছিলে, হঠাৎ ছেড়ে চলে এলে কেন?

—দু'মুণ্ডি আর কাকে বলে?

—যা বলেছ। আমি কি তোমার যোগ্য হয়েছি? দিদির কথা ভাবলে তোমার জন্যে দুঃখ হয়।

—দুঃখ করে আর কি করবে বল? যা হবার তা হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বতোষ আব সহ্য করতে পারছিল না। আশ-থাওয়া করেই উঠে পড়ল। এতক্ষণে করুণার খেয়াল হল, বিশ্বতোষ খেলে না। কিন্তু বদ্ব্যভূতে পারলে না, কেন খেলে না? শুধু ব্যস্তভাবে বলে উঠল, ওকি, তুমি খেলে না? রাগা কি ভাল হয় নি? এ ঠাকুরটা ভারী অনামনস্ক। একে দিয়ে চলবে না।

বলে সেও উঠে পড়ল।

ডাঃ মহলানবীশ অকৃতদার। বিবাহ কবার সময় পান নি। ঘোবনের অনেকখানি অংশ তাঁর ইউরোপে অধ্যয়ন এবং জ্ঞানানুশীলনীতে কেটেছিল। চাল-চলনে সাহেব, কিন্তু স্বভাবে বাঙ্গালী।

দেখা যায়, ব্যারিস্টাররা যত সহজে সাহেব হন, ডাক্তাররা তত সহজে হতে পারেন না। তার কারণ বোধহয় এই যে, ব্যারিস্টারদের যে কাজ, সেটা ইংরেজদের কাজ। কিন্তু ডাক্তারদের যে কাজ, সে কাজ কোন একটি বিশেষ দেশের কাজ নয়। সে কাজ বিশ্বজনীন। দীর্ঘকাল ইউরোপে কাটিয়ে ডাঃ মহলানবীশ চাল-চলনে পাকা সাহেব হলেও সাহেবী মেজাজ পান নি। যেটুকু পেয়েছিলেন, এদেশে কিছুদিন থাকার ফলে তাও নষ্ট হয়ে গেছে।

গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে তিনি অসীমাদের বাড়িতে আর উলেন না। অসীমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন নিজের বাড়িতে। তাঁর মনটা ভারী হয়ে উঠেছিল। চিন্তাটা, কি করে অসীমাকে ডাঃ ঘোষের বিরুদ্ধে একটু সাহায্য করা যায়। চাকরীর হুজা এই যে, একবার চাকরী থেকে অবসর নিলে অতিবড় জ্বরদস্ত অফিসারও অসহায় হয়ে পড়েন।

ডাঃ মহলানবীশ ভেবে দেখলেন, তাঁর করবার কিছু নেই। তিনি ডাঃ ঘোষের কিছুই করতে পারেন না। তিনি বড়জোর ডাঃ ঘোষের সঙ্গে এ বিষয়ে বন্ধুভাবে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু ডাঃ ঘোষ যে ধরনের মানুষ তাতে বন্ধুত্বের মর্যাদা তিনি রাখবেন বলে বিশ্বাস হয় না। কদিন তিনি হাস-পাতাল গেলেন। ডাঃ ঘোষের সঙ্গে দেখাও হল। তিনি খুব আপ্যায়িতও করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডাঃ ঘোষের যে পরিচয় ডাঃ মহলানবীশের জানা,



বিশ্বতোষ উল্টোপাল্টে চিঠিগুলো দেবল

তাতে তিনি কিছু বলতে সাহস করলেন না।

আশ্চর্য এই যে, ডাঃ ঘোষ একবার ইঞ্জিতেও জিজ্ঞাসা করলেন না, যে মহিলাটিকে সেদিন গাড়ের মাঠে তিনি দেখেছিলেন, তিনি কে? জিজ্ঞাসা করলে যে ডাঃ মহলানবীশের সন্নিবিধ হত, তাও নয়।

সেদিন বাধ্য হয়ে ডাঃ মহলানবীশকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়।

ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ হিসেবে ডাঃ মহলানবীশের নাম-ডাক যথেষ্ট। চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পূর্বে তিনি প্র্যাকটিশ করতেন। অবসর নিয়েও তাই করতে লাগলেন। এবং দৃষ্টিচ্যুতায় অনেক বিনীত রজনী যাপন করে যখন কুল-কিনারা পেলেন না, তখন ভাবলেন অসীমাকে তাঁর সহকারী করে নেবেন। এ পর্বন্ত ভেবে কথাটা একদিন অসীমার কাছে পাড়লেন। বললেন, অসীমা, কি করি বল ত?

—কিসের?

—বয়েস হচ্ছে, শরীর ভেঙে যাচ্ছে, প্র্যাকটিশ করতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

অসীমা বললে, শরীরটা দেখান।

ডাঃ মহলানবীশ ব্যঙ্গভরে হেসে বললেন, তুমিও কেমন। এ বয়সে আর শরীর দেখাব কি? বরং আমি ভাবছিলাম, অন্য কথা।

—কি কথা?

—একটি বিশ্বাসী সহকারী যদি পাই, তাহলে খুব সন্নিবিধ হয়।

—এতবড় কলকাতা শহরে একটি বিশ্বাসী লোক পাওয়া কি এতই কঠিন?

—কঠিন কিছু নয়। ধর, তোমার মত একজন সহকারী যদি পাওয়া যায়। অসীমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাঃ মহলানবীশের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তাঁর মনের ভিতর কি চিন্তা কাজ করছে জানবার জন্যে।

ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব।

—কর।

—এত লোক থাকতে আপনার আমার কথা মনে হল কেন? আপনি কি সন্দেহ করছেন, আমার চাকরীটা থাকবে না?

খতমত খেয়ে ডাঃ মহলানবীশ

বললেন, না, তা কেন, তা কেন। চাকরী
কি অতঃসহজে যায়?

—তবে?

—তবে আর কি? তোমার মতন
একটা লোক পেলে ভাল হয়, সেই কথা
বলছিলাম। আমার কথার মধ্যে কোন
উদ্দেশ্য খোঁজবার চেষ্টা করো না।

বলে ডাঃ মহলানবীশ হাসতে
লাগলেন।

কিন্তু অসীমা হাসলে না। গম্ভীর-
ভাবে কি চিন্তা করতে লাগল।

রাগে নলিনীর সঙ্গে অসীমা এ
বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল।
বললে, নলিনীদি, তুমি কি বল?

—কিসের?

অসীমা বললে, বলছি। আজ ডাঃ
মহলানবীশ এসেছিলেন। বলতে পার,
একটা প্রস্তাব নিয়ে। আমার মনে হয়
উনি আশঙ্কা করছেন, আমার চাকরী
বেশী দিন নয়। সেই ভেবে উনি বলতে
এসেছিলেন যে, ঠিক শরীরটা অশক্ত হয়ে
যাচ্ছে, আমার মতন একজনকে সহ-
কারী পেলে প্র্যাকটিশটা ভাল করে
করতে পারতেন।

নলিনী বললে, তুমি 'না' বল নি।
ত' দিদিমণি?

—না ঠিক বলি নি। তবে, বিশেষ
সাদৃশ্য-শব্দও দিই নি।

—সাদৃশ্য দাও নি কেন? তোমার
বিশ্বাস আছে, চাকরী যাবে না, এই ত'?

—চাকরী থাকা না থকবার কথা
আমি জাবি নি। আমার মনে ডাঃ
মহলানবীশের কাছ থেকে আরও বেশী
উপকার নেওয়ায় আপত্তি আছে।
প্রকাশ্যে সে কথা বলি নি। তবে
উৎসাহও দেখাই নি। তাতে তিনি যা
বুঝে থাকুন।

নলিনী চুপ করে রইল। তার
বিশ্বাস আছে ঠিক সময়ে এ বিষয়ে সে
যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারবে।

রাগে শূন্যে অসীমার ঘুম আসে না।
শূন্য ডাঃ মহলানবীশের কথাগুলো
উত্তেজিত ভাবে। তিনি বলে-
ছিলেন, 'চাকরী কি অতঃসহজে যায়?'
যায় না ঠিকই, তবে উপরওয়ালার
অফিসার চাকরীক্ষেত্রে নানা অসুবিধার
সৃষ্টি করতে পারে। তখন নিম্নতম
অফিসারের পদত্যাগ করা ছাড়া উপায়
থাকে না। তা পদত্যাগ করতে অসীমা
স্বপ্ন পায় না। এই দীর্ঘকালের
চাকরীতে সে যে সুনাম করেছে, তাতে
নিজের পেট চালাতে ভয় পায় না।
তেমন-তেমন বুঝলে অন্য কোথাও
চাকরী জোগাড় করবার চেষ্টাও করতে
পারে। কিংবা অন্য সরকারী হাস-
পাতালে বদলীর চেষ্টাও করতে পারে।

এই কথাটা মনে হতেই উৎসাহে সে
বিছানায় উঠে বসল। এই ব্যাপারে ডাঃ

মহলানবীশ তাকে অনেক সাহায্যও
করতে পারেন নিশ্চয়। স্থির করলে,
কাল সকালেই টেলিফোনে ডাঃ মহলা-
নবীশকে বিকেলে আসতে আমন্ত্রণ
জানাবে। তিনি এলে তাঁর সঙ্গে এ
ব্যাপারে পরামর্শ করবে।

সকালে উঠে হাসপাতাল যাবার
আগে চায়ের টেবিলে এই বিষয়ে সে
নলিনীর সঙ্গে আলোচনা করলে।
নলিনী বললে, আমিও এই রকম একটা
কথা ভাবছিলাম। চাকরী অবশ্য হামেশা
খালি হয় না, তবে হয়। এখন থেকে
তাকে তরু থাকলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।
আমার মনে হয়, ডাঃ মহলানবীশ নিজেও
তোমার কথা ভাবছেন। তিনি চেষ্টাও
করবেন।

—তাতে আর সন্দেহ কি।

অসীমা এই চিন্তা করতে করতে
অফিস গেল। যাবার আগে ডাঃ মহলা-
নবীশকে ফোন করে বিকেলে তার
বাড়িতে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালে।

অসীমা চলে যেতে নলিনী ঘর-
দোর গোছাতে বসল। তারপর বাজারের
খালিটা হাতে নিয়ে বাজারে বেরতে যাবে,
এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামল তাদের
দরজার সামনে। ডাঃ মহলানবীশের
গাড়ি। গাড়ির ভিতরে তিনি হাসতে
হাসতে বেরিয়ে এলেন।

—কি খবর বলত, নলিনী?

—কিসের খবর বলুন ত'?

—ভোরেই অসীমা আমাকে টেলি-
ফোন করেছিল।

—আসুন, আসুন, ভিতরে এসে
বসুন।

ডাঃ মহলানবীশ ভিতরে আসতে
আসতে বলতে লাগলেন, ভোরে আমাকে
টেলিফোন কোনদিন করে নি।

নলিনী হাসতে হাসতে বললে,
বিপদে পড়লে সময়ের জ্ঞান থাকে না।

—কিন্তু বিপদটা কি সেই কথাটাই
জানতে এসেছি।

—নলিনী হেসে বললে, এখন ত'
উনি নেই।

—সে ত' জেনেই এসেছি। অসীমা
নেই, তুমি আছ। তোমার সঙ্গে পরামর্শ
করবার জন্যেই এসেছি। তুমি হলে
প্রধানমন্ত্রী।

ডাঃ মহলানবীশ হা-হা করে হেসে
বললেন, বল ত' ব্যাপারখানা কি?

নলিনী বললে, আমি ঠিক জানি
না।

—চাকরীতে কোন গোলমাল দেখা
নিচ্ছে কি?

—আমি ঠিক জানি না। এখন
পর্যন্ত শুনিনি। তবে যে রকম
ব্যাপার, তাতে চাকরীতে গোলমাল বাধা
অসম্ভব নয়।

নলিনী একটু ভেবে বললে, আমার

এম. এ.

এম. এ. ইংলিশ ১১ ভল্যুম

জেনারেল এডিটর : অধ্যাপক এন. চ্যাটার্জী এম. এ. (ডবল)

এম. এ. হিষ্টি ৯ ভল্যুম

জেনারেল এডিটর : অধ্যাপক বি. ঘোষ, এম. এ.

শীঘ্রই ব্যহির হইবে

এম. এ. পলিটিক্যাল সায়েন্স ৮ ভল্যুম

জেনারেল এডিটর : অধ্যাপক এ. চ্যাটার্জী, এম. এ., এল এল বি

এম. এ. বাংলা ৮ ভল্যুম

সাধারণ সম্পাদক : অধ্যাপক এন. এন, চট্টোপাধ্যায় এম. এ. (ট্রিপল)

সম্পাদক : দীননাথ ভট্টাচার্য, এম. এ.

ল সিরিজ ৮ ভল্যুম

জেনারেল এডিটর : অধ্যাপক টি. চ্যাটার্জী এম. এ., এল এল বি

চলন্তিকা

৭, নবীন কৃষ্ণ লেন,
কলিকাতা-৯

নে হয় সেই বিষয়েই আপনাব...সঙ্গে,
খালোচনা করতে চায়।

—উ। আচ্ছা আমি তাহলে এখন
উঠলাম।

বলে ডাঃ মহলানবীশ দরজার দিকে
গা বাড়ালেন। কিন্তু তখনই আবার
ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখ নলিনী,
আমি যে এখানে এসেছিলাম তা
অসীমাকে বলবার দরকার নেই।
মুঝলে?

নলিনী ঘাড় নেড়ে জানালে, আচ্ছা।

নির্দিষ্ট সময়ে ডাঃ মহলানবীশ
এসে উপস্থিত হলেন। অসীমা 'আসুন,
ঘাসুন' বলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালে।

ডাঃ মহলানবীশ বিস্মিতভাবে বল-
লেন, কি ব্যাপার? এত সম্বর্ধনা
কিসের? আজকে আমি যেন প্রথম এ
বাড়িতে এলাম।

অসীমাও হেসে বললে, ঠিক তাই।
আপনি যেন প্রথম এ বাড়িতে আসছেন,
আমি সেই রকমই ভাবতে চাই। আসুন,
আমরা নতুন শ্লেট নিয়ে লিখতে আরম্ভ
করি।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, উত্তম।
তাই হোক। কিছুদিন পর পর নতুন
শ্লেট নিয়ে লেখা আরম্ভ করা নিশ্চয়
স্বাস্থ্যকর।

অসীমা ইতস্তত করছে দেখে ডাঃ
মহলানবীশ বললেন, আর ইতস্তত করা
কেন? আরম্ভ কর।

অসীমা নলিনীকে ডাকলে। নলিনী
এসে দাঁড়াতেই তাকে কি একটা ইশারা
করলে। সে চলে গেল। তখন অসীমা
বললে, কি নিয়ে আরম্ভ করা যাবে,
বলুন।

—বাস্। এতক্ষণ পরে আমাকেই
বলা হল কথা আরম্ভ করতে। অথচ
আমলগ্ন করছি তুমিই।

—ক্ষতি কি। কালকে আপনি যে
কথা নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন, সেই কথা
নিয়েই আরম্ভ করুন।

—কি কথা নিয়ে আরম্ভ করে-
ছিলাম?

—একজন বিপ্লবী সহকারী
পেলে আপনার কাজের সুবিধা হয়।

ডাঃ মহলানবীশ হো হো করে হেসে
বললেন, ও, সেই কথা!

নলিনী এক মেট খাবার এনে ডাঃ
মহলানবীশের সামনে রাখল। ডাঃ
মহলানবীশ বললেন, এতক্ষণে পরামর্শ
লম্বো। আমি নলিনীকে তোমার
প্রধানমন্ত্রী বলি। সেকথা যে মিথ্যে
নয়, তা নলিনী এই মুহূর্তে প্রমাণ
করলে।

লম্বা পেয়ে নলিনী পালাল।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, দেখ

অসীমা, ডাঃ মহলানবীশ তোমার চাকরী
থেকে পারেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।
তোমার চাকরী যদি কেউ থেকে পেরে
সে তুমি নিজেই। উত্তেজিত অবস্থায়
এমন কিছু করে বসতে পার যাতে তুমি
বেকায়দায় পড়ে যেতে পার। সে বিষয়ে
সতর্ক থাকবে। ডাঃ ঘোষ তোমার
উপরওয়াল, এই কথাটি ভুলবে না।

অসীমা শান্ত মেয়ের মত একমুনে
ডাঃ মহলানবীশের কথাগুলো শুনেন
থাকিল।

বললে, সেকথা আমি কখনই ভুলি
নি। আমি সব সময়েই চেষ্টা করি,
কোন অপরাধ না করতে। তবু অপরাধ
হয়ে যেতে পারে।

—হ্যাঁ। তবু অপরাধ হয়ে যেতে
পারে। সেই 'তবু'র ক্ষেত্রেই বল-
ছিলাম, আমি তোমার পিছনে আছি।

অসীমা বললে, সেই জন্যেই একটা
কথা বলছিলাম। আমাকে যদি অন্য
কোন ইস্পিটালে বদলী করতে পারেন,
তাহলে বড় ভাল হয়। আমি যথাসাধ্য
সম্মতভাবে থাকব। তথাপি অপরাধ
করে ফেলা বিচিৎর নয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাঃ
মহলানবীশ বললেন, আমি খোঁজ
ধাকব।

নলিনী এল চা নিয়ে।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, তুমি
পালিয়েছিলে কোথায়?

নলিনী লম্বিত হাস্যে বললে,
আপনার জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করতে।

চায়ের পেয়ালায় চমুক দিয়ে ডাঃ
মহলানবীশ বললেন, গুড। মুঝলে
অসীমা, এই বিপদে তুমি যদি বাঁচো ত'
নলিনীর জন্যেই বাঁচবে। ও অত্যন্ত
বুদ্ধিমতী।

লম্বা পেয়ে নলিনী আবার পালাল।

ডাঃ ঘোষ অত্যন্ত চাপা লোক।
সহজে তাঁর মনের কথা বোঝবার উপায়
নেই। অসীমা ডাঃ ঘোষের সঙ্গে কথা
বলে না। অথবা বললে কাজের কথা
এক মিনিটে শেষ করে দেয়। ডাঃ ঘোষ
অসীমার সঙ্গে কথা বলে যখন আরো
সকলে থাকে। কোনদিন তিরস্কার
করে না কিংবা পরিহাসও করে না।
ছ' মাসের মধ্যে উভয়ের সম্পর্কটা প্রায়
সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

কিন্তু অসীমা জানে, তা নয়।
সম্পর্ক সহজও হয় নি, স্বাভাবিকও হয়
নি। তাই সে পূর্ববৎ দরজা বজায় রেখে
চলে।

অসীমা লক্ষ্য করতে লাগল, আগে
যেমন কঠিন কেসগুলো তার ভাগে
পড়ত, এখন আর তা হয় না। সোজা,
মামুলী কেসগুলো তার হাতে পড়ে।
ও কিন্তু তার জন্যে দুঃখ করে না, রাগ

অভিমানও না। 'সে' মনে মনে বোঝে,
যেমন করে সে এতদিন চিন্তাকর্ষক কেস-
গুলো পেতো, এখন অন্যেরা তাই পাচ্ছে।
বিস্মৃত, এই ব্যাপারে তার রাগ করবার
কিছু ছিল না।

ডাঃ ঘোষও লক্ষ্য করছেন, অসীমার
মনে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। যতই দেখ-
ছেন কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না, ততই
হতাশ হচ্ছেন। অসীমার ওপর চাপ
কখনও শক্ত করছেন, কখনও ঢিলে
করছেন। কিন্তু ফলের কোন ব্যতিক্রম
যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত আর কোন উপায় না
পেয়ে ডাঃ ঘোষ বিশ্বতোষকে একখানা
চিঠি লিখলে। তাতে অসীমার সঙ্গে
ডাঃ মহলানবীশের সম্পর্কটা বিবৃত
করলে। লিখলে যে, শব্দ কানামুসোর
ওপর নির্ভর করে এই কথা লিখছে না,
তার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা আছে। বম্বুর
স্ত্রীর এই প্রকার আচরণ বড়ই বেদনা-
দায়ক।

উত্তর এল, প্রকৃতপক্ষে অসীমার
সঙ্গে বিশ্বতোষের কোন সম্পর্ক নেই
শব্দ পুরাতন একটা সম্পর্কের জের
চলছে। সেই জেরটুকু যে কোন
মুহূর্তে কাটা যায়। সেই চেষ্টাই
করছে।

বিশ্বতোষ এই নিয়ে অসীমাকেও
একখানা কড়া চিঠি লিখলে। সেট
পেয়ে অসীমা তেলেবেগুনে জ্বলে
উঠল। সে কড়া প্রত্যুত্তরে লিখলে যে
এ কথা বলার মূখ বিশ্বতোষের নেই।
ডাঃ মহলানবীশকে সব কথা সে বললে।
তিনি ত' খুব খুশি।

বললেন, আমি ত' আগেই বলে-
ছিলাম বিশ্বতোষের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ
করবার জন্যে। মিথ্যে কয়েকটা বছর
নষ্ট করলে।

অসীমা হেসে বললে, নষ্ট আর কি।
নষ্ট কিছুই হয় নি।

—হয় নি? না হলে তোমার কবে
বিয়ে হয়ে যেত। ঘরভর্তি ছেলেপুলে
হত।

অসীমা হেসে মরে গেল।

নলিনী এসে বললে, আমি অনেক-
দিন বলেছি ওকে এ কথা। তখন ও
রাজী হয় নি। এখন থাকে খেয়ে রাজী
হয়েছে। কিন্তু ওর ওপরে আমার
বিশ্বাস কম। যা কিছু করতে হবে,
তাড়াতাড়ি করা দরকার।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, তাড়াতাড়ি
করবে কি করে। পার উপস্থিত
আছে?

—আছেন।

—এখানেই উপস্থিত আছে, না,
টেলিফোন করে আনতে হবে?

নলিনী হেসে বললে, এখানেই
উপস্থিত আছেন। একেবারে এই
ঘরেই।

ডাঃ মহলানবীশ জিজ্ঞাসা করলেন, পাণ্ডাটী লোক কি রকম? পাণ্ডার মতই পিছল?

—এইরার দেখা যাবে, পিছল কিনা। এখন আপনার আশীর্বাদ নিয়ে নেন্সে ত' পড়া যাক।

ডাঃ মহলানবীশ হেসে বললেন, হ্যাঁ, গেলে ত' যাও। তারপরে যা করেন মা ফালী।

বিশ্বতোষের শরীরটা খারাপ ছিল। সেজন্য আজকে আর হাসপাতাল যান নি। এমন সময় রেজিস্টারী চিঠি এল।

বিশ্বতোষ অবাক হয়ে ভাবলে, রেজিস্টারী চিঠি আবার কে দিচ্ছে? সেই করে চিঠিখানা নিয়ে অবাক। বারুদের মত ফেটে পড়ল। সে চিংকারে করুণা এসে উপস্থিত।

—কি ব্যাপার?

হাতেব চিঠিখানা বিশ্বতোষের হাত থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। করুণা সেটা তুলে নিয়ে পড়ল। পড়ে সেও অবাক। অসীমার উকিলের চিঠি। দিয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যে।

করুণা বললে, এতদিন পরে বিবাহ-বিচ্ছেদ।

—মতিচ্ছন্ন আর কাকে বলে।

দু' জনে চুপ কবে ভাবতে লাগল। একটু পরে করুণা জিজ্ঞাসা করলে, কি করবে?

বিশ্বতোষ বললে, আইনের ব্যাপার। উকিলের সঙ্গে না পরামর্শ করে কিছু বলতে পারব না। আর পরামর্শ করতে গেলে ভাল উকিলের সঙ্গে করা দরকার।

বিশ্বতোষ একজন ভাল উকিলের কাছে গেল। তাকে সমস্ত কথা বললে।

সমস্ত শুনে উকিল বললেন, আপনি কি কবতে চান? ডাইভোর্স কেসটা নস্যং করে দিতে চান? কিন্তু তাহলে আপনার প্রথমা স্ত্রীকে ফিবিয়নে নিয়ে তার সমস্ত ভার নিতে হবে।

বিশ্বতোষ বললে, তা সম্ভব নয়।

—তাহলে এ কেস আপনি কনটেন্ট করবেন না। যা হবার হবে।

—কি হবার হবে?

—কিছুই হবে না। শূদ্ধ ডাইভোর্স হয়ে যাবে। অর্থাৎ সেই স্ত্রীর ওপর আপনার কোন অধিকার থাকবে না।

—সেই স্ত্রীর ওপরে এখনও কোন অধিকার নেই।

—তবে আর কি?

বাড়িতে করুণা উদগীর হয়ে বিশ্বতোষের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। বিশ্বতোষের খুশিভরা মুখ দেখে করুণা কিছুটা সাহস পেলে। সে এগিয়ে গেল।

বিশ্বতোষ বললে, উকিল আমাকে কেস চালানো নিষেধ করলেন।

—কেন?

—কেস চালিয়ে কোন ফল হবে না।

তার চেয়ে ডাইভোর্স হয়ে যাক। তার যা ইচ্ছা হয়, করুক। আমার মনে হয় সে আবার বিয়ে করতে চায়। আমার বাধা দেবার কি দরকার?

করুণা বললে, এ তোমার অনুমান মাত্র।

—অনুমান নিশ্চয়। তবে একেবারে অমূলক নয়। অসীমাদের উপরওয়াল ডাঃ ঘোষ আমার বন্ধু লোক। তিনি একখানা চিঠিতে অসীমার কীর্তকলাপ কিছু কিছু জানিয়েছেন। সেগুলো একেবারে মিথ্যে নয়। এবং তার কিছুটা সত্য হলেও আমার অনুমানও সত্য হবে। শই হোক, যে উকিলের কাছে গিয়েছিলাম, তিনি খুব বিচক্ষণ উকিল। তাঁর পরামর্শ আমার মনে লেগেছে। আর তাছাড়া, কলকাতা পাটনা ছোটোছোটো করা আমার পোষাবে না। তুমি কি বল?

করুণা বললে, আমি এসব ব্যাপারের কি বুঝি? উকিল যা বলেছেন, তাই করাই উচিত।

নির্দিষ্ট সময়ে মামলা আরম্ভ হল। কিন্তু বিশ্বতোষ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য হাজির হল না। একতরফা কেস ডিসমিস হয়ে গেল।

অসীমা বাঁচল। বিশ্বতোষ আত্মপক্ষ সমর্থন করলে উকিলের জেরায় কি যে হত, তা ভেবে অসীমার ভীষণ ভাবনা হয়েছিল। উকিলের অসাধ্য কাজ নেই। জেরায় তাবা দিনকে রাত করে, রাতকে দিন। বিশ্বতোষের এই ব্যবহারে সে মনে মনে ওর ওপরে কৃতজ্ঞ হল।

ডাঃ মহলানবীশ অসীমার সঙ্গে কোর্টে এসেছিলেন। তিনি চেয়ে চেয়ে বিশ্বতোষকে খুঁজছিলেন। না দেখতে পেয়ে ফিস ফিস করে বললেন, বিশ্বতোষ আসে নি।

তথাপি অসীমার বৃকের চিপ-চিপানি ধামল না। তার তখনও বিশ্বাস বিশ্বতোষ কাছেই কোথাও আছে। সময় হলেই আসবে।

সময় হল। নাম-ডাক হল। অসীমা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বিশ্বতোষের দেখা নেই। সঙ্গে সঙ্গে কেস একতরফা ডিসমিস হয়ে গেল।

অসীমার সাহস ফিরে এল। সে ডাঃ মহলানবীশের হাত ধরে কোর্টের বাইরে এল। উকিলের কাছে বিদায় নিয়ে তারা গাড়িতে এসে বসল।

বাড়িতে নলিনী উদ্বেগের সঙ্গে ঘর-বার করছিল। অসীমাদের গাড়ি এসে থামতেই ছোটো দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিল। ওদের হাসি হাসি মুখ দেখে নলিনী বৃকতে হেঁরি হল না যে মামলায় জয় হয়েছে। অসীমার

হাত তখনও ডাঃ মহলানবীশের হাতের মধ্যে। নলিনী ফিসফিস করে অসীমাকে বললে, উদ্ভূ দেবো নাকি?

অসীমার হাত ছেড়ে দিয়ে ডাঃ মহলানবীশ তিন পা পিছিয়ে গেলেন। সভয়ে বললেন, খবরদার ও' কববে না!

তিন জনে ঘরে এসে বসল।

অসীমা বললে, বিশ্বতোষ আসে নি। সে বৃকছে যে, সর্বিষা হবে না। পাঁচ মিনিটে ডিগ্রি পেয়ে গেলাম।

নলিনীর মন খুঁততে ঢল: জিজ্ঞাসা করলে, রায় বেরুনো মাত্র তুমি ডাক্তারবাবুর হাত ধরে, না ডাক্তারবাবু তোমার হাত?

অসীমা তাড়াতাড়ি বললে, উনিই আমার হাত ধরলেন।

ডাঃ মহলানবীশ হেসে বললেন, এই মিথ্যে কথা বলছ? তুমি আমার হাত ধরলে না?

দু' জনে তুমুল তর্ক বাধল।

নলিনী বললে, তর্ক থামাবেন নই, আমি চা নিয়ে আসছি।

চা এল। শূদ্ধ চা নয়, দু' জনের জন্যে দু' প্লেট খাবার।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, এ আবার কি?

নলিনী হেসে বললে, ব্যাজকের দিনে গিফটমুখ করতে হয়।

অসীমা ও ডাঃ মহলানবীশ দু' জনে সলজ্জভাবে চোরা দৃষ্টি বিনিময় করলে।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, চল একটু বৌড়িয়ে আসি।

নলিনী ঠাট্টা করে বললে, দেববেন, আর যেন ডাঃ ঘোষের সামনে পড়বেন না।

অসীমা বললে, আর থোড়াই কেয়ার।

নলিনী ডাঃ মহলানবীশকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার ধৃতি-চাদর নেই?

—কেন বল ত'?

—তাহলে আজ ধৃতি-চাদর পবে বেরুতেন। চেনা লোকের সামনে পড়লে তাদের বৃকতে দেরি হত না যে, একটা নতুন পরিচ্ছেদের আবশ্য হয়েছে।

কথাটা ডাঃ মহলানবীশের মনে লাগল। তিনি বললেন, তাহলে অভ্যর্থন অসীমা। কাল ধৃতি-চাদর পরে আসব। কিন্তু টাক টাকব কি করে?

নলিনী বললে, একটা গান্ধী টুপি কিনবেন। তাহলেই হবে।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, ঠিক বললেন নলিনী। এই জনেই তোমাকে আশি অসীমার প্রধানমন্ত্রী বলি।

চুপি চুপি বিবাহ হয়ে গেলে কেউ জানলে না। নলিনী ছাড়া আর

অশ্ব-নাচার বাবা, দুটো নয়্যাপরসা
দিবে যান—

নামি রেস্টোরাঁ, ছিমছাম চারিদিক।
এয়ারকন্ডিশন্ড ঘর। আসবাবপত্রের ও
কোটেশ্যারি অনিন্দ্য, পরিচ্ছন্ন খাবার-
দ্রব্য। টেবিলে টেবিলে ফুল। ভাল
ভাল মানুষের আনাগোনা, বড় বড়
গাড়ি থেকে নেমে হাস্যমুখে মস্তুর পায়ে
ভাঁটা ভিতরে ঢুকে যান।

দরজার অদূরে গাছতলায় চোখ বুঁজে
থসে তিনকাড়ি তারস্বরে চেঁচাচ্ছে : অশ্ব-
নাচার বাবা—। সামনে গামছা বিছিয়ে
দিয়েছে, দু-এক পরসা ফেঁসছেও কেউ
কেউ।

আজকে এক জাঁকালো মজ্জব—
রাজেন্দ্র সামন্ত মশায় ‘পদ্মভূষণ’ উপাধি
পেয়েছেন, হোটেলের তাঁকে সম্বৰ্ণনা
বিচ্ছে। ভাইনের পুরো কামরাটা রিজার্ভ



বৃন্দমতি, বাসুদেব মতি, মিনা-করা
ব্রুপোর পশ্ম দিল একজনে। বৃন্দ বড়
প্রসন্ন। গদগদ কণ্ঠে বলছেন, দেখ,
বিস্তরকাল বেঁচেছি মরেই তো যাবো
এবার—কিন্তু জেনে গেলাম এত আপনজন
 আমার আছে। জীবনে সকলের বড় তৃপ্তি।
মিষ্টি কনসার্ট বেঞ্চে উঠল এমন
সময় হলঘরে।

দিব্যা চলছে, হুলস্থূল পড়ে গেল
হঠাৎ। ভূমিকম্প, হরবাড়ি নড়ছে। নড়ে-
চড়ে মহত্ কাল হাছল, আবার নড়ে
ওঠে। শব্দধ্বনি চতুর্বিধে। কেমন একটা
চাপা শব্দ মাটির নিচে থেকে। বাসুকী
সাপ—বসুমতীর বোঝা আর বইতে
পারছেন না—গম্বাচ্ছেন যেন তাই।
আত্নাদ, কান্নাকাটি। রেস্টোরাঁ ছেড়ে
চক্ষের পলকে লোকজন সব রাস্তায়।

একলা বৃন্দ বাজেন্দ্র বিশাল চেয়ার-
খানায় বসে আছেন। ওঠেন কেমন করে—
বাতে অধব, ধাবে তুলে দিতে হয়।
বিচলিত নন তিনি। মুরগির রোস্ট ছুরি
দিয়ে কেটে কেটে আস্তে আস্তে মুখে
তুলছেন। এত বড় কামবাক মধ্যে একলা
একজন তিনি। রেস্টোরাঁর সাধোও নোদুখ
একলা।

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে তিনকাড়ি
চুকল। এবন্ধনের জবগাষ দুজন। অশ্ব-
নাচারের চোখ খুলেছে। মহাপ্রলয়ের
দিনটি হয়তো। চাচা আপনা বাঁচা

দুর্ভিক্ষ
মতো
বসু

করা, গেস্ট একশ' জনের মতো হবে।
মুখ্যার পর থেকে তাঁরা আসতে
লেগেছেন। জাঁদিয়ে মানুষ সমস্ত—এ বলে
আমায় দেখ, ও বলে আমার দেখ। শব্দ-
মাত্র মানুষ নয়, যে যে গাড়ি থেকে
মামছেন গাড়িগুলিও। গাড়ির চেহারা ও
সোফারের সাজ-পোষাকের ছটা দেখে
মানুষের দরও মালুম হয়ে যায়। চেঁচানি
বন্ধ করে তিনকাড়ি ক্ষণে ক্ষণে অভ্যাগত
ও কামরার ভিতরের আলোজুন উৎকর্ষক
দিয়ে দেখে নিচ্ছে।

রাজেন্দ্রের গাড়ি এলো। আসল
মানুষ ইনিই। সে আর বলে দিতে হয়
না। রাজেন্দ্র ও অনুচরবর্গে ঠাসা গাড়ি-
খানা। আগে-পিছে আরও পাঁচ-সাতখানা
গাড়ি একসঙ্গে এসে পড়ল। ছেলে-বউ
মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনি আত্মীয়বন্ধ
আসতে কারো বাকি নই। গাড়ির
হরজাতেই রাজেন্দ্রের গলায় প্রকাণ্ড এক
মালা পরিয়ে সুদলবলে ঘিরে নিয়ে ঢুকল।
গাছতলায় তিনকাড়ি পিটিপটি করে দেখছে।

ডিনারেব আরম্ভ, সূপের স্নেট পড়ে
গেছে। উপহার খারা-স্নোলের মতো
আসছে এখানে। অফদন্ত। রাজেন্দ্র
সামন্ত নিয়ে নিয়ে আর পায়ন না। হাত

ঠিকিয়ে দিচ্ছেন একটু, পিছন দিককার
টেবিলে নিয়ে গায়া করছে। ফলেব তো
পাহাড় হয়ে গেছে। গীতা-উপনিষদ ও
বিবিধ ধর্মপুস্তক দিয়েছে, কল্ল, কাপড়,

—যে যার প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। এমন
মণ্ডকা কে ছাড়ে! পরিপাটি টেবিলের

[শেষাংশ—২২৬ পৃষ্ঠায়]



ପରବাসୀଓ ସେ ନୟ

ବିଦୁଷୀ ବାବୁ

ବିଷୟ

ସମୀକ୍ଷକ

॥ १ ॥

ଅହଂ ରାମୋଦିବସ୍ତୁତି

ଉପମାଓ ସେନ ମୃତ ଆଜ୍ଞ । ଜଳେ, ଥାଳେ, ବାତାସେଓ ହାସ
ଈକ୍ଷମନ୍ତା,
ଏକ ନୟ, ଶାତ ଶତ । ପ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦେଶେ ଦେଶେ ସର୍ବତ୍ର ତାଦେର
ସାତାସାତ,
ଦେହେ ମନେ, ନାଢ଼ିତେ ନାଢ଼ିତେ କୀଟୀନୁତେ, ଈକ୍ଷମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମେ ଓ ଶହରେ,
ଏଦେଶେ ଓଦେଶେ ।

ଏକମାତ୍ର ଏଥାନେ ଓଥାନେ ଜୋଡ଼ା-ଆଧା କୁବେରର ସରକାର
ଗୋମନ୍ତା
ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଦିବ୍ୟା ନିତ୍ୟ ଏଦେଶେ ଓଦେଶେ ପ୍ରଭୁପଦେ କରେ ପ୍ରତିପାତ,
ମୁଖେ ଚୋଖେ ଏକାକାର, ଭିକ୍ଷୁ ଶୂନ୍ୟ ଏର ଓର ଭିକ୍ଷୁ ଭିକ୍ଷୁ ବେଶେ ।

ଈକ୍ଷମନ୍ତା ସବ କିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ମାନବିକ, ଅଥଚ ଶ୍ମଶାନଓ ନୟ,
ଛବିଭଂଗ ଜନପଦ ହାରଧାର ଏବେଶେ ଓଦେଶେ ଗ୍ରାମେ ଓ ଶହରେ,—
ଏକମାତ୍ର ଗୋଛଗାଛ ସିନ୍ଧୁକେ ବନ୍ଦରେ ବିମାନେ ଆଢ଼ିତେ ବନ୍ତା ।

ମାନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାତ, ତାର ଶରୀରେ ମାନସ ନେଇ, ସଦାପାତାଳକ
ମନେ ଭୟ ।
ପରବାସୀଓ ସେ ନୟ, ତାହି ସ୍ଥିତି-ନୀତି ଭୁଲେ ସାୟ ବାହିରେ ଓ ସରେ,
ଶତ ଭିକ୍ଷୁ ମୁଖେ ଭାବେ ବୋଢ଼େ ଯାବେ, ଶକ୍ତିର ଶିକାର ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛୋଟ-ଛୋଟ-ଈକ୍ଷମନ୍ତ୍ର
ପରକେ ଓ ନିଜେକେ ଡରାୟ, ସର ନେଇ, ଦକ୍ଷିଣ ଦେଖେ—ନାକ

ଆଦ୍ୟଜ୍ଞାନହୀନ ସର୍ବାଧିନୀ ଅଜ୍ଞାନ
ଦେବୀ ମୁକ୍ତେ ସାହା ଆସ୍ତା ତାହାହି ଅହଂ
ଚନ୍ଦ୍ରାଧ୍ୟାତା ମହାମାୟା ସେ ଆମି ସ୍ବୟଂ
ସର୍ବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମୁକ୍ତ ମହାନ ଅମ୍ଳାନ ।

ଆମିହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତବୁ ଦେହାତୀତ
ଏକାଦଶ ରୁପରୂପେ ହିଁ କାଳାନ୍ତକ
ଅକ୍ଷତ୍ବସ୍ତୁ ହସ୍ତେ କରି ଶାଧକେ ଅନ୍ବିତ
ଅକ୍ଷତ୍ବିଧ ଧନେଶ୍ବରେ ପ୍ରଦାନି ପୂଜକ ।

ହାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ଆମି ତ୍ରିଗୁଣେ ପ୍ରକାଶ
ନାମ-ରୂପ-ବାବହାରେ ବିଶ୍ବଦେବ ଆମି
ଧର୍ମାଧର୍ମ ମୁଖଦୁଃଖ ସ୍ବାସ ଓ ପ୍ରସ୍ବାସ
ଆମାତେହି ଜ୍ଞାତ, ତାହି ଆମି ସର୍ବସ୍ବାମୀ ।

ଶ୍ଳୋକାର୍ଥରେ ଜ୍ଞାନିଲାମ ଶୂନ୍ୟ ସତ୍ୟାବେଶ
ଅପୋରୁଷେୟ ବେଦେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋକ ।

॥ २ ॥

ଦେବୀ ପ୍ରମୋଦିବସ୍ତୁତି

ଡାଲୋବାସାର କଥା

କିରଣଶଙ୍କର ସେନଗୁପ୍ତ

ଏଥନ ଦିନଗୁଲୋ ଡାଲୋବାସାର କଥା ଶୋନାୟ ନା ।
ସେ ପାଖିରା ଶୀତେର ଦୁଃସ୍ବରେ
ବାବାନ୍ଦାୟ ଏସେ ବସତୋ, ସେ ବେଢ଼ାଳ
ଧାବାର ରୋଦ ଧରାବେ ବଲେ
କରେକବାର ପାୟତାରା କସେ ହାହି ତୁଲେ
ଆମାବ ପାୟେର କାଛେ ଘର୍ମିୟେ ପଢ଼ିତେ
ତାବା ସବାହି କଥନ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହଂସେ
ଜ୍ଞାନତେ ପାରିନି ।

ଆଜ୍ଞ ଡାଲୋବେସେ କଥା ବଜାବାର
ତେମନ ପ୍ରେମିକ କୋଥାଓ ନେଇ ।

ହେ ଦେବୀ ପ୍ରମୋଦା ହଓ, ବିପଦାପନ୍ନେର
ଆର୍ତ୍ତ ହରଣ କରୋ । କ୍ରିଷ୍ଣ ଭୀତ ଜନ
କାତରେ ଶରଣ ଯାଚେ ଧର୍ମଚରଣେର
ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଅନନ୍ୟ ମନନ ।

ଜାଣିକ ଆମିହି-ରୂପୀ ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନାର
ଅଧୌକ୍ତିକ ଅଭିମାନେ ମୁଦ୍ଧ ନହେ ଆର ।

ତାରା ସେ ଜେନେଛେ ତୁମି ଅଧିକ ବିଶ୍ବେର
ଶାଶ୍ବତୀ ଜନନୀ ସମା ସର୍ବଦା ମୁଦ୍ରାତୀ
କୁମାତା ହତେ କି ପାରୋ କହୁ କୁପ୍ତହେର
ପ୍ରୀତି ତୁମି ବିଶ୍ବେଶ୍ବରୀ ! ଧର୍ମେ ପାନେ ପୂର୍ବ
ନିମ୍ନତ ଧାବିତା ଜ୍ଞାନି କଳ୍ପକୋଟି ଧରି,
ତୁମି ଶୂନ୍ୟ ନିତ୍ୟା, ସାରା, ବହୁବ ଈଶ୍ବରୀ ।

ମହାମାୟା ରୂପେ ମୁଦ୍ଧ ରେଖେଛୋ ଧରାବେ
ପ୍ରମୋଦା ମାତାର ରୂପେ ଶାନ୍ତି ଦାଓ ତାରେ ।

লক্ষ্য লক্ষ্য শিশু

সুখ লাল হয়ে পড়ে যায়

অরুণ মিত্র

দিলেশ দাস

জলক লক্ষ শিশু

ফটোপাথ ছাড়িয়ে ভাঙা রাস্তায় পা দিচ্ছে
না দিতেই পাখনায় খরখর
কলকাতা এমন রং বিলোয় যে কথায় কথায়
ঘাসপাতা প্রজাপতি এবং অগুস্তি তম্বা ছয়লাপ
গ্রামলাইন ফুরিয়ে গিয়ে খোলা মাঠে
গঙ্গার বকের নৌকো
কাগজের ভাঁজ থেকে তরতরিয়ে
অনেক ক্ষেতের ধারে বরষাঝরায় ব্রিকেল পেয়েছে
ফানুসের আলো
চরের হাওয়ার ঘরে মাছলান্ন।

তখনই সন্ধ্যার ফুল-ফুটে ওঠে
গড়িয়াহাট জলাঞ্জল নদীর পাড়ের
দোলা নিয়ে নলখাগড়া কাপবন
আর বেল রজনীগন্ধার ফুরিয়ে
একরাস্তি গানের সুরাস
মালা আর পতুলকে আঁকি ধরে ভিড়ের উজ্জানে চলাত পথ
বড়োমানুষের বুক কচি মসৃণ আগলে আগলে
অন্ধকার পার হয়ে একটা আলোর
একটু কেন একটু কেন এই ব্যাকুলতা খালি
কারণ দুঃস্বপ্ন পাড়ি দিতে হলে আলো
এমন কি বাড়ির রাস্তা অন্ধকারে হারাবার মতো।

এখনই দক্ষিণ পুরো খলে যায়
আ-মরি বাতাস আহা সমুদ্রের
গাঞ্জাডোনো রাত কণা-বলি-বলি
অথচ ঘরের ভিত ভীষণ ঝড়ের দিকে
ছোট বিছানার কোণ পাশ-ভুলে কলকর
কত লক্ষ হাত দাঁড়ে
কত না মজাব দেশ বাকী
যখন কাজকের সূর্য উঠবে কলকাতা
ধূপের ইশারা লাগা সোনার রোশনীরে
ইস্কালের ফিরতিপাথে হৈ হৈ বাড়ি
অশ্রুচর্য হবার গল্প
সব গলা ফেঁদে ফেঁদে বজ্রার-দীপকারে
ধূশির হাজার লক্ষ চেউয়

যে-গড়িটার ওপর আকাশ দাঁড়িয়েছিল,
তার ওপর রোজ কুড়ুলের আঘাত করেছে কেউ;
আকাশ গড়ো হয়ে ভাঙা কাচের মত ধরে পড়ছে।
আমাদের অপদার্থ মনে করে
নক্ষত্রেরা অনেক দিন বিদায় নিয়েছে,
সূর্য ও লাল হয়ে পড়ে যায়।

কেউ হেন সাঁড়াশী দিয়ে
আমার আঙ্গুল-দাঁতটাকে উপড়ে ঢাল;
কারা বেন-শাবল দিয়ে আইন-ভাঙছে,
কারা বেন নিজেই বাড়িতে
নিজেরাই আগুন ধরিয়ে দিল;
রাতি জ্বলছে
আগুন-ভীর-বাঁশীর মত বাজে,
সেই শব্দে আমার অস্তিত্ব টুকরো টুকরো হয়ে যায়;
আগুনের ধোঁয়া আমাকে গিলতে চায়।
আলো-ছায়ার ক্ষিত্রে কত মৃদু
কাউকে চেনা যায় না;
ফাল্গুনো ক্ষিতে শব্দ; সত্যের প্রচার,
কোনও সত্যকেই আজ সত্য বলে মনে হয় না—
সবই হেন অর্থসত্য,
অথবা ভবিষ্যতের সত্য।

শব্দ কালো বাড় উঠছে;
কালো বাতাস দিয়ে
রাতি তার গহবরগুলি ভরিয়ে তোলে।
ঝড়ের মধ্যে সমুদ্র-পাখির মত আমি অসহায়—
বাতাসের বেড়াঙ্কালে বন্দী,
কোনোদিকেই ডানা মেলা যায় না,
চতুর্দিকে কালো চেউয়ের বদন-প্রতিবদন;
আকাশ ক্রমশ ওপরে উঠে যায়,
সমুদ্রও ডুব দিয়ে নীচে তলিয়ে মাঝে;
দগন্ত আমার কাছে অর্থহীন।

শ্রীমতী

শ্রীপাল ভৌমিক

সকলেই কম বেশি খেলি;
হয় বল নিয়ে লোকালয় কীর
ময়তো সেটিকে লম্বা মেয়ে
এগিয়ে দি' অপার কারও দিকে;
সে যদি বিপদে পড়ে পড়ুক না!
বলটি আমার পা থেকে যে চলে গেছে
আমি খুঁশি হয়ে উঠি সেই আনন্দে।
ক্ষমায় শোভায় মাছলান্ন।

প্রতিদিন এই আমাদের কাজ,
ফাঁকি দেওয়া এবং ফাঁকিতে পড়া;
অল্পচ অধিকার নামাবলী গানে
নিজেকে মনে করি দ্বিতীয় ভগবান।
কাষক্ষেত্র আছাড় খাই হাত পা ভাঙি,
গোল যেমন দূরে তেমন থাকে;
শব্দ মাঝ মাঠে বল নিয়ে লোকালয়
প্রবেশ দেখে দর্শকেরা-দুরো-দেয়-শব্দ।

সামনেওয়ালা ভাগো

দুঃখাধ শ্রুতগোপাধ্যায়

বকে বাঁধছে ঢাল যতই ছেড়ে যাচ্ছে নাভী
ভয় পেয়ে দেখাচ্ছে ভয়
পথে বসছে ফাঁড়ি

ইশ্টনার রূপতে রূপতে
হাতে বলল খিল
হাতের তৌড়া হাতেই রইল
মিঠাই নিল চিল

ধোঁড়া টিপেছে গুলি ফুটেছে হাত ছুটেছে
ঘাটে
টিপসইয়ের যা নশুন রে ভাই
ভাতে ভো ভয় পাই

ভয় পেয়েছি বিষম ভয় পেয়েছি ভয় ভীষণ
আত্মারাম ছাড়তে চাইছে
খাঁচার ইন্-
টিশন

মাটির আগাম ফুটে হাঁড়ি কাকতালুয়া
মা গো
বাজল ঘণ্টা নড়ল নিশান চলল গাড়ি
সামনেওয়ালা ভাগো ॥

দুঃখ, ক্যাডার এক জে

বরপ্রসাদ মিত্র

যে দিকটায় নখীর খুলোর গম্ব,—দুঃপূরে রোদের বঙ্গম খুলঘড়িল
থেকে সোজা টেবিলে এসে পড়ে,—মক্কেদা-পেয়াদা-চোর-
ডাকাতের আদালত বেদিকে,—চাকরি রাজনীতি টাকার লোভ
এবং আনন্দমণ্ডিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার সেই পরিমন্ডল জীর্ণ হতে
হতে জ্যোৎস্নার সারস হাঁটিছে, এই এক পটের মধ্য দিয়ে
গোখলিতে দেখা বিবাদশূচি কোনো এক নারীলাবণ্য পাশে,
ক্লেমে সম্মুখাতারা ভিক্ষা করছিল সে।

রোজই দেখতুম তাকে। অনেকদিন, অনেক দিন না।

ইতিমধ্যে কতো যে ধারালো নলের হাত উঠলো হাওয়ায়।

যেন হিশ্ হিশ্ করলো দুঃখজার সাপ।

তার গলা শুকিয়ে কাঠ হোলো।

শব্দ বৃক্ষলো।

শব্দ নেই।

চেনা শব্দ গম্বের বাইরে গিয়ে পড়ছে সকলেই।
সময় ক্যাডারের মতন লাফাতে লাফাতে ছুটেছে।

বঙের গোলাম

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খোদার ওপর খোদাকানী
করেছিল খুই পরের ধনে পোন্দারী;
পরের টাকে হাত বুলিয়ে বাহার রে তোর সর্দারী;
ওরে আমার নন্দ খোবের ছা!
এবার তবে দেশকে বেচে থা;
দেবো তোরক সাবাস বলে জোৎস্নারী, পোন্দারী, সর্দারী।

দইতে পারবি তো?
চুরির ধন দুই পকেটে বইতে পারবি তো?
চারের হয়ে, খুলার হয়ে, গটিকাটা আর দেখ

বেচে থাক

হয়ে অনেক মজার কথা কইতে পারবি তো?
ওরে আমার মাণিক! ও, আমার সোনা!
প্যাক্সা ডেকে শোহর কেটে গড়িয়ে দেবো দানা।
দেবে তাকে বাহার দেখে বাড়ি, গাড়ি, বউয়ের জন্য
শাড়ি, ডলার
কাড়িকাড়ি, জোৎস্নারী, পোন্দারী, সর্দারী।

স্বপ্নে-দেখা ঘরদুয়ার

শ্রীকান্তনাথ চক্রবর্তী

পুকুর, মরাই, সবুজ-বাগান, জংলা ডুরে শাড়ি,
তার মানেই তো বাড়ি,
তার মানেই তো প্রাণের মধ্যে প্রাণ।
নিকিয়ে-নেওয়া উঠোনখানি রোদ্দুরে টানটান।
ধান খেটে খায় চারটে চড়ুই, দোলমণ্ডের পাশে
পায়রাগলো ঘুরে বেড়ায় ঘাসে।
বোড়ালটা আড়মোড়া ভাঙছে; কুকুরটা কান খাড়া
করে শুনছে, কথা বলছে কারা।
পূর্বের সূর্য পশ্চিমে বের পাড়ি,
দুঃপূর্ববেলার ঘূমের থেকে জেগে উঠছে বাড়ি।

মাটির ডগায় পুটলি বাঁধা, অনেকটা পথ ঘুরে
লোকটা যাচ্ছে দূরের থেকে দূরে।
ওর চোখেও কি এমনি একটা বাড়ির স্বপ্ন টানা?
ওর মনেও কি গম্ব ছড়ায় গোপন হাসনুহানা?
ও বড়ো বউ, ডাকো, ওকে ডাকো,
ওই যে লোকটা পার হয়ে যায় কাঁসাই নদীর সাঁকো।

অথচ পথ জুড়ে

জগন্নাথ চক্রবর্তী

উত্তরে ভয় দেখিয়ে তুমি
দক্ষিণের বারান্দায় নিয়ে এসে ছাড়িয়ে ধরো
পশ্চিমের অস্ত্রজ্ঞানলায় পরদা টেনে
ক্রেবলি আমার পুঁবে তেলে দাও
যেখানে আকাশ জুড়ে সহস্রাঙ্ক স্বলপম্ম।
কেন তোমার এই জ্বলম্ম?
নন্দ্রের কিনার ছুঁতে ছুঁতে
পাহাড়চাড়ায় উঠে যাই
আমি পালাতে পথ পাই না
তোমার ভয় তোমার কাছেই তেলে দেয়।
বৃক্কের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ি।
তুমি কে আমি জানি না
অথচ তুমি আমার পথ জুড়ে বসে আছো।

ভূমিকা

রাম বন্দু

চাপা পড়ে আছে সুৰ্য ব্রোঞ্জের তলার
খেলে গিয়েছে, তবু আলতে চায় স্বাইরে, হাওয়ায়
হাওয়া নেই অথচ কোথাও।
ময়দানে নতমুখ জোড়ায় জোড়ায়
কাতারে কাতারে ছোট মানুস অথবা মানুসের মত কিছুর
ট্রামে বাসে ফুটপাথে স্বপ্নে ও দৃশ্যস্বপ্নে বোনা, ভেঁজাজড়ি করা
যেন গাছগাছড়া পড়ে বাড়িটার, অম্বকারে বিড় বিড় করে
গালে হাত দিয়ে ভাবে: হাওয়া নেই অথচ কোথাও?
আকাশে তাকাবে—নেই সে সাহস
মাঝে মাঝে দেখা যায় মরীয়া আবেগ
সংযবস্থ আত্মহননের।
হাওয়া নেই, শব্দই হাওয়ার শব্দ
ব্রোঞ্জের তলার সুৰ্য মারাত্মক বিস্ফোরণে চায়
মুষ্টি, পারাপারহীন স্তব্ধের শব্দভাষা
শব্দে ওরা চমকে ওঠে
তিরতির করে আশা চোখে, যেন
গাছের ফোকে থাকে কবেকার জল নড়ে চড়ে পাখির ডানায়
কেউ থাক যে আশা-নিবাসার পাক থেকে উঠে ডাকাতে আকাশে
কেউ থাক যে মল্লখানি মেলে দিতে পারে পতাকার মত
বিষাবের প্রজাতন্ত্রে দাঁড়িয়ে সময়, তার বৃক্ক
গজের মতন গৌরী সমুদ্রের ঝাঁঝ ও আইডিন
সেখানে চেউ-এর ছুরি ফেড়ে ফেলছে পাখির হৃদয়
শুকনো শিকড়গুলো সমুদ্রাত আদিম কল্পম
গায়ে মেখে দৃষ্টের সুবাস একজনও অস্তত থাকুক
যে অন্তমে সাক্ষ্য দিতে পারে
হে হেঁকে শোনাতে পারে:
পদ্রুপের প্রমে শস্যে জন্ম নেয় সুৰ্য পুনর্বীর
নারীর বৃক্কের চুড়া ধরে রাখে পূর্ণিমার চাঁদ।
যেহেতু রাশি না আশা
আমি সেই ভূমিকা নিলাম।

ম্যানহোলে, অরন্ডে, অন্ধকারে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

ভয়ানক অন্যমনস্ক
ম্যানহোলে কি বৃপ করে পড়ে গেল কেউ?
তারি নাকি অন্তিম চীৎকার!
একবার, কয়েকবার—ভয়ানক সন্দেশে—
হাত-পা ছোড়া, ছটফট গোষ্ঠানি। তারপর
দীর্ঘ প্রতীক্ষারত। উম্মারকাঁধের জন্য
কেউ কি এগিয়ে আসবে? যদি আসে—
সুদীর্ঘ সময় শব্দ অতিরিক্ত শ্বাসকষ্ট। বিষবাস্পে,
দৃগন্ধ ও বিষবাস্পে কণ্ঠনালী ভরে যায়, ভরে যায়,
ভারাক্রান্ত, ভরে যায়। তীর, ভয়ঙ্কর
সুদৃশ্যে মৃত্যুর নৃত্য.....।

এ দৃশ্য নিশ্চয়ই খুবই বীভৎস, করণ? কিন্তু
মনে হচ্ছে আজকাল
বিষাক্ত কাঁটার ঝোপে অনবরত যেন জড়িয়ে যাচ্ছে
ঘাসের প্রান্তর ছেড়ে, কখন অরণ্যে এক
আচমকা পড়েছি ঢুকে। হ্যাঁ অরণ্যপূর্বেও।
না হলে এ সব আমি, পরিবর্ত চারিদিকে
কি দেখছি হে আজ!
ভালুক, হায়না, নেকড়ে নিঃশব্দে, দরাল
হাঁটছে বৃক্ক ফুলিয়ে। গরিলার আঙ্গালন—
ডলে সাপ, প্রকাশ্য গিরিগাতি চোখ খুবলে নিতে চায়।
এমন কি, কাঠ-পিপড়ে সব কী ভীষণ বিজ্ঞে তাকায়
ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে।

হয়ত ম্যানহোলে গেলে
এক-আধজন নক্ষর কুন্ড, আঙ্গু পাওয়া যাবে।
এখানে নাভিস্বাস চম্বিশ ঘণ্টার। বৈধ রাস্তা
অসম্ভব, অসম্ভব। বৈধ কত কার?
তপ্ত এপ্রিলের রাতে ঠাসা আলুর বস্তায়
এরচে' আশ্রিত হওয়া অনেক, অনেক মাননীয়।
ঘেনের চাকায় গলা দিচ্ছি না যদিও—
তবু, মনে হয়, তান্ত নিরুপদ্রব।
অস্তত ছিচো ও ইন্দুর,
নাকে-কানে গর্ত খুঁড়তে চাইবে না কিছুরে,
এ রকম বথেছ প্রহারে।

হে ঈশ্বর! দয়াময়, দয়ালু ঈশ্বর!
হারিকিউলিস কি ইন্দ্র একজন
প্রবল সুসভ্য কাউকে অবিলম্বে এখানে পাঠাও।
কোথায় অলিভপাতা, পাবন জলপাইফল, পাই নি কিছুরে।
ইতিহাস, লোকালয় চক্রাকারে পাক খেয়ে
অপস্ময়মান সরে যায়। সরে যায়—।
কাক ডাকে জ্বলজ্বল, সুৰ্য নিভে আসছে, দিন
বড় অন্ধকার।

ট্রেন

অরুণ ভট্টাচার্য

বাঁশী বাজলে যেতে হয়।

ষতদূর দেখা যায়
সাগরে কিছুর নেই, শুধু
দীর্ঘকালো অন্ধকার।
অতীতে তাকালে কিছুর ক্ষতিচিহ্ন।

তাহাকে পাবার নেই তাহাকে দেবার কিছুর নেই।

চারিদিকে শূন্যতার মাঝে
থেকে থেকে ট্রেনের সূতীক্ষ্ম স্বর কানে বাজে :

বাঁশী বাজলে চলে যেতে হয়।

নিষিদ্ধ খরচ

সুনীল বসু

এর নাম নিষিদ্ধ খরচ প্রতিদিন অগোচর
অনন্তর দিকে চলা, এই চক্ষু, সহনা তমিহ্রা
দ্বি-জগৎ দৃশ্যহীন, সব ছিল, কিংবা কিছুর নেই
এই এক অলক্ষ্য খরচ, অথচ হিসাব-শূন্য
দৃষ্টিতে যেন গম-পেয়া, সুখে যেন স্বর্গে চরমার-
অস্তিত্বের স্বাদ, তবু অনন্তর বায়ুভূত লীলা
নক্ষত্রময় বিস্মৃতি, কত গেছে, কত যায়, তবু
শুধু স্রোত, ধুয়ে চলে যাওয়া, বিশাল ব্যাবিধ-ময়।
তবু প্রতিদিন, ভুলি, ভুলে থাকি, নিষিদ্ধ খরচ
ভুলে যাই নশ্বরতা, চর্মসার, নিশ্চিহ্নের স্পর্শ
তবু রিপা, ক্রোধ, কাম, অহংকার, ধ্যানমগ্ন প্রেম,
কিছুর নেই। শুধু ক্রুর বিস্ফোরণ, রক্তে উপভোগ
এর নাম নিষিদ্ধ খরচ, তিলে তিলে টেন পাই
স্বর্গমর্ত্য তোলপাড়, পরিণামে শুধু পোড়া ছাই।

চালচিহ্ন

লমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সন্ধ্যা হয় হয়। চারিদিকে
পাখির ডাকের পরবর্তী নীরবতা।
উঠানে জমানো আছে কার্তিক ধানের সুসংবাদ,
চৌকি ঘর থেকে জায়া ও সজ্জনী ধান নিতে এসে,
ধমকে দাঁড়াচ্ছে সন্ধ্যাতারাটির নিচে; লণ্ঠনে দোদুল আলো
আলতা পায়ের পাতা অবনত খোকর মত
ঘিরে আছে। দাদুর দাওয়ায় কথকতা
এবার রামের সঙ্গে সীতাকেও অরণ্য পাঠাতে
জমশই হতেছে প্রস্তুত।

তবু সম্ভবা গাভির কণ্ঠে বাঁধা ঘৃণিত কোনো গায়ে
অসহিষ্ণু বোজ উঠবে। বোঝা যাবে হয়েছে সময়; পরিপাটি
ভোরে মানুষ্যশিশুর জন্য দৃষ্টি ভরে উঠবে বাটি,
আবার কোকিল ডাকে চাঁড়কামণ্ডলে
মল্লিকদ্বারের শব্দগুলি বাধা পাবে।
ভোরের ভ্রমসী বাংলা গ্রামে গ্রামে বয়স হারাবে।

বিস্তৃত আকাশের কামনা

শ্যামসুন্দর দে

সীমিত আকাশ চোখে ভাসে
কনীনিকা প্রাণপ্রণে ঝঞ্জে দেখে
বিস্তারিত আকাশের সীমা
বিফল প্রয়াসে শুধু তার ফিরে ফিরে আসা।
বড়ো বড়ো ইমারত দিয়ে ঘেরা
চিমনিতে ধোঁয়া—তার অবিরত অনাগোনা
আমার আকাশ সীমা ঢেকে দিল।
বারান্দার তারে ভিজে ভিজে কাপড়ের সারি,
রোদের কণিকা ওরা চায়
জলের রেখাকে মুছে দিতে
ওরা সব হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে
উদ্ভূত কামনাগুলো চারিদিকে ভিড় করে।
সে সব কামনাগুলো ঠেলে ফেলে
একটু আকাশ পেতে চাই
আরো কিছুর আলোকের সীমা
মনে হয় চোখের চাওয়ার দিন শেষ করে
যদি সব ভেঙে দিতে পারতেন।

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক চিন্তাগুলি

রাজলক্ষ্মী দেবী

সারস-বাগের 'পরে কুয়াশার আস্তরণ শীতের সকালে।
বেলুনের মতো শাল-মুড়ি-দেয়া লোকগুলি পথে ছেঁটে যায়।
পাষণ নামক হৃদ মধু মধুছে পরিচ্ছন্ন,—বৃষ্ণের মাধায়
ঝুলন্ত, বিকীর্ণ চুল, কুয়াশা,—লটকে আছে খেজুরের ডালে।
মাথা ঠিক হয়ে গেলে কেউ হিন্দুশানে পর পর চারবাব
কফির অর্ডার দেয় না। ফুটপাথ ছেড়ে দিয়ে হাঁটে না রাস্তায়।

কেউ হাড়-কাঁপা শীতে সূর্য, সূর্য-হেন মধু দেখতে জানালায়
দাঁড়ায় না। ট্রেন ছেড়ে গেলে কেউ হেঁটে যোলে মাইল হয় না
পায়।

পাষণ নামক হৃদ সাত-সকালে পরিচ্ছন্ন,—উজ্জ্বল স্ফটিক।
সকালে-বিকলে চিঠি কেউ লেখে না, মাথা বেই হয়ে যায় ঠিকই
মাথা ঠিক হয়ে গেলে সন্ধ্যাচিন্ত কেউ ভোলে, যা ঘটেছে সদি;
প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি পড়ে থাকে গারদের অর্থহীন ছবি।

শারদীয় সাপ্তাহিক বসুমতী : ১৩৭৭

ছবি হয়ে ওঠে

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন জেগে থাকে শিয়রে আমার
সেই মৃদু প্রগাঢ় জননীর মতো,
ভোরের আকাশে মৃদু পায় নিয়তই
এক বৃক রক্তের মাঝে সেই নাম
করে পড়ে গ্রীষ্ম-বর্ষা এবং বসন্তে।

উজ্জ্বল প্রাণের রক্তে সেই সব
রক্তের ফুল আদিগন্ত ব্যাপ্ত হয়
শরতের ফসলের ক্ষেত্রে,
অমৃতা অতীত শহরের কতিপয়।
হারানো দোয়েলের কণ্ঠের টানে
কতবার রোদের দুপদরে
সোনা রঙ স্বপ্নের ভিড়ে
ছবি হয়ে বেঁচে ওঠে জনৈক আমিন মৃদু
কিংবা শঙ্কাহীন কোন এক দীপকের মৃদু।

শতমানে প্রতিদিন শহরের প্রসন্ন বিকেলে
আমাদের শ্রমে গড়া মিছিলের পায়ে
পা রাখে তারা সব, বস্ত্র গাম্ধ
একাকার বন্দরের আত্মীয় নৈবিক।

সময় নির্দেশ করে না এখন

সমস্ত সাহা

যা পেয়েছি খড়-কুটো দেয়াল কার্নিস
ফুটপাথ চিলে কোঠা ছাদ
অরণ্য শহর
শব্দ স্বর তানপুরা
জড়িয়ে ধরেছি দুই হাতে;
খেলেতে খেলতে
একাকার হয়ে গেছি।

খেলেতে খেলতে বাঘা শব্দ করোছি কখন
শব্দ চলা শব্দ পথ
শব্দ দূর বহন দূর।

চলতে চলতে খেলার সাথীরা
একে একে খসে পড়ে
খসে পড়া পালকের মত
কোথায় যে চলে যায় খড়-কুটো
অরণ্য শহর
একে একে খসে পড়ে দেয়াল কার্নিস
শব্দ স্বর তানপুরা
হারিয়ে গিয়েছে।

হারাতে হারাতে অবশিষ্ট কিছুর নেই আর
রোদ বৃষ্টি ঝড় নেই
দিন নেই রাত নেই
শব্দ নেই নীরবতা নেই
পাওয়ার আনন্দ নেই
বিচ্ছেদ-বেদনা নেই

ঘাড় চলে হৃৎপিণ্ডের তালে তালে
সময় নির্দেশ করে না এখন।

অপরাজিত

সুশীলকুমার গঙ্গু

আমি তার অন্তরংগ বন্ধু তবু কতটুকু তাকে
আজ্ঞাও জ্ঞান, জ্ঞানতে পেরেছি। কত বিচিত্র রাস্তায়
তার গতি। যত তাকে দেখি তত আশ্চর্য মায়ায়
সে নতুন হয়ে ওঠে, মথলোভে কালের মৌচাকে
ছড়লে না চিল, হিঙ্গল ভিন্নমূল্যের ক্ষতজ্বালা স'হে
পুড়িয়ে পুড়িয়ে সত্তা লিখে গেল নীল পাতা ভরে
নিজস্ব ভাবনা, যার ফলে গেল অকালেই ম'রে
স্বর্ণিল বসন্ত, হল ছিন্নভিন্ন বৈশাখী বিরোধে।

দৃশ্যান্তরে মনে হয় সে হেরেও কখনো হারেনি।
বড় চাকরি গাড়ি বাড়ি সবকারী সম্মান ইত্যাদি
না হলেও তার আছে দুর্লভ সম্পদ স্বপ্নোদ্ভাস।
সে সংসারী, কিন্তু তার সংসার বাস্তব বস্তুবাদী
ঘনিষ্ঠ প্রতীক; পরদৃষ্টিতে তীর্থ ব্যাথার নিবেদী;
তাই সব মরে আর সে এক উজ্জ্বল ঈশ্বর।

এখনো এলোনা

বেণু দত্তরায়

সবারই জন্যে কেউ না কেউ প্রতীক্ষা করে
জ্বলিতে
আর জাহাজ স্পন্দিতই বেবী করে
ফেরে
অথচ সিটির শব্দ শব্দ ঘন হয়
মধ্যসন্ধ্যা
বাতাস শব্দ কাপে
লুপ্তনকারীর
বুকে দৃষ্টিব ক্ষোভ জমে—
এল না সে এখনও এল না।

তৃতীয় নয়নে

গলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দৃশ্যান্তরে সান্নিধ্য প্রকল্প প্রমিত
দিবালোকে চতুর্দিকে বহুধা বিস্তৃত।
জদয়ের অশ্লীকার জীবন-গভীরে
খুঁজে দেখো। যাবতীয় নির্ধন সমিতি
গোষ্ঠীর সমাবেশে আভাসে আরক্ত;
সমাহিত মহাকাল বিস্তৃত নজীরে।

দুইটি নয়নে আর কতটুকু দেখা
পশ্চাদ্ভূমির দৃশ্য? অদৃশ্য ভাস্কর্য
ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে পরতে পরতে
পেশল শৈল্পিক স্পর্শে। অন্তর্ভুক্তি এবং
পরিচয়্য করে সব নকল নাগর্য
ছপ্তির নিবাস ফেলে আকণ্য শ্রুতে।

ধ্যানমগ্ন হও এসে ধ্রুতের শয়নে
পশ্চাদ্ভূমিকে দেখ তৃতীয় নয়নে।



জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল আদিমানব আদমকে। নিষেধ অমান্য করে সে আর তার স্ত্রী স্বর্গচ্যুত হয়। তা সত্ত্বে তাদের সম্মতি পদ্রুপানক্রমে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আসছে। এরার স্বর্গে নয়, মর্ত্যে। পাঠশালায়, স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন এর পরিণাম কী হয়েছে শুদ্ধন।

এক প্যারিস শহরেই চার্লস হাজার পদলিশ চিরস্থায়ীভাবে মোতায়েন হয়েছে, পাছে বিদ্যার্থীরা দু'বছর আগের মতো আবার এক বিপ্লব বাধায়। সেবার পদলিশের বিরুদ্ধে নালিশ ছিল যে পদলিশ খুব মেরেছে। এই দু'বছরে পদলিশের কোনো অস্তঃপরিবর্তন হয়েছে বলে শোনা যায় না। সোদিন এক ফরাসী ভদ্রলোককে হাতের কাছে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, "ফরাসী বিপ্লবের খবর কী? আবার কবে বাধছে?"

তিনি হাসিমুখে মানদুষ, প্রতক্ষ্য রাসিয়ে রাসিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান। বলেন, "আর বাধবে না। পদলিশ ভয়ানক কড়া।"

বাঙালীদের সম্বন্ধে বলা হয় ওরা ভারতবর্ষের ফরাসী। তাই যদি হয় তবে কলকাতা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্যারিস। স্বয়ং লেনিন নাকি একবার ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, "বিপ্লব পিকিং থেকে প্যারিসে যাবে, কলকাতা হয়ে।" তাঁর ভবিষ্যৎবাণী যে হেসে উড়িয়ে দেবার নয় তা তো আমরা আজ হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। সেই জন্যেই কি কলকাতা শহরে প্যারিসের মতো পদলিশ মোতায়েন শুরুর হয়ে গেছে? এটাও কি সেইরূপ এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত?

প্যারিসে ছাত্রবিদ্রোহ অতদূর গড়াত না, যদি না কলকারখানার শ্রমিকরা তাদের পক্ষ নিয়ে ধর্মঘট করত। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের অনেককম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তার ফলে তারা আর ছাত্রদের সঙ্গে গোলে হারিবোল দিতে রাজী নয়। সোদিন একজন প্যারিসের শ্রমিকদের সম্বন্ধে লিখেছেন যে, ওরা মোটর গাড়ি টেলিভিশন সেট ইত্যাদি পেয়েছে, ছাত্র-বিদ্রোহে ওরা যোগ দেবে না, তবে ওদের নিজেদের স্বার্থে দবকার হলে লড়বে। তার মানে পরের জন্যে ওরা পদলিশের মার খাবে না। খেলে নিজেব জন্যে খাবে।

মার্ক্স-এংসেল উত্তরকারী হচ্ছেন মার্কুস হার্ন। বিপ্লব বাধাবে কেটা, এই প্রশ্নের উত্তর মার্ক্স দিয়েছিলেন একভাবে, মার্কুস দিচ্ছেন আরেকভাবে। মার্ক্সের আশা-ভরসা ছিল কলকারখানার শ্রমিকশক্তি। মার্কুসের আশা-ভরসা স্কুল-কলেজের ছাত্রশক্তি।

এখন মর্শকিল হলো এই যে, ফরাসীরা আগেভাগে সতর্ক হয়ে নিবারণী ব্যবস্থা করে বসে আছে। পদলিশ সমস্তক্ষণ বন্দুকের ঘোড়ার উপর আগ্রহ রেখে তৈয়ার। যাদের হাতে বন্দুক দেওয়া হয় নি তাদের হাতে রবারের ট্রাণ্ডন। বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা আসে, এই মহাতত্ত্ব ওরাও জেনে গেছে। আর ওরাই তো বন্দুক-হস্ত। গণতান্ত্রিক সমাজে পদলিশকে কড়া হাতে সংযত করাটাই নিয়ম, কিন্তু যেমন দেখা যাচ্ছে যে-কোনো ক্ষমতাকে সংযমের বাঁধ ভেঙে যাবে। যদি পদলিশের উপর বোমা পড়ে বা শহরের শান্তি বিপন্ন হয়।

প্যারিসের মতো শহরেই এই ব্যাপার। আমেরিকার হালাচালও ওরই উনিশ-বিশ। গণতন্ত্রেরও নব আছে, দাঁত আছে। স্বাভাবিক সময়ে সে পোষা বেড়াল। সংকটের দিন বনবেড়াল। তার চোখে ধুলো দিয়ে একদল ছাত্র বা একদল শ্রমিক রাতারাতি বিপ্লব বাধিয়ে ক্ষমতা কেড়ে নেবে এটা সম্ভবপর নয়। সে তার নখদন্ড ব্যবহার করবেই। করলে যে পরের বার ভোট পাবে না তাও নয়। প্যারিসের ছাত্রবিদ্রোহের পর ফ্রান্সে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে দ্য গলেন্ড প্যাটিই জয়লাভ করে।

গণতন্ত্রী দেশে অধিকাংশ ভোট-দাতার হাতেই ক্ষমতার চাবি। তাদের ভাঁওতা দেওয়া, ভয় দেখানো ইত্যাদি বার দিলে সেটা থাকে সেটা হলো তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় ভোটদান। বৃহত্তে নয়, ব্যালোট-সেখানে নিয়ামক। কেউ যদি বৃহত্তেকেই নিয়ামক ভাবে তবে তাকে পদলিশের সম্মুখীন হতে হবে।

তখন আর কল্যাণকাটি করা চলবে না যে, “বন্ধ লেগেছে।”

যেদেশে গণতন্ত্রের পাট নেই সেদেশে বিদ্রোহ বা বিপ্লব করলে জনসাধারণের অধিকার খর্ব করা হয় না। কিন্তু যেখানে জনগণ ভোটার অধিকার পেয়ে গেছে ও তার ব্যবহারও ভালো করে জেনেছে সেখানে বিদ্রোহ বা বিপ্লব জনগণের হাত থেকে তাদের একটি মূল্যবান অধিকার হরণ করে। ফরাসী নির্বাচকমণ্ডলী তাই দ্য গলকেই সমর্থন করেছে, তাঁর পার্টির উপরেই শাসনের বরাত দিচ্ছে। ছাত্ররা পিটুনি খেলে সরকার জনসাধারণের আস্থা হারাতে না। জনমত সরকারের দিকেই যাবে। মাঝখান থেকে সাম্প্রস্তা হবে ছাত্রের দল। জনতাকে সঙ্গে না নিয়ে ছাত্ররা এগোতে পারে না। অথচ জনতা তাদের সঙ্গে চলতে রাজী নয়।

সবাই আজকাল চালাক হয়ে গেছে। জনতাও কমা চালাক নয়। জনতা যদি জানতে চায়, “তোমরা বন্দুকের নলের ভিতর থেকে ক্ষমতা বার করে নিয়ে নিজেরাই ভোগ করবে তো? আমাদের তাতে কী লাভ? এই যে আমরা ভৌতাদিকার খাটিয়ে রাজা উজীর মারছি, একবলকে হটাচ্ছি, আরেকদলকে বসাইছি এ অধিকার তো হারাতে হবে।” তবে এর কী দাবাব দেবে ছাত্ররা?

ছাত্ররা কেউ কাস্তেও ধরবে না, হাতুড়িও ধরবে না, চাষীর মতো বিয়ে করবে না, মজুরের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেবে না। এরা যদি স্বতন্ত্র একটা শ্রেণী হয়ে থাকে তো সেটা যে-কবছরের স্কুল-কলেজে কাটে সেই কবছরের জন্যে। তার পরে এদের চাকরি-বাকরি বা ওকালতী-ডাক্তারি অনুসারে এদের শ্রেণী নির্ণয় হয়ে যাবে। তখন আর ছাত্রশক্তি নয়, উকীলশক্তি বা ডাক্তার শক্তি বা চাকুরে শক্তিই এদের শক্তি। শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে এইসব মধ্যবিত্ত ঘরের চাকুরে বা উকীল বা ডাক্তারদের এমন কী চিরস্থায়ী সম্পর্ক আছে যে এদের জন্যে শ্রমিক তার জীবিকা বিপন্ন করবে বা কৃষক তার প্রাণ বিপন্ন করবে।

এটা একপ্রকার সোয়ানে সোয়ানে কোলাকুলি। কদাচ কখনো ছাত্রদের সঙ্গে শ্রমিক বা কৃষকরা একই আসরে নামতে পারে, কিন্তু কাজ কুরোলেই যে যার নিজের স্বার্থ বন্ধে নেয়। স্বার্থে স্বার্থে বিচ্যুত বাস্তবতে পারে। ছাত্ররা স্বতন্ত্র একটা শ্রেণীও নয়, তারা যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সে শ্রেণী ক্ষণকালেও জন্যে সংগ্রামের খাতায় নাম লেখালেও তার স্বার্থে শ্রমিক স্বার্থ বা কৃষক স্বার্থ নয়। শ্রেণীস্বার্থ যদি সত্যি সত্যি বাস্তব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররাও কাটা পড়বে। কেউ বিশ্বাস করবে না

যে, তাদের বাপ-খুড়োরা শত্রু হলেও তারা শত্রু নয়, মিত্র। তাদের আত্মীয়-গোষ্ঠী দৈত্যকুল হলেও তারা এক-একটি প্রহ্লাদ। যেহেতু তারা ছাত্র। ছাত্রই বা কেমন করে তাদের বলা হবে যখন তারা ছুলেও পড়াশুনা করে না, কলেজে গেলে পড়াশুনার জন্যে বায় না, যন্ত্র কগড়া করতে, তাম্ভব নাচতে?

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ছাত্রদের নিজস্ব কয়েকটি সমস্যা আছে যার জন্যে তারা অশান্ত। ছাত্র অশান্ত যেমন করে হোক দূর করতেই হবে। দূর করবে সমাজ, করবে রাষ্ট্র। কিন্তু নিজস্ব সমস্যা আছে বলেই তারা শ্রেণী-বৃদ্ধ বা বিপ্লব করবে এটা একটা উৎকট দাবী। দাবী যদি ন্যায্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায় তবে কারো কাছে সহানুভূতি পাবে না। তাদের শ্রেণীমিত্রতাও একদিন তাদের পরিত্যাগ করবে। তখন মোহতগ অবশ্যম্ভাবী।

শিক্ষার পুনর্গঠন প্রাপ্ত অত্যাৱশ্যক হয়েছিল। ছাত্রবিদ্রোহের ফলে পুনর্গঠনের দিকে সরকারের ও সমাজের নজর পড়েছে। ছাত্রবিদ্রোহ সে হিসাবে ব্যর্থ হয় নি। এটাও সত্য যে সমাজের তথা রাষ্ট্রের পুনর্গঠন না হলে শিক্ষার পুনর্গঠন হবে বেশিদূর যাবে না। ছাত্ররা আবার বিদ্রোহী হবে। অপর পক্ষে এটাও মনে রাখতে হবে যে, কাস্তের মতো বক্ষণশীল সমাজ ছাত্রদের ভয়ে ভীত হবে না। এসব হলো সামঞ্জস্যের ব্যাপার। সামঞ্জস্য রাতারাতিও হয় না, একতরফাও হয় না। যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাদের স্বার্থও বিবেচনা করতে হবে। তাদের স্বার্থ তারা অংশত ছাড়তে পারে, সম্পূর্ণ ছাড়বে না। শিক্ষাসংস্কার তাই কিস্তিবন্দীভাবে হতে পারে, সমাজের পরিবর্তনও তেমনি দফায় দফায়। বিপ্লব এর নাম নয়।

সগজটা পচনখরা বর্জ্যো প্রতিক্রিয়াশীল, অতএব ছাত্রদের উপরেই ইতিহাস বরাত দিয়েছে যে, তোমরাই এখানে বিপ্লব আদি ঘটাবে, এটা একটা মোহ। যারা পড়াশুনার ভালো তাদের মধ্যেই এ মোহটার প্রাদুর্ভাব বেশি। কারণ তাবা জ্ঞানবৃদ্ধির ফল খেয়েছে। আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের সেরা ছাত্ররাই নাকি ছাত্রশক্তির বৈপ্লবিক ভূমিকায় নিমস্বেহ। এতদিন পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান ছিল যে, বেশি পড়াশুনা করে মানব সংস্কারবাদী হয়, মানুষের ষোড়শটি হস্ত তর্কে-বিলকে। এখন দেখা যাচ্ছে শব্দ স্বাধীনবাসীও হয়। বিশ্বাসে মিলায় বিপ্লব, তর্কে বহুদূর।

এর মধ্যে ভরসার কথা এই যে, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হামলাব ভয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানবৃদ্ধ থাকলে তো ছেলেরা জ্ঞানবৃদ্ধির ফল ভক্ষণ

করবে। আমাদের এই গরীব দেশে আমরা এক কলকাতা শহরেই চার্লস হাজার পুঁলিশ মোতায়েন করতে পারব না। তার চেয়ে পড়াশুনার পাট একেবারেই ছুলে দেব। যার ইচ্ছা সে ঘরে মাস্টার রেখে পড়বে। অধ্যাপকরা সেইভাবেই প্রতিপালিত হবেন। যারা উদ্যোগী পুঁজু তাঁরা টিউটোরিয়াল হোম খুলে অধ্যাপনা চালাতে পারেন। সেকালের চতুষ্পাঠীর আধুনিক সংস্করণ। তারপর কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ ইত্যাদি উপাধি বিতরণ করতে পারেন। তার জন্যে পদীকার কী দরকার। পরীক্ষা পড় করারও প্রয়োজন হবে না।

এখানে বলে রাখি যে, সব দেশেই শিক্ষাব্যবস্থা বিবর্তনশীল। কোথাও বৈপ্লবিক নয়। ছাত্রদের হাতে বিপ্লবের ভার কেউ কোথাও দেয় না। এমন কি রুশে চীনেও না। ছেলেরা আগে পড়াশুনা করবে, তার পরে রাজকর্ম করবে, কেউ কেউ রাজনীতিতে যোগ দেবে। সে রাজনীতি কোনো কোনো দেশে বৈপ্লবিক। আমাদের এদেশে আধা-বৈপ্লবিক। কিন্তু পড়াশুনা ছেড়ে কাজকর্ম ছেড়ে কেবলমাত্র বৈপ্লবিক রাজনীতি নিয়ে থাকা কোথাও কখনো লক্ষ লক্ষ ছাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। ইতিহাসে আর কোথাও এর নজীর নেই। সুতরাং ছাত্রশক্তি বলে সম্প্রতি যে ভঙ্গ প্রচারিত হচ্ছে সে ভঙ্গ ভিত্তিহীন। তার পেছনে সত্য যদি কিছু থাকে তবে সেটা এই যে, ছাত্রদের আসরে নামতে দেখে শ্রমিকরাও আসরে নামবে, তা দেখে কৃষকরাও নামবে। কিন্তু শ্রমিকরা যদি সরে দাঁড়ায় তা হলে কী হবে? ছাত্রদের নিজেদের দৌড় কতদূর?

বিপ্লবের দাবী নিয়ে আসরে নামা প্যারিসে বন্ধ হয়ে গেছে, আর কোথাও বিপ্লবের ডাকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বিপ্লব ছাড়া আরো একটা জিনিস আছে। বিবর্তন। বিবর্তন কোনোখানেই বন্ধ হয়ে যায় নি, বন্ধ হতে পারে না, বিবর্তনে যাদের আস্থা আছে তারা সব দেশেই সব সময় সক্রিয়।

ভারত বিবর্তনের পথ বেছে নিয়েছে। এ পথ বিপ্লবের মতো রাতারাতি ফল দেয় না। সেই কারণে এ পথ মনকে নাড়া দেয় না, বৌবনকে দোলা দেয় না। কিন্তু এ পথ প্রতি-বিপ্লবের বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচায়। বিপ্লব হলে প্রতিবিপ্লবও অবশ্যম্ভাবী। গৃহযুদ্ধ তো বাস্তবেই, বিদেশী সৈন্যরাও এসে ঘাঁটি গেড়ে বসবে। যারা এদেশকে ভিয়েতনামে পরিণত দেখলে খুশি হয় তারা কি কম্পনা করতে পারে না যে,

[শেবাংশ ২২৬ পৃষ্ঠায়]



দলন্ত গ্রামের এক এপ্রিলেই ফুলদারাম তাঁর প্রথম মামলায় দায়রা-সোপদ হয়েছিলেন। বছরটা ছিল ১৯০৬।

১৭ই এপ্রিল, মেদিনীপুরের জজের ম্যাজিস্ট্রেট মন্মথকুমার দেব ফুলদারামকে দায়রা-সোপদ করতে গিয়ে বলালেন :

“তুমি ফুলদারাম বস, তোমাকে আমি প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, এম কে দেব, অভিযুক্ত করছি—

প্রথমতঃ তুমি ২৮শে ফেব্রুয়ারী নাগাদ মেদিনীপুর পুরোয়া জেল-চক্রে ‘ক’ চিহ্নিত ইস্তাহার বিলি করে ব্রিটিশ ভারতে আইনভঃ প্রতিষ্ঠিত ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বেষ অথবা ঘৃণা সঞ্চারের এবং অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করছ; তার ফলে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারাবলে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করছ এবং তা দায়রা আদালতের বিচার্য এস্তিয়ারে পড়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, তুমি ২৮শে ফেব্রুয়ারী নাগাদ মেদিনীপুর পুরোয়া জেল-চক্রে ইউরোপীয়ান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এ দেশীয় সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করার অথবা উত্তেজিত হতে পারে এই অভিপ্রায়ে ‘ক’ চিহ্নিত ইস্তাহার বিলি করছ; তার ফলে

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৫ (গ) ধারাবলে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করছ এবং তা দায়রা আদালতের বিচার্য এস্তিয়ারে পড়েছে।

তাই আমি এই নির্দেশ দিচ্ছি যে, উল্লিখিত অভিযোগে দায়রা আদালতে তোমার বিচার হোক।”

কারণ

কারণ হিসেবে ম্যাজিস্ট্রেট দেব লিখলেন :

“জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মামলাটির নিষ্পত্তির ভার আমার ওপর দিয়েছেন। ১২৪ (ক) ধারার মামলা বিচারে আমার অধিকার নেই; তাই আমি কেবল ফৌজদারী কার্যবিধির অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিধান মতো একটা তদন্ত করছি।”

সরকার পক্ষের অভিযোগ হল এই : এখানে যখন প্রদর্শনী হিচ্ছিল তখন এই পনেরো বছরের বালকটি প্রদর্শনী দর্শকদের মধ্যে ‘ক’ চিহ্নিত ইস্তাহার বিলি করছিল। প্রদর্শনী সেস্টারির হুকুম মতো হেড-কনস্টেবল তাঁক পাকড়াও করে। কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া হব। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই বিষয়ে তদন্ত করেন এবং স্থানীয় সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার অধিকার দেন জেলার পুলিশ

সুপারিন্টেন্ডেন্টকে। তাই করা হয়। সরকার পক্ষ ১০ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তাদের কয়েকজন নিতান্তই নিয়ম রক্ষা হিসেবে; বরেক জনের সাক্ষ্য কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। এই ‘ক’ চিহ্নিত ইস্তাহার বিলি করেছিল বলে আসামীকে সনাক্ত করেছে কেবল ৫, ৬, ৭, ১১ ও ১৩ নং সাক্ষী। ২ ও ১০ নং সাক্ষী অন্য যে ইস্তাহার বিলি করার কথা বলেছে তা আদৌ রাজ-দ্রোহাত্মক বলা চলে না এবং তা অভিযুক্ত করবার অনুমোদনও পাওয়া যায় নি। এই অভিযোগটি শুধু ‘ক’ চিহ্নিত ইস্তাহারের জন্য।

আসামী পনেরো বছরের এক বালক মাত্র। গ্রেপ্তারের পর সে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক বিবৃতি দিয়েছে; এখনও সে সেই বিবৃতিতে অবিচল আছে। সে ঐ বিবৃতিতে বলেছে যে, একজন দাড়িওলা লোকের কাছ থেকে সে কিছু কাঁপ পেয়েছিল এবং সে না পড়েই তার কয়েকটি বিলি করেছিল। এই বিবৃতি তারই প্রমাণ সাপেক্ষ।

এখন মামলা যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে এটি পরিষ্কার যে, আসামী যদি এই ইস্তাহার বিলি করে থাকে তবে নিশ্চয়ই সে এর মর্ম জানে; কেন না সরকার পক্ষের মতে ইস্তাহার বিলি মাত্র একদিনে বা একটি-দুটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। তার কাজের তাৎপর্য বোঝবার মতো যথেষ্ট পরিপক্ক বোধ তাব ছিল কি না তা অবশ্যই আলাদা ব্যাপার।

সরকার পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণেও কিছু হেরফের ঘটেছে—বিশেষ করে তার গ্রেপ্তার ও তাকে ছাড়িয়ে নেবার ব্যাপারে। সরকারপক্ষের ৫ নং সাক্ষী হেড-কনস্টেবল এখন বলেছে যে, আসামীকে তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে (ছিনিয়ে) নেওয়া হয়েছে; পক্ষান্তরে, একজন সম্মানভাজন সাক্ষী (৪ নং) বলেছেন, জর্জন সন্তোষবাবু অনুযোধ্য-ক্রমে হেড-কনস্টেবল তাকে ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য ১২৪ (ক) ধারা থাকতে ছিনিয়ে নেবার অভিযোগ আর আনা হয় নি। আসামীকে ধরবার সময় তার হাতে কত ইস্তাহার ছিল তা নিরৈক সাক্ষ্যের তারতম্য আছে। কেউ বলেছে ১৫০, কেউ ৬০, কেউ বলেছে একটিও না। ৮ নং সাক্ষী বলেছে, আসামীকে ধরবার সময় তার হাতে কোনরকম ইস্তাহার ছিল না, মাটিতেও পড়ে থাকে নি। অতএব হেড-কনস্টেবলের বিবৃতি থেকে অনেক জায়গায় তারতম্য ঘটেছে। এসব তারতম্যের মৌল মূল্য বিচার আমার কাজ নয়। তবে এই মামলায় এমন সব সাক্ষ্য আছে যা মেনে নিলে আসামীর দণ্ড হবে। এ বিষয়ে শ্বিভত নেই যে,

ক' চিহ্নিত ইস্তাহারটি রাজদ্রোহাক্ষক এবং কেউ যদি তা বিলি করে থাকে তবে সে নিঃসন্দেহে তাঃ দঃ বিধির ১২৪ (ক) ও ৫০৫ ধারা বলে অপরাধী। সুতরাং এই দুটি দফাবই চার্জ গঠন করা হয়েছে এবং এসব ক্ষেত্রেই দায়বা আদালতে বিচারের জন্য আসামীকে সোপদ করলাম।”

যেইমাত্র ক্ষুদীরামকে দায়বা সোপদ করা হ'ল অর্নি তার আগের লামীন নাকচ হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কোর্টের লাগোবা এই হাজতে দটো বেজে গেল, তবু এক গ্রাস খাবার ব্যবস্থা হ'ল না। সাবাটা দিন উপোস। সন্ধ্যা ছটায় কিছু খাবার মিলল। সেশট্রাল জেলে নিয়ে যাবার আগে তার হাত দটো শক্ত লোহার হ্যান্ডকাফে বন্দী; কারণ, কচ্'পক্ষের দৃষ্টিতে এখন ক্ষুদীরাম এমন এক ব্যক্তি বলে গণ্য যিনি পরাক্রমশালী সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন নেড়ে দিয়েছিলেন।

সকাল এটায় বসেছিল আদালত। কেবল কোর্ট নয়, স্কুলও ওদিন থেকে সকালবেলায় বসবার কথা। তবু আদালতকক্ষ ছাত্র ও দর্শকে পরিপূর্ণ। গত ১ই এপ্রিল হয়েছিল সরকার-পক্ষের একাদশ সাক্ষীর সাক্ষ্য। তারপর আজ (১৭ই) দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সাক্ষী যথাক্রমে অস্থায়ী মনসেফবাবু ললিত-মোহন বসু বি-এল এবং সুবাদার মঙ্গল তেওয়ারীর সাক্ষ্য। ক্ষুদীরামের পাশে আরও দশটি বালকে ডকে দাঁড় করানো হয়েছিল। ললিতবাবু ক্ষুদীরামকে সনাক্ত করতে পারেন নি।

ক্ষুদীরাম বনাম ওয়েস্টন

৩১শে মার্চ মৌদীনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডি ওয়েস্টনের কাছে ক্ষুদীরাম বলেছিলেন :

“আমার নাম ক্ষুদীরাম বসু। আমি কায়স্থ, বৃত্তিতে তাঁতি। আমার বাড়ি সদর থানার বর বল্লভপুর মৌজায়। আমি সেখানে থাকি।”

“তুমি কি স্বেচ্ছায় এই বিবৃতি দিচ্ছ, না, কেউ তোমায় পরামর্শ দিয়েছে?”

“আমি স্বেচ্ছায় এই বিবৃতি

দিচ্ছি, কেউ আমায় শিথিয়ে দেয় নি।”

“—তুমি কি বলতে চাও?”

“—মেলা বন্ধ হবার আগের দিন আমার অচেনা দাড়িওলা লোক কিছু লাল ও সবুজ কাগজ বিলি করছিল; সে আমাকে ছটা কপি দেয়; আমি তাই থেকে দটো দিয়ে দি; এতগুলো আমার দরকার ছিল না। তখন পুর্লিশ জমাদার আমার কাছে এসে বলে, বাবু আমাকে ডাকছে। সে তখন আমাকে তার বাবুবা কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে আমার হাত ছেড়ে দিতে বলি, আমি নিজেই যাব। সে হাত ছাড়ে না; আমি তাই হাতটি ছিনিয়ে নি ও বাড়ি চলে যাই। আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ঐ চারটে কাগজও আমার হাত থেকে পড়ে যায়।”

“—জজ যৌদিন পুরস্কার বিতরণ করছিলেন সেদিন তুমি মেলায় গেছলে?”

“হ্যাঁ, সেদিনই আমি কাগজ-গুলো দিয়েছিলাম। আমি সকাল দশটায় গিয়েছিলাম।”

“—বিলি করার আগে তুমি কাগজগুলো পড়েছিলে?”

“—পরদিনের আগে আমি একটিও পড়ি নি। আর একজনকে ছেলের কাছে আমি ওটা পেয়েছিলাম।”

“—পুরস্কার বিতরণের আগের দিন তুমি কেন ইস্তাহার বিলি করেছিলে?”

“—না।”

“—যে দাড়িওলা লোক তোমায় কাগজগুলো দিল আগে তুমি তাকে কখনো দেখেছ?”

“—না।”

“—এখন যদি তাকে দেখ চিনতে পারবে?”

“—হ্যাঁ।”

“—এই কাগজের কপিই কি তুমি দিয়েছ?”

“—হ্যাঁ।”

যৌদিন মামলা আরম্ভ

১ই এপ্রিল জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মন্মথ দেবের আদালতে মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। ১১ টার পর কালেক্টরেটের দিকে চার দিক থেকে দর্শক ও ছাত্রদের বন্যা নেমে আসে।

প্রত্যেকেই ছেলোটিকে দেখবার জন্য উৎসুক। ক্ষুদীরামের নামোচ্চারণ করা হলে ক্ষুদীরাম ডকে আসে। আদালত-কক্ষে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সম্ভার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ঐ কোমল-কালিত বালকটির ওপর। তার এই অল্প বয়স সম্ভার হৃদয়ে সহানুভূতি উদ্ভূত করল; সম্ভারই চিন্তা উদ্বেলিত করে একটি প্রশ্ন জাগতে লাগল : সম্ভার কি করে তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহে অভিযোগ অন্য অনুমোদন করলেন?

সরকারপক্ষে ছিলেন সরকারী উকিল যোগেন্দ্রনাথ হালদার এম-এ, বি-এল; তার ক্ষুদীরামের পক্ষ সমর্থনে ছিলেন দুজন ব্যাবিটার সবশ্রী কে বি দত্ত ও পি কে বসু এবং মতিলাল মদ্যাজী বি-এল। শ্রীদত্ত উঠে গবর্ণমেন্ট যে ক্ষুদীরামের বিরুদ্ধে মামলা করার হুকুমনামা মঞ্জুব করেছেন সরকারী উকিলের কাছে তা চাইলেন। কিন্তু সরকারী উকিল রাজি না হওয়ায় একটা বিতর্কের সৃষ্টি হ'ল। শ্রীদত্ত তখন তৎসংক্রান্ত একটি আবেদনপত্র দাখিল করলেন। তারপর শ্রীদত্ত জানতে চাইলেন, এই মামলা নিষ্পত্তির জন্য জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীদেব বিশেষ অধিকার পেয়েছেন কি না। শ্রীদেব জানানলেন, না, অভিযোগ দাঁড়িয়ে গেলেই তিনি তা দায়বায় পাঠিয়ে দেবেন।

জেলা পুর্লিশ সুপারিস্টেডেন্ট ছিলেন প্রথম সাক্ষী।

প্রথম গ্রেপ্তারের সংবাদ

অমৃতবাজার পত্রিকার ২রা এপ্রিলের সংখ্যায়, “মৌদীনীপুরে চাপ্তা : ১৫ বছরের বালক গ্রেপ্তার” এই শিরোনামায় আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার এই সংবাদটি ছাপা হয়ঃ—

মৌদীনীপুর, এপ্রিল ১। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রদর্শনী প্রাপ্তগণে একটি বালক “এই কি আমাদের শাসক সম্প্রদায়?” এই শিরোনামায় একটি ইস্তাহার বিলি করছিল। পুর্লিশ তার একটি কপি পায এবং তাতে রাজদ্রোহের গন্ধ পায়। এক হেড-কনস্টেবল শিগগিরই বালকটিকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ছেলোটি পালিয়ে



সেতে সমর্থ হয়। তখন তদন্ত শুরু হয় এবং কিছুকাল কোন আর ঘটনা হয় না। গত শতাব্দীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিজয়টিতে আবার মনোযোগ দেন এবং স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের একজন শিক্ষক ও ল্যান্ড একুইজিসান কেরানী-বাবু সত্যেন্দ্রনাথ বসু সহ কয়েক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ বসু ম্যাজিস্ট্রেট ভবন থেকে ফেরামাত্র তাঁর চাকুরী খতমের আদেশ-জারী হয় এবং ক্ষুদ্রিয়ারাম বসু নামে একটি পনেরো বছরের ছাত্রের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ান্ন জারি হয়। রাতি একটা নাগাদ একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও জনা-বারো কনস্টেবল নিয়ে স্বয়ং ইন্সপেক্টর স্থানীয় তাঁতের স্কুলে লরিকারে থেকে হঠাৎ ক্ষুদ্রিয়ারামকে পাকড়াও করে। বাবু পিয়ারীলাল ঘোষ, উকিল, রাত তিনটের সময় সদর থানায় জামীনদার হবার জন্য হাজির হন; কিন্তু তাঁকে জানানো হয়, অভিযোগ হচ্ছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ও ৫০৫ ধারামতে এবং জামীন দেবার কোন আদেশ গ্রেপ্তারী পরোয়ান্ন নেই।

পরদিন অবশ্য পিয়ারীবাবু জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে ৫০০ টাকার জামীন মঞ্জুর করিয়ে নেন।

অমৃতবাজারের ওরা তারিখের কাগজে যে খবরটি কোন এক বিশেষ সংবাদদাতা পাঠান সেটি ভারি কৌতুহলপ্রদ। অবশ্য সেটির তারিখও ১লা এপ্রিলই। তিনি লেখেন :—

“গত শিল্প প্রদর্শনীটি উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে জেলা ছয় ডি ওয়েন্স্টন, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তি এবং ভদ্রমহোদয়গণের উপস্থিতিতেই সেক্টরারী গোসাই দাস দত্ত ও রামচরণ সেনের বহুবিধ সতর্ক ব্যবস্থা সত্ত্বেও চারদিক থেকে “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি উঠিত হয়। [সেকালে “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি কার্ভতঃ নিষিদ্ধ ছিল এবং এজন্য বহু নিষাভন হয়েছে। সন্ধ্যার মনে ভয় জাগতে লাগল পাছে ওয়েন্স্টন কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু মনে হ’ল, এ ব্যাপারে তিনি কণপাণ্ড করেন নি। তারপর মেলার সমাপ্তি দিবসে এলাহাবাদের “পাও-নীর্যার” বাংলা ভাষায় “এরাই কি আমাদের রাজা” এই মর্মে এক ইস্তাহার পান; এটি নাকি মেলা চত্বরের বাইরে বারি হয়েছে।

সেদিন পুলিশের সঙ্গে রামচরণ-বাবুর যাতায়াত কিছু সন্দেহজনক ছিল : এবং কিছু পরেই একজন হেড-কনস্টেবল ১৫ বছরের একটি বালককে গ্রেপ্তার করে। তার হাতে নাকি দু-তিনটি ঐ কাগজ ছিল। হেড-

কনস্টেবল যেখানেই নিয়ে যেতে চায় বালকটি সেখানেই যেতে রাষ্ট্র, কিন্তু তার হাত ছেড়ে দিতে হবে; সে তো কোন অপরাধী নয়। কিন্তু হেড-কনস্টেবল তাকে অপমান করে এবং তাকে হিচড়ে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে; তখন ছেলেটি ভয়েই হোক কি রাগের বশেই হোক, কেন না, তার ধারণা তাকে অবৈধ ও অন্যায়ভাবে ধরা হয়েছে, সে নিজেকে ছিনিয়ে নেয়। পুলিশের ভাষা হচ্ছে, সে হেড-কনস্টেবলকে বেশ একটি জোর ঘৃষি মেরে চলে যায়। এ ঘটনাকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১লা মার্চ থেকে পুলিশ তদন্ত শুরু হয়। কিছুদিন ধরে তারা এখানে-সেখানে খোঁজ করে; তারপর মনে হ’ল যেন সব চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে রামচরণবাবু পুলিশকে সর্ববিধ উপায়ে সাহায্য করছিলেন এবং বলা যায় প্রধান সাক্ষী, তিনি ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে কোথাও চলে গেছিলেন এবং এজন্য ব্যাপারটায় অগ্রসর হওয়া যায় নি। তিনি এখন ফিরে এসেছেন এবং কাল অকস্মাৎ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বাড়িতে রামচরণবাবু, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ বসু (ল্যান্ড একুইজিসানের হেড ক্লার্ক), একটি মুসলমান ছাত্র ও আর এক ভদ্রলোককে ডেকে পাঠান। তাঁদের বিবৃতি নেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের সত্যেন্দ্রবাবুর বিচারাটি পরিদর্শনের কথা ছিল। কিন্তু সত্যেন্দ্রবাবুকে অফিস থেকে ডেকে পাঠানো হয় এবং তিনি যখন ম্যাজিস্ট্রেট ভবন থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর পদচ্যুতির আদেশ জারি হ’ল। এতে সরকারী কর্মী মহলে চাম্পল্যের সৃষ্টি হয়েছে।”

রাতের সংবাদ আরও ভয়ঙ্কর। “বন্দে মাতরম্” সম্প্রদায়ের” তাঁত স্কুলটির সঙ্গে একটি বোডিং আছে; কোন কোন সময় সেখানে কেউ কেউ রাত কাটায়। গত রাতি একটা নাগাদ তিনজন সাব-ইন্সপেক্টর ও দশজন কনস্টেবল জোর করে ঐ স্কুল ভবনে ঢোকে এবং ক্ষুদ্রিয়ারাম বসু নামে একটি বালককে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে ১২৪ (ক) ধারার মামলা রাজদ্রোহাত্মক ইস্তাহার বিলির জন্য এবং ৫০৫ ধারা গবর্ণমেন্টকে অবমাননা করার জন্য। এতে জামীন হয় না ক্ষুদ্রিয়ারামের পক্ষাবলম্বী উকিলরা চেষ্টা করেও রাতে কিছু করতে পারেন নি। ক্ষুদ্রিয়ারাম তখন ভাত খাচ্ছিল যখন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের জন্য ঘরে ঢোকে। সে কথা দিলে তাকে হাত-

মুখ ধোবার অনুরাগিত দেওয়া হয়। তারপর তাকে থানায়, থানা থেকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। সে সব লাঞ্ছনা ধৈর্যের সঙ্গে এবং বীরের মতো সহ্য করেছে।

“He bore the trial patiently and heroically.”

সে পনের বছরের বালকমাত্র এবং কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। সারা শহর এই সংবাদে চমকল।

শেষ পর্যন্ত বিরত সরকারই পরবর্তী শুনানীর দিন মামলাটি সামান্য বাজে অজুহাতে প্রত্যাহার করে নেন। সকল পক্ষই আপাতভঃ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তারপর একদিন বোমা পড়ল মঞ্জুরপুরে এবং ফাঁসীর মধ্যে উঠল এই ক্ষুদ্রিয়ারাম। পলায়নপর জনতার কেউ গুলী খেয়ে শহীদ নয়, দেশ-প্রেমের মূল্যস্বরূপ সজ্জানে স্মিত-হাস্যে ফাঁসীর রক্ত চন্দনের শহীদ।

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব, গাণিতিকর, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন), ৮৮-২ রবি অহম্মেদ কিদোয়াই রোড, “জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন” কলিকাতা-১০। সময় বৈকাল ৫-৭টা। ফোন : ২৪-৪০০৫। প্রেসিডেন্ট—মি অল ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েটেড ক্যাল এন্ড এ্যাসোনিক্যাল সোসাইটী স্থাপিত ১০০৭ খ্রীঃ বিবাদেহাযা এই মহাবানবের বিশদ্রক্য ভবিষ্যদ্বাণী, হস্তরেখা ও কোষ্ঠী বিচার, জাতিক ক্রিয়াকলাপ ভারতের জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রের ইতিহাসে অবিভী য। তার পৌরবর্য প্রভিতা শুধুমাত্র ভারতে নয়,—

বিখ্যাত পণ্ডিত দেশ (২২ জুলাই, আমেরিকা জাতি, ২৭, ৮ জ্যোতিষা, চীন, জাপানী জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর) প্রভৃতি পরিবাণ্ড। গুরুত্ব চিত্রাবিদ্যা প্রভৃতি অস্ত্রের জ্ঞানিয়েছেন স্বতন্ত্র অভিনন্দন। প্রসঙ্গোপন্ন সহ কয়েকশের জন্য ৫০ পয়সার ভাণ্ডারীকট পাঠাইবেন। বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অভ্যাসার্থ্য কবচ।

বন্দা কবচ—সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতির মন্ত্র ১১-৪০, বৃহৎ ৪৪-৪৪, মহাশক্তিশালী ১৪২-১১। বর্ণলাক্ষণী কবচ—সুজনশ, সামলার জয়লাভ ও কর্ণোয়তি হয় ১০-৪৪, বৃহৎ ৫১-১৮, মহাশক্তিশালী ২০০-০১। মোহিনী কবচ—ধারণে চিরশত্রুও মিত্র হয়—১৭-২৫, বৃহৎ ৫১-১৮, মহাশক্তিশালী ৪৪-৪৪। সুরক্ষতী কবচ—বিভোয়তি ও পরীক্ষার স্বকল ১৪-০৪, বৃহৎ ৫৭-৪৪।



মায়ের পায়ের ধুলো নিল। শেষে মা-কে জড়িয়ে ধরল। মা হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। পটল গাঙ্গুলি হাসছে মিটি মিটি। সেও একে একে গুরুজনের প্রণাম করল। আর গুরুজনেরা জামাই আদরেই তাকে ঘরে নিয়ে গেল।

বিয়ের সাত বছর বাদে জামাই সহ মেয়ের এই প্রথম পদার্পণ বাড়িতে। এর আগেও অনেক ছোট-বড় অনুষ্ঠানে মেয়ে-জামাইয়ের নেমন্তন্ন হয়েছিল। এই তো বছর দেড়েক আগে রমার ছেলের মূখে ভাতের সময়ও রমা নিজে গেছিল কাঁচড়াপাড়ায় ওদের নেমন্তন্ন করতে। অতসী একে দেখে খশি হয়েছিল। কিন্তু

সাত বছরের মধ্যে এই ভোজবাজীর ব্যাপারটা ঘটে গেল। সাত বছর আগে যে লোকটাকে জেলে দেবার জন্য সকলে উঠে-পড়ে লেগেছিল, আর ঘরের মেয়েটার দৃশ্যই দেখে যারা হায় হায় করেছিল, কতব্যের তাগিদে যারা সেদিন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল, সাত বছর বাদে আগে থাকতে প্রস্তুত হয়ে দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়েছিল। অতসীর ছোট গাড়িটা বাড়ির সামনে দাঁড়ানোমাত্র তার তিন কাকা হাসিমুখে এগিয়ে এসে জামাইকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তাদের পিছনে অতসীর মা দাঁড়িয়ে। গাড়িটা এসে দাঁড়ানোমাত্র অতসীর দুই খুঁড়তুলো বোনও এগিয়ে এসে শাকি বাজাতে শুরু করেছিল। খুঁড়তুলো বোন দু'টি অর্ধাং গীতা আর রমা আগে থাকতেই এই প্র্যান করে রেখেছিল। শাকি বাজাতে শুনে আশ-পাশের বাড়ির মেয়ে-বউরা উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল। ওই বাড়িতে আজ ছোট-খাটো উৎসব আছে একটা সকলেই জানে। মীতর শ্বিতীয় ছেলের আজ বটা করে মুখে-ভাত সকলেই হয়ে গেছে।

**সাত
বছর
পরে**

রাগিতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। তার মধ্যে এই একটা গাড়ি এসে দাঁড়াতে শাকি বেঞ্জে উঠল কেন?

নিরঞ্জন গুরুপে পটল গাঙ্গুলি নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছে কাঁচড়াপাড়া থেকে এ-পর্যন্ত। পাশে মেয়ে-কোলে অতসী বসে। দুই খুঁড়তুলো বোনের কাশ দেবে লজ্জা যেমন পাছে খুঁশিও তেমনি। আড়চোখে পাশের লোকের দিকে একবার তাকিয়ে হাসিমুখে নেমে এলো। বড়কাকা আগেই মেয়েটাকে কোলে নিয়েছে।

অতসী একে একে কাকাদের আয়

বলোঁছিল, সময় হলে যাব, এখন যেতে পারব না।

রমা রাগ করেই বলেছিল, সময় কবে হবে, তোর আরো বেশি টাকা, আরো বড় গাড়ি হলে?

অতসী জবাব দিয়েছে, না, মা যেদিন ডাকবে সেদিন যাব।

কিন্তু মা ভাকে নি। ডাকতে পারে নি। খুঁড়তুলো বোনেরা আর ককাকা মা-কে কতবার অনুরোধ করেছে। কিন্তু মা শুনু কেবোছে। দেড় বছর বাদে এবারে গীতা এসেছিল নেমন্তন্ন করতে। অতসীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে চুপি-

চুপি বলছে, দিদিভাই, এবারে বড়মার হুকুম, তোর না গিয়ে উপায় নেই—কি কান্ড হয়েছে তুই জানিস না, ভোররাতে বড়মা স্বপ্ন দেখল, জ্যাঠা চোখ রাঙিয়ে বকছে বড়মাকে, মিছিমিছি মেয়েটাকে কণ্ট দিচ্ছ কেন—ডাকতে পারো না?

অতসী করকর করে কেঁদে ফেলেছে। তারপর ছুটে গেছে পটল গাঙ্গুলির কাছে।—শুনছ, মা ডেকেছে, গীতার ছেলের অপ্রাশন, আমি যাব!

মন দিয়ে হিসেব দেখছিল পটল গাঙ্গুলি। মদু তুলে গীতাকে দেখে হেসে, অভ্যর্থনা জানিয়েছে, শালী দেবী যে! তারপর স্ত্রীর বিকে ফিরে বলেছে, বেশ তো, মেয়েকে নিয়ে তুমি ঘুরে এসো।

—আর তুমি?

—আমি আবার কেন।

অতসী তক্ষুণি রেগে আগুন, দেখো, সাতটা বছর ধরে এই দিনের অপেক্ষার আছি—ফের ও-কথা বলবে, তো তৈমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না বলে দিলাম!

গীতা সবিম্বয়ে দেখল পাড়ার সেই লম্পট ছেলে পটল গাঙ্গুলি সন্ধ্যায় দু'হাত জোড় করে বলে উঠল কি সর্ব-নাশ! যাব—যাব, তুমি হুকুম করলে শ্বশুর বাড়িতেই থেকে যাব!

গীতা দিন-কতক ওদের থেকে আসার জন্যেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল জ্যেষ্ঠির হয়ে। কিন্তু এমনই বরাত, উৎসবের ঠিক পরদিন ভোররাতে এক গ্রীক বোকাই মাল যাবে ইউ, পি-তো। সেই ব্যস্ততায় ঘরের লোকের উৎসবে যাওয়ার ফুরসত মেলানি ভার। চেষ্টা-চরিত্র করে সে-সময় না-হয় করা যাবে, কিন্তু এ-যাত্রা থাকা মুশকিল। সেই রাতেই ফিরে আসতে হবে।

গীতা বলছিল, তাহলে তোর বর না হয় চলে আসবে, এতকাল বাদে গিয়ে তুই সোদিনই ফিরবি কি! স্বামীর সামনেই অতসী হেসে হুকুটি করেছে এ কি আর তোদের মতো ভদ্রলোক বর, কি চরিত্র জানিস না? না রে ভাই, যখন ও সময় পাবে তখন গিয়ে থাকবি।

উৎসবের ব্যস্ততার মধ্যেও দুই শালীর ঠাটা-তামাশা চলল। রমা এক-বার বলল, তোর মেয়েটা তো দিগ্বিদ্ব ফসাঁ হয়েছে রে দিদিভাই।

অতসীও পাশের লোকের দিকে একবার কটাক্ষ করে, তেমনি জবাব দিয়েছে, ফসাঁ হবে না তো, কি, কার মেয়ে তাতে তোর সম্পদ আছে না কি!

অতসী বেশ কাণো। মদুখতী মন্দ নয় অবশ্য, স্বাস্থ্যও ভালো। কিন্তু এই ষোণাযোগের (অঘটনেরও বলা যেতে পারে) আগে কাকারা মদুখ করে বলত, মেয়েটার গায়ের রঙই সব খেয়েছে।

অন্যদিকে পটল গাঙ্গুলির গায়ের রঙ ধপধপে ফসাঁ।

...সাত বছর আগে পাড়ার বে-পরোয়া বখাটে ছেলে পটল গাঙ্গুলি আর এই বাড়ির মেয়ে অতসীকে নিয়ে এক মর্মাস্তিক ব্যাপারই ঘটে গেছিল।

অতসীর বয়েস তখন পঁচিশ। বি-এ পাস করে তিন বছর ধরে ঘরে বসে আছে। তার বছর দশেক আগে বাবা মারা গেছে। বাবাকে কি ভালই না বাসত অতসী। সেই বাবা মারা যেতে ওর চোখে জগৎ অন্ধকার হয়ে গেছিল। দুই কাকা তারপর সন্মানে মানুষ করেছে ওকে। বি-এ পাস করার আগে থেকেই ওর বিয়ের চেষ্টা চলছিল। বাবা সে-রকম ভালো চাকরি কিছু করত না। মারা যাবার আগে সর্বসাকুল্যে মেয়ের বিয়ের জন্য আঠের হাজার টাকা সিরিয়ে রেখে যেতে পেরেছিল। কাকারা দু'জন বড় চাকরি করে। তেমন ভালো ছেলের সন্ধান পেলে আঠের হাজারের ওপরেও আরো পঁচ-সাত হাজার টাকা খরচ করতে আপত্তি ছিল না। খুঁজুতো দুই বোন গীতা আর রমা এক বছর দেড় বছরের ছোট অতসীর থেকে। তাদের গায়ের রঙ ফসাঁ। ওই দুই কাকার দুই মেয়ের অনেক আগেই নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেছে।

বাড়ির সামনেই ছোট একটা গলি। সেই গলির শেষ মাথায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত পটল গাঙ্গুলি তার বড়ুয়ী মায়ের সঙ্গে। সেই মা মরে যাবার পর ছেলে একাই থাকত সেখানে। লোকটা ওই ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে অন্যান্য ঘরের বাসিন্দাদের হাড় জুড়ুতো। কিন্তু সাহস করে সে মনো-ভাব কেউ প্রকাশ করতে পারত না। ঘরের মালিকও না।

পটল গাঙ্গুলির বয়েস তখন তিরিশ। সময়কালে কোনরকমে হায়ার সেক্রেটারি পাশ করোঁছিল। তারপর কিছুকাল শিক্ষানবিশী করে মোটর মেকানিক হয়েছিল। একটা মস্ত ফ্রান্সে চাকরিও পেয়ে গেছিল চেহারার জোরে। তখন সাড়ে তিন-শ' টাকার ওপরে মাইনো পার। মোটর মেকানিকের কাজ যখন করে তখন তার এক চেহারা, আর বাড়ি ফিরে চানটান সেয়ে প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট গায়ে চড়ায় যখন, তখন আর এক রকম। নিজের হাতে সারানো এক-একটা স্কককে মোটর নিজেই হাঁকিয়ে গলির মুখে নামে। তারপর ফিটফাট হয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার যখন সেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যায়, তখন মনে হয় ধরা

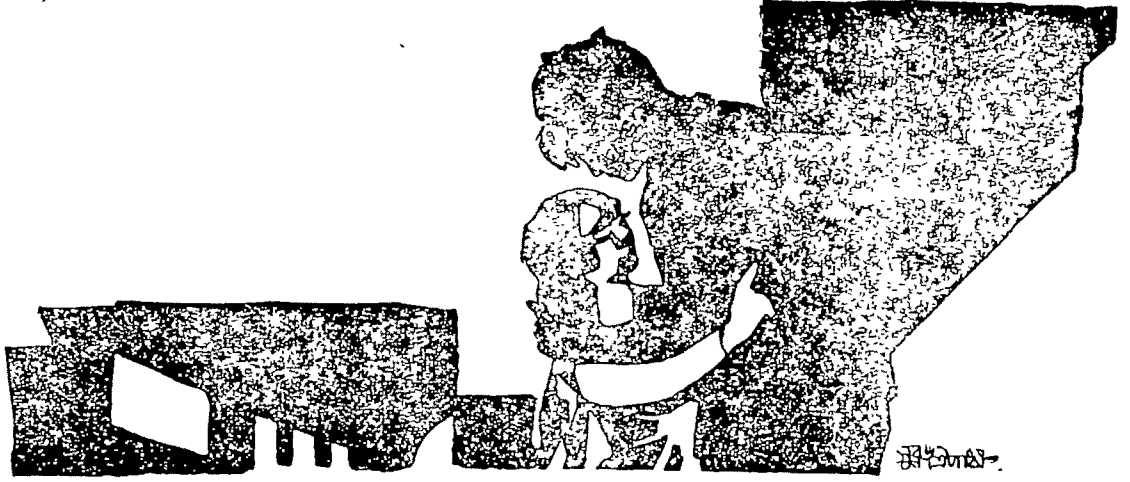
আয় সরায় কোনো তফাৎ নেই ওর চোখে।

ঘরে বউ নেই। পাড়া-প্রান্তবেশীরা বলত, ওই লম্পটের হাতে গেয়ে দেবে কে। যাবা জানত পটল গাঙ্গুলিকে, তারা মেয়ে দেবে না। যার জানত না, তারা আসত। কিন্তু পটল গাঙ্গুলি তাদের পাশা দিত না, কি, খোজখবর নিয়ে তারাই আর এ-মদুখো হত না বলা শস্ত। ও যখন ঘরে থাকত তখন পাড়ার এক দলগল বখাটে ছেলে আসত আস্তা দিতে। রোজগেরে বন্ধু পটল গাঙ্গুলি তাদের সদর। ওদের জোরেই তার জোর। পঁচ বছর আগেও দল বেঁধে মারামারি, খুনোখুনি করেছে। তিরিশ বছর বয়সে বাইরেব আচরণ তার থেকে একটু সভ্য-ভবা বটে—কিন্তু ক্ষেপলে যে আগের মতই দুর্দান্ত বেপরোয়া হতে পারে তাও সকলেই জানে।

গলির এই ছেলেটাই গত দশ বছর ধরে ফাঁক পেলেই খুনসুটি করে আসছিল অতসীর সঙ্গে। অতসীর যখন পনের বছর বয়েস আর ওর হুড়ি, তখন থেকে। ফাঁক পেলে ওর গিহন-পিছন ঘুরেছে। বাতাসে হাসি আর কথা ছুঁড়েছে। অতসী ওকে ভয় কবত তখন, ঘণা করত। ও যখন বি-এ পাড়ে, পটল গাঙ্গুলি বহুবার ওকে নিরি-বিলিতে দুই-একটা কথা বলার অভিনাষ জানিয়েছে। আর অতসী বরাবরই শত হাত তফাতে থাকতে চেষ্টা করেছে। মনে মনে রাগে জ্বলেছে, কিন্তু ভয়ে বাড়ির লোককেও কিছু বলতে পারে নি। জানত শ্বশুর জুড়ুতো বোনেরা। তা তারাও ওই গুন্ডাকে ভয়ই করে। বাড়ির লোক কিছু বললে রাগের মুখে শয়তানটা কি করে বসবে ঠিক কি!

অতসীর বয়েস যখন পঁচিশ আর পটল গাঙ্গুলির তিরিশ, তখনই ঘটল সেই অপ্রত্যাশিত কান্ডটা। অবশ্য পটল গাঙ্গুলি তখন আর আগেব মতো ওইভাবে পিছনে লাগত না। কাজে না বেরুলে গলির মুখে দাঁড়িয়ে নাটুয়ে সিগারেট টানত, আর সামনের বাড়ির নীচের বা ওপরের বারান্দায় অতসীকে একসা দেখলেই মিটিমিটি হাসত, একটু-আধটু চপল ইশারাও কবত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কার প্রত্যাশায় অমন দাঁড়িয়ে থাকত তাও কারো বুদ্ধিতে বাকি থাকত না। অতসীকে বারান্দায় দাঁড়াতে দেখলেই তার মা ওকে ছলে-বলে ডেকে নিত, কখনো বা ধমকের সুবে বলত, ও পাঙ্কীটাকে ওখানে দেখলে তুই বারান্দায় দাঁড়াস কেন, চলে আসতে পারিস না?

হঠাৎ একদিন মাথায় আগুন জ্বলল অতসীর। বাইরে কি কেনাকাটা কবতে গেছিল। বাড়ির কাছাকাছি আসতে



সাত বছর পরে

দেখে ওই মূর্তি গিলির মূখে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। অতসী ওর দিকে না তাকিয়েও অনুভব করতে পারে দুই চোখ দিয়ে গিলছে ওকে। নীচের বারান্দায় পা দিয়েই ঘুরে দাঁড়াল। চোখাচোখি হল। পটল গাঙ্গুলি দাঁতের কোপে ঠোঁটের কোণ কামড়ে হাসল একটু। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের স্যাঁডালটা হাতে নিয়ে অতসী ওটা দিয়েই কাছে ডাকল তাকে, অর্থাৎ এসো—

এত সাহস দুনিয়ায় কারো থাকতে পারে পটল গাঙ্গুলি কল্পনা করতে পারে না। আশপাশের দু' চারটে ছেলেও এই দৃশ্য দেখে প্রথমে হতভম্ব পরে ভয়ে কণ্টকিত। এদিকে বাড়িতে কাকারা নেই, খুঁড়তুতো বোনেরা তো শব্দুর বাড়ি।

পটল গাঙ্গুলির ফর্সা মুখ লাল হচ্ছে। আর কালো মেয়ে অতসী পথের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে হাতের স্যাঁডাল নেড়ে ডাকছে তাকে।

রাস্তা পেরিয়ে পটল গাঙ্গুলি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। অতসীর পাঁচ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে স্যাঁডালটা সজোরে পটল গাঙ্গুলির মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল অতসী। ঠাস করে লাগল ওটা। পটল গাঙ্গুলির ফর্সা মুখ ভয়াবহ রকমের স্থির। কিন্তু অতসী ছুটে পালাল না। পায়ের স্বিতীয় স্যাঁডালটা হাতে তুলে নিল।

স্তম্ভ মূর্তি কয়েকটা। দু'জনে দু'জনের দিকে নিশ্চলক চেয়ে আছে।

ঝুঁকে ওর স্যাঁডালটা হাতে তুলে নিল পটল গাঙ্গুলি। তারপর সেটা ছুঁড়ে অতসীর সামনে ফেলে দিল। আবার কয়েক পলক ওকে দেখে নিয়ে গিলির দিকে ফিরে গেল।

পমডায় ঘটনাটা রুটে যেতে সমস্ত

লাগল না। অতসী বাড়িগে কিছু বলে নি। কিন্তু বাড়ির লোক বাইরে থেকে শুনে দিশেহারা। কাকারা অতসীকে বাড়ির বার হতে নিষেধ করে নিল। কিন্তু তারা আপিসে পা বাড়ানো মাত্র অতসী আরো গোঁ-ভরে বাড়ি থেকে বেরোয়—মা কারিকমাদের কথা কানেও তোলে না।

পটল গাঙ্গুলিকে আর গিলির মুখে দেখা যাচ্ছে না, তবু পাড়ার লোকের খারণা বিষম কিছুই ঘটেবে একদিন।

হাতে সারানো গাড়ি হাঁকিয়ে পটল গাঙ্গুলি গিলির মুখে নামে যখন, অতসী অনেক সময়েই দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথমতঃ মুখে পটল গাঙ্গুলি ঘাড় বোঁকিয়ে তাকায়। অতসী হুকুটি করে চেয়ে থাকে। অর্থাৎ এখনো শিক্ষা হতে বাকি?

মাস দেড়েক পরের কথা।

মৌডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মায়ের চোখের জ্বান অপারেশন হয়েছে। দশ দিন থাকার কথা সেখানে। সাত দিন কেটে গেছে। অতসী রোজ বিকেলে মাকে দেখতে যায়। কারিকমাদের একজন সঙ্গে থাকে রোজই। কাকারা আপিস থেকে যায়। মা রোজই মেয়েকে আসতে বারণ করে। তার সবদাই ভয়। কিন্তু অতসী তার কথার কানও দেয় না।

দুপুর থেকেই সেদিন হামলা হিঁচল শহরে। রাস্তায় পুঁদিশ টহল দিচ্ছে। অন্য তরুণ এখানে-সেখানে বোমাবাজী করছে। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। অল্প অল্প বাস চলছে।

কারিকমারা দুপুরেই ঘোষণা করেছে, আজ আর হাসপাতালে যাওয়া নয়, অতসীও যেন বাড়ি থেকে না বেরোয়। অতসী হাঁ-না কিছুই বলে নি।

সে যখন চারটের বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, কারিকারা তখন ঘুমুচ্ছে। বেরুবার সময় দেখল, গিলির মুখে একটা গাড়ির সামনে সেই মূর্তি দাঁড়িয়ে। অতসী সদর্পে চলে গেল। ঠেলে-ঠেলে একটা বাসে উঠল।

মা হাসপাতালের ঘরে শুয়ে, হামলার কথা জানবে কি করে। তবু মেয়েকে একা দেখে রুগ্ন। ওর কাকারা একজনও সেদিন এলো না দেখে চিন্তিতও। অতসী তাকে অভয় দিয়ে ছুটায় হাসপাতাল থেকে বেরুলো।

শহরের গন্ডগোল ততক্ষণে শ্বিগুপ বেড়ে গেছে। বাস ত' বন্ধ হয়ে গেছে। ট্যাক্সি নেই। বাড়ি সাড়ে চার মাইল দূরে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে গন্ডার মুখে সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

চালকের আসনে একটি অচেনা মুখ। তার পাশে পটল গাঙ্গুলি বসে। পিছনের দরজা খুলে দিয়ে ডাকল, এসো, চারদিকে গুলী চলছে, বোমা পড়ছে, আগুন জ্বলছে।

অতসী জবাব দিল না। মুখের দিকে চেয়ে রইল শূন্য।

পটল গাঙ্গুলি আবার বলল, দাঁড়িয়ে থেকে না, বিপদ দেশে তোমার কারিকমারাই আমাকে বলে-করে পাঠিয়েছেন—দেঁরি করলে আর যেতেই পারব না।

অতসী উঠে বসল। পটল গাঙ্গুলি বরজা বন্ধ করে পাশের লোককে বলল, পিছিয়ে গিয়ে স্ট্রান্ড রোড ধর—অন্য কোনো রাস্তায় যাওয়া যাবে না।

উল্টো দিকে অর্থাৎ উত্তর কলকাতার দিকে গাড়ি ছুটল। অনেকক্ষণ বাদেও বাকি না নিয়ে উত্তর দিকেই ছুটে চলল।

ক্লান্ত, অবস্থা অন্ধকার, ঠাণ্ডা করা যাচ্ছে না কোন দিকে যচ্ছে।

অতসী স্থানদূর মত বসে।

ভিতর থেকেই টপকে পিছনে চলে এলো পটল গাঙ্গুলি। তার পাশে বসে বলল, একেবারে খুনফুন কাউকে এখন পর্যন্ত কার নি, কিন্তু তেমন দরকার পড়ল করতে আপত্তিও নেই। টু-শব্দ না করে যেমন বসে আছে তেমন থাকো।

অতসী টু শব্দও করল না। বসেই রইল।

সামনে পিছনে আশপাশে বোমা ফাটছে। পটলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে।

অনেক পথ একেবেকে প্রায় এক ঘণ্টা বাবে মোটরটা অন্ধকারে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। উত্তেজনা চারিদিক ধমধম করছে। দূরে দূরে গিলির মূখে অস্পষ্টসী ছেলেদের জটলা। বড় হেড লাইট দেখে এটাও পটলিশের গাড়ি ভেবে ছুটছাট আড়ালে চলে গেল।

পটল গাঙ্গুলি আগে নম্রল, তারপর শক্ত হাতে হাত ধরে অতসীকে নামালো। তখন আশপাশের অনেকেই উকিঝুকি দিল।

গিলির মধ্যে দশ পা ঢুকতেই ভাঙা বাড়ি একটা। সগের লোক সামনের ঘরের তালা খুলল। অতসীকে নিয়ে পটল গাঙ্গুলি ঘরে ঢুকল। সামনের চৌকিটায় বসিয়ে দিল তাকে।

অতসী নিষ্পন্দ মূর্তির মতো বসে রইল।

দরজার কাছে গিয়ে ওরা দুজন কি পরামর্শ করল। তারপর সগের লোকটা বেরিয়ে যেতে পটল গাঙ্গুলি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরে দাঁড়াতে অতসীর সঙ্গে চোখাচোখি। সে স্থির নেড়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

পটল গাঙ্গুলি হাসছে।—আমার মূখে জুতো ছুঁড়লে কি ফল হয় খুবছ এখন? ছেলে হলে তার প্রাণ যায়, আর মেয়ে হলে এই দশা হয়।

অতসী চেয়েই আছে।

হাসছে পটল গাঙ্গুলি।—কি করবে এখন, কেঁদে কেটে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে? কিন্তু আমি তো ক্ষমা করি না বড় একটা।

অতসী নির্বাক—চেয়ে আছে তেমন।

একটু বাদে বাইরে থেকে মন্দ কড়া নাড়ার শব্দ। রাতের মতো তিন-জনের খাবার নিয়ে এসেছে সেই লোকটা। তারই ঘর এটা।

আধঘণ্টার মধ্যেই সেই লোক খেয়েদেয়ে আবার বেরবার জন্য প্রস্তুত। পটল গাঙ্গুলি তাকে বলল, গাড়িটা মালিককে বন্ধিয়ে দিবি, আর

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবি।

সে চলে যেতে পটল গাঙ্গুলি আবার দরজা বন্ধ করল। হাসছে।—কি গো, একেবারে যে বোবা হয়ে গেলে, খুব ভয় করছে?

অতসীর ধমধমে মূখ। নিরুত্তর।

ওই মূখের দিকে চেয়ে আরো বেশি হাসছে পটল গাঙ্গুলি। বলল, আমার এই বন্ধুটির বৃদ্ধি আছে বেশ, আশপাশের লোকেরা জেনেছে তুমি আমার বউ, দুর্ভাগ্যে আটকে পড়ে রাতের মতো বন্ধুর কাছে আশ্রয় নিয়েছি।...ভাবছ কি, চেষ্টামিচি করবে? চেষ্টা করে দেখতে পার, আলকের দিনে কারো বিকে কারো চোখ-কান নেই। লাতের মধ্যে আমি আরো বেশি নির্দয় হব।

অতসী স্থানদূর মতো বসে।

কাছে এগিয়ে এলো, হাত বাড়িয়ে ওর মূখটা নিজের দিকে তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের একটা স্যান্ডাল খুলে নিয়েই ছিটকে উঠে দাঁড়াল অতসী। প্রাণপণ শক্তিতেই মারতে গেল।

কিন্তু তার আগেই শক্ত হাতে হাতটা ধরে ফেলল পটল গাঙ্গুলি। হাতে সবলে ওকে জাপটে ধরে অন্য হাতের ঝাঁকুনির চোটেই স্যান্ডালটা হাত থেকে ফেলে দিতে বাধ্য করল। তারপর জোরে ধাক্কা মেরেই চৌকির ওপর ফেলল তাকে।

তার পরেই প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে যে জিনিষটা বার করল, দেখা মাত্র অতসী নিশ্চল একেবারে।

ছোট কুচকুচে কালো রিভলভার একটা। দাঁতে দাঁত চেপে অনুচ্চ কঠিন গলায় পটল গাঙ্গুলি বলল, আমি নিজের জানের পরোয়া করি না যখন অন্যেরও করি না, মনে রেখো।

আবার কাছে এসে বড়কে দাঁড়াল।—তোমাকে আমি এই শাস্তি দেব কখনো ভাবি নি, তুমিই আমাকে বাধ্য করছ। তুমি কালো, কিন্তু তোমাকে আমার ভালো লাগত। আমার বিয়ে করতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু তুমি আমাকে ঘৃণা করেছ, বিদ্রোহী হয়ে ভেবেছ-রাজ-পুত্র আসবে তোমাকে নিতে—সেই দোমাকে তুমি আমার মূখে জুতো ছুঁড়ে মেরেছ—এখন? এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?

অতসী নির্বাক, নিশ্চন্দ। কিন্তু সোজা মূখের দিকেই চেয়ে আছে।

পটল গাঙ্গুলি হেসে উঠল, বলল, ওই রকম চেয়ে আছ বলে আরো বেশি ভালো লাগছে।...পায়ে ধরে কান্নাকাটি করলে আর ক্ষমা চাইলে এখনো হয়তো অন্যরকম চিন্তা করতে পারতাম।

অতসী নির্বাক, নিশ্চল তেমন। একটু বাদে পটল গাঙ্গুলি খাবারের

জিনিসগুলো এনে দু'ভাগ করে সাজালো। তারপর একটা তাব নামনে রেখে বলল, খেয়ে নিতে হবে, অব্যাহত হলে তার ফল ভালো হবে না... তোমাকে যখন ধরে এনেছিলাম তখনো আমার মাথায় অন্যরকমের আগুন জ্বলছিল। এখনো জ্বলছে, কিন্তু অতটো নৃশংস হতে ইচ্ছে করছে না।

অপেক্ষা করল একটু। তারপর দুই কাঁধ ধরে সজোরে খাবারের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় ত্রিঙ্গনা করল, তুমি খাবে কি না?

আবার খানিক নিষ্পলক চেয়ে থেবে অতসী খাবারের দিকে চোখ ফেরালো। শেষে আস্তে আস্তে হাতও বাড়ালো।

পটল গাঙ্গুলি গোত্রাসে তার খাবার শেষ করল। আর অতসী নামানাই মূখে দিল। বাকিটা পড়ে থাকল। পাতাগুলো তুলে মূড়িয়ে পটল গাঙ্গুলি জানলা দিয়ে ফেলে দিল। হাত ধরে নিজে জল খেল। ওর সামনেও জলের গেলস ধরল।

ওদিকে বোমার আওয়াজ বাড়ছেই। দূরে দূরে গুলীর শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিছু কিছু হৈ-হল্লাও শোনা যাচ্ছে। কাছেই কয়েকটা বোমার শব্দ। একটু বাদে গুলীর আওয়াজ। ভারী ধাক্কের শব্দ। পটল গাঙ্গুলি তাড়াতাড়ি ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। বিড়বিড় করে বলল, আলো দেখলে পটলিশ আসতে পারে।

অতসী তেমন বসে আছে। একটু নড়ছেও না। লোকটা ঘরমুখ পাথচালি করছে, আর এক-একবার চৌকির এক ধারে বসছে। অস্থিরচিন্তে ভাবছে কিছু বোকা যায়। এরকম একটা কাণ্ড কবে ফেলার পর এখন বিপদের কথা ভাবছে বোধ হয়। অতসীর বাড়িতে এতক্ষণে হুলস্থূল পড়ে গেছে জানা কথাই! সময় কেটে যাচ্ছে—কাছে দূরে ব্রমাগত বোমাও পড়ছে, গুলীর শব্দও শোনা যাচ্ছে।

পটল গাঙ্গুলি আবার এসে চৌকির ধারে বসেছে। আর অন্ধকারেই অতসী দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে।

হঠাৎ বিকট আওয়াজে খুব কাছের উপস্থিতির বোমা ফাটল কয়েকটা। গিলির মূখের এই পূর্বনো বাড়িটানুসুদু কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট শব্দ করে অতসী একেবারে গায়ের ওপর এসে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল পটল গাঙ্গুলিকে। বিষম ভয় পেতে দেখে সে-ও দু'হাতে জাপটে ধরল অতসীকে। একটু বাদেই গুলীর আওয়াজ—খুব কাছের। অতসী আরো জোরে আঁবড়ে ধরে রইল তাকে। আশ্রয় আর অভয় দেবার মতো করেই পটল গাঙ্গুলি নিজের বৃকের সঙ্গে চেপে ধরে থাকল তাকে।

বোমা আর গুলার শব্দ কমে আসছে। কিন্তু পটল গাঙ্গুলি নিজের যুদ্ধে আগলে রেখেছে অতসীকে। একটু একটু করে সংঘর্ষের বাঁধ ভাঙছে তার। নিজের সঙ্গে যোদ্ধার মতো অবসান হয়ে আসছে। রমণী দেহ তার সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ। উষ্ণ সান্নিধ্য নিবিড়তর হয়ে উঠছে।

পটল গাঙ্গুলি ধরা পড়ল তিন দিন বাদে। অতসীদের বাড়ির লোকের চেষ্টা আর তৎপরতার কাঁচড়াপাড়াতেই পটলিশের হাতে ধরা পড়ল তারা।

তারপর কোর্ট। বিচার। কিন্তু অতসীর বক্তব্য শুনে বাড়ির লোক স্তম্ভ একেবারে। সে শপথ নিয়েই বলেছে, কেউ তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় নি, ওই লোকের সঙ্গে স্বেচ্ছায় চলে গেছে সে। এবং ওই লোককেই সে বিয়ে করবে এও স্থির।

না কোর্ট থেকে অতসী বাড়ি ফেরে নি। পটল গাঙ্গুলির সঙ্গেই কাঁচড়াপাড়ায় চলে এসেছে।

বাড়ি এসেছে সাত দিন বাদে। ছুটির দিনে। একলা। এসেছে আগে থাকতে চিঠি লিখে জানান দিয়ে। লিখেছিল তার ষ্ট্রোক আর শাড়িগুলো নিতে আসবে। তাছাড়া কাকা আর মায়ের সঙ্গে কিছু কথা আছে।

মা দরজা খোলে নি। কঠিন মুখে কাকা জিজ্ঞাসা করেছে, কি কথা? অতসীর কপালে আর সিঁথিতে সিঁদুর লক্ষ্য করেছে সকলেই।

অতসী জিজ্ঞাসা করেছে, বাবা তার নামে যে আঠের হাজার টাকা রেখে গেছে সেটা তাকে দেওয়া হবে কি না।

কাকার ইঙ্গিতে কাকিমা তার মাকে জিজ্ঞাসা করতে গেল। সঙ্গে চেকবই, পশবই আর একটা পটলি নিয়ে ফিরল। বলল, ওর জন্য যা ছিল দিদি সবই দিয়ে দিল। পটলিটা দেখিয়ে স্বামীকে বলল, এ ওর মায়ের গয়না, এও দিয়ে দিল।

ব্যাংকের টাকা সব অতসীর নামেই ছিল। পাশবই চেকবই মায়ের কাছে থাকত শুধু।

সব নিয়ে অতসী উঠে দাঁড়িয়েছে। কাকা-কাকিমাকে প্রণাম করেছে। তারা স্থির কঠিন।

মায়ের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।—মা, একবার দরজা খুলবে না?

—না।

—তাহলে আমি চলে যাই?

—হ্যাঁ। তোর বাবার দিদি রইল, আর এ বাড়িতে মশ্ব দেখাস না।

অতসী স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শানিক। তারপর আস্তে আস্তে নিচে নেমে এলো।

চার মাস বাদে অতসীর তাগিদে

পটল গাঙ্গুলি চাকরি ছেড়েছে। ওই টাকায় একটা সেকেন্ড হ্যান্ড লরী কিনেছে। অতসী অবিব্রান্ত সাহস আর উদ্দীপনা জুগিয়েছে তাকে।

দেড় বছরের মধ্যে ধার বেন করিয়ে, সেই নগ্নে নিজের সমস্ত গয়না বেচে একটা নতুন লরী কিনতে ব্যর্থ করেছে তাকে। বড় হতে হবে, মানুষের মতো মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে তাকে—এ ছাড়া আর কোনো দাবি ছিল না অতসীর।

বড় হয়েছে। এখন চারখানা লরী তাদের। দিবারাত্র খাটছে। টাকা আসছেই। কাঁচড়াপাড়ায় একটা ঝকঝক ছোট বাড়ি ভাড়া করে থাকে এখন। সেখানেই একটা জমি কেনা হয়েছে। সামনের বছর বাড়ি শুরুর করবে। গাড়ি আগেই কিনেছে।

সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও রাণি আটটার মধ্যে খেয়েদেয়ে স্বামী আর মেয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল অতসী। কাকিমা তখনো দৃঢ় করতে হেসেই বলল, প্রথমবার জোড়ে এলে জোড়েই ফিরতে হয় কাকিমা, সাত বছর পার হয়ে গেছে তাতে কি।

মাকামারি রাস্তা পার হওয়ার পর পটল গাঙ্গুলির হঠাৎ খেয়াল হল গাড়ি চালাতে চালাতে সে একলাই বকে চলেছে। অতসী চুপ সেই থেকে। বাড়ি ফিরিয়ে দেখল, গম্ভীরও। মেয়েটা তার বকে মুখ রেখে ঘুমুচ্ছে।

—কি হল?

অতসী ফিরে তাকালো, কি?

—একেবারে চুপ আর গম্ভীর যে? মন খারাপ না করে থেকে গেলেই তো পারতে।

—মন খারাপ তোমাকে কে বললে?

—তাহলে কি?

অতসী হাসতে চেষ্টা করল, বাড়ি চलो, বলছি।

পটল গাঙ্গুলি বলল, বুঝেছি, মা-কে এবার নিজের কাছে এনে রাখবে, এই তো?

—তা রাখতেও পারি, কিন্তু সেকথা ভাবছি না।

—তবে?

ছমকোপে চোখ পাকালো অতসী। —বললাম না বাড়ি চলো আগে!

বাড়ি।

মেয়েকে শাইয়ে, পোশাকী শাড়ি বদলে মুখ-হাত ধুয়ে অতসী কাছে এসে বসল। আবারও সে গম্ভীর আর আগের মতই অনামনস্ক। পটল গাঙ্গুলি তাও লক্ষ্য করছে। এবারে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বলো।

অতসীর মুখে বিড়ম্বনার ছায়া, সেটা ঠেলেই বেন বলল, দেখো, মা ক্ষমা করেছে, আজকের মতো আনন্দের দিন

আর হয় না—এই দিনে তোমার আমার মধ্যে কিছু গোপন থাকা উচিত?

—কক্ষণো না, বলে ফেলো।

তবু বলতে বিধা অতসীর, লজ্জাও পাচ্ছে বেন।—শুনলে তুমি রাগ করবে না?

—আর দেরি করলে রাগ করব।

অতসী বলল, সাত বছর আগে আমি তোমার সঙ্গে ভয়ানক ছলনা করেছিলাম...আজ সেটা স্বীকার করব। ...আমার বিয়ের প্রায় তিন বছর আগে এক ছেলের পক্ষ আমাকে দেখতে এসেছিল। বড় চাকুরে ছেলে। আমার বদলে আমার ষড়যন্ত্রে বোন গীতাকে পছন্দ করে গেল তারা। বাড়ি গিয়ে জানালো, ওই মেয়ের সঙ্গে কাজ হতে পারে।

পটল গাঙ্গুলি সাগ্রহে কাছে এগিয়ে এলো।—তারপর?

—তারপর তাই হল। পরে আরো অনেকে আমাকে দেখতে এলো। পছন্দ হল না। রমাকে বারো দেখতে এলো তারা একবারেই পছন্দ করে গেল। বিয়েও হয়ে গেল...আমি পড়ে থাকলাম। মায়ের তাগিদে কাকারা আমার বিয়ের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এই গারের রং কারো পছন্দ নয়।

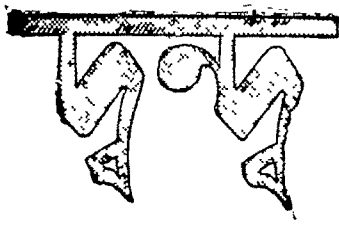
পটল গাঙ্গুলি আরো উৎসুক।

অতসী বলে গেল, শেষে এক ছেলের দল আমাকে দেখতে এসে ইয়ারিকির ছলে প্রায় অপমানই করে গেল। সেই থেকে আমার মাথায় আগুন জ্বলতে থাকল। প্রতিজ্ঞা করলাম, বিয়ে না হলেও সংয়ের মতো আর কারো কাছে নিজেকে দেখাতে বসব না। কিন্তু বিয়ে হবেই বা না কেন?...সেই প্রথম তোমার দিকে আমার চোখ পড়ল, একমাত্র তুমিই আমাকে কালো বলে অসম্মান কবো নি, আমাকে চেয়েছ। তক্ষুণ মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, বিয়ে হবে, আর তোমার সঙ্গেই হবে। এমন স্বাধীনপন আমি এও ভেবে নিলাম, যে-রকম ফর্সা গারের রং তোমার—তোমার ছেলেমেয়ে নিশ্চয় কালো হবে না।—তারা আমার মতো ভুগবে না।

দু'চোখ কেন বেন হলছিল করে উঠল অতসীর। পটল গাঙ্গুলি নিবিড় মমতায় এক হাতে কাঁচা জড়িয়ে ধরল তার, কিন্তু মুখে কোপ দেখিয়ে বলল, এসব ভেবে-চিন্তে প্রথমেই মুখে জুতো বসালে, আমার! চাল দেবার জায়গা পাও না?

—সত্যি, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, ঠিক যা করলে তোমার মতো দুর্দান্ত লোককে কাছে টানা যাবে আমি তাই করতে লাগলাম...বিয়ের পর ওই ন্যাসডল ছুঁড়ে মারার জন্যে তোমার

[শেষাংশ ২২৬ পৃষ্ঠায়]



বরেন্দ্রনাথ মিত্র

‘সঞ্জীব?’

‘হ্যাঁ আমি সঞ্জীব বলছি। কে?’

‘গলা শুনে চিনতে পারছ না?’

‘অধমের নাম নিমলচন্দ্র।’

‘হেসে বললাম, ‘ও নিমলদা। টেলিফোনে তোমার গলা অনারকম শোনায়। তাছাড়া তুমিতো বেশি ফোন-টোন করোও না।’

‘ফোন করা আমার আসে না। কেউ কেউ পারে মেয়েদের মত টেলিফোন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে। খুঁড়ি, এখানে আবার মেয়েদের একটি প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে আছে। নিজের জাতের নিন্দা শুনলে সে কষ্ট পাবে। ফোনটা তাকে দিচ্ছি। তার সঙ্গে কথা বল। বুঝতে পারছ কে?’

বললাম, ‘পারছি।’

নিমলদা সকৌতুকে বললেন, ‘কে হল তো?’

‘আমি বললাম, ‘অর্চনা—মানে ডিউদ।’

নিমলদা তেমনি কৌতুকের সঙ্গে বললেন, ‘ঠিকই ধরেছ। আমি শব্দ সংযোজক অব্যয়। আর কিছ, না। না-ও কথা বলো।’

‘হ্যালো।’

এবার অর্চনার গলা শুনতে পেলাম। ওর গলা মিষ্টি। ও চিরকালই অনুচ্চ-ভাবিনী। বললাম, ‘কি ব্যাপার? সকালেই যে খুব খোঁজ-খবর নিচ্ছ।’

অর্চনা, একটু অভিমানের সঙ্গে বলল, ‘আমরা খোঁজ-খবর না নিজ তুমি তো আর নিজে থেকে খোঁজ নাও না।’ বললাম, ‘কাজকর্ম’ নিয়ে ব্যস্ত থাকি।’

‘আহা! কাজ যেন আর কেউ করে না। এখন কী করছিলে এই সকাল-বেলায়?’

একটু ইতস্তত করে বললাম, ‘আমার এক প্রবীণ বন্ধুর একটি বই বেরোবে আমাদের পাবলিশিং ফর্ম থেকে। সেইটাই একটু গুঁছিয়ে-টুঁছিয়ে দেখে-শুনে নিচ্ছিলাম।’

‘মানে বাড়িতেও আফিসের ব্যস্ত বয়ে নিয়ে এসেছো। কী যে তুমি।’

‘ঠিক অফিসের কাজ নষ এটা বন্ধকৃত্য। থাকগে। তোমার খবর বলো।’

অর্চনা বলল, ‘খবর আর কি। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। অফিসের পবে চলে এসো না আমাদের এখানে। রায়ে সবাই মিলে একসঙ্গে খাব।’

‘আবার খাওয়া-দাওয়ার কামেনার কি দরকার। আজকে কোন উপলক্ষ আছে নাকি? বিবাহ বার্ষিকী-টার্ষিকী?’

অর্চনা বলল, ‘না-না ওসব কিছ, না। বিনা উপলক্ষে আসতে নেই বুঝি?’

বললাম, ‘আর একদিন গেলে হয় না? আজ একটু জরুরী কাজ আছে।’

‘বেদিন বলব সেদিনই ডুমি কয়েক দোহাই দেবে। আজই চলে এসো। দেরি হলে কোন অসুবিধা হবে না। এ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া তো দেরিতেই হয়।’

বললাম, ‘আজ্ঞা।’

অর্চনা কেন ডাকল? কেন খেতে বলল? উপলক্ষটা খুঁজে পেলাম না। বিবাহ বার্ষিকী যে নয় তা আমি জানি। ওদের বিয়ে হয়েছিল ফাল্গুনে ঘাসে।



আর এটা প্রাণ মাস। এক হিসাবে এই বিষের ঘটক আমিই। অন্তত বরপক্ষ আর কন্যাপক্ষ দুই পক্ষকেই আমি যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলাম। বাজঘোটক হয়েছে কিনা তা ভবিষ্যৎ বলবে।

উপলক্ষ জানা না থাকলে উপহার নিয়ে যাওয়ার কথা ওঠে না। ওরা বড়লোক মানুষ। আমাদের ছোট-খাট উপহারে কি ওদের মন উঠবে? নিম্নলিখিত আমাব আপন মাসতুতো ভাই। কিন্তু বড়লোক হওয়ার পূর্ব কতখানি আপন আছে তাতে আমাদের মনে গভীর সন্দেহ রয়েছে। বিয়ে, শ্রাস্থ, ক্ষমপ্রাশন এইসব উপলক্ষ ছাড়া ওঁরাও আমাদের বাড়িতে আসেন না। আমরাও ওঁদের বাড়িতে যাই না। বরং অনেক সময় ওঁরা নিমন্ত্রিত হয়েও সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন না। ওঁরা যে সগাজেব কয়েক ধাপ ওপরে উঠেছেন ওঁদের চালচলনে কথাবার্তায় তা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু আমি ভেবে দেখিছো অন্তত এই নিয়ে আমার মনে কোন অভিযোগ নেই। বরং এইটাই ওঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। ওঁরা যে ইচ্ছা করে ওঁদের জীক্জমক দেখান তা নয়, আমরাই সাধারণ গৃহস্থ বলে ওঁদের আড়ম্বর অনুষ্ঠান বাড়ি-গরুড় আসবাবপত্র মেয়েদের গাভরা তল্কার আর মনভবা অহংকারের ওপর আমাদের চোখ বেশি গিয়ে পড়ে।

কিন্তু বছর কদিনই বা আমরা মুনোমুখি হই। আমার মা আর মাসি দুই বোন শহরের দুই প্রান্তে থাকেন। আমরা উত্তরে ওঁরা দক্ষিণে। যাওয়া-আসা নেই, দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তাই ওঁদের ঐশ্বর্যের উচ্ছলতায় আমাদের চোখ কলসাবার ফুরসৎ বড় কমই ঘটে। আমাদের শ্যামপুকুর স্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ির দারিদ্র্যও ওঁরা দেখতে পান না।

শুধু মাই মাঝে মাঝে আমাদের কাছে অনুযোগ করেন, 'দিদি একবার একটা খোঁজও নেয় না। শত হলেও মায়ের পেটের বোন তো। জামাইবাবু না হয় বড়ো হয়েছেন। নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে মস্ত। কিন্তু ছেলেমেয়েরা? ওরা তো একটু খোঁজ-খবর করতে পারে। এখন তো আমাদের বাড়িতে ফোনও হয়েছে। মাঝে মাঝে একটা ফোন নবলেই বা দোষ কিসের?'

দাদা বলে, 'জানো না মা ওয়া খুব হিসেবী। বড়লোক হলে কি হবে একটা ফোনও ওরা বিনা হিসাবে খরচা করে না। আমাদের ফোনের বিল যত ওঠে তুলনার ওদের বিল তত হয় না।'

একই কটাক্ষে দাদা আমাকে আর বউদিকে বিম্ব করে।

অনুযোগ অভিযোগ আমরা নিজেরাই মনে মনে পোষণ করতাম। মত খুঁটে বলতাম না। মাসি-বাড়ি সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্ন হবার

জোঁ হয়েছিল। কিন্তু নিম্নলিখিত আর অর্চনার বিষের পরে অবস্থাটা একটু পালটে গেছে। খুব ঘন ঘন না হলেও দু-একটা ফোন ওদের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে আসে। আমিও বিনা নিমন্ত্রণে বিনা উপলক্ষে ওদের বাড়িতে বার দুই গিয়েছি।

আমার এই বউদি ঠাট্টা করতে ছাড়ে না, 'খুব যে টান দেখাচ্ছ, হবেই তো একে বান্ধবী তারপর বউদি।'

আজ্ঞেও যখন অফিসে বেরোবার আগে বলে গেলাম, 'মা, আমি রাগে বোধহয় আজ আর বাড়িতে খাব না।'

মা বললেন, 'বোধ হয় টোষ হয় বউবানে বাপু। না খেলে পরিষ্কার করে বলে যাও। কেন, আজ আবার কোথায় নেমন্তন্ন?'

বউদি হেসে বলল, 'জানো না মা, অর্চনা ওকে আজকাল খুব নিমন্ত্রণ করে যাওয়ায়। পরোনো মাসি বাড়িতে নতুন বউদি এসেছে। আমরা আর পাস্তা পাইনে।'

মাও হাসলেন, 'তুমি বড়ই হিংসুটে হয়েছে মাধুরী।'

বউদি জবাব দিল, 'কেবল আমার দোষই দেখছ মা। কিন্তু তোমার ছোট-ছেলে যে কমেই বড়লোক যে'মা হয়ে উঠছে তা দেখতে পাচ্ছ না।'

মা বললেন, 'সুঁতি, নিম্নলিখিত এত পক্ষপাতই বা কিসের। ডোব দাওয়া বউদিকে বলে না কেবল ডোবেই যেতে বলে, যেতে বলে।'

হেসে বললাম 'ওরা জানে, দাদার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে। আমি নিরাশ্রয় নির্বাসন। তাই কিণ্ডে সহানুভূতি-সমবেদনা—'

আমি বউদির দিকে হেসে তাবলাম।

বউদিও হেসেই জবাব দিল, 'একটু সাবধানে থেকো। বেশি সমবেদনা কিন্তু ভালো নয় ভাই। শেষে বিষম কিছু ঘটে যেতে পারে।'

মনে মনে হাসলাম। বিবম কিছু ঘটতে পারে। না কোন মেরেকে নিয়ে ভেমন কোন আশংকা আমার নেই। আমার এই ছাত্রিশ বছর বয়সে মেয়েদের সম্বন্ধে অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা নিশ্চয়ই আমি পোষণ করিনে; আবার অতিরিক্ত ঔৎসুক্য কৌতুহল কি তৃষ্ণাও আমার নেই। সেই স্তরও আমি অনেকদিন পার হয়ে এসেছি। আমাব সমবয়সী বন্ধুরা বলে বৌদি দমসাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলেই আমি একালে প্রবীণতা লাভ করেছি। তাব মানে ইচ্ছা করেই আমি নাকি একপদবন্দ পিঁছিয়ে গিয়েছি। ওরা বলে আমাব মগো কালধর্ম নেই। আমার দেহটা একালেব মনটা সেকালেব। কী



একে বান্ধবী তারপর বউদি

জানি, আমি তো তেমন করে কিছু করতে পারিনে, কোথায় এই দুই কালের জামারেখা।

তবে বয়স্কদের কাছে আমি অপ্রিয়-ভাজন নই। আমি সর্বদা তেমন বক্তব্য শুনিন। যেটুকু গ্রহণ করবার আমি সেটুকু গ্রহণ করি, যা গ্রহণ করতে পারিনে তা নিঃশব্দে বর্জন করি। নিষ্ফল বাদ-প্রতি-বাদে মধ্য যাইনে। আমি জানি, ওদের কাউকে বদলাবার সাধ্য আমার নেই। মৃত ও পথ বদলাবার পক্ষে ওরা যথেষ্ট প্রবীণ। আমি নিজেই কি ঈচ্ছামত বদলাতে পারি?

হয়তো আমার এই ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার জন্যেই আমি মেসোমশাইর কিছু স্নেহভাজন হয়েছি। বিশ্বাস-ভাজনও। তিনি তাঁর জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের কথা আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন, 'সঞ্জীব তোমার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ হয়। তোমার সঙ্গে আমার যতটা মেলে আমার ছেলের সঙ্গে তেমন মেলে না।'

এই নিয়ে আমার ভিন মাসতুতো ভাই—অমলদা, শ্যামলদা, নির্মলদা—সবাই আমাকে ঠাট্টা করেন, 'সঞ্জীব হল বাবার মানসপুত্র।'

কেউ কি আর কারো মানসপুত্র হতে পারে? তবে মেসোমশাইর সঙ্গে আমি উৎসাহ-ব্যবহার করিনে আর তাঁর বহু দোষ থাকলেও কিছু কিছু গুণের আমি প্রশংসা করি এই জন্যেই তিনি হয়তো আমাকে পছন্দ করেন।

ধর্মতলা স্ট্রীটে আমাদের অফিস। প্রেস আছে, পাবলিকেশন আছে। বহু আকারের কিছু নয়। আমার চাকরী পাবলিকেশন ডিপার্টমেন্টে। আমি সহকারী মাত্র। আমার মাথার ওপরে আছেন সঞ্জল মৈত্র। তাঁর ওপরে মালিকেরা। কচিং কখনো তাঁদের ঘরে আমার ডাক পড়ে। আমি সঞ্জলবাবু আড়ালে বাস করি। প্রেসে যাই, দরকার হলে ফাইনাল প্রুফ দেখে দিই। লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। কোন নবীন লেখকের ম্যানাস্ক্রিপ্ট পড়তে দিলে পড়ি। বই বেরোলে তার বিজ্ঞাপন লিখতে বসি। নানারকমের কাজকর্মই আমাকে কবতে হয়। সঞ্জলবাবু আমাকে একটু বেশি খাট্টেনে নেন সে কথা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু শরীর অসুস্থ না থাকলে, কি মনমেজাজ নিতান্ত খারাপ না থাকলে আমি খাটতে আপত্তি করিনে।

সঞ্জলবাবু তাতে খুশি হন। তিনি বলেন, 'খেটে যাও সঞ্জীব খেটে যাও' এই তো পরিশ্রম করবার বয়স। তুমি আমার কাজ করছ বলে মনে কোরো না। কোম্পানীর কাজও নয়। কাজ যখন করবে নিজের

কাজ বলে ভাববে। তাহলেই কাজটা ভূতের মত তোমার ঘাড়ে চাপবে না। তুমি তোমার কাজের ওপর প্রভু কর্তে পারবে।'

সঞ্জলবাবুর কথাগুলি নতুন নয়। কিন্তু ও'র বলবার ভঙ্গিটি বড় মিষ্ট। পলার স্বরটি ভারী কোমল। সঞ্জলবাবু দেখতেও সুপুরুষ। বেশ লম্বা চেহারা ছ' ফিটের কাছাকাছি। গৌরবর্ণ লম্বা বাহন-তেম্পান্ন হবে বয়স। কি তার কিছু বেশিও হতে পারে। সাধারণত মিহি ধৃতি পাঞ্জাব পরে আসেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে ঝোঁক আছে। একটু বা সাজ-সজ্জার দিকেও। আমার ভালোই লাগে।

সঞ্জলবাবু বলেন, 'ভোজনরাসিক কাকে বলে জানো? যিনি পোলাও মাংসও খেতে পারেন, আবার ডাল ভাত ডাউ চর্কাড়ি দিয়েও বেশ পরিতোষের সঙ্গে খেয়ে উঠতে পারেন। কাজের বেলাতেও তাই। জুতো সেলাই থেকে চন্দীপাঠ যে কাজ যখন তোমার হাতে আসবে তুমি যদি হাসিমুখে করে খেতে পার তাহলেই বুঝবে তুমি কর্মযোগী।'

সঞ্জলবাবুর কর্মযোগের এই ভঙ্গি আমি যে পুরোপুরি বিশ্বাস করি তা নয়। কিন্তু তা নিয়ে বড় একটা তর্ক করিনে। সমাজে সব কাজ কি সমান? সব কাজের মর্যাদা আর অর্থমূল্য কি একরকম? যে কাজে মর্যাদা কম, অর্থ কম, আনন্দও কম মানুষ সে কাজকে কী করে নিজের কাজ বলে ভাবে? এই সে আমাদের অফিসে দারোগান-বেয়ারা, সাধারণ কম্পোজিটররা যা মাইনে পায় ততে কি ওদের কাজের সঙ্গে সবসময় একাধ্ব হতে পারে?

আমি সঞ্জলবাবুর সঙ্গে তর্ক করিনে। কিন্তু আমার মূখের ভাব দেখে ঠোঁটের হাসি দেখে তিনি বুঝতে পারেন তাঁর কর্মতত্ত্ব আমি সেন্ট পারসেন্ট গ্রহণ করিনি। কিন্তু তাই বলে আমি নিজের কাজে ফাঁকি দিইনে।

সঞ্জলবাবু সদালাপী। মোটামুটি প্রসন্ন মুখে, ঠান্ডা মেজাজে কাজকর্ম করেন। করিয়েও নেন। কিন্তু আজ এসে দেশলায় ও'র মুখটা কেমন ভার ভার। সিগারেটটা বেশি খাচ্ছেন। মন খারাপ থাকলে ও'র ধূমপানের মাথা বেড়ে যায়।

আমি বললাম, 'আজ আপনার শরীর খারাপ নাকি সঞ্জলবাবু?'

সঞ্জলবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, প্রেসারটা বড় বেড়েছে।'

বললাম, 'আপনি না এলেই পার-তেন। শরীর যখন এত খারাপ।'

তিনি বললেন, 'না এলে চলে কী করে।'

'বেশ আজ আর বোশঙ্ক থাকবেন না। কী করতে হবে আমাকে বলুন। তারপর কাজকর্ম সেরে বাড়ি চলে যান।'

সঞ্জলবাবু একটু হেসে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। অফিসের মালিক যদি তুমি হতে তাহলে মন্দ হত না সম্ভাব।'

আমি একটু লজ্জিত হলো। আমাদের অফিস সরকারী অফিসের মত নয়। যিনি বয়সে বড় পদমর্যাদায় বড় তাঁর কাছেও আমরা সহজে যেতে পারি, স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারি। আমরা আমাদের উর্ধ্বতনদের স্যর বলে ডাকিনে। নামের পরে একটা বাবু বসিয়ে নিই। আর যাঁরা দু-চার পাঁচ বছর এমন কি দশ বছরেরও বড় আমরা তাঁদের নামের সঙ্গে বাদা জুড়ে রাখি। ছোট বলেই অফিসের পরিবেশটা মোটামুটি ঘরোয়া।

কিন্তু ইদানীং কেন যেন আমার মনে হচ্ছে সঞ্জলবাবু এত ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করছেন না। তাঁর মেজাজ ভালো নেই। কেন নেই সে কথাও আমার একেবারে অজানা নয়। আমি অবশ্য অফিসের ব্যাপারে মাথা গলাই না। কানও পাতিনে। তবু কোন কোন কথা কানে আপনা থেকেই আসে। কণ্ঠপঙ্কুর সঙ্গে সঞ্জলবাবুর তেমন পড়ন হচ্ছে না। ও'র কাজকর্মে তাঁরা খুশি নন। তাছাড়া হিসাবপত্রও কিছু গোলমাল ঘরা পড়েছে। শুনে আমি দঃখ পেয়েছি। তাই যদি হয় তাহলে পরিণামটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে। 'আহা সঞ্জলবাবু, অত ভালো লোক। কিন্তু অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে পুরোপুরি ভালো লোক তাঁকে বলি কী করে? বেশির ভাগ মানুষই কি অংশত ভালো অংশত খারাপ। কোন কোন ব্যাপারে ভালো আবার কোন কোন বিষয়ে খারাপ।'

একটু বাদে বেয়ারা কার্তিক এসে সেলাম জানাল, 'বড়বাবু ডাকছেন আপনাকে।'

বড়বাবু মানে বড় তরফের মালিক মিঃ দত্ত। তিনি আলান চেস্বারে বসেন।

সঞ্জলবাবু উঠে গেলেন। একটু বাদে অ্যাকাউন্ট্যান্ট পরিমলবাবুও উঠে গেলেন ও'র ঘরে। মোটামুটি গুরুগম্ভীর মাঝবয়সী ভদ্রলোক।

যানিক বাদে সঞ্জলবাবু ফিরে এলেন। মুখ গম্ভীর থমথমে।

আমি আর ভরসা করে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। মাথা নিচু করে নিজের টেবিলে বসে কাজ করে যেতে লাগলাম। দরকারমত দু-একবার প্রেসে গেলো। ফোন ধরলাম।

সম্ভলবাবুও নিজের কাজ নিয়ে
হুইলেন। পাঁচটা পর্যন্তই অফিসে কাজ
করলেন।

বরং আমাকে বললেন, 'তোমার
নাকি একটু আগে যাওয়া দরকার
সম্ভলবাবু। তুমি যেতে পার।'

বললাম, 'না না, আমার খুব
আগে যাওয়া দরকার নেই। চলুন না
হয়, একসঙ্গেই বেরোব।'

কিন্তু আমার মনে হল সম্ভলবাবু
যেন আমাকে আজ একটু এড়িয়ে যেতে
চান। আমরা আমাদের একান্ত প্রিয়-
পাত্রকেও সবসময় সহ্য করতে পারিনে।
তাই আমরা আলাদাভাবেই বেরোলাম।

গরচা রোডে মেসোমশাইর বাড়ি।
বৈরাট তিনতলা বাড়ি। বাড়ির লাগায়ো
কারখানা। সাইনবোর্ড টাঙানো আদিত্য
দত্ত এন্ড সন্স। তিনতলা বাড়ির
একতলার ঘরগুলি দ্বিতীয় রুম।
কৌটো ভরতি সব পুষ্টিকর খাদ্য।
শিশুদের একরকম বয়স্কদের আর
একরকম। জাতিকে এই খাদ্য জুড়িয়েই
মেসোমশাই বড়লোক হয়েছেন। শুনছি
বাদ্যের পর প্রসাধন ছবোর দিকে মন
দিয়েছেন মেসোমশাই। ব্যবসায় এখন
সৌন্দর্যকে সম্প্রসারিত।

বাড়ির সামনে যে জনটুকু আছে
সেখানে পায়চারি করছিলেন মেসো-
মশাই। দীর্ঘ চেহারা, কিন্তু পরশে
খাটো ধাঁড়, গায়ে সাদা ফুতুরা। হাতটা
কনুই পর্যন্ত এসেছে। মাথার চুল
খুব ছোট করে ছাটা। বেশির ভাগই
পাকা। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে
কামানো। মনে হল সম্ভার আগেও
তিনি একবার কামিয়েছেন। নইলে
গাল এত পরিষ্কার থাকবার কথা নয়।
আশ্চর্য, এই বয়সেও শরীরের কোথাও
মেদবাহুল্য নেই। বেশ সোজা হয়ে
হাঁটেন। মেসোমশাই সদৃশ্য নন।
অবে দেখলেই বোঝা যায় ব্যক্তিগত সম্পদ
পূরুষ।

আমি সামনে গিয়ে প্রণাম করলাম,
'এই যে মেসোমশাই, কেমন আছেন?'

'কে?'

তিনি হুঁ করে আমার দিকে
তাকালেন। ওর চোখে চশমা। কালো
মোট ফ্রেম। সাধারণ শেলের তৈরি।

'আমি সম্ভলবাবু।'

তিনি হেসে বললেন, 'ও সম্ভলবাবু।
এসো এসো।' সন্মুখে আমার পিঠে
হাত রাখলেন মেসোমশাই। তিনি
আমাকে মাঝে মাঝে আদর করে

সম্ভলবাবু বলে ডাকেন। আমি ভাবি,
আমার মধ্যে সত্যিই কি তেমন জীবনী-
শক্তি আছে?

গুদামের পশ্চিমে ছোটমত একখানা
বনবার ঘর আছে। মেসোমশাই আমাকে
নিয়ে প্রথমে সেই ঘরে ঢুকলেন। চাকর
এসে আলো জ্বলিয়ে দিয়ে গেল। এই
ঘরখানিও সোকাপেটিতে সাজানো।
শুনছি মেসোমশাইর ঘনিষ্ঠ বন্ধু
বলতে বিশেষ কেউ নেই। দু' একজন
যাঁরা আছেন তাঁদের নিয়ে মাঝে মাঝে
এ ঘরে এসে বসেন। আর আনন্দ কারো
সঙ্গে গোপন কোন পরামর্শ থাকলে।
মেসোমশাই বললেন, 'এসো
সম্ভলবাবু।' তারপর আমার মূখেব দিকে
চেয়ে একটু হাসলেন, 'তুমি তো ছোট
বউমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ।'

আমি ও'র সামনের সোফাটায় বসে
বললাম, 'আমি আপনার সঙ্গেও দেখা
করতে এসেছি মেসোমশাই। আগে
দেখা হয়ে গেল, ভালোই হল। নইলে
পরে দেখা করে যেতাম।'

মেসোমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তা
যেতে। দেখা করেই যেতে। আজকাল
অনেকেই আমাকে এড়িয়ে যায়। কিন্তু
তুমি সে প্রকৃতির ছেলে নও।'

বললাম, 'এভাবে কেন? আপনি
বোধহয় জানেন না মেসোমশাই আমার
বেশির ভাগ বন্ধুই প্রেট, বৃন্দ।'

মেসোমশাই একটু হাসলেন, 'তাই
নাকি? শুনো তো খুব স্বাভাবিক বলে
মনে হচ্ছে না। আমার সমবয়সী দু-
তিনজন ভদ্রলোককে দেখেছি তাঁরা
বড়োদের সঙ্গে মেশেন না। অপবয়সী
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুঁজে বেড়ান।
কিন্তু উল্টোটা কি হয়?'

উল্টোরথ কি চলে? কমবয়সী
ছেলেমেয়েরা কি বড়োদের সঙ্গে চায়?

আমি বললাম, 'আর কারো কথা
বলতে পারি নে। তবে বন্ধুত্বের বেলায়
বয়স আমার কাছে একটা ফ্যাক্টর নয়।
যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা
করতে ভালো লাগে তাঁর সঙ্গে আমি
অনেকক্ষণ কাটানত পারি। আমি ভুলে
যাই তিনি যবক কি বৃন্দ, নারী কি
পুরুষ।'

মেসোমশাই একটু হাসলেন, 'নারী
কি পুরুষ সেকথাও ভুলে যাও।'

আমি হঠাৎ কোন জবাব দিলাম না।
তিনি কি ঠাট্টা করলেন? না আমার কথা
একেবারেই বিশ্বাস করলেন না?

মেসোমশাই বললেন, 'সাহা, এবার
তুমি ওপরে যাও। ছোট বউমাবা তোমার
জন্য অপেক্ষা করছে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গেই ওঠে দাঁড়লাম
না। তা হলে মেসোমশাই ভাববেন,
আমি যাওয়ার জন্যে একেবারে উন্মুখ
হয়ে আছি।



চলুন না হয় একসঙ্গেই বেরোব

জললাম, 'অর্চনা-অর্চনা বউদি
আপনার সেবায় ঠিক মত করে তো?'

মেসোমশাই আমার দিকে তাকালেন,
'তুমি বুঝি ছোট বউমার নাম ধরে
ডাকো? বউদি বলবে। বউদি বলাই
ভালো। আমাদের সময়—এ সব ব্যাপারে
থব কড়াকড়ি ছিল। যারা সম্পর্কে
আমাদের মাসি-পিসি হত তারা সমবয়সী
এমন কি দু'এক বছরের ছোট হলেও
আমাদের ডাকতে হত মাসিমা পিসিমা
বলে। এখন তো সব নাম ধরে ডাকে।
তুই তোকারি করে। লঘুগদর সব সমান।'

আমি কোন তর্ক করলাম না। শব্দ
সম্বোধন নয়, এ কালের চাল-চলন আচার-
ব্যবহার পোষাক-আশাক খুঁটি-নাটি
অনেক কিছুর বিরুদ্ধেই মেসোমশাইর
আপত্তি আছে। আর কোথাও না হোক
নিজের বাড়িতে তিনি নিজের সেই মত,
আদর্শ বলবৎ রাখতে চান। কিন্তু যোবনে
তিনি যা পেরেছিলেন এই বার্ষিক্যে এসে
তা পারবেন কেন। যদিও এই বাড়ির
কারখানা বিষয়সম্পত্তি তিনিই সব
করেছেন, তাঁর ছেলেরা শব্দ ভোক্তা মাত্র।
তবু সেই ছেলের প্রতাপ দিনের পর
দিন বাড়ছে, তারা মেসোমশাইর ইচ্ছার
বিরুদ্ধে অভ্যর্থনায় বিরুদ্ধে চলছে এই
ধারণা তাঁকে কষ্ট দেয়।

তাঁর এই দৃষ্টি মোচনের ক্ষমতা
আমার নেই। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে
তাঁকে সান্ত্বনা দিই।

আমি বলি, 'মেসোমশাই আপনি
এসব খুঁটি-নাটি ব্যাপার নিয়ে মনে
অশান্তি আনবেন না। দাদারা বড়
হয়েছেন, তাঁদের ভাগ্যগন্ধ বস্ত্রবাস
ক্ষমতাও হয়েছে। তাঁদের এবার স্বাধীন-
ভাবে থাকতে দিন।'

মেসোমশাই বলেন, 'বাবা এ সব কথা
বলা বড় সহজ। বিয়ে করে ছেলেমেয়ের
বাপ হও তখন বুঝবে।'

ওঁব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি
দোতলায় উঠলাম। সিঁড়ির ডানদিকে
মেসোমশাইর শোবার ঘর। এ ঘরখানা
বেশ বড়। মাসিমা তাঁর ঘর-গৃহস্থালীর
অনেক জিনিষপত্র এ ঘরে জড় করেছেন।
ডবল বেডের শাট, গোলরেকের আলমারি,
সুবহুং রেডিও সেট যেমন আছে তেমনি
পুত্রোন্নত আমলের ট্রাঙ্ক আর কাঠের
বাক্সও এ ঘরে রেখে দিয়েছেন।
বাক্স-টায় সিঁড়ির পুর্নালি আঁকা।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম,
'মাসিমা ওগুদি কেন রেখেছে?'

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'ওগুদি
তো মেসোমশাইর কারবারের প্রথম দিন
থেকে আছে। ঘরের লক্ষ্মী।'

হেসে বলছিলাম, 'ওতো কাঠের
লক্ষ্মী। আসল লক্ষ্মী তো তুমি।'

মাসিমা হেসেছিলেন, 'লক্ষ্মী না
আরো কিছু। তো মেসোমশাই আমাকে

মোটাই পছন্দ করেন না। বলেন তুমি
মোটো হয়ে গেছ।'

মাসিমা মোটা হয়েছেন ঠিকই। বেচপ
ধরনেরই মোটা হয়েছেন। কিন্তু তাই
বলে কি মেসোমশাই তাঁকে অপছন্দ
করেন? ওটা মাসিমার সোহাগের কথা।

মাসিমার ঘর পর্যন্ত যেতে হল না।
তার আগেই তিনি বেরিয়ে এসেন, 'এই
যে এসোঁহস? আর। এ মখে হওয়াই
তো তোরা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিস।
সুহাস কেমন আছে রে?'

হেসে বললাম, 'মা? মা ভালোই
আছে মাসিমা।'

'আচ্ছা যা। বউমারা তোরা জন্যে
অপেক্ষা করছে।'

বললাম, 'তুমিও বউমা বল নাকি
মাসিমা? নাম ধরে ডাকতেও তো
শুনছি।'

মাসিমা হেসে বলেন, 'নাম ধরেও
ডাকি—আবার বউমাও বলি। একটা বলে
ডাকলেই হল।'

তা ঠিক ডাকা-ডাকতে কি এসে যায়।
দোতলার ঘরগুলি আমার মাসতুতো
বোনদের জন্যে। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে।
মেঝো বোনটি বাদে আর দুটির ছেলে-
মেয়েও হয়েছে। তবু তারা বছরের
বৈশিষ্ট্য ভাগ সময় বাপের বাড়িতেই
থাকে। কে যে কখন এসে পড়বে তার
ঠিক নেই। তাই তাদের জন্যে এক এক-
খানা ঘর আলাদা করে রাখা আছে।
কেউ কেউ আবার সেই ঘর ত্যাগ বন্ধ
করেও যায়।

দোতলার ঘরগুলিতে না গিয়ে আমি
তিনতলায় উঠলাম।

মেয়েদের জন্যে একখানা কয় ঘর
বরাদ্দ। কিন্তু ছেলেরদের জন্যে দু'খানা
করে। একখানা শোবার আর একখানা
বসবার। এ ছাড়া প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে
অ্যাটাচড বাথরুম আছে, ঘরের সামনে
ব্যালকনি আছে।

যার ঘর তার পছন্দমত সাজাবার
স্বাধীনতা মাসিমা প্রত্যেক বউকে
দিয়েছেন। কিন্তু তারা আদায় করে
নিয়েছে। এই অন্দরমহলে মেসোমশাইর
তেমন প্রতিপত্তি আছে বলে মনে হয় না।
এখানে মাসিমার রাজত্ব। তাঁর নিয়ম-
কানুন, শাসন-প্রশাসন এখানে চলে।
অবশ্য কতটা চলে তা ঠিক জানিনে।

অমলদা শ্যামলদার ঘর ছাড়িয়ে
আমি নিম্নলিখিত ঘরের সামনে গিয়ে
দাঁড়লাম। মাসিমা আমার সঙ্গে এসে-
ছিলেন। দরজা ভেজানো। লম্বা নীল
রঙের পর্দা ঝুলছে। ভিতর থেকে
মেয়েদের কথারাত্তি আর হাসির শব্দ
শোনা যাচ্ছে।

মাসিমা তাদের উদ্দেশ্যে ডাকলেন,
'রুনা, ভারতী, অর্চনা কই তোমরা। দেখ
কে এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে রুনা বউদি, ভারতী বউদি
আর আমার মাসতুতো বোন মঞ্জুলা খাট
থেকে নেমে এল।

মঞ্জুলাই আগে এসে আগাব হাত
টেনে ধবল 'আরে সঞ্জীবনা এসো এনো।
বাস্য কী তুম্বরের ফলই না হয়েছে।'

বিয়ের পব মঞ্জুলাকে আমি অনেক
দিন বাদে দেখলাম। এরই মধ্যে এবটু
ষেন ফুটিয়ে গেছে। না কি বেটে বলেই
এমন মনে হচ্ছে। গডনটা মাসিমার
শাভের। তবে তার চেয়ে গায়ের রঙ অনেক
ফস।

সবুজ রঙের শাড়ী পরেছে। বাড়িতে
মেয়েরা যা ব্যবহার করে তার তুলনায়
ওর গায়ের গয়নার পরিমাণ কিছু বেশ।

রুনা বউদির বয়স বইশ-ভেঁশে হবে।
তিনিও বেশ সুন্দরী। ফস। লম্বা
চেহারা। মেঝো ভারতী বউদিও তাই।
তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাসি-
খুশি। রঙের দিক থেকে অন্যান্য রঙই
জায়ের তুলনায় একটু ময়লা। শ্যাম-
বর্ণা মেঝা। তবে শরীরের গড়ন আব
মুখের ডেল ওরই বেশ সুন্দর। আব
কালো আয়ত দুটি চোখ। ক্লাসেব গবাই
ওকে ঠাট্টা করে বলত বিশালাক্ষ্মী। ওর
চোখের দুটিতে কিসের যেন একটা
করুণ বিষমতা মাথা। ওকে বিষয়সম্পত্তিও
বলা যায়। সবাইর চেয়ে অর্চনা সেজেছে
কম। বালা, হার আর কানের ফল ছাড়া
আর কোন গয়না পরে নি বলা চলে।
শাড়ীখানিও জমকালো নয়, বর্ণা নব।
হালকা সোনালী রঙের শাড়ী পরেছে
অর্চনা।

আমি বললাম, 'তোমার হয়েছে কী?'

অর্চনা বলল, 'কী আবার হবে।'

ভারতী বউদি হেসে বলল, 'যে
রোগই হোক এবার আমাদের বড় ডাক্তার
এসে গেছে। আর ভয় নেই।'

'বড় ডাক্তার কে?'

ভারতী বউদি আবার আগাব দিকে
চেয়ে হাসলেন, 'কেন তুমি?'

তারপর রুনা বউদির দিকে চেয়ে
বলল, 'চল দিদি, চল মঞ্জু আমরা এবার
যে-যার ঘরে যাই। ডাক্তার তার পেশেন্টকে
পরীক্ষা করুক।'

অর্চনা একটু লজ্জিতভাবে বলল,
'কী যে যাতা বোল না মেজিদি।'

ভারতী বউদি বললেন, 'আমরা সব
বসবার ঘরে গিয়ে বসি। সঞ্জীব ঠাকুরপো
তুমি ওই খাটের ওপর উঠে বেসো।
অর্চনা, কী যে তোরা ভদ্রতা। বন্ধুকে
ডেকে এনে দাঁড় করিয়ে রাখিস। বসতে
বলবি তো।'

অর্চনা একটু হাসল, 'তোমরাই তো
বলবে।'

রুনা বউদি বললেন, 'আমাদের বলা
আর তোরা বলা কি এক কথা? চল

ভারতী, আমার আবার মেয়েকে খাওয়াতে হবে।'

ভরতী বউদি বললেন, 'ভারতী এখনো তো মেয়ের ঠাকুরমাই আছে। তোমার ঋত চিন্তা কেন দাঁদি। তা হলে ঠাকুরপো তুমি ভাই তোমার নতুন বউদির সঙ্গে আলাপ-টালাপ কর আমরা বাই। ভোর তো ডবল দাঁবি অর্চি। একই সঙ্গে ক্লাসফ্রেন্ড আর বউদি। আমবা এম-এ-পাশও করি নি। বাড়ির মধ্যে কোন ক্লাসফ্রেন্ডকেও আনতে পারলাম না। এ-বাড়ির বউদিদের মধ্যে তুমিই ভাই একমাত্র ছেলে বন্ধু। তুমি আমাদের কমনফ্রেন্ড। এজমালি সম্প্রতিতে আমাদের সবাইরই অংশ আছে।'

ভারতী বউদি হাসতে লাগলেন। বেশ সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু বেশি প্রগলভতা আমার ভালো লাগে না। আর এই রসিকতার ধরণ। আগেও তো দেখেছি ভারতীকে। এত চটুলতা যেন ছিল না। বয়স বাড়ছে আর প্রগলভতা বাড়ছে। অঞ্চল স্মিতমুখী মিতভাষিনী হলে এই বউদিকে আরো বেশি সুন্দর দেখাত বলে আমার মনে হয়।

ওরা চলে গেলে আমি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম। অর্চনা বসল ওর পাটের ওপরে। এই বাটেই ওর ড্রেসিং টেবল, আলনা, বেডিং সেট। সব বিশ্বের সময় পাওয়া। ওব বাবা নিরঞ্জনবাবু দিয়েছেন। মেসোমশাই অবশ্য বলেছিলেন, 'আপনাকে কিছু দিতে হবে না। সব আমার আছে। শব্দ, শাঁখ-সিসিন্দুর দেবেন তাই যথেষ্ট। নিরঞ্জনবাবু, প্রথম জীবনে আমি স্কুলের মাস্টার ছিলাম। আপনি তবু কলকাতার প্রফেসর। আপনি সেই স্কুল মাস্টারের সঙ্গেই কুটুম্বিতা করছেন এইটা ভেবে নিন।'

কিন্তু নিরঞ্জনবাবু, তা ভাবতে পারেন নি। শাঁখ-সিসিন্দুরের ক্ষেত্রে সম্প্রদান করতে তাঁর মন ওঠে নি। তিনি সাধামত ব্যস্ত কবেছেন। কিন্তু তাঁর সেই সাধা মেসোমশাইর স্ট্যান্ডার্ডের তুলনায় অনেক নিচে। শুনছি ছেলের শব্দশূর-বাড়ির এইসব যৌতুকে মাসিমার মন ওঠে নি। রসি ভারতী বউদিরাও তাঁট উলটেছেন। তমলদা শ্যামলদা বা বলেছেন, 'আচ্ছা, ওগুনি আপাতত গদ্য ঘরে রেখে দেওয়া হোক। নির্মলের ঘর আমরা সাজিয়ে দিচ্ছি।'

কিন্তু অর্চনা তা হতে দেখে নি। সে বলেছে, 'আমাব বাবা যা দিয়েছেন তাই আমি ব্যবহার করব। আব কোন জিনিস কেউ যেন আমার ঘরে না আনে।'

নির্মলা এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় নি। সে বলেছে, 'শস্যর চেয়ে শয়ন-সংলগ্নীটিই আসল। তা ছাড়া ঘর আমার সাধা। আমি পার্টিতেও ঘুমোতে পারি আবার মাটিতেও ঘুমোতে পারি।'

মেসোমশাই উদারভাবে বলেছেন, 'সত্যিই তো। ছোট বড়ম। যা বলেছে তাহঁ ঠিক। ওর বাবার দেওয়া জিনিসই ও ইউজ করুক। তারপর যখন দরকার হবে বদলে নেবে।'

অর্চনার দিকে চেয়ে আমি ফের জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে তোমার বলতো? অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে নাকি?'

অর্চনা হাসল, 'তুমি কি সত্যিই ডাক্তার করতে এসেছ? অসুখ-বিসুখ করবে কেন? সুখেই তো আছি।'

বললাম, 'তোমার মুখ দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। অর্চনা এ কথাও কোন জবাব দিস না।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আচ্ছা, নির্মলা কোথায়? ওদের কাউকেই বাড়িতে দেখাছিন।'

অর্চনা একটু হাসল, 'ওরা কি এত সকাল সকাল বাড়ি ফেরেন যে দেখবে?'

'কখন ফেরেন?'

'তার কি কিছু ঠিক আছে? এগারটা বারটা।'

'ওরে বাবা। অভ রাত অবধি ওরা বাইরে করেন কি?'

অর্চনা বলল, 'সবাই এক কাজ করেন নাকি? বড়দা নতুন এক কারখানা গড়ে তুলছেন সন্তোষপুরে। সে কারখানা ওর নিজেব। তিনি তাই নিয়ে ব্যস্ত। মেজদার রাজনীতি আছে। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে থাকেন।'

'আর নির্মলা?'

অর্চনা বলল, 'তিনি দর্শক। রাষ্ট্রের কলকাতা দেখে বেড়ান।'

হেসে বলল, 'একই দেখেন?'

অর্চনা বলল, 'একা কি আর দেখেন? নিশ্চয়ই সঙ্গী-টঙ্গী আছে। ক্লাব আছে।'

হেসে বললাম, 'তুমি গিয়েছ সেই ক্লাবে?'

অর্চনা বলল, 'এ বাড়ির মেয়েদের বাইরে যাওয়ার নিয়ম নেই। যদি থাকতও ওসব ক্লাবে আমি যেতাম না।'

হেসে বললাম, 'তোমার অত শূচিবাস্তুতা কেন অর্চনা?'

অর্চনা বলল, 'শূচিবাস্তুতা নয়, শূচিতা বল। তুমি দেখেছ তো আমার বাবাকে? বাবা একটা সিগারেট পর্যন্ত খান না।'

বললাম, 'সবাই তোমার বাবার মত হবে এমন আশা করতে পার না।'

অর্চনা বলল, 'সিগারেটটা না হয় তবু সহ্য করা যায়। যদিও তা আমার পক্ষে সহ্য কবা কঠিন। তুমি দেখেছ ক্লাসে যেসব ছেলে সিগারেট খেত আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতাম না। শব্দ ওই গন্ধের জন্যে। ওই গন্ধ আমার কাছে অসহ্য।'

হেসে বললাম, 'আবার এও জানি অনেক মেয়ে ওই সিগারেটের গন্ধের জন্যেই হার্ডস্মোকারদের পছন্দ করত।'

কোন কোন মেয়ে নাকি নিজেরাও সিগারেট খেত। আমার চোখে অবশ্য পড়ে ন। কিন্তু কারো কারো ঘ্রাণে অর্ধ-ভোজন হত এ কথা শুনোছ।'

অর্চনা বলল, 'তুমি জানো, আমি সেই অর্ধভুক্তদের দলে ছিলাম না।'

বললাম, 'যার ভরপেট খাওয়ার সাধ্য আছে সে কেন আধপেটা খেয়ে থাকবে?'

অর্চনা বলল, 'ভরপেটই বটে। তোমার নির্মলাদার যে এত ভিত্তিক করার অভ্যাস আছে তা তো তুমি কই আমাকেও বল নি, আমার বাবা-মাকেও বল নি।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'অর্চনা, তুমি মিথ্যা আমাকে দোষারোপ করছ। তোমার মাও আমাকে ওর্ডার এমন অনুরোধ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তো শব্দ তোমাদের যোগাযোগ ধরিয়ে দিয়েছিলাম। তোমরা নিজেরা দেখে-শুনে যাচাই করে নেবে এ ভার তোমাদের ওপরই ছিল।'

অর্চনা আমার কথাও কোন জবাব দিল না। বোধ হয় জবাব দেওয়ার কিছু ছিল না।

একটু বাসে আমি ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন। আরো পাঁচটা অভ্যাসের মত মদ খাওয়াও একটা অভ্যাস মাত্র। এ অভ্যাস ছাড়তে কতক্ষণ। সব দেখে-শুনে মানুষ এক সময় এ অভ্যাস নিজেই ছেড়ে দেয়।' অর্চনা বলল, 'আবার কেউ কেউ ছাড়তে পারেও না, ছাড়তে চাইলেও পারে না। মৃত্যু পর্যন্ত অনেকে অনেক অভ্যাসকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বয়ে নিয়ে যায়।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'নির্মলা নিশ্চয়ই অভ্যাসের অমন দাস হয়ে পড়বে না। তা ছাড়া এর মধ্যে নীতিগত প্রশ্ন তুমি-কেন টেনে আনছ? নির্মলা অ্যাফোর্ড করতে পারে তাই খায়। যারা স্ট্রীপট্রাকে না খেতে পারে না পরতে পারে বারে গিয়ে পড়ে থাকে নির্মলা নিশ্চয়ই তাদের দলে নয়।'

অর্চনা একটু হাসল, 'খব যে ওকালতি করছ। চোরে চোরে মাসভুতো ভাই।'

বললাম, 'তুমি ভালো কবেই জানো আমি ও রসে রসিক নই। আমি চরিত্রও করিনে, লোকোচরিত্রও করিনে। এর মধ্যে কতটা সামাজিক অন্যান্য কতটা বা ব্যক্তিগত রুচি অর্চনার ব্যাপার রয়েছে আমি তাই ভাবি।'

অর্চনা আর একটু সোজা হয়ে বসল, 'সেই রুচি অর্চনা কি আমার থাকতে নেই? তোমার নির্মলা জানে ওই গন্ধ আমি একেবারেই সহ্য করতে পারিনে।'

হেসে বললাম, 'তোমার শব্দ-গন্ধে আপত্তি? শুনোই এলাচ টেলচ

আরো কি সব মশলাপাতিতে ও গন্ধ ঢাকা যায়। নিম্নলিঙ্গকে বলতে হবে।

অর্চনা বলল, 'তুমি হাসছ। জানো না তো সহ্য করা কী কঠিন।' আমি চুপ করে রইলাম। নীতির প্রশ্ন বাদ দিলেও ব্যক্তিগত রুচি অরুচির প্রশ্ন কম কথা নয়। বোধহয় সবচেয়ে বড় কথা। যে বস্তুর স্বাদগন্ধ নিম্নলিঙ্গকে কাছে পরম উপাদেয় তার অস্বস্তি হয়তো অর্চনার পক্ষে অসহনীয়। আমাদের শরীর ধর্ম কি আমাদের মানসিক প্রবণতা হৃদয়বস্তির চেয়েও বড়?

অর্চনা বলল, 'কিন্তু তোমাকে আজ তোমার দানার বিরুদ্ধে নালিশ শোনাবা জন্যে ডাকিনি। অন্য একটা দরকারে ডেকেছি।'

হেসে বললাম, 'আমার মত অস্বস্তিকারী লোককেও কেউ আবার সরকারী কাছে ডাকে! বল কী করতে হবে।'

অর্চনা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সারাদিন বাড়িই মশো চুপচাপ বসে থেকে থেকে আনার নিঃস্বাস বন্ধ হয়ে আসে।' এখানে 'কিছু' আমার বরবার নেই। আমি বাইরে বেরিয়ে কিছু করতে চাই।'

'কী করবে চাকরি বাকরি?'

'হ্যাঁ। যদি মাটিরার জোটে—স্কুলে কলোজে পড়শালার যেখানে হোক তাই করব। যদি অফিসে কিছু পাই টৌল-ফোন অপারেটর থেকে গুরু করে সিসেপসনিস্ট, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট যে কোন পোস্টে—'

'তোমার চাকরির জন্যে উদ্দেশ্য করিতে বলছ?'

অর্চনা বলল, 'না উদ্দেশ্য করিতে বলছি না। চাকরি আমি নিজেরই জোগাড় করে নেব। কিন্তু তার জন্যে আমাকে বাইরে বেরোতে হবে। ইন্টারভিউতে ডাকলে তার জন্যে হাঙ্গির হতে হবে, চাকরি পেলে চাকরি করতেও হবে।'

হেসে বললাম, 'তাহলে হবেই।'

অর্চনা বলল, 'সেই মতটা তুমি বাবার কাছ থেকে মানে তোমার মেসো-মশাইর কাছ থেকে আদায় করে দাও। শুনোছি, নিজের ছেলেদের চেয়েও তোমাকে বেশি ভালোবাসেন। তুমি আজকালকার ছেলে হয়েও মদ তো দরের কথা, পান খাও না, বিড়ি সিগারেট খাও না, কোন রাজনৈতিক হৃদয়গের মধ্যে যাও না, তোমার অন্য কোন বিলাসবাসন নেই, তুমি ধৃতি-পাশ্রাব পর, নিজের কাজ আর পড়া-শোনা নিয়ে থাকো বাবার কাছে তুমি আদর্শ ছেলে।'

অর্চনার মূখের দিকে তাকালাম। তাঁক ঠাট্টা করছে: কিন্তু ঠিক ঠাট্টা

বলে মনে হল না। অর্চনার 'ক'বা নিরঞ্জন-চৌধুরীও তো এই আদর্শেই বিশ্বাসী। ওর দাদা তাপস এখন আছে লন্ডনে। রিসার্চের জায়। শুনোছি তার আচার আচরণেও এই ধরনের মলোবোধ স্বীকৃতি পায়। ছেলের সঙ্গে নিরঞ্জন-বাবুর নিয়মিত চিঠিপত্র চলে। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে আমার প্রোটো-টাইপ নয়। কিন্তু আমার ছেলে আমারই ছেলে। আমারই চিন্তাবস্তির অনুসারী। উত্তরাধিকারী।'

আমি অর্চনার দিকে চেয়ে বললাম, 'তুমি বা বললে সবই আমার নৈতিবাচক বিশেষণ। আমার মধ্যে সদর্থক অন্তি-বাচক কিছু নেই।'

সব না না না না। এই তা না না-স্ব আমি আরো কিছু যোগ করতে পারি। আমি কোনোদিন মেসোমশাইর কাছে কোন আবেদন নিয়ে আসিনি। তুমি জানো কিনা জানিনে, মেসোমশাই তাঁর এই কারবারে আমাকে আর আমার দাদাকেও টানতে চেয়েছিলেন। দাদার মন একটু ছলে উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসেনি।

আমিও আসিনি। এলে আমার মাসভূতো ভাইদের মত, মাসভূতো ভ্রাতৃপতিদের মত কোন না কোন ডিপার্টমেন্টের 'ইনচার্জ' হয়ে যেতে পারতাম। মোটা মাইনে পেতাম। বলা যায় না পরিণত বয়সে দু' এক পয়সার স্বেচ্ছারও হয়তো জুটে যেত।'

অর্চনা একটু হাসল। 'তবে এলে না কেন?'

আমি এ কথার কোন জবাব দিলাম না। বললাম, 'আমিও আসিনি। আমার কোন আত্মীয়-বন্ধুকেও চাকরি প্রার্থী করে পাঠাইনি।'

অর্চনা বলল, 'কিন্তু আমার কেস আলাদা। আমি তো আর আমার শব্দরের কারখানায় কি অফিসে চাকরি চাইছি। আমি শুধু এই দুর্গ থেকে বেরোবার জন্যে একটি গোটপাশ চাইছি। তার জন্যে তুমি সুপারিশ করতে পার।'

হেসে বললাম, 'নিম্নলিঙ্গকে বলনা।'

অর্চনা বলল, 'ওয়ে বাবা। এ ব্যাপারে বাবার ছেলেরা তাঁর বাবা। এ বাড়ির বউরা বাইরে বেরোবে চাকরি করতে? বাড়ির মর্যাদা নষ্ট হবে না?'

হেসে বললাম, 'এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আমি বললেই কি কিছু হবে। বুঝিয়ে শুনিয়ে আগে নিম্নলিঙ্গকে রাজি করাতে হবে। তারপর মেসোমশাইকে ধরব।'

অর্চনা বলল, 'যেভাবেই পার এই কাজটুকু তোমাকে করে দিতেই হবে। তাহলে শুধু তুমি আমার মধ্যস্থ বন্দ।' বললাম, 'পুত্রস্কারটা কী পাব?'

অর্চনা বলল, 'পুত্রস্কার? তুমি নাকি নৈতিবাদী নিম্নলিঙ্গ পুত্রস্কার? আমার কাজ উদ্ধার হলে তোমাকে আমি একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজে দেব। যেমন তুমি আমাকে সুন্দর পায়ের খোঁজ দিয়েছ।'

হেসে বললাম, 'পারটি যে সুন্দর তাতে কোন সন্দেহ নেই অর্চনা। নিম্নলিঙ্গ আমাদের ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে সুপুত্রস্কার। বাবাপুত্রস্কার। বন্দুক ছুঁড়ে পারে, শিকার করতে পারে।'

ভারতী বউদি খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, 'বন্ধু'ব সঙ্গে মৃদুধ্বনির বসে গল্প করলেই বুঝি হবে অর্চনা? ওকে চা-টা দিতে হবে না?'

অর্চনা বলল, 'সেহন্যে তো তোমরাই আছ। সিনিয়র বউদি।'

ভারতী বউদি বলল, 'হ্যাঁ, তুমি বসে বসে মৃদুধ্বনি পান কববে আর আমরা আছি দাসী বউদি চা জোগাব, পান দোস্ত জোগাব।'

ঠেতে করে কেঁটল আর তিন চারটি কাপ নিয়ে অল্পবয়সী একটি মেয়ে এসে চুকল।

ভারতী বউদি বলল, 'পদ্মা তুই সব রেখে যা। আমি ঢেলে দেব।'

মেরিটি চলে গেলে ভারতী বউদি বসলেন, আমার এই নতুন কিটি কেমন দেখতে সখী?'

বললাম, 'ভালোই তো।'

ভারতী বউদি বললেন, 'কালোর ওপর বেশ মিষ্টি চেহারা, তাই না?'

বললাম, 'হুঁ।'

ভারতী বউদি বললেন, 'আমি এ বাড়ির কয়েকটি বউদি ঝি আর অপদার্থ চাকরকে বাদ দিয়ে নতুন লোক নিয়োজি। দুটি বউদির অবশ্য পেনসনের ব্যবস্থাও করছি। সব আমার হাত ধরচ থেকে।'

হেসে বললাম, 'মহারাজী কবুগা-ময়ী। আর বুড়ো দারোয়ান জাইভার রাখলে বামুনদের কী অবস্থা? তাদেরও কি চাকরি গেছে নাকি?'

ভারতী বউদিও হাসলেন, 'ওটা আমার ডিপার্টমেন্ট নয়। তারা প্রায় সবাই বহাল তবিয়তে আছে। ও ঝি তুমি মিষ্টিটিষ্টি কিছু খাও না যে।'

বললাম, 'আমি চা বিস্কুটই খাব। মিষ্টি পছন্দ করিনে বউদি।'

'তাই কি হয় ভাই? শূদ্র মিষ্টি মুখের পানে চেয়ে থাকলেই চলে? মিষ্টি খেতেও হয়।'

হঠাৎ ভারতী বউদি একটি রসগোল্লা আমার মুখে জোর করে গুঁজে দিলেন। খানিকটা রস আমার জ্ঞানর

লেগে গেল। আমার মনে হল এও ভারতী বউদিব দুষ্টুটি।

আমি বললাম, 'কী করলেন দেখুন তো।' ইন্দেন তো আমার জানাটা নষ্ট করে ?'

ভারতী বউদি বললেন, 'এই বউদি নষ্ট ক'রা হল ? আচ্ছা পিঁড়ত তো ? অর্চনা, দে তো এই রসটুকু খুয়ে। এই হল বসেব মাহাশ্মা। লাগাতেও রস, খুয়ে ফেলতেও রস। চলি ভাই রাঙা ঠাকুরপো।'

বললাম, 'আমি আবার রাঙা হলাম কখন ?'

'লক্ষ্য রাঙা না কি অনুরাগে রাঙা ? কোনটা মানানসই হয় অর্চনা বলতো।'

অর্চনা বলল, 'কী জানি মেজাদি। আমি তো কোথাও রঙ দেখিছিনে।'

ভারতী বউদি বললেন, 'তুমি আবার রঙ দেখছ না ? তোমার ছোঁয়াব আমাদের সঞ্জীব ঠাকুরপো যে একখানা রামধনু হয়ে রয়েছে। যাই ভাই, এবাব তোমরা খাওয়া দাওয়া শেষ কব। খেয়েদেয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করে। দুজনেই এসো। উনি তোমাদের খবর নিয়েছেন। তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

তিনি বেরিয়ে গেলে আমি বললাম, 'ভারতী বউদি একখানা মেয়ে ঘটে।'

অর্চনা বলল, 'হ্যাঁ, খুব ঠাট্টা ভামাসা করতে পারে। নিজেও আনন্দ থাকে বাড়ির আর পাঁচজনকেও আনন্দে রাখে। তবে মাঝে মাঝে বড় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এই যা দোষ।'

একটু বাদে বলল, 'কী আর করা থাকবে। যার যা স্বভাব।'

'আব ররা বউদি ?'

তিনি এর বিপরীত। গম্ভীর প্রকৃতি। বাইবের লোকব সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে পারেন না। বউদি ঘরের কাজকর্ম নিয়ে থাকতেই ভালো-মাসেন। বেশ গুছাতে টুছাতে জানেন।'

হেসে বললাম, 'আর আমার মাসীমাব ছোট বউ ?'

অর্চনা বলল, 'তাকে তো দেখতেই শাচ্ছ।'

মনে মনে ভাবলাম দেখতে পাচ্ছি হুই কি। তবে অর্চনাকে আগে বেগন দেখেছি তার চাইতে ও যেন আবো একটু গম্ভীর হয়েছে। ওর মুখে চোখে বিষমতা ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

অর্চনা বলল, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বাবা নাকি আবার অপেক্ষা করছেন।'



দাদাশব্দুর হতে রাজি আছি

'হ্যাঁ, মেসোমশাই দুজনকেই ডেকে পাঠিয়েছেন। কী ব্যাপার বলতো ?'

'কী করে বলব ? বোঝহয় কাছে বসিয়ে গল্প টম্প করবেন। উনি আজ-কাল কথা বলতে ভালোবাসেন। কিন্তু কথা বলবার লোক পান না।'

'তুমি একটু যত্ন টঙ্গ করলেই পার। বড়ো মানুস।'

অর্চনা হেসে বলল, 'সে কি তুমি বলবে তবে করব ? তুমি কি আমার দাদাশব্দুর নাকি ?'

'তোমার মত একটি নাটবউ পেলে দাদাশব্দুর হতে রাজি আছি।'

অর্চনা বলল, 'বটে।'

প্লেটে মিষ্টিগুলি পড়েই আছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম, 'অর্চনা, মিষ্টিগুলি খেয়ে নাও। মিছামিছি নষ্ট হবে।'

'নষ্ট হবে কেন। লোকজন আছে ওরা খাবে। কিন্তু তুমি খেলেই ভালো হত। তোমার জন্যে আনা।'

'পাগল নাকি অত কেউ খেতে পাবে ? ভালো কথা তুমি আমায় জামার রসেব দাগটা তুলে দিলে না ?'

অর্চনা বলল, 'আমার দায় পড়েছে। যিনি রস মাখিয়ে দিয়ে গেছেন তাকে ডাকো।'

তিনি তো মাখিয়ে দিয়েই থালাম।'

অহলে নিজেই তুলে নাও। তোমার কি হাত টাট কিছু নেই ?'

তারপর অবশ্য অর্চনা ওর আঁচলের খুঁট ভলে ভিজিয়ে আমার বুক পকেটের কাছ থেকে রসের দাগ তুলে দিল। তারপর মৃদু গল্পনার সুরে বলল, 'নাও। তোমরা সবাই সমান। খাটিয়ে নিতে কেউ ছাড় না।'

এই গল্পনা অবশ্য গুজনের মত শোনাল। আমি ওর আরওটুকু উপভোগ করতে করতে ভাবলাম বউদি হয়ে না এসে অর্চনা কি এত ঘনিষ্ঠভাবে আমার কাছে আসত ? ফিলসফি আমরা সবাই পড়তাম। কিন্তু ওকেই একমাত্র দার্শনিক মনে হত। কী গাম্ভীর্য আর একাক্ষ নিঃসেই না অর্চনা থাকত তখন। তারপর যে আলাপ হল তা নিতান্তই সশরৎ আলাপ। একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার সুযোগ হল এবং আমাদের ফার্ম থেকে নিরঞ্জনবাবুর একখানি প্রবন্ধেব বই ছাপা হওয়ার সময়। তখন আমি মাঝে মাঝে যেতাম। একবার ওর বাবার সঙ্গে ও আমাদের ফার্মে এসেছিল। দেখে গিয়েছিল আমি কত সামান্য কাজ করি। তা সত্ত্বেও আমি যখন ওদের বাড়িতে যেতাম ও আমার সঙ্গে বসে কথা বলত চা টা দিত। নিরঞ্জনবাবু বাড়িতে না থাকলেও এই আদর আপ্যায়নটুকু জুটত।

ভারপর আমি ঘটক হয়ে গেলাম। আর কিছু হবার ইচ্ছা কি আমার মনে কখনো ছিল? কখনো না।

‘আচ্ছা নিরালদা, কেন আসছেন না অর্চনা?’

অর্চনা বলল, ‘কী জানি, আমাকে তো কিছু বলে যায় নি।’

‘আমাকে আসতে বলে নিজেই অনুরোধ করত।’

‘সে হয়তো ভেবেছে সে উপস্থিত না থাকলেও তোমার আদর যত্নের কোন অভাব হবে না।’

বললাম, ‘সে অভাব হচ্ছেও না। কিন্তু নিরালদা থাকলে ভালো লাগত। সমস্ত বাড়ির মধ্যে ও’র সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়।’

অর্চনা মৃদুস্বরে বলল, ‘শুধু কথাই বলতে পারে।’

ওপর থেকে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি একটু কান খাড়া করে থেকে বললাম, ‘ও কি।’

অর্চনা মৃদু হাসল, ‘রাধা গোবিন্দের ঘরে আর্বাতি হচ্ছে। আজ ঠাকুর-মশাই একটু দেরি করে এসেছেন। নইলে এতক্ষণ আর্বাতি শেষ হয়ে যায়।’

আমার মনে পড়ল রাধাগোবিন্দ মেসোমশাইদের গৃহবিগ্রহ। এই বিগ্রহের নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে।

মেসোমশাই একদিন বলেছিলেন, ‘আমাব যা কিছু হয়েছে ওই গোবিন্দের কৃপায়।’

আমি বলেছিলাম, ‘কিন্তু মেসোমশাই আমি আপনার ব্যবসায়বুদ্ধিকে, আগনার ক্ষমতাকে আরো বেশি বিশ্বাস করি।’

তিনি বলেছিলেন, ‘স্কেপেছ? আমার মত বুদ্ধি আর ক্ষমতা অনেকেরই আছে। কিন্তু ভগবান মুখ তুলে না চাইলে, তিনি কৃপা না করলে এটুকু হত না তা আমি জানি।’

মেসোমশাইর এই ভগবানভক্তির অংশীদার আমি হতে পারি নি। কিন্তু এই বিশ্বাস যে তাকে শক্তি জুগিয়েছে তা অনুভব করতে পারি। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় কখনো কখনো মেসোমশাইর মুখে যে অশান্তির ছায়া দেখতে পাই তা কি ঈশ্বরের অনুগ্রহ না নিগ্রহ? দঃখ-কষ্ট-বন্ত্রণাকে কোন চোখে দেখেন মেসোমশাই? কী ব্যাখ্যা দেন এই অশুভ শক্তির?

আমাদের বাড়িতে পূজা অর্চনা হয় না। শুধু মার একটি লক্ষ্মীর আসন আছে। পোড়ামাটির ছোট একটি লক্ষ্মী-মূর্তি। মা নিত্য সেখানে ফুল জল দেন। আর রেকাবিতে করে দু’খানা বাতাসা ভোগ। বিশেষ কোন উপলক্ষ থাকলে সন্দেশ। পূজার সময় আমি থাকি। কিন্তু প্রসাদের সময় সর্বোচ্চ হাত

পাতি, দাও-মা, প্রসাদ দাও।’

মা বলেন, ‘তোবা তো দেব-দেবী কিছু মানিসনে। তবে প্রসাদ কিসের?’

আমি বলি, ‘আর কিছু না গানলেও, মাতৃদেবীকে তো মানি।’

মা বলেন, ‘ঘোড়ার ডিম মানো। বিপদের সময় মানো, সম্পদের সময় মানো না। সব সুবিধাবাদী।’

আমাদের বাড়িতে ষেটুকু অনুষ্ঠান হয় নিরঞ্জনবাবুর বাড়িতে তাও হয় না। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নন, তবে আপৌস্তলিক, আনুষ্ঠানিক কোন ধর্মচরণে বিশ্বাস করেন না। মেয়েদের বেলায় কী হয় জানি, নিরঞ্জনবাবুকে অত্যন্ত ওসব কিছু করতে দেখি নি। শুধু দেশ-বিদেশের লোকোত্তর পুরুষদের ছবি তাঁর ঘরে টাঙানো দেখেছি।

ধর্ম সম্বন্ধে মেসোমশাইর আমার আর নিরঞ্জনবাবুর মত, বিশ্বাস, আচার-আচরণ কত আলাদা। অথচ আমরা একই হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত।

অর্চনাকে বললাম, ‘কোথায় আজকাল তোমাদের ঠাকুরঘর? ওপরে নাকি?’

অর্চনা বলল, ‘হ্যাঁ, ছাদের ওপরে একখানা নতুন ঘর করা হয়েছে। সেখানে রাধাগোবিন্দকে ওঁরা নিয়ে রেখেছেন। আগে নিচের ঘরেই ছিলেন। কিন্তু বাবা বললেন, ‘ঠাকুরের ঘর ওপরেই থাকা উচিত।’

বললাম, ‘চল তা হলে।’

অর্চনা বলল, ‘ওখানে গেলে কিন্তু দেবতাকে প্রণাম করতে হবে, প্রসাদ নিতে হবে।’

হেসে বললাম, ‘নেব, যিগ্মন দেশে যদাচারঃ। ভালো কথা, মেসোমশাইর সামনে তোমাকে কিন্তু আমি বউদি বলে ডাকাব। তুমি হেসো না কিন্তু।’

অর্চনা হাসিমুখে বলল, ‘হাসব কেন। তাই বলে তোমাকে কিন্তু আমি ঠাকুরপো বলে ডাকতে পারব না।’

বললাম, ‘বেশ তো সঞ্জীবদা বলবে।’

অর্চনা হেসে বলল, ‘ঈস। খবর যে দাদা হবার সখ? তুমি কি আমার চেয়ে বয়সে বড়।’

আমরা ওপারে উঠলাম। ঠাকুর ঘরের সামনে তখনো আর্বাতি হচ্ছে। শ্বেত পাথরে গড়া বাধিকা মূর্তি, কালো পাথরের বংশীধারী কৃষ্ণ। বোগায়ত পৈতা গলায় একজন ব্রাহ্মণ পঞ্চপ্রদীপ হাতে, ঘণ্টা বাজিয়ে আর্বাতি করছেন।

মেসোমশাইর পরনে পটুকাপট্ট। কোঁচার খুঁটিট গলায় ভুলে দিয়েছেন। তিনি নিজের হাতে কাঁসর বাজাচ্ছেন। তাঁর পাশে যন্ত্রকবে মাসিমা দাঁড়িয়েছেন। পরনে লালপেড়ে সাদা খোলসে শাড়ী। একটু দূরে রম্মা বউদি, ভারতী বউদি আর মঞ্জুলা দাঁড়িয়েছে।

মেসোমশাই আমাদের দেখে জোখের

ইসারায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে বললেন। অর্চনা সরে গিয়ে মেয়েদের পাশে দাঁড়াল। আমি আলাদা। এখানে সম্প্রদায়িক ধর্মচরণ করছেন শুধু মেসোমশাই।

পূজা আর আর্বাতির পর প্রসাদ বিতরণ হল। শুধু পরিবারের লোকজনই নয়, ষি চাকর দারোয়ান ড্রাইভাররাও প্রসাদ পেল। প্রসাদের মধ্যে কিছু শ্রেণী-বিভেদ ছিল কিনা লক্ষ্য করি নি। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা আছে আমি তার সবটুকু গ্রহণ করতে পারলাম না। কিন্তু এর অংশবিশেষের মধ্যে যে দৃশ্যগত সৌন্দর্য আছে আমার রূপানুভূতিকে তা ছুঁয়ে গেল। দীপের আলোটুকু ভালো লাগল, ধূপের গন্ধটুকু ভালো লাগল, ধোঁয়াটুকুও। শ্বেত পাথরে গড়া রাধাধারার মূর্তিটুকু বেশ সুন্দর। অমন চম্পলা অতি প্রগলভা ভারতী বউদি স্থির নির্বাকভাবে ওই মূর্তির মতই দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখেও কি এখন একটু বিষাদের ছায়া লেগেছে না কি এ আমারই দৃষ্টিভ্রম? এই আধুনিক শিক্ষিতা যৌবনবতী মেয়েবা কি এসব ধর্মানুষ্ঠানে বিশ্বাস করেন? না কি আমারই মত এ’রা শুধু দেখতে এসেছেন?

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে মেসোমশাই মাসিমা নিচে দোতলায় নিজেদের ঘরে ফিরে গেলেন। যাওয়ার সময় মেসোমশাই ডেকে গেলেন, ‘সঞ্জীব, এসো। ছোট বউমা তুমিও এসো আমার ঘরে।’

ওঁবা চলে গেলে ভারতী বউদি মুখ টিপে হাসলেন, ‘যাও দেই ত্যসামী। এবার ডাক পড়েছে তোমাদের! দেখ গিয়ে কী হয়। নির্বাসন না কি যাবজ্জীবন কাবাদড।’

বললাম, ‘আমাদের উকিস হয়ে আপনিও চলুন। দেখুন যদি ছাড়িয়ে আনতে পারেন।’

ভারতী বউদি বললেন, ‘উকিল হব কোন দয়খে। আমি ব্যারিস্টার। আমার ফি বড় চড়া।’

‘কত?’

ভারতী বউদি বললেন, ‘শুন কি হবে। তুমি জুগিয়ে উঠতে পারবে না।’

বললাম, ‘আচ্ছা, তাহলে মঞ্জুলা চলুক আমাদের সঙ্গে। মঞ্জু, তোর কী হয়েছে বলতো। সেই থেকে মূ’ ভার করেই আছিস।’

মঞ্জু বলল, ‘কী আবার হবে।’

ভারতী বউদি বললেন, ‘যা হয়েছে তা তুমি বুঝবে না সঞ্জীব।’

‘বুঝিয়ে বললে বুঝব না কেন?’

‘তুমি একটি বোকাম। সব কথা কি আর ব্যাখ্যা কবে বুঝিয়ে বলা যায়? ইসারা ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হয়। মঞ্জুর তিন বউদির স্বামীর এগাবটা হোক নাহা। তাক এই ব্যক্তির মুখই ফিরবে।’

বিস্তৃত মঞ্জুর আদেশে বিশ্বজনীন। ছোট
মন্ডাই দর্শন-বিশ্বের মধ্যে ফিরছে না।

বললাম, 'সলিল পেছে কোথায়?'

ভাবতী বউদি বললেন, 'মন্ডাই
সেখানে ডিলারদের সঙ্গে ক্রিয়াকর্ম আছে।
মঞ্জুর ভাবছে বাবার হৃদয় কি কঠিন।
পাঠালেই যদি পূর্ণিমা রজনীর পরে
জামাইকে বাইরে পাঠালেই হত।'

বললাম, 'আজ পূর্ণিমা নাকি?'

'কেন আকাশের দিকে তাকাওনি।'

বললাম, 'তাকাবার মত ক্ষুধার আর
পেলাম কোথায়?'

ভারতী বউদি বললেন, 'ওরে বাবা!
শুধু যে কথা ফুটেছে।'

মেসোমশাইর ঘরের দিকে যেতে যেতে
অর্চনার কাছে শুনলাম মন্ডাই
আদিত্য এন্ড সন্সের যে ছোট একটি
অফিস আছে মঞ্জুর স্বামী সলিলকে
তার ম্যানেজার করে পাঠানো হবে।
মঞ্জুর সেখানে যাবে। কিন্তু বাবা তাকে
কলকাতার বাইরে সদর মফস্বলে
পাঠাচ্ছেন বলে মঞ্জুর খুশি নয়।
কলকাতার এত বড় কারখানার কি ছোট
জামাইয়ের একটু জায়গা হত না? কিন্তু
মেসোমশাই জামাইয়ের রাজনৈতিক মতা-
মতকে একটু সন্দেহের চোখে দেখেন।
লেবারের সঙ্গে তার বড় বেশি মাথা-
মাষি। মঞ্জুর স্বামীকে পবামর্শ দিয়েছে
অন্য কাজ খুঁজে নিতে। এই নিয়ে বাপ
মেয়ের মধ্যে মন কষাকষি চলছে।

'এসো সঞ্জীব, এসো বউমা।'

সন্নেহে আমাদের দু'জনকে ঘরের
মধ্যে ডেকে নিলেন মেসোমশাই।

এবার বড় একখানা ইঞ্জিনের তিন
দীর্ঘ দেহকে এলিয়ে নিয়েছেন। ঠাকুর-
ষবেব সামনে যে-বেশে তিনি দাঁড়িয়ে-
ছিলেন সেই বেশ ছেড়ে ফেলেছেন। এখন
তার পরণে সাধারণ ধাঁড়! ফতুয়া বদলে
গায়ে একটা গেঞ্জি। একটু যে-ক্লান্ত
লাগছে মেসোমশাইকে। তবু তিনি
আমাদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন,
'দাঁড়িয়ে কেন, বোসো তোমরা।'—ওখানে
দুটো মোড়া আছে। অর্চনা মোড়া দুটি
নিরে সামনে এসে বোসো।' তাবপর
আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন,
'আমি মাঝে মাঝে ওব নাম ধরেও ডাকি।
তাই বলে তুমি যেন তা ডাকতে যেনো
না। মোটেই ভালো শোনাবে না। সেদিন
আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম।
হাল আমলের বউদি দেওয়ার বনভাব-
সেননেব একটুকরো কানে এস। তারা
পরস্পরকে তুই বলে ডাকছে। আমি তো
অবাক। মেয়েরাই মেয়েদের তুই বলে।
নন্দ ভাজে ওটা চলতে পারে। কিন্তু
দেওব ভাজে কেন চলবে। যে কোন ভাষার
মেয়েদের ডালাকেট আলাদা ছেলেদের
ডালাকেট আলাদা। ছেলেরা যদি সংকুত
বলে মেয়েরা প্রাকৃত।'

অর্চনা করিকাবে খচিত দাম
চর্মডার দুটি সন্দেহ মোড়া এনে দু'পাশে
রাখল।

মেসোমশাই বললেন, 'বোসো দু'জনে
পাশাপাশি বোসো। দুই এক ক্রাসমেট।
তোমাদের দেখে আজ আমার ফের ক্রাস
নেওয়ার লোভ হচ্ছে। এক সমস্ত
গান্টারি তো করছি। টিউশনিও করছি।
একটি ছাত্রকে পড়াভার বার টাকা
মাইনেব। সঙ্গে সঙ্গে তার বোনটিও
আসত। সেটি ফাউ।'

অর্চনা বলল, 'বাবা, আমি তাহলে
আপনার ফাউ?'

মেসোমশাই বললেন, 'তাই কি হয়
মা? তুমি হলে ঘরের বউ, কুললক্ষ্মী।
ভালো কথা, নিম্ন বোধ হয় এখনো
ফেরে নি?'

অর্চনা বলল, 'না বাবা।'

মেসোমশাইর মুখে একটু যেন ছায়া
পড়ল।

'ওরা বোধ হয় কেউ ফেরে নি?'

অর্চনা বলল, 'না।'

মেসোমশাই বললেন, 'দেখ কাশ।
অচ্চ ওরা সবাই জানে সঞ্জীব আজ রায়ে
আমাদের এখানে থাকে। ওকে সেখানে
নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে।'

বললাম, 'তাতে কী হয়েছে মেসো-
মশাই। আমার সঙ্গে তো কোন
ফর্মালিটিব প্রশ্ন নেই। মাসিমা
রয়েছেন, আমি অর্চনার দিকে একটু
তাকিয়ে বললাম, 'বউদিরা রয়েছেন।
এখানে কি আমার আদর-বন্ধের অভাব
হবে?'

মেসোমশাই বললেন, 'তা হবে না।
তবু ওদের থাকা উচিত ছিল। আজ
একটু আগে আগেই ওদের আসা উচিত
ছিল। কিন্তু রাত দুপুরের আগে ওদের
কানো আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না।
যা নিশা সর্বভূতানাং তম্যং জাগতি
সংযমীঃ। আমার ছেলেরা হয়েছে সেই
সংযমীর দল। আমার কাছে যা রাগি
ওদের কাছে তা দিন। একবার বাইরে
বেরোলে ওরা বাড়ির কথা ভুলে যায়।
আমার ছোট বউমাও বাইরে বেরোবার
জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।'

মেসোমশাই আমাদের দিকে তাকিয়ে
একটু হাসলেন।

অর্চনা মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল,
'বাবা, আমি তো আপনাকে সেকথা
বলি নি।'

মেসোমশাই তেমনি হাসলেন, 'বল নি।
কিন্তু আমি অন্তর্ভাগ্যমী কি না, তাই
কোন কোন ব্যাপারে আমি মনের কথা
শুনতে পাই। যেমন আমার কারখানার
রথ, কোন লেবারের দিকে তাকিয়ে আমি
টের পাই ও কি ভাবছে। আমার ছোট
বউমা অবশ্য ছেলেদের মত রাতের

চায়ের সঙ্গে চায় না। দিনের
জালহোসাই দেখতে চায়।

কথটা শুধু মেসোমশাই নিজেই
তুললেন, তখন আর এই সুযোগ হাত-
ছাড়া করা উচিত নয়। আমি মোড়ার
ওপরে টান হয়ে বসে অর্চনার পক্ষ
সমর্থনের জন্যে তৈরি হলাম।

'আপনি ঠিকই বুঝেছেন মেসোমশাই।
ছোট বউদির একটা চাকরি-বাকবি করার
শুধু সাধ।'

মেসোমশাই বললেন, 'সাধ না সখ
সৌখীন মজদুরী। কেন ওর অভাব
কিসের? আমি তো প্রত্যেক বউকে
আলাদা অ্যালাউন্স দিই।'

'টাকাটাই কি বড় কথা মেসোমশাই?
ছোট বউদি লেখাপড়া শিখেছেন। অচ্চ
তার কোন চর্চা হচ্ছে না। এইটাই ওর
মনে সবচেয়ে বড় দুঃখ।'

মেসোমশাই একটু হাসলেন, 'আমাদের
বেশির ভাগ দুঃখই নিজেদের কারখানার
প্রোডাক্ট। আসলে এ দুঃখের কোন কারণ
নেই সঞ্জীব। ছোট বউমার আগের দুই
জা রজা আর ভারতী ওরাও লেখাপড়া
জানা মেয়ে। ওরাও তো এ বাড়িতে বেশ
অচ্চ। চাকরি-বাকবির জন্যে ছুটফট কবছে
না। ওদেরও একজন গ্র্যাডুয়েট আর
একজন অনার্স গ্র্যাডুয়েট। লেখাপড়া
কি শুধু অর্থকরী? চাকরি করবার
জন্যে?'

হেসে বললাম, 'কিন্তু চাকরিও তো
দরকার। অল্পবস্ত্রের সমস্যা সবচেয়ে
আগে।'

মেসোমশাই এবার সোজা হয়ে
বসলেন। তারপর বললেন, 'হাজারবার।
হাজার হাজার ছেলেমেয়ে সেই সমস্যার
জর্জর। সেই সমস্যার সমাধান আমার
মত দু'চারজন ক্ষুদ্র ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের
হাতে নয়। এটা একটা ন্যাশনাল প্রবলেম।
ন্যাশনাল লেভেলেই এর সমাধানের চেষ্টা
দেখতে হবে। তবু ক্ষুদ্রশক্তি মত অল্প
আমার কাজ করছি তুমি তা জানো?
আমার কারখানা আমার অফিস, আমার
ব্রান্ড অফিসগুলি সব ওভার-
কটফড। যারা আমার লগিত না করে,
আমার গলার ছুরি না ধরে তাদের কাউকে
আমি ছাটাই কবিনে। আমি ভাবি, আহা
ওদের ব্রুজিরোজনার বস্তু ফতে লাভ কি?
আমার না হয় দু'পয়সা কমই হয়।'

নাতনীকে কোলে নিয়ে মাসিমা পাশে
এসে দাঁড়ালেন। অমলদাস হুময়ে। বৈদ্য
সুন্দর হয়েছে দেখতে। ওর গালের পতাই
সুন্দরী।

আমি বললাম, 'বেশ মজত হা-
মেয়ে।'

মাসীমা বললেন, 'আজ তা-
কিছু। দুপুর একশেষ। এতক্ষণ কী
জ্বালানোটাই না জ্বালানো ছিল।' মাসিমা
মেসোমশাইর দিকে একটু হেসে তাকালেন,

‘আর জন্মলাভ তুমি। সম্ভা থেকে সেই-বে বকবক করছ।’

মেসোমশাই হেসে বললেন, ‘ওটা বৃদ্ধি তোমারই মনোপাল।’

মাসীমা প্রসঙ্গ পাচ্চলেন, ‘তোমার খাওয়ার সময় হল না? এবার খেয়ে নাও।’

মেসোমশাই বললেন, ‘আমি সঞ্জীবনের সঙ্গে খাব।’

মাসীমা বললেন, ‘ওদের খেতে অনেক দ্রুত হয়ে যাবে। এখনো ছেলেবা কেউ ফেরেনি। ওরা সব একসঙ্গে বসে খাবে। তুমি খেয়ে নাও। তোমার তো বেশি রাত্রে খাওয়ার অভ্যাস নেই। খেলে হজম হয় না।’

মেসোমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘বলছি যে এখন আমি কিছু খাব না। যদি পার তিন কাপ কফি করে দাও আমাদের তিনজনের জন্যে।’

অর্চনা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘মা, তুমি বোসো আমি করে আনিছি।’

মাসীমা বসলেন না। নাতনীকে নিয়ে ফের ঘর থেকে চলে গেলেন।

একটু বাদে ঝেঁতে করে দু’ কাপ কফি আর একটি গ্লাস নিয়ে এল অর্চনা। মেসোমশাইর নিকে ভাফিয়ে হেসে বলল, ‘মা কিছুতেই আপনার জন্যে কফি করতে দিলেন না। বললেন, এইসময় কফি খেলে আপনার খিদে ঘরে যাবে। তাছাড়া রাত্রে ঘুমোতে পারবেন না। তার চেয়ে আপনি একটু ওভালটিন খান।’

মেসোমশাই শানিকটা অসহায় ভাঙতে বললেন, ‘তাই দাও।’

একটি সেক্টর টেবিলের ওপর ট্রোট বেঞ্চে গ্লাসটা মেসোমশাইর হাতে তুলে দিল।

মেসোমশাই পূর্ববধর এইটুকু সেবায় বেশ বৃদ্ধি হলেন। তিনি প্রসঙ্গ কোমল সুরে বললেন, ‘এই তো তোমার কাজ অর্চনা। এই তো তোমার স্বার্থ ক্ষেত্র। আমাদের কাছে উৎসাহ দেওয়া প্রেরণা জোগানো এটা কি কম কাজ? এর চেয়ে তুমি কোন স্কুল কলেজে মাট্টারি করলে, কি অফিসে বসে কলম পিষলে, কি ধর না হয় তুমি কোন অফিসারই হলে এর চেয়ে সেটা কি বেশি গৌরবের কাজ হবে?’

অর্চনা কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। মেসোমশাইর বৃদ্ধি যে তার কাছে একটুও গ্রহণযোগ্য হয়নি আমি তার মৃদু হাসি দেখে তা বুঝতে পারলাম।

মেসোমশাইও তা বুঝলেন।

তিনি একটু ধৈর্যে বললেন, ‘বাংলা দেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ের চাকরির দরকার আছে। আমার কাজে

যারা আসে আমি তাদের বাঁচা তোমরা শৃঙ্খল মূখে শ্রমের মর্যাদার কথা আউন্ড খেয়ো না। কাজ করে তা দেখাও। করবে না চুরি-ডাকাতি আর করবে না ভিক্ষা। পরিবার প্রতিপালনের জন্যে আর সব কাজ মানুব করতে পারে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ের কাজের দরকার আছে। কিন্তু তোমার তো সেই ধরনের কোন দরকার নেই মা। তবু তুমি যদি জেদ করে কোন কাজ নাও তুমি আর একটি লোককে হয়তো একটি গোটা পরিবারকে মৃদুখের গ্রাস থেকে বঞ্চিত করবে।’

অর্চনা একথারও কোন জবাব দিল না। আমি বললাম, ‘টাকার ওর দরকার নেই।’ কিন্তু ওর আত্মবিকাশের পক্ষেও তো কিছু কাজ চাই।’

মেসোমশাই একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, ‘সেই কাজ কি স্কুল কলেজের রুটিন বাঁধা পড়ানো কি অফিসে বসে কলম পেষা? আত্মোন্নতির কি আর কোন রাস্তা নেই? ও পক্ষে শৃঙ্খল টাকা রেজগারই হয়। আত্মবিকাশ, জ্ঞানের অনুশীলন হয় না। আমার অন্য দুই বউমার লেখাপড়া নিয়ে বেশি মাথা ব্যথা নেই। তারা সিনেমা দেখে, সস্তা সিনেমার কাগজ পড়ে। তাদের সাহিত্য সংস্কৃতির দৌড় ঐ পর্যন্ত। বিয়ের পরেও লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক যা একটু অর্চনারই আছে। ভালো কথা। এটা একটা সদগুণ। আমার বহুবিনের ইচ্ছা বাড়তে একটা ভালো লাইব্রেরী করব। তুমি সেই লাইব্রেরী গড়ে তোল।’

আমি বললাম, ‘নিশ্চয়ই এটা একটা ভালো কাজ। হোম লাইব্রেরী আপনার একটা থাকা উচিত।’

মেসোমশাই বললেন, ‘আমার ছেলে-দের ওদিকে রুচি নেই। ওরা সব টেকনিক্যাল লাইনে পড়াশুনো করেছে। টেকনিসিয়ানের দল। সেইজন্যে আমি বউদের বেছে বেছে এনেছি যারা আর্টসের ছাত্রী। ছেবেছিলাম এতে একটা ভারসাম্য থাকবে। ওদের উদ্যোগে এ বাড়িতে শিল্প সাহিত্যের চর্চা বাড়বে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সঞ্জীব আমি হতাশ হয়েছি। পরীক্ষায় পাশ করাটাই সব নয়। অ্যাকাডেমিক পড়াশুনোটাই সব নয়। কিন্তু অর্চনার ওপর আমি এখনো ভরসা রাখি। ও ইচ্ছা করলে সব পারে।’

আমি চুপ করে রইলাম।

অর্চনাও কোন কথা বলল না।

মেসোমশাই একটু হাসলেন, ‘তাছাড়া আমার আরো দু’ একটা প্রাণ আছে। আমার কারখানার লেবারারদের জন্যে আমি একটা রিক্রিয়েশন ক্লাব করে দেব। সেখানেও ওদের জন্যে একটা

লাইব্রেরী থাকবে, রিডিং রুম থাকবে। রিডিং থাকবে। নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থাও থাকবে। ওদের ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা স্ট্রী প্রাইমারী স্কুল খুলবারও ইচ্ছা আছে। যদি অল্পতে বেড়ি পাই আর অল্প যদি বাড়িতে পারি তাহলে আরো কিছু করে যাব। অর্চনা হবে আমার কালচারাল ডিপার্ট-মেন্টের সর্বসর্বা। এর জন্যে কিন্তু মাইনে পাবে না মা।’

হেসে বললাম, ‘সেকি ছোট বউদিকে একেবারে বিনা মাইনেতে খাটিয়ে নেবেন?’

মেসোমশাই বললেন, ‘হ্যাঁ এটা হবে ওর love’s labour, অর্চনা মাঝে মাঝে জনকল্যাণের কাজের কথাও বলে। আপনজনের কল্যাণও জনকল্যাণ।’

পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল। মাসীমা এসে বললেন, ‘তোমার ফোন এসেছে। রিমাউন্ট রোড থেকে মি। তরফদার ডাকছেন তোমাকে।’

মেসোমশাই উঠে দাঁড়ালেন, ‘আজ্ঞা তোমরা যাও গম্পটপ কর গিয়ে। অনেকক্ষণ তোমাদের আটকে রেখেছি।’

মেসোমশাইর বাসন্ততা দেখে মনে হল ফোনটা জরুরী এবং হয়তো ও’র ব্যবসা সংক্রান্ত।

মেসোমশাইর ঘর থেকে বেরোতেই ভারতী বউদির সঙ্গে দেখা। তিনি হেসে বললেন, ‘কী রায় বেরোল? ফাঁসি না স্বাধীপান্তর? আজকাল তো আবার স্বাধীপান্তর নেই। যাবম্জীবন কারাদণ্ড? সেটা আরো কঠিন শাস্তি। কী বলিস অর্চনা।’

অর্চনা বলল, ‘কী জানি। তুমি কি এতক্ষণ আড়ি পেতেছিলে না কি মেজদি?’

ভারতী বউদি বসলেন, ‘ওই তো আমার কাজ। আড়ি পাতা আর ফাঁসি পাতা। চল এবার আমার ঘরে চল।’

ভারতী বউদি আমার হাত ধরলেন।

হেসে বললাম, ‘এখন আর কোন ঘরেই যাচ্ছি না বউদি। এবার মনকে বলছি, মন চল নিজ নিকেতনে।’

‘ওরে বাবা। তবে তো কলির সম্ভা। এখনি এত বেরাগ্য। নিজ নিকে-তনে আজ তোমাকে যেতে দিচ্ছে কে?’

‘সারা রাত আজ কয়েদ করে রাখবেন নাকি? মতলব তো ভালো নয়।’

অর্চনা বলল, ‘সারা রাত না হোক, তুমি এক্ষুণি কী করে যাবে। ও’রা কেউ এলেন না। তোমার খাওয়া দাওয়া কিছু হল না।’

বললাম, ‘খাওয়া দাওয়া যা হয়েছে তাই যথেষ্ট। এবার পালাই।’

ভারতী বউদি বললেন, 'কেন, কার ভরে পালাবে ?'

'কার ভয়ে আবার ? বাড়ির সবাই চিন্তা করবেন।'

ভারতী বউদি বললেন, 'তুমি তো বলেই এসেছ। তাছাড়া চিন্তা করবার আসল লোকটি তো ঘরে আসেনি যে অর্চনার মত চিন্তায় চিন্তায় শূন্য হয়ে মরবে।'

অর্চনা প্রতিবাদ করে বলল, 'কী যে বাজে কথা বলছ মেজদি। আমি শূন্য হয়ে মরব কোন দৃষ্টে। সঞ্জীব যদি বোঁশে দেরি না করতে পারে তাহলে এক কাজ করা যাক। ঠাকুরদের রক্ষা বোধহয় নেমে গেছে। বউদি ওতো ওখানেই আছে। চল, সঞ্জীবকে আমরা খাইয়ে দিই। তারপর ও যেতে হয় চলে যাবে।'

ভারতী বউদি বললেন, 'না ভাই, আমার অত বুদ্ধির পাটা নেই। কতারা কেউ বলেন না। আর ওকে আমরা খাইয়ে দাইয়ে ঋণ্ডিকি দোর দিয়ে পার করে দেব অত বড় দুঃসাহস—'

অর্চনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী যে বাজে বকছ সেই থেকে। তোমাব ওই এক ধরনের রসিকতা ভালো লাগে না সব সময়।'

কথায় কথায় আমরা তিনজায় উঠে ভারতী বউদির ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

ভারতী বউদি বললেন, 'এসো ঘরে এসো। গরীবের কুটিরে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাও।'

অর্চনা বলল, 'তোমরা তাহলে বসে বসে গল্প কর। আমি যাই।'

ভারতী বউদি বললেন, 'ওরে হিংসুটি। তুই এক ঘণ্টা ওকে নিজের ঘরে বন্দী কবে রেখে মুখোমুখি বসে গল্প করেছিস। আর আমি পাঁচ মিনিটের জন্যে ওকে ডাকছি, তাই তোর সহ্য হচ্ছে না।'

অর্চনা এবার হেসে ফেলল। হাসলে ওর একটি গালে টোপ পড়ে। দাঁতের গড়ন ভারি সুন্দর। ওর হাসির মধ্যে ভারতী বউদির মত লাস্য নেই সব মিলিয়ে ফাঁসের যেন একটু স্নিগ্ধ মধুর লাগণ্য আছে।

অর্চনা হেসে বলল, 'মেজদি, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এবার ভাই সত্যি সত্যি হার মানছি।'

ভারতী বউদি বললেন, 'হার মানছি তো ? সঞ্জীব সাক্ষী। এরপর ফের যদি সমানে সমানে বুদ্ধিতে আসিস রক্ষে রাখব না। কিন্তু সন্ধিপরে স্বাক্ষর করার আগে তোকে এক কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ ?'

বউদির ঘরে ফোন আছে। সেখান থেকে সঞ্জীবদের বাড়িতে একটা ফোন করে দিয়ে আল আজ রাতে ওর বাড়ি ফেরা হবে না। আজ ও আমাদের এখানেই থাকবে।'

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, 'না না না, সে কি।'

অর্চনা একটু দাঁড়াল। মৃদু হেসে বলল, 'মেজদি, যদি থাকতে না চায় জোর জবরদস্তি করে লাভ কি।'

ভারতী বউদি বললেন, 'তুই কিছু জানিস নে। মাঝে মাঝে জবরদস্তি চালাতে হয়। নইলে লোকসানের অশুক বাড়ি।'

ওর পিছনে পিছনে আমি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। পরিপাটি করে সাজানো ভারতী বউদির ঘর। অর্চনার চেয়েও এ ঘরের আসবাবপত্র দামি। খাট আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, বকশেষ জিনিসগুলি অবশ্য সেই একই। কিন্তু যেভাবে রাখা হয়েছে তাতে রুচি আর কলা নৈপুণ্যের ছাপ আছে। রং ভালোবাসেন ভারতী বউদি। জানালা দরজার পর্দায় বিছানার চাদরে কুশন ঢাকনিতে সেই বর্ণচাঁচা। হলুদ আর সবুজ রংই বোধহয় ভারতী বউদির প্রিয় রং। দেয়ালে ওর আর শ্যামলবার যুগল ফটো। ইদানীংকালের ফটো নয়। বিয়ের কিছুদিন পরেই বোধহয় এই ফটো তোলা হয়েছিল। নামকরা স্টুডিওর কুশলী ফটোগ্রাফার এই ফটো তুলে দিয়েছেন। শ্যামলদা সুন্দর নন। অন্য ভাইদের তুলনায় ওর চেহারাটা একটু যেন চোয়াড়ে চোয়াড়ে। রংও ময়লা। কিন্তু চোখ দুটি ভারি ভীষণ। চাপা ঠোঁটে যেন দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ আছে।

পশ্চিমবিকের দেয়ালে নীল ঢাকনিতে ঢাকা একটি গীটার আলোনো রয়েছে। এরা আগে এসে দু' একবার বাজাতে দেখেছি ভারতী বউদিকে।

বললাম, 'ভালোই হল বউদি। আজ আপনার বাজনা শুনব। বেশ সময় কাটবে।'

ভারতী বউদি চট করে কথাটা ধরে ফেললেন। 'ঈস, সময় কাটবার জন্যে বাজনা। আমার বাজনা কি এতই সস্তা।'

তাড়াতাড়ি শূন্যে নিয়ে বললাম, 'তুল হয়েছে বউদি। আমি বলতে চাই-ছিলাম চিন্তাবিনোদন ঠিক তাও নয় স্বর্গীয় আনন্দ লাভ।'

'বটে। চাটুকার চণ্ডামণি আমাকে একেবারে স্বর্গে তুলে দিলে।'

বললাম, 'সত্যি বলছি বউদি, একটু বাজান না। আমার যাওয়াটা যখন এমন করে বন্ধই করে দিলেন তখন কিছু গান-বাজনা শুনছি।'

আমরা দু'জনে দাঁড়া-নিচু চোয়ালে বসে কথা বলছিলাম। ট্রেসিং টেবিলের আয়নার আমাদের ছায়া পড়েছিল। বউদি মাঝে মাঝে সোদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন।

একবার বললাম, 'অত কি দেখছেন।'

ভারতী বউদি হেসে বললেন, 'দেখছিলাম আমাদের মানিয়েছে কিনা। আমি প্রথমে একটু লজ্জিত ছিলাম। তারপর সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম, 'কী দেখলেন। মানিয়েছে নিশ্চয়ই।'

ভারতী বউদি বললেন, 'ঈস দেমাক দেখ। যা দাঁড়াকের মত চেহারা একখানা। ময়রপুচ্ছেও যদি ঢাকা পড়ত।'

আমি সুন্দর নই, তবে দাঁড়-কাকও নই তা আমি জানি। তাহলে ভারতী বউদির মত অমন রূপবতী রসময়ী মহিলা আমাকে এতখানি আদর যত্ন করতেন না। আমাকে চটবার জন্যেই যে উনি এমন খোঁটা দিচ্ছেন তা আমার বুদ্ধিতে বাকি রইল না।

ভারতী বউদি কাটা ঘরে নুনের ছিটা দিলেন না। শীতল মলম লাগা-লেন। হেসে বললেন, 'অমনি মুখখানা কালো হয়ে গেল তো ? তবে শোন। শূন্য তুমি কেন ভাই, কাউকেই মানায় না। তোমার ওই চোয়ালে বসে কতজনই তো এসে গল্প করে গেল। কত মধুর সম্পর্কের দেওর, কত বন্ধু, কত নন্দাই। এই রক্ষণশীল বন্ধুদ্রুতও আমি তাদের গেটপাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তবু ভরিল না চিন্ত।'

এ প্রসঙ্গ চলতে দেওয়া বিবেচনা সঙ্গত নয়। আমি তাই আগের সূত্র ধরে বললাম, 'বউদি, আপনার বাজনার কথা হচ্ছিল। শোনান না একটু।'

ভারতী বউদি হাসলেন, 'গীটারের কথা বলছ ? ওটা একটা ফানিচার হিসাবে ঘরে রয়েছে। অনেকদিন বাজাইনে। বাজানো প্রায় ছেড়েই দিয়েছি।'

'মন বসে না। তোমাদের মত যদি মন লাগিয়ে কাজ করতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই একদিকের না এক-দিকের দিকপাল হতামই। কিন্তু আমি ধরি আর ছাড়ি, ধরি আর ছাড়ি। কোন কিছুকেই শক্ত মৃতিতে ধরে রাখতে পারিনে। ধরে রাখতে চাইনে। সোনা মৃতি বলে যা ধরি মৃতি খুলে দেখি কোন এক ম্যাজিকে তা ছাই মৃতি হয়ে গেছে। এখন আমার কিসে মন লেগেছে জানো ?'

'কিসে ?'

ভারতী বউদি হেসে বললেন,

‘আমি একথানা বই লিখছি। সে এক মহাগ্রন্থ হবে।’

বললাম, ‘বলেন কি আপনার ও বিদ্যাও জানা আছে নাকি?’

‘কোন বিদ্যা জানা নেই তাই বল? অল্পবয়স থেকে চৌবাটি কলার মধ্যে অস্তত চারটি বড় বড় কলার আমি হাত মকস করেছিলাম। লেখা, ছবি আঁকা, গান আব বাজনা। রাধা আর চুল বাঁধার মত মাইনর আর্টসগুলির কথা ছেড়েই দিলাম।’

হেসে বললাম, ‘আমি পেটুক নই বউদি। তবু রম্মনবিদ্যাকে আমি মোটেই গোঁপ শিচপ বলে মনে করিনে।’

ভারতী বউদি বললেন, ‘তাই নাকি আচ্ছা নাকি? আচ্ছা তোমাকে আমি একটি রেখে থাওয়াব।’

বললাম, ‘আপনার লেখার কথা হাঁচ্ছি। কী লিখছেন বউদি? ডায়েরি?’

‘দেব? ডায়েরি লিখব কোন দৃষ্টে? ডায়েরিতে সব কথা লিখে রাখব আর তোমার দাদা লুকিয়ে লুকিয়ে সব পড়বে আমাকে কি অতই বোকা ভেবেছে?’

হেসে বললাম, ‘স্বামীর সম্বন্ধে আপনার ধারণা তো খুব চমৎকার। পড়তে না দিলে শ্যামলদা আপনার ডায়েরি কেন পড়তে যাবেন?’

‘নিজে ডায়েরি লেখার চেয়ে পরের ডায়েরি লুকিয়ে পড়ায় আরো মজা। তোমার শ্যামলদাও তো ভরে ডায়েরি রাখেন না। পাছে আমি পড়ে ফেলি। নইলে তোমার শ্যামলদারও গোপন কথা কিছু নেই নাকি?’

হেসে বললাম, ‘ওঁর সিক্রেস তো সব পলিটিক্যাল সিক্রেস। তা যদি আপনি জেনেও ফেলেন নিশ্চয়ই সমস্ত আয়বণ সেফে রেখে দেবেন।’

ভারতী বউদি বললেন। ‘দায় পড়েছে। ওঁর রাজনীতি সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই, এত চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই আমার কোন আকর্ষণই জাগল না।’ তোমার দাদার রাগ তো সেই জন্যেই। তিনি চান আমি তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী হই। তাঁর মতই বাইরে বাইরে কাজ করি। পার্টি অফিসে যাই, বক্তৃতা দিই, প্যাম্পলেট লিখি। ইলেকসনের সময় নিজেদের দলের ক্যান্ডিডেটের পক্ষে ‘দিন-রাত খাটি।’ কিন্তু আমি তা পারিনি।’

বললাম, ‘আপনি চাইলেও পারতেন না। মেসোমশাই বাধা দিতেন।’

‘তাঁর বাধায় কিছু এসে যেতো না। তোমার দাদা আমাকে নিয়ে আলাদা শাসা করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু আমিই যেতে বাজী হইনি। ওঁর সঙ্গে গিয়ে আলাদা বাড়িতে বাস করাও যা,

পার্টি অফিসে দিনরাত কাটানোও তাই। আমি তা পারব না। তার চেয়ে বেশ আছি।’

বেশ থাকবার নমুনা তো দেখলাম। প্রসঙ্গটা আর বাড়তে না দিয়ে আমি বললাম, ‘বউদি আপনি ডায়েরি লেখেন না বললেন, তা হলে কী লেখেন আত্মজীবনী?’

ভারতী বউদি বললেন, ‘আচ্ছা পশ্চিডত। ওই একই তো কথা হলো রোজ একটু একটু করে নিজের জীবনের কথা না লিখে পুরো জীবনটাকে অগা-গোড়া লিখে যাওয়া। তাছাড়া আত্ম-জীবনী লেখে লোকে শেষ বয়সে। আমার কি শেষের দিন এসে হজির হয়েছে? আত্মজীবনী লিখব কোন দৃষ্টে?’

হেসে বললাম, ‘আত্মজীবনী লেখায় শৃঙ্খল দৃষ্টেই আছে সৃষ্টি নেই? আমি যদি লিখতে পারতাম আর সেই লেখা বিক্রি করার কোন প্রশ্নই না থাকত তাহলে নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা লিখতাম না।’

বউদি বললেন, ‘বোকাচণ্ডী তুমি যা লিখবে তাই তো তোমার নিজের কথা। পরের জীবনীই লেখ আর নিজের জীবনীই লেখ।’

‘তাহলে আপনি কী লিখছেন।’

‘উপন্যাস। লিখলামই যদি তাহলে গলি-ঘড়িতে হাটাইটি করে কী হবে। একেবারে রয়াল রোড ধরে চলি।’ ভালো। উপন্যাস শেষ হলে দেব তোমার হাতে। ছাপাবে তোমাদের পাবলিশিং ফার্ম থেকে?’

কবি যশপ্রাণী দ্বি-একজন মহিলার কথা আমার মনে পড়ল আমি তাই সতর্ক হয়ে বললাম, ‘বউদি ছাপবার কর্তা তো আমি নই। আমার ওপর আরো দু-তিনজন মনিব আছেন। আপনি লেখা শেষ করুন তারপর ব্যবস্থা করা যাবে।’

ভারতী বউদি বললেন, ‘এই শেষ করাটাই সমস্যা Well begun is half done, কিন্তু এই অর্ধেক পর্যন্তই হয়। সব ভালো যার শেষ ভালো।’

‘মেজ বউদি।’

বাইবে পর্দার আড়ালে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হল মঞ্জুলায় গলা।

ভারতী বউদি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। বসে বসেই বললেন, ‘আয় ভিতরে অয়। দোর তো বন্ধ নেই মঞ্জু, খোলাই আছে। পর্দা সরিয়ে সোজা ঢকে পড়। সঞ্জীব তো আর তার বাম্ববীর ঘরে নেই। বউদির সঙ্গে বসে কথা বলছে। তোর অত গলা খাঁকারি দেওয়ার কী হয়েছে।’

তাঁর গলায় আবার সেই চন্দ্রশু ফুটে উঠল।

মঞ্জুলা ঘবে ঢুকে বলল, ‘বাঃ যে, আমি গলা খাঁকারি দিলাম কোথায়, বউদি বলে ডেকেছি তাতেই দোষ। এ যে ঠাকুরঘরে কে? আমি কল্যা খাইনে অনেকটা সেইরকমের ব্যাপার। তাই না সঞ্জীবদা?’

জবাব না দিয়ে আমি মৃদু হাসলাম।

মঞ্জুলা বলল, ‘আমাকে বড় বউদি পাঠিয়ে দিলেন। বাবা একসঙ্গে যাবেন বলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অথচ দাদারা তো এখনও কেউ ফেবিন। মার নাড়ে নটা এত সকালে কেউ ওবা ফেরে না। অত বড় বড় ছেলে। এখনো কি স্কুলের ছাত্রের মত ওদের তাড়না করা যায়? বাবা সে কথা বদতে চান না। তুমি এখন খাবে নাকি সঞ্জীবদা?’

আমি একটু ইতস্তত কবলাম। মেসোমশাইকে আমি যথেষ্ট প্রাণ্য করি। কোন কোন ব্যাপারে মতের বৈষম্য থাকলেও ঠিক আমি ভালোবাসি। কিন্তু তাই বলে ওঁর সঙ্গে একা একা খেতে আমার যেন মন সরল না।

আমি ভারতী বউদির দিকে তাকালাম, ‘আপনারা খাবেন নাকি এখন?’

ভারতী বউদি বললেন, ‘ওরে বাবা। পতির আগে সতীদের খাওয়া নিষেধ। তুমি শৃঙ্খল মঞ্জুলাকে সঙ্গে পেতে পার। আশা করা যায় ময়ূরভদ্রে বলে ময়ূর ভাঙ্গা দিয়ে ওব স্বামী এতদূরে রাতের খাওয়া সেরে নিষেছে।’

আমি বললাম, ‘তাহলে থাক। দাদারা ফিরে আসুন এক সাথেই খাব। মেসোমশাই আবার কিছু ভাববেনো নাতো?’

মঞ্জুলা বলল, ‘তা নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। আমবা গ্যানেজ করে নেব।’

একটু বাদে মঞ্জুলা ফিরে এসে বলল ‘বাবা বেশি কিছু খেলেন না। ফল আর মিষ্টি খেয়ে শুয়ে পড়লেন।’

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম, ‘এই বে উনি রাগ করলেন না তো?’

মঞ্জুলা বলল, ‘না না, রাগ করবেন কেন? আসলে বেশিরভাগ দিনই বাবা রাগে খান না। খেলে হজম হয় না। উনি খেতে চাইলেও মা খেতে দেন না। মা বলেন, ও তোমার দৃষ্টে ফিড়ে! বাবা মার কাছে যত জন্দ তত আর কারো কাছে নয়।’

আমি হেসে বললাম, ‘এ বাড়িও বউরাও কি এ ব্যাপারে শাস্ত্রভীর কাছে শিক্ষা নিচ্ছে?’

‘মঞ্জুলা বলল, ‘সে কথা বউদের জিজ্ঞাসা কর সঙ্গীবদ।’ আমি কী করে বলব?’

ভারতী বউদি কৃষ্ণিম স্কোভের ভাণ্ড করে বলল, ‘সেই শিক্ষাই যদি নিতে পারতাম তাহলে আর কথা ছিল কী।’

খাওয়াটা তো এড়ানো গেল। এখন কী করা যায়। এবার সত্যিই আমি একটু বোরড ফীল করতে শুরু করছি। মেয়েদের সান্নিধ্য আমার ভালোই লাগে। তবু তারও একটা সীমা আছে। অর্চনারই বা কী আক্কেল। মেজ বউদির সঙ্গে আমাকে ভিড়িয়ে দিচ্ছে নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছে। নাকি শুয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে কে জানে অথচ আমি তো ওর নিমন্ত্রণেই আসলাম এখানে এ আমি।

আমি এক সময় বললাম ‘ওরা সব কোথায় মেজ বউদি?’

ভারতী বউদি বললেন, ‘কারা? অর্চনারা? তোমার বুদ্ধি একজনকে নিয়ে মন উঠছে না? সবাইকে চাই। কী করবে সবাইকে নিয়ে?’

‘কী আর করব? দাদাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে আপনাদের সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যেত। দোষ দিয়ে দিতাম আমরাও নিশাচর হতে পারি।’

‘ওরে বাবা তোমার সাহস তো কম নয়।’

বললাম, ‘নাইট শোয়ে একটা সিনেমা-টিনেমা দেখে আসা যেত। কিন্তু তারও তো সময় চলে গেছে।’

ভারতী বউদি আবার বললেন, ‘তোমার সাহস তো কম নয়। আজকাল শহরের যে অবস্থা তাতে কি আর মেয়েরা নাইট শো দেখে? তা ছাড়া তুমি যা বীর! তোমার সঙ্গে বেরোব কোন ভরসায়?’

বললাম ‘আপনারা নিজেরা তো বীরগণনা আছেন। তাই তো যথেষ্ট। কাপড়দুই হই আর বীরপদুই হই সিনেমার সমস্ত যখন নেই তখন আর তর্ক করে লাভ কি। তার চেয়ে আসুন এক হাত তাস খেলি। তাস আছে?’

ভারতী বউদি খুশি হয়ে বললেন, ‘নিশ্চয়ই, কী নেই তাই বল। আমার ঘরে সব পাবে। এ হল সব পেরাছির ঘর।’

ড্রেসিং র্টেবলের ড্রয়ার থেকে ভারতী বউদি এক জোড়া তাস বের করলেন। দামি তাস। বেশি পুরোন হয় নি।

তিনিই তোড়জোড় করে খেলার সঙ্গীদের ডেকে আনলেন। তাঁর টানা-টানি চোটে অর্চনা এল, মঞ্জুলা এল, জড় বউদিও এসে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন, ‘সঙ্গীব কিছু মনে

কোরো না। আমি তাদের কোন খেলাই জানিনে। ভারতী আমাকে অনেকবার শেখাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে নি। আমি বরং আমার ঘর ছেড়ে দিতে রাজি আছি।’

ভারতী বউদি বললেন, ‘আহা ঘর দিলে কী হবে। যেখানে আছি এও তো ঘরই। মাঠও নয়, গাছভাঙাও নয়। তুমি তা হলে খেলা দেখবে আর খেলোড়ের পান-দোস্তা জোগাবে দিদি।’

ভারতী বউদির খাটের ওপরই খেলার আসর বসল। প্রথমে কে কার পার্টনার হবে তাই নিয়ে খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটি বলব না, কথা চালাচালি হল।

ভারতী বউদি বললেন, ‘তোমার পার্টনার হয়ে লাভ নেই। বরং তোমার সঙ্গে রাইভলারির জন্যে আমার হাত নিসপিস করছে। তুমি আসল যুদ্ধে কতটা বীর তাসের বুদ্ধিই তার নমুনা বোকা যাবে।’

মঞ্জুলা আর ভারতী বউদি একদিকে গেল। আমি আর অর্চনা আর একদিকে। অকসন ব্রীজের খেলা। খেলা ওরা মোটা-মুটি সবাই জানে। কিন্তু খেলতে গিয়ে দেখলাম অর্চনার খেলায় মন নেই। কল দিতে ভুল করে, লীড দিতে ভুল করে। ভারতী বউদি একাই বাজি মাত করলেন। তিনি রাবার করলেন আর আমরা এক-বার খেলা নিয়েও ডাউন দিলাম।

আমি ভারতী বউদির দিকে চেয়ে বললাম, ‘অনিচ্ছুক আর অমনোযোগী পার্টনার নিয়ে খেলতে গেলে সে খেলায় কি জেতা যায় বউদি?’

তিনি বললেন, ‘নিজের খেলতে জানো না। এখন পার্টনারের নামে দোষ। আমার জাকে যা তা’ বলা হচ্ছে।’

অর্চনা লক্ষিত হয়ে একটু হেসে বলল, ‘আমি তো তোমাদের আগেই বলেছিলাম আমি খেলতে জানিনে।’

ওর সেই লক্ষিত হাসি আর ভাণ্ড-টুকু সমস্ত অক্ষমতা আর অমনো-যোগিতাকে যেন মাথুর্ষে মূড়ে দিল।

ভারতী বউদি বললেন, ‘জানা না জানার প্রশ্ন নয়। তোর মন কোথায় পড়ে আছে সে আমি জানি।’

আমি বললাম, ‘কোথায়?’

‘কোথায় আবার? নিমল ঠাকুরপোর ক্লাবে। আরে আমাদের স্বামীও তো এখন পর্যন্ত কেউ বাড়ি ফেরে নি। তাই নিয়ে কি আমরা আনন্দ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে বসে আছি?’

অর্চনা মৃদুস্বরে বলল, ‘দিদি, তোমাদের কথা আলাদা।’

ভারতী বউদি বললেন, ‘কিন্তু ফল তো একই।’

অর্চনা কোন জবাব দিল না। ওর আনত মূর্ধে দীর্ঘ অবনত দেহাবয়বে আমি

একটি করুণ বিজ্ঞতার মূর্তিকে ফুটে উঠতে দেখলাম।

একটুবারে অর্চনা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল, ‘তোমরা বোসো। গল্প কর। আমি যাই।’

ভারতী বউদি বললেন, ‘ঘরে গিয়ে একা একা কী করবি?’

‘কী আর করব?’

অর্চনা উঠে চলে গেল।

কেউ তাকে বাধা দিল না।

বড় বউদি আর মঞ্জুলাও বিদায় নিল। ভারতী বউদি বললেন, ‘সে বার ঘরে গিয়ে তো খিল দিল, আমিও যদি ওই পথ নিয়ে তোমাকে ঘর থেকে বের করে দিই তুমি যাবে কোথায়?’

হেসে বললাম, ‘কোথায় আর যাব? পথে দাঁড়াতে হবে।’

‘তার চেয়ে চল ছাতে গিয়ে একটু দাঁড়াই। ঘরের মধ্যে কেমন একটা গমট ভাব। বাইরে হাওয়া আছে, চাঁদের আলো আছে। যাবে?’

বললাম, ‘যেতে আপত্তি কি। কিন্তু কেউ কিছু বলবে না তো? আপনাদের যা একখানা বাড়ি।’

ভারতী বউদি হাসলেন, বললেন, ‘বলবে। এই বুদ্ধি তোমার পৌরুষ? এই সাহসে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে? আর একটু ছাদে বেড়াতে তাতে এত কাতর?’

ছাদে ওঠার পর অবশ্য ভালেই লাগল। বিরাট ছাদ। এক কোণে মেসো-মশাইর রাধাগোবিন্দের ঘর। সে ঘর এখন তালো বন্ধ। বাকি ছাদটা খোলা। আলসের ওপর ফুলের টবগলি পাশা-পাশি সাজানো। হাওয়ায় বেল ফুলেব গন্ধ। পূর্ণিমার তিথি হলেও আকাশের চাঁদ অব্যাহত নহ। বার বার মেঘ এসে তাকে ঢেকে দিচ্ছিল।

এরই মধ্যে পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। পাশের বড় রাস্তায় বাস চলাচলের শব্দ বিরল হয়ে এসেছে।

নিচে মেসোমশাইর কারখানার হিন্দু-স্থানী দারোয়ানরা ঢোল বাজিয়ে কী যে গান গাইছে আমি তার কোন অর্থ বোধ করতে পারলাম না।

ভারতী বউদি পূর্ব কিনারে সরে এলেন। আমাকে বললেন, ‘এদিকে এসো।’

আমি এগিয়ে এসে ঠুব পাশে দাঁড়িলাম।

তিনি বললেন, ‘কেমন লাগছে?’

বললাম, ‘খুব সুন্দর। ছাদ আমার খুব ভালো লাগে। আমরা যে ভাড়াটে বাড়িটায় থাকি সেখানে ছাদে ওঠার জো নেই। ছাদটা মেয়েদের এলাকা। তারাই কাপড়-চোপড় শুকোতে দেয়।’

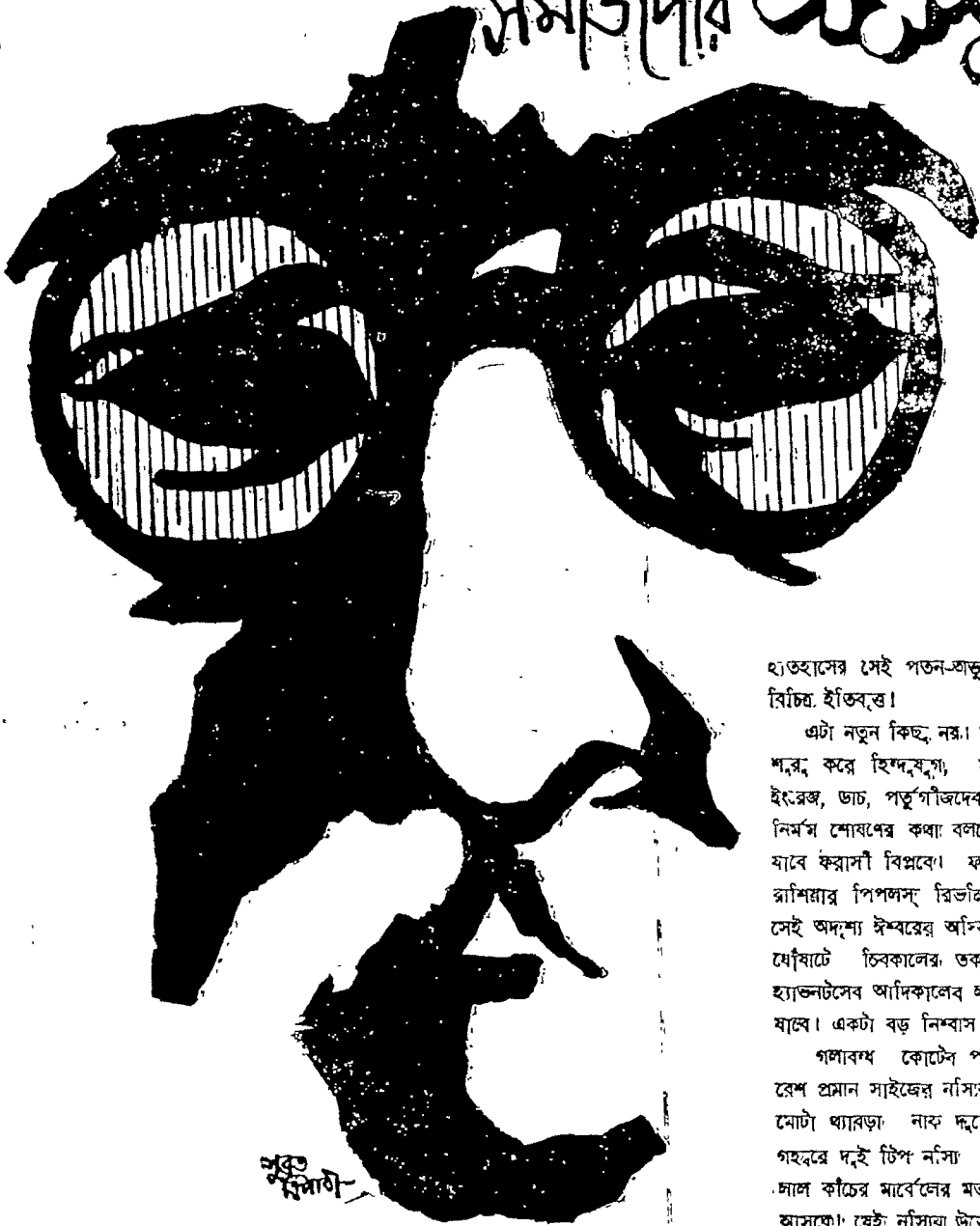
[শেষংশ ৯২ পৃষ্ঠায়]

এ. এ. প্রকাশনী, ১০০ নং ব্রহ্মচর্য রোড, কলিকতা-১০।
 প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৬ খ্রি: ১০০ নং ব্রহ্মচর্য রোড, কলিকতা-১০।
 প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৬ খ্রি: ১০০ নং ব্রহ্মচর্য রোড, কলিকতা-১০।

শব্দনু বিন্যাসবাহু, পৃথিবীর ইতিহাসের
 একেবারে গোড়ার কথা। কি? জেনেন একপ্রশ্ন-
 চেননা। উকিল চিন্তাহরণ চক্রবর্তী উত্তেজিত
 হয়ে বলতে, শুরুর করল, আর 'রা' অনাব'দের
 শেষণ করেছে অত্যাচারে জজরিত করেছে,
 মহেজোদারো 'হরাপার' ধ্বংসকর্ষণ আজও তার
 সাক্ষী দিচ্ছে। তারপরে 'চলে' আসুন হিন্দু
 পিরিয়ডে ধর্মপাল, সেবপাল, মহাপাল আর
 পলাপ্রতিনিধি 'কৈবর্ত' যুবক সেই দিব্যোকের
 সঙ্গে সংঘর্ষ.....

আমি বাধা দিলাম না। লাভ নেই।
 বন্যার জলের তোড় কখনো আটকানো যায়
 না। এই বৃষ্ণ আইনজীবীর চেতনার ভেতরে
 মক্ষের মতা জ্বলজ্বল করছে, পৃথিবীর

চিন্তাধর্মের আজ মুখ্য কাল সমাজদার প্রবন্ধ



ব্যতহাসের সেই পতন-আত্মদলের ঢিটা ও
 বিচি। ইতিবৃত্ত।

এটা নতুন কিছু নয়। মহেজোদারো থেকে
 শব্দ করে হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম ছাড়া
 ইংরেজ, ডাচ, পর্তুগীজদের নিরবস্থি আর
 নির্মম শোষণের কথা বলতে বলতে সে চল
 যাবে ফরাসী বিপ্লবে। ফরাসী বিশ্বব বোম্বে
 রাশিয়ার পিপলস্ রিভলিউশনে। তারপরই
 সেই অদৃশ্য ইশ্বরের অন্তিমের মত জটিল ও
 ঘোঁষাটে চিবকালের শুরু—হাতস ভাসস
 হ্যান্ডটসেব আদিকালের লড়াইতে গিয়ে থেমে
 যাবে। একটা বড় নিশ্বাস ফেলবে। তারপর—
 গলাবধ কোটের পকেট থেকে একটা
 বেশ প্রমান সাইজের নাসির ডিবে বের করবে।
 মোটা থ্যারডা নাক দুটোব কালো বালো
 গহবরে দুই টিপ নীচা গুঁজে দেবে। লাল
 লাল কাঁচের মাঝেবের মত দুটোবে জল ভরে
 আসফো! সেই নাসিরা উত্তেজক আমেজ শেষ

কড়াই করা হচ্চে বলে মন খারাপ হয়েছে। কিন্তু এসব কিছুই বললাম না।

উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাহরণ যেন বহু—বহু দূর থেকে বলল, সে কী সাবরোজিন্টারবাবু—চলে যাচ্ছেন যে! তার গলার স্বরটা আত্মাদের মত শোনালো। দূরে জানালার বাইরে ঘন ধকধকে অন্ধকারের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে অক্ষুট স্বরে বলল, ইংরেজী প্রবাদটা যেন কি—
টুথ মাস্ট বি—

রাভড্—

ভুল—একবারে ভুল সাবরোজিন্টারবাবু, সকালে এমন অনেক সত্য আছে যা কখনো দিনের আলোয় আসে না, কাকপক্ষী জানতে পাবে না—তীর স্কোডে, উত্তেজনায় পোড়া পোড়া তামাতে মুখখানা কেমন অমানবিক হয়ে উঠছে। কে জানে—বকের ভেতর কিসেব আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে।

সেই অস্বস্তিকর নিশ্চিন্ততার ভেতরে চুপ করে বসে থাকতে খুব খারাপ লাগছিল। নিজেকে বেমানান মনে হচ্ছিল। আমার সামনে টেবিলে ঘড়ির ফসফরাসে মাথা নীচু হাটাধট্টো নির্বিকারভাবে সময় বদলে চলেছে। গীটে মেরেতে ইকনমিক টাইমস, ইন্টার-অ্যাক্সেস আরও নানাবকমের বিদেশী পত্রপত্রিকার ছড়াছড়ি। সেলফে, স্টাবিলে, বিজ্ঞানায় ইতস্তত বিকল্প হলে পড়ে রয়েছে পলিটিক্সের মোটা মোটা বই—ট্রেমনারহায়ারের লেখা দি পলিটিক্যাল এক্সপারিয়েন্স অফ দি এনসেল্টস ইন ইটস বিয়ারিং আপন মর্ডান টাইমস; মিলেব লিবার্শী, ডানিং-এর পলিটিক্যাল থিয়োরীস আরও বহু বই।

হ্যাঁ কি লিখছিলাম, জিজ্ঞাসা করছিলেন মা? বেনন অনমনস্ক হয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল চিন্তাহরণ, একটা ড্রাফট তৈরী করছিলাম—

ড্রাফট!—কিসের?

কোন কথা বলল না। হাসল। শান। শীর্ণ হাসি। সেই পলিটিক্সের কথাই উঠে যাচ্ছে সাবরোজিন্টারবাবু, লাওসের জারস অঞ্চল উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনীরা দখল করেছে—গোলমালের গম্বু পেয়ে অর্মান মার্কিনরা সেখানে হাজির হয়েছে, ধবধবে মেঝেয় ছড়ানো বইগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, আরব-ইসরাইল কণ্ঠা বেধেছে। মিউ-মার্ট করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে নিরুন্ন কোসিগিন, বলতে বলতে তীর ঘুঘাঘ সেই মোটা নাকটা দাঁড়র মত পাক দিয়ে উঠল। চিবিখে চিবিখে বলল, খাড পাটির ইন্টার-ফিয়ারেন্সের মত অভিশাপ বৃষ্টি আর নেই।

আমি বন্ধুতে পারলাম না।

বন্ধুতে পারলাম না, এই সম্ভাষ ঘরের কোণে বসে বসে তার ড্রাফটের সঙ্গে এসব পলিটিক্সের যোগাযোগ কোথায়?

শুনুন, আপন তো হাকিম মানব। আপনিই বলুন, যদি কোন স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীর আগ্রহ ছেড়ে অন্য কোথাও বাস করে তাহলে তাকে ধরপোষ দিতে বাধ্য থাকবে কেন হাসব্যান্ড?

না। ধরপোষ পেতে পারে না—

কিন্তু খাড পাটী অর্থাৎ ভ্রমহিংসার ভাই বিরাদর আত্মীয়স্বজনদের ইনস্টিগেশনে তিনি দাবী করছেন ধরপোষ—স্ট্রেঞ্জ! হো-হো করে হাসল। হাসির দমক কমলে বলল, পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ডট আর পূর্ব জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী উইলি স্ট্রোফের বিবোধ মেটাতে এগিয়ে আছে সোভিয়েট ইউনিয়ন—

কার কথা বলছেন।

কার আবার? ধরুন, রাম, শ্যাম, যদু মধু, হরির—প্রত্যেকের। আমরা বারা লেক, সিকিউরিটি, সাকসেস নিয়ে আজীবন মাথা ফাটাইয়াটি কবি—

খট্—খট্—খট্ খুব দ্রুত নালতোলা জুতোর শব্দ হলো।

দীপঙ্কব এল।

কি রে খোকা রাত করলি কেন? গভীর স্নেহে ভিজে ভিজে কণ্ঠস্বরের ভেতরেও প্রজ্বল বিরক্তির আভাস ফটে উঠল।

খুব বিবস্ত হয়ে কি যেন বলতে হচ্ছিল। আমাকে দেখে সামলে নিবে বলল দীপঙ্কব, আজ একটু ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে-ছিলাম—

তাই নাকি! বাঃ বাঃ বেশ—বদলে সাবরোজিন্টারবাবু খোকার পড়াশুনার অসম্ভব মনযোগ—

এখনি উজ্জ্বলিত প্রশংসা তেড়ি উঠবে ভয়ে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে গেল দীপঙ্কব। চাপা গলার ফিসফিস করে চিন্তাহরণ বলল জানেন, গভীর রাত পর্যন্ত জেগে কি পড়ে—এই মোটা মোটা বই, ফরেন অর্থসের লেখা সব—

গভীর হয়ে রাত নেমেছে। মাথার ওপরে নতুন আলপিনের মত ঝকঝকে একরাশ তারা বিধে আছে কক্ষপঙ্কের আকাশে। অনেক—অনেক দূরে ঝট্টা পেপারে মোছা কালির দাগের মত ফিকে মনে হচ্ছে গগ্গাকে।

আমি অস্বস্তি পায়ে পরচারী করছি। কোন পাস্ট হিস্ট্রি? তাহলে—তাহলে হঠাৎ জ্যাগস্টেশনের মত সবুজ আলো দুলিয়ে প্রেম-বিবাহ-সংসারের যে জীবন বহু—বহু কাল আগামী অক্ষর করে চলে গিয়েছে, তিনি সেই সাবককালের স্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে আত্মজীবনী লিখছিলেন।

না। আত্মকাহিনী লিখলে তার মনে এত যন্ত্রণা—এই অল্প যন্ত্রণা থাকতো না। একমাত্র ছেলের ভবিষ্যৎ—আদর্শবাদী শিক্ষকের স্বপ্নের ছবি ছাড়া আর কোন কিছুইতেই তিনি

আনন্দ পান বলে মনে হয় না। হয়তো সেই আনন্দটুকু—ছেপেকে সেই আদর্শবাদী শিক্ষক করে গড়ে তোলার আত্মকর্তৃত্বের ভেতরে কোন রকমে বেঁচে আছেন। দেহমন তো কোন না কোন যন্ত্রণায় একেবারে কীকরা হয়ে গিয়েছে বন্ধুতেই পারা যাচ্ছে। অবশ্য—

অবশ্য আমরা সবাই কোন না কোন ভুতুড়ে যন্ত্রণায় ভুগছি।

যাহোক আমি মাঝে মাঝে কখনো সকালে কখনো সন্ধ্যায় তার সেই বই ছড়ানো, অগোছালে ঘরে যাই। বসি—

যশুনি মাই, দৈর্ঘ্য সেই ম্যারেজ এ্যান্ড ডাইভোর্সের ল বই দুখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি দেখছে।

আমি ঘরে পা দেওয়ামাত্র সম্প্রস্তু হয়ে ওঠে। দ্রুত বই বন্ধ করে ফেলে। কখনো ছেলের পড়াশুনা—ভবিষ্যৎ—কখনো ওয়ান্ট পলিটিক্স শুরু করে।

কিছুতেই মনের কাছাকাছি যেতে পারি না। বার বার তার দর্ভেদ্য বর্মে ঘা খেয়ে ফিরে আসি।

যত ব্যর্থ হই; তত কৌতুহল বাড়ি। একটা একটা করে দিন কেটে যায়। লক্ষ্য করছি, রাজনীতির কথা বড় একটা বলছেন না।

বিস্তৃত তার মানসিক যন্ত্রণাটা যেন আরও আরও বেড়েই চলেছে। বলে, খোকার সেটল কবিয়ে বৈদিকে দুচোখ যার চলে যাবো—সংসারের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার মানাই নিউ জেনারেশনের সঙ্গে ক্লাস—একবারে অনিবার্য। একটু থেমে আবার বলে ভাস্কর্য্যম তো চাই—তা না হলে নতুন এয়ার আসবে কি কবে?

আবার কোনদিন বলে, রোলার 'আই, উইল নট রেস্ট' পড়েছেন?

আমি মাথা কাঁকাই।

একটা ব্যস্তির বিবেক, একটা লোকের মনোবী পৃথিবীর চেহারার রূপান্তর আনতে পারে—এটা রোলার বলেছেন। আমিও তাই বিশ্বাস করতাম হাকিমবাবু—

এখন করি না—করতে পারছি না, ইন্ডি-ভিডুয়ালিটির কোন মূল্যই নেই, দেখতে দেখতে বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখখানা। বলল, কোন না কোন পলিটিক্যাল আইডিয়াস কি 'ইজম' বা ক্রীড়ের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড নয়, এমন একজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তার ওপরের কথাগুলোর তাৎপর্য সৈদিন ভাল বন্ধুতে পারি নি। পরে বন্ধুতে পারলাম একদিন।

বেশ রাত হয়েছিল সৈদিন। গত কয়েক দিন যাই নি চিন্তাহরণের কাছে। হঠাৎ তার ঘর থেকে একটা উত্তেজিত বচসার আওয়াজ পেলাম।

জেনারেলের প্রায় শতাব্দি, এত রাত কল্পনা করেছিলেন। এই সকলের ছেলেদের আরও বিবরণ নেই—কেন জানেন—কিন্তু জানি—মাথা নীচ করে আসতে আসতে হঠাৎ লোকটা আমার মনে হল, এই অস্থির, বিক্ষুব্ধ আর সংশয়ের মধ্যে সাবেককালের সত্য শিব-সুন্দর অগত থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে, লোকটা। তাই কোন কিছুই সঙ্গেই এ্যাডজাস্ট করতে পারছে না।

কিন্তু তোমার কাছে কারা সব আসে—চাপা গলায় কি ফিসফিস করে আলোচনা কর, একটু খেমে গজরাতে গজরাতে বলল, একজন জ্বালিয়েছে সারাজীবন—তুমিও জ্বালাবে—

তারপরেই ষট্ ষট্ করে ভারী জ্বরের শব্দ হলো। আর, দেখলাম, চিন্তাহরণবাবু ছিলে, বাইরে অপেক্ষমান একটা 'কারে' চড়ে ফলাফতার দিকে চলে গেল।

ভাবলাম, যাই একবার। কিন্তু মন টানল না। পিতাপুত্রের স্বাধীন। একান্তই ঘরোয়া ব্যাপার। আদর্শবাদীর শিক্ষকের স্বপ্নটা নিশ্চয়ই অপসরমান রেলগাড়ীর শব্দের মত দূর দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আমাকে যেতেও হল না। বলতেও হলো না। যেদিন ক্রেস্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে চার-চারটি অমূল্য প্রাণ ছাত্র গৃহিণীর জাতীর গর্ভসম্মানের গলীতে লাঠিরে পড়ল; সেইদিন খুব উত্তেজিত হয়ে চিন্তা-হরণ আমার কাছে এল।

হাকিমবাবু বলল, এই চন্দ্র দমননীতি আব শোষণ কতদিন চলবে? কন্সোভিয়ের মার্কিন ইন্টারফায়ারেন্সের প্রোটেক্ট করে কি এমন অন্যান্য করেছিল ওরা।

সেদিন মনের অবরুদ্ধ বেদনাব উজান ঠেলে খুব ক্লান্ত আর অবসন্ন গলায় বলেছিল, জানেন সার্বভৌমত্ববাদ শব্দ পৃথিবীর রাজনীতিতে নয়, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দেশে দেশে নয়, মানবের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেও শোষণ চলছে একটানা—

কি বকম?

আমার এই প্রশ্নের স্তম্ভ হয়ে গিয়েছিল হৃদয় মাইনজীবী। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলেছিল, আমাকেই দেখুন না, আমার এত দিনে মনোবৈজ্ঞানিক সাবজেক্ট হয়ে বিচার করা কথা। কিন্তু তা-হয় না। আমি আজ—দীপঙ্কর বাড়ীতে, আছে? বাড়ীতে না গেলে আমার বাড়ীতেই খোঁজ নিতে এসেছে একজন।

পরান দামী স্যুট। টেরিলিনের জামা। চোখে গগলস।

ফেন—কি দরকার তাকে? আমি তার বাবা—

যদি কোন—

আমার দীপঙ্করকেই দরকার। ধন্যবাদ—বিশেষ উদ্ভট ভঙ্গীতে বলে মোটরসাইকেল চালিয়ে ঝড়ের মত যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল লোকটা। যেন একটা উদ্দাম হত্যাস পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয়ে গেল।

পরিমলভের নত বাস করতে পারতো কি—হঠাৎ একটা বিপাক হঠাৎ হঠাৎ—

প্রায়ই সভ্যসময়ের কাছে আসতো লোকটার এক ব্যবসারী। বেশ গোপনীয় চেহারা। বেঁটেবাটো দেখতো। মুখখানায় ভীষণ চালাক চালাক ভাব। সংসারে কখনো সে কারো কাছে ঠকছে বলে মনে হয় না।

নাম: ধীরেশ লাইডারী। লোকটা গরু-হাড় চালান দেওয়ার ব্যবসা করতো। সেই উপলক্ষে ঘন ঘন কল-কাতাব আসতো। আর এলেই সভ্যসময়ের বাড়ীতে উঠতো। একদিন চিন্তাহরণ জানতে পারল, তার বিরুদ্ধে কোথায় বিয়ে, কবে বিয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে—রাম-রহিম কিছু বলল না। দিনরাত পড়াশুনায় ডুবে থাকে। শান্ত-প্রিয় মানুষ। সহজ কৃতিত্ব বিনিময়েও ঘাপের সশ্রম কথা কাটাকাটি করে নিজের মনের শান্তি ক্ষুদ্র করতে চায় না।

শোন খোকা, মেয়ে তুলে এনে বিয়ে দেবো—বরষাটাই দগল নিয়ে যেতে গুজর করচ। আব এ তো আমাদের নিজেদের ভেতরের ব্যাপার। ধীরেশের একমাত্র মেয়ে—ধীরেশ আমার ছোটবেলার বন্ধু—

চিন্তাহরণ যথারীতি চুপ করে থাকল। শব্দ মনে পড়ল কোন সুন্দর বাল্যকাল হারানো যোলা যোলা কাঁচের জ্বালানীর ওপরের খাদসা ছায়ামূর্তির অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া মার মুখখানা।

তিনি থাকলে হয়তো বলতেন, কেমন মেয়ে—কেমন বংশ—কেমন স্বভাব—তিনি তো সেই কবেই মায়ের কাটিয়ে চলে গেছেন। এখন তার বাবার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা।

হঠাৎ গেল বিয়ে—মেয়ে সুন্দরী। স্বাস্থ্য ভাল। একটু খুঁত আছে পারে। একটা পা ছোট। খুঁড়িয়ে চলে। তারপর—

তারপর আর কি? যা হয়। দেখতে দেখতে ভিজে কাঁথা দুপুররাত্তি ফিঁড়ি বটল, ঘরের কড়িকাঠে টাঙ্গানো দোলনা, শাড়ীর নোকা আর সিনেমার সেই চিত্রাচারিত কক্ষ পথ ধরে জীবন আবারিত হয়ে চলল।

কিন্তু—গাড়ি গাড়ি জীবনের সেই সৌভাগ্য তার জীবনে ছিল না। একদিন সে জানতে পারল, তার বাবা সভ্যসময় তাকে কামোড়িটি করে বেশ দুপয়সা কামিয়েছে।

শব্দ তাই নয়। অন্যতাদের সঙ্গে তাদের বিরোধে চলেতে পারে না। প্রাইভেটেড রিলেশনস। একজনের টাকার দুর্ভাগ্য শোভ আর একজনের ধোঁড়া মেয়ে এবং চিন্তাহরণের মত সযোগ্য ও শিক্ষিত ছেলে। অতএব—দুই বাণে হস্তি করে তার গলায় কড়িলের দিল।

আবার হয়তো খবর আসে, সরকারী কলেজের প্রফেসারীরা সভ্যসময় বাধা দেয়। বলে—খুব কি হবে মাষ্টারী করে, তার চেয়ে তুই বং পলিশ ইন্সপেক্টরের চাকরীটা নে—

বাবা মৃত্যুর দিকে তাকায় চিন্তাহরণ। জটপাকানো গলীসুতার মত বোখাটিল মুখখানা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন হিংস্র সরীসৃপের মৃত্যুর মত মনে হয়।

হয়তো তার পছন্দমত সে মনোবৈজ্ঞানিক প্রফেসারী নিত। আর আজ বুদ্ধিজীবীদের মত রেক্স হিমহাম সুব্রহ্মচন্দ্র ও সংস্কৃতির

পাল্পলীরও নদী ছিল না অতএব তারও কোন বাধা ছিল না।

সেই প্রথম ও শেষবারের মত সত্যশরণের মূখোন্মুখি দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে অনীতার হাত ধরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিল এই শহরে।

তখন বাচ্চার বয়স মাত্র তিন বছর।

শহরের লোকাল বারে প্রাকটিশ করতে শুরু করল চিন্তাহরণ। কোর্ট-কাছারী-মক্কেল নদী-পদ্ম নিয়ে বেশ ভরাট জমজমাট সংসার। দিন কাটে।

অনীতা কেনন শুনিয়ে যায়। তার তার হৃদয়। বেশী কথা বলে না। চিন্তাহরণ বেশ বোঝে ওর মনের আকাশে একটু একটু করে চিন্তার মেঘ জমেছে।

কি হয়েছে তোমার?

কিছু না তো—

এইরকম একটা নিরাকার অস্বস্তিকর পরিবেশ আরও তিন বছর তাদের জীবন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। কিন্তু ম্যামীরা লামা-ক্লান্ত নদীর মনের কোন আলোদা একটা জগত, আলোদা একটা সন্ধ্যা থাকতে পারে—সেটা স্বীকার করে না।

বলো তুমি একী করছো—এইভাবে বাঁচার কী অর্থ হয়?

আমার কেনন ভয় করে গো, চিন্তাহরণের হৃদয় মধু গুলল সে। কল্পায় ভিজে ভিজে অস্পষ্ট প্লায় বলল, আমি লক্ষ্মীপূজা করতে বসলেই মনে হয়—আমি অশুচি—আমার মনে পাপ—

অনীতা তুমি সত্যি—তোমাকে যে ভাল-মাসি সেটা সত্যি—মা হয়েছে তার জন্য তোমার তো দোষ নেই—

কিন্তু হিম্মুর মেয়ে।

সম্ভারের ডিপো।

মন থেকে সেই সম্ভারের অবসেসনটা কিছুতেই বেড়ে ফেলতে পারল না অনীতা।

একদিন ছেজেকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছিল চিন্তাহরণ। ফিরে এসে দেখল, অনীতা নেই। যথারীতি ছোট একটা চিরকুট-সন্ধ্যাতে বাবার কাছে চলেগায়। তার সঙ্গে একটা বোকাগড়া করবো—তেমনি ঘর করা সম্ভব নয়—প্রতি মূহুর্তে আমার মনে হয়, আমি যেন পাপের ভেতরে ডুবে আছি.....এসব আঠারো বছর আগেকার কথা।

ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে পাল্পলী মারা গেছে। ভাইদের সংসারে পরগাছার মত দাস করতে হচ্ছে অনীতাকে। তাদের প্রারোচনায় স্বরপোলের দাবী জানিয়ে আদালতে মামলা রুজু করে দিয়েছে—

এই পর্যন্ত বলে থেমেছিল চিন্তাহরণ। আমাব ঘরের ভাড়াবাড়ী ফটা ফটা মেঝের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল—যেন তার

অতীত জীবনের দুঃসহ দিনগুলোয় মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আমার মনের মেঝের অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে।

তার বিচার জীবনবৃত্তান্ত বলার পর আর আমার বাড়ীতে আসত না চিন্তাহরণ। পলিটিস্কের আলোচনাও করতো না। দূর থেকে দেখতাম, চারিদিকে বই, ম্যাগাজিন ছড়ানো সেই ঘরের টেবিলে পাথরে মূর্তির মত বসে আছে চিন্তাহরণ। লম্বা তামাটে সেই মুখপানায় তাঁর হস্তগার চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

কিসের হস্তগার। অনেকদিনের পুরানো অসুখের মত—ছেড়ে যাওয়া নদীর প্রতি ভাল-মাসি, না ঘৃণা-সন্দেহ-অবিশ্বাস, না—অবাধা ছেলের জন্য চাপা দুঃখ, তাকে আদর্শবানী শিক্ষক করে গড়ে তোলার সেই বিনষ্ট স্বপ্নই যেন অলক্ষ্য ব্যাকটেরিয়ার মত তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে—বাইরা করে দিয়ে—

চিন্তাহরণের এই আজ, কাল, পরশুর চিন্তাটা একটা দারুণ দুর্বোপে জ্বলন্ত হয়ে গেল সেদিন, যেদিন খুব জোরে তার বাড়ীর চারিদিকে দেখা গেল পলিশ। চিন্তাহরণবাবু

আছেন? পলিশ! অফিসার বলল, আপনাকে ছেলে দীপঙ্করকে আমরা এ্যারেস্ট করছি—

এ্যারেস্ট কেন?

পলিশ অফিসার গোষ্ঠারী পরোরানাটা এগিয়ে দিল তার কাছে। বলল, কলকাতার দুর্নীতনটে রিসেন্ট ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে আপনার ছেলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ—

ব্যাঙ্ক ডাকাতি!—না-না, দুহাতে বকে

মেপ ধরে আত্নানদ করে উঠল বন্ধ চিন্তাহরণ, আমার ছেলে—আমাব ছেলে ডাকাত—

কখন কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে নিরীহ ছেলের মত বেরিয়ে এসেছিল দীপঙ্কর, কখন পলিশভ্যানে উঠেছিল গুটি গুটি এসব কিছুই জানে না চিন্তাহরণ। তার শব্দ মনে হয়েছিল, পাবের তলায় মাটি নেই। একটু একটু করে অন্ধকাবের সমুদ্রে সে তলিয়ে যাচ্ছে আর দূরে বহুদূরে আদর্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ মানুষের মহত্ব, উদারতা এক এক টুকরো বস্তুদের মত ভেসে চলেছে। আব—

মনে হয়েছিল—শব্দ অনীতা নয় এই অস্থি, বিক্ষুব্ধ, উদ্বেগের শব্দ—নীতিজ্ঞান ধর্ম এবং বাবতীয় মানবিক গুণ ধূবে ঘুছে যাওয়া এই সর্বনাশা কালও তাব কাছে থেকে জোর করে খর্বপোষ আদায় করে নিয়ে চলে গেল।

এই বহুবিখ্যাত গ্রন্থের বহুকাল পরে বহু প্রত্যাশিত পুনর্মুদ্রণ

প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র নন্দীর

ওমর খৈয়াম

গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসাচার্য স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, “যাঁহারা ‘ওমর’ বলিতে শুধু বুলবুল ও গোলাপ, মরিচা ও সাকীর কথা ভাবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, লোকটা কবি ও ভোগী মাত্র ছিলেন না, কঠোর গণিতবিদ এবং গভীর দার্শনিকও। ওমরের প্রতিভার প্রতি ন্যায় বিচার করিবার জন্য আমরা লেখকের নিকট স্বাগত।”

“জগতের জন্য ইসলাম কি করিয়াছে, তাহা জানিতে হইলে আমীর আলীর গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদের উপর নির্ভর করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীর ‘ওমর খৈয়াম’ এই হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। ইহাতে ওমরবাব কাব্যের লালিত্য ও দর্শনের স্নিগ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আছে। কিন্তু এই গ্রন্থে আরব সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞানের বিভাগগুলি এবং প্রত্যেক বিভাগে পূর্বে-পারের কি সম্বন্ধ তাহার বর্ণনা ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং নবীনতম ও প্রামাণিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থগুলির তথ্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া লেখক বঙ্গ ভাষায় ইতিহাস-বিভাগের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। মধ্যযুগের পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার ইতিহাস হিসাবে এই বইখানি বঙ্গভাষায় নবীনতম, সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ।”

মূল্য পাড়ে তিন টাকা মাত্র।

বসুমতী প্রাঃ লিঃ

কলিকাতা—১২

চেনা স্বপ্ন



রেণু ভর্তনিত বড়ো আঙুল ঠেকিয়ে
যললে, আড়ি-আড়ি-আড়ি-জন্মের মতো
আড়ি!

পল্টু জুতোসুন্দরই পা-দুটো লম্বা করে
চৌকির বাইরে ঠেলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে
পড়ল।

—আমার অপরাধ?

—জানিনা যাও। কাল অত করে
বললাম সিনেমায় যাব, তা আসাই হল না।

পল্টু গম্ভীরভাবে বললে, বাস্তবের
শো-এ যেতে পারব না। ম্যাটিংয়ে যাবে
তো চলো।

বেণু অভিমানে মুখ ফিরিয়ে বললে,
হ্যাঁ, বাড়ি ফেলে এখন তোমার সংগে যাই।
তরুণ মা ঘিবে এসে মুখে ঝাটা মাঝুক।

পল্টুর কানে যেন সব কথা গেল না।

কেমন যেন অন্যমনস্ক। হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক
একটা কথা বলে বসল—আমার ব্যাগটা
কোথায় রাখলে?

—খালি ব্যাগ আর ব্যাগ। যখনই
আসবে ব্যাগটি আগলে রাখা চাই। কী
আছে এমন সাত রাজার ধন!

—না না, বলো না কোথায় রাখলে?
ওতে আপিসের অনেক দরকারি কাগজপত্র
আছে। একটা হারালেই—যাস! একেবারে
শ্রীঘর!

—তাতে আমার কী!

পল্টু এবার ঈষৎ হেসে কটাক্ষে তাকিয়ে
বললে, তাই নাকি? আমি জেলে গেলে
তোমার কিছ্‌ নয়? বিয়ে হবে কার সংগে?

রেণু ঠোঁটের একটা ভাঁজ করে বললে,

ইস। উনি ছাড়া যেন আর পাঠ নেই।
স্নেহ চেয়ে ভালো পাঠ আছে।

পল্টু গম্ভীর হবার ভান করে বললে,
তাই বৃদ্ধি? তাহলে আর কেন? ব্যাগটা
বের করে দাও। বিদায় হই।

বলে উঠতেই দু'খানি কোমল বাহু
তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল।

—পাললেই হল! যেতে দিচ্ছি কিনা।
জান আমি তোমার ব্যাগদস্তা? ঠাট্টা করেও
অমন কথা বলতে নেই।

—আমার বলতে নেই, আর যত বলতে
আছে তোমার, না?

—কম দূরশে বলি। বলতে বলতে
বেণুর দু'চোখ জলে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি
পল্টুর পিঠে মুখ লুকালো।

তাবপর ওর পিঠে মুখ ঘষতে ঘষতে

বললে, কবে থেকে তুমি মাকে কথা দিয়ে রেখেছ। মা সবাইকে বলেছে। তারা কেবলই জিজ্ঞেস করে—কবে বিয়ে হবে? তারা জানতে চায়—ছেলের কে কে আছে, কোথায় বাড়ি—কি চাকরি করে। মা তার একটারও উত্তর দিতে পারে না। শেষে যানিয়ে বানিয়ে উত্তর দেয়। আজ এককথা—কাল আবে—এককথা, মায়ের এরকম কথা—আমাব এরকম কথা। এমন মিথ্যেকথা বলে আর কতদিন চালাব বলতে পার? পল্টু ধীরে ধীরে উঠে বসল।

রেপু জিজ্ঞেস করলে, চুপ করে রইলে কেন? একটা কিছু বলো—অন্তত আমাকে বিশ্বাস করে বলো।

পল্টু গম্ভীরভাবে বললে, সময় হলে ঠিকই বলব। কই, আমার ব্যাগটা দাও।

বেণু এবার আর উত্তর-প্রত্যুত্তর করল না। আলমারির মাথা থেকে ছোট্ট একটা ব্যাগ বের করে পল্টুর হাতে দিল।

—চলে যাচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—আজ রাত্তিরে একবার এসো না। মা থাকবে। একটু গল্প করা যাবে।

পল্টু বললে, রাতে আসতে পারব না।

—একদিনও পার না?

—না। নাইট ডিউটি। বলে পল্টু কেমন একরকম কবে হাসল।

মুখটা শুকিয়ে গেল রেপু। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে, ডিউটির সময় বদলানো যায় না? না-না এখানে আসার জন্যে বলাই না। দিনকাল খারাপ। চারিদিকে খুন-জখম-ছিনতাই। রাতে ডিউটিতে যাবে শুনলেও ভয় করে।

পল্টু তার উত্তর দিল না। দীর্ঘ সবল দেহখানি একটু নত করে দরজা গলিরে ঘুরিয়ে গেল।

হ্যারিসন বোড।

নিশ্চিন্ত রাত্রেও লোক চলাচল করে। রিক্সা চলে, ট্যাক্সি চলে। রাত দেড়টা নাগাদ প্রতিদিন হ্যারিসন বোড দিয়ে নিয়ে যায় শুরোবের পাল। গ্রাম থেকে নিয়ে আসে। যায় কসাইখানার। একহাতে লস্টন, অন্য হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ি। পিচঢালা রাস্তায় লাঠির শব্দ করতে করতে ব্যাপারীরা শুরোব তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এছাড়া পাগল আছে; মাতাল আছে। রাস্তার ফুটপাথেব বাসিন্দাবাও এককম রাতের যাত্রী বৈকি। তাদের তো ঘুম বলে কিছু নেই। গায়ে দু'ফোটা বৃষ্টি পড়ল—অমনি চট-কাঁধা তোলা, বোম ফাটল তো মা অমনি বৃষ্টির মধ্যে হেলোটাকে আঁকড়ে ধরল, কিম্বা ঘেঘো কুকুবটা কখন গায়ে গা ঠেকিয়ে ধসেছে—দুর্গন্ধে ঘুম ভেঙে গেল।

হ্যাঁ, লোক চলাচল আছে—সারা রাত কেউ-না-কেউ জেগে আছেই হ্যারিসন বোডেব ওপব। ঘুমের আশীর্বাদ কি সকল মানুষের কাগো জোট?

সেটা ছিল ১৯৭০ সালের জুন মাসের শেষার্শ্বে কোনো তারিখ। হঠাৎ সেই হ্যারিসন বোডের ওপর ভোর রাতে মর্মান্বিত আত্মনাদ—মারলে—মাবলে—বাঁচাও।

সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠেব হুস্কার—চুপ!

ঘুম ভেঙে গেল—কোনো একজনের নয়, বাড়ি বাড়ি সকলেব। বাস্তার দু'ধারে শূন্য গেবস্তবাড়িই নেই—রয়েছে বড়ো বড়ো হোটেল, বোর্ডিং, মেস। কিন্তু আলো জ্বলছে না কোনো বাড়িতে। শূন্য অন্ধকারের আড়ালে আত্মগোপন করে রুদ্ধ-শ্বাসে তারা দেখতে লাগল।

আলো-অগ্নিমূল হ্যারিসন বোড। একটু আগেই বৃষ্টির একটা মালবোকাই লরী চলে গেছে—বাতাসে পোড়া পেট্রলের গন্ধ। দেখা গেল একজন পথিককে তিন জনে ধরেছে। লোকটি বোধহয় শেষাঙ্গনা থেকে ডোরের ট্রেন ধরবার জন্যে যাচ্ছিল। তিন-জনে মিলে তাকে হিঁচড়তে হিঁচড়তে নিয়ে গিয়ে ফেলল একটা বাড়ির নকে। একজন টিপে ধরল গলা—আর একজন বের করল ছুরি। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ—নিরপরাধ মানুষ—মানুষের কাছে হাত জোড় করে প্রার্থিন্কা চাচ্ছে।

যে-বাড়ির দরজা ওপরে ফেলে এই নারকীয় কাণ্ড ঘটছে সেখানে ঘুমোচ্ছিল চার-পাঁচজন ভিখারি। আত্মনাদ শ্রুনে তারা উঠে বসেছিল। অমনি আত্মীয়রী হুস্কার দিয়ে উঠল—চোখ বঞ্চে থাক শালারা। নইলে শেষ করে দেব তাদের।

ভিখারিরা চোখ বুজে শূন্যে রইল পরস্পরের গা বেঁধে। তারা কানে আঙুল চেপে রইল—পাছে আত্মনাদ শ্রুনে দুর্বল মনটা অবিরোধের মতো বিদ্রোহ করে ওঠে।

বড়ো বড়ো বোর্ডিং, হোটেল, মেসের জানালায় জানালায় শতাধিক উৎসুক মানুষ তখন ঘটনা দেখে যাচ্ছে। টু শব্দটি নেই মুখে—গলায় একটা প্রতিবাদেব হুস্কার নেই—আলো পর্যন্ত জ্বলছে না ভয়ে।

কিসের ভয়? যদি ঐ নারকীয় কাণ্ডের সাক্ষীকে ওই তিন জন চিনে রাখে? লোক চিনতে না পারুক—বাড়িখানা মনে রাখা তো কঠিন হবে না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিরীহ পথিকের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ওবা একটা ট্যাক্সিতে উঠে পালালো। যাবার সময়ে একজন বললে, শালারা সবাই দেখেছে। একটু আগুয়াজ দিয়ে যে।

নিমন্তব্য বাজপথে বোমা ফাটল দু'টো। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। সেই ধোঁয়ায় মধ্যে ট্যাক্সি অন্তর্ধান করল।

রাত তখন পৌনে চাবটে।

একপব আর ঘুম হবার কথা নয়। তবু বিখ্যাত কোমো হোটেলের বিলাস-উপকরণ-সম্বিত ঘরের ভদ্রলোকটি বাস্তের ব্যক্তি অশ্বকাবটুকু অপচয় করতে দিল না।

অনেক দিনেব অনেক চেষ্টার পর মেসেজি নিয়ে বেবোতে পেরেছ। সমস্ত বাদ দিয়ে পেয়েছে সুযোগ পাচ্ছিল না। সেই সুযোগ আর সাহস যুগপৎ মিলেছে। মাত্র পঞ্চাশ টাকাব পরদ্বী লাভ। মাত্র এক বাত্রি—তাই পুরোপুরি তাব সদ্ব্যবহার করা চাই।

ভদ্রলোক শয়্যাগিগনীর পুনশ্চ বৃত্তে আকর্ষণ করল। বহুটি অফুটস্বরে বকে, রাস্তার বোম ফাটল কিসের? চোর-ডাকাডাক নাকি?

—না না, ছিনতাই পাটি। ও তে নিতাই লেগে রয়েছে।

—মেসে ফেলে নি তো কাউকে?

—তা ফেলতে পারে। উঃ, কী বিধয়ে! তোমার হাতেব এই লোহাটা। বৃত্তে ফেলো তো।

মেসের লোকদের চোখে কিছু আর ঘুম এল না। শয়্যা আবে আকর্ষণ বলল না। কারণ, তাদের তো এখানে শয়্যাগিগনী নেই। তারা যে যার ঘরে বসে রুম-মেইদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল—অধবাবেই, ফেল না তখনো আলো জ্বালতে ভয়, পায়ে বেঁটে মনে করে বসে তারা অপরাধের সাক্ষী!

একজন আত্মধিকার দিবে বললে, চোখেব সামনে ব্যাপাবটা ঘটে গেল, আত্ম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বেঁটে বাধা নিতে পারলাম না।

আর একজন বললে, বাধা দিতে যাব কী নিয়ে? শূন্য-হাতে? দেখলে না ছবিখানা? তার ওপর বোম। শালা বোমচার বন্দ করল বাড়িটা কেঁপে উঠল।

অন্য একজন বললে, আমবা ভেবেছনাম পাড়ার ব্যাপাব। কে জানত অন্য পাড়ার লোক এসে ছিনতাই করছে। তাহলে ডো—প্রথম জন কথার মাথখানে বল উঠে, পাড়ার ব্যাপার হলেই বৃষ্টি চুপ বসে থাকতে হবে?

—তাছাড়া কী! পাড়ার হেলোদের চাটবে টিকতে পারা যায়? বৈনি নয় জন দশকে মিলে যদি বোম ছ'ব বত নিশ্চ বাদি চড়াও করে তাহলে ঠেকাবে নো পুলিশ? পুলিশ আসবে খুন-খাঙ্গার লুণ্ঠরাজ হবে যাবার পব।

—পুলিশেব কথা বাদ দাও।

—তাহলে পাড়ার লোক? আমবা প্রত্যেকেই প্রত্যেকেব পাড়ার লোক। এতটু আগে যখন লোকটা প্রাণেব ভয় চেঁচিয়ে উঠেছিল কেউ কি ছুটে এসেছিল?

প্রথম জন ক্ষুব্ধ স্ববে বললে, তাহলে আমবা বাঁচব কী করে? নিরাপত্তা কোথায়?

দ্বিতীয় জন সাব দিগ্ব বলা, এমন করেই তো দুর্বৃত্তদের সাহস বেড়ে যায়। যে-কোনো দিন যে-কোনো মহাত্মা যে-কোনো ফ্যামিলি বিপদে পড়তে পারবে—শূন্য বাস্তেব নয়, দিনেও। কেউ সাহায্য করতে আসবে না।

তৃতীয় জন বললে, তাছাড়া দুর্বৃত্তদের

শ্রেণীও বদলে গিয়েছে। আগে যেমন চোর, জোক্তর, গুন্ডা বলতে বিশেষ একধরনের চোরা চোরের সামনে ভেসে উঠত এখন তার তো নয়। দেখলে তো তিন জনকে? সব কটাই তো ভদ্র ধরনের ছেলে!

রাস্তার ওপরেই একটি গেরস্তবাড়ির মোতলার ঘরেও তখন এই নিয়ে কথা হাঁছিল। স্বামী-স্ত্রী। নতুন বিয়ে হয়েছে।

স্ত্রী বললে, তুমি অত রাত করে কারখানা থেকে ফের আমার বস্ত ভর করে।

স্বামী বললে, উপায় কী? তোমার ভয়ের জন্যে তো আমার ডিউটি বদলানো যাবে না।

এ-সত্য স্ত্রীও জানে। এমন একটা উত্তরও যে পাবে তাও কিছু অজানা নয়। তবু—প্রাণ যেখানে আকুলি-বিকুলি করে ওঠে সেখানে আর যুক্তিতর্কের খেঁচ থাকে না।

স্বামী বললে, সবচেয়ে ভয় করে মাইনের দিম। কী সাবধানে যে টাকা নিয়ে বেরোই। একবার ছিনতাই হয়ে গেলে উপোস করে মরতে হবে।

স্বামী একটু ধামল। তাবপর বললে, দিন দিন এই সব ব্যাপার বেড়েই চলেছে। এই তো সেদিন কাগজে দেখলে চান্সের দোকান থেকে একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় কুকুর-ড্যাগানি করে মারলে।

স্ত্রী বললে, সে তো রাজনৈতিক পার্টি-ফাটির ব্যাপার।

স্বামী গম্ভীরভাবে বললে, কান্টা রাজনৈতিক, ফোন্টা ব্যক্তিগত আক্রোশ আর কান্টাই বা গুন্ডামি এ তফাৎ করা মুশকিল এখন। একটা মানুষকে লুট করবে আর লোকে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে যাবে—এ-কী কাপড়বুজ!

একটু থেমে স্বামী বললে, তুমি হয়তো বলবে, ওদেব হাতে অস্ত্র আছে। আমি ফলব, কটা অস্ত্র? পঞ্চাশ জন লোক যদি যিবস্ত্র অবস্থায় শব্দ গজান কবে ওঠে তাতেই কাজ হয়। কিন্তু তা আমবা করি না। আমাদের ভয়, পাছে 'আমি' মরি। কিন্তু 'আমি'কেই কি বাঁচানো যাবে শেষ পর্যন্ত?

স্বামী একটু ধামল। তাবপর আবার বললে, সেই ট্রেনেব ঘটনাটা মনে আছে তো? চাল পাচার করছিল কয়েকজন। মাথপথে দিবা চেন টেনে চাল নামাচ্ছিল। আর গাড়িসব্দ লোক হাঁ কবে দেখছে। তাদের সবাই মেয়ে, বুড়ো বা শিশু নয়। কিন্তু আমি কিছুতেই—

স্ত্রী বাধা দিয়ে বললে, উঃ, বোলো না, বোলো না। এখনো ভাবলে গা কেমন করে। ছবিখানা যদি বসিয়ে দিত?

—বসিয়ে দিলে নিঃসন্দেহে তোমাব বিধবা হতে হত। কিন্তু দিতে পারে নি। আমি যে এমন ভাড়া কবে যাব ভাবতে পারে নি। নাভাস হয়ে গিয়েছিল। তার

কারণ, এর আগে ওয়া কখনো বাধা পায় নি। তাবপর আমি বন্ধ চোঁটের উঠে গাড়ি থেকে নেমে পাথর হুড়ুতে লাগলাম তখন দেখি অন্য প্যাসেঞ্জাররাও আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

একটু থেমে বললে, তুমি এমন করে বাধা না দিলে আজকেও আমি চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করতাম।

বাধা দেওয়ার অপরাধে স্ত্রী বোধহয় কোনো গ্রানি অনুভব করল না। হাই তুলে, আলিস্য ভেঙে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। উনুনে ভাতি দিতে হবে।

তবু দু'ঘণ্টা আগের ব্যাপার সম্বন্ধে কৌতূহল যায় না। বললে, তুমি কেমন স্বচক্ষে ডাকাতগুলোকে দেখলে। আমি কখনো দেখি নি।

স্বামী হেসে বললে, দেখে সুখ হবে না। নিত্যন্তই সাদামাটা ছোঁরা সব। চেনা মুখ। বলতে বসতে ভদ্রলোক কেমন যেন অন্য-মনস্ক হয়ে গেল। স্ত্রী উঠে যাচ্ছিল, ডেকে বললে, তোমাব আলবামটা একবার যার কর তো রেগু।

—এখন আলবাম নিয়ে কী কবে?
—সরকার আছে।

অগত্যা সেই ভোরবেলাতেই রেগুকে বাস্ত-ভোষণ নামিয়ে আলবামটা বের করে দিতে হল।

স্বামী আলবামটা নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল। একজায়গায় এসে তার দৃষ্টি হোঁচট খেল। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিন জন। বেগু, রেগুর মা, আর—

—এ ছেলেটি কে বোলা তো ব্যাগ হাতে?
—ও তো পল্টুদা। আমাদের পাড়ার ছিল।

স্বামী গম্ভীরভাবে আলবামটা স্ত্রীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, ইনিই আজ ভোব রাতে আমাদের পাড়ার অভিসারে এসেছিলেন।

—সে কী গো!

বলতে বলতে রেগু অস্বাভাবিক ভয়ে আঁকড়ে উঠল। পল্টুদা যে এই প্রকৃতির—এ ধারণা রেগুর হয়েছিল একদিন গোপনে অন্য চারি দিয়ে তার ঐ ব্যাগটা খুলে দেখতে গিয়ে। শব্দ যে বড়ো একটা হোঁরা তাই নয়, আবো কত কী! সেই দিন থেকে আর সে ভয় পল্টুদাকে বাড়ি ঢুকতে দেয় নি। বেগুর মা'ও ভাড়াভাড়া যেমন-তেমন পাঠের সম্ধান পাওয়ামাত্র মেঝেকে স্থানান্তরিত কবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

কিন্তু পল্টুদা যে এতখানি সাংঘাতিক—একবারে ডাকাত হয়ে গিয়েছে রেগু তা কল্পনায় করতে পাবে নি। ভয়ে দু'মুখে লজ্জায় তার দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তাব কেবলি মনে হতে লাগল, বোধ হয় তার কাছ থেকে আঘাত পেয়েই পল্টুদাটা এমন হয়ে গেল।

কিন্তু শব্দ কি রেগুর পল্টুদা? শব্দই কি প্রেমের ব্যর্থতা? জীবনে তাদের আর কোনো ব্যর্থতা নেই?

কয়েক বছর ধরে বাংলা দেশের সর্বত্র ছিনতাই, লুট, ডাকাতি, হত্যা বেড়েই চলেছে। যুক্তফ্রন্টের বিতীয়বার সিংহাসন আরোহণকালে শব্দ হল নতুন সংকট—শত্রিকী সম্বন্ধে। চোন্দ দলের যুক্তফ্রন্ট। তাদের কারো কারো আদর্শে দস্তুর প্রভেদ। কাগজের পাতায় নেতায় নেতায় ঝগড়া যতই লাল হরফে ফুটে ওঠে, পথে-ঘাটে তাদের অনুগতদের মধ্যে ততই হানাহানি বাধে।

এই সব রক্তক্ষরের জন্যে সেদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকেই দায়ী করেছিল কয়েকটি পার্টি। সবচেয়ে উত্তেজিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী—বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখোপাধ্যায়। তিনি তার উপ-মুখ্যমন্ত্রীর ওপর চটে গিয়ে নিজের সরকারকেই 'বর্বর সরকার' আখ্যা দিয়ে বসলেন এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি আর তার প্রতিবিধানের অসমর্থ জেনে ১৬ই মার্চ ১৯৭০ পদত্যাগ করলেন।

জনগণের ওপর সি. পি. এম-এর প্রভাব কম গিয়েছে এই ছিল তাঁর শেষ পর্যন্ত ধারণা। কাজেই সি. পি. এম-কে বাদ দিয়ে তিনি বিকল্প সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। সেটা যখন সম্ভব হল না—তখন তিনি রাষ্ট্রপতির শাসনকেই স্বাগত জানানলেন। আশা ছিল, রাষ্ট্রপতির নিরপেক্ষ শাসনে দেশে অরাজকতা দূর হবে, আইন-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

এদিকে যুক্তফ্রন্ট ভাঙাব প্রতিবাদে সি. পি. এম এবং তার অনুগত দলগুলি যে পরদিনই দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিয়েছিল (১৭ই মার্চ) তা সফল হল।

এর দু'দিন পর থেকেই রাষ্ট্র-পতির শাসন শব্দ। কিন্তু এই-দিন থেকেই যে রক্তপাত শব্দ হল—কী বেগনে কী বর্ধমানে, দেশের লোক তাতে শিউবে উঠল। তারপর থেকে জুলাইয়ের আজকের তারিখ পর্যন্ত—কোথায় ছেল শাসন, কোথায় গেল আইন-শৃঙ্খলা। প্রতিদিন কাগজ খুলেই লুট, ছিনতাই, ওয়াগন ভাঙা, হত্যা আব সংঘর্ষের ভয়ঙ্কর ঘটনা। যে ছেলোবা কালীপুজোর পটকা তৈরি করতে ভয় পেত তাবাই আজ মারপাল্ল তৈরি কবেছে। পকেটে পকেটে বোমা। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে আসতে লাগল বিভালবার বাইফেল, স্টেনগান, হেনগান। ইতিমধ্যে ঘণ্য ডাকাতিস অভিযোগে ধবা পড়লেন দেশপূজ্য অনন্ত সিংহ! ভর্তিবিহীন আদর্শবাদী বাঙালি-সমাজ চমকে উঠল। কাউকে তো তাহলে বিশ্বাস করা যাব না।

পুলিশ একসময়ে কংগ্রেসীদেব মন জুগিয়ে চলেছে। সে একরকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। চোন্দ দলের যুক্তফ্রন্টের হাতে

কোনো পদার্থ-পরিবেশের হায়ে উঠল।
তার আদেশ চেলো। কার আদেশ রাখে।
এ বলে, শুকে ধরো। ও বলে, হেড়ে দাও
আমার দলের লোক।

আর এখন পদার্থ হায়ে উঠছে সমস্ত।
কারণ, জনতা বা হায়েসমাজ আজ নিরস্ত নয়।
তারাও হিংস্র, সমস্ত। গুলী চল দূতরক
থেকেই। হতাহতও হয়, তবে নিরীহ
পথচারী বাই বেশি।

এ তো তবু সংঘর্ষ—সংবাদপত্রের ভাষায়
খণ্ডবৎ! পথচারী এখানে বোকার মতো
দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে মার খায় না।
পালিয়ে বাঁচে। এ পালানোর হয়তো কমা
আছে। কিন্তু—

এরই সংগে চলেতে লাগল দৃশ্যে হত্যা-
কাণ্ড। অর্থাৎ দলবদ্ধ হয়ে কোনো বিশেষ
জনের বাড়ি আক্রমণ। যার ওপর আক্রমণ
আছে (সে আক্রমণ হস্ততা শব্দই রাজ-
নৈতিক মতের অমিলের জন্ম) তাকে জোর
কবে ধরে এসে খুন। এই সব খুন ঘটেছে
প্রকাশ্য রাজপথে—প্রকাশ্য দিবালোকে—
বহু লোকের সামনে। জনতা নীরব দর্শকের
ভূমিকায়—পদার্থ সব জেনেশুনেই দূরে
করে থেকেছে।

খুন অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বাঙালি
চরম শব্দবোধ হারিয়ে যে কতখানি হিংস্র,
নিষ্ঠুর হয়েছে তার বুদ্ধিমানী শ্রমস্ব সাহস
হারিয়ে কতখানি ক্ষম-পশুর শিকার
হয়েছে কেবলমাত্র জুলাই ১৯৭০ জালের
বছরের কাগজের পাতা।

জুলাই মাসের প্রথম কুড়ি দিনের ঘটনা
একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল।—

৭ই জুলাইয়ের খবর
৬ই জুলাই ব্যারাকপুরে কোনো রাজ-
নৈতিক কর্মীকে পিটিয়ে মারা হয়।
৮ই জুলাইয়ের খবর
১. কোনো নিহত রাজনৈতিক কর্মীর

মৃতদেহ নিয়ে শোক মিছিল।

২. ৬টা জুলাই মেদিনীপুরে এক
কৃষককে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করা
হয়।

৯ই জুলাইয়ের খবর

১. জনৈক কৃষক কর্মী প্রকাশ্য
দিবালোকে নিহত।

২. ৮ই জুলাই উত্তর কলকাতায়
ছুরিকাহত হয়ে একজনের
মৃত্যু। সামান্য বচসা থেকে
খুন।

১৫ই জুলাইয়ের খবর

১. মেদিনীপুর গ্রামে জোতদারকে
খুন।

২. ৭ই জুলাই বর্মানের গ্রামে
পিতাপুত্র খুন হয় রাত
সাড়ে আটটার।

৩. ১৫ই জুলাই বর্মানের

কোনো গ্রামে পাঁচ ব্যক্তি
অক্রান্ত হয়।

১৬ই জুলাইয়ের খবর

১লা জুলাই দুপুরের দিকে
মেদিনীপুরের গ্রামে বাপ-মায়ের
সামনে দুই ছেলে এবং দুই
আত্মীয়কে টাঙি দিয়ে হত্যা
করা হয়। পদার্থ নীরব দর্শক।

১৭ই জুলাইয়ের খবর

২০শে জুন একদল যুবক
বৈদ্যবাটী থেকে চলন্ত ট্রেনে
উঠে কান্ট রাসের বাতীকে
ছোবা দেখিয়ে টাকা-পয়সা ও
মাসিক টিকিট ছিনিয়ে নেয়।

২১শে জুলাইয়ের খবর

১. মেমারীতে সদ্যবিবাহিত
যুবককে সকাল নটার বাড়ি
থেকে ডেকে রাস্তায় এনে খুন।

২. ডায়মন্ডহারবারে রাজনৈতিক
কারণে একজনকে খুন করে
মাটিতে পুতে রাখা হয়েছিল।

৩. রাজনৈতিক কারণে, ফুল
শিক্ষকে হত্যা করার ব্যারাক-
পুরে ছাত্র ধর্মঘট।

২২শে জুলাইয়ের খবর

কলকাতায় সত্তেরো বছরের
একটি ছেলেকে রাজনৈতিক
কারণে প্রাকশ্য পিটিয়ে মারা
হয়।

১শে মাত্র ওরফে কচি মিশ্রের ওরফে
ইসাক চৌধুরী একা একাই কলেজ স্ট্রীট
দিয়ে আসছিলেন। ট্রাউজারের সঙ্গে বসশাট
ম্যাচ করেছিল। চোখে সানগ্লাস। ইউনি-
ভার্সিটির সামনে আসতেই হঠাৎ তার
মনটা কেমন হয়ে গেল। এটা তার কাছে
নতুন কিছু নয়। কলকাতার কলেজগুলো
বা ইউনিভার্সিটির সামনে দিয়ে ঘোরা
ফেরা করা তার অনেক দিনের একটা
খেয়াল। সে হায়াসকে জোরপাশ
করেছিল। কিন্তু পয়সার অভাবে কলেজে
ভর্তি হতে পারে নি। খুব আগ্রহ ছিল
কলেজে পড়বে। কিন্তু যখন টাকার
অভাবে ভর্তি হতে পারল না, হৃদয়হীন
কর্জপক্ষের আচরণে এতটুকু সহনশীলতা
পর্যন্ত পেল না তখন তার মনে হল এই
কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলো কেবল বিশেষ
শ্রেণীর মানুষের জন্যে। গরিবের প্রবেশ-
অধিকার সেখানে নেই। এ দৃশ্য এ ক্ষোভ
তার আর যায় না। তাই লোভীর মতো
এখনো সে ঘুরে বেড়ায় কলেজের আশে-
পাশে। দেখে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের।
কিন্তু তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করতে
পারে না। মনে হয় ওরা ভাগ্যবান।

আজও ইউনিভার্সিটির কাছে ঘুরতে
ঘুরতে একটা হকারের কাছ থেকে কাগজ
কিনে নিল।

বছরের কাগজ বোজাই সে পড়ে।
কিন্তু বাংলা দেশে যে রাজনৈতিক জড়ো-
খেলা চলেছে তা তার ভালো লাগে না।
এমন কোনো নেতা—এমন কোনো মানুষ
থাকে পায় না যাকে শ্রদ্ধা করতে পারে।
আর তার ধারণায় রাজনীতি মানেই ট্রাম-
বাস পোড়ানো, পরীক্ষা ভাঙল করা,
মাস্টারদের শাসনো; কাঁচা কাঁচা ছেলের
গুলোকে ধরে এনে ছুরি মারা, মহা-
পুরুষদের মূর্তি ভাঙা।

পল্টু ইউনিভার্সিটি পায় হয়ে কচি
হাউসের পাশ দিয়ে হ্যারিসন রোডের দিকে
এগোতে লাগল।

মূর্তি ভাঙার কথার তার মনে—
দিনের বেলায় রাস্তায় একা চলেই সে
যেন অন্য মানুষ—যেন কত বড়ো
চিন্তাবিদ—যেন কত বড়ো রাস্তা-নেতা।
নিজের কথা ভেবে নিজেরই হাসি পায়।

তার হঠাৎ মনে হল পাথরের এই
নীরব নিরপরাধ মূর্তিগুলো ভেঙে
জাত কি?

পরক্ষণেই মনে হল, আমরাও তো
আজ্ঞা! কতগুলো পাথরের মূর্তি
থাকল আর গেল তাই নিয়ে হঠাৎ এত
সচেতন হয়ে উঠি কেন? আমরা কি
সত্যিই এই মূর্তিগুলোকে প্রাণা করি?
এদের প্রতি কি আমাদের এতটুকু সম্মান-
বোধ আছে? বছরে একবার করে চন্দ্র-
দিনে মালা দিয়েই দায়িত্ব শেষ। এই
মূর্তি যদিও তাদের জীবন সম্বন্ধে—
তাদের ত্যাগ সম্বন্ধে আমরা কতটুকু
ভেবেছি? বরঞ্চ এই সব মূর্তি বসিয়ে
দিয়ে আমরা লোককে এই বলে ঠিকিয়েছি
—দেখো আমরা এদের কত সম্মান করি।

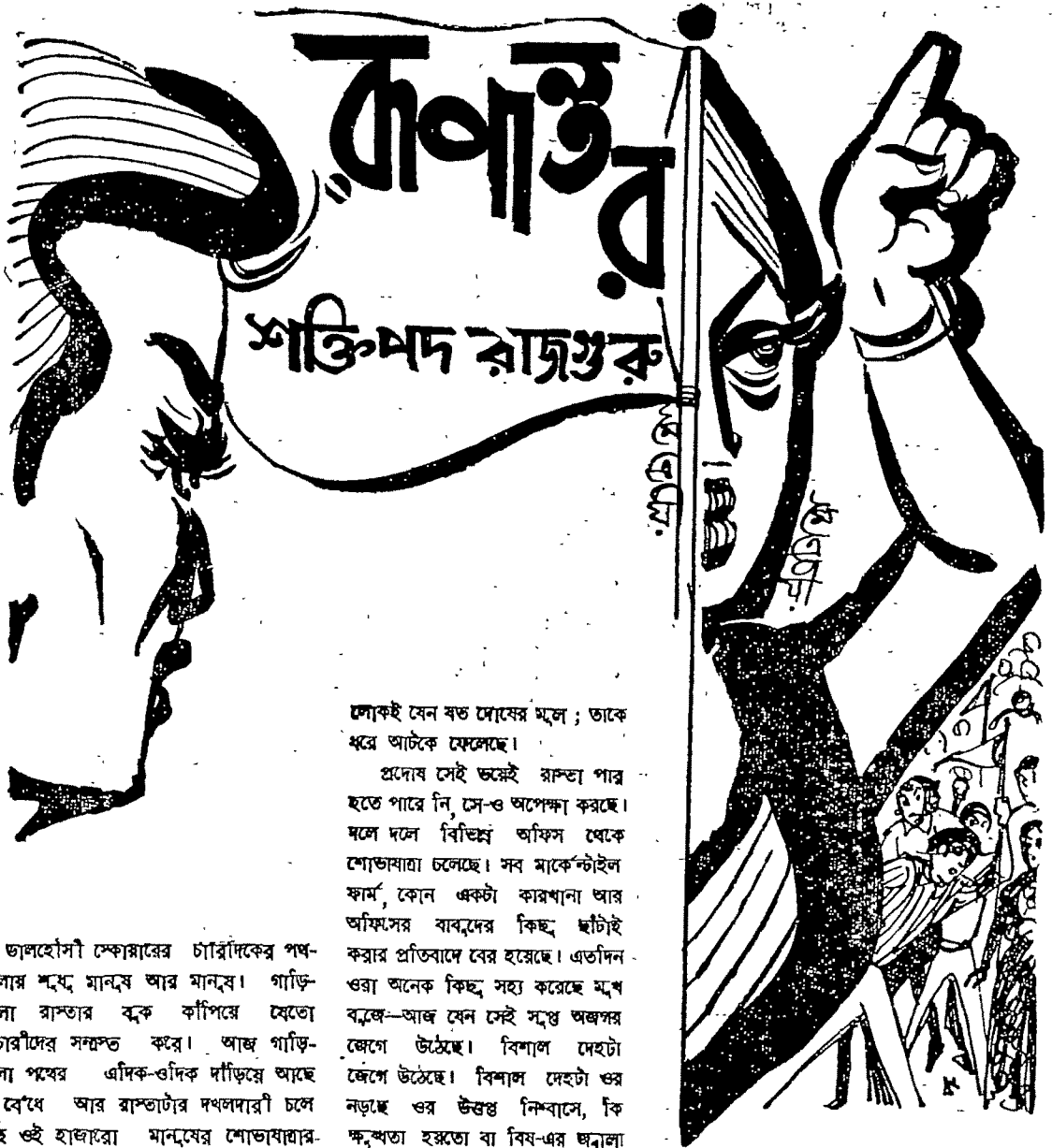
মূর্তি ভাঙা—তাহলে কি যদিও মূর্তি
তাদের অসম্মান করা নয়, যারা ভাঙল
ভাঙারী করে তাদের প্রতি আত্মশ্রম
প্রকাশ?

এই দেখো না হ্যারিসন রোড!—পল্টু
হ্যারিসন রোডে এসে পড়ল। এখানে কেন
যে এল তা সে নিজেও জানে না। তবে,
হ্যারিসন রোডে এলেই রেশমের কথা মনে
হয়। এখানেই কোথায় যেন সে থাকে।

হ্যাঁ, এই হ্যারিসন রোডের নাম দেওয়া
হয়েছে মহাত্মা গান্ধী রোড। দেশপ্রেমের
পরাক্রান্ত! শালা, আব কিছতে দেশভক্তি
দেখানো গেল না! যত দেশভক্তি বাস্তব
নাম বদলিয়ে। এদের কাছে ইতিহাসের
কোনো দাম নেই! আশ্চর্য!

হঠাৎ এমনি সময়ে হ্যারিসন রোডের
ওপর একটা হল্লা। পল্টু চমকে উঠল।
এ ধবধবে হল্লাব সংগে তার পরিচয় আচ্ছ।
তাড়াতাড়ি এগোতেই দেখতে পেল
সত্তেরো-আঠারো বছরের একটি ছেলেকে
আর কয়েকটি ছেলে বলির পাঠার মতো

[শেষাংশ—১৬০ পৃষ্ঠায়]



লোকই যেন বস্তু সোষের মূল ; তাকে
ধরে আটকে ফেলেছে।

প্রদোষ সেই ভয়েই রাস্তা পার
হতে পারে নি, সেও অপেক্ষা করছে।
মলে মলে বিচিত্র অফিস থেকে
শোভাযাত্রা চলেছে। সব মার্কেটাইল
ফার্ম, কোন একটা কারখানা আর
অফিসের বাবুদের কিছু ছাটাই
করার প্রতিবাদে বের হয়েছে। এতদিন
ওরা অনেক কিছু সহ্য করেছে মৃদু
বক্তা—আজ যেন সেই সুস্থ অজ্ঞপ্ত
জেরে উঠেছে। বিশাল দেহটা
জেরে উঠেছে। বিশাল দেহটা ওর
নড়ছে ওর উত্তপ্ত নিশ্বাসে, কি
ক্ষুধতা হয়তো বা বিষ-এর জ্বালা
ফুটে ওঠে।

ভালহোসী স্কোয়ারের চারিদিকের পথ-
ঘলোয় শব্দ মানুষ আর মানুষ। গাড়ি-
গুলো রাস্তার বুক কাঁপিয়ে যেতো
পথচারীদের সন্তপ্ত করে। আজ গাড়ি-
গুলো পথের এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে আছে
দল বেঁধে আর রাস্তাটার দখলদারী চলে
গেছে ওই হাজারো মানুষের শোভাযাত্রার
হাতে।

লাল ফেস্টুন আর পিজবোর্ড লেখা
দাবীর কথাগুলো, ওরা স্লোগান দিয়ে
চলেছে, আশমানে উঠতে উঠতে হাজারো
হাত, কলকণ্ঠে ওরা আকাশ-বাতাস ভরিয়ে
সোজার শপথে এগিয়ে চলেছে ময়দানের
রিকে।

খেটে খাওয়া মানুষ আজ দল বেঁধেছে।
সেখানে নারী-পুরুষ বিভেদ নেই। কুলি,
স্বাক্ষর, রাষ্ট্রদূতের প্রতীক নেই। ক্লাস
রিফোর—সবাই নেমেছে পথে কঠিন প্রতি-
বাদের শপথ নিয়ে।

প্রদোষও দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়।
সারকণ্ঠী ওই শোভাযাত্রা চলেছে রাস্তা
জুড়ে। পারাপার হবার পথ বন্ধ। কোন এক
কক্ষ জলোক কি জরুরী কাজে ওই
সারকণ্ঠী মানুষের ফাঁক দিয়ে রাস্তার ওপারে
ঝেঁত চেষ্টা করেছেন, অর্মান তার উপরই
কাঁপিয়ে পড়ছে যেন মানবগুলো, এই ভয়-

প্রদোষ জানতো এ সব। অনেকদিন
সেও ইউনিয়ন করেছে, এমন পথে বের
হয়েছে, রোদ-বৃষ্টি মানান, কত বাঘের সঙ্গে
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তর্ক করেছে। দিনরাতি
কৈটেছে ইউনিয়ন অফিসে। প্রদোষ দাঁড়িয়ে
আছে—তবু মনে হয় ওদেব ওই নোড়ার
প্রতিবাদে সাক্ষি হয়ে যাবে। আবার যৌবনের
সেই দিনগুলো ফিরে পাবে।

কিন্তু কোথায় যেন বাধে তার। ক্রান্তি,
বিচ্ছিন্ন। ঠিক জানে না সে। আজও তাই
সরে এসেছে অফিস থেকে চুপিচুপি,
একটু আগেই।

ভিড়ের মধ্যে কাকে দেখে একটু অবাক
হয় প্রদোষ। শ্রীপর্ণাও আছে ওই শোভা-
যাত্রার অপিসের অনেক মেয়েদের সঙ্গেই।
শ্রীপর্ণা ওই মেয়েদের শোভাযাত্রার আগে
আগে চলেছে। রোদে, গরমে ওর মসৃণ
টুকটুক মৃদুখান্না লাগতে হয়ে উঠেছে।

কপালে এসে পড়েছে কোকিড়ানো চুলগুলো,
শাড়িটা ওর নিটোল দেহের রেখাগুলোকে
মুগ্ধ করে তুলেছে ওর কণ্ঠস্বরের মতই।
শ্রীপর্ণা প্রশমনে বের হবে তা বলে নি।

ওপাশে ডেসপ্যাচ সেকশনের সুহাস
আরও কারা চলেছে ফেস্টুন হাতে। প্রদোষ
একটু গম্ভীর হয়ে যায়। সুহাস ওই ভিড়ের
মধ্যে হাত তুলে চীৎকার করছে। শ্রীপর্ণার
চোখে কিসের হাস্য। ওরা এই শোভাযাত্রার
মাঝে এত লোকের ভিড়েও দু'জনে যেন
একটা নৈকট্য বজায় রেখে চলেছে। এই
পরিপ্রসেও ওই সামিয়ার্টুতে দু'জনেই
ভুগ্ন।

আমাদের দাবী—মানতে হবে!

ভিড় হালকা হয়ে আসছে। বিবাত একটা
দল এগিয়ে গেল; পিছনে নেতাজী সূভাষ
রোড। আনও অনেক শোভাযাত্রা আসছে
চলমান জলপ্রবাহের মত। এই ফাঁকে আটকে

পড়া মানবগুলো ওই রাস্তা দিয়ে পার হবার চেষ্টা করছে। গাড়ির সার জট পাকিয়ে গেছে—তবু প্রদোষ পিহনের মানবগুলোর চাপেই এগিয়ে এল।

দূরে ওদের শোভাযাত্রা চলে গেছে—কলরব শোনা যায় মাত্র। ওই কলরবে মিশে যাচ্ছে শ্রীপর্ণার সুরেলা কণ্ঠস্বর। ওর মিস্ট্রি অস্তিত্বটুকু।

সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

ছোট বাড়িটার অন্ধকার নেমেছে। আলোগুলো জ্বলছে দু' একটা ঘরে। তাতে অন্ধকার যেন আরও ঘন হয়ে উঠছে কলেই মনে হয়। সামনে একটা ঘন বইলতার আবেষ্টনী, সবুজ লতার শাদা ফুলগুলোর বিবর্ণ সুরভি বাতাসে যেন কার দীর্ঘশ্বাসের মত মিশে আছে।

প্রদোষ অনেক চেষ্টার এই বাড়িটুকু করেছে। তার নিষ্ঠুরনীড়। অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে সে এই ঘর বেঁধেছিল। সে আর একজন। দু' জনের নিবিড় ভাল-বাসায় ভরে উঠেছিল এই স্বপ্ননীড়। প্রদোষ আশা করেছিল আরও কেউ আসবে তাদের জীবনে। তার অক্ষুট কাকলি আর হাসির শব্দ ওর শূন্যতা পূর্ণ হয়ে উঠবে কি আনন্দে।

কিন্তু এখনও সেই স্বপ্নটা অপূর্ণ রয়ে গেছে। সোফাসেট-ল্যাম্পস্ট্যান্ড-রঙীন পর্দা, ছোট কার্পেট ক্লাওয়ার ডেসে রজনীগন্ধার

চিটক, কাচের শো-কেসে টুকটাকি কিউরিও ওদের দু' জনের কোন নিষ্ঠুর বৈজ্ঞানিক বাবার স্মারকচিহ্ন সবই রয়েছে। ঘরের চারিদিকে কাব সাবধান হাত আর পরিচ্ছন্ন ব্রাচির পরিচর মেলে।

তবু কোথায় একটা শূন্যতা রয়ে গেছে—আর দিনে-দিনে সেই ফাঁকটা বড় হয়ে উঠছে দু' জনের কাছে।

প্রদোষ ঘড়ির দিকে চাইল। আটটা বেজে গেছে। কি নীরব উদ্বেজনার পারচাষী করছে সে। বাইরের জমট আধার ঢাকা গাছগাছালির বকে রাতের বাতাস এলো-মেলো খড় তুলেছে।

ওর মনের অভলে তেমনি বড়। স্মৃতির জীর্ণ পাতাগুলো সেই দমকা ঝড়ে কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। চোখের সামনে ফুটে ওঠে আগেকার সেই উদ্বেজনার সিন্দূরগুলো। প্রদোষের সেই দিনকার ছবি একখানা আন্ধ্র দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে।

ছিপছিপে একটি ভরুণ-লম্বা নাক—জ্বলজ্বলে চোখ। মাথার চুলগুলো উস্কেখস্কে। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবী—পাকজামা, কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগে কাগজপত্র।

সৈদন অপিসের বিভিন্ন কারখানা-অপিস-ওয়ারহাউসের কর্মীদের কাছে প্রদোষ একটি জনপ্রিয় আর পরিচিত নাম। সেবার কর্মীদের দাবী নিয়ে সেই প্রথম সাড়া তোলে,

শারদীয় সাপ্তাহিক বসন্তমতী : ১৩৭৭

বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো রয়েছে এদের ম্যানেজিং এজেন্সী নেওয়া অনেকগুলো অপিস। কতৃপক্ষ তাদের একত্রিত করে দি এই ভয়ে যে, তাতে ওরা সমবেতভাবে আঘাত হানতে পারে ম্যানেজমেন্টের ওপরে। তবুও তাদের সেই বিতেন্দনীতিকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল প্রদোষ তার অশ্রুত সংগঠনীশক্তি দিয়ে।

হাজার হাজার কর্মী বিভিন্ন কোষ থেকে সাড়া দিয়েছিল। ওরা সৈদন কতৃপক্ষের সব শাসন আর অন্যায় দোষের বিবৃতিতে রুদ্ধে দাঁড়িয়ে কর্মঘট করেছিল। কোম্পানীর বিরূপ ভিত্তিমূলে নাকড়া দিয়েছিল ওরা, প্রদোষ সৈদন ছিল তাদের অন্যতম নেতা।

এই সময়ই ওই কর্মকর্তার মধ্যে দেখা হয়েছিল শ্রীপর্ণার সঙ্গে। সুন্দর একটি মেয়ে। চোখে-মুখে ওর ব্যুধি দাঁষ্ট। ও রকম মেয়েরা সাধারণ চাকরী করতে আসে না।

তবু শ্রীপর্ণা এসেছিল চাকরী করতে। কোন সাহেবের পি-এ। ইউনিয়ন থেকে প্রদোষই ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল কারণ, ওদের কাছ থেকেই কোম্পানীর ম্যান-প্রোগ্রামের গোপন খবর পাওয়া যাবে।

কঠিন একটি মেয়ে সে-ও ব্যাপারটা বুঝেছিল। দেখেছিল হাজারো মানবের সেই সোচ্চার প্রতিবাদ। ওরা সকলের জন্য বাচার দাবীতে লড়াই শুরু করেছিল। শ্রীপর্ণা তাই বোম্বহার ওদের এই লড়াইএ নামিয়ে হয়েছিল, তবে প্রকাশ্যে সৈদন আসতে পারে নি। গোপনেই সাহায্য করেছিল। প্রকৃত সাহায্য। প্রদোষও আশা করে নি যে, শ্রীপর্ণা এগিয়ে আসবে তাদের এই লড়াই-এ।

দীর্ঘ একমাস ওরা সব ব্যর্থ করে দিয়েছিল। কোম্পানীও বাস বুটিশ। তাদেরও সম্মানে ঘা লেগেছিল। তাই ওরা ধর্মঘট মিটিয়েছিল সাতা কিছু কিছু লোককে তারা অবিশ্বাস করেছিল। ওরা জেনেছিল তাদের ভিতরের খবর। ডিরেক্টর-বোর্ডের গোপন মিটিং-এর মিনিটস মার কনফিডেন্সিয়াল সাকুল্যর মেমোর। কপি হয়ে ওই ধর্মঘটীদের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। তারই সন্দেহ দু'চাষ জন যাদের উম্মতি হবার আশা ছিল তাদেরই উপর চোট পড়ে। একে একে তাদের সেই সব জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, আব নির্দেশ দিয়েছিল ওদের বিবদান্ত ভেঙে দিতে হবে—খীয়ে খীয়ে এবং গোপনে।

প্রদোষ সবই জানতো।

দিদিমণি এখনও ফিরল না? বিয়ের ডাকে প্রদোষ ওর দিকে চাইল। হড়িতে পোনে নাটা বাজছে। শহরভল্লীর রাস্তা প্রায় জনশূন্য হয়ে আসে।

প্রদোষের রাগ হয়, তবু কিয়ের সামনে এই রাগটা প্রকাশ করতে চায় না সে। ফলে,

কাজ আছে অপিসে।

কি ঠিক যেন কথাটা বিশ্বাস করে যা ওর কথা বলার ধরণ দেখে। কারণ, মেয়েদের উপর পুরুষদের রাগটা মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারে। বলে সে,—খাবার দেব আপনায়?

সাইকেল-রিস্কাটা একচক্কু হাঁরমে চাহনির মতই একটু মিটিমিটি আলোর রেখা মেলে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। প্রদোষ কি ভেবে নিজেই এগিয়ে গেল, প্রদোষকে দেখে শ্রীপর্ণা রিস্কা থেকে নেমে গলগল করে শোনায়।—তুমি গেলে না, উঃ কি গ্যাডারিং? বুকেল আজ নেপালবাবু ডারাসে দাঁড়িয়ে যা বললেন। সুহাস বলে আমরা আলটিমেটাম দেব। কি সাড়া চারিদিকে।

হঠাৎ শ্রীপর্ণা ওকে চুপ করে থাকতে দেখে চাইল। শ্রীপর্ণা অবাক হয়েছিল। ও একজন কি দুর্বলত আবেগভরে বলোছিল কথাগুলো, কিন্তু যাকে বলা সে ওই সম্বন্ধে আদৌ আগ্রহী নয়। ও যেন ফের দেওয়ালে কঠিন ধাক্কা খেয়ে খেয়ে গেছে।

শ্রীপর্ণা শুধোয়, কি হল তোমার?

—কিন্তু না। গেটটা বন্ধ করে এমোঃ স্মারি হয়ে গেছে। আর একলা ঘরের বৌ হয়ে এত রাত্রে ঘেমে নেয়ে বাড়ি ঢুকবে এটা দেবতো কি ভাববে?

শ্রীপর্ণা গেটের কাছে গুম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে ওর চোখ ধূস্র জ্বলছে নীরব রাগে আর অপমানে। প্রদোষ ইচ্ছে করেই তাকে এই কথাগুলো বলেছে। ও জানে আজ জব্বের রাতি আছে, একাধল ওই-ই ছিল ইউনিয়নের অন্যতম পাশা। দিন-রাত সে ঘুরেছে, কতো রাত পড়ে বেবেবেই ইউনিয়ন অফিসের মাদুরে ব্যাগ মাথায় দিয়ে।

আজ। সামনে একটা বিরাট প্রশ্ন। কতৃপক্ষের সব অন্যায় অভ্যচারের বোঝাপড়া করার জন্য তৈরি হচ্ছে তারা। প্রদোষ আজ কাউকে না জানিয়ে অপিস থেকে চলে এসেছে, প্রশ্নশনে যায় নি। আর উল্টে তাকেই আজ যা-তা শোনায়।

ক্লান্তিতে ঘেমে বাড়ি ফিরেছে শ্রীপর্ণা। জামাটা ভিজে গেছে ঘাস জমে জমে। মাথা গ্যা-মাথা থেকে বিস্তীর্ণ গম্ব বের হচ্ছে। স্মারন করতে হবে।

এগিয়ে গেল সে বাবরুমের দিকে নিজে ঘরে কাপড় চোপড় বদলে। ঝি ওব দিকে চেয়ে থাকে। বলে সে,—দাদাবাবু খবর রেখে গেছে বোর্ডিংমনি।

শ্রীপর্ণা কথা বললো না। ব্যাপারটা সেও জানে কিন্তু প্রদোষের রাগে এই কারণটা ঠিক বুঝতে পারছে না। তবে সেথেকে ইউনিয়নের অনেককেই এখন এড়িয়ে চলে সে।

নতুন ছেলেরা এসেছে—তারার আরও সিনিসিয়ার—আর হুঁশিয়ার।

সুহাসকে দেখেছে শ্রীপর্ণা। এ নিয়ে

একটি পড়াশোনা করেছে। এম-এ পাশ।
ইক্সমিকস-এর ছাত্র। তাই, ট্রেড ইউনিয়ন
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল আগে। সে
এসে ইউনিয়নের অনেক ভোল বদলে
দিয়েছে।

শ্রীপর্ণা দেখেছে ওকে, কোথাও ইতি-
উতি ভাব নেই, সরল স্বভাব একটি বুদ্ধিদান
ব্যবক। কতৃপক্ষের সঙ্গে আপোষ-এর পথে
সে যার নি।

বাধরমের ঠাণ্ডা পরিবেশে শ্রীপর্ণার
স্বাভাৱিক কমে আসে। দুটি মানুষ দু-
জনের রোজগার দিয়ে এই নীড় বেঁধেছে
‘পন নীড়। কোথায় শ্রীপর্ণার চিরন্তন
‘রোমি অনেকে কিছুই পেতে চেয়েছিল,
‘সিঙ্গার সেই শূন্য জীবনের দিনগুলোর
‘স্মি মনে পড়ে। রূপ-গুণ তার ছিল,
‘স্মি সাহেবের পি-এ হয়েছিল তার
‘স্মি সোনারি আঙ্গ টাইপ ভালো জানার জন্য,
‘স্মি হুইটাই কি ঠিক। তার রূপও শানিকটা
‘স্মি হাওয়া করেছিল।

কিন্তু তি ছিল সে স্থানে সার্থকতা।
হয়তো মাইনে অনেক বাড়তো। সাহেবের
নেক-নজরে ছিল তাই প্রমোশন হয়ে যেতো।
জনা গ্রেডেই উঠে যেতো। কিন্তু সেই
‘স্মি নীড়কেও দেখেছিল শ্রীপর্ণা। ক্লাবে
‘স্মি সিনা-বিক্রি। আরও অনেক কিছু
‘স্মি স্মানকে মনে দিতে হতো, সাধারণের
‘স্মি অনেক দূরে সরে যেতে হতো।

তাই হয়তো ভালোবেসেছিল সৈদিন
‘স্মি প্রদোষকে। বলিষ্ঠ খাজু একটি
‘স্মি ভরসা তাকে ভালোবেসেই ইউনিয়নে
‘স্মি এনেছিল। তার জন্য অনেক হামাই
‘স্মি দিয়েছে সে। প্রমোশন ভাল কোয়ার্টার,
‘স্মি তার গাড়ি সেই প্রাচ্যের জীবন
‘স্মি সব কিছু, ওকে ভালোবাসার খবরটা কতরা
‘স্মি প্রেরণে তারপরই সেই স্বর্গ থেকে
‘স্মি হয়েছিল তার নিবাসন, বাস দপ্তর থেকে
‘স্মি করল হয়ে এসেছিল হেড অফিসের স্টেনো
‘স্মি হয়ে।

হেসেছিল প্রদোষ তখনই কলোছলাম
‘স্মি পর্ণা এতো ডেরারিং হরো না। এখন হাতে
‘স্মি হাতে ফল ফলো, নিজের কেরিয়ারটাকে
‘স্মি শেষ করলে?

শ্রীপর্ণা ওর দিকে চেয়েছিল, ভাগর
‘স্মি চোখের চাহনি মেলে, ভাতে ফটে
‘স্মি উঠেছিল খুশীর কলমল ভাব। তার শূন্য
‘স্মি রিক্তজীবন কি অপূর্ব সম্পদে সে পূর্ণ করে
‘স্মি নেবার আশা করে সে কসেছিল শ্রীপর্ণা।
‘স্মি—এই তো চেয়েছিলাম। তোমাকে আজও
‘স্মি কাছে পাবো, দু’ জনে ইউনিয়নের কাজেই
‘স্মি মাসব্যো নতুন করে, সামান্য কিছু হারিয়ে
‘স্মি অনেক কিছু পেলাম প্রদোষ।

জল পড়ছে সাওয়ার থেকে। শ্রীপর্ণার
‘স্মি দেহটা ওই হিম জলকণাগুলোকে শুষে নিয়ে
‘স্মি বেন পূর্ণতর হয়ে উঠতে চায়। সেই
‘স্মি শামশ্য খুশী ধাকা মেয়েটি বাড়ির এই
‘স্মি পরিবেশে আবার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা

করে, অপিসের কচকাচ এখানে নেই। এখানে
‘স্মি সে নারী আর প্রদোষ পূর্ণতর। স্বামী-স্ত্রী।

তোয়ালে দিয়ে মসৃণ ঘাড়-গলা-কাঁধ
‘স্মি মৃদুতে বের হল শ্রীপর্ণা, প্রদোষ অন্যদিকে
‘স্মি চেয়ে থাকতো ওর এই সন্ধ্যা স্নান সারা
‘স্মি চেহারার জিক, কায়ম-রাগে যমকে উঠতো
‘স্মি শ্রীপর্ণা।—এম-এ। অসভ্য কোথাকার।

হাসতো প্রদোষ, আজ সেই প্রদোষ
‘স্মি কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। শ্রীপর্ণা এগিয়ে
‘স্মি এসে গায়ের সদা-মাথা ল্যাভেডার সাবানের
‘স্মি মিষ্টি গন্ধ ছাড়িয়ে বলে এখনও রাগ পড়ে নি?
‘স্মি উঃ! কই—কামি, বাগার দিয়ে যা। বুদ্ধলে?
‘স্মি কি খিদেই না পেয়েছে?

শ্রীপর্ণার মধোমুখি চাপা পড়া সেই
‘স্মি আলগা স্রীটুকু ওঠে, এই শ্রীপর্ণাকে এখন
‘স্মি সব সময় খুঁজে পায় না প্রদোষ। ওর মনে
‘স্মি এখন অনেক প্রশ্ন—আর সেইগুলোর কথা
‘স্মি প্রদোষকেও বলে না, আজ প্রদোষ ওকে
‘স্মি নিষেধ করেছিল ও যেন এই শোভাযাত্রায়
‘স্মি না যায়, সুহাসদের সে দেখতে পারে না।
‘স্মি আর দেখেছে ওই শ্রীপর্ণা ওদের সঙ্গেই
‘স্মি মিশবে। সৈদিন তো বাইরে ওদের কোন
‘স্মি কারখানায় মিটিং করতে গিয়ে একটা দিন-
‘স্মি রাত কাটিয়ে এসে।

প্রদোষ সৈদিনও বলেছিল বাই-ই কর
‘স্মি এটা ছলো না তুমি বাড়ির বো। শূন্য
‘স্মি চাকর্যই করো না—কতকগুলো সামাজিক
‘স্মি নীতি-কানুনও মানবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে
‘স্মি ঘর বেঁধেছে।

শ্রীপর্ণা সৈদিন দপ্তর করে জড়ল
‘স্মি উঠেছিল মনে? কি বলতে চাও তুমি?
‘স্মি প্রদোষ সৈদিন ওর চোখে দেখেছিল কি তাঁর
‘স্মি জ্বালা। চূপ করে গেছিল, প্রদোষ হয়তো
‘স্মি বলতে চেয়েছিল অনেক কিছুই, ইউনিয়ন
‘স্মি সেও করেছে।

আজ প্রদোষ ওদের অনেকের মাথার
‘স্মি ওপর উঠেছে নিজের কাজ দেখিয়ে। অপিসে
‘স্মি তার কাজেরও সুনাম আছে। কাজে সে
‘স্মি ফাঁকি দেয় না, আর তার জন্যই সে গ্রেডে
‘স্মি উঠেছে। এবার জমিয়ার অফিসার হবে।
‘স্মি একটা ছোট মরিস মাইনার গাড়ি দেখেছে
‘স্মি সেটাও কিনবে। ট্রেনে-বাসে যাতায়াত করা
‘স্মি এক সমস্যা হয়ে উঠেছে, সেটা মিটেবে, আর
‘স্মি গাড়ি কেনা তার অমিত দিনের স্বপ্ন, শ্রীপর্ণা
‘স্মি শূন্য হবে।

কিন্তু শ্রীপর্ণার এই সংসারের দিকে মন
‘স্মি নেই। যে আগ্রহ আর ভালবাসা নিয়ে তারা
‘স্মি ঘর বেঁধেছিল—শ্রীপর্ণার মনে যে উতাপটুকু
‘স্মি ছিল—তা যেন নিভে গেছে, আজ আবার
‘স্মি সে বাইরে তার উদ্দাম জীবনের কি সাড়া
‘স্মি খুঁজে পেয়েছে, তাই এই ঘর—প্রদোষ-এর
‘স্মি দিকেও তার কোন আগ্রহ নেই, উতাপও
‘স্মি জ্বাড়ে এসেছে।

—কি ভাবছে এতো! শ্রীপর্ণা ওর
‘স্মি দিকে চাইল।

প্রদোষ কথাটা বলতে চেয়েছে, কিন্তু
‘স্মি কোথায় তার যেথেকে, চোখের সামনে সেই

নিভৃত মৃদুতগুলো মেগে ওঠে। শ্রীপর্ণা
‘স্মি এগিয়ে চলেছে শূন্য হাত-ভুলে মেয়েদের মধ্যে
‘স্মি সেই-ই লীডার, সুহাস-বন্দু-আগ-অনেকেই
‘স্মি ওর সঙ্গে হেসে কথা বলেছে।

.....প্রদোষের মনে আজ নতুন স্বপ্ন।
‘স্মি এতদিন ইউনিয়ন করেছ, তাং আমলেই
‘স্মি সেবার শ্রিতীয় ধর্মঘটকে এড়াতে পেরেছিল
‘স্মি কোম্পানী, অসকে বলে প্রদোষকে ওরা কিনে
‘স্মি নিয়েছিল, শ্রীপর্ণার মনেও তাং ওই কথাটা
‘স্মি ফুটে উঠেছিল ঘুসার জ্বালা, ও বলেছিল
‘স্মি—তোমার লক্ষ্য করে না, এইসব কাজ
‘স্মি করবে।

প্রদোষ বলেছিল—এ ব্যাপার মাথা
‘স্মি মলিওনা পর্ণা, এ সময় স্টাইক করলে
‘স্মি ম্যানেজমেন্ট আমাদের ক্রাশ কবে দেবে,
‘স্মি সম্মানের সঙ্গে পিছ হটে আসাও একটা
‘স্মি রণকৌশল।

শ্রীপর্ণা সেন ওর কথাগুলো বিশ্বাস
‘স্মি করে নি, সুহাস-স্বপ্নের দলও, হয়তো তাদের
‘স্মি দ্বাবী কিছুটা মিটেছিলো কিন্তু ওরা
‘স্মি প্রদোষকে সহ্য করতে পারে নি ওবা বলে
‘স্মি কাওগার্ড। এক্ষেত্রে!

প্রদোষ পর্ণার মূখেও সেই কথারই
‘স্মি প্রতিশ্রুতি শুনিয়েছিল। তাই বলেছিল প্রদোষ
‘স্মি অপিসের ব্যাপার, অপিসে ইউনিয়ন রেখেই
‘স্মি আমরা ঘরে ফিরবো পর্ণা।

শ্রীপর্ণা বলেছিল একটাকে বাদ দিয়ে
‘স্মি অন্যটা নয়। আমি তোমাকে দেখেছিলাম
‘স্মি অনেক-সিনসিয়ার, তাই ভালো লেগেছিল।
‘স্মি দু’জনে ঘর বাঁধতে রাজী হয়েছিলাম—প্রদোষ
‘স্মি ওর দিকে চেয়ে থাকে। সূর্যের কস
‘স্মি মূখখানা ওর কি উত্তেজনা লাল হয়ে
‘স্মি উঠেছে। মনে হয় এ তার হিরো ওয়ারশিপই।
‘স্মি ভালোবাসা অন্য জিনিষ বা ওদের মত
‘স্মি আত্মসচেতন মেয়েসব মনে জন্মায় না।
‘স্মি নিজের মনগড়া আবঙ্গ তাকে ওরা খতম
‘স্মি করে দেবে।

প্রদোষের মনে হয় সেও ওকে দেখেছিল
‘স্মি অন্য রূপে। আজ সেই বিশ্বাসের মতো
‘স্মি ফাটল ধরেছে, আর মতবাদের সেই ফাটলটা
‘স্মি অদৃশ্য পক্ষে অপিস-কর্মজীবনের সীমা পায়
‘স্মি হয়ে ওদের এই নিভৃত স্বপ্ননীড়ে এসে
‘স্মি পৌঁচেছে। আর সেটা বেড়ে চলেছে।

রাত হয়ে গেছে। শহরের এই অঞ্চলে
‘স্মি এখনও গ্রাম গ্রাম ভাবটা মুছে যায় নি।
‘স্মি এমিক ওদিকে দু’চাক্রে বাগান গাছ-গাছালি
‘স্মি রয়েছে গেছে। ওপাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটা
‘স্মি খাল—তার ধারে কলাগাছগুলোয় অবিার
‘স্মি জ্বালা, বাঁশবনে হাওয়া বর, হাওয়ার
‘স্মি হাছাকার ওঠে।

শ্রীপর্ণার ঘুম আসে নি। ওর সারা
‘স্মি মনে কি কদম্বা। মনে হয় কোথায় যেন
‘স্মি ঠকে গেছে সে। ঘর বেঁধেছিল—কিন্তু এ
‘স্মি ঘরও শূন্য হয়ে গেছে। দুটি মন—একসঙ্গে
‘স্মি বাঁধা পড়েছিল তবু আজ দু’দিকে তারা
‘স্মি চলেছে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে।

শ্রীপর্ণা চেয়েছে অন্য সমাজ সেখানে মাথোলের নীচতা প্রত্যক্ষ থাকবে না। সেদিন ওই প্রদোষের চোখে ওর দৃষ্ট ভাব্যর দেখেছিল সেই পথের শপথ।

আজ সে কেমন স্বার্থপর আর লোভী হয়ে উঠেছে। শ্রীপর্ণাকে শাসন করেছে। তার সম্বন্ধে অভিযোগ করেছে, অনেক সময় নিস্তী ইংগিত করেছে, ওকে সে এই গম্ভীর মতো নিজের দখলে আবদ্ধ করে রাখতে চায় কি সম্পদেব দখল জারি করার মতই চেষ্টা নিয়ে। সকলের সামনে আজ প্রদোষের লোভী সঙ্কটের প্রকাশ ঘটেছে, এটাকেই সে ঘৃণা করে। তার দেহ-মন কুংকড় ওঠে ওর সামিগো।

প্রদোষ বলে গাড়ির কথা বলছিলাম— শ্রীপর্ণা দেখেছে ওর লোভটা ধাপে ধাপে কোষায় উঠছে, আবছা অন্ধকারে সেই লোভী স্বার্থপর মানুষ্টা আজ হাজার সহকর্মীকে তার স্মৃতিও অস্বস্তি করে নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে।

প্রদোষ বলে—সামনের মাসেই জুনিয়ার অফিসাব হবে যাবো। ওখান থেকে বদলি হয়ে যাবো, অবশ্য আমিই কথাটা বলোচ্ছি। যেখানে ছিলাম পেটি ব্রাক সে স্থানে অন্য কালিগ্রাও রয়েছে। কেরানী হয়ে সেখানে অফিসার হয়ে না থাকাই ভালো। ওরা এডভান্সটেক্স নিতে চাইবে, গাড়িটা তাই বলে দোষ ভাবছি।

শ্রীপর্ণা ওর দিকে চেয়ে থাকে, হাজার মানুষ শব্দ বাটার লড়াই নিয়ে বাস্তব, তাদের ভবিষ্যৎ কি অন্ধকারে ঢাকা জানে না, ভবু ওরা কঠিন হয়ে উঠেছে। আর তাদের বণ্ডনার ওপর দিয়ে ওই লোকটা পা দিয়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠবে।

একদিন ওর জন্যই কোম্পানী কটা অন্যান্য মত এদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল, আজ তারা সেই সর্বের বন্দনা ভোগ করছে আর প্রদোষ গাড়ি-ভিলা, ভালো চাকরী নিশ্চিত জীবনের স্বপ্ন দেখছে।

শ্রীপর্ণা জানে ওই ধর্মঘটের ফলে কতো লোক মাইনে পাবে না, ওদের দিন অজল হয়ে উঠবে, শূন্য উপবাসী সম্মানদের মন, তাদের চাহনি ওদের বুকে কড় তুলবে— ভবু তাবা এগিয়ে এসেছে অন্যায়ের-অভ্যা-চারের প্রতিকারের দাবী নিয়ে।

শ্রীপর্ণা বলে—তুমি প্রমোশন নেবে তাহলে?

হাসে প্রদোষ—কেন নেবে না। আমি ক্ষম দেখিবে তার দাম চেয়েছি। তোমাকেও বলবো পর্ণা, তুমি ওইভাবে রাস্তার ওদের সঙ্গে যেব হয়ে দল পাকাবে বিয়িং এ্যান অফিসার্স ওয়াইফ, এটা কর্তৃপক্ষ ভালো চোখে দেখবে না। তাই বলছিলাম—তোমার যা দরকার তার থেকেও বেশীই পাবে, তাহলে এ সব করার দরকার কি?

শ্রীপর্ণা দপ করে জ্বলে ওঠে—অর্থ

ওদের দাবীলি করে কিছু ভিক্ষে নিয়ে ল্যাক্স লাড়তে হবে। পোষা কুস্তার মত।

—পর্ণা! প্রদোষ চটে উঠেছে। আজ তারও বেন খেঁচের সীমা পার হয়ে গেছে, দেখেছে—অমর-কিছুই। পর্ণার মনের অতলে একটা অতৃপ্তি আর লোভই রয়ে গেছে তাই সুহাসের সঙ্গে মেশে আর সেই নীচতাকে চাপবার জন্যই সে তার দেখার ওদের দরদে সেও দরদী, তাই সংগ্রামী সৈনিকের ভূমিকা নিয়েছে।

বলে ওঠে প্রদোষ—নিজের মনের নিলম্ব ইভারমিকেই প্রশ্রয় দেবার পথ হিসাবে নিয়েছো এটাকে। আর মুখে বলো—সংগ্রামী মতবাদের কথা। তোমার চোখে-মুখে সেই নিলম্ব লাগলার ছায়াটাকে আমিও দেখছি—এই ভণ্ডামীকে ঘৃণা করি।

শ্রীপর্ণা বিহানা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। রাগে অপমানে ওর দু' চোখ জ্বলছে, সুন্দর গালটা টসটেসে হয়ে উঠেছে, বেন ওখানে কঠিন হাতে আঘাত করেছে ওট লোকটা। বন্দনার-অপমানে বিহবল হয়ে পড়েছে শ্রীপর্ণা, তার মাথ-স্বপ্ন কৈমদিন উবে গেছে।

শ্রীপর্ণা বলে—তুমি ভীরা-কাপুরুষ-ইভর। তাই এইভাবে কথা বলতে এতটুকুও বাধে না?

—প্রদোষ ওকে দেখছে। এই নিশ্চরুণ আঘাত করে সে ওর প্রভুকে ফিরে পেরেছে। এইটুকুই তার কাছে পৌরুষের পরিচয়। তাই বলে সে।

—ঠিক কথাই বলেছি, সত্যি কথা। আর তাই জানাতে চাই—ওখানে মেশা তোমার চলবে না। দুটো পথের মধ্যে এই পথটাকেই আশা করি মেনে নেবে তুমি।

শ্রীপর্ণা ওকে দেখছে। লোভী একটা দামব, সহকর্মীদের ঠিকিয়েছে—তাদের বণ্ডিত করে নিজের ভাগ্য গড়ে তুলতে চায়, পেতে চায় প্রতিষ্ঠা-গাড়ি অর্থ; তাই সব কিছুতেই ও জানাতে চায় তার নিশ্চেষ্ট দাবী। শ্রীপর্ণাকেও সে সেই লোভের জগতে লালসার অন্ধকারে নিয়ে স্বেতে চায়।

নিজেকে শয়তানের কাছে বিক্রী করে দিতে হবে। ওর সব—কিছু, হারিয়ে যাবে এটা ভাবতেই পারে না শ্রীপর্ণা।

রাত হয়ে আসে। ওই বিজ্ঞানায় একদিন নিজেকে তুলে ধরেছিল শ্রীপর্ণা, একঘাটা ভাবতেও ঘৃণা বোধ হয় আজ। এ তার নিজের সমস্যা নয়। আজকের দিনের প্রশ্ন।

এখানে কোন আপোষ নেই। ঘর বাইরের সব আঘাত-সমস্যা নিয়ে আজ তাদের জীবন ভালবাসার বণ্টকুও সেই সমস্যার বন্দনার বিন্দু হয়ে গেছে, নিজস্ব সত্তা আজ সব স্বাভাবিক নিয়ে বাঁধতে চায়। তাই দুটো পথ তাদের সামনে। হয় মনের সেই সত্যবোধ-সচেতনাকে হত্যা করতে হবে—মেনে লিতে হবে সব অন্যান্যকে। তাকে সমর্পন করতে হবে। বিনিময়ে তারা পাবে সব স্বাভাবিক, অন্যদিকে

প্রতিবাদ-বন্দনা ভবু কোন আশা নিয়ে উদ্ভল একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা। বর্ষদিন মানুষ মানুষের পরিচয় নিয়ে বাঁচে পায়বে। এই প্রশ্নের মাঝে কোথাও আজ আপোষের অবকাশ নেই।

দুটোর একটা পথ তাদের বেছে নিতে হবে।

শ্রীপর্ণার চিরন্তন নারী মন রাতের এই নিদ্রা তারা জ্বলা অন্ধকারে ওই হু-হু-ধাতাসে কি ভাবছে।

প্রদোষকে সে ফেরাতে পারে নি। তার ভালবাসা প্রেমকে পায়ের তল মাড়িয়ে দিয়েছে ওই মানুষটা নতুন কি পাবার দুর্বীর আনন্দ, ঘর-স্বামী-ভালবাসা এ সবার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে সেই প্রতিষ্ঠার মোহ।

তবে আর এভাবে বাটার, দিন কাটানোর লাভ কি! শ্রীপর্ণার মন হয়, শূন্য মন তার শূন্যই রয়ে যাবে, ওই বণ্ডনাকে আত্মবিন শব্দ এই সিদ্ধির আর লোহার বন্ধনে বন্ড হয়ে সইতে হবে কোন ভালবাসার স্পর্শও থাকবে না সেই ক্ষুর, নিজের এই অপমৃত্যুটাকে তার স্বাধীন সত্তা কোনমতেই সমর্পণ করতে পারে না।

ভোর হয়ে আসছে, জমাট অন্ধকারের বুক আলো জাগে। ওই আলোয় সব কিছুর নিজস্ব রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে—গাছগুলো-বিল, বাঁশবন, ঘর-বাড়ি সবগুলোরই বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক আছে।

শ্রীপর্ণার কাছে এই স্বাভাবিক আজ নতুন রূপে দেখা দেয়।

প্রদোষ সকালে চারের টেবিলে এসে বসেছে, তার সাহেবী আশা এখন থেকেই শব্দ হয়ে গেছে। কেরানী আর নয় সে। গাড়ি-সাজানো ভিলা-বন-বাড়ি সবই হবে। কোনটা বাজছে। কোম্পানী থেকেই ওকে দিয়েছে।

—তুমি! একটু অর্থাৎ হয় প্রদোষ শ্রীপর্ণার পলা। সকায়েই সে বাড়ি থেকে চলে গেছে সে জেগে ওঠবাব আগেই!..... প্রদোষ কথাগুলো শুনছে।

এ বেন অন্য কোম একটি মেয়ে—যার সঙ্গে তাব কোনো সম্পর্ক নেই। যদিও বা হিঙ্গ কবে তা শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীপর্ণা জানিয়েছে ওর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি সে, প্রদোষের প্রমোশন পাকা হোক। ওব সেই মতকে মানতে পারে নি শ্রীপর্ণা তাই মিথো ঘরের বাঁধনে বন্দী না থেকে সে ক্ষেত্রের হোটেলে চলে এসেছে।

শ্রীপর্ণা জানায়—দেখলাম আমার চেঁষও ওই প্রমোশন আর মানুষকে বণ্ডনা করার অধিকারটাকেই বড় করে দেখেছো, তাই সবে এলাম।

প্রদোষ কোনটা নামিয়ে চপ কবে কি কি ভাবছে।

জ্বলি! জ্বল করেছে শ্রীপর্ণা। সব কিছু

আমার কথাগুলি যেন ভারতী
হৃদয় কানে গেল না। কি ইচ্ছা করেই
তিনি কানে তুললেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি
হঠাৎ বললেন, 'এই জায়গাটা সুইসাইড
স্পট হিসাবে আইডিয়াল কী বল?'

আমি একটু চমকে উঠলাম, 'এমন
সুন্দর রাতে, এমন সুন্দর জায়গায় এসে
আপনার আত্মহত্যা করার কথা মনে হল
কী হবে? আপনি আত্মহত্যা করবেন
কোন দৃশ্যে?'

ভারতী বউদি বললেন, 'কী আশ্চর্য।
আমি কেন করতে যাব? আমি আমার
উপন্যাসের নায়িকার কথা ভাবছি। সে
যদি আব কোন পথ খুঁজে না পায়
আত্মহত্যার পথ বেছে নিতেও পারে।
তাছাড়া মানুষ কি শব্দে দুঃখেই মরে,
সুখেও মরতে চায়। এমন চাঁদের আলো,

মরি যদি সেও ভালো। শোন নি গানটা?'
'শুনোছি। সে তো কাব্যের মতো।'

'আমার নায়িকার বৈশিষ্ট্যও তাই।
কাব্যের মতো। বেঁচে থেকেও অনেক
অধিকার আমাদের হাতে থাকে না। কিন্তু
মরবার স্বাধীনতা যদি থাকে।'

'আপনি' নিজে দেখি বীররাগনা।
আপনার নায়িকা মরবার কথা ভাববে
কেন? তার কত বয়স?'

'ভরা যৌবন। লোকে কি বুড়ো বয়সে
মরবার কথা ভাবে? বুড়ো বয়সে মৃত্যুকে
ভয় করে। আমার শব্দরকে দেখ না।
হার্টার্ডিজের রোগী। একবার শ্রোত্র
হয়ে গেছে। কত সাবধানে থাকতে হয়।
তবুও ঠিক একশ বছর বেঁচে থাকবার সাধ।
যৌবনই শব্দে মৃত্যুকে নিয়ে খেলতে পারে।
তার মানেই জীবন নিয়ে খেলা।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম,

'আপনি যদি আপনার উপন্যাসের প্রট্টা
আমাকে বলেন, আপনার নায়িকার
অপমৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ আছে
কি না আমি ভেবে বলতে পারি।'

'বললে তুমি চুরি করে নেবে না তো?'
কি আর কাউকে বন্ধে দেবে না তে?'

'না না আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ভারতী বউদি কী যেন একটু
ভাবলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,
'আমার উপন্যাস একটা বড় উপন্যাস
হবে। আজকাল শুনছি বড় উপন্যাসেরই
চাহিদা বেশি। তাতে অনেক চরিত্র অনেক
উপাখ্যান থাকবে। কোনটা সে মূল
আখ্যান তা আমি এখনো ভেবে ঠিক
করতে পারি নি। তোমাকে একটি
উপাখ্যানের কথা শোনাই। ধর বড়-
লোকেব বাড়ির একটি বউ। তাব বাপের
বাড়ির অবস্থা তত ভালো নয়। মধ্যবিত্ত
গৃহস্থ। সে বড়লোকের ঘরে পড়ল।
শব্দে রূপের জোবে নয়, কিছ, কিছু গুণ-
যোগ্যতাও তার আছে।'

'তারপর?'

'সুখাম করে বিয়ে হল। বাস বিয়ে
গেল। শব্দরাগি গেল। তারপর আরও
অনেক দিন-রাগি কেটে গেল। সে দেখল
স্বামী তাকে মোটেই আদর-আহ্বাদ করে
না। বাপের বাড়িতে ফিরে এলে তার
বন্ধুরা, তার খুড়তুতো জেঠতুতো
বোনরা তাকে ঘিরে ধরল। কীরে রাতে
কি সব হয়েছে-টেরেছে বল। শব্দিনি গোপন
কথা। কিন্তু গোপন কথা শোনাতে কি-
মেরোটিব কোন গোপন কথা নেই। এ কথা
বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবার
মত কথাও নয়। তাই সে কিছু না পেয়েও
বলল পেয়েছি। সব পেয়েছি। বন্ধুদের
কাছে সে হাব মানবে কেন? বারা তাকে
ঈর্ষ্যা করে তাদের কাছে সে কেন
করুণার পাত্রী হতে যাবে? ক্রমে ক্রমে এই
মিথ্যাটাকেই সে সত্য করে তুলল। বাপ-
মা আত্মীয়স্বজন কাউকেই সে কিছু
বুঝাতে দিল না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আজকালকার
লোপাড়া জানা মেয়ে কি এতই বোকা
হয়? স্বামীর সঙ্গে সে কি একটা বোকা-
পড়া করে নিতে পারল না?'

'কী বোকাপড়া করবে? স্বামীর
ব্যবহার তার কাছে একটা হে-য়ালিব মত।
এক স্বামীর মনের রোগ না শরীরের
ব্যাপি মেরোটি বন্ধুতে পাবে না। স্বামী
তাকে প্রথম রাতেই বলিছিল এ বিয়েতে
স্তাব মত ছিল না। বাবার জেঠম কোন
একটা দুর্বল মনুষ্যের সে রাজি হয়ে
গেছে। এখন সে ভুলটা শব্দে নিতে চায়।
তার জন্যে স্বামীকে সে এড়িয়ে যেত,
গরজটা যেন মেঘেরিটাই। সেই সেপারে-
শনের জন্যে অ্যাপ্রাই করবে, পরে
ডিভোর্স কেস করবে। একজন ভুল



কী বোকাপড়া করবে?

করেছে তার খেসারত শব্দ মেয়েটিকেই দিতে হবে।

আমি বললাম, দিক না খেসারত। তবু অঙ্গের ওপর দিয়ে যাক। নইলে মারা জীবনটাই যে তার নষ্ট হবে।

‘মেয়েটি সে কথাও মাঝে মাঝে ভাবে। কিন্তু তবু পারে না।’

‘কেন পারে না?’

‘কেন যে পারে না কে বলবে। হয়তো সংস্কার, লোকসম্মতি, জুরো মর্শ্যাবোধ, মেয়েমানুষ যখন ভালো খাওয়া পরা, গরনাগাটির লোভের কথাও ভেবে নিতে পার। যে স্বামীর কাছে থেকে কিছুই পায় নি, যে স্বামীকে সে চুড়ান্তভাবে ঘৃণা করে, প্রতিরাগে যার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়, তাকেও সে বোধহয় একটু একটু ভালোবাসে। ঘুমোলে সেই স্বামীর মূখ অবশ্য ছেলেমানুষের মত দেখায়। মেয়েটির পিঠাপিঠি যে ভাইটি অকালে মারা গেছে—সেই ভাইটির মূখ তার মনে পড়ে। সেও তার দাঁড়ির ওপর কম উপপাত, কম অত্যাচার করে নি। মেয়েটি ভাবে একজীবন তারা না হয় ভাইবোন হয়েই রইল।’

আমি একটুকাল চুপ করে থেকে বললাম, ‘আপনার এ গল্প এ যুগে অচল। রক্ষণশীল বাড়ির বউ হয়ে আপনি আরও রক্ষণশীল লেখিকা হয়েছেন। তার চেয়ে ওই বস্তুতা মেয়েটিকে বের করে নিয়ে যান বাড়ির বাইরে। সে এই মিথ্যে বিয়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলুক। আবার বিয়ে করুক, বিয়ে যদি নাই হয় বিয়ের বিকল্প কিছু করুক। স্বামী সন্তান নিয়ে সুখী হোক।’

ভারতী বউদি একটু হাসলেন, ‘সে তো রিফর্মের কাজ। তোমার দাদা যদি এ নডেল লিখত সে হয়তো এইভাবেই শেষ করত। সে অবশ্য রিফর্মের নামে নাক কঁচকায়। রিভলিউশন ছাড়া তার মূখে কথা নেই। কিন্তু আমার তো মনে হয় রিফর্ম সব বিপ্লবের মধ্যেই আছে। অন্তত আছে। তোমরা সবাই রিফর্মের ভক্ত। কিন্তু আমি ফর্মের জন্যে প্রাণ দিতে পারি।’

একটু চুপ করে থেকে বললাম, আপনার নারিকার কথা বলুন। সেই নারিকা কি এখনো জার্জিন?’ ভারতী বউদি দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি চকচক করে উঠল। তিনি অস্তুত একটু হাসলেন, ‘সে কথা তোমাকে বলে কী হবে?’

সিঁদুরে সিঁদুরের রেখা। কপালে সিঁদুরের টিপ। হাতে শাখ চর্চিত।

মেঘমল্ল চাঁদের আলোয় আমি ভারতী বউদির দিকে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরেই মজ্জা আমাদের ডাকতে এল।

সঞ্জীবদা, শিগগির এসো। দাদারা এসে গেছে।

ছাদ থেকে তিনতলায় নেমে এসে দেখলাম—তিন দাদার মধ্যে দুই দাদা এসেছেন কিন্তু নির্মলদার এখনো দেখা নেই।

অমলদা বেশ স্বাধাযান লম্বা ফর্সা চেহারা। শ্যামলদা সেই তুলনায় একটু রোগা আর কালো। দুজনেরই পরনে সার্ট-ট্রাউজার্স। অমলদাকে মেসোমশাইর মত খানিকটা রাসভারি বলে মনে হয়। শ্যামলদার চেহারার মধ্যে তীক্ষ্ণতা বেশি।

অমলদা বললেন, ‘এই যে সঞ্জীব তুই আজ আসবি শুনোছিলাম। ভেবেছিলাম একটু আগে আগেই ফিরবি। কিন্তু ফিরতে ফিরতে সেই দেয়। নানা কামেলা।’

হেসে বললাম, ‘কামেলা তো হবেই। তুমি নাকি নতুন কারখানা খুলেছ অমলদা?’

‘তুই কার কাছে শুনলি?’

‘শুনতে পাই। তুমি আর যুবরাজ থাকতে রাজি নও। নিজেই এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছ।’

অমলদা হেসে বললেন, ‘সাম্রাজ্য তো ভারি। বাবার কারখানার তুলনায় সে কিছুই নয়। মধুপকের বাড়ি। তবু সেখানে আমি নিজে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছি। বেশ আছি। চিরকাল বাপের জুনিয়রগিরি করা বড় শক্তিরে ভাই। তাকে তা বদ্বতে হল না।’

আমার বাবা অঙ্গ বয়সে মারা গেছেন। পিতৃমৃত আমার কাছে বড়ই মধুর। তাঁর কাছে কোন দিন কোন কড়া শাসন পেরেছি বলে মনে পড়ে না। মার ঘরের দেয়ালে টঙানো ফটোতে যেমন দেখি বাবার প্রকাণ্ড সৌম্য সন্দর প্রসন্ন স্নেহশীল একটি মূর্তিই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁর কি অন্য মূর্তিও ছিল? কিংবা বাবা যদি আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাঁর সঙ্গেও কি আমার এই রকম বিরোধ বাধত? রুচিতে প্রবৃত্তিতে শিক্ষা-দীক্ষার মেসোমশাইর সঙ্গে তাঁর ছেলেদের যে বিরোধের কথা শুনি আমার আর বাবার মধ্যেও কি সেই সম্পর্কই গড়ে উঠত?

শ্যামলদা হেসে বললেন, ‘দাদা, তোমার অস্তত বাবার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ক্যাপিটাল তুমি বাবার কাছ থেকে নিয়েছ। কিছুটা জ্ঞানিয়ে কিছুটা না জ্ঞানিয়ে। কিছুটা হয় মা আর বউদির মধ্যস্থতায়। তারপর রস্যা বলে তুমি যে নতুন প্রোডাক্ট বার করেছ বাজারে তা বেশ চালুও হয়েছে তাতে তোমার পরী প্রেমের নিদর্শন আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহটা তোমার ওরিজিনালিটিতে। বাবার দৃষ্টি তুমি তাঁর ফর্মলাই চর্চা করে

একটু এঁদিক ওঁদিক করে নিজের নামে চালাচ্ছ।’

অমলদা চটে উঠে বললেন, ‘মিথ্যে কথা। বাবা যদি তা বলে থাকেন মিথ্যে কথা বলেছেন।’

বলতে বলতে অমলদা নিজের ঘরে গিয়ে চুকলেন।

শ্যামলদা তাঁর দিকে তাকিয়ে মূখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

বললাম, ‘হাসছ যে শ্যামলদা?’

‘দাদাকে চিটিয়ে দিতে বেশ লাগ।

ও অঙ্গপেতেই এত চটে যায়। অন্যান্য ব্যাপারে দাদা হাসিঠাট্টা বেশ বোঝে, করতও পারে। কিন্তু নিজের কারখানার ব্যাপারে দারুণ সিরিয়াস। ঠিক বাবার একাটি অবিকল প্রোটোটাইপ।’

হেসে বললাম, ‘তুমি প্রোটোটাইপ নও শ্যামলদা?’

শ্যামলদার মূখ এবার একটু গম্ভীর হল।

তিনি বললেন, ‘না। আমি মোটেই বাবার মত না। কোন দিক থেকেই না। এমন কি চেহারায় পর্যন্ত মিলের চেয়ে অমিল বেশি।’

আমি মনে মনে হাসলাম। অমলদার আর দোষ কি। শ্যামলদারও কি ওরিজিন্যাল হবার গর্ব কম?

শ্যামলদা বললেন, ‘বাবার সঙ্গে আমার যদি মতের পথের মিল থাকত তাহলে বাবা আমাকে এত ভয় করতেন না।’

আমি একটু কৌতুক বোধ করে বললাম, ‘মেসোমশাই তোমাকে ভয় করেন বুঝি?’

শ্যামলদা একটু হাসলেন ‘বাবা আমাদের তিনজনকেই ভয় করেন। দাদাকে ভয়, দাদা বাবার কমপিটিটর হবে। বাবার সর্বস্ব আত্মস্যাং করে বাবাকে অস্পীকার করবে। নির্মলকে ভয় ওর হাতে একাদনের জন্যেও যদি এই কারখানার ভার দেওয়া যায় ও জলপ্রোতে সব ভাসিয়ে দেবে।’

‘জলপ্রোতে!’

‘বুঝিস নি ব্যাপারটা?’

হেসে বললাম, ‘বুঝেছি।’

‘বাবা সেইজন্যে কারখানার কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ ওকে দেন নি। অথচ টাকাটাও মোটাই পাচ্ছে।’

বললাম, ‘আর তোমাকে ভয় করেন কী জন্যে?’

শ্যামলদা বললেন, ‘আমারটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। বাবা ভাবেন আমি যে কোন মূহুর্তে লেবার ট্রাবল ঘটতে পারি। বোমা মেরে সব উড়িয়ে দিতে পারি।’

বললাম, ‘তুমি তা পার না, শ্যামলদা। তাছাড়া মেসোমশাইকে অত বোকা বলে মনে হয় না।’

শ্যামলদা বললেন, ‘খুব যে মেসো-মশাইর ভক্ত হয়ে উঠেছিস। বাবা বোকা

হবেন কেন। তিনি বেশ বুদ্ধিমান! কিন্তু
তাই ঠেঙেব ব্যাপারে বুদ্ধিমান। ঠেঙের
ধাইরে তাঁব পাকা বুদ্ধির পরিচয়
পাই নি। যতই পাকা মাথা হোক।
তা ছাড়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও নানা রকম
ইন্ডিয়োসিনক্রিসি থাকে। তাঁরও আছে।
সেইগুলি দিনের পর দিন বাড়ছে।
সেনিসিটির লক্ষণ এসে গেছে।

রজা বউদি এসে তাড়া দিলেন,
ঠাকুরপো, রাত প্রায় এগারটা। এবার
তোমরা খেয়ে-টেয়ে নাও। তারপর ডক
কোবো।

আমাদের জেনারেশনে ঠাকুরপো
ঠাকুরসি সম্বোধনগুলি প্রায় অচল হয়ে
গেছে। আমার নিজের বউদি আমাকে
নাম ধবে ডাকেন। কিন্তু মেসোমশাই
কিছু কিছু পুরোন বস্তুকে বেশ বাঁচিয়ে
বোঝেছেন। রাধাগোবিন্দের মন্দিরের মত
বহু পুরোন রীতিনীতি, আচার-নিয়ম
এ বাড়িতে বক্ষিত হয়েছে। আমার হাল
আমাদের দাদারাও সেসব ব্যাপারে হাত
দেন নি। ধনীরাই ঐতিহ্যকে আশ্রয় দিয়ে
থাকেন।

বউদির কথার জবাবে শ্যামলদা
বললেন, 'হ্যাঁ ষাই। হাত মুখ ধুয়ে
একটুগুণ আসছি বউদি। নিম্ন
এসেছে?'

রজা বউদি বললেন, 'না। সে
এখনো ফেরেনি। মনে হচ্ছে তার
আরো রাত হবে। নিম্নলৈর জন্যে
আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে?
তোমরা খেয়ে নাও। বেচারা সঞ্জীব
সেই সন্ধ্যা থেকে বসে আছে।'

শ্যামলদা আমার দিকে তাকিয়ে
মুদ্র হাসলেন, 'বেচারা সঞ্জীব!
বেচারা সঞ্জীবের সময়টা নিতান্ত
খারাপ চার্টেন বলে মনে হচ্ছে।'

তারপর তিনি জামাকাপড় ছেড়ে
ঘাঘরুমে ঢুকলেন।

দোতলায় ডাইনিং রুম। টেবিল
চেয়ারে খাবার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা
আমাদের বাড়িতেও আছে। তবে এত
বড় টেবিল এত দামি দামি চেয়ার
আমাদের নেই। মেসোমশাই অবশ্য
ঘাটিতে আসন পেতে খেতেই বেশি
ভালোবাসেন। একটি ঘরে সেরকম
ব্যবস্থাও রয়েছে। মেসোমশাই নিজের
বন্ধুদের নিয়ে সে ঘরে বান। কি
জামাইরা এলে তাদের পাশে বসিয়ে
গল্প করতে করতে খেতে ভালোবাসেন
মেসোমশাই। মাসীমা পরিবেশন করেন।

অজ্ঞও এত বড় টেবিলে অমলদা,
শ্যামলদা আর আমি খেতে বসলাম।
চার পাঁচখানা চেয়ার খালি পড়ে রইল।
বউদিরা সবাই উপস্থিত। কিন্তু
কেউ খেতে বসছেন না।

আমি বললাম, 'কী ব্যাপার।
আপনারা বসে পড়ুন।'

রজা বউদি বললেন, 'আমরা একটু
পরে বসব। দেখি নিম্নলৈ আসে নাকি।'

শ্যামলদা বললেন, 'নিম্নলৈর ভাগ্য
ভালো। ওর জন্যে সবাই অপেক্ষা
করে। তোমরা অন্তত দু' একজন
সঞ্জীবের সঙ্গে বসতে পার। ওকে
কম্পানি দেওয়া উচিত।'

রজা বউদি সবাইর মুখপাত্রী হয়ে
বললেন, 'আমরা অনেকক্ষণ কম্পানি
দিয়েছি। এবার তোমরা দাও।'

মঞ্জুলা বলল, 'আমার ক্ষিদে
পেয়েছে। আমি বসে ষাই।'

সে এসে আমার পাশের চেয়ারে
বসল।

আমি বললাম, 'তুইই একমাত্র ভদ্র-
মহিলা।

ভাল তরকারি মাছ মাংস অনেক-
গুলি পদ রান্না হয়েছে।

আমি বললাম, 'এ যে এলাহি
কান্ড। আচ্ছ কারো বার্থ ডে না ম্যারেজ
অ্যানিভারসারি।'

অমলদা বললেন, 'ও সব কিছু
না।'

শ্যামলদা বললেন, 'তুই তো
কালে ভয়ে আসিস। ধরে নে তোর
আবির্ভাব বার্ষিকী।'

ভারতী বউদি বললেন, 'এর মধ্যে
একটা পদ অর্চনাকে দিয়ে রাখিয়েছি।
বলতে হবে কোনটা তোমার এক্স
সহপাঠিনীর রান্না। বৃদ্ধ জিভের
কিরকম তাক।'

হেসে বললাম, 'বলতে পারব না
বউদি। আমাদের ক্লাসে রান্না খাওয়ার
পাট ছিল না।'

অমলদা সবচেয়ে জোরে হেসে
উঠলেন। তাঁর হাসি ধামলে অর্চনা
স্মিতমুখে মৃদুস্বরে বলল, 'অত খোঁটা
দিচ্ছ কেন মেজদি। সবাই জানে আমি
তোমর ভালো রাখতে জানিনে।'

মাসীমা একবার এসে দেখে
গেলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন,
'কত ভালো লাগছে দেখতে। মাঝে মাঝে
যদি আসিস, থাকিস এসে দু' একদিন
কত আনন্দ হয়।'

বললাম, 'বউদিরা যা লোভ লাগিয়ে
দিলেন আসতেই হবে মাসীমা।'

শ্যামলদা একটু হেসে আড়চোখে
আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, 'শ্যামলদা, তুমি
কিছু বলবে?'

শ্যামলদা বললেন, 'হ্যাঁ বলব।
আমাদের কারখানার কথা তুই যেন কী
বলিছিলি।'

বুদ্ধিতে পারলাম, কথাটা শ্যামলদা
ঘুরিয়ে দিলেন।

রজা বউদি বললেন, 'কারখানার
কথা থাক ঠাকুরপো। তুমি আর নিম্নলৈ

কারখানার জন্যে কত কাজ কর তা
সবাই জানে।'

শ্যামলদা একটু হেসে বললেন,
'আজকাল দাদাও আমাদের একমালি
কারখানার জন্যে বেশ কিছু করার
সময় পায় না বউদি। সে তার নিজের
কারখানার জন্যেই খাটে। তাছাড়া তোমরা
তো সন্তোষপুত্রের আলাদা বাড়ি করে
উঠে যাচ্ছ। তখন একেবারেই কোন
যোগাযোগ রাখবে না। এই সঞ্জীবদের
মত অবস্থা হবে।'

শ্যামলদা হাসতে হাসতেই কথাটা
বললেন। কিন্তু অভিযোগের সূত্রটা
প্রচ্ছন্ন রইল না।

রজা বউদি বললেন, 'কী করব ভাই,
আমাদের তো দিনরাত শৃঙ্খল পাটি
করলে হবে না, আমাদের খেতে খেতে
হবে।'

শ্যামলদা হেসে বললেন, 'মানে
খাটিয়ে খেতে হবে।'

অমলদা গম্ভীরভাবে খেয়ে যাচ্ছেন।
নিশ্চয়ই আলোচনাটা তাঁর মনঃপুত
নয়। খাওয়ার টেবিলে এ আলোচনা
আমার কাছেও মনঃরোচক বলে মনে
হচ্ছিল না।

আমি তাই প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়ার
জন্যে বললাম, 'এই আনারসের চার্টেনটা
বোঝায় অর্চনার নিজের হাতের না,
মেজবউদি?'

ঠিক সেই মুহূর্তে মেসোমশাই
খাবার ঘরের কপাটের সামনে দাঁড়ালেন।

'এই যে তোমরা বৃদ্ধি সব খাচ্ছ?'

আমি তাঁর দিকে না তাকিয়ে
পরম মনোযোগে চার্টেনর স্বাদ গ্রহণ
করতে লাগলাম।

মেসোমশাই আমাকে কিছু বললেন
না।

অমলদা শ্যামলদাকে লক্ষ্য করে
বললেন, 'তোমরা সব খাচ্ছ, নিম্ন
কোথায়?'

আমি এবার নিঃশব্দে মেসোমশাইর
দিকে তাকালাম। তাঁর চোখ শৃঙ্খল ভাব
দেখে মনে হল আমার অনধিকার চর্চা
তাঁর কানে যায় নি।

অমলদা বললেন, 'নিম্ন এখনো
ফেরেনি বাবা।'

মেসোমশাই বললেন, 'এখনো
ফেরেনি?'

অমলদা বিরক্ত হয়ে বললেন,
'দেখতেই তো পাচ্ছ ফেরেনি। তুমি তো
শৃঙ্খলে পড়েছিলে। আবার কেন উঠে
এসেছ।'

মেসোমশাই বললেন, 'উঠে এসেছি
যে কেন তুমি তার কি বুদ্ধি। ছেলেটা
চোখের সামনে বয়ে যাচ্ছে কারো কোন
দৃষ্টিপন নেই।'

অমলদা বললেন, 'দৃষ্টিপন করে
কী হবে? তোমার ছেলে কি এখনো

হেলেনাম্ব আছি নাকি-বাবা? ঠিক-
স্কুল কলেজের ছাত্র?

‘ওসব কথা এখনে কেন? চল
বাইরে চল?’ বলে: শ্যামলদা উঠে
পড়লেন।

তার আগেই অমলদা উঠে গিয়ে-
ছিলেন।

রজা বউদি তাড়াতাড়ি বললেন,
‘ও কি তোমরা রসগোল্লা পায়েসটা
খেলে না?’

তাঁর কথা অমলদা-শ্যামলদাব কানে
গেল না।

আমি তখনো টেবিলে বসে রয়েছি।
আমার সামনে পায়েসের বাটি। অর্চনা
একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রজা বউদির মুখে হাসি। যেন
কোথাও কিছু হয় নি। তিনি তেমনি
পরিহাসভরল-সুরে বললেন, ‘তোমার
মোটাই জিভের তাক নেই সঞ্জীব।
চার্টনিটা আমার। আর পায়েসটা আমার
ছোট জ্বর। তালিম আমি দিয়েছি।
কিন্তু করেছে অর্চনা নিজের হাতে।
খেয়ে নাও। মধুরেণ সমাপয়েৎ হোক।’

আমি ভাবলাম মধুর পরিসমাপ্তি
আর হচ্ছে কই।

খানিক বাদে আমিও উঠে গিয়ে
বেসিনে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম।

মাসীমা অমলদা আর শ্যামলদা
মিলে মেসোমশাইকে ততক্ষণে ফের তাঁর
ঘরে নিয়ে গেছেন। কী যেন সব
রোজাতে শব্দ করছেন। সব আমি
ঠিক বন্ধুতে পারলাম না।

রজা বউদি বললেন, ‘এবার তুমি
শুয়ে পড় সঞ্জীব। বাবার ঘরের পাশের
ঘরে তোমার বিছানা করে দিয়ে
এসেছি।’

‘সে কি এখনই শুয়ে পড়ব।
আপনাদের এখনো থাওয়া হল না।’

ভারতী বউদি বললেন, ‘আমাদের
থাওয়ার দোর আছে। কেন, তুমি কি
পরিবেশন করবে নাকি?’

‘তা করতে পারি। একেবারে
আনাড়ি ভাববেন না।’

ভারতী বউদি বললেন, ‘যখন
হাফপ্যান্ট পরতে বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণের
আসরে বোধহয় নদন আর নেকড় টেবু
দিতো।’

অর্চনা মৃদুস্বরে বলল, ‘সত্যিই
তুমি শুয়ে পড়না গিয়ে।’

তার গলার স্বরে কাতর অনুরোধ
ফুটে উঠল।

আমি বন্ধুতে পারলাম ‘অর্চনা
চাইছে না আমি জেগে থাকি। আমি
রাত্রির ব্যাক ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষদর্শী
হই।

কিন্তু আমি সেটুকু না বন্ধুবার
ভান করে বললাম, ‘ছোট বউদি,
শারদীয় সাপ্তাহিক বঙ্গমতী : ১০৭৭

তোমাদের অনুরোধ উপরোধে
নিম্নলিখিতদিকে ফেলে দিয়ে নিলাম।

‘কিন্তু তার আসার আগে ঘুমিয়েও
পড়ব? সেটা কি উচিত হবে ছোট
বউদি?’

এবার অর্চনার মুখে হাসি ফুটল,
‘থাক, তোমাকে আর ছোট বউদি ছোট
বউদি করতে হবে না।’

আমি আল এই দলভ হারিটুকুই
দেখতে চেয়েছিলাম।

রজা বউদি ডেকে বললেন, ‘অর্চনা
আয় এবার। আর কত রাত করবি।
ছোট ঠাকুরপোর ভাত বেড়ে রেশে
আমরা গেয়ে নিই।’

‘কি-চাকর রাধুনীদের আগেই
ছুটি দিয়ে ওরা একজলার পাঠিয়ে
দিয়েছেন।

অমলদা কারো সঙ্গে কোন কথা
না বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

‘আমি বললাম, ‘শ্যামলদা, নিম্নলিখিত
কোষায় গেছে বলতো?’ অমলদাকেও
বেশ উদ্বেগ মনে হচ্ছে।’

শ্যামলদা একটু হেসে বললেন,
‘হু। মনের উদ্বেগ অশান্তি বাবাকে
সারারাত জাগিয়ে রাখে আর দাদাকে
ঘুম পাড়িয়ে দেয়। দাদা ঠিক গিয়ে
ঘুমিয়ে পড়বে। তুই দেখে নিস। তুই
কী করবি? ঘুমোবি না জেগে
থাকবি।’

‘সে তোমার ওপর নির্ভর করে।
তুমি যদি রাজনৈতিক আলোচনা কর
আমার ঘুম পাবে।’

শ্যামলদা বললেন, ‘বাদশাজাদাদের
নিদ্রা ছুটে যাবার সময় হয়ে এসেছে।
আর কোন আলোচনা তোকে জাগিয়ে
রাখবে? রসভর? যৌনজীবন?’

শ্যামলদার সঙ্গে আমি তাঁর
তিনতলার ড্রয়িং-রুমে এসে বসলাম।
আলমারি ভরা বই। বাইরেও
শ্রুতপীকৃত পত্রপত্রিকা। বেশির ভাগই
দলীয় পুস্তক।

শ্যামলদা আমার সামনের সোফা-
টায় বসে সিগারেট ধরালেন। আমার
দিকে কেসটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,
‘খাবি নাকি একটা? চলে?’

আমি বললাম, ‘না।’

শ্যামলদা একটু হেসে বললেন,
‘ঠিক আছে। তখন আমাদের কারখানার
ব্যাপারে তুই আমাকে একটা খোঁচা
দিয়ে কথা বলেছিলি। সেটা আগে
পরিস্কার হয়ে যাক।’

হেসে বললাম, ‘তুমি কথাটা
ভোলনি দেখাছি।’

শ্যামলদা বললেন, ‘আমি কেউ
হাঁ করলেই তার মনের কথাটা বন্ধুতে
পারি।’

আমি বললাম, ‘তোমার ধারণা
মানুষের মন তার মধুগহবরে।’

‘শ্যামলদা কী-কিছু’ হয়ে বললেন,
‘বাজে কথা রাখ। তুই যা বলতে চেয়ে-
ছিলি আমি তা বন্ধুতে পেরেছি। তুই-
বলতে চাস যেহেতু আমি আমাদের
কারখানার একজন অংশীদার জাত।
হিসাবে মোটা টাকা পাই, ভবিষ্যতের
একজন উত্তর অধিকারী আমি আমাব
নিজে স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে
পারিনে।’

হেসে বললাম, ‘ঠিক তাই।’

শ্যামলদা উত্তেজিত হয়ে বললেন,
‘অত্যন্ত ভুল কথা। আমাদের কাব-
থানায় শ্রমিকদের যে সুযোগ-সুবিধা
হয়েছে আমার জন্যেই। বাবার মত ছিল
না, দাদার মত ছিল না।’

বললাম, ‘শ্রমিকদের নিজেদের
ইউনিয়নের কোন জোর ছিল না।?’

শ্যামলদা বললেন, ‘নিশ্চয়ই ছিল।
কিন্তু আমি তাদের সাহায্য করি।
গাইড করি। এইজন্যে বাবা আর দাদা
আমাকে ভাবে ঘরের শত্রু বিভীষণ।
আমি যে টাকা এখান থেকে পাই তার
অর্ধেকের বেশি পার্টি ফান্ডে যায়।
দাদা আলাদা কারখানা করে ভাবছে
আমাকে তার প্রিসমীনায়ে ঢুকতে দেবে
না। কিন্তু আমি না ঢুকি আর একজনে
ঢুকবে। ওর প্রত্যেকটি শ্রমিকের মধ্যে
যে আমি মিশে থাকব ও তা জানে না।’

‘আমি বললাম, ‘কী জানি শ্যামলদা।
তুমি এই তিনতলার ওপর থেকে গাড়ি
হারিয়ে রোজ দশ-বার পদ দিয়ে খাবার
খেয়ে তুমি যে দিনমজুরের সঙ্গে মিশে
যেতে পার একথা কল্পনা করা একটু
কঠিন।’

শ্যামলদা হেসে বললেন, ‘নৈমক
হারাম। এইমাত্র টেবিলে বসে চর্বা চেব্যা
লেহ্য পেয়ে খেয়ে আমাদেরই নিদ্রা
করাঁহস। অতগুলি আইটেম দিয়ে
আমরা রোজ খাইনে। আজ বউদির
সপ করে করে করেছেন তাই।’

তারপর আমার দিকে চেয়ে বেশ
জোর দিয়ে বললেন, ‘কল্পনা করতে
হবে কেন একথা বাস্তব সত্য।’

কিন্তু আমি যে কোন মূহুর্তে এই
তিনতলা থেকে নেমে যেতে পারি।
নদন ভাত খেয়ে থাকতে পারি। সে
পরীক্ষা নিজের ওপর দিয়ে আমি করে
দেখছি। তুই যাই ভাবিস না কেন
বাবার সঙ্গে দাদার সঙ্গে আমাব তমাং
আছে। যদিও আমরা একই কারখানার
মালিক, একই বাড়ির বাসিন্দা। আমি
আমার নিজের আদর্শ নিজের লক্ষ্যকে
জানি। আমি জানি আমি কাদের জন্যে
জড়ি করছি।’

আমি চুপ করে রইলাম। শ্যামলদার
আন্তরিকতায় আমার সন্দেহ নেই।
কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন জীবন আব

আদর্শের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা কি সব ঠিকের নিঃসংগম করবে ?

শ্যামলদা আরো যেন কী বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ মাসীমা এসে প্রায় ছাঁপড়ত হাপাতে হাজির হলেন।

শ্যামলদা বললেন, 'কী ব্যাপার মা। তুমি এখনো ঘুমোও নি ?'

মাসীমা বললেন, 'কথা শোন ছেলের। একজন রইল বাড়ির বাইরে আর আমি ঘুমোব ? তাছাড়া তোমার বাবা আমাকে পাগল করে দিচ্ছেন।'

শ্যামলদা বললেন, 'যাওনা পাগল হয়ে।'

মাসীমা বললেন, 'গেলে তো বাঁচতাম।'

শ্যামলদা বললেন, 'কী করছেন বাবা ?'

'কী আর করবেন? একবার উঠছেন, আবার শুয়ে পড়ছেন, ফের গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াচ্ছেন। এখন বুঝি আবার গিয়ে টেলিফোনের কাছে বসছেন। এত কবে বলি তুমি যে সব জায়গায় ফোন করবে তার কোথাও ওকে পাওয়া যাবে না। গির্হিমিহি লোক জানাজানি কবে কেলেঙ্কারি বাধাবে। তা কি আমার কথা শুনবে?'

শ্যামলদা একটু হেসে বললেন, 'ধানার অব হাসপাতালেও ফোন করতে বল।' তাবপব আমার নিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলে দিতে হয় না। ওর ফিরতে দেরি হলে ও সব জায়গাতেও বাবা মাঝে মাঝে খোঁজ নেন।'

ওঁর অবিচল ঔদাসীন্যে আমি একটু বিস্মিত হলাম।

শ্যামলদা ফের মাসীমাকে বললেন, 'তুমি যাও। বাবাকে গিয়ে একটু শান্ত করে রাখ। আমি এফ্রুগি আসছি।'

মাসীমা চলে গেলেন।

শ্যামলদা বললেন, 'এই প্রিয়লিশন এই অশুভ অমঙ্গল আশঙ্কার মনে কী আছে বল তো? Death wish? এত নস্ট হবার কী আছে বল তো? ব্যস্ত হয়ে এখন কিছু করা যাবে না। নিম্নের সঙ্গে গাড়ি থাকে। যেদিন গাড়ি না নিয়ে যায় ওঁর ক্লাবেব বম্বুবা ওকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যায়। যত রাতই হোক ও শান্তভাবে ফেরে। বাবা চেঁচাচ্ছেচি না করলে ও কোন চেঁচা-মেঁচি কবে না। খাবার ঢাকা থাকে। যেদিন ইচ্ছা হয় না খায় না। যেদিন ইচ্ছা হয় খেয়ে নিয়ে শুরুর পড়ে। ঘুমোয়ে বেলা দশটা-এগাবটা পর্যন্ত।'

বললাম, 'তুমি এ সব সমর্থন কর শ্যামলদা? সহ্য কর?'

শ্যামলদা বললেন, 'সমর্থন ঠিক করছেন। তবে সহ্য না করে কী করব। বাবা আর দাদাকেও তো আমার সহ্য করতে হবে। আমি তো আর রাতারাতি



দাদার মত ছিল না

মবাইর ধাং বদলে দিতে পারছি নে। তবে বাবার মত এ সবের বিরুদ্ধে আমার অত প্রেজ্জুডিসও নেই।'

আমি বললাম, 'প্রেজ্জুডিস? তুমি কি একে শুধু একটা প্রেজ্জুডিস বল?'

'তাছাড়া কী?'

আমি বললাম, 'মোটেই তা নয়। তোমাদের না হয় সাধ্য আছে তোমরা খাও। বাবের সাধ্য নেই, ভাত জোটে না—'

শ্যামলদা হেসে বললেন, 'তারা পচানি খায়।'

আমি বললাম, 'তুমি হাসতে পার। কিন্তু ব্যাপারটা কি অতই হেসে উড়িয়ে দেবার? আমি জানি আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে এর চলন বেড়ে গেছে। কে যেন বলছিল স্কুলের ছেলেরা খায়, কলেজের মেয়েরাও নাকি কেউ কেউ খায়। এর মূলে কতখানি সত্য আছে তা জানি নে। কিন্তু যে দেশে বৈশিব ভাগ লোক খেতে পায় না, মধ্য-বিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে বারা সব আধপেটা খেয়ে থাকে সে দেশটা মোটেই অ্যাফ্রোয়েনয়ের দেশ নয় যে তুমি একে প্রশ্রয় দিতে পার। তুমি মূখে চীন-রাশিয়ার আদর্শ আওড়াবে আর বাঁচতে

চাইবে মার্কিন দেশের লোকের মত এই কনট্রাডিকশনের কোন মানে নেই।'

শ্যামলদা হাসলেন, 'মানে নেই বলেই—তো এই কনট্রাডিকশন। এই পানাহারের অভ্যাসের মধ্যে রাজ-নীতিকে টেনে আনা বোকামী। ভাই রে গঞ্জিকা আর সোমরস কি আজকের জিনিস? তা সেই মর্নিং-খবির আমল থেকে চলছে।'

'অথচ এখনকার ছেলেমেয়েদের ধারণা এইটাই আধুনিকতা।'

শ্যামলদা বললেন, 'জিনিসটা আধুনিক নয়, গ্রহণ করবার ভাগিটা আধুনিক।'

হেসে বললাম, 'গ্রহণ না করবার ভাগিটা আধুনিক হতে পারে। মর্নিং-খবির আগল থেকেই চলছে। কিন্তু যথার্থ কোন ঋষি একে সমর্থন করেন নি, না সেকালে না একালে। যাই বল না, নিকোটিন আর অ্যালকোহল অ্যানিটি হাইজিনিক এ কমন তো ঠিক।'

শ্যামলদা হেসে বললেন, 'স্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ বস্তু কি কেবল ওই দুটোই? আরো বহু আছে। আরো বহু অভ্যাস আছে যা মানুষের রুচি শালীনতা

স্বাস্থ্যের প্রতিকূলে। তবু তো মানুষ সেগুলিকে ছাড়তে পারে না।

আমি বললাম, ‘অসংখ্য দোষ আছে বলেই তুমি আরো একটি দোষকে সমর্থন করতে পার না। সেটাও বোধের পর্বায়ে পড়ে। দোষের তালিকাই তাতে বাড়ে। সেটা গৃহ বলে ধরা যায় না।’

শ্যামলদা বললেন, ‘কে বলেছে যে যায়? যদিও দোষটাও গৃহবাচক বিশেষ্য। মানুষের স্বভাববাচক। আমরা অনেক জিনিসকেই খারাপ বলে জানি, খারাপ বলে মানি। তবু তা ছাড়তে পারি নে। তবে আগের জেনারেশনের চেয়ে একালের ছেলেমেয়েদের সাহস বেড়েছে। তাদের মধ্যে হিপার্ক্লিস কম। এইটাই বা শুভ লক্ষণ।’

নিচে মাসীমা আর মেসেমশাইর মধ্যে কী যেন বাদানুবাদ হচ্ছে শোনা গেল।

শ্যামলদা বললেন, ‘যাই ওঁদের একটু সামলে আসি। নির্লটকে নিয়ে আর পারা গেল না। একটু বৃষ্টি-শূনে চললেই হয়।’

বাবা-মাকে শান্ত করে শ্যামলদা একটু বাদেই ফিরে এলেন।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোরা বোধ হয় ঘুম পাচ্ছে।’

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, ‘না-না ঘুম পাবে কেন।’

শ্যামলদা হেসে বললেন, ‘তা হলে বোধহয় যোগনিদ্রা। কিছুনি লক্ষ্য করছি। এককাপ করে কফি খেলে এটুকু যেত। বউরা বোধ হয় ষে-যার ঘরে দোর দিয়ে শুয়েছে। খিল না দিলেও ভেজিয়ে রেখেছে। তুই বলবি ভারতীকে? দু’ কাপ কফি করে দেবে।’

হেসে বললাম, ‘তুমি বল না।’

শ্যামলদাও হাসলেন, ‘আমি বললে দেবে না। খাই-খাই করে উঠবে।’

বললাম, ‘তোমাদের ব্যাপারটা কি বল তো?’

শ্যামলদার মুখ গম্ভীর হল। ‘কেন ভারতী তোকে কিছু বলেছে না কি?’

‘কী আবার বলবেন?’

‘তুই নিজেই অনুমান করছিস? Horse sense? শুনোছি ঘোড়া আর কুকুর দুইয়েরই ঘ্রাণ নাকি প্রবল।’

হেসে বললাম, ‘আমি বোধ হয় স্বিতীয় শ্রেণীর জীব।’

শ্যামলদা বললেন, ‘ওরে বাবা। সে আরো মারাত্মক। ফ্লেপে গেলে কামড়ে দেয়।’

বললাম, ‘মুশকিল এই, আমি জায়গামত ফ্লেপতেও পারি নে। আমি চির অনদগত। তুমি আমাকে নিয়ে স্বপ্ন পুষতে যেতে পার।’

শ্যামলদা বললেন, ‘মহাপ্রস্থানের

পথে? সে পথ আমার পথ নয়। তা-ছাড়া আমি যুধিষ্ঠিরও নই। সুতরাং ধর্মরাজ, তোমার পথ আর আমার পথ আলাদা। আমি স্ত্রীকেও সে কথা বলে দিয়েছি। তোমার পথ আমার পথ আলাদা।’

বললাম, ‘কিন্তু ঘর যখন এক, পথও এক করে নিতে পারলেই তো ভালো ছিল।’

শ্যামলদা বললেন, ‘এক করে নেওয়া কি মূখের কথা? আমাকে কেউ কেউ বলে তোমাদের অতগুলি রাজ-নৈতিক দল কেন? এক হয়ে মিশে গেলেই পার। এ যেন জায়ে জায়ে ঝগড়া। এ বেলার বিবাদ ওবেলা মিটিয়ে নিলেই হয়। তাও আজকাল মেটে না। ভিন্ন স্বার্থ, ভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গি। রাতরাতি কি মন্যবলে মিলে যাবে? যারা বাইরে থেকে দেখে তারা ও সব কথা বলে। যারা হাতে-কলমে কাজ করে তারাই জানে সমস্যাটা কত জটিল। যতটুকু মেলে তার ওপর ভিত্তি করে এগোতে হবে। পারসদ্বৈত করতে হবে।’

আমি বললাম, ‘পারসদ্বৈতনে কাজ না হলে পারসিকউশন।’

শ্যামলদা বললেন, ‘রকমারি হলে তাও। তোরা রক্তপাতের পক্ষে অধিক উঠিস। কিন্তু রক্তপাত কি হচ্ছে না? বহুকাল ধরেই হচ্ছে। ইনটারনাল হেমারেজ চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ভিতরের সেই রক্তস্রাব আরও সাংঘাতিক।’

আমি এ প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে বললাম, ‘ভারতী বউদির কথা বলছিলে শ্যামলদা।’

শ্যামলদা বললেন, বৃষ্টিতে পারছি প্রসঙ্গটা তোর কাছে তেমন রুচিকর লাগছে না। কিন্তু অন্য প্রসঙ্গও কি রুচিকর হবে? ভারতীকে আমি বলে দিয়েছি তোমার পথ আমার পথ আলাদা। এর পরেও যদি একঘরে থাকতে হয় থাকো। সে আছে ভাই আমিও আছি।’

বললাম, ‘পথ আলাদা কিসের?’

শ্যামলদা বললেন, ‘আমার পথ কাজের, আমার পথ রক্তের, তার পথ রসের। ও ভাবে আমি সখের শ্রমিক। এর চেয়ে দাদার মত মন দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য দেখলে কাজের কাজ হত।’

ভালোবাসার ধরণ-ধারণও আমাদের আলাদা। ও চিরকাল অষ্টাদশী হয়ে থাকতে চায়। কিন্তু আমি তো জা পারি নে। আমি সেই আঠের বহুরের তারুপাকে অনেক দিন পার হয়ে এসেছি। নির্মলের মত ওর বাইরে কোন নেশা নেই। কিন্তু নেশা আছে ওর ভিতরে। রসের নেশা। খেজুর রসই হোক আর

ভালের রসই হোক তা যেমন হলে গেলে তাড়ি হয় ও-ও তেমন আমার কাছে একটি তাড়ির হাড়ি। আর ওর কাছে আমি কলে পেয়া রস নিড়ে নেওয়া একখানি শুকনো আশ।’

আমি চুপ করে রইলাম।

শ্যামলদা একটু হাসলেন, ‘ওর আরো গৃহ আছে।’

‘কী রকম?’

‘ও একসময় একটু লেখা-টেখার অভ্যাস করেছিল, কিন্তু মনের মত হয় নি বলে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মনে মনে লেখাটা ছাড়ে নি, মূখ-মূখে বানানোটোও ছাড়ে নি। অসাধারণ ওর কম্পনশক্তি। স্থল ভাষায় বলতে গেলে মিথ্যা কথা বলবার শক্তি। ও নিজের যেন বৃষ্টিতে পড়ে না মিথ্যা-কথা বলাছে। যা বলে তখনকার মত তাই সত্য। তারই সঙ্গে ও একান্ত। ও নিজের এক কাম্পনিক জগৎ তৈরি করে নিজে যতক্ষণ শূন্য তার মধ্যে বাস করতে পারে। এ একধরনের রোগ। কিন্তু এর জন্যে ওকে আমি মেনটাল হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি নে। নিয়ে যেতে চাইলেই বা ও যাবে কেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেও বলতে পারি নে। বললে ও-ও যাবে না। এই সহাবস্থান অসহনীয়।’

শ্যামলদা অ্যাসট্রেতে সিগারেটের টুকরোটি চেপে নিবিয়ে রাখলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ‘তবু হঠাৎ কোন কোন দিন ওকে যখন লুকিয়ে লুকিয়ে কাদতে দেখি মনটা কেমন হয়ে যায়। রাশ-রাশ মেঘের মত, পাঁজা-পাঁজা অম্বকারের মত তাল-তাল দৃষ্টি আমার বৃষ্টির মধ্যে জমে ওঠে। তখন একটা দর্শনিনীকে আশ বৃষ্টি জড়িয়ে ধরি।’

একই ব্যাপারে দু’ রকমের ব্যাখ্যা। আমি দু’ জনের মূখ থেকে শুনলাম। সম্ভ্যায় একরকম, দু’পূর-রায়ে আর একরকম। এই দুই জবানবীর কোনটি সত্য কে জানে।

আমি শূন্য নিজের প্রকৃতিকে কিছুটা জানি। আমার মেন কোন মতামত নেই, ব্যক্তিত্ব নেই। আমি যেন এক রূপমূখ ধর্মানুশ্রয় ভরল জলীয় সত্তা। সেই ধর্মানুশ্রয়ের অন্তর্নিহিত আবেগ আমার মধ্যে সংক্রামিত হয়। আর আমাকে মুহূর্তে মুহূর্তে রূপান্তরিত করে।

গেটের কাছে একখানা গাড়ি এসে থামবার শব্দ হল।

শ্যামলদা বললেন, ‘এই বোধহয় এল। দারোয়ান আছে নিচে। সেই দোর খুলে দেবে।’

একটু বামে সিঁড়িতে পায়ের দৃশ্য
দুশানা গেল।

আগানের ঘরের সামনে নির্মলদাকে
দাঁড়াতে দেখলাম।

দীর্ঘ দেহ, ফর্সা রঙ। নাক-মুখের
গড়নও সুন্দর। ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে
সুপুরুষ নির্মলদা। পরণে খসর
টাইজার্স, গায়ে হাফসার্ট, তাতে কিন্তু
সবুজ, বেগুনি, হলদে তিন-চারটি
ঝড়ের ছিট আছে। নির্মলদার মুখ-
খানা একটু ফোলা ফোলা। চোখ দুটো
একটু লাগচে।

আগানের দিকে তাকিয়ে বলল,
‘এই যে তোমরা এখনো জেগে আছ।
সঞ্জীব কখন এসেছিল?’

শ্যামলদা বললেন, ‘ও তো এসেছে
‘সন্ধ্যাবেলায়।’ ভূই আজ একবারে রাত
‘একটা করে ছাড়াল।’

নির্মলদা বলল, ‘দেয় হয়ে গেল।
‘সিনেমায় গিয়েছিল।’ তারপর
‘সান্যালের পাল্লায় পড়ে গেল।’

শ্যামলদা গম্ভীরভাবে বললেন, ‘আ
ঘরে যা।’

হঠাৎ সিঁড়ির কাছ থেকে চমক
জন্মায় বস্ত্রনাদ শোনা গেল, দাঁড়াও।

আমি আর শ্যামলদা ঘর থেকে
বেরিয়ে এসে দেখি মেসোমশাই ভক্তকে
ঘুরে একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে-
ছেন। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বড়সড় চেহারা।
বাইরে থেকে এখনো বেশ স্বাস্থ্যবান
মনে হয়। পরণে সেই আটহাতি খুঁড়,
‘পায়ে ‘বিদ্যাসাগরী চটি’। খোলা গা।
চেয়ে দেখলাম মেসোমশাইরও চোখ
দুটি লাগচে, নির্মলদার মত তাঁরও পা
দুটি কাঁপছে।

মেসোমশাই সাধু ভাষায় বলতে শুরু
করলেন, ‘দাঁড়াও। আমি তোমাকে বার
বার নিবেদন করেছি ওসব খাবে না, এত
রাত করে ফিরবে না। তবু কেন—’

নির্মলদা প্রথমে এঁড়িয়ে মাওয়ার
চেষ্টা করে বলল, ‘আঃ ছাড়ো। রোজ
এই নাটক সহ্য হয় না। পথ ছেড়ে
‘দাও।’

মেসোমশাই বললেন, ‘আগে আমার
কথার জবাব দাও। তারপর যাবে।’

নির্মলদা বলল, ‘আচ্ছা জ্বালাতন।
এর আবার জবাবের কী আছে। দেখতে
পাছ আমি না বেরিয়ে পাব না।
আমাকে ‘বেরোতে হয়। তুমি বড়ো
হয়েছ। তোমার বেরোবার দরকার হয়
না। তুমি শয়ে থাকো, বিশ্রাম কর।
ঘুমোও। আমি কী করি না করি, কখন
ফিরি না ফিরি সে খোঁজে তোমার
তো কোন দরকার নেই। আমি এখন

আর। শব্দ নয়, মেসোমশাইর নয়। আমি
এখন ‘ব্যাংক’ বড় হয়েছি।’

মেসোমশাই বললেন, ‘হাই থেরেছ।’
নির্মলদা বলল, ‘বেশ তাহলে তাই
হরোহ। তোমার রুটি অন্তরী তুমি
চল, আমার রুটি নিয়ে আমাকে চলতে
দাও। তুমি তোমার মত করে বাঁচো,
আমাকে আমার মত বাঁচতে দাও।’

মেসোমশাই বললেন, ‘বাঁচা? এই
তোমার বাঁচা? তিলে তিলে ক্ষয়,
‘ভিলে তিলে অপমৃত্যু। আমি চোখের
‘সামনে সেই মৃত্যু দেখছি তোমার।
এর চেয়ে একনিমেমে তোমাকে আমি
শেষ করে দেব।’

নির্মলদা হেসে উঠল, ‘How
funny. শেষ করে দেবো। কী করে
শেষ করবে?’

আমি মেসোমশাইকে ধরে টানাটানি
করাছি। শ্যামলদা নির্মলদাকে সিরিয়ে
নিতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু কেউ
কাউকে নড়াতে পারছেন না। এতক্ষণে
বাড়ির সবাই রক্তমণ্ডে হাজির। মাসীমা
এসে গেছেন, বাড়ির বউরা, মেয়েরা সব
উঠে পড়েছে। অমলদা আর রত্না বউদিও
এসে দাঁড়িয়েছেন সেই ভিড়ে। শব্দ
নিচ থেকে দাবোয়ান আর চাকর-
বাকররা ভয়ে উঠে আসতে পারে নি।
তারা নিচে দাঁড়িয়েই ওপরের মজা
নেখছে।

নির্মলদা বুক ফুলিয়ে তার
নাবার দিকে এগিয়ে গেল, ‘কর দেখি
শেষ। গায়ে একবার হাত তুলে দেখ
দেখি। তোমার কতখানি সাহস দেখে
নিই একবার।’

মেসোমশাই রাগে কাঁপতে কাঁপতে
বললেন, ‘নিশ্চয়ই শেষ করব। আমি
স্বীকৃতি করেছি, আমি পালন করেছি,
আমিই তোকে—’

বলতে বলতে মেসোমশাই হঠাৎ
বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

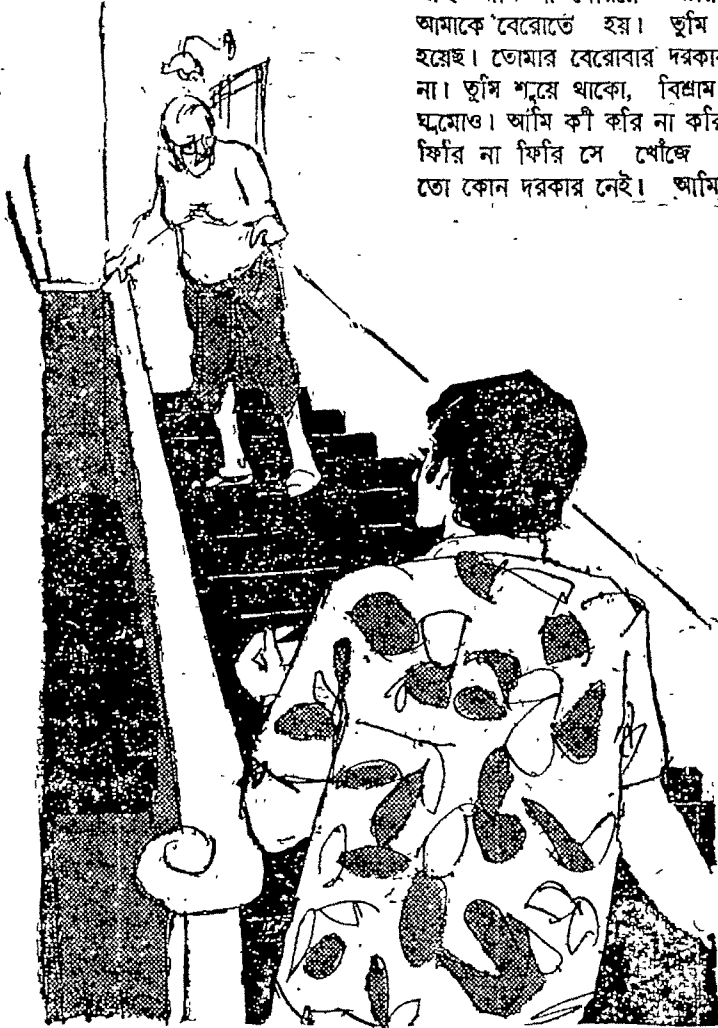
নির্মলদা বলল, ‘ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
এসেছেন। এবার মহেশ্বরের নিজেরই
মহাযাগ হবে। হয় তো হোক। আমি
তার জন্যে দায়ী নই।’

বাকি সবাই কী হল কী হল
বলে মেসোমশাইকে তাড়াতাড়ি তুলে
শরলেন। তারপর ধরাধরি করে তাঁকে
নিয়ে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দেওয়া
হল।

কে যেন বলল, ‘ডাক্তারকে ফোন
করে দাও। এ হয়তো সেকেণ্ড স্ট্রোক।’

কিন্তু মেসোমশাই হাতের ইসাবার
নিবেদন করলেন। তিনি নিশ্চয়ই
বিছানায় পড়ে রইলেন। বউরা শব্দগুণা
করতে বসল।

নির্মলদা দোতলার নেমে এসে
মেসোমশাইর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে
বলতে লাগল, ‘শেষ করে ফেলবে। এ



‘দাঁড়াও’

মাসীমা বললেন, 'আর গল্পগল্প করিস নে এবার যা। তুই ঠেকে মেরে ফেলাব।'

নির্মলদা বলল, 'ফেলি তো ফেলব। আমার হাতে যদি মরে তোমার স্বামীর স্বর্গবাস হবে। নইলে অনেক অপমৃত্যু ঠিক কপালে লেখা আছে।'

বউদিরা উঠে গিয়ে নির্মলদাকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল। অর্চনা মেসোমশাইকে শুশ্রূষা করতে লাগল। মজ্জালাও কাছেই ছিল। কিন্তু মাসীমা ওদের তুলে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে এসে বসলেন।

অমলদা অনেক আগেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন ফ্যামিলি ফিজিওশিয়ানকে ডেকে আনতে। শূন্য টেলিফোন করলে এত রাতে যদি না আসেন। যদিও মেসোমশাইব বাড়ি থেকে ফোন করলে একজন কেন তিন জন ডাক্তার এসে হাজির হবেন। তবু অমলদা নিজেই গেছেন।

ডাক্তার এসেন। রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, 'তুমি ভয়ের কিছু নেই। তবে খুব সাবধানে থাকতে হবে। বেশি ঘন কথা না বলেন। কয়েকদিন বিছানা থেকে উঠতে দেবেন না।'

প্রেসক্রিপশনখানা অমলদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাস্তব হবেন না, ওষুধ কাল আনলেও হবে। ঘুমের ওষুধ আমার কাছে আছে।'

সবাই ঘরে চলে গেলে আমি মাসীমা-মেসোমশাইর কাছে আরো কিছুক্ষণ বসে রইলাম।

মাসীমা বললেন, 'রাত শেষ হয়ে এল। যা, পাশের ঘরে বিছানা কয় আছে। এবার শূন্য থাক গিয়ে।'

কিন্তু শূন্য পড়বার আগে ভাবলাম একবার নির্মলদার খোঁজ নিয়ে আসি।

তিনতলার উঠে পেলাম। ঘরে ঘরে খিল পড়েছে। শূন্য পূর্ব-দক্ষিণ বরাবর নির্মলদার ঘরের দোরটি খোলা।

দোরের সামনে সে চুপচাপ বসে আছে। দুই হাটুর মধ্যে মাথাটা পোঁজা। পাশেই অর্চনা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চল জ্যোৎস্না রাতে দুটি নারী-পুরুষকে নয় ঘেন তাদের দুটি স্ট্যাচুকে আমি সামনে দেখতে পেলাম।

একটু এগিয়ে এসে অর্চনাকে বললাম, 'ওকে শূন্যে দাও নি কেন?'

অর্চনা হৃদয়বলে বলল, 'না শূন্যে চাইলে কী করে শোয়াব?'

আমি নির্মলদাকে একটু নেড়ে দিয়ে

বললাম, 'এভাবে বসে আছ কেন। যাও শোও গিয়ে।'

নির্মলদা মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল। একটু দোষ নিয়ে বলল, 'কে সজীব? সেই থেকে বসে আছি। আমি ডাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনলাম কিন্তু খাওয়াতে পারলাম না।'

'আমার খাওয়ার জন্যে ভাবছ কেন। আমি পেটভরে খেয়ে নিয়েছি। তেমনাই বোধ হয় খাওয়া হয় নি।'

নির্মলদা বলল, 'আমাকে কে খাওয়াবে বল। আমার কি কেউ আছে? I have none, none in this world.'

অর্চনা আগের মতই কোমল স্বরে বলল, 'তোমার খাওয়ার জন্যে এত সাধাসাধি—'

আমি ওকে হাতের ইসারায় থামিয়ে নির্মলদাকে বললাম, 'খাবে এখন?'

নির্মলদা বলল, 'না না। আমাকে বিরক্ত কোরো না। সে আমাকে শেষ করে দিতে চায়। শেষ করে দেওয়া ঘেন এত সোজা।'

বললাম, 'ও কথা কেন ধরছ। রাগের সময় একটা কথা বলে ফেলেছেন।'

নির্মলদা বলল, 'রাগের সময় নয়। এটা তার সব সময়ের চিন্তা। He does not love me. He loves only himself.'

বললাম, 'কী যে বল। আমি যতদূর জানি তোমাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তোমার ওপরই তাঁর বেশি আশা-ভরসা।'

নির্মলদা বলল, 'খাচ্ছে কথা। ফেলে দে তোর ভালোবাসা আর আশা-ভরসা। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি নে। বাপ হওয়া ভারি শক্ত। ভারি শক্ত।'

হেসে বললাম, 'তুমি হয়ে দেখেছ না কি?'

নির্মলদা বলল, 'হুই নি। কিন্তু একদিন তো হবে। একটা আইডিয়া তো আছে। শিশুর বাপ হওয়া সহজ, বাচ্চা ছেলেমেয়ের বাপ হওয়া সহজ, কিন্তু জ্যোতান ছেলের বাপ হওয়া খুব কঠিন। দেখনি নি ছেলেমেয়েরা বড় হলে বড়ো-বড়ো তাদের ডিঙিয়ে বাচ্চা নাভি-নাভনীদের আদর করে। ভালোবাসার অর্থ তাদের কাছে শূন্য, caressing। গায়ে পিঠে হাত বোলানো, জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া। And nothing else. কিন্তু বয়স্ক ছেলেকে ভালোবাসতে হলে শূন্য তার শরীরকে ভালোবাসলে চলে না। তখন সে তার শরীর নিয়ে দুঃস্বপ্নে থাকে। তখন ভালোবাসতে হয় শরীরের চেয়েও যা বেশি সেইমূলিক। তার হৃদি প্রবর্তি অভ্যাস তার আশা-আকাংক্ষা আদর্শ, তার দৃষ্টি বৈদ্য নৈরাশকে ভালোবাসতে হয়।'

বললাম, 'কিন্তু সব কিছুতে ভালোবাসা কি সম্ভব? বাপেরও তো পছন্দ-অপছন্দ আছে।'

'তাহলেই বোধ বাপ শূন্য তায় পছন্দকেই ভালোবাসে। তার বাইরে কিছুকে নয়, কাউকে নয়। ছেলের আনন্দের জন্যে ছেলে নয়, নিজের আনন্দের জন্যে ছেলে। নিজের প্রয়োজনের জন্যে ছেলে। নিজের স্মৃতি-সিস্থির জন্যে ছেলে।'

মাঝে মাঝে নির্মলদার গলা চড়ে উঠছিল। আমার ভয় হল পাশের ঘরে শ্যামলদারা ছেগে উঠতে পারেন।

আমি বললাম, 'নির্মলদা, চল এবার তোমার ঘরে গিয়ে বসি। সেখানে কথা হবে।'

নির্মলদা বলল, 'না ঘরে যাব না। ঘরে বড় গরম।'

'গরম কিসের। ফ্যান খুলে দিলেই হবে।'

নির্মলদা বলল, 'ইলেকট্রিক ফ্যান ভেঙে ফুরে কথা। অর্চনা যদি হাতপাতা নিয়ে ছাওয়া করতে বসে তাহলেও গরম হবে না।'

নির্মলদা স্থায়ী দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

অর্চনা শান্তভাবে বলল, 'আমি জানি, আমার পাখার জোর অত বেশি নয়।'

নির্মলদা বলল, 'তার চেয়ে চল বাইরে কোথাও গিয়ে বসি।'

বললাম, 'এত রাতে বাইরে কোথায় যাবে। যেতেই যদি হয় ছায়ে চল। খোলা জায়গা আছে, হাওয়া আছে।'

নির্মলদা বলল, 'ও, তোর তো আশা-ভরসা ছিল খুব বাতিক। বেশ চমক! আমায় আপত্তি নেই।'

আমি অর্চনার দিকে চেয়ে বললাম, 'যাবে না কি?'

নির্মলদা আমায় দিকে চেয়ে আশা কৌতুকের সরে বলল, 'আবার অর্চনাতে কেন? না হলে তর্ক জমবে না? কথা বেরোবে না? Now come my friend you require a woman and I require a glass of wine. The same the same. কারো কারো পক্ষে both the questions are compulsory. সেরা রসিক কে বল তো?'

নির্মলদা আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'বল, বলতেই হবে। সেটা রসিক কে? বেতাল কহিল, মহারাজ, বলুন তো এই তিন ব্যক্তির মধ্যে রসচূড়ায় কে? মহারাজ কহিলেন, কী কহিলেন বড় না?'

নির্মলদা উঠে দাঁড়িয়ে আমায় কাঁধ ধরে একটু ঝাঁকুনি দিল।

আমি বললাম, 'অর্চনা, তোমার গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং ঘরেই থাকো।'

অর্চনা বলল, 'না চল, আমিও
মাই।'

নির্মলদা বলল, 'নিশ্চয়ই যাবে।
আমি যাব, সঞ্জীব যাবে, অর্চনা যাবে।
আমরা সবাই যাব। তুই অত ভয় পাচ্ছিস
কেন সঞ্জীব? ভেবেছিলাম আমি মাতাল
হয়েছি? মোটেই না। আমি বেশ স্ট্যান্ড
করতে পারি। আমার system এখন
ধরিষ্ঠীর মত ধারিষ্ঠী।'

অর্চনা বলল, 'তাহলে একটা মাদুর-
গাদুর নিয়ে আসি।'

নির্মলদা স্ত্রী বদিকে ফিরে তাকাল,
মাদুর? মাদুরে কী হবে?'

অর্চনা বলল, 'ছাদে তো বসবাব মত্ত
আর কিছ, নেই। মাদুর ছাড়া বসবে
কিসে?'

নির্মলদা বলল, 'কেন তোমার আঁচল
বিছিয়ে দেবে।'

দেব কাঙালিনীর আঁচল তোমার পথে
পথে বিছিয়ে। পথে বিছাতে হবে না।
ছাদেও ওপব একটু বিছিয়ে দিয়ে তাহলেই
যথেষ্ট।'

তারপর নির্মলদা আমার দিকে ফিরে
তাকাল, 'কিন্তু সঞ্জীব, সে আঁচলে তে
ভাই, দু' জনে ঠাই হবে না। উ'হু,
নেভার। আমি অত স্মার্ত্যাগী নই।
তুমি যোগীপুত্রের। তুমি বরং একখানা
কুশাসন বগলে নিয়ে চলে এসো।'

এর পরেও অর্চনা মাদুর আনতে
যাচ্ছিল কিন্তু নির্মলদা বাধা দিয়ে বলল,
'বলছি যে কিছু আনতে হবে না, অর্চনাই
চল।'

এরপর আমরা সব ছাদে উঠলাম।
পারিস্কার ছাদ। আকাশ এখন নিমেষ,
নির্মল, স্লোপেনাথোয়া।

আমি পকেট থেকে একখানা রুমাল
বের করে নির্মলদার হাতে দিতে
যাচ্ছিলাম। সে বাধা দিয়ে বলল, 'থাক
থাক, এমনিই বসতে পারিবি। অত ফর্সা
চাপড়-চাপড় দিয়ে কী হবে। হাঁ, কী
।। বসছিলাম?'

বললাম, 'ভুলে গেছি।'

নির্মলদা বলল, 'আমি ভুলি নি।
ভবি ভুলবার নয়। দেখাছিস তো নেশার
গুন? স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, Concentra-
tion বাড়ায়। Intorication-এর কথা
হাচ্ছিল। এ বস্তু সবাইরই দরকার। কারো
মদ, কারো মেরে, কারো বা চাঁদের
আলো।'

'সব কি সমান?'

নির্মলদা বলল, 'সব সমান। যার
সিসটেমে যা সয়, তাব পক্ষে তাই শ্রেয়।
যে যাহাবে ভালোবাসে সে যাহাবে তাব
পাশে। বিহারের বেলায় যেমন এ কথা
সত্য পানাহারের বেলাতেও তাই। যার
বাঁচিতে যা সয়, যার সিসটেমে যা সয়
সে তাই খাবে। তাতে যদি কেউ বাধা
দিতো আসে সে মার খাবে।'



আমি ভুলিনি। ভবি ভুলবার নয়

বললাম, 'তোমার সিসটেমের ওপর
তোমার বুদ্ধি খুব বিশ্বাস?'

'নিশ্চয়ই। আত্মবিশ্বাস আমার
একমাত্র সম্বল। অহংকার একমাত্র
অলংকার। কৃপার্দীপ সুনীতেনের উপদেশে
আমি কোনদিন আকুণ্ট হই নি। হবও
না।'

বললাম, 'ভালো কথা। আত্মবিশ্বাস
বলে বস্তু আমার একেবারেই নেই। তা
যাদের আছে আমি তাদের শ্রদ্ধা করি।
যিনি যে কোন ক্ষেত্রে কিছু achieve
করতে পেরেছেন আমি তাঁকে মশাদা
দিই।'

নির্মলদা বলল, 'সে achievement
যতই মেকী হোক না, যতই 'ভি'সহীন,
শূন্যগত' হোক না তাতে কোন ক্ষতি
নেই। শব্দ তার বাজারদর থাকলেই হল।
এই তো বলে যাও, বলে যাও।'

বললাম, 'তা নয়। আমি চেষ্টা করি
যার যথাযথ মূল্য আছে তাকেই মূল্য
দিতে। হয়তো বিচারে ভুল হতে পারে।'

নির্মলদা বলল, 'বিচারে ভুল মানে?
তোরা বিচারের ধারধারিস নাকি?
নির্বিচারে চোখ বজ্জে সব মেনে নিস।'

'তারই নাম ট্রাডিশন। তারই নাম ভাষ্ক-
প্রামা।'

বললাম, 'একটা একটা করে সারা
যাক। তুমি তোমার system এব কথা
বলছিলে। তার ওপর অত বিশ্বাস
রেখে না। নিজের শরীরটা তোমার
হাতের মুঠোর নয়। এ দেশের জলহাওয়া
মাটির প্রভাব তার ওপর অনেক বোশ।
তাহাড়া আমাদের এই 'system' বড়
betray করে। প্রকৃতি ছলনাময়ী।'

নির্মলদা বলল, 'Rhetoric and
Prosodyর ছড়াছড়ি। উপমা আর
অলংকার। কোন প্রকৃতির কথা বলছিস?
দেহপ্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতি না এই নারী-
প্রকৃতি?'

অর্চনার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে
নির্মলদা একটু হাসল।

অর্চনা কোন জবাব দিল না। চাঁদের
আলোর তার মূখ তেমন শান্ত আর
স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল। একটু ক্রান্ত একটু বা
অবসন্ন।

আমি বললাম, 'তোমার কি শব্দ
পাচ্ছে? তাহলে শব্দে যাও না।'

অর্চনা বলল, 'পরে যাব। কের তো
প্রায় হয়েই এল।'

বললাম, 'মির্জা'মাছ হাত আগলে।
তুমি খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলে পারতে।'
অর্চনা বলল, 'সে তো তুমিও
পারতে, উনিও পারতেন। কিন্তু কারই
বা ঘুম হল।'

নির্মলদা বলল, 'অনিদ্রাটা আমার
সিসটেমে সয়ে গেছে। আমার অপবিধে
হয় না। তোমরা যদি ইচ্ছা করে না
ঘুমোও আমি কী করতে পারি।'

বললাম, 'আবার সেই সিসটেমের
গর্ব। তোমার সিসটেমে এত উল্টাপাল্টা
অভ্যাস কিছুতেই সইবে না। আজ সইছে।'
কিন্তু দু'দিন বাধে দেখবে আর সইছে
না। দেখবে শরীর ভেঙে পড়ছে। সেই
শরীর নিয়ে কিছুতেই কোন কাজ করতে
পারছ না। সেই জন্যেই সংযম। সেই
জন্যেই নিয়ম-কানুন; স্বাস্থ্যবিধি।

নির্মলদা বলল, 'দূর দূর। পুরোনো
হস্তাঙ্গ সব ভুল। পদে পড়ে বিধ-
নিষেধই যদি মেনে চলাতে হয় তাহলে
জীবনে মজা রইল কোথায়। নিজের
বিশ্বনিষেধ আমি নিজে তৈরি করে
নিয়োছি। আমি তাই মেনে চপি। আমি
স্বয়ম্ভু। নিজের মনের সংহিতাই আমার
মনসংহিতা। তুই আর কী। এমন ভাঙা-
গড়ার ভয় দেখাচ্ছিস। শরীর ভেঙে
পড়বে তাতে হয়েছে কী। না হয় মরে
যাব। তার চেয়ে বেশি কিছু কেন আর
হবে না। বাবা ভাবেন তিনিই একমাত্র
স্বামী বিষ্ণু শিব। এই ত্রিমূর্তি আমাদের
প্রত্যেকের মধ্যেই আছে।'

আম-খাওয়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে
দিয়ে নির্মলদা নতুন একটা সিগারেট
ধরাল। তাবপর পরম উল্লাসে বলতে
লাগল, 'এই ত্রিমূর্তি আমরা প্রত্যেকেই।
আমিও সৃষ্টি করি, পালন করি, সংহার
করি।'

'কাকে?'

নির্মলদা বললেন, 'আমার মনের মধ্যে
কত আইডিয়া, কত সংকল্প, কত প্রাণ-
শ্রুতি, কত প্রতিশ্রুতি ভাঙার খেলা।
আমার ফ্যাঙ্করী বাবার, ফ্যাঙ্করীর চেয়ে
ঢ়র বড়। আমার ফ্যাঙ্করীতে যখন
প্রোডাকশন আরম্ভ হবে, কোয়ান্টিটি
কোয়ালিটিতে I shall surpass my
father.'

হেসে বললাম, 'ভালোই জে। সেই
তো চাই।'

নির্মলদা আমার কথায় কান না
দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমিও ত্রিমূর্তি।
আমিও জন্ম দিই, পালন-পোষণ করি
তারপর আমারও অসম্ভাব্য অসুস্থ
হাড়ে থাকে। তখন আমি সব গলা টিপে
মেরে ফেলি। And those things are
masculine. সবই পুরুষের কাজ। কোন
ময়ের সাধ্য নেই তা করতে পারে।
অর্চনা, তুমি পার?'

অর্চনা এবার একটু হাসল, বলল,
'না।'

নির্মলদা বলল, 'আমি সেখানে
একজন নিরলস কর্মী। A devoted
worker.. ডাবল ওভার-টাইম পাবার
যোগ্য। বাইরে থেকে লোকে দেখে আমি
ক্রেবল ব্লড করি আর চুপচাপ বসে থাকি।
তা নয়। আমি সেখানে কাজ করি, প্লান
করি, ডিজাইন তৈরি করি। Very
complex, very complex design.
আমি তা ওয়ার্ক-আউট করি, বম্প্রট
করি। And I destroy them
altogether. And thing the
circle becomes complete.'

নির্মলদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।
তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু
বিদ্রুপের ভাঙতে বলল, 'নাও। এরায়
তোমাদের সূর্য উঠবে। এবার আমার
ঘুমোবার সময় হল। সজীব, তুমি প্রাণ-
ভরে সুরোদয় দেখ। অর্চনা ইচ্ছা করলে
তুমিও থাকতে পার। আমি যাই। শূন্যে
পাড় গিয়ে। এখন হয়তো ঘুম আসবে।'
পূর্বের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে।
কিন্তু সূর্য উঠতে এখনো দেরি। আমরা
সে জন্যে কেউ অপেক্ষা করলাম না।
নির্মলদার সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে
এলাম।

নির্মলদা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমি ইতস্তত করছিলাম। অর্চনা
বলল, 'এসো না।'

ঘরে ঢুকলাম। ডবল বেডের খাতে
হুগ করে বিছানা পাতা রয়েছে। পাশা-
পাশি দু'জোড়া বালিশ। কিন্তু সারা
রাতের মধ্যে কেউ সে বিছানা স্পর্শ
করেছে বলে মনে হল না। নির্মলদা
তাড়াতাড়ি গিয়ে এবার সেখানে
শূন্যে পড়ল। তাবপর আমার
দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো যান।
শূন্যে পড়। এখানে এসে ঘুমো।
Of course if you can stand the
Smell.'

নির্মলদা একটু হাসল।

আমি বললাম, 'সে জন্যে নয়। এখন
শূন্যে আমার ঘুম আসবে না। তুমি
ঘুমোও।'

আমি বেরিয়ে এলাম।

অর্চনা এল। পিছনে পিছনে বলল,
'কোথায় যাচ্ছ।'

আমি বললাম, 'আব কি। নির্দিষ্ট ভোর
হল। এবার বাড়ি যাই।'

'রাত জেগে চোখমুখের যা অবস্থা
হয়েছে।'

বললাম, 'হ্যাঁ, কেউ দেখলে ভালো
ধারণা হবে না।'

অর্চনা বলল, 'চা-টা খেয়ে যাবে না?'

'না। এখন না গেলে ফাস্ট ট্রাম ধরতে
পারব না।'

অর্চনা একটু হাসল, 'ফাস্ট ট্রাম

ধরতেই হবে এমন কোন কথা আছে
নাকি?'

বললাম, 'ওই আমার এক বিলাস।
সুযোগ পেলেই ফাস্ট ট্রাম ধরি। ফাস্ট
বাস ধরি। বাইরে কোথাও গেলে ফাস্ট
ট্রেন।'

অর্চনা বলল, 'ফাস্ট ক্লাস না পাওয়ার
ক্ষতিপূরণ।'

'ঠিক বলেছ।'

অর্চনা কারডোর দিয়ে সিঁড়ির মূণ্ড
পর্যন্ত আগিয়ে এস।

'মাকে বলে যাবে না?'

'না। ঠুরা হয়তো এখন ঘুমোছেন,
তুমিই মাসীমাকে বলে দিনো। বেড়া হলে
আমিও টেলিফোনে খবর নেব।'

অর্চনা হঠাৎ বলল, 'আমার চাকরীর
কথা যেন মনে থাকে।'

হেসে বললাম, 'চাকরী? চাকরী কি
তুমি সত্যিই করতে পারবে নাকি?'

অর্চনা বলল, 'কেন পারব না?'

বললাম, 'তুমি কি এ বাড়ি থেকে
বেরোতে পারবে?'

অর্চনা একটু হাসল, 'কেন পারব
না? চিরকালের জন্যে তো বেরোব না।
রোজ বেরোব, রোজ ফিরব।'

'তুমি কি সেই অনুমতিটুকুও আদায়
করতে পারবে?'

'তোমার দেখাছি বেশ আত্মবিশ্বাস
আছে।'

অর্চনা হাসল, বলল, 'যহসামান্য।
তোমার দাদার মত অগাধ নয়।'

'অগাধ আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো।'

'কেন?'

'অনেক যেতে যেতেও তবু খানিকটা
থেকে যায়। ওকি তুমি আর ভ্যাসছ
কেন?'

অর্চনা বলল, 'দারোয়ানকে বলে দিই।
গেট খুলে দেবে।'

'কেন, আমি বললে খুলবে না?'

'তাও খুলবে। তবু আমার বলটাই
ভালো।'

লনের পাশ দিয়ে গেটের দিকে দৃষ্টি
এগোতে লাগলাম।

আমি বললাম, 'নির্মলদা শিগগিরই
বদলে যাবে।'

'কী করে বদলে? তুমি কি সম্প্রতি
জ্যোতিষচর্চা ধরেছ?'

'জ্যোতিষের ওপর আমার আস্থা
নেই। কিন্তু তোমার ওপর আছে। তুমি
ওকে বদলে দেবে।'

অর্চনা বলল, 'আমার শব্দভরসেরও
অবশ্য সেই ধারণা। কিন্তু কে তাকে
বদলাবে তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না।
আচ্ছা, তোমাদের কি বিশ্বাস আমি একটা
ঔষধ?'

'ঔষধ কেন হবে? তুমি ব্যাধির
শুল্কা।'

[শেষাংশ ১৬০ পৃষ্ঠায়]

বিদ্যাচর্চা ৩

বাংলাভাষায়

বিজ্ঞান চর্চা বুদ্ধিবৈজ্ঞানিক

[আজ থেকে দেড় শত বছর আগে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। এ বছর তার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী। আমরা তাই সাহিত্যে, শিক্ষার ও সমাজ-সংস্কারে তার অবিস্মরণীয় অবদানের কথা নতুন করে আলোচনার উপযোগিতা অনুভব করছি। নিম্নোক্ত প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর-প্রতিভার একটি স্বল্প-আলোচিত ও প্রায়-অজ্ঞাত দিক—বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তার অবদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।]

বিদ্যাসাগরের সমস্ত কল্যাণকর্মের পেছনে সুসংস্কারমূলক বিজ্ঞাননিষ্ঠ একটি মন কার্যকরী ছিল। সমাজ-সংস্কারে তো বটেই, শিক্ষা-বিস্তারে ও সাহিত্য-সাধনাতো তার এই বিজ্ঞাননিষ্ঠতার পরিচয় মেলে। এমন কি তিনি নিজে বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লিখেছেন, বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনার অনেককে উৎসাহ দিয়েছেন।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায় ক্ষেত্রে তার অবদানকে মোটামুটি দু' ভাগে ভাগ করা যায়—(১) বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনার অগুরুত্ব উৎসাহদান ও অপরের রচিত গ্রন্থের পরি-সার্জন; (২) বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে সর্ব-সাধারণের পাঠোপযোগী প্রবন্ধ রচনা।

প্রথমে দিক দিয়ে বিদ্যাসাগরের একটি বুদ্ধিবৈজ্ঞানিক অবদান হল লোসনসংকলিত ও 'লিয়ার্স' অনুবাদিত 'পম্বাবলী' গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করা। পম্বাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫২

খ্রীষ্টাব্দে; আর প্রথম সংস্করণের প্রকাশ-কাল ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায় আদি পূর্বে-অর্থাৎ যে পূর্বে প্রধানত ইউরোপীয়রাই বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করতেন সেই পূর্বে লোসন-সংকলিত এই গ্রন্থটি মোটামুটি জনসমাদর লাভ করে। কারণ, এতে বিভিন্ন জীবজন্তু নিয়ে লেখা প্রায় সবক'ট প্রসঙ্গই গল্পের মতো সুখপাঠ্য। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থটির চাহিদা ক্রমেই বাড়ছিল। অতএব বিদ্যাসাগর যে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করতে কেন রাজী হয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

এছাড়া, অক্ষয়কুমার দত্তের বিখ্যাত বই 'বাহ্য বস্তু'র সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'-এ ইংল্যান্ডের বিদ্যাসাগরের কিছু হাত ছিল। বইটি তিনি ও মহর্ষি মেকেন্স-নাথ ঠাকুর সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বাহ্য বস্তু'র সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৫১ ও ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। জর্জ, কুন্স-এর 'Constitution of Man' অবলম্বন করে অক্ষয়কুমার এ-বইটি লেখেন। তবে কুন্স-এর গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ তিনি করেন নি; ভাবানুবাদ করেছেন। এই অনু-বাদের কাজে বিদ্যাসাগর আশ্বমগোড়াই অক্ষয়-কুমারকে উৎসাহ দিয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কালের পাঠ্য-পুস্তক প্রণেতারাও নানাভাবে তার কাছে

কথা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, লেপল্যান্ড শর্মাকে 'পম্বাবলী' (সংকল ১১১৬) রচনার সময় তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী 'বীজগণিত' লিখেছিলেন প্রধানত তাঁরই পরামর্শে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলার পাশ্চাত্য পন্থাভিতে প্রথম বীজগণিত রচনার কৃতিত্ব প্রসন্নকুমারেরই প্রাপ্য। তাঁর বীজগণিত ১ম ও ২য় ভাগ যথাক্রমে সংকল ১১১৬ ও ১১১৭-তে প্রকাশিত হয়।

এ-সবই হল বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায় ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের পরোক্ষ অবদান। এছাড়া বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রবন্ধ রচনা করে প্রত্যক্ষভাবে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করলেন।

তার রচিত 'জীবনচরিত'-এ (১৮৫০) বিস্বাক্ষিপ্ত করেছেন বিজ্ঞানীর জীবনী স্থান পেয়েছে; কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেল প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কথা আলোচিত হয়েছে অতি সহজ ও সরল ভাষায়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানীর জীবনচরিত বিদ্যাসাগরই প্রথম রচনা করেন।

'জীবনচরিত'-এর উপাদান বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও অনু-বাদিত। তবে অনুবাদ আক্ষরিক নয় কোথাও, কোথাও অবিকল নয়। বাংলা ভাষায় বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবতা পাঠকদের সীমিত বিজ্ঞান-শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যাসাগর অনুবাদকে কথাসম্ভব সরল করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে

কলা, যার, বিভিন্ন বিজ্ঞানীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাই মূল্য স্থান অধিকার করেছে এখানে; তাঁদের আবিষ্কার সংবন্ধ আলোচনা খুব একটা গুরুত্ব পায় নি।

‘জীবনচরিত’-এ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শব্দে বাংলা অনুবাদে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতানুগত্য দেখিয়েছেন। তাছাড়া তিনি অনুবাদ করেছেন শব্দের অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে।

বিদ্যাসাগরের একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ ‘বোধোদয়’-এর (শিশুশিক্ষা, ষষ্ঠ ভাগ) বেশির ভাগ অংশ জুড়েই বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ। মূলতঃ ‘চেম্বার্স’ ব্রাডিস্টেন্ট অব ন্যাশনাল অবলম্বনে লেখা এই গ্রন্থটি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এ-গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর স্বরকরে ভাষা এবং অতি অল্প পরিসরের মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সমাবেশ। প্রাণ-বিদ্যা, শরীরবৃত্ত ও উদ্ভিদবিদ্যার কথা তো বটেই, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং ভূগোল ও ভূবিদ্যাবিময়ক প্রসঙ্গেও এতে আছে।

‘বোধোদয়’-এর বৈজ্ঞানিক রচনাগুলিকে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানপ্রবন্ধ হয়তো বলা যায় না; কিন্তু অধিকাংশ রচনায়ই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় রয়েছে, তা বিনা সন্দেহে বলা যায়। উদাহরণ হিসেবে ‘চতন পদার্থ’ নামক রচনাটি স্মরণীয়। আলোচনা এখানে প্রাথমিক প্রকৃতির এবং সংক্ষিপ্ত, সন্দেহ নেই; কিন্তু আলোচনায় সুপারিকল্পনার ইংগিতও স্পষ্ট। এখানে একে একে জল, পাথর, মাছ, সাপ, পতঙ্গ ও কীট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার প্রারম্ভে জীবজগতের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে লেখক স্পষ্ট করে কিছ্ না বললেও, বিষয়বস্তুর পর্যায়ক্রম দেখে সহজেই বোঝা যায়, রচনার সময় বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা সংবন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। টেকনিক্যালিটি এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস ‘বোধোদয়’-এর বিভিন্ন রচনায় দেখা যায়। যেমন, এক জায়গায় স্বর্ণের গুরুত্ব বোঝাতে ‘আপেক্ষিক গুরুত্ব’ কথাটির উল্লেখ পর্যন্ত করা হয় নি। শুধু বলা হয়েছে, ‘স্বর্ণ জল অপেক্ষা উর্নিশ গুণ ভারী’। এ ছাড়া, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সম্পর্কে আলোচনায় শরীরবিজ্ঞানবিষয়ক নামগুলি লেখক এড়িয়ে গেছেন। আবার কোনো কোনো প্রসঙ্গে (যেমন কাল এবং বস্তুর আকার ও পরিমাণ নিয়ে আলোচনায়) তিনি অনুসরণ করেছেন এদেশীয় রীতি।

‘বোধোদয়’-এর কোনো কোনো অংশ গল্পের মতো সুখপাঠ্য। প্রসঙ্গত ‘মানবজাতি’ নামক রচনাটির কথা উল্লেখ করা যায়।

শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হলেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে ‘বোধোদয়’-এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অতি সরল ও সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের সাধারণ কয়েকটি প্রসঙ্গ যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা তখনকার যুগের বাংলা ভাষা ও



বিদ্যাসাগর

বাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে অভিন্ন।

‘বোধোদয়’-এর রচনার নিদর্শন। ‘কাচ’ নামক রচনাটির একাংশ :-

“কাচ অতি কঠিন, নির্মল, মসৃণ পদার্থ, এবং অতিশয় ভগ্নপ্রবণ, অর্থাৎ অন্যায়সে ভাঙিয়া যায়। কাচ স্বচ্ছ, এ নির্মল, উহার ভিতর দিয়া, দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে থাকিয়া, জানালা ও কপাট বন্ধ করিলে, অন্ধকার হয়, বাহিরের কোনও বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সারিস বন্ধ করিলে, পূর্বের মত আলোক থাকে, ও বাহিরের বস্তু দেখা যায়। তাহার কারণ এই, সারিস কাচে নির্মিত; সুর্বের আভা, কাচের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে,

কিন্তু কাচের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে না।

বালুকাও একপ্রকার ক্ষার, এই দুই বস্তু একত্রিত করিয়া, অগ্নির উৎকট উত্তাপ লাগাইলে, গলিয়া উভয়ে মিলিয়া যায়, এবং শীতল হইলে কাচ হয়। বালুকা যেদ্রুপ পরিষ্কার থাকে, কাচ সেই অনুসারে পরিষ্কার হয়। কাচে লাল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি রঙ করে; রঙ করিলে, অতি সুন্দর দেখায়।

কাচ অনেক প্রয়োজনে লাগে। সারিস, আরস, মিসি, বোতল, গেলাস, ঝাড়, লন্টন, ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।

কাচ কোনও অস্ত্রে কাটা যায় না, কেবল হীরাতে কাটে। হীরার সুক্ষ্ম অগ্রভাগ কাচের উপর দিয়া টানিয়া গেলে, একটি দাগ পড়ে। তার পর জোর দিলেই, দাগে দাগে ভাঙিয়া যায়। যদি হীরার অগ্রভাগ স্বভাবতঃ সুক্ষ্ম থাকে, তবেই তাহাতে কাচ কাটা যায়। যদি হীরা ভাঙিয়া, অথবা আর কোনও প্রকারে উহার অগ্রভাগ সুক্ষ্ম করিয়া, লওয়া যায়; তাহাতে কাচের গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে, কাটিবার মত দাগ বসে না।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই দেখি আমরা, বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রটিকেও সমৃদ্ধ করেছিলেন।

বেকার সমস্যার সমাধান ?

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মর্গি উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রায়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লন্ডন)

লিখিত সচিব

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

জাহানারা

দ্বারেশ চন্দ্রনাথ

কল্পমেঘ



জাহানারা বলছে,—বলছে তার সুখ-
দুঃখের কাহিনী।

আর ফেলে-আসা অতীতের সোনালী
দিনগুলো অমলের সামনে মিছিল করে
দাঁড়িয়েছে। সেই-হারানো সুর আবার
শুনতে পাচ্ছে অমল। ব্যবধানের শূন্যতা
পূরণ করছে তার না-জানা অতীতের
নেপথ্যের দিনগুলো। বলে যাচ্ছে জাহানারা,—
কোত হল! জানার আগ্রহ আর না-
জানার ব্যথা অমলকে আকুল করে তুলেছিল,
আজ সেই আকুলতা কথার ধারায় শান্ত
করে দিচ্ছে জাহানারা। একদিন ঘোবদের
প্রথমপাদে সর্বহারার মত ঘোবনে এসেছিল
অমল সব পাবার আশায়, কিন্তু মনে হচ্ছে
সে নির্যাতিত। কল্পনার রথ চলেছে মেঘ-
লোকে,—সেই কল্পনাকে নতুন গতি দিয়েছে
জাহানারা। কিশোরী জাহানারা আজ আর
এই জাহানারার মাঝে নেই, উত্তর মেঘ
খুঁজে মরছে কল্পনার অলকাপুরীতে
সেই কিশোরী জাহানারাকে।

কঠিন, রুঢ় আর সত্যের নিম্নলি বিভী-
ষিকায় মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে অমল।
আর জাহানারার কথার ছন্দে উঠছে
আলোড়ন। এই রকম খোলা মাঠে কিংবা
গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালেই তার মনোরথ

চলে আকাশের মেঘের ওপর ভর করে,
নদীর স্রোত বয়েও চলে,—কিন্তু ভাটির
দিকে সাগরে নয়, চলে উজান বেয়ে।
এমনি উজান বেয়ে উজ্জামি-নগরে ন্বগের
ঘাটে বেহুলার ভেলা পেঁছে গিয়েছিল।
কিন্তু অমলের মনোরথ অমলকে শূন্য
কল্পনার কুহেলীই দেখিয়েছে,—

ক্ষিপ্ৰগতি মানুষের মনোরথ,—অমল
পেঁছে গেছে সে অলকায়। মাঠ, ঘাট,
গাছপালা সবই দেখেছে ভেসে উঠছে
তার কল্পনার ধ্যানলোকে; কিন্তু—ফেলে-
আসা সেই দিনের সেই সময়টার ওপরেই
পড়ে গেছে যবনিকা। কল্পনার ছবি এঁকেছে।
আবার মূছে দিয়েছে,—এমনি করে দিনের
পর দিন বছরের পর বছর কেটে গেছে।

শ্যাম-ঘন কোপে ছায়াঘেরা ঘরগুলো—
গ্রামের পর গ্রাম। কপিলা গাই, সাদা
আর লালচে বাছুরগুলো কেমন ছুটেছে;
কেমন সামনের পা দুটো উঁচু করে
দাঁড়িয়েছে দুটো ছাগল ছানা,—বাঃ,
এরা মাথায়-মাথায় কেমন ভাঙতে ঠোকা-
ঠুকি করছে। স্রোতের রেখা,—শ্যামলী মেয়ের
বুকে তির তির করছে সাদা রেখা;—
ঝিল, ঝিল বেশ সুন্দর লাগছে। বিলের
ধারে সাদা বকপাখি,—লাল টালির ছাদ

দেখা যাচ্ছে,—নানা নামের মানা স্টেশন,—
রেল লাইনে ধারে তারের লাইন চলে গেছে
দূর-দূরান্তে। মাঠ-ঘাট তারপর সারি
সারি পাহাড়,—টিলা। তারই ফাঁকে ফাঁকে
ঘর-বাড়ি দেখা যাচ্ছে—করগেটের টিল
চকচক করছে,—জলো হাওয়া বইছে, মস্ত নদী
তারপর হাঙ্গর।

এত বড় গাছ গাঁদাফুলের গোল গোল সোনালী হলদে গোলক ঝিলমিল করছে; ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে হাসি ছড়চ্ছে; বাতাস এখানে মিষ্টি-মধুর সিন্ধু গন্ধে ভরপুর। কমলাকুসুম-না, পাহাড়ী টিলার কমলাগাছের সারি।

আর গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত অগুনতি লিকুলিকে হাত বাড়িয়েছে আকাশের দিকে—মাথায় সবুজ-লালচে পাতার চৌপব! তারই নিচে আনারস, রক্তগৌর তার বর্ণ। টিলাগুলির আনাড়-কানাচে ছেলে আর মেয়েরা লুকোচুরি খেলছে।

ক্লান্ত গধিক উপরের কমলা-বনের দিকে তাকিয়ে আছে স্তব্ধ নয়নে। টিলা থেকে গড়িয়ে দু' একটি ফল হয়ত নিচে গড়িয়ে পড়ে।

অবন্তী, উজ্জয়িনী নদ, কিবা বিশীর্ণ বৈষ্ণবী নদী নয়; ওপাশে মনহবা স্বচ্ছ-তোরা কুশিয়ারা। দূরে, আরো দূরে ওই নদীর বাকি বাকি এগিয়ে যায় অমলের জলোথ,—

শিখণ্ডিত হয়েছে দেশ।

স্বপ্ন দেখছে অমল। তার সামনে কসে জাহানারা। জাহানারা শোনাচ্ছে তার কাহিনী।

আর নির্বাসিত বন্ধ স্বপ্ন দেখছে কিন্তু বার বার সেই স্বপ্নে পড়ছে আঘাত। কল্পনার স্বপ্নজগতে জাহানারার কথার চেউ মাঝে মাঝে কালো ছায়া ফেলছে।

যে অদম্য কৌতূহল এতদিন কল্পনার কল্পনালোকে বিচরণ করেছে; আজ তার সেই কৌতূহল রূপ নিচ্ছে—সার্ধক হচ্ছে, কিন্তু তা মাঝে মাঝে চমকে দিচ্ছে।

শুনছে কি শুনছে না,—মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলে অমল। সে কিরে যায় হাবিয়ে-বাওয়া, ফেলে-আসা সেই বিগত দিনগুলিতে।

বির বির বৃষ্টির অঝোর ধারার মাঝখানে একদিন যে কিশোরীকে দেখেছিল অমল, যার মুখে শুনিয়েছিল বর্ষার কলগুজনের রন্দ রন্দ তাল রবীন্দ্র-নাথের বর্ষা-কবিতার আবৃত্তি, সেই কিশোরী আজ অনেক ধাপ এগিয়ে এসে গিয়েছে অমলের সামনে। সেই কিশোরী কোথায় হাবিয়ে গেছে এই পরিস্পর্গ মারীর মাঝে;—ঘরপা, গৃহীণী,—স্না। এই মায়ের মাঝেও এসেছে শূন্যতা। বিরহ, বিচ্ছেদ, ব্যবধান,—সৃষ্টি হয়েছে বিরাট জ্বাধান তাব একান্ত দীর্ঘতর সঙ্গ।

অভিশাপ?—কে দিয়েছে অভিশাপ?

জাহানারার মুখ মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আনন্দের জ্যোতিও দেখা দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। আবার কখনো বা তার কাহিনী কলতে কলতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। চোখও মুহে জাহানাবা। আবার আতঙ্ক তার হৃদয়খানা

কখনো বা ক'কড়ে বাজে। মনে হচ্ছে, আকাশ-বাতাসে আতঙ্কের ডেউ ছড়ানো। সেই ডেউ দেখে শিউরে উঠেছে জাহানারা। চীৎকার,—আগুন, রক্ত, ছোরা!—গুড়ুম, গুড়ুম গুলীর আওয়াজ, বোমা,—বাড়ি-ঘর জ্বলছে। স্রোতের উজাসের মধ্যে অসহায় নারী আর শিশু।

জাহানারা বলে যাচ্ছে,—খালের ওপারে যেতে চাইছে মানুষ। এপারে তাড়া খাচ্ছে—মাথায় পড়ছে লাঠি, বৃকে ছোরা, লোহার ডান্ডা, বস্তু,—জলে পড়ছে; আর ওপারে উঠতে গিয়েও ওরকমই মার খাচ্ছে। মায়ের বৃকে শিশু—দয়া নেই, মায়ী নেই। ক্ষেপে উঠছে শয়তান, ক্ষেপে উঠেছে জানোয়ারের পাল, দেখছি সব ক'কড়ে, হারেনা, চিতা-বাঘ,—হিংস্র সব পশু।

তার বলার ভগ্নী এমনি যে,—সেই দু'শাগুলো অমলের চোখেও জ্বলন্ত হয়ে কিলবিল করছে।—থামো থামো জাহানারা!

ঔষজীবকে শাসাচ্ছে যেন জাহানারা,—এমনি দৃষ্ট তার ভগ্নী,—মাঝে, মানুষ কাকে বলে অমলদা? জবাবদিহ চাইছে জাহানারা।

চোখে ছিল স্বপ্নের ঘোর,—সে স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করেছিল আমার দাদা। তারপর সেই বৃষ্টির রাতে তোমার মাঝে কি যে দেখেছিলাম; তাই এগিয়ে গিয়েও ধমকে দাঁড়িয়েছিলাম। নিজেকে তৈরী করেছিলাম। যুদ্ধ শুরুর হল, দাদা চাকুরী পেলে; শহরে এলাম, পড়াশোনা এগিয়ে চলল। স্কুল-মিস্ট্রেস। সুন্দর আর স্বচ্ছন্দ জীবন,—তবু কথা শুনিয়ে অনেক। বাবা-মার অনুশোষণ ছিল, কিন্তু ভাবনা ছিল না। জানো ত, আমাদের সমাজ। কুমারী জীবন। কিন্তু এই দৃষ্টির বিভীষিকার উপায় নেই। দাদাও দূরে চলে গেছে। আছে প্রবীর,—দাদারই কথ,—জানো ছুঁমি। বাঁচবার উপায় করতে হল। জাহানারার মুখে হাসি,—বুঝলে না? আগেই বলেছি বউ বউ খেলা। প্রবীরদের খেলায় ছলে মিসেস চক্রবর্তী। বাইরে আতঙ্কের বিভীষিকা,—দুবে শোলা যায় হে-হে রব,—শাখ বাছাচ্ছে,—আতঙ্কের ধনি।

তারই মাঝে সিঁথিতে সিঁদুর পথলাম।—হাসি? কিন্তু বিষাদ-ঢালা এমন হাসি অমল আর কোনদিন দেখে নি।

এক একবার চোখ তুলে জাহানারার দিকে তাকায় অমল,—রহমত সাহেবের কিশোরী কন্যা, গাইগোর, একটাকে দাঁড় ধরে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অঝোরে ফবছে বৃষ্টি। তার আজ?

আবার মন চলে যায় কোন এক স্বপ্নলোকে,—তারও ছেলেবেলা, কিশোরের কথা মনে পড়ে,—যৌবনের প্রথম ধাপে পা দিয়েই সেই যে যোগসূত্র ছিল হয়ে গেছে।

কনকচাঁপার কুড়ি। সবুজের মেলায় সবুজের আসনে একটি কোরক। ফুটে সোনালী আভা। আশ্চর্য,—মুখ চোখে দেখে। হাটি-হাটি পা-পা কতে হাটিতে শিখল; ছুটেতে শিখল—বছর এগিয়ে চলছে, এক, দুই, তিন, চার পাঁচ ছয় সাত আট, নয়—কৌতূহল আর অনন্ত জিজ্ঞাসা। দশ, এগারো, থেকে সেই কিশোরকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিল সেই জিজ্ঞাসার মিছিল। ফুল কেমন করে ফটে? দিনের মারে সাত বার দাঁড়িয়ে থাকত ফুলগাছেব ধারে। কুড়ি হয়েছে কুড়ি,—এবার ফুল হবে। ভোর বেলা পূর্বের আকাশ লাল হতে না হতে আবার আসত সে কুড়ি দেখতে,—মুখে হাসি ফুটল,—ফুল ফুটেছে পাগড়ি মেলেছে কনকচাঁপার কুড়ি। হাততালি দিয়ে উঠত সেই ছেলে।

—মানুষেরও ফটে-ওঠার সময় আছে অমল!—বলত ভবানীদি।

—দূর, মানুষের কি ফুলের মতন পাগড়ি আছে?

—নেই। কিন্তু দেহ আছে, সৌন্দর্য বাড়ে; আভা দেখা দেয়।

—দূর, ওকি বলছো?

—বুঝবি, বড় হ' দেখিয়ে দেবো। চৌদ্দ থেকে উনিশে কেমন আভা ফুটে মানুষের দেখিস নি?

—আভা? সে আবার কি?

—ছেলেদের দেহে কোন পুরুষিত আসে; মুখে দেখা দয় গোপেব রেখা। লাবণ্য আসে দেহে।

—আব মেয়েদের?

—মেয়েদেরও হয়। বুঝবি রে বুঝবি।

—য্যাং, ছুঁমি পাগল।

ভবানীদির কথা পাগলামি বলে একদিন উড়িয়ে দিয়েছিল অমল। কিন্তু পরে ভবানীদির কথা বুঝেছে শিশু হারিয়ে যাব কিশোরে, কিশোর হারায় যুবায়, যুবা হাবায় প্রৌঢ়ের তাবপর বার্ষিক্য একেবারে সব গ্রাস করে নেয়। যৌবনের ধাপ পর্যন্তই ফোটার ধাপ,—তারপর ঝরে যাবাব পালা। পূর্ব মেঘে লাগে উত্তবে হাওয়া।

ইতিহাস বলছে জাহানারা,—ও শূন্য তাব নিজের সুখ-দুঃখের কথা নয়; সাদা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখ বেদনার কাহিনী অঝোর ধাবায় ঝবেছে তার কথার অপ্রভে।

জানো অমলদা, মানুষ বখন পড়ে যাব, তখন তাব সবই পড়ে যাব। ধাপে ধাপে তোমাদের সেই দেববাঁবা পড়েছে; জানো ত তাদের কীর্তকলাপ, এক সময় তোমাদের ওই চক্রেব মাইল দশক জুড়ে তাদেরই জয়ধ্বজের ধোজা উড়ছিল, হাসপাতাল বাজার, স্কুল তাদেরই কীর্তি। পুজোব সময় অটেল খবচ করতেন দেববা। সাত গায়ের লোকেরা চার দিন পাড় পাড়ত দেব-

বারে বার পুজোবাত্তে। ছিল শ্রমজীবী
ছিন্ন-নাগাট। সবই—আজ—নিপ্রভ। অরুণ
সেই পাগলা ভট্টাচার্যদের বাড়ির কথাও
জানো! আমাদের গায়ের চোখেরীদের কথা
হয়ত ভুলে যাও নি। তাদের একটা নর,
দুটো নর, দশটা হাতী—ছিল। কি
জমজমটি।

আব আজ?—বৃষ্ণের দৌলতে ভোলা-
জ্বরার ছেলে দেবু মররা, আর ইন্সকানারের
ছেলে আব্বাসউদ্দীন হয়ে পড়েছে লাখোপতি,
—শুক্লের পড়া ছেড়ে দিয়েছিল ওয়া। দু'জনে
বাড়-ভুলে হয়ে ঘুরে বেড়াতে। কি যে
দৃষ্টি এল দু'জনের মাথায়, দেবু হল
দেবদাস মোদক, মিস্টার মোদক। মিলিটারীর
মাছ-মাগের যোগান দিত দেবু। আর
আব্বাসউদ্দীন করত রাস্তার নুড়ি সাগাই।

কলো কি? তারা এখন কোথায় আছে?
কোথায় আছে জানি নে—বাড়ি-গাড়ি
সবই হয়েছে তাদের। কলজ করে দিয়েছে
দেবদাস মোদক, মারের নামে হয়েছে
নিমন্তারনী কলজ। আর আব্বাসউদ্দীন
শহরে কবে দিয়েছে মেয়েদের হাসপাতাল
প্রসূতিভবন।

—কিন্তু বৃষ্ণ ত কবে থেকে গেছে।
এখন কি করে?

—একবার মগজ খুলে গেলে নতুন পথও
হয়। বড় বড় ব্যবসা ফেদেছে তারা।

—হিংসের হবে দেবেবা আব হিংসার
আগুনে জ্বলে মরছে চৌধুরী বংশের ছেলেরা।
হুংসা বটায়। কিন্তু উপায় নেই। মহীরুহে
দু' একটা সাধাতে কিছুই হয় না।

—জানো অমলদা, এই আব্বাসউদ্দীন
কি চেয়েছিল?

—কি করে জানব? আমি ত
অনেকদূরে।

হেসে উঠল জাহানারা, চেয়েছিল
রহমান সাহেবেব মেয়েকে সাদি করতে।
শহরে বড় বাড়ি, দু'খানা নতুন গাড়ি, বড়
ঘড় ট্রাক্। বিজলি বাতি আর বিজলি
পাখা, বাড়ির সামনে বাগান।

—তুমি ভুল করেছো বোন!

—ভুলেব নেশার জন্য দায়ী কে?

—নিশ্চয়ই প্রবীর।

—না গো মশাই না।

—নিশ্চয়ই তোমার বাবা-মার মত ছিল।

—তাও নয়। দাদাবও তেমন আপত্তি
ছিল না। কিন্তু বলড—আল্-কাল্-চার্ড।
ওর সঙ্গে মানাবে না।

—আর তুমি?

—আমি সেই কাল্-চার্ড লোকের জন্যই
অপেক্ষা করছিলাম। জানো তার জন্য কত
ক্ষতি হয়েছে। আমাদের জমি জিবে গোলমাল
ধাতিয়েছে শহরে। পড়াশোনার জন্য বদনাম
হটি-বহে। বাপজানের সেই দোকানটার
একদিন আগম লাগিয়েছেন।

—কী সর্বনাশ?

—সর্বনাশ অনেক কিছু হয়েছে। বাবা

মরিয়া গেলেন। মাকে শহরের বাসিন্দা নিয়ে
এল দাদা, মাও সেহ রাখলেন। দাদা আমাকে
অনেক বুঝাল। বললে, তোর যা হচ্ছে
তুই করতে পারিস, আমি বাধা দেবো না।

—কবীর বিয়ে করে নি?

—না। সময় আর অব হয়ে ওঠে নি।
আর কারণটাও বোধ হয় আমি।

তুমি? তার কারণ হবে কি করে?

—আমি কুমারী থাকার এই প্রতিশ্রুতি
শনে দাদা চমকে উঠল। ঠাট্টা প্রসিক্তাও
করল, কয়েকদিন। তারপর কেমন যেন
আনমনা হয়ে পড়ল। আমি শুলে চাকুরী
নিলাম। তাবপর দাদা আমাকে নিয়ে
কলকাতায় এল, এখান থেকে চলে গেল বোম্বে।
সেখানেও মেয়েদের শুলে চাকুরী জুটে গেল।
আমাদের কলেজের সেই শাস্ত্রীমশাই রিটারার
করে এখানে এসে মেয়েদের শুলে খুলেছেন,
সেখানেই চাকুরী।

বেশ ত চমকিল।

—হ্যাঁ, বেশ চলাছিল। কিন্তু হঠাৎ সরে
কেটে গেল। চিরদিন নতুন মেয়ের তালে
তালে মরুরী নৃত্য দেখে কাটানো হল না।
বুকে ত?

—কিন্তু তোমার নামটা সিঁথির
সিঁদুর বদলে দেয় নি?

জ্যোৎস্না—হাসির কলক, তারপর
অশ্রুধারা।

শহরতলীর এক পল্লীর একতলা বাড়ি।
সেখান থেকে শুলে যাতায়াত করে
জাহানারা। কিন্তু আর সে জাহানারা
নেই জ্যোৎস্না চক্রবর্তী, শাস্ত্রীমশাইও
স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু খেলার ছলে
যে স্বীকৃতি দিয়েছিল সে আজ আর নেই।

সাদা ধান শাড়ি পরা জ্যোৎস্না চক্রবর্তী
শহরতলীর রাস্তা দিয়ে যায়; ছোট ছোট
ছেলে-মেয়েরা পিছু নেয়—জ্যোৎস্না দিদিমণি।
শ্যামপুরুষের জগন্নারীণী কিন্ডারলার বেশী
দূরে নয়! রিক্সায়ও যায়। আবাব কোনো
কোনো দিন পায়ে হেঁটেও যায় জ্যোৎস্না।

জাহানারাব ছেলে জয়ন্ত—উত্তর মেয়ের
কাহিনী সে জানে না। পূর্ব মেঘও সে
দেখে নি। হয়ত প্রবীরকেও ভুলে গেছে।
ফুটফুটে ছেলে—দোড়ধাপ, ছুটাছুটি,
প্রজ্ঞাপতি ধবতে যায়।

অমল এই শিশুর মাঝে দেখে নতুন
আলোক, অমল তখন উত্তর মেয়ে মনের
পাখা মেলে উড়ে যায় তার ছোটবেলাব সেই
কেলে আসা জগতে—কি হ'ল ভবানীদিব;

জাহানারা? ক্ষণিকের অতিথি হয়েছিল
একদিন ওই কিশোরী মেয়ের আহবানে।
ভুলেই গিয়েছিল সে সন্ধ্যার স্মৃতি। কত
বছর যে গেছে। অকস্মাৎ আবার তার
আবির্ভাব। বিচিত্র এ-দৃশ্য। নিজেকে
যেন এক মাকড়সার জালে জড়িয়ে ফেলেছে
অমল।

মায়া, মমতা। ভালবাসা?—মনে মনে

বার-বার উচ্চারণ করে অমল। ভবানীদিব—
অহেতুক বাড়াবাড়ি করড সে। কেন?
ভবানী অমলকে চোখে চোখে রাখত।
দিদি?—শব্দ মূর্ষের সম্পর্ক। সেই দিদি
বধন দিদিগিরি ফলাত? বকত, মায়ডা
কতদিন মেয়েছে। আবার বুক জড়িয়ে
ধরে চোখের জল-ফেলেছে। তারই সমবয়সী
একটি মেয়ে। তারপর কেমন যেন সতর্ক
প্রহরা—বয়স বেড়েছে, দিন-এগিয়ে চলেছে;
নিজেকে বেশ-আবরণে ঢাকতে চাইত
ভবানীদিব।

—আবরণহীন আবরণ! চলার ভঙ্গী
আর চোখের চাউনিতে ফুটে উঠত কেমন
যেন সজ্জাচ, লজ্জা আর আপদহার্য ভাব।
এইত দেখেছে।

আসঙ্গা গিঙ্গা? নিজের স্বপ্নভঙ্গা।
নব যৌবনের পথে বসন্তের আবেগ। বিদ্যা-
পতির পদ মনে পড়ে যায়! কি চেয়েছিল
ভবানীদিব?

জাহানারা কোন্ অতীতের বুক থেকে
কিরে এসে অমলের স্বপ্নভঙ্গা করেছে।
কৈশোর নেই, যৌবনেরও স্বপ্নভঙ্গা হয়ে
গেছে। মাধবীমঞ্জরী করে পড়তে দেখেছে
অমল, নিজের মধ্যও যেন বসন্তের আবেগ
জেগেছিল,—দেহ-মনে ঘটেছিল তারই
আবির্ভাব।

আকাশে-জাতাসে তাব সঁড়া পেরেছিল
অমল। কিন্তু আজ?—শব্দ স্বপ্ন। নির্বাসিত
যক্ষ—বামগিবিতে দাঁড়িয়ে পূর্ব দিকে দৃষ্টি
মেলছে—আষাঢ় নব মেঘ, তার ওপর পড়ছে
পূর্বের পূর্বের আলোব ছটা; সোনালী-
রাঙা। চিক্-চিক্ কবছে গাছে—পাতা-
গুলো।

কোন রামগিরি পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছে
অমল। কাব অভিশাপ?—কে দেবে-উত্তর?

এ-যে গাঁতরই অভিশাপ,—ফুর্গনের
আভিবাতি—অভিশাপের বীজ থেকে অমল
তা' থেকে চারা—তার ফলে মহীরুহ।
কল্পপতি আর ছোট চারাগাহে ফিরে যেতে
পারে—না। কাল—মহাকাল, গতি।

প্রবীর, কবীর, জাহানারা ও ভবানীদিব
—সবাইই জীবনে এই গাঁতর এই পরিণতিরই
অভিশাপ পড়েছে। বেশ কল জাহানারা—
বউ, বউ খেলা।—প্রাণের দায়?—প্রেম,
ভালবাসা, আকর্ষণ।—আসঙ্গা গিঙ্গা!

পরিণতি কালে এই যে জয়ন্ত।
প্রবীর আব জাহানারার মিলনের পরিণতি।
না, এখানেই শেষ নয়। পূর্ব মেঘ আর
উত্তর মেঘের খেলা চলবে অনন্তকাল।
তা থামবার নয়; আবার পূর্ব মেঘের
খেলায় মাতবে এই জয়ন্ত। অমনিধারা
চলবে, নতুন নতুন প্রবীর আসবে; আসবে
জাহানারা।

আপন মনে বিড়বিড় করে হেসে
উঠল অমল।

[শেষঃ ১৬১ পৃষ্ঠা]

বলরামের গতিবিধি রহস্যজনক মনে
হয়েছে মানদার। বিশেষ করে সেই
বিমলা মাঝা মাঝার পর থেকে। কোথায়

যায় কি করে কেউ জানে না। সদাই
উদাসীন।

প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল মানদা
সদা আশ্বাত পেয়েছে একটা তাই অমন
মনমরা ভাব। তাই মানদাকে দেখেও
দেখে না। শ্মশানবৈরাগ্য।

মানদা জানে পুরুষদের অমন শোক
কয়েকটাবিনের জন্য। পুরনো বোঁ-এর
শোকে মনে হয় বৃষ্টি পাগল হয়ে যাবে।

দুর্ভাগ্যে মাস বা বার চক্কলম্বা একটু
বেশ তার বড় জোর ছ' মাস। তারপরই
শুধু সংসার বজায় রাখার জন্য আসে
শূন্য ঘরে ঘরণী। এ লোকটা ব্যতিক্রম।
যে মানদার প্রথম পক্ষের বোঁ হবার কথা
ছিল সে এখন দ্বিতীয় পক্ষেও চাপে
পাচ্ছে না। অন্য কোথায় যে বাধা পড়ল
মানদা তাই নিয়ে মানদার ভাবনা।

বলরাম নদীর পাড়েই বসে ছিল
জলের দিকে চেয়ে। তর তর করে বয়ে
চলেছে নদী। মানদার জীবনটা অমন
ব্যস্তগতিতে চলতে পারে না কেন,
কোথায় তার বাধা তাই বৃষ্টি ভাবছিল।

মানদা কাছে গেল পা টিপে টিপে--
কি গো, অমন করে কার কথা ভাবছ
কালো সখা? আমাকে নাকি?

হাসতে হাসতে দু'তিনিতে হাত দিয়ে
একটু সোহাগ করল মানদা!

—যা, হাসি-মস্করা ভাল লাগে
না!

—কেন প্রাণসখা! এতো বৈরাগ্য
কেন? যা যায তা কি আর ফেরে!

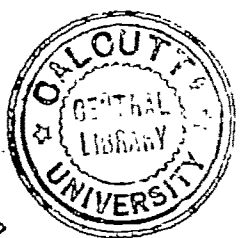
বলরাম উঠে গেল বিরক্ত হয়ে।
মানদা এখন নিজের কথাই ভাবছে।
ভাবতে স্বাক লাগে। বলরাম তার
জীবন থেকে হারিয়ে গেল নিঃসন্দেহ।
স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিল দু'জনা
মিলে। চেয়েছিল জায়গা জমি করে
সংসার পেতে বসবে।

একসঙ্গে ছেলেবেলা থেকে বড়ো
হয়ে, খেলে, মাঠ মাঠে ঘুটে কুড়িয়ে, বনে
বনে কাঠ ভেঙ্গে জীবিকার সম্মানে
কাছাকাছি থেকে মনের কাছেও এসেছিল।
তারপর সেই মন এক হোলো না! শুধু
সই বিমলার বাপের দেড় বিষে জমির
জনাই কি! ঐ জমি তো বলরামের

মামি সখা



ধর্মদাস মথোপাধ্যায়



বাপেরও ছিল। সে জমি গেল কোথায়? শব্দরূপের জমিও তো রইল না। সবই তো হারু ঠাকুরের গ্রাসে চলে গেল। জমি গেল বউ গেল তবু সে মানদুটো ফেরে না। কিসের নেশাঘ ঘোরে মাতালের মতো। আবার কি জমিওয়ালা বৌ খুঁজছে নাকি?

নিজের মনেই প্রশ্ন করে মানদা আর জবাব খোঁজে। তারপর একদিন দেখা হতেই বলে—কি গো সখা! পুরনো হাঁড়ি বাঁতল হলে মানুষ তো নতুন হাঁড়ি কাড়ে? তোমার মতলব কি?

বলরাম জবাব দেয় না। হাসে মচকে মচকে।

—জমিওয়ালা বৌ-এর খোঁজ পেলে নাকি আর একটা?

—না, ললিতা সখী তোমার কাছে খোঁজ-খবর আসচে নাকি?

—হাঁ, হারু ঠাকুরের মেয়ে আছে না?

হারু ঠাকুরের নামে জ্বলে উঠল বলরাম। তার বাপের জমি শব্দরূপ নয় শব্দরূপের জমিও গিয়েছে ঐ ঠাকুরের গ্রাসে। হারু ঠাকুরের নামে লোকটা উধাও হল। আশ্চর্য!

মানদা হাসছে আপন মনে, ভাবছে পুরান কথা। এখন নদী পার হয়ে ওপারে যাবে ঘুটে কুড়োতে। এক নৌকায় সই বিমলাকে দেখে চোঁচিয়ে উঠল—সই যে! কোতায় চললে জোড়-মানিক মিলে?

বিমলা লজ্জা পেলে মানদাকে দেখে। ঘোমটাটা তুলে দিল মাথার ওপর। তৃপ্তিসূত্রে ভরা মৃদুটাকে উজ্জ্বল করে মচকে হাসল একটু। তাবপব ইসারায় দেখিয়ে দিল বলরামকে।

—ও সুবলসখা! কোতায় গো বউ নিয়ে সেজেগুজে—

—নামটা বললে গেল যে সই।

মানদা হাসল একটু। তারপর বলল—নামটা বদলালেও মানদুটা একই আছে। তোমার কালাচাঁদ আমার গুবরাসখা।

শব্দরূপে গেল।

বলরাম ভাবাছিল আর দেখাছিল মানদাকে বলল—ললিতা সখী যাবি আমাদের সঙ্গে টৌকি দেখতে?

মানদা হাসল একটু মানদা! তারপর বলল—হঁ, সেই যে মানদু কি বলে না, কুঞ্জের আবার চিং হয়ে শোবার সখ।

—কেন ভাই সই, চল না একসঙ্গে যাই। বিমলা অনুমতি করল ওর হাত দুটি ধরে।

না গো সই, আমার কি টৌকি

বেখেতে গেলে চলে। আমি গেলে ঘুটে কুড়োবে কে?

—একদিন না গেলে কি হয়।

—না ভাই তোমরা যাও! আমি তোমাদের মাঝখানে থেকে কেন রসভোগ করি! তোমরা মনে মনে গালাগাল দেবে সে কি ভাল হবে।

—কার মাঝখানে কে এসে রসভোগ করল?

বিমলার কথায় তিনজনেই ওরা চমকে উঠল। এ ওর মৃদুখের দিকে চাইল। সবাই অপ্রস্তুত। এতক্ষণ কথার যাদুতে যে কথা চাপা দিতে চেয়ে দুই সখীতে হাসিতামাসায় মেতেছিল তা অতীকৃতে বোরিয়ে এল বিমলার মৃদু দিয়ে। যেন নিজের অপরাধ নিজেই স্বীকার করে নিল বিমলা। শব্দরূপে সে নয় বলরামও কম দোষী নয়। জমির লোভে বিয়ে করল বিমলাকে। এই জমির লোভ দেখিয়েছিল মানদাই।—লোভ দেখিয়েছিল চাষী হতে। বলিছিল—মেয়েমানুষের সঙ্গে সঙ্গে কদিন ঘুটে কুড়িয়ে আর বনে বনে কাট ভেঙে কাটাবি। মরদের মতো জমি করে চাষ করতে পারিসনে!

—মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিসনে মনো, জমি অমনি মৃদুখের কতা! জমি বললেই জমি পাওয়া যায়।

—কেন, বাবুরা যে মিটিনে লেকচার দেয় জাম যে চাষ করবে তার। তুই মুনিস খাটবি জমি পাবিনে কেন? জমি নিতে হবে! বল বাবুদের জমি চাই! না হলে আমরা গরীবেরা এক-জোট হয়ে জমি কেড়ে নেব।

—ধাম, ধাম, বাবো হাত কাপড়ের কাচা নেই ষাদের তাদের বড় রড় কতা ভালো লাগে না।

ভাল মানদারও লাগে নি। তাই বলরামের সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরছে সে, যেখানে বলরাম সেখানে মানদা। শহরে গিয়েছে কাঠ বেচতে দু'জনে একসঙ্গে, বনে কাঠ কাটতে তাও তারা জোড়ায়। আর ঘুটে-কুড়োবার সংগীদের মধ্যে এক-মাত্র পুরুষ বলরাম বাকী সকলেই মানদা বিমলা তারামণির দল।

বিমলা ঠাট্টা করেছে—সই লো একটা মনের কথা কই?

—কি বলবি বল না, তু কেন?

—আর কবে সোঁদিন আসবে তোর বাড়িতে দু'মুঠো খাব। চিরকাল কেবল লোক দেখানো জোড়া বেধে রইলি, বাসা বাঁধবি কবে?

—কেন তোর বড়ি সখ খব! তা তুই-ই জোড়া বাধ না সই! আমার আপত্তি নেই।

—সত্যি বজাছিস তো! মন খুলে? না ভাই দরকার নেই। সেই কথায় বলে না মানদুঃ

পরের সোনা দিও না কানে, টেনে নেবে হেঁচকা টেনে।

পরের সোনার লোভে জোয়ান মরদ এতদিনের ভাব-ভালবাসা ভুলে পরের খোঁদে মৃদু দিল। নিজের মুরোদে জমি করতে পারল না এক বিধে। বড়ো শব্দরূপের মরতে তবে জমি এল হাতে। সেই পড়ে পাওয়া চোন্দ আনা নিয়ে লাফালাফি। নিজের মুরোদ বোঝা গেল। নিজেরা চাষী ছিল সে ভুলেই গিয়েছিল। বাপ ঠাকুরদা মাটি কামড়েই বেঁচে ছিল সে কথা মানদাই মনে করিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু কাকে মনে করাবে। মানদার কথায় রাগ হয়েছে—তুই জমি জমি করিস, জানিস মানদু জমিজমা বিক্রী করে শহবে চলে যাচ্ছে।

—জানি। সে ভন্দরলোক যারা তারাই। তাই বলে চাষী চলে যাবে! জমির জন্য চাষী জান দিয়েচে শুনিস নি!

—শুনিনি, মানদা সিং-এর নাম শুনিনি।

বলরামের এই কাপড়রূপের মতো ঠাট্টায় মানদা কান্না পেয়েছে। এমন অপদার্থ মানদুটাকেই মনের মানুষ হিসেবে ভালবেসে মবল অবশেষে।

ভিতরে ভিতরে কোথায় চিড় খেয়েছিল। একই সঙ্গে ভালবাসা আর ঘৃণা বাসা বেঁধেছিল। জমির ক্ষুধা বলরামের না থাকলেও মানদার ছিল।

অজুও আছে। মানদাকে ডাকতেই ছুটে গেল। যেভাবেই হোক জমি এখন বলরামের। সেই জমিতে চাষ হচ্ছে ডাক এসেছে মুনিস খাটার। মুনিসের খুব দর। মিলছে না সহজে। সারা মাঠ জুড়ে শব্দরূপে বীজ বোনার মরশুম।

ভালই হয়েছে মানদার কাজ মিলেছে। এই ঘন বর্ষায় সব কাজ বন্ধ। এই বর্ষাই চেয়েছে চাষী। তাই শ্রাবণ নেমেছে অকোর ধারায়। তাবৎ কৃষক চেয়েছিল আকাশপানে চাতকের মতো। গুন গুন করে দোয়া প্রার্থনা করেছে 'আজ্ঞা মেঘ বে পানি দে'। ঘন ঘন দোয়া গরজন। তারপর আকাশ ভেঙে নেমেছে বাদল ধারা।

লাঙল দেওয়া আছে ভাল করে। এখন কাদা কুর বীজ বুনবে বিমলা বলরামের সঙ্গে। বর্ষার এই ধারা-বিররণে পিঠে একরাশ কালো চুল ছাড়িয়ে দিয়ে ভিজতে ভিজতে এক হাতে বীজের গুঁচ নিয়ে অন্য হাতে টপাটপ কাদার মধ্যে পড়ে দেবে দু'তিনটে একত্রে। বলরামের সঙ্গে সমানতালে হাত চালাবে বিমলা কিছতেই সে হার মানবে না। চাষীর মেয়ে সে-ও যত

ভাল মুনিসই হোক বলরাম বিমলাও এক ফোটা বৃষ্টি মৃদাবিন্দুর মতো টল টল করবে।

হোলো না! মনের সাম মনেই রইল তার। একেবারে শয্যাশায়ী। সে-ও শয্যা নিল আর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি অনেকদিন দেখে নি বিমলা।

বলরাম যেন খুশি তেমন বিবর্ত। হাতে পয়সা নেই। বীজ কিনতে হবে, মুনিস লাগাতে হবে। বিমলার অসুখটা বাঁকা পথ ধরেছে, ডাক্তার আনতে হবে।

—না, না, ডাক্তার এখন থাক, তুমি বীজের টাকা জোগাড় কর! দেখ না হারু ঠাকুরের কাছে, টাকা পাও নাকি?

হারু ঠাকুরের কাছে টাকা মিলল, টাকা দেবার জন্যই ঠাকুর বসে ছিল। যাওয়া মাত্র এমন আপ্যায়ন করল যেন গুরুঠাকুর এসেছে।

—আরে এসো এসো বলরাম কি মনে করে, সব খবর ভাল তো?

—আজ্ঞে না, বিপদে পড়ে এয়েছি আপনার কাছে। বউটার অসুখ, তা ছাড়া আবাদ লেগেছে, টাকা চাই।

—ভয় কি! বিপদ কেটে যাবে। টাকা পয়সা তো বিপদেই দরকার। তা আমার কাছে তো নেই! জানই তো একজনের কাছ থেকে এনে দিই। মানুষ বিপদে পড়লে তো থাকতে পারিনে। সে আবার সুদ নেয় টাকায় টাকা। আমি বলে কয়ে কিছু কম করাব। তা কত লাগবে?

টাকা নিয়ে এল বলরাম। ডাক্তার আনতে যাবে বাধা দিল বিমলা আবারও।

—ডাক্তার লাগবে না, তুমি মুনিস দেখ, বীজ কোতায় পাও খোঁজ নাও। সেই তো এমনি কোতায় যায় না কাজে, তাকেই নিয়ে এসো ভাল কাজ পাবে। গরীব মানুষটা দরুণে পয়সাও পাবে।

—কিন্তু তোর অসুখ—

—আঃ, খালি এক কতা। ঐ দেখ আবার দেয়া গর্জন, খুব ভন্যা নামবে। শীগগির যাও! দেখ আকাশে মেঘের কি বাহার! যাও, যাও। আর দেরী করো না জো ফসকে যাবে।

বৃষ্টির মধ্যে ভিজে একাকার হয়ে ধরে নিয়ে এল সইকে। মানদাকে দেখে চমকে উঠল বিমলা। এ কি রূপ। এই রূপেই তো সে মাঠে নামতে চেয়েছিল। ওই রকম করে কোমড়ে কাপড় জড়িয়ে মাথা ভরা চুল এলিয়ে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে ছুটে বীজধান নিয়ে মাঠে। ঠিক সই-এর মতো টপ টপ করে জল ঝরবে চুল বেয়ে কপালে, কোথাও কপালের ওপর ঝুঁকেপড়া একটা অবাধ্য চুল পাক খেয়ে খেয়ে দোল খাবে আর তার ডগায়

—সই এসেছে! এ কি ভাল যে লাগচে! এই দেখ না, আমি বিছানায় পড়ে, কে মাঠে যাবে। কে বীজ বুনবে, কে কি করবে। তুমি যাও তাই। আমার হয়ে মাঠের কাজটা করে দাও। আমি ভাল হয়ে মাঠে যাব, কাটা ধান পাঁজা করে করে ভুলে আনব, খামারে। তারপর লক্ষীকে চরে তুলবো জলখারা দিয়ে—লক্ষীর পায়ের ছাপ দেব পশুর ওপর। সেই ছাপে পা দিয়ে দিয়ে ঘরে উঠবেন মা।

বিমলা স্বপ্ন দেখে। কথা বলতে বলতে হাঁপায়। একটু শান্ত হয়ে দেখে ওরা দু'জন চলেছে মাঠে। বলরামের মাথায় টাকা আর সই-এর মাথায় চুল এলো। বীজধান মাথায় নিয়ে বলরাম চলেছে। মাঠে মাঠে ডাক এসেছে ফসলের ডাক। ভাবী ফসলের স্বপ্ন চাষীর চোখে মুখে।

বিমলার চোখের সামনে দিয়ে ওরা গেল। বৃষ্টির দাপটে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ওরা। মানদাকে দেখল নতুন রূপে। এই রূপ দেখে প্রথমে ভয় হয়েছিল, এখন ভয় নেই। সই-এর এই রূপের মধ্যে দিয়ে তার রূপ প্রকাশ পেয়েছে। তার ইচ্ছার প্রতিফলন সই-এর এখনকার সমস্ত কাজের মধ্যে। মাঠে ধান রুইতে চলেছে মানবা নয় বিমলাই। বিমলার কামনা বাসনা সব কেন্দ্রীভূত হয়ে রূপ নিয়েছে মানদায়। মানদাও তো এই চেয়েছিল। চাষ করতে, চাষীর সাক্ষী হতে।

বিকালের দিকে ফিরে এল বলরাম মাঠ থেকে হস্তদস্ত হয়ে। বীজ কম পড়েছে। রোয়ার কাজ বাকী রয়েছে এখনও।

—বিমলা! বিমলারে! ঘুমিয়েছি। আর একটু ঘুমো। আমি আরও চাষি

বীজ নিয়ে আসি। বীজ টান পড়ে গেল যে।

হারু ঠাকুরের কাছে টাকা নিয়ে বীজ এনে আবারও মাঠে গেল বলরাম। বউ আশ্বাস দিয়েছে ভয় নেই। আগে চাষ তারপর অন্য কিছুর। জো ফসকালে জো আসবে না। বলরামের চোখেও তাই ফসলের স্বপ্ন। ধান রোয়া শেষ করে যখন বাড়ি এল বর্ষা থেমেছে। বিমলারও শুকপুতুনি থেমেছে। বৃষ্টির ওপর ঝুঁকে পড়ল বলরাম। ফসলের স্বপ্নে এমন করে ঘুমিয়ে পড়ল বিমলা এই অসময়ে।

মানদা মাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। সারা মাঠ জুড়ে সবুজের বন্যা। যে শিশু ধানগাছ পুতেছিল মানদা সেই গাছ এখন মাথাচাড়া দিয়ে আকাশের পানে মুখ তুলেছে। হাওয়ায় বোল খাচ্ছে মাথা-গুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে, নয়তো পাতায় পাতায় হুঁ লেগে আওয়াছ উঠছে শিরু শিরু। কেমন যেন স্বপ্নের ঘোব লাগে মানদার। ঐতো সইয়ের ভূমি। সে বীজ বুনছিল। কেমন সুন্দর ধান হয়েছে। সই নেই বলরাম আছে। জমিও আছে। কিন্তু ও জমি আর বলরামের নয়। সই যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে। অনেক স্বপ্ন দেখেছিল। নবায়ের স্বপ্ন। সেই নবায় হবে তারই জমির ধানে হারু ঠাকুরের বাড়িতে। এমনি করেই চাষীর স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেয় হারু ঠাকুরের মতো সুদী মহাজনরা। সইকে বাঁচাতে টাকা নিয়েছে আরও। খালি হাতে হারু ঠাকুর কত দেবে। অতএব বিক্রি কবলার জমি বাঁধা রাখ। জানে কম টাকা দিয়ে বেশি দাম লিখিয়ে যে কবলা সে আর ফেরৎ নেওয়া হয় না।

লক্ষী সদাই চণ্ডা গরীবের ঘরে। এই চলে আসছে। জমি যে চষবে থাকবে না তার কাছে। দেনার দায়ে

ইম্পিরিয়াল

চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা



পানে ও আপ্যায়নে

ইউকো প্রাইমিং

৪নং বাজা উড মন্ট প্রিট
কলকাতা-১

রোগের দায়ে, সাময়িক বীচার জন্য তা
চলে যাবেই।

—না, এ অনায়াস! না, না—

মাঠে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ
বোঁরিয়ে গেল কথাগুলো মানদার মূখ
দিয়ে। তার জমির কৃষ্ণা ছিল পুরুষকে
ঘিরে। পুরুষ আসে নি বলে কৃষ্ণা
থাকবে না। চাষার ঘরের এই একমাত্র
স্বপ্ন, এই মাটীই হোলো তার ইহকাল
পরকাল সর্বস্ব। বলরাম তার জমি চাষ
করতে নিয়ে এই কৃষ্ণাকে বাড়িয়ে
দিয়েছে। যে স্বপ্ন ছিল সঙ্গু তাকে
জাগিয়েছে। যে জমি সে নিজে হাতে
চাষ করল তার ধান উঠবে হারু ঠাকুরের
ঘরে।

তাই খুঁজে বোঁড়িয়েছে বলরামকে।
বলরামকে সঙ্গে চাই। বিমলা যেমন
করে জমি দিয়েছিল মানদাও দেবে। এ
পর্যন্ত দেখা হলে হাসি তামাসা করেছে।
নতন করে ঘর বাঁধতে বলেছে। নতুন
হাঁড়ি কাড়তে বলেছে পুরনো বাতিল
হলে।

কিন্তু লোকটাকে পাওয়া যায় না।
সে হয়ে উঠেছে আরও রহস্যময় পুরুষ।
নিশ্চয়ই পড়েছে কোন যাদুকরীর
পায়ায়। বিমলার চেয়েও যে জাদু
জানে। মানদা জাদু জানে না। তবু
সে বলরামকে অনেক কিছু দিতে
পারবে। আর কিছু না পারুক জমির
স্বপ্ন দেখাকে করতে পারবে চিরন্তন।

—এই যে সখা! সবই তো গেল
এখন নতুন কোন বোম্বটমীর খবর পেয়েচ
নাকি?

অনেকদিন পরে বলরামকে হাসতে
দেখল মানদা।

—বোম্বটমী কি আমার চেয়েও
সৌন্দর্য!

ঘাড় নাড়ল বলরাম। তারপর নবী
পার হবার জন্য খোঁয়া নৌকোয় চাপল।
শুধু এবারও মচকে হাসল বলরাম।
নদী পার হয়ে হন হন করে দ্রুতপায়ে
চলে গেল মাঠ পেরিয়ে।

—সুবলসখা, আমি যে যাব তোমার
সঙ্গে।

বলরাম হাত নেড়ে বারণ করল
তাকে। তারপর মিলিয়ে গেল একসময়
পৃথিবী আড়ালে।

সুবলসখাকে আরও রহস্যময় মনে
হোলো মানদার। সত্যিই কোথায় যায়
বলরাম। ঘটাট কুড়োতে কুড়োতে
কেবলই ভেবেছে বলরামের কথা।
মানুষটা কেমন যেন হয়ে গেল। ওর
চলাফেরা খাওয়া থাকা সবই রহস্যময়।
সত্যিই কোন আশঙ্কার খবর পেয়েছে
নাকি? সেখানে কি নিত্য মাধুকরী
চলে?

কয়েকদিন পর দেখা। এক নৌকোয়
শাব হল মানদা। অন্ধ তাকে ছিল।
নৌকোয় একটি কথাও না। শুধু চোরা

চোখে দেখল মানুষটাকে। ভাবছে
কিছু। নিশ্চয়ই নতুন বোম্বটমীর কথা।

অনেকটা দরদর রেখে অনুসরণ
করল মানদা। বর্গম পথ। কাটাগাছ
আর আগাছার ঝোপ। ক্রমেই বন গভীর
থেকে গভীরতর ভয় ভয় করছে মানদার।
ভয় করতে গিয়ে হারিয়ে গেল মানুষটা।
অন্য পথ ধরেছে নয়তো মানদাকে
দেখেছে পিছন ফিরে। ফিরে এল
মানদা। এবার দেখা হলে দুকথা
শুনিয়ে দেবে আচ্ছা করে। একদিন না
একদিন হবেই—কি গো বীরপুরুষ!
বউও গেল, জমিও গেল! তাহলে জমির
নেশা সত্যিই ত্যাগ করলে?

অনেকদিন পরে দেখা হতে মানদা
কলকলিয়ে উঠল। এই গালাগালির
পরও অবলালীয় হাসতে লাগল মৃদু
মৃদু।

—আমি সব জানি তোমার রহস্য।
কোথায় কি কর কিছু জানতে বাকী
আছে নাকি?

বলরামের হাসিমুখ কঠিন হল
এবার।

—এ গহীন বনের মধ্যে কি হয় কি?
কিছু জানিনে বন্ধি!

শান্ত চোখদুটো জ্বলে উঠল
অকস্মাৎ দপ করে।

—নিশ্চয়ই কোন মেয়েমানুষকে
নাকিয়ে রেকেচ ওখানে? নইলে ওখানে
কি কাজ আছে তোমার।

বিদ্যুৎ চমক থেমে গিয়ে আবারও
রোদ উঠল। হাসি দেখা গেল বলরামের
মুখে।

—ছিঃ ছিঃ, হাসতে লজ্জা করে না
সখা! দেনার দায়ে জমি গেল বলে
বৈরাগী হতে হবে। শক্তি নেই
পুরুষের। তেজ। লড়াই করতে জান
না! কত জায়গায় যে জমি নিয়ে লড়াই
হচ্ছে খবর রাখ না। কি হবে মেয়ে-
মানুষের মতো বেঁচে থেকে। এর থেকে
মরাও ভাল বুঝলে সখা! বাঁচতে
গেলেই লড়াইতে হয় শোনো নি।

—লড়াই! লড়াই ফড়াই বন্ধিনে
সখী ভূমি যদি আমাদের আখড়ায় যেতে
চাও নিয়ে যেতে পারি। দেখাও করিয়ে
দিতে পারি আমার নতুন বোম্বটমীর
সঙ্গে। যদি পছন্দ না হয় তখন ভাবা
যাবে লড়াই-এর কথা।

—তাই নিয়ে চল! বেশি কেমন
তোমার বোম্বটমী!

—বেশ তৈরি থেকে। নিয়ে যাব
একদিন।

তৈরি থাকতে হোলো না। মানদার
গ্রামে হুলস্থূল পড়ে গেল। হারু
ঠাকুর খুন হোলো। কেউ বলল ব্যক্তি-
গত শত্রুতা। কেউ বলল দলের কাজ।
অনেকে খুশি বহু লোকের সর্বনাশ
করার জন্য। এ অঞ্চলের অজ্ঞান গরীব
কৃষকের জমি তার গহবরে। গৃহস্থ-

বধের সর্বনাশের কারণ হারু ঠাকুর।
পুলিশ ছেয়ে ফেলল গ্রাম। খুঁজে বের
করবে আসামী। হঠাৎ একটা নম নিয়ে
ফিসফিস কানাকানি। অবাক হল
সকলে। অবাক হল নামটা শুনে।
মানদাও শুনল। হাসল মনে মনে আর
বলল : “শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর।”

ঘটাট কুড়োবার জন্য নদী পার হয়ে
বেশ কিছু দূরে দেখা একটা ঝোপের
আড়ালে। হন হন করে চলেছে মানুষটা
চোঁচিয়ে উঠল মানদা।—কে?

—ঘাড় ফিরিয়ে লোকটা দেখল
একবার।

—তোমার নামে কি সব শুনচি থে—
শুনল না। লোকটা দ্রুত চলে
গেল। কোন সাড়াও দিল না।

মানদার মনে হল অন্য বেউ নাকি?
যাকে মনে করেছে সে হোসে সাড়া
দিতো নিশ্চয়ই।

ঝোপের বাইবে আসতেই দারুণ
চমকে উঠল মানদা। পুলিশ। রাই-
ফেল উঁচিয়ে এগিয়ে চলেছে ধীরে
ধীরে।

—এই মাগী, এখানে কার্ডকে দেখে-
হিস। কোন লোককে!

—না তো!

—আমরা দেখলাম! তুই দোঁধস নি।
তুই বোধ হয় দলের। সত্যি কথা বল,
নইলে দিখোঁহিস।

—সত্যি বলচি বাবু! এ-জগলে কে
থাকবে?

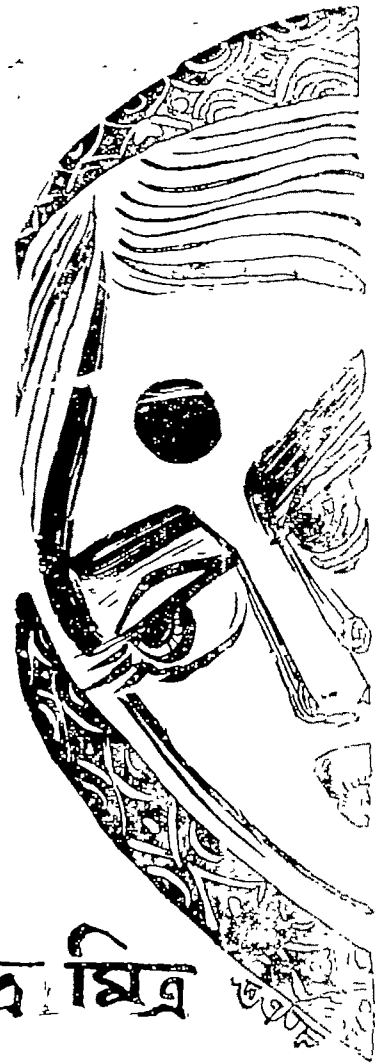
—কে থাকবে জানিসনে, এ মাগীও
বোধ হয় এ দলের—

—হাঁ, হাঁ, এই মাগীই যতো নষ্টের
গোড়া—এই মানদার সঙ্গেই তো ওদের
স্বত পিরীত—ওই তো জমির লড়াইতে
উসকে দিয়েছে এ নেংটা মানুষ-
গুলোকে।

—এই মাগী কথা কসনে যে! বল
কোথায় তারা? বলেই বন্দুক
সঙ্গীনের এক খোঁচা দিতেই ‘মা গো’
বলে চীৎকার করে উঠল মানদা।
ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটল। সঙ্গে সঙ্গেই
বিকট শব্দে বোমার আঘাতে কেঁপে
উঠল সমস্ত বনভূমি। আত’নাব উঠল,
কাতরানির শব্দ মেলাতে না মেলাতে
রাইফেলগুলোও গর্জন করে উঠল।
শব্দ হল দু’পক্ষের অদৃশ্য তুমুল
লড়াই। মৃদুমৃদু গগন বিদীর্ণ করা
আওয়াজে মগ্ন হন নতুন বণেশ্বর।
বনের পশুপাখি উড়ে গেল ভয়ে।

শব্দ বনভূমি। লড়াই থেমে গেছে
অনেক আগে। গভীর রাত। মানদার
মৃতদেহের কাছে এসে কে যেন বসল
তারপর গভীর মমতায় মাথাটা কোলে
তুলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—ললিতা
সখী, লড়াই দেখবে না? শেষ লড়াই
যে এখনও বাকী!

ইডাক্যই



বীরেন্দ্র ঘিট্র

"স্কাউন্ড্রল!" কাগজটাকে এক ঝটকায় আছড়ে ফেলল গৌতম। ডঃ গৌতম গাঙ্গুলী। বললে, "রাবিশ!" বলল ঐ প্রভাতী সংবাদপত্রটা লক্ষ্য করেই। সেটা তখন খড় খড় করে উড়ে বেড়াচ্ছে মোজাইক মেঝেয়। কতিত-মন্ড মুরগী ঝাপটে বেড়াচ্ছে যেন নিঃপ্রয়োজন ডানা দুটো। একটা পাক খেয়ে অবশেষে নিস্তেজ কাগজটা শূন্যে পড়ল। গৌতম দেখল, তখনও একটা কাগা মরা চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বড় হরফের হেড লাইন হা হা করছে কার্টুনিস্টেব-চোখে-দেখা দাঁত বার করে : "ডঃ গৌতম গাঙ্গুলীর অপসারণ দাবি তদন্তের জন্য রাজনৈতিক মহলের চাপ অভিযোগ পাঠা অভিযোগ" গৌতম নাড়া দিয়ে দেখল, চার-মিনাবের প্যাকেট খালি। সোনালী চা পাতলা পেয়ালায় জুড়িয়ে গেছে অনেক-ক্ষণ। কাপের কাগায় সরের প্রলেপ বাসি ঠোঁটের মতো নোংরা। একটা মাছি উড়ে উড়ে স্বাদ নেওয়ার চেষ্টা

করছে। চোখ ফিরিয়ে দেওয়ার ঘড়ির কাঁটা দেখল গৌতম। আটে নয়ে তীরের ফলাদুটো বিঁধে আছে। লেটেস্ট ডিজাইন-এ ঘড়ির পেণ্ডুলাম নেই। ঘড়ি চলছে না বন্ধ একথা হঠাৎ তুমি বলে দিতে পার না। কাল রাতে বন্ধ হতে পারে। আজ পোনে আটে বিঁধে থাকতে পারে। রজ্জা নিশ্চয়ই বাথরুমে। সাড়া শব্দ নেই। আর সমস্ত কিছুর এতো বেশি নিঃশব্দ। কাগ পাতলে ঘড়ির আওয়াজ শোনা যায়। কিন্তু গৌতম কাগ পাতে না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একাকীত্ব যেন বুক চেপে বসছে। আর ঠিক এইসব মুহূর্তেই বজ্রার বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে আরাম করা চাই।

আচ্ছা, চায়ের কাপটাকেই একটা আছাড় মারলে কেমন হয়? রজ্জা ছুটে আসবে কলঘব থেকে। বড় অলপ আতঙ্কিত হওয়ার রোগে পেয়েছে ওকে। কিন্তু না। মেজাজ আসছে না। কোনোদিন সম্ভব বিরক্তি প্রকাশের

স্বভাব নেই। প্রশাসক হিসেবে সেটা কি গৌতমের একটা বড় ফৌলও না? গত আট মাসে অফিসে কোনোদিন স্টাফকে তটস্থ করার জন্য হেঁচকি করতে পাবে নি গৌতম। কেন করবে, মানুষগুলো কেঁত তো মন্দ নয়। মনুষ্যোচিত ব্যবহার পেলে একটু আশ্চর্য হয় বটে। হয়ত একটু কম কেয়ার করে। তা হোক, তাতেও কাদের কোনো অসুবিধা হয় না। বরং একটা পরিবারের মতো কাজ-কর্ম চলে ঠিক তালৈই। নই কেন একটু বেশি বকে ওরা। কেউবা অভিরিঞ্চ সম্মান জানাতে চিনির মতো হাত গলে যায় ওপরওয়ালার সহন-ভািত জল গায়ে মেখে। ওরা জানে, গৌতম ওদের রাজা করতে পারে না। তবে ওরা তারও জানে, গৌতম ইচ্ছে করলে ওদের ক্ষান্ত করতে পারে। তাই ওরা না কাদার পুতুল। ওরা এতো অসহ্য। ওদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে। তাই সবে হয়ত যেতেই হবে। রাজনৈতিক রেশ্য-রেশি, সংবাদপত্রের যোগসাজস আর

নতুন সরকারের কোপ। সবকিছু সামলে নেওয়ার ক্ষমতা গৌতমের নেই। গৌতম অশান্ত অফিসটিকে শান্ত করতে পেরেছিল। কারণ মানুষগুলোকে ভালবেসেছিল সে। ঠিক যৌবনে সে তার ছাত্রদের যেমন ভালবাসত। স্ফাচ : আমি, ডঃ গৌতম গাঙ্গুলী আজ একটা নিউজ হয়ে গেলাম! আশ্চর্য, অনেকখানি জায়গা কাগজওয়ালারা আজ আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। মিনিষ্টারদের মতো আমাকে নিয়েও হেড লাইন ছাড়ছে ওরা। অথচ চার-চারটে বই লিখেও অত পার্বলিসিটি পাই নি। সমালোচনা ছাপানোর জন্য একবার এক সম্পাদককে কোঁকের মাথায় পেগ কয়েক জনি ওয়াকার ওভ স্কচ খাইয়ে টুই-শনের সব টাকাটা খরচ করে ফেলে-ছিলাম। আর আজ? না চাইতেই প্রচারের বর্ষ। অপ্রস্তুত কাঁচা সড়কে কাদা ঠেঁরি হয়েছে মাত্র। রিপোর্টার উমেশ পাকড়াশির প্রমোশন হবে হয়ত। গৌতম গাঙ্গুলীকে বিখ্যাত করে উমেশ পাকড়াশির স্পেশাল করসপন্ডেন্ট হওয়া! চমককার। গৌতমকে গাছের ফলের মতো পেড়ে ফেলে তার গায়ে ছুরি চালিয়ে চোকলা ভুলে টেস্ট করিয়ে রাজনৈতিক প্রচার : দেখো, এ ফল টক। তাই এ গাছের ফলগুলো টক। অতএব এগাছ টোকো এবং এর মলোচ্ছেদ প্রয়োজন। চমককার!

আরে না, না। গাছের উপমাটা ঠিক নয়। আমি তো সেই টোকো রাজনীতি গাছের ফল নই। অথচ এই উপমা আমার মাথায়ও আসছে। যদিও আমার সঙ্গে রাজনীতি-গাছের কোনো সম্পর্ক চাই। ব্যক্তি সরকারের পলিশকে রূপ দিয়ে-ছিলাম প্রশাসক হিসেবে। আমি রাজনৈতিক নই। অথচ এই সব কাগজে প্রচারের কী ক্ষমতা রে বাবা! আমাকে রাজনৈতিক ঘানিয়ে দিল এবং আমিও ঐ লাইনে উপমা জানাচ্ছি।

বেশ মেশিনটা বসিয়েছ চাঁদু। ইচ্ছে করলে স্বাভাবিক করলে ফেমাস, কারকে কুস্তা বানাতে পারো। আমরা ঈশ্বরকে খুঁজছিলাম। সভ্যতা নামক সৃষ্টির তুমি এক ক্ষুদ্রে ঈশ্বর। আর উমেশ পাকড়াশি! সৌন্দর্য তোমাকে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলাম, স্কাউটস্কেল! তুমি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলে, আই ইউল প্রভ ইউ এ স্কাউটস্কেল ডঃ গাঙ্গুলী!

সত্যিই তুমি প্রমাণ করেছো কথা।

আর আমি কী অস্তুত বোকা ছিলাম, এটি? তোমার মতো এতো বড় ঈশ্বরের প্রিপ্রেসেন্টিভেট চটিয়ে দিয়েছিলাম।

বস্তুত আমি একটা :

এ ফুল। এ শোয়াইন। এ স্কাউট-প্রবল!

গৌতম কি চিন্তাকার করছিল? আত্মবিস্মৃত হয়েছিল চিন্তায় ডুবে। নয়ত দরজার ফ্রেমে ও কে ফ্লিকড হয়ে আছে? রক্ত। ওর চোখে আতঙ্ক, মুখ বিবর্ণ।

গৌতম হাসবার চেষ্টা করল। রক্ত কিন্তু ব্যথিত দৃষ্টিতে মাপতে চাইছে গৌতমকে।

‘ভেতরে এসো রক্ত।’

গৌতমের কান্ডাকারখানা কয়েকদিন কেমন সম্মোহনক। ভয় করছে রক্তার। গৌতম, ডঃ গাঙ্গুলী, দর্শনে প্রথম শ্রেণীর প্রথম। যৌবনকালে যে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়েছে। আজ যার বয়স পঞ্চাশের চৌকাঠে পা পেতেছে। কদিন আগেও যে ছিল মর্যাদাবান একজন সফল পুরুষ। আজ তার এই মানসিক বৈকল্যে কোন স্ত্রীর বৃকের মধ্যেটা ধক করে না ওঠে! গৌতমের চীৎকারে রক্ত সত্যিই ভয় পেয়েছে।

অবশ্য রক্ত জানে, বয়সের মাপে মাপে গৌতমকে ঠিক ‘সেট’ করা যায় না। ওর মধ্যে একটা যৌবন চাপল্য সব সময়ই বয়সকে অস্বীকার করতে চায়। অকারণে হাসা, দু-একটা চপলমতি শব্দ ব্যবহার—তাকে ইতিপূর্বেও করতে শুনিয়ে। কিন্তু এমন একা একা দিবাস্বপ্নের ঘোরে ডুবে যেতে দেখিনি।

গৌতমের ছেলমানুষীর জন্যই আজ কঠোর ঠাকরণ হয়ে উঠতে হয়েছে রক্তকে। রক্ত আর গৌতম, গৌতম আর রক্ত, এই বাপ আর ছেলের সংসারটা সামলাতে হয় তাকেই। ওরা দু’জনই তো মস্তপক্ষ। রক্ত আবার এক কাঠি ওপরে। গৌতম স্নেহাপড়ায় মগন ছিল ঐ বয়সে। রক্ত গড়া আর পলিটিকলে ডুবেছে। খেলালী পিতার কাছ থেকে বাধা পায় নি কোথাও। অবশ্য বাবার নামও ডোবায নি সে। হাস্যর সেকেন্ডারীতে প্রথম জিনের এক। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে এখন সবার প্রিয় ছাত্রনেতা।

রক্তকে চুপ করে থাকতে দেখে গৌতম উসখুস করে আবার একটু হাসল, কিছূবা বোকাম মতো। বললে, ‘চা ছুড়িয়ে জল হয়ে গেছে-রক্তা!’

‘চারমিনার খবরসপ্রাপ্ত।’ প্যাকেট নেড়ে দেখালো।

‘একমাত্র তদারককারিণী ফ্রেড ফিলসফার গাইড এন্ড ‘মাই লভ’ স্নানাগারে। সুতরাং ফ্রেড সরকারের ডিগবাজি, কাগজে ঈশ্বরদের উদ্ভাস, উমেশ পাকড়াশির হাই জাম্প, নেতাদের নতুন-কুদর্ন, ‘রাজ্যপালের...’

চুপ কর, প্রিয়। একটা বিষয়ে বেশি ভাবতে ভাবতে মানুষ পাগল হয়ে যায়। তুমি জান না, তুমি গালাগাল দিচ্ছিলে। ও ঘরে রক্ত পড়ছে!’

গৌতম লম্বিত হয়েছিল। এখন তার ফর্সা মুখমণ্ডল রক্তা হয়ে উঠল। বললে, ‘পড়ছে না কি? রক্ত কী হবে, ইঞ্জিনীয়ার? কোনো লাভ নেই রক্তা। তার মানে ওকে কোনো প্রজেক্টে সরকারী চাকরি করতে হবে। তার মানে সরকারী নির্দেশ পালনের অপরাধে পাণ্টা সরকারের বিরাগভাজন হতে হবে ওকে। বাগে পেলে কাগজে ঈশ্বর ওকে ওর বাবার মতো রাতারাতি ফেমাস করে দেবে এবং ওর কচি বৌ তোমার মতো সংঘত আচরণ করতে না পেরে হয়ত পা ছিড়িয়ে বসে কাঁদবে।

মেকের ওপর কাগজটা আবার পাক খেতে শুরুর করেছে। রক্তার নজর পড়ল সৌদিকে। আর তাকেই সেই অক্ষর-গুলো আরও নজরে এলো। বস্তুত গৌতম বলেই এখনো পাগল হয় নি। লোকটার অস্তুত সহ্যশক্তি। রক্তা হলে লম্বা শয্যা নিত হয়ত। জ্বরবে ঘোরে ভিলিরিয়ম। গৌতম কিন্তু গত কালও অফিসে গেছে।

রক্তা কাছে গিয়ে গৌতমের কপালে হাত রাখল। পরে সার্টির মধ্য দিয়ে বৃকের উত্তাপ পরীক্ষা করে বললে, ‘ভেঙে পড় না লক্ষ্মীটি। আমি চা আনছি।’

‘একটু বোসো।’ গৌতম হাতটা ধরে আকর্ষণ করল রক্তাকে।

রক্তা বললে, ‘অফিস যাবে না?’

‘এখনো ঠিক করি নি।’

‘ওর আবার ঠিক করার কী আছে। বড় গাছে তমন একটু ঝড় লাগেই। তাবলে মাথার ওপর ছাউনী পেতে বসে থাকবে? দাঁড়াও চা আনি।’

গৌতম আবার চিন্তাপাত হয়ে শুরুর পড়ল নরম বিছানায়। বাস্তবিক কী রমণীয় এই খাট, গদি আসবাব এবং রক্তা। কী অস্তুত শান্তি রক্তার চোখে, রক্তার সর্বাত্মক সবেশনায়।

ইদানীং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুলে রক্তা উন্মিশ্ন হচ্ছে। আর তার জন্য কেউ উন্মিশ্ন হলে অবিস্তি বোধ করে গৌতম। পরীক্ষার সময় মা যে ছেলের সমস্ত প্রয়োজনীয় সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হইতেন, বাবা শব্দ নিতেন ঘন ঘন, এ সবই সাংসারিক ভালোবাসার ব্যক্তরূপ। গৌতম মা, বাবা, ভাই বোন প্রত্যেকের জন্য এ সব সময় কী নির্নির্ভর বেদনাভ ভালবাসা অনুভব করত। মনে হত, এতো ভালবাসার ভার সে বৃদি আর বইতে পারবে না। ভালবাসার মানুষ বড় কাছে আসে। একের প্রতি অপরের দায়িত্ববোধ বেড়ে যায়। সে ভার বহন করা কঠিন। তার মধ্যে ফাঁক-ফাঁকি থাকে না। এই যে রক্তা শব্দ উন্মিশ্নের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, রক্ত কেমন চুপচাপ, আড়ালে আবডালে চোখের

বাইরে থাকছে। হয়ত মনে করছে তার চোখের সামনে আমি লজ্জা পাব। কিম্বা আমার বিরুদ্ধে কিছু বিকোষ কিছু বক্তব্যও থাকতে পারে তার। কিন্তু এসব কিছুই নেই রম্মার। সে শুধু ব্যাকুলভাবে জানতে চায়, 'সত্য কি ব্যাপার বল না!' কে জানে রম্মাও কাগজে বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে স্বামী সম্পর্কে বিরূপ ধারণা কবছে কি না। কিন্তু তার মমতা-পূর্ণ দৃষ্টি দেখলে আর তেমন ভয় করে না গৌতমের। 'ও কিছু নয়, যত সব খবর-কুড়নি কেছা!' এসব কণ বলে এলো সম্প্রতি যতই ঘটনা দেখাচ্ছে, কিছু বলা বা জিগেস পড়াও খেয়ে যাচ্ছে। এখন একটা ভয়ঙ্কর শৈথিল্য ঘিবে ফেলছে গৌতমকে। স্কুল-ভীত ছেলের মতো অফিস টাইমে চাপা কান্নার বক দরদর কবে তার। 'বিরূপ বিবে মানুষ নিয়ত একাকী'। হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর এক শূন্যতার ভয়ে ঘুম আসে, ক্লান্তি আসে, ঘম আসে।

অধিকাংশ সময় ডিভানের ওপর শুয়ে থাকে। কানে ফোন লাগিয়ে অবিরত কৌতুহলী প্রশ্নের জবাব দিতে-দিতে ক্লান্ত হওয়া। আর ফোনও মুহূর্মুহূ। যেন কী একটা কান্ডই হচ্ছে তাক ঘিরে। যেন ভিন পাড়ার একদল বীরপুরুষ প্রচণ্ড 'পেটো'—পিটুনি-পর পিটটান দিয়েছে। এখন গৌতমকে রাস্তার মোড়ে কলার চেপে ধরেছে বিপক্ষীয়রা। যদিও গৌতম শুধু ভিড়ের মধ্যে পাকচক্রে পড়ে গেছিল। মারপিটটা হয়েছে ঠিক তার রোয়াক ঘেঁষে। এ দিকটার দখল নিয়ন্ত্রিত ওরা। গৌতম ওদের হুকুম তামিল করেছে। ওদের হাতে শূন্য তালু ভিজিয়ে নেওয়ার জন্য জলের প্লাশ তুলে দিয়েছে। বিপক্ষীয়রা অভাব অসন্তুষ্ট। সারি সারি দো-নলা চোস্তা প্যান্ট এখন আইফল টাওয়ারের মতো ফাঁক হয়ে আছে গৌতমের সামনে। কে যেন বুকের কাছে মুঠি করে জামা ধরে শাসাচ্ছে।

গৌতম আপ্রাণ বোকাবাব চেষ্টা করছিল, 'বিশ্বাস করুন, আমি ওদের দলের লোক নয়। আমি ওদের জ্ঞান দিয়েছিলাম মাত্র। ভয়ে।' এবং সময়ে আপনাদেরও...!

'আ বে চপ শা!' ভিড়ের মধ্যে গর্জন ওঠে।

'ওদের গায়ে গরম জল ঢালতে পারনি চাঁদ! লেংগীবাজি হাচ্ছিল।। খয়ের খাঁ, ম্যাংবোট!'

'দে ওর মাথা মুড়িয়ে!'

উনি তামাক খান না। খোসে গেছে ঠাণ্ডা হাতে। মার লাগা...(হেই)...'

'উ-এ' পেট চেপে কোষ্ঠা হার গেছে গৌতম। মোক্ষম একটা পাশ্চাত্য পড়েছে লোয়ার এ্যাবডোমেনে।...

গৌতম দ' চোখে অশ্রুকাব নেমে আসতে দেখছে।...

খর থেকে বার হওয়ার মুখেই জোর থাকা। রম্ম দ' হাতে জড়িয়ে নিয়ে রম্মার পড়ন্ত শরীরটাকে মাধ্যাকর্ষণের টান থেকে রক্ষা করল।

ছেলের চুলটা আলতো ধর রম্মা বললে, 'এমন উত্তমের মতো নামতে হয় সিঁড়ি দিয়ে? কোথাও দেশাশ্বারে খাচ্ছিস বন্ধি। ভালই হোতো, পড়ে হাড়গোড় ভাঙলে তোর আস্তা আব জিন্দাবাদে বাধা থাকত না কোনো'। বাবা তো কিছু বলে না।'

'তুমিও ভয়ানক অনামনস্ক থাকছ আজকাল। সোঁদিন কলঘবে পড়ে গেলে।'

'তোমার আর কি, যত চিন্তা তো আমার।'

'চিন্তা!' রম্ম কৃষ্ণ গম্ভীরের সঙ্গে বললে, 'সাবধান, এমন কন্মটিও কোরো না। চিন্তা করলেই গারদ।' দেখছ না, দেশসুন্দর লোক ঐ ভয়ে চিন্তা করাই ছেড়ে দিয়েছে। এলোমেলো কথা, এলোমেলো চিন্তা, এলোমেলো আচরণ, তাহলে একরকম নিশ্চিন্ত থাকতে পার। না হলেই গারদ।'

'গারদ?'

'অন্তত পাগলা গারদ।'

'তাই বল। এ বাড়িটাও তা-ই হয়ে উঠছে। তোর বাবা আপন মনে বকছেন। হ্যাঁ রে, ঠাণ্ডা বিরুদ্ধে কী সব হচ্ছে কিছু শুনছিস।'

'কী আর হবে। উনি চোরও নন, ডাকাতও নন। পলিটিক্যাল জালে পা আটকে গেছে। একটু ভুগতে হবে আমাদের।'

'তবে যে লোকে বদনাম দিচ্ছে।'

'বদনাম এড়াতেও তো বদনাম রটে। উনি একটি ক্রিন 'স্ক্রিপ গোটে' পরিণত হয়েছেন।'

'স্ক্রিপ গোটে? বাঙলার যাকে বলীর পাঠা বলে? ছিঃ, বাবার সম্বন্ধ এমন বলতে নেই।'

কাঁধ ঝাঁকালো রম্ম, 'আমি না বললেই তো অন্যে বলা ছেড়ে দিচ্ছে না। বাবার একমাত্র বাঁচার পথ এখন, সত্যি রাজনীতিতে নেমে পড়া। ব্যাপারটা তাহলে আর পরোক্ষ থাকবে না। প্রত্যক্ষ লড়াই-ই হবে।' বাবারও কেউ ব্যক্তিগত বদনাম রটাতে পারবে না।'

'কিন্তু উনি তো কোনোদিন রাজনীতি করতেন না।'

'রাজনীতি আজকাল আর কসতে হয় না মা।' বহার অসহায় দীন প্রশ্নকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যই হাল্কা হলে রম্ম বললে, 'রাজনীতি তুমি কর ছাই না কর রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তেই পার। দেখছ না, রোজ দিন বাবা মনছে তারা সমর্থক বলেই মরছে। কিম্বা কোনো দলের সমর্থক হিসেবে খেতাব পাতে মরার পন। তার সমর্থক তোমাকে হতেই চায়।'

জমি অধিকার করতে, কিম্বা বেনামী গ্রাম আধিকারে রাখতে। পাড়ায় ভদ্রভাণ্ডে বঁচতে, অথবা দুর্নাম চাপা দিয়ে ভদ্র পলিটিক্যাল বনতে, ঐ একই ব্যাপার, কারো না-কারো সমর্থক হও। আর বাবাব মতো পোস্টে যারা কাজ করেন, তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টি রাখতেই হবে। অর্থাৎ কালকেই চালু সরকার ভেঙে কার সরকার হয় সেটা বুঝে কাজ না কবলে ভাবতেও কোথাও কোনো বড় সরকারী পোস্টে নিয়োগের ব্যাটিং করা খুব মুশকিল।'

ছেলেবে গুরুগম্ভীর পণ্ডিতীয়ানায় হেসে ফেলে রম্মা। বলে, 'যা না তোর বাবাকে বল।'

রম্ম মায়ের গলা জড়িয়ে এব বলে, 'অত কিছু ভেবো না তো। দ' জ্ঞান মিলেই মাথা খারাপ করবে দেখছি। বাবাক না হয় অন্য কোথাও সরিয়ে দেবে। দ'ক না। পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে না তো।'

আসলে এসব প্রশ্ন ঘটিতেই ভালো লাগে না রম্মর। যদিও এ সমস্যাও বাজ-নৈতিক এবং সে পাটি করে। কিন্তু নিজের সংসারের প্রশ্নটা যেন দিভান্তই গাঢ়। তাছাড়া বাবা-মার ওই উন্মত্ত প্রকাশ্যে হেসে ওড়ালেও মনে মনে তাকেও উদ্বেগ করে। এড়িয়ে চলতে চায় তাই রম্ম। রম্ম কথা শেষ করে এগোব।

পিছ থেকে রম্মা বলে, 'একপ্যাকেট সিগারেট আনিস তোর বাবাব জন্যে। এখনই আনিস। একটাও নেই ঠিকত।'

বেরিয়ে পড়ে রম্ম। গলির মোড়ে বাঁক নিতেই মগ্গলের চায়ের দোকান। দ' পা এগিয়ে সিগারেট। কিন্তু পথের মধ্যে শিবেন তার কাউ-বয় প্যান্টের দ' পকেটে হাত ভরে এগিয়ে এলো। টেব্লাস হিরো, পাইবেট জুলপী কান পর্যন্ত।

'কি রে, সিটি বুকিং-এ যাচ্ছিস নাকি?' তেরছা হাসিতে যেন পিক কাটল শিবেন। 'সিটি বুকিং-এ কেন?'

'আজকের কাগজে যেটা বেব হয়েছে, তোর নিশ্চয় ঢের আগেই সে খবর জেনে গেছিস। শুনছিলাম, কোনো ইফবল-টফবলে বদলি হবে তোর বাবা।'

'আমাব বাবা কাথায় বদলি হবেন' (হবেন কথাটার ওপর জোব দিল রম্ম) তা তোরাই আগে ভাগে জেনে ফেলিছিস?'

শিবেন হা-হা করে হেসে বললে 'একটা ক্যাপসটান ছাড়, বলছি লেটেস্ট 'পার্সোন বলে দেব একেবারে। খবর তো স' হেড কোয়ার্টারেই তৈরি হচ্ছে।'

তা বাটে। শিবেন আজকাল পাটি কবছে। খবর ওব কাছে থাকতেও পারে। কিন্তু সে খববে রম্মর কী লাভ। আর তাবই বাবার অসহায়তা নিয়ে যে তামাসা হবে তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বসতেও তো ঘণা হয়।

রম্ম পা বাড়াল, শিবেন, তাঁর বড় লাডাবাড়ি করল। 'মস্কানি লাল-ডলদেব

সঙ্গে কোনো, আমার সঙ্গে একটা সামাল দিয়ে কথা বলাই উচিত।

‘আ’ বৈ যা শা। ভোদের মতো ওর ঢের লেতা দেখা আছে। ভোদেরও ঠাণ্ডা করার ওষুধ আসছে। সেদিন আসিস শিবেন দাঁর কাছে।’

আসফালন দেখালেও শিবেন কিন্তু পথ ছেড়ে সরেই দাঁড়াল। রমুসেব সঙ্গে লাগবার সাহস নির্দেশ এখনো নেই। রমু একা নয়, তার দল আছে। বদলা আরম্ভ হলে ভয়ঙ্কর কান্ড হবে।

রমু দেখল শিবেনের সাটের নিচে সোনার চেনটা ঝিলিক দিয়ে অদৃশ্য হল। শিবেনেরা স্বর্ণবর্ণিক। ঢের টাকা। তবু পাড়ার ছেলেদের ঘাড় ভেঙে সিগারেট খাওয়া ওর স্বভাব। শিবেনের নীরব প্রস্থানে রমুর বেশ আকর্ষণ ছিল। রমু বিজয়ী মোরগের মতো বুক চিতিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে এগেলো। শিবেন মণ্ডলের দোকানে ফিরে গিয়ে তার বন্ধুদের কী বেনা বলছে। না তাহলেও সাহস করলে না ওরা রমুর সঙ্গে লাগতো। ওদেরও বদলার ভয় আছে।

ঠিক সিগারেটের দোকানের সামনেই জীবন ওর গা বেঁধে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে দিল।

‘উঠে পড় বমু, প্রশান্তদা এখনই যেতে বলেছেন।’ ব্যস্ততার জীবন একপায়ের চোকো দিয়ে অপর পায়ে উল্টো প্যাডেল করে যাচ্ছে।

রমু বললে, ‘খুব জবরী?’

জীবন মাথা নাড়ল।

রমু বললে, ‘বাবার একপ্যাকেট সিগারেট রাড়িতে নামিয়ে যাব। এই লখিরা একপ্যাকেট চারমিনার ছাড়।’

‘তোমার বাবা মাইরী, পাক্সা ইনটেলেকচুয়াল। একটা ফাস্টব্রাশ বর্জোয়া দালালের পোশেট কাজ করেও রয়াল ব্রান্ড।’

রমু হাসল, ‘মানুষ আর অল্প ঠিক একই রকমের সমাধানে পৌঁছে দেয় না জীবন। পোস্ট-আব মানুষ সব সময় এক নাও হতে পারে। অন্তত আমার বাবা একটা মৃত পোস্ট নয়।’

জীবন রমুকে রডের ওপর তুলে নিল, ‘নিজের বাবা সম্পর্কে আমাদের দুর্বলতা থাকা কিছু অন্যায় নয়। তবে শ্রেণীশত্রু বাবা হলেও একই কাঠগড়ায় বিচার।’

‘এ সম্পর্কে আমি তর্ক করব না জীবন।’

‘কিন্তু আমাদের উত্তর দিলে হচ্ছে রমু, তোমার বাবার সম্পর্কেই।’ জীবনের কণ্ঠস্বর ভারি আর কঠিন শোনালো।

রমুকে বেন হাতের গুলিগিড়ে শট করল জীবন।

মাথাটা ঘুরিয়ে অস্ফুটে চীৎকার করল রমু, ‘হু দ্য হেল পুটন ইউ ক্রায়েসচেনস?’

জীবন বিস্মিত বুদ্ধে রমুকে দেখলো, ‘গান্ধীর ভাবো বলালো, যা সিগারেটটা দিয়েই চলে আসে।’

বলল না, ‘হুকুম করল জীবন। আশ্চর্য, জীবন হুকুম করছে রমেন গণ্গোপাধ্যায়কে। যে রমেন একজন নিবর্তীয় শ্রেণীর ছাত্রনেতা। যে রমেন তাদেব দলের মধ্যগত্রে ছদ্মনামে পুলিশি সংক্রান্ত প্রবন্ধও লেখে, বক্তৃতা দেন গ্রুপ মিটিং-এ।’

রমুর সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। শিথিল হয়ে আসছিল শরীরের গ্রন্থিগুলো।

‘এ তো দেরি করল রমু। উনি ছটফট করছেন। যা তাড়াতাড়ি ওপরে দিয়ে আয়।’ রমু ঘাড় ঘুরিয়ে বললে।

প্যাকেটটা ছুড়ে রামোর টেবলে দিয়ে রমু পেছন ফিরল, ‘তুমি দিমে দিও। আমি বের হচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে। ঢের কাজ আছে আমার।’

‘রমু!’—পিছন ডাকতে গিয়েও নিজেঁকে সামলে নিল রমু। ছেলেটা ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। সকালে দু’ স্লাইস জেদি-রুটি ছাড়া কিছু খায় নি। ভাল লাগে না, রমুর কিছু ভাল লাগে না। গৌতম নিজের চিন্তায় ক্রান্ত। রমু যে বাস্তবিক কী করে, জানে না রমু। সমস্ত অশান্ত ঘর্নির মধ্যবিন্দু হয়ে রমু দিশাহারা। সর্বজন কী একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকটা দুবদুর করে। চেহারা শূন্য আর বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পড়শী মোরে-বৌরা ভাবে স্বামীর অফিস-সংক্রান্ত ব্যাপারে রমু বোম্ব হয় জেগা হারিয়ে ফেলছে। গৌতম গণ্গোপাধ্যায়ের হস্ত চাকরিই যাবে। যেমন কর্ম তেমন ফল। খুব লপচপানি বেড়েছিল। এখন ঠেলা সামলাও। রোজ একদিকে চাঁদ ওঠে না।

অথচ রমু জানে, চার দেওয়ালের মধ্যে এক একটা ছোটো ছোটো পৃথিবী নিয়ে যে পাড়াটা, যে শহর, দেশ, যেখানে প্রতি ছোটো ছোটো গ্রহের আলাদা আলাদা কান্না মানুষের কানে পৌঁছায় না। নিজের বদবুদের ঘেরাটোপে মানুষ কেবল চক্রাকারে বাড়ে আর অন্যের বিচ্যুতি গণনা করে নিজেঁকে নিটোল ভাবতে চায়। গৌতমের বিরুদ্ধে কাগজ-খবর পোর্টেবল মাদকতার পাড়া-পড়শী আত্মীয়-স্বজনের চেতনা যেন হঠাৎ জাগ্রত হয়েছে। সবাই পড়ি-মড়ি করে এন একটা সুলভ দুর্বলী সংগ্রহ করছে। গাঙ্গুলী-বাড়ি ওপর প্রত্যেকের ছটলো দুটো করে চোখ সিস্থেন্দ হয়ে আছে। গাঙ্গুলী পরিবারের গ্রহান্তর ঘটছে আত্মীয় পরিজন আর প্রতিবেশী সমাজের কোল থেকে। রমু তাই শামুকের খোলার মধ্যে ঢুকছে ক্রমশ। কে জানে, হয়ত এতোটা স্পর্শকাতরতা অনুভবিত। কিন্তু সহ্য করতে পারছে না মানুষের ক্ষমতাহীন

দৃষ্টি। হুঁপ-পথের লোকের বাড়ির বারান্দায় জোষ-মতুলে হাটে। পাড়ার ঐ বাড়ি বিখ্যাত হয়ে গেল। অনেকে আঙুল তুলেও দেখায়। এ কী একটা মিনি জুদ!

জানশায় দাঁড়ানো, বারান্দায় চলে চিরনদী তানতে তানতে শহুরে জনস্রোত দেখা, ছাদের প্যারাপটে বুক চেপে পড়শী-গিঞ্জির সঙ্গে গল্প করা, এ সব ইন্তফ দিয়েছে রমু। গৌতম বাত করে বাড়ি ফেরে। গাড়ি থেকে নেমেই টুপ করে ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে। পাড়াটা হুমড়ি খেয়ে তাকে দেখে বলেই নিজে সাবধানে নিজের দুটি লুকিয়ে রাখতে চায়। রমু হারছে তার গান্ধারী। চোখ বেঁধে সে-ও বসে আছে ঘরের মধ্যে। আহা, রমুটাকে হয়ত কত কথা সহ্য করতে হয়। তবে ও বলে না কিছু বাড়ি এসে। পাড়ার লোক ভয় করে রমুকে। তার বিরাট বাহিনী আছে। এক হিসেবে রমুর জন্যেই যাবা আঘাত করে আনন্দ পায় তাবা সরাসরি আঘাত কবতে না পেরে আরও বেশি ফুসছে। তিলকে চালকুমড়া বানিয়ে বাড়ি বাড়ি মাগনা পৌঁছে দিয়ে আসছে। গাঙ্গুলীর বড় লোভনীয় খাদ্য। যেন নতুন করে সাদা জেগেছে পরসীসমাজে।

অথচ ঐষিত দৃষ্টিতে না তাকালে প্রতিবেশীরা বুঝতে পাবত বর্তমান পোস্টে আসার পর এই আট মাস গাঙ্গুলী পরিবারে কোনো চমকপ্রব পরিবর্তন ঘটে নি। গৌতম তার পুরোনো ফ্ল্যাট, পুরোনো পোষাক বদল করে নি, আগের মতই রমু এখনো গ্যাস খুলে নিজেই, রান্না কবে। হয়ত খাদ্যের আইটেমে কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকবে। এখনও রমুই গুড়ো সাবানে কাপড় কেটে নিজেই প্লাস্টিক স্ট্রিং-এ মোল দেয়। পাড়ার মোয়েরা বলে, ‘বাম্বা, রমুবৌদি আপনি কি কিপটে! আর একটা লোক রাখতে পারেন না?’

রমু হাসে, ‘তোমার দাদার আর কতই বা মাইনে বেড়েছে ভাই। শ’ তিনেক টাকা এ্যালগোরিস্ম বেশি পায়।’

‘কম নাকি? তিন শ’ টাকায় একটা সংসার চলে।’ ‘বারে, সব টাকা খরচ করলে চলে? চিরকাল বৃষ্টি ভাড়া বাড়িতে থাকব?’ ‘ও তাহলে বাড়ি করার মঞ্জাব? খুব ছবির মতো বাড়িটা করবেন বৌদি।’ বাড়ি কেমন হলে আকর্ষক হয় এই নিয়ে মোয়েরা তখন মুখর হত। যেন রমুর বাড়িটি হলে ওরা প্রত্যেকে আনন্দে সে বাড়িতে ফুল ফুটিয়ে আসবে। এখন কাণে আসে, ‘হবে না। রমুবৌদি বাড়ি করার শখ মেটাতেই গৌতম গাঙ্গুলী ফাঁসলেন।’ ‘হি হি হি, এতোকাশের ঘনিষ্ঠতায়ও মানুষ মানুষ চেনে না, চিনতে পারে না, চিনতে চায় না।’

রসায়ন দৃষ্টিতে গৌতম হেসে বলে, 'ও নিয়ে দৃষ্টি কোর না রসায়ন। এ কোনো মানবের নিজস্ব নীতিভা নয়। আমরা যে দেশের মানুষ, যে বিষয়ক হাওয়ায় সর্বাপেক্ষা সর্বশেষ পড়ছে তাতে এমন চিন্তাই স্বাভাবিক। এর চেয়ে আলাদা করে ভাবতে আমরা ভুলে গেছি। নিজেকে পবিত্র জানাই আমাদের সামর্থ্য। আমরা আমাদের বৃত্তি দিয়েই মানুষকে বিচার করি। তুমি আমি সকলেই।'

'চল আমরা অন্য কোথাও যাই। বস্তু নোংরামি, কেমন অস্বপ্ন করে, অসহ্য করতে পারছি না গৌতম। তুমি নী করে সও?'

গৌতম রসায়নকে কাছে টানে। বলে, 'তোমার আর রমুর মূখের দিকে তাকালে আমি সর্বস্ব হই হয়ে যাই। সমস্ত মস্তিষ্কের সময় সাপের বংশধর আমরা পালাব কোথায়। সব গরল জমা হয়ে ফণা ভুলেছে। মহামরণ ছাড়া মৃত্তি নেই। আমি আজকাল ঘুম ছেড়ে উঠে কী প্রার্থনা করি জান, বলি, বিষে বিষে নীল হয়ে গেছি আমরা। এইবার তোমার পদভার তুলে দাও প্রভু, শেষ হয়ে যাই।'

রসায়ন মনে হয় সে গৌতমের নয়, পাথরের বুকে মাথা রেখে দাঁড়িয়েছিল। যন্ত্রণা টেনে ওঠে। বলে 'তুমি কেন কলেজের চাকরী ছাড়লে গো। কবিতা পড়তে, বই পড়তে, লাইব্রেরী যেতে, সাংস্কৃতিক সভায় কথুতা করতে। এখন ফাইলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছ, চাপা পড়ে যাচ্ছ। আগের দিনগুলো আমরা আর আর ফিরে পাই না?'

গৌতম জানলার গরাদে গিরে দাঁড়ায়। পিছন কিবে মাথা নাড়ে, 'না রসায়ন, হয়ত আর সেই নির্ভর দিন আমরা ফিরে পাব না। এই জীবনেই খাপ খাওয়াতে হবে। আমি বদনাম কুড়িয়েছি বন্ধু, আমি দাগি মানব!'

রসায়ন জানে, হয়ত কেবলমাত্র রসায়ন জানে, তাব সামনে দাঁড়ানো এই মানুষটা অপরাধকে ভুল কবে, ঘৃণা কবে। তবু সে বদনাম কুড়িয়েছে।

একমাত্র বন্ধুর কাছে গিয়ে এক-মহাত হালকা হয় লতা। সমস্ত হতাশাকে এককণ্ঠে উড়িয়ে দিতে শিখেছে এই ছেলেরা।

রসায়ন দুই কাঁখে চাপ দিয়ে বসিয়ে দেয়, গলা ছেড়ে হেসে বলে, 'মিছ-মিছ দৃষ্টি পাও কেন মামনি, যাবার জীবনটা কতবড় একটা অভিজ্ঞতা। পাঁকে পড়ে থাকলে পাঁক নজরে পড়ে না। গায়ে মাখলে গা ঘিনঘিন করে না। এক-চল দূরে দাঁড়িয়ে দেখো, নাকে রুমাল দেবে। চারিদিকেব পাঁকের মাথা এক স্কোয়ার ফুট শ্যামলা মাটিতে বাবা আমাদের দাঁড়ি কবিয়ে দিয়েছেন। পাঁকের এতো কাছাকাছি না এল পাঁকব

বীভৎসতা তোমাকে আমাকে এমন চমক করত না। তোমার মনে হয় না মা, এই ডুবন্ত পাঁক থেকে উদ্ধার হই। স্নান করে আসি। যারা পাঁকে ভল্লার গেছে, তারা ভাবছে আমরাও ডুবেছি। ওরা কাদা ছোঁড়া খেলার মেতে উঠতে চাইছে। বই পড়ে যা বুঝি না, সর্বাপেক্ষা কাদা মেখে তাই বুঝি।'

বিশ বছরে বিশ হাজার বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলে যে রমু। রসায়ন অবাক হয়। এ কোন অভিন্নমু! মায়ের পেটে অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মেছে। কিন্তু রমু কি পাঁকের বাহ ভেদ করতে পারবে।

টেলিফোন পেয়ে অফিসে আসতেই হ'ল গৌতমকে। কয়েকটা জরুরী ফাইল সই না করলেই নয়। টেবলের দু'পাশে ফাইলের পাহাড়। মাঝে উপত্যকা প্রদেশে টেবল শ্লাস। সিগারেটের ছাই আর খালি প্যাকেট ইতিমধ্যেই ইতস্তত।

অজয় আবার বললে, 'সার, আপনি একটা প্রতিবাদ করুন কাগজে।'

উঃ কি হবে জয়ন্ত। চারদিকে বর্ষা, একটা ঢাল দিয়ে রুদ্ধব।

'কিন্তু!'

'না, জয়ন্ত। আমার আর ভালো লাগছে না। এতো নোংরা এ্যাক্সেসার সমস্ত।'

'কিন্তু এ সাপ্তাহিক কাগজটা? ওরা এ্যাকচুয়ালী সমস্ত ব্যাপারটা ডিসকট করেছে, সার।'

'জয়ন্ত।'

'বলুন সার।'

'তোমাদের আমি কোনো অমঙ্গল করি নি তো?'

'একথা বলছেন কেন সার। আপনাকে হারাতে সকলেরই খুব কষ্ট হবে।'

'সকলেরই?' অবিশ্বাসী হাসি ফুটল গৌতমের ঠোঁটে।

'প্রায় সকলেরই।' সঙ্গজভাবে শ্রুত্রে নিল জয়ন্ত।

'এটাই আমার সবচেয়ে বড় সামর্থ্য জয়ন্ত। কখনো যদি পথে-ঘাটে দেখা হয়, তোমরা এগিয়ে এসে হয়ত জিগোস করবে, কেমন আছেন?'

'সার! জয়ন্তের কণ্ঠস্বর রুম্বায়ে আঘাত করছে যেন।

এই সময় প্রবেশ করলেন মিঃ লাহিড়ী। সঙ্গে আর কয়েকজন। গৌতম গাঙ্গুলীকে ঘিরে বসলেন তাঁরা।

অত্যন্ত আন্তরিক বেল টিপল গৌতম।

'বসলেন মিঃ লাহিড়ী! দুই ঠোঁটের ফাঁকে আরও একটা দোমড়ানো সিগারেট টেনে দিল গৌতম, 'ঘরে শূন্যে শুনছিলাম, আমার জেলে তার মাকে বলছে আমি

যদি পুরো রাজনৈতিক হতাম, স্বাধীনতা ভাবে আমার গায়ে কাদা এসে পড়ত না। বলছিলাম, আমি নাকি স্কেনপ গোট? গৌতম টেনে টেনে হাসবার চেষ্টা করল।

লাহিড়ী অন্যান্যদের মুখে তাকালেন। কোন ভাবান্তর নেই। কেমন যেন পাথরের মূর্তি প্রতিটি মানুষ। গৌতমেরও ভারি অবাক লাগছে ওদের দেখে। এসব মুখ যেন মুখোশ। গৌতম দু'হাতে হাতড়ে একটা সহানুভূতির রেখা খুঁজতে চাইল। মনে হচ্ছে, পাণ্ডারের মতো প্রত্যেক মুখই যেন বিক্ষমতার প্রলেপ। কিম্বা হয়ত প্রত্যেক মুখই চাপা কাঁড়ুক, কিম্বা মিঃ লাহিড়ীর পেছনে এসব মুখ পারাওটা আরনার মুখ। কোনটা ধাবড়া, কোনটা অসম্ভব লম্বাটে। হয়ত কোনটাই যথার্থ মানুষের মুখ নয়।

জয়ন্ত? তার মুখটা ভাল কবে নজরে আসছে না। ও যেন কী কাঁছলি এখুশুনি। হ্যাঁ, সবাই খুব দুঃখিত। ছাত্রদের দুঃখিত মুখ দেখেছে ডঃ গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়। বোজগোরে মানুষের দুঃখিত মুখ বোধহয় এমনি মৃত্ত ভয়াল আর বিবর্ণ।

গার্ড অব অনার নেওয়া সময় সৈন্যদলকে কি এই রকম মুখ দেখেন! কী আশ্চর্য! সব মুখই একরকম। সব মাথা ঘাড়ের ওপর ঘোরানো। সব হাতে রাইফেল। কিন্তু রাইফেলের চেহারা-গুলো এক একটা ফ্লাট ফাইলের মতো কেন?

ও কি, ওরা সবাই ফাইলগুলো তাক করে এগিয়ে আসছে পায়ে-পায়ে গৌতমেরই দিকে।

'আরে না, আমি, গৌতম গাঙ্গুলী। আমাকে চিনতে পারছেন না আপনারা? আমি.....'

কী আশ্চর্য, কেউ কথা বলছে না। গৌতম অনুভব করছে ঘামে তার সর্বাপেক্ষা ভিজ়ে যাচ্ছে।

গৌতম চেয়ার ছেড়ে ঘরের কোণায় গিয়ে দাঁড়ায়ছে। মাথার ওপর দুটো হাত তুলে দিয়েছে।

'দেখুন! আমি আপনাদের ভালো ছাড়া খরাপ করি নি। আমি আপনাদের দাবীগুলো নিয়ে লড়েছিলাম। কিছু আদায় করে দিয়েছি। আমাকে আপনাবা ভুল করছেন না তো! গৌতম কাঁপা গলায় বললে। মুখ মূহুর রুমালের এক পাতে।

লাহিড়ী এগিয়ে এলেন। বাড়িয়ে ধরলেন একটা শীলমোহর করা চিঠি।

গৌতম কম্পিত হাতে চিঠিটা নিয়ে পড়ল। একবার দু'বার তিন বার; এটা গৌতমের ওপর নির্দেশ। মিঃ লাহিড়ীকে চার্জ বুঝিয়ে চাবি দিয়ে আজই চলে যান গৌতম গাঙ্গুলী। আপনার বিবন্ধ

রাজনৈতিক দলদলির মধ্যে নিজেদের শত্রু করার অভিযোগ আছে।

লাহিড়ী পেনটা এগিয়ে ধরেছেন। অন্যান্য ফাইল নিয়ে লাহিড়ীর পেছনে লাইনবন্দী। গৌতম বলতে চাইল, 'আপনারা এতো অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছেন কেন? আপনাদের চোখে অপরিচয়ের দৃষ্টি কেন? আপনারা.....'

লাহিড়ী মেয়ে পাঠকলেন: গৌতম অনুভব করল, এতোবড় ঘবটার গতোকটা মানুষ লাহিড়ীর পেছনে প্রবলগা আকাশের মতো মুছে গেছে। এখন গৌতম ভয়ঙ্কর একা। লাহিড়ী প্রকাণ্ড একটা রকেটের মতো তাঁর বেগে তাঁর ওপর নেমে আসছেন।

'আমি! আমি.....'

গৌতমের গলা থেকে কেমন একটা গোঙানির ডেলা ঢুক করে চলাকে পড়ল। গৌতম শিউরে উঠল সেই ডেলাটা দেখে। গৌতমের বাবা যখন ধারা বান, গৌতম পাশে বসে। বাবা মাথাটাকে কেমন একটা কাকানি দিয়ে আঙুল তিনেক তুলে ছিলেন। একটা হিকার মতো খেঁচনি। গৌতম তাঁর ধর্তনীর নিচে হাত রেখেছিল। তিনি জেলির মতো শাদা রঙের কী এক বস্তু বমন করেই মাথাটা টাল খাইয়ে পড়ে গেছিলেন। ঘরের সবাই জুতো খুলে ফেলেছিল এর পর।

গৌতম ভয়াত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, 'না, না, নো!'

'এই কী হচ্ছে, শোন। তুমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছলে।' রস্মা পাশ বসে ঠেলাছিল গৌতমকে।

গৌতম অবিশ্বাসী ঘোলাটে চোখ মেলে তাকাল। না, রস্মাই। রক্ত-মাংসের রস্মার শঙ্কিত মুখটা তার মুখের ওপর ব্যাকুলভাবে ঝুলে আছে। সন্ধ্যা ফিরে এসে গৌতমের। সেই সন্ধ্যা কিছ লম্বা। গৌতমের সমস্ত মুখে ঘামের পদ্ম-কাটা।

গৌতম বললে, 'একশাশ জল দাও! আমার লেটার প্যাড আর কলমটা কোথায়?'

'দাঁছ। তুমি স্বপ্ন দেখছিলেন?'

গৌতম হাসল, 'না, আমি আমার পূর্ব-জন্মের একটা ঘটনা দেখছিলাম। জাতিস্মরণ এমন দেখতে পায়। তুমি কি খুব ভয় পেয়েছ রস্মা?'

রস্মা কথা না বলে সন্ধ্যা চোখে স্বামীকে পরীক্ষা করতে করতে বেড-সাইড টেবলে কাব কাগজ আর কলম এগিয়ে দিল। বললে, 'জল অনিচ্ছ। লম্বাটী তুমি আব ঘুমিয়ে পড় না।'

'না। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হতে পার।'

প্রশান্তদা চেয়েবেব ওপর পা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন।

ওরা রম্মকে বসতে দিয়েছিল সময়ের

টুলটায়। জীবন ঠিক তার পেছনে-রক্ষীর মতো খাড়া আছে। প্রশান্তদার চোখে দৃষ্টিটা ছুঁচলো আর কঠিন হয়ে উঠেছে। অপেক্ষা করছেন উত্তরের।

রম্ম বললে, 'কিন্তু আমি তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি। তাঁর প্রতি অগ্রন্থা জাগতে পারে এমন কোনো কারণ তিনি ঘটান নি। ছেলে হিসেবে বাবাকে চেনার আমার যে সুযোগ আপনাদের এবং আর কারও তা নেই।'

'আমি অস্বীকার করি না। ব্যক্তিগত-ভাবে আমিও বিশ্বাস করি তিন রাজ-নীতির বোর্ডে অসহায় একটা বিলিয়র্ড বল। একটা লম্বা স্টিক আর একটা বল, দুয়ের ধাক্কা তিন গড়িয়ে চলেছেন; নিষাৎ ডেস্টিনেশন জাগুর পকেট। কিন্তু রমেন, এখানে একটা কথা আছে। শ্রেণীশত্রুর ব্যক্তিত্ব আমাদের ভাষায় 'নিল', শূন্য। এই উপযুক্ত মূহুর্ত, এই সময় আমরা তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার না হলে একটা পলিটিক্যাল ব্রান্ডার হবে। আমি তাই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করেছি। অপারেশন লীড করতে হবে তোমাকেই।' প্রশান্তদা পা-নামিয়ে কাছে এলেন।

উঠে দাঁড়াল রম্ম, 'অন্য কর্তৃকে এ কাজের তার দিন প্রশান্তদা। একটা মিথ্যেকে ঘাঁটতে আর ঘাঁটতে আমি পারব না।'

'পার্টির জন্যেও না?'

'মানুষের জন্যে পার্টি। তন্মায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামই হওয়া উচিত রাজনীতি।'

'রাজনীতির' অর্থ তুমি এখনও বোঝ না রমেন। তুমি শিশু। তাছাড়া তুমি আমাদের নেতৃস্থানীয় একটা পদে আছ। কেউ না বলে, তোমার মুখ চেয়ে উপযুক্ত সময় আমরা আওয়াজ তুলি নি। 'হিট করি নি।'

'প্রশান্তদা, আওয়াজ তুললে তাঁকে সাজিয়ে-গাড়িয়ে বন্ধুত্বমিতে নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধেই আওয়াজ তুলতে হয়।'

'প্রশাসকদের একটা বিরাট শোষণ-যন্ত্রের চালিকাশক্তি বলে তুমি বিশ্বাস কর না?'

'শ্রেণী হিসেবে।'

'তোমার বাবা সেই শ্রেণী থেকে আলাদা নন।'

'কিন্তু তাঁকে আমি জানি।'

'তুমি জানলেও, আমরা যাদের জানিয়ে এসেছি প্রশাসক একটা শ্রেণী, তারা জানে না। কিন্তু আমার হাতে সময় অস্প। তোমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'আমার সিদ্ধান্ত আমি জানিয়েছি, আপনাকে।'

'তুমি অমান্য করছ।'

'আমি একজনের হয়ে ন্যায়বিচার চাইছি।'

'ফুল, কাওয়ার্ড; তুমি তোমার বাবাকে ভালবাস, পার্টিকে নয়।' প্রশান্তদা গল্প করল।

রম্ম অবচলিত গলায় বললে, 'আমি ন্যায়, সত্যকে ভালবাসি, ব্যক্তি বা দলকে তার ওপরে জানি না।'

'তোমাকে বিহৃকৃত করলে?'

'তাতে যদি দলের মঙ্গল হয় সরে দাঁড়াব। কিন্তু ন্যায়নীতি সব সময় ফর-মুলা মানতে পারে না প্রশান্তদা।'

'স্মৃ, এ ফিল দি ইনির্ভিডিক্স্যালিস্ট। জানো রমেন, আমরা তোমাকে শাসিতও দিতে পারি। পার্টির তেমন নির্দেশও আছে।'

রম্ম ঘরের চারিদিকে তাকাল। বস্তুত তাকে ঘিরে আছে বদুহের মতো কয়েক-জন।

'শাসিত।' রম্ম অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'বিশ্বকার শাসিত নিশ্চয়।'

'না, তারও থেকে কঠিন কিছ?'

'দল আমাকে ভয় পেতে শেখায় নি প্রশান্তদা।'

চুপ কর বিশ্বাসঘাতক! প্রশান্তদা উন্মত্তের মতো একটা চড় মারলেন রম্মের বাম গালের ওপর।

রম্ম শূন্য একবার বেঁকে খাড়া হয়ে গেল।

প্রশান্ত দস্তগুপ্ত নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসলেন আবার। যেন হাঁফাচ্ছেন, 'রমেন, তোমার সাহসিকতার জন্য তোমাকে আমি শূন্যমাত্র বিহৃকৃতই করব। এজন্য দৃষ্টিখত। কিন্তু দলের স্বার্থের কাছে ব্যক্তির জন্য সহমর্মিতার স্থান রাখি না। তবে বিশ্বাস করি, ফিরে তুমি একদিন আসবেই। তখন আমরা দেখব, তুমি সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে এসেছ। যাও জীবন, ওকে সাবধানে পেঁচিয়ে দিও।'

জীবনের সাইকেলে বসে বম্মর কিম্বদন্তি আসিছিল, চাপা জ্বরে যেমন ম্যাক্স ম্যাক্স করে সমস্ত শরীর।

জীবন বললে, 'প্রশান্তদাকে জবাব-দিহ করতে হবে তোকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। তিন তোকে ভালবাসতেন। তোর কাজ, তোর ব্যস্তির প্রশংসা করতেন।'

'আমি জানি জীবন!'

'হয়ত প্রশান্তদা লীডারশিপ থেকে সরে যাবেন।' জীবনের কণ্ঠস্বর মেঘলা হয়ে এলো।

'আমরা সবাই ওকে ভালবাসি। ভালবাসতে পেরেছি বলেই প্রশান্তদাকেও হয়ত চলে যেতেই হবে। আচ্ছা জীবন, রাজনীতিতে ভালবাসা বলে কিছ নেই?'

'তুই অহিংসার কথা বলিছ?'

'না, ভালবাসায়। মানুষের জন দ্বাঙ্ক-নীতির কথা বলিছ।'

[সংস্প ১৬১ পঃ ১]

সেকালের কলকাতায় যেমন পুজো আসত, একালের কলকাতাতেও ঠিক তেমন করেই ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আসে পুজো। তবে তফাৎ হয়ে গিয়েছে উৎসবের বৈচিত্র্য এবং অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায়।

সে-কলকাতার চেহারার সঙ্গে এ-কলকাতার চেহারার যেমন অমিল, ঠিক তেমন অমিল হয়ে গেছে মায়ের আবা-ধনায়। হাটখোলা আর শ্যামবাজারে পথে পথে শিউলি ফুলের বাহার আজ আর চোখে পড়ে না। বাগবাজারের কোনো পুকুরে তেমন করে দেখা যায় না গম্বীর সমারোহ। কৃষ্ণনগরের কারি-গরেবা আব কি আসেন মায়ের প্রতিমা গড়তে? কুমারটুলির প্রাচীন ঐতিহ্য হয়ত খানিকটা আছে। কিন্তু সিন্ধে-শ্বরীতলা জুড়ে মায়ের প্রতিমা তৈরি হচ্ছে, তাকি আমরা ভাবতে পারি?

না, সে পুর্বনো-কলকাতার ছাপ আজ আর কোথাও নেই। সে ফেরি-ওয়ালাবা বা আগমনী গানও নেই। ছেলেদের টুপি, চাপকান আর হবেক-রকম পোষাক নিয়ে পুজোর অনেক আগে থাকতেই দর্জির ফিঁরি করে বেড়াচ্ছেন বাড়ি বাড়ি—এ ছবি এখন আমাদের স্মৃতি মাত্র। গাড়ির হররা, সহিসের পইস্ পইস্ শব্দ, আর কে'নো কে'নো ওয়েলার-নরমান্ডির টাপেতে সদা কম্পমান কলকাতার পথে চলতে চলতে সেকালের পুজোর উৎসবে কখনও আমরা যোগ দিতে পারব না। কখনও না।

তবে একটি স্বাদ আমরা পেতে পারি। পেতে পারি একটি ঐতিহ্য। তবে তা কিন্তু প্রতিমার নয়। নয় পুজামণ্ডপেরও। এ ঐতিহ্যটি হল চাঁদার। মায়ের চাঁদমুখ দেখার অনেক আগেই, যে প্রণামী আমাদের দিতে হয়, তার সঙ্গে হাড়ে হাড়ে আমরা পরিচিত। সেকালের কলকাতাতেও এ বস্তুটি ছিল। এবং সেকালের মানুষেরাও হাড়ে হাড়ে এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

জিজ্ঞাসা কর যাঁরা আদায় করতেন, তাঁদের কথা আমরা জানি না। যাঁরা দিতেন, তাঁরা কতখানি প্রসন্নচিত্তে দিতেন, তা অজানা। আর মারাঠাদের চৌধ? নাঃ, তার কথা না-তোলাই ভালো। কেন না, এ বস্তু নারিদলে গদান্ন যেত, তাই মূখে হাসি রেখেও, এ খরগোষ্ঠী অনেক নবাব বাহাদুর বা রাজা-মহারাজাকে করতে হত। এরপরে এলো কর্ণওয়ালিশের প্যারামেন্ট সেক্টলমেন্ট। এলো অক্টম আইন এবং সেই সঙ্গে পেয়াবা। শোনা যায়, ঐ অক্টমের পেয়াদারা উনানে পা দিয়ে আদায় করতেন টাকা। ঐ টাকা না-দিয়ে



কেউই পার পেতেন না। কেউ না।—ঐ ঐতিহ্যের পথ ধরেই এলেন চাঁদা-আদায়-কারীরা। চাঁদার হাত থেকে তাই রেহাই পাবার সুযোগ পেলেন না কেউ। চাঁদা না-হলে পুজো হয় না। হয় না বারো-ইয়ারের মজলিস। সুতরাং তাঁরা বেথা দিলেন আতঙ্কের মতন। তবে কোন কোন জায়গায় মো-সাহেবী করেও টাকা আদায় করতেন। এদের সম্পর্কে হুতোম তাঁর নকশায় লিখে-ছিলেন, 'কলকাতার বারোইয়ারি চাঁদা সাদারা প্রায় বিত্তীয় অক্টমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনা সাদার মত লোকের উনানে পা দিয়ে টাকা আদায় করতেন—অনেক চোটের কথা কয়ে বড় মানষেদের ভুট করে টাকা আদায় করতেন।'

কবে এবং কখন থেকে বারো-ইয়াররা মায়ের আরাধনায় লেগে গেলেন তার নির্দিষ্ট কাল ঋজে পাওয়া কঠিন। হয়ত গবেষকরা এ তারিখ ঋজে বের করে দিতে পারেন। তবে এটুকু আমরা বলতে পারি যে যেদিন থেকে মা সদয় হয়ে ইয়ার দলের ভেতর গিয়ে ঢুকে-ছিলেন, সেদিন থেকেই চাঁদা তোলারও সুস্থপাত। প্রথম পর্বে ইয়ার দলের বধ্য ছিলেন মহাজন-গোলাদার-দোকানদার ও

হেটোরা। আর বাবুদের দানিগ্য এ'রা লাভ করতেন মো-সাহেবী কবে।—এভাবে যে অর্থ উঠত, তা ব্যয়িত হত পুজোর আড়ম্বর রক্ষায়। পরে যখন ইয়াররা পাড়ায় পাড়ার আরম্ভ করে দিলেন বারো-ইয়ারি পুজো, তখন লেগে মো-জাক-জমকের প্রতিযোগিতা। প্রতি-বর্ষী দলকে টক্কর দেওয়াই হয়ে উঠত এ পুজোর মূখ্য উদ্দেশ্য। ইয়াররা ছিলেন বাবুদের ছায়া। বাবুদের সবচে-গুণই পেয়েছিলেন তাই বাবুদের মতনই এ'রা মশ্ন থাকতেন বেনাবোঁত।

চলাফেরাতেও এ ইয়াররা ছিলেন। বাবুদের ছোটখাটো সংস্কারণ। বাবুরা চলাফেরা করতেন নিজেদের নামী-নামী গাড়িতে। সে সব গাড়ি এ'রা মো-সাহেবী পাবেন? তাই এ'রা কাজ সামান্য ভাড়া করা গাড়ি চেপে। অতীতে যেমন মোড়ে মোড়ে অনেক দল টা-জমায়েত থাকে, সেকালে ঠিক এভাবেই পাওয়া যেত ঘোড়ার গাড়ি। গাড়ীগুলো নানা রকম করে সজ্জাবাদী অ-হা-হা-হা-হা-শোনা যেত সৌখীন আগায়।—'চাঁদা আনা!' 'চার আনা!' 'লাদা দিবি!' 'তেরজুবা' ইত্যাদি ধনি গ্রন্থই অসং-কানে। কখনো কখনো মিহিসের ওবা ডাকত, 'এসো গো বাবু ছোট আদায়ত'

কুঠিওর না থেকে কেরানীবাৰু পৰ্যন্ত সকলেই সেকালে এ ভাড়া গাড়িতে পাড়ি দিতেন অফিস। ভাড়ার ভার কমাবার জন্য সঙ্গী নেওয়াও চলত। যাদের সঙ্গে ভাড়ার কথা হত না, তাদের দিকে গাড়োয়ানরা 'তবে ঝাঁকা মটরে যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম নম' প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ টিটকির ছুড়ে দিত। এদের সরস কৌতুকে মোড়ের মাথাগুলি সদাই সর-স্রস থাকত।

ঐ মোড়ের থেকে গাড়োয়ানদের সঙ্গে রসিকতা করেই ইয়াররা যোগাড় করতেন গাড়ি। নিমখাসা রকমের একটি ছন্দর হলেই খুশি হতেন ইয়ার মশাইরা। তারপর রুন্দ, রুন্দ ছন্দ, ছন্দ করে পাথরেঘাটার গিলির ভেতরে গিয়ে ঢুকতেন বড়ো বড়ো লোকদের বাড়ি। চাঁদা আদায়ের জন্য।

চাঁদা আদায়কারী বাবুরা সাধারণত সেই সব বাড়িতেই প্রথম যেতেন, যেখানে দরাজ বাক্ষিণ্য ছিল অবধারিত। তবে এসব বাড়িতে ঢোকার পথে প্রধান বাধা ছিল দরওয়ান। এ দরওয়ানরাই সেকালে বড়লাকদের বাড়িতে বুলডগের কাজ করত। আজবাজে লোককে এরা বিদায় করত আগভাগে। আর ভিক্ষুক-দের কাছে ছিল এরা একবারে কালান্তক যম। তবে ইয়ার বাবুদের প্রতি এরা ছিল প্রসন্ন। ছিল একটু সদয়। কিন্তু ঐ পৰ্যন্ত। বক্সিস না দিলে হাঁ করানো যেত না। হুতোমের ভাষায়, 'নবের রাজা এলেও খবর নদারক'। তাই চাঁদা আদায়কারী ইয়ার বাবুদের প্রথমেই অস্তিত্ব দিতে হত চার আনা প্রণামী। কৈফিয়ত দিতে হত কিসের জন্য এ অগমন। এ সময় বোয়াড়া রকমের দু-একটি দরওয়ানী ঠাট্টা পাওনা হওয়াও বিচিত্র কিছু ছিল না।—যাইহোক, আনা চারেক দান দিলে ঐ দাদুনে দরওয়ান চিকুতে চিকুতে শেষবেশে ইয়ার মশাইকে পৌঁছে দিত বাবুর কাছে।

বাবুর কাছে পৌঁছে গেলেই যে সমস্যার সমাধান হইবে যেত, তাও নয়। কেন না, বাবুর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে নেওয়া ছিল রীতিমত কঠিন। দেড় হাত-উঁচু গদির ওপর বসে থাকতেন বাবু। আদর না। ঠেস দিয়ে থাকতেন একটি তাকিয়ার ওপর। পাশে চশমা-পরা মুনশি। পেস্কার মশাইও সমা-সীন। কিন্তু ভীষণ ব্যস্ত। সামনে একরাশ খোলা খাতা। উম্মেদার ও মো-সাহেবে বাবু পরিবৃত। কেউ করছেন স্তব, আবার কেউবা রসিকতা। এরকম পরিবেশে বাবুর চোখে পড়ই ভার। তবু ঠিক সময়েই ইয়ার মশাইরা বাবুর চোখে পড়তেন এবং এককথায় হাজার টাকা চাঁদা আদায় করে বেরিয়ে আসতেন।

না, সোজা বেরিয়ে আসার উপায়

ছিল না। স্বাক্ষরীথানায় পেমেন্ট নেবার সময় হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকত দরওয়ান। শতকরা দু-টাকা হিসাবে সে কেটে নিত নগদ কুড়ি টাকা। এ দস্তুরি না-দিয়ে উপায় ছিল না ইয়ার মশাই-দের। পরের বছরের পুজোর কথা ভেবেই দরওয়ানকে খুশি রাখতেন তাঁরা। বাহনকে সম্মুখ না-রাখলে দেবতার দেখা পাওয়াই হয়ত ভার হবে। তাই এ উৎকোচ।

ওপরে যে কাহিনী বিবৃত করা গেল, ঐ ধরনের চাঁদা দাতা বাবু অবশ্য সেকালে খুবই কম ছিল। খুবই কম। অনেক বাবু ছিলেন বিপরীত। তাঁদের স্তব কমলে একটি কানা কড়িও আদায় হত না। কোনো কোনো বাবু আবার সদয় হয়ে এককথায় সহ করে দিতেন মস্ত টাকা। বলা বাহুল্য, সে টাকা কোনো কালেই আদায় হত না। ফলে, বারো-ইয়ারি বাবুদের অনেক দুর্ভোগ বহন করতে হত। কোথাও কোথাও আবার সোজা গলাধাক্কা খেতেন। কোথাও বা রীতিমত ঠোনাটা-ঠানাটা। আর ঠাট্টা-তামাসা?—ওসব ত' ছিল নিত্য আভরণ। অঙ্গের ভূষণ।

তবে চাঁদা-আদায়কারী ইয়ার বাবুরা ছিলেন রীতিমত খুঁত লোক। চাতুরীর খেলাতে তাঁরা ছিলেন সকলের ওপরে। কোনো অপমানকেই তাঁরা গায়ে মাখতেন না। টাকা পাবার এককথা আশ্বাস পেলেই, তাঁরা সেখানে নানারকম চাতুরী খাটিয়ে সহজেই বের করে আনতেন টাকা। তা সে যত দূস্তর বাধাই হোক না কেন!

একবার একচোখ কানা কোনও এক সোনারবেণের কাছে চাঁদা আদায় করতে গিয়েছিল ইয়ারের দল। বেণে বাবু ছিলেন বেজায় কুপণ। বেজায় নিজেদের মাকে ইনি বলতেন, 'বাবার পরিবার।' আর এই 'বাবার পরিবার'কে দু-বেলা দু-মুঠো ভাত দিতে তিনি ছিলেন বেজায় কুণ্ঠিত। তামাক খাবার পাতের শুকনো নলগুলি আর পাঁচজনের মত ইনি ফেলে দিতেন না। একেকটি করে রাখতেন জমিয়ে। এক বছর হয়ে গেলে গুল্লি বিক্রয় করতেন মোবাকে। আর এর বিনিময়ে যা অর্থ পেতেন, তাতে পরি-বারের কাগড় কাচার খরচ উঠে আসত।—মোট কথা, ঐ হাড়-কিপটে বেণের কাছে ইয়ার-মশাইরা গিয়ে চাঁদার খাতা মেলে ধরলেন। বেণে মশাই তো রেগে আগুন—তেলে বেগুন। তিনি হাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি কোনো বাজে খরচে নেই।' ইয়ার মশাইরা তখন বেণেবাবুর বাজে-খরচ বের করার চেষ্টা আরম্ভ করলেন। সত্য সত্যই কি এ বাবুর কোনো বাজে খরচ নেই? এক

কথা না? তামাকের গুল্লিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে সেগুলি পৰ্যন্ত সুরক্ষিত। কোম্পানীর কাগজের সঙ্গে সেগুলিকে রাখা হয় বাজের মধ্যে। বালিসের ওয়াড়, বা ছেলেদের পোষাক—কোনোদিনই তাঁর করে না দাঁজতে। বেণেবাবু এগুলিকে স্বহস্তে তাঁর করেন নিজেদের অবকাশ মত। বাবুর একটিমাত্র চাকর। তাও বড়ো। তার কাছে জিম্মা থাকে তামাকের গুল্লি এবং বড়ো খ্যাঙা। বাবু তাও আবার নিকেশ নেন দিনে দুবার। খুঁত পূরনো হলে ফেলে দেন না। বদল দিয়ে বাসন কেনেন। বাবুর তিরিশ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ। এ বাবদ সদ ও চোটারি বিলক্ষণ দশ টাকা আসত তাঁর। কিন্তু না, এক পরসাত তিনি এর থেকে নিজের প্রয়ো-জনে খরচ করেন না। পৈত্রিক পেশায় যা রোজগার করেন, তাতেই নির্বাহ করেন সংসার যাত্রা—মোট কথা, বাজে খরচ নেই বললেই চলে।

অনেক তম তম করে খুঁজে এ হেন সচেতন কুপণের কাছেও ইয়ার মশাইরা একটি বাজে খরচ আবিষ্কার করে ফেল-লেন। হঠাৎ এঁদের দৃষ্টি পড়ল বেণে-বাবুর চোখের দিকে। বাবুর একটি চোখ নষ্ট, একটি ভালো। চশমায় অচ দৃশ্যনি পরকোলা। সঙ্গে সঙ্গে এক ইয়ার বলে বসলেন, 'মশাই। আপনার বাজে খরচ আছে। আর তা ধরা পড়ে গেছে। হয় চশমার একটি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয়ত আমাদের কিছু দান করুন।'—বেণেবাবু সত্যি সত্যিই এবার বেহু বনে গেলেন। তবে ভেতরে ভেতরে খুঁশিও হলেন। আর সেই খুঁশিতে দুটি সিকি না-দান করে পারলেন না।

ইয়ার মশাইরা বাবুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই ভাবেই আদায় করতেন চাঁদা। যে যেমন বাবু, এবং যে বাবু যেমন চান, ইয়ারের দল ঠিক সেভাবেই এগোতেন। কোথাও কোথাও ঐ কৌশলের কল্যাণে এঁরা লাভ করতেন আশাতীত সাফল্য।

স্বয়ং হুতোম সম্ভবতঃ এ ইয়ার দলের একবার শিকার হয়েছিলেন। 'হুতোম' মানে কালীপ্রসন্ন সিংহ। পুজোর কিছুদিন আগের কথা। আশ্বিনের রোদে কেমন যেন পুজোর গন্ধ পাওয়া যায়। বাতাসে পাওয়া যায় আসন্ন ছুটির আভাস। সিংগি বাবুদের বাগানে পুকুরের ধারে একরাশ কাশ ফুল ফুটেছে।

ঐ রকম এক আসন্ন পুজোর সকালে অফিস বেরোচ্ছিলেন সিংহ মহাশয়। হঠাৎ চাঁদাপ্রার্থী একদল ইয়ার এসে ঘিরে ধরল তাঁকে। তারপর সকলেই চেঁচাতে লাগল, 'খুঁতই ধরছি!'—

ছেলেটি

বুলাডিকুমার
সেন

একটি ছেলে তার কিশোর বয়সে মাকে মাঝে বাড়ির সঙ্গে বিরোধ করে আমার ঘরে এসে আশ্রয় পায়। ব্যাপারটা আমি পছন্দ করতাম না, অথচ স্নেহবশত কিছু বলতেও পারতুম না ছেলেটিকে। অনেক সময় হয়তো আমার চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু প্রকাশ পেতো—যাতে সে বুঝতো তার এ-ধরনের আসাটা আমার মনঃপুত নয়, কিন্তু তা নিয়ে তার বড় একটা সংশয় ছিল না। সে জানতো—আমার চোখে যাই থাক, মুখে কিছু প্রকাশ পাবে না। কিন্তু একদিন হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল। ছেলেটি সেদিন তার পথের-অপথলের যা কিছু ছোট্ট একটা সুটকেসে বোকাই করে অধিক রাগে আমার দরজায় এসে কড়া নাড়লো। বলতে বাধ্য নেই যে, তাদের বাড়ি আর আমার বাড়ির মাঝখানে অত্যন্ত মাইল করে কেবল বাবধান। তৎসত্ত্বেও তার কাছে দিন-রাতির ব্যবধানটা সামান্যই।

আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই ছেলেটি আমার চোখের দিকে একবার তাকালো, তাবপর নিজে থেকেই দ্রুত স্বরে বললো : 'চল এলাম রতনদা, বাবার সঙ্গে আজ একপশলা হয়ে গেল, বোরিয়ে এলাম তাই বাড়ি থেকে। ও-বাড়িতে আব যাবো না।'

দরজায় দাঁড়িয়েই আমি বললাম : 'তবে হয়েছে তাই বোঝেছ। কিন্তু বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে এসে আমার ঘরে বাসা বাঁধবে এটা আমার ঠিক পছন্দ নয়।'

ছেলেটি আব একবার আমার চোখের দিকে তার দৃষ্টি তুলে ধরলো, সে-দৃষ্টিতে

তার কি ছিল, বোঝা যায় নি। শুধু বললো : 'বেশ, আমি চলে যাচ্ছি।'

দ্বিতীয় প্রশ্ন করবো যে, তার আর অবকাশ রইল না। বাইরের দ্বারটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই অন্ধকার পথেই দ্রুত সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন ছেলেটির কতই বা বয়স, খুব বেশি হলে বছর সতেরো ; শুল্ক ছেড়ে সবে কলেজে চুকছে। বন্ধুবা মিলে মাসিক দেওয়ালপত্র প্রকাশ করবে ; আমার কাছে এলো একটি শূন্যচেস্টা কবিতা চাইতে। ছেলেদেব এ-সব কাজে আমার চিবকালই উৎসাহ আছে। আমাদের সাহিত্যজীবনের গোড়াতেও আমরা এমনি করছি। তাই বিনা বিধায় চার লাইনের একটি কবিতা লিখে দিলাম। দেওয়ালপত্রে প্রকাশ করে আমাকে দেখাতে নিয়ে গিয়ে ছেলেটি বললো : 'আশীর্বাদ কবুন, আপনায় কবিতাব মতো যেন হবে উঠতে পারি। যেখানে যত কখন, যত বাধ্য সেই বাধ্য দেওয়াল ভেঙে আমবা যেন বোঝে—পড়তে পারি মৃত্ত পাখির মতো।'

বললাম : 'কেন পারবে না, নিশ্চয়ই পারবে।'

এ বকম উৎসাহ বোধ করি আর কোথাও থেকে পায় নি। ছেলেটি তাই আমার কাছ ঘোলাঘরিটা তাব কিছু বোঝে গেল। আমাব ঘবে যত বই আছে, একে একে পড়ে ফেললো সে। আমাব নিজের লেখা বইগুলো তাব কাছে তখন যেন জীবনবোধ। পারিবারিক পরিচয় দিয়ে একসময় সে বললো : 'এককাল আমাদের প্রচুর জমিদারী ছিল,

কিন্তু পাকিস্তানে পড়ে গিয়ে সব গেছে। এখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভাসমান জীব। ভদ্র গা থেকে আমার জমিদারী-রক্তের গন্ধ যায় নি ; যদি একটু ভালো করে গুঁড়িয়ে বসতে পারতাম, তবে আপনাকে নিয়ে যে কী করতাম, কি বলবো !'

বললাম : 'দোলনায় দুলতে, এই তো ?' এবারে কি ভেবে হঠাৎ ফিক্‌ফিক্‌ করে হেসে ফেললো ছেলেটি, তারপর নিজের খোঁয়ালেই একসময় কোথায় একদিকে উঠে গেল।

এমনি করেই সে একসময় কলেজের দরজা পেরিয়ে কোন একটা প্রাইভেট ফার্মে গিয়ে চাকরীতে চুকে পড়লো। বললো : 'দেখুন অদৃষ্টেব কি পরিহাস ! যে চাকরীটায় চুকলাম, এ বকম মাইনেব চাকরী দিয়ে এককালে আমাদের পরিবার কত লোককে পুঁয়েছে।'

বললাম : 'কি করবে বলো ! জীবনে সব অবস্থাকেই মেনে নিতে হয়। সময় এলে আবার দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

উক্তবে ছেলেটি বললো : 'বাবাব কোনো আভাস নেই। আমার মধ্যে আমি এক দরবস্ত যৌবনকে অনুভব করি ; কত কাজ করাব আছ, কত কাজ করতে চাই আমি, কিন্তু কোথাও কিছু করার সন্ধান নেই। যৌবন আমার মনে আছে, ক্রিমিয়ে আছে।'

বললাম : 'তা যায না ; দেখবে—আবার জেগে উঠবে।'

এবাবে অনেককাল অপলক দৃষ্টিতে আমাব মনঃব দিকে তাকিয়ে বইল ছেলেটি, তাবপর দীর্ঘ দীর্ঘ সন্ধ্যা : 'উঃ, আপনায়



কাছে হেরে গেলাম আমি; আমার জ্বালা একসময়ও যদি আপনার মধ্যে ধারণে দিতে পারতাম। আপনি এত ভালো—যেন গাছের ছায়া, যেন গ্রীষ্মের বর্ষা; মন জড়িয়ে যায়।

শুন হাসি পাচ্ছল, কিন্তু হাসতে পারতুম না। ছেলোটর মধ্যে শব্দ কবিতা নয়, আছে ছন্দ, রূপ ও ভাবের অলংকার; ওর যৌবন যেন সীতাই একটা অগ্নিপিণ্ড, যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়ে বিস্ময়কর কিছু একটা ঘটিয়ে তুলতে পারে। একটুকাল থেমে বললাম: 'এতকাল লেখাপড়া নিয়ে ছিলে, এখন কিছু কিছু লিখলেই তো পারো।'

ছেলোটি বললো: 'ছাপবে কে? এর মধ্যে কয়েকটা খাতাই তো লিখে শেষ করলাম। ভাবছি, এবারে মাইনের টাকা দিয়ে নিজের কাগজ বার করবো। আমার মতো বত তরুন আছে, সবাইকে এমন ভেড়াবো সেই কাগজে।'

বললাম: 'কিন্তু কাগজ চালাতে হলে বিজ্ঞাপন চাই যে। নইলে কাগজও চলবে না, মাইনের টাকাটাও যাবে।'

দু'চার পাতা বিজ্ঞাপনের জন্য কি আর কাগজ আটকে থাকবে। ঠিক দেখবেন যোগাড় হয়ে গেছে।' বল আর অপেক্ষা করলো না ছেলোট, কোথায় একদিকে বেরিয়ে গেল।

এরপর একদিন কোন পেশাম, তার বাবার খবর অস্ব, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে

ভর্তি করে দিয়েছে; কেড-নাম্বার দিয়ে বললো: 'পারেন তো বিকেলের দিকে এসে একবার বাবাকে দেখে যাবেন।'

গেলাম দেখতে। ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে কষ্ট হলো। শরীরে কিছু নেই, পাকিস্তানের জমিদারী রক্ত এখানে এসে শুকিয়ে গেছে। বললেন: 'শুনো, কান্দুকে আপনি খুব স্নেহ করেন; আমি সেরে উঠলে একদিন যদি আমার বাড়িতে আসেন, খুব খুশী হবো।'

বললাম: 'যাবো, আপনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই যাবো।'

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে তাঁর দেরি হলো না, কিন্তু দেহটাই শব্দ ছাড়া পেলো, দেহের মধ্যে যে প্রাণটা থাকলে দেহ বেঁচে থাকে, সেই প্রাণটা আগেই সেই মহাশয় গিয়ে মিলিয়ে গেছে—যেখান থেকে তাকে আর কেউ কোনোদিন ফিরিয়ে আনতে পারে না। কথা দিয়েছিলাম, তাঁর বাড়িতে যাবো, এবারে গিয়ে দাঁড়লাম সেই ঘরটাতে—যে ঘরের প্রতিটি স্তরে নিজের চিহ্ন রেখে গিয়েছেন ভদ্রলোক। সন্তানদের মধ্যে কান্দু ছেলোটই বড়, বাকী আরও ছ'সাতটি। বহু তাদের খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। কষ্ট হলো—ভদ্রলোকের জন্যে নয়, কষ্ট হলো—এদের জন্যে। এরা কববে কি, দাঁড়াবে কি করে জীবনে?

আমার মানসিক অবস্থাটা কান্দু হস্তোত কিছুটা বৃদ্ধিতে পেরেছিল; তার সঙ্গে তার নিজের মানসিক অবস্থা যোগ করে এক-

সময় বললো: 'চলুন আপনাকে বাসে ছুঁতে দিয়ে আসি।' বলে আমার কোনোক্রম আপত্তিই না শুনে আমার সঙ্গে সে বাস-রুট অবধি হেঁটে এলো।

বললাম: 'একদিন বাবার উপর রাগ করে কত কাশুই না করেছ, আজ বাবা নেই, দায়িত্ব অনেক, আয় যেন বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে থেকে না।'

ছেলোটর মূখে এবাবে কথা নেই। ইত্যবসরে আমার বাস এসে যাওয়ার আমি উঠে পড়লাম।

এরপর ছেলোটর সঙ্গে দীর্ঘকাল আর আমার দেখা হয় নি। এই দীর্ঘ সময়ের অবকাশে সমাজ ও রাষ্ট্রের যেমন দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে, ছেলোটর মনেরও তেমনি পরিবর্তন ঘটা অব্যাহত নয়। শুনলাম—ইতিমধ্যে সে কয়েক সংখ্যাই কাগজ প্রকাশ করেছে এবং তাকে ঘিরে তরুন মহল এক সজুন মৌচাক রচনা করে আধুনিক কবিতায় কুবাড়ি গুছাচ্ছে। শুনেন খুশি হলাম সত্যই মই, এতদিনে তবু যাহোক সে তার যৌবনকে কাজে লাগাতে পেরেছে। কিন্তু খুব যে আশঙ্কিত হলাম, তা নয়। নয় বলেই আমাকে অনেককাল অপেক্ষা করতে হলো।

সহসা কড়ের মতো একদিন আবির্ভাব ঘটলো—তার। উল্লেখ্য শুন চলে। মূখে প্রাথমিক উদ্ভাসিত দাড়ি-গাফের অরুণ, গরমে পায়জামা ও পাজাবী, অনেকে হয়তো 'হািশ' বলে আশঙ্কা করবে, কিন্তু আমার সে-রকম কোনো সংশয় নেই। হাতে খবরের কাগজের মোড়ক থেকে একতাপ পত্রিকা বার করে আমার দিকে এগিয়ে ঘিরে ছেলোট বললো: 'কাগজ বার করছি মাস কয়েক হয়ে গেল, এদিকে আসা পড়ে নি বলে আপনাকে দেওয়া হয় নি। পড়ে জ্ঞানাবেন, কেমন লাগলো।'

বললাম—ছেলোটর জীবনে আমার লেখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন তার দিক খুলে গেছে, দীক্ষা নিয়েছে সে নতুন যুগের কাছে। কাগজখানিক যথাসম্ভব নাড়াচাড়া করে বললাম: 'ভালোই তো, বেশ লাগছে হাতে ধরে, তোমার লেখাটা অস্তত আসে পড়বো।'

দেখলাম—কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ কবিতা লিখেছে ছেলোট, নিজের পুরো নাম ব্যবহার করেছে এখানে—কাননকুসুম বাগচী। কানন থেকে কান্দু, ওর বাবার মূখেই কান্দু নামটা শুনিয়েছিলাম।

ছেলোট আর বললো না, বললো: 'বাই, প্রেসে যেতে হবে, বাইশডায়ের কাছে যেতে হবে, অনেক কাজ।'

জিজ্ঞেস করলাম: 'কবে আসতে আবার?'

যেতে যেতে ছেলোট বললো: 'কবে কিছু বলা যাচ্ছে না, তবে এমনি করেই আগার কখনও এসে পড়বো।'

ভাবলাম-ভালো, এ বুকের এই বাক্য
প্রীতি। বুঝে যে একটি ভাল ভাবলাম-ভা-
নয়; ওর কাগজ খুলে যে-কটি লেখার
উপর দিয়ে চোখ বুজিয়ে গেলাম, দেখলাম-
আমাদের আজন্মের বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও
প্রকাশভঙ্গি সব সঙ্গো কোথাও কোনো মিল
নেই। এ-যেন আলাদা একটা শহরে এসে
প্রবেশ করা গেল-যেখানে গাছে কোনো
পাতার সমারোহ নেই, নেই বৃক্ষ, রং আর
প্রাণের আকর্ষণ, অথচ একটা শহর সন্দেহ
নেই-যে শহর কেবল গড়ে উঠেছে, গড়ে
উঠে বালিবাড়ী পাহাড় চড়ায়।

দিলকয়েক কেটে যাবার পর হঠাৎ এক-
দিন একটা পোস্ট কার্ড পেলাম তার।
লিখেছে: 'আসচে বুধবার-কলকাতা-বেতারের
সাহিত্য-বাসরে আমার কবিতা পাঠ আছে,
শুনবেন-কেনন লাগে।'

শুনলাম। লাগলো-যেমনটি লেগেছিল
ছেলেটির কবিতা পড়ে। বাকি আছে, নতুন
নতুন নানা দেশজ ও বিদেশী শব্দের কলঙ্ক
আছে, আছে শব্দগত ছন্দও। কিন্তু সেই
ছন্দ নেই-বা এসে মনের মধ্যে বাঁধা বাঁধায়,
সেইভাবে নেই-বা মনকে হাসায়, কাদায়,
ভাবায়, উদ্দীপ্ত করে। তবু ছেলেটির কবি
পরিচিতির কথা ভেবে খুশি হলাম। এক-
দিন যখন বয়স হবে, যখন যৌবনের উদ্ভাস
চাঞ্চল্য তাকে আর ভাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে
না, তখন চিরকালীন সাহিত্যের নিরম
ভাষার রত থেকেও নিশ্চয়ই নিরন্তর হবে।

এরপর বেশ কিছুকাল চুপচাপ।
মাকথানে আমিও কিছুকাল বাইরে গিয়ে
কাড়িয়ে এলাম। ফিরে এসে নিজের কাজের
অধেই আবার ডুবে গিয়েছিলাম। দু'জন
প্রকাশকের সঙ্গে দু'খানি বইয়ের চুক্তি ছিল।
অগ্রিম টাকা নিয়েছিলাম, কিন্তু কপি দেওয়া
হয় নি। এবারে সেই কপির দিকে মন দিতে
নিয়ে অপর কারুর কথা আর ভেবে উঠতে
পারি নি। কিন্তু আমি না ভাবলেও অলঙ্কার
সবার মনের মধ্যে যিনি ভাবনা সঞ্চার করেন,
তিনি নির্বিকার হয়ে কসে ছিলেন না।

মাস দুয়েক যাদে কানন বাগচী নিজে
কেকেই এসে আবার উপস্থিত। এবারে
নিষিদ্ধ ছিলাম; প্রথম গৌর-দাড়ি কল্লের
যে সখর শোভনতা, সারা মুখের উপর সেই
প্রসন্ন শোভনতা বিরাজ করছে। সম্প্রসারিত
কললাম: 'গত রাতে বোধ করি ঘুমটা ভালো
হয়েছে, আজ তাই বুঝে ফের দেখাচ্ছে।'

ছেলেটি বললো: 'এটা ঘুমের চিহ্ন
নয়, নিশ্চিন্ত রাত্রিগাপের অবশেষ।'

জিজ্ঞেস করলাম: 'কোথায় রাত
করতেন?'

—'কখনও ঘরে, কখনও ফাঁকা মাঠে।'

ছেলেটি বললো: 'অনেককাল পর কাল
কিরকম চাঁদ উঠেছিল, দেখেছিলেন তো?
বাম্ভবী বললো: 'এস, বেড়াই। সাবা রাত
চাই বেড়ালাম।'

—'শুভ বা পুণিলের ভয় কবলো না?'

ছেলেটি বললো: 'শুভ তো আমি
নিজেই, আর পুণিল তো আমার সঙ্গেই ছিল
বাম্ভবী। রাত্তিভাষার আপনারা পুণিলকে
তো স্মৃতিলিপ্ত করেছেন।'

মুখ টিপে হেসে কললাম: 'এবারে
তোমার কাছে আমি হার স্বীকার করছি।'

—'তাহলে, সিগারেট খান, আমার
পকেটে দামী সিগারেট আছে। বাম্ভবী
কাল আমাকে নতুন কেস আর লাইটার সহ
স্টেট এক্সপ্রেস প্রেজেন্ট করেছে।' বলে পকেট
থেকে সিগারেট কেস আর লাইটার বার করে
আমার দিকে এগিয়ে ধরলো ছেলেটি।

বলবো না—এ তার ঔষুভা, বলবো—
এ তার আধুনিক জীবনযাত্রার স্বভাবের
সম্মত। আমি নিজেকে সেই স্বভাবের সঙ্গে
জমে-পাশ রাইয়ে নিতেই চেষ্টা করছি, নইলে
এই মহাসমুদ্রে ভরুন কাশ্মীরীদের হাতে
আমার ভরাটুবি হবাব সম্ভাবনাটা একেবারে
আলীক নয়। হাত সরিয়ে নিয়ে নম্রকণ্ঠে
বললাম: 'খ্যাকস্ স্মোকারিং আমি ছেড়ে
দিয়েছি, শরীর মিছে না; ছুঁমি খাও।'

কিন্তু খেলো না, হাতের যুটোর মধ্যে
সিগারেট কেস আর লাইটারটিকে চেপে
রেখে ছেলেটি বললো: 'একটা প্রোগ্রাম
কিছুতেই কাটছে না। বুকতে পারছি,
এখন আমার বিয়ে করা দরকার, কিন্তু মেয়ে-
পক্ষে ক্যাণ্ডিডেট তিনটি, তিনজনই আমার
সিমান প্রিয়। মাগতীদের অবস্থা ভালো
নয়, কিন্তু নিজে সে উর্বরী, নাচে-গানে
অম্বিতায়া; শ্যামলী মোটামুটি চলনসই
ঘরের মেয়ে, কথা বলে ভারী মিষ্ট, চাকরী
করে; আর শিম্পা হাসতে পারে অক্লান্ত,
সেই হাসি দিয়ে মনের মধ্যে কবিতার
কলঙ্কর তোলে। তিনজনই ওরা গলায়-গলায়
বন্দ্য। ওদের কোনো একজনকে নিলে
যাকী দু'জনকে বিবর্ত করা আবাস্য, তা
হয় না।'

বললাম: 'তাহলে বাম্ভবীরা বাম্ভবী
থাক, বিয়েটা বরং অন্য কোথাও করো।'

ছেলেটি এবারে ইষৎ জ্বলে উঠলো,
বললো: 'একেই বলে ষট্ অব ওল্ড স্কুল।
এভাবে বিয়ে করলে কোনো মেয়েই কি আর
বাম্ভবী থাকে?'

মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার কোনো
আইডিয়া নেই দেখছি; এই আইডিয়া নিয়ে
গল্প-উপন্যাস লেখেন কি করে, ভেবে
পাই না।'

বললাম: 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে
বলতে আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম।
তা যাক, কি করবে ঠিক কবে?'

—'এনি হাউ টু, সলুভ দা ডায়লেমা।'
বলে উঠে পড়লো ছেলেটি, যেতে যেতে হাত
ছেড়ে বললো: 'চল এখন, পরে জানাবো।'

ওব স্বভাবটা আগাগোড়াই এ রকম।
আসবে, কিন্তু বেশিক্ষণ বসবার ঠিক নেই,
দু-চারটে কথা বলেই উঠে পড়বে। মনে আছে
একবার বলেছিল: 'আপনার মতো ঠিক

আর সম্ভবীভূত থাকলে আমি বোধ করি
পাপল হয়ে যেতাম। আপনারা একজায়গায়
বসার পর যেটা বসে যেটান কি করে, সেই-
টেই আকর্ষণ। মন মিলানোর বোধ কোথাও
বসলে আমার মন কষ হয়ে আসে।'

উত্তরে আমি শুধু বলছিলাম: 'অনেক-
ক্ষণ ছুটবার পরে মম পাওয়াও তো চাই।'
কথাটা মনচ্যুত হয় 'নি ছেলেটির, 'খ্যাক' বলে
উঠে গিয়েছিল।

ওর এই অধৈর্য ফল ফলতেও দেখা
গেল-সেরি হলো না। যে চাকরীটার
চুকোছিল, সেখানে ওর টেম্পোরারি সাস-
পেন্সন হলো। কোনো আফনার নাকি
কখনও প্রয়োজন মতো তাকে পায় না।
এই নিয়ে অনেকবার তারা ওয়ার্মিং দিয়েছে
তাকে। উত্তরে সে বলেছে: 'এইটেই আমার
জীবনের একমাত্র কাজ নয়, আবও বহু কাজ
আছে। তা হলেও ডিপার্টমেন্টে আমার
এ্যালোটেড কাজ কখনও পৌঁছোয় থাকে,
একথা কেউ বলতে পারবে না। তবু অফিস
থেকে তার উপর ডিসমিসিনারী একাংশ
নিতে দৌর হলো না।

শুনে মনটা হঠাৎ যেন কেমন খারাপ
হয়ে গেল। ছেলেটি টেলিফোন সন্দেহ নেই,
কিন্তু কি রকম যেন। বিশেষ করে ঘর ভর্তি
ছোট ছোট সব ভাই-বোন, বিধবা মা, কি
অবস্থা হবে সকলের? ভাবলাম—নিজেই
আর একবার বাই ওদের বাড়িতে, বুঝিয়ে
সুজিয়ে বলি চাকরীর ক্ষেত্রে অন্তত বাত
সে ঠিক রাখ।

কিন্তু যেতে আর হলো না, ছেলেটি
নিজেই একসময় ঝড়ের মতো ছুটে
ছুটে এসে আমার ঘরে ঢুকলো, বললো:
'আমেন ডায়লেমা যেটা ছিল, আমাব অফিসের
দৌলতেই সেটা হয়ে গেল। অফিসে যে-রকম
বীদ্রামি শব্দ করেছে, তাতে ওখানে আর
টাকা বাচ্ছে না। তাই শ্যামলীকে কথা
দিয়েছি সামনের মাসেই আমাদের বিয়ে
হবে। শ্যামলী চাকরী করে, এই বা ভরসা।
ইতিমধ্যে কাগজের সাবস্ক্রিপশন আর বিজ্ঞাপন
আমি বাড়িয়ে ফেলতে পারবো। অফিসে
কতকগুলো জাত-কোরাদারী তাবোদারি করার
চাইতে স্বাধীনভাবে অল্প আয়ের কিছু
করাও ভালো।'

অনেকক্ষণের মধ্যে কেন যেন কথা বলতে
পারলাম না। ভুলে গেলাম যে আমি আমার
নিজের ঘরেই বসে আছি এবং এখানে বসে
আমি যে-কোনো কথাই বলতে পারি। কিন্তু
কোনো কথাই মুখে এলো না। শুধু
নির্বাক দৃষ্টিতে ছেলেটির মুখের দিকে
তাকিয়ে থাকতে গিয়ে মনে হলো—দেশ
আজ কত এগিয়েছে, কাননের মতো হেলেরা
আজ অনায়াসে অনেক কিছুকে স্বাধীনতার
কবে অবলীলাক্রমে অনেক কিছুকে গ্রহণ
করতে পারে। তাতে ওদের সঙ্কোচ নেই,
ভয় নেই, লজ্জা নেই। যাদের ওরা ওল্ড
স্কুল অব ষট্ বলে, তাদের কাছে ঐ

কল্যাণ, ভয়, আর সন্দেহটাই বড় ছিল।
তাই অনেক কিছু হবার থেকেও অনেক
কিছু হলো না। ওরা সেই হবার সম্ভাবনাটিকে
কক্ষাও পায়ে মাড়িয়ে যায়, কখনও দু' হাতে
কেড়ে নেয়, তাতে অতীত, বর্তমান বা
ভবিষ্যতের কোনো ন্যায়-নীতির দোহাই
থাকে না।

ছেলেটি প্রশ্ন করলো: 'কি দেখছেন
এমনি করে?'

বললাম: 'না, কিছু না; জীবনে তুমি
কৃতকার্য হও, শূন্য এই চাই।'

ছেলেটি বললো: 'যাচ্ছি এখন, আমার
বিলম্বে আপনাকে যেতে হবে কিন্তু, মনে
থাকে যেন!'

বলে আমার হাঁ বা
না'র জন্যে আর অপেক্ষা নেই, সঙ্গে সঙ্গেই
অন্তর্ধান।

হঠাৎ আমার কলমে কবিতার কটি
লাইন এলো—যার কথাগুলো আমার না
হয়ে ওরই হওয়া উচিত, অথচ লিখলাম
আমি—

পাণির মতো উড়ে উড়েই যায়
যদি দিন কেটে,
মনের তৃষ্ণা নাই বা যদি মেটে,
চাগু বলে তবু আমি মানবো
না তো হার,
খেয়াল-স্বপ্নে খোলা আমার সকল
কণ্টা স্বার।

এ-লেখা এমনি করে নিশ্চয়ই ও কোন-
মিন লিখবে না। বক্তব্য এক হলও ওদের
কলবার চা আলাদা, কারণ আলাদা, ভাষা
আলাদা—যার ফলে বক্তব্যের মূল কথাটাও
কেমন ব্যপসা হয়ে যায়। অথচ ওদের ক্ষি-
ত্ববাক্যের বাজা কাবা নানা আন্দোলনে
প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠে। সেখানে
আমার মতো যারা—তারা স্বীকৃতি পাচ্ছে
না, স্থান পাচ্ছে না কোনো আলোচনায়।

শুনছিলাম—ছেলেটি তার শ্যামলীকেই
কোটে গিয়ে বিয়ে করেছে। বাড়িতেও
ছোট-খাটো কিছু অনুষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু
সে-অনুষ্ঠানে গিয়ে যোগ দেওয়া আমার
পক্ষে সম্ভব হয় নি। অল ইন্ডিয়া ফাউ-
ন্ডারাল সেমিনারে আহুত হয়ে এসময়ে দিন
পনেরো আমাকে গিরে নামপদে কাটাতে
হয়।

অনুবোধ দিয়ে এবারে যৌন ছেলেটি
আমার ঘরে এসে দাঁড়ালো, সৌন্দর্য সে
আর একা নয়, সঙ্গে শ্যামলী। বোনের
সঙ্গে ছেলেটিও এই প্রথম আমার পায়ে
হাতস্পর্শ করে প্রণাম করলো, বললো:
আমাদের বিয়েতে আপনাকে পাবো খুবই
আশা করছিলাম। কিন্তু নাগপদ সেমিনার
আপনাকে টেনে নিয়ে গেল। এবারে তো
আসতে পারবেন একদিন নিশ্চয়ই!'

—নিশ্চয়ই—? তারপর থেকে প্রশ্ন
করলাম: 'কেমন লাগছে দু' জন্মের
নতুন জীবন?'

শুন শ্যামলী যতটা লজ্জা পেলো,
ছেলেটি ততোধিক মনঃমুগ্ধ কণ্ঠে বলে
উঠলো: 'ভেরী নাইস, ভেরী চার্মিং।
তবে বাস্তবীদের কিছু অন্তর্দাহ হয়েছে।'

জিজ্ঞেস করলাম: 'আ আর ভাইবোনেরা
বেশ খুশি হয়েছে তো?'

—এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব কোনো
অনুশির কারণ ঘটে নি।' থেকে এবারে
চিবিয়ে চিবিয়ে ছেলেটি বললো: 'তবে
ফ্যামিলির পক্ষে শ্যামলী হোল-টাইমার
হলে হয়তো সবাই বেশ খুশি হ'তো,
কিন্তু ওর চাকরীর ইমপ্লটেন্টাই কি কম?'

—বটেই তো! বললাম: 'বস, চা
থেকে তবে যাবে।'
আপনি জানিয়ে ছেলেটি বললো:
'এইমার চোরগা হোটেল থেকে চা খেয়ে
তবে আপনার এখানে এলাম; অন্যদিন
এসে বসে থাকো।' বললাম: 'বৌমাকে এই
প্রথম দেখলাম, এসে একেবারে খালি মুখে
উঠে যাবে, এটা কি ভালো দেখায়?'

শ্যামলী কেমন বোকা বোকা দৃষ্টিতে
তাকিয়ে রইল। ছেলেটি বললো: 'আপনি
দেখিচি ইমানীং বড ফর্মালিটিতে এসে
যাচ্ছেন। আমাদের চিরকালের নমস্কা
আপনি; আমাদেরই বরং উচিত ছিল
আপনার জন্যে হাতে করে কিছু নিয়ে
আসা।'

শ্যামলী বললো: 'কলো না—আমাদের
ওখানে গিয়ে একদিন উনি থেকে আসবেন।'

ছেলেটি তার প্রতিদ্বন্দ্বি করে বললো:
'শুনলেন তো?'

বললাম: 'মনে রুইল, দেখি—কবে
যেতে পারি।'

—এবারে তা'হলে যাচ্ছি আমরা।'
বলে চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ালো ছেলেটি।
শ্যামলীর উদ্দেশ্যে বললাম: 'তোমার
কর্তৃটি চিরকালের লাগাম ছাড়া। জমিদারী
নেই, কিন্তু তার শেষ রক্তবিন্দু এক্ষণও
বুকের মধ্যে টাংবগু করে ফুটেছে। পারো
তো, ঘরে এবারে শক্ত করে বাঁধতে চেষ্টা
করো।'

মুখ টিপে হেসে শ্যামলী বললো:
'আমার কথা কি ও শোনে যে, বাঁধবো!'
তারপর সে তার স্বামীর অনুগমন করলো।

এরপর মাঝে মাঝে নিজের কাজের ফাঁকে
ফাঁকে লক্ষ্য করে দেখেছি—ছেলেটির জীবনে
যেন সত্যিই এতদিনে যৌবনের জোয়ার
এসেছে। কুল থেকে কুলে গিয়ে আহুত
পড়ছে সেই জোয়ার। নিজে পঢ়িকা চালাবার
ফলে আর দশ-বিশখানি পত্র-পত্রিকার তার
লেখার চাহিদা হয়েছে, রেডিওতেও ডাক
পড়েছে আরও দু'-একবার, তাছাড়া
ভিন্ন ব্লককে আবৃত্তি করে বন্ধু-মহলে এরই
মধ্যে অসামান্য হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো
সত্যীর্থ বন্ধু ঈর্ষাকাতর হয়ে তার সঙ্গও
ত্যাগ করেছে। শিল্পী বড উন্নতির শীর্ষে
ওঠে, ততই নিঃসঙ্গ হয়—এই প্রবাদটি

যেন ছেলেটির জীবনে বড় বেশি মত
হয়ে উঠলো। তবে এই মুখ ও মূর্ত্ত
দোদুল্যমান জীবনে শ্যামলীর মতো
স্বাী পাশে আছে, এইটাই বড় সান্ত্বনা।
মনে মনে এমনি একটা কল্পনাই আমি
করেছিলাম আর আনন্দ পাচ্ছিলাম ছেলেটির
কর্মোদ্যমে।

কিন্তু দীর্ঘকাল বাদে হঠাৎ তার
একটা টেলিফোন পেয়ে চমকে উঠলাম।
বললো: 'আপনার সঙ্গে বহুকাল যোগাযোগ
নেই, তাই হয়তো জানেন না—আমার জীবনে
ইতিহাস কোথাও স্থির হয়ে বসে নেই।
আমাদের সংসারে শ্যামলীর চাকরীটাই শেষ
পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়ালো; কিন্তু তার
আগেই সে মাতৃষ পেয়েছে, থোকনের
বরসও প্রায় মাস ছয়েক হলো। কিন্তু
শ্যামলী আর আমার সঙ্গে নেই। মার
সঙ্গে প্রথম বনিবনা হলো না, তারপর
ডাই-বোল্ডের সঙ্গে। আমাকে বললো:
চলো, আমরা আলাদা কোথাও বাসা বাঁধি—
আমি বললাম: 'মা আর এতগুলো ভাই-
বোনকে ফেলে আমি আমার একার স্বার্থে
তোমাকে নিয়ে গিয়ে কোথাও থাকতে
পারবো না।—শুনে প্রথমটা কথা বসে, তা-
পর সে তার এক বাস্তবীর বোর্ডিংয়ে গিয়ে
উঠেছে।'

বললাম: 'বৌমাকে দেখে এমনটা তো
মনে করা যায় নি। তা—থোকনকে নিয়ে
সে বোর্ডিংয়ে কি করে কাটাবে?'

কোনোই ছেলেটি বললো: 'থোকনকে
আমি দিই নি। শ্যামলী একাই গেছে,
এ-বাড়িতে সে আর আসবে না।'

—কলো কি? বললাম: 'নিশ্চয়ই
এর মধ্যে কিছু ভুল বোকাবুদ্ধি আছে,
দু' দিন বাদে সেটুকু থাকবে না।'

ছেলেটি বললো: 'আপনি শ্যামলীকে
যেমন ভালো করে জানেন না, তেমনি
আমাদেরও বংশের রক্ত চেনে না।'

এবারে কি জবাব দেবো, সহসা খুঁজে
পেলাম না। কিছুটা ইতস্তত করে বললাম:
'তা—এসব কথা দু' থেকে ফোনে না বলে
একদিন চলে এস না, ভালো কবে সব
শুনবো।'

ছেলেটি বললো: 'এর বাইরে আব
শোনার কিছু নেই, ভেবেছিলাম—আপনাকে
জানাবো না, কিন্তু না জানিয়েও কেমন যেন
স্বস্তি পাচ্ছিলাম না, তাই ফোনে থেকে
বললাম। তা—ঠিক আছে, যাবো একদিন;
ভালো আছেন নিশ্চয়ই?'

বলতে যাচ্ছিলাম: 'আছি কোনো রকম,'
কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই অনুভব করলাম—
ছেলেটি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো।
নামিয়ে যে রাখবে, তা অনুমান করে
ছিলাম; কারণ, এইটাই তার স্বভাব।
নিজের ব্যক্তব্য যেখানে তার শেষ, সেখানে
আর কাউকে নতুন করে কিছু বলার সুযোগ
নিতে সে নারাজ। এ রকম সব চরিত্র

কিছু দিনের পর দিন ভাষা যায়, কিছু বা প্রহসনও আঁকা যায়, কিন্তু প্রয়োজনবোধে কত রকম খাতিয়ে করা যায় না কিছুই।

আমার পক্ষেও তাই হলো। আমার সম্পর্কে আসা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ছেলোট সম্পর্কে নানাভাবে ভাবতে গিয়ে মনটা কিছুটা আনন্দে, কিছু বিস্ময়ে, আবার কিছুবা দুরখে ভরে উঠলো, কিন্তু তার পারিবারিক জীবনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু করা সম্ভব হয়ে উঠলো না।...

এরপর প্রায় মাস ছয়কে কেটে গেল। এই ছ' মাসের মধ্যে সেও যেমন কোনো ধরনের নি, আমারও তেমন শারীরিক অসুস্থতায় ও নানা কাজের চাপে মনটা নানাদিকে ছড়িয়েছিল। তাছাড়া সামনে পুজো, পুজো সংখ্যার লেখার চাপও মাঝারি কম ছিল না।

সেদিন সকালে চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাগজ-কলম টেনে লিখতে বসেছি। হঠাৎ বাইরে থেকে দরজার কড়াটা দশম্বে বেজে উঠলো। ভাবলাম—হয়তো কাগজের ডরকেরই কেউ হবে। ডরকর গতিকার ডরক থেকে কিছু টাকা আগ্রহ দিয়ে যাবার কথা আছে; এলে মন্দ হয় না। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাই দরজা খুলে দিলাম। কিন্তু—হাঁ, হতোষি! ডরকর গতিকার পরিকল্পিত প্রভাতী ডরকের মূর নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মূর্তিমান কান-কুসুম। বললো: 'মনে হচ্ছে—আমাকে মেখে কেন কিছু অবাক হয়ে গেছেন!'

ভিতরে এসে পুনরায় বসতে বসতে বললাম: 'না—মানে—এক ভুললাকের আসার কথা ছিল, দেখলাম—তিনি নন, তুমি!'

ছেলেটিও অবলীলাক্রমে আমার সামনে এসে বসে পড়লো, বললো: 'আমিও এমন খুব ছোট লোক নই, তবে ক্রমেই হয়ে যাচ্ছি।'

প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে এবারে ছেলোটের মুখের দিকে তাকালাম।—'তাই নাকি?'

ছেলেটির কোনো বিধা নেই। বললো: 'জীবনটা কোথা দিয়ে যে কি করে কাটছে, নিজেই বুঝতে পারছি না। বোকনের জন্ম ঘরে ফিরতে হয়, নইলে কল্ম-বান্ধবের সঙ্গে এখানে-ওখানে কফির টেবলে কিম্বা মদের আড্ডার সময় কাটাতে ঘুম লাগে না।'

বললাম: 'মাইকেল হতে চাচ্ছে?'

—'চেষ্টা আছে, জানি না হতে পারবে কি না।' ছেলোট বললো: 'তবে ভয় আছে, শেষ পর্যন্ত কারমাইকেলে যেত নিতে না হয়!'

—'কেন, মাতা রাখতে পারছো না?'

এবারে কিছু একটা না বলে ছেলোট হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই আমার মুখের দিকে বড় বড়

চোখ করে তাকিয়ে বললো: 'করে বসে শব্দ কম্পনার আশ্রয়ে গল্প লেখেন, মাফের তো দেখেন না, দু'পা বাড়িয়ে লোকালয়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানও না। বিচিত্র লেখক আপনারা। কোনো ঘটনা থেকে লক্ষ হাত দুরে থেকে আপনরাই আবার বলেন—Facts are stranger than fictions. আপনাদের জীবনে তাই Facts নেই, fictions নেই।'

হাতের কলম বন্ধ করে রেখে এবারে স্থির হয়ে বললাম। ছেলোটের কথাগুলোকে ঠাণ্ডাভাবে বললে মনে হলেও ওর মার্সিক অবস্থার কথা ভেবে আমি ওর কথার কোনো প্রতিবাদ করলাম না। যে মহাত্মা ওর উপস্থিতি লক্ষ্য করছে, সেই মহাত্মাই বুকে নিয়ন্ত্রণ—কিন্তু বস্তুর নিয়ে এসেছে, কথা শেষ হলে নিজে থেকেই আবার উঠে যাবে। তাই বললাম: 'আর কি বলবার আরছ, বলো।'

যদি লিখতে পারেন তো আপনাকে গল্পের উপাদান দিই।' বলে নিজে থেকেই আবার বলতে শুরু করলো ছেলোট। 'আমার বর্তমান মানসিক অবস্থাটা আঁচ করা হয়তো আপনার পক্ষে এমন কিছু শক্ত নয়, তাই কিছু বলার অবকাশ আছে। আমার সমস্যা কথ্যদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে তাদের এক বাঁধা মেয়েমানুষের মূর গিয়ে সন্ধ্যায় আড্ডা জমায়। অজানা অবস্থায় আমিও একদিন গিয়ে বসেছিলাম তাদের সঙ্গে। খুব যে খারাপ লাগলো আমার, তা নয়। বন্ধুরা যতক্ষণ হাসি-তামাসা করছিল, আমি একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলাম মেয়েটিকে। সুপে দ্ব্যস্তা মিলিয়ে মোটামুটি সুন্দর না। মুখখানি হাসি-হাসি। ভাবছিলাম—আমাদের সমাজের কথা। এমন মেয়েকেও পতিভাবিত্তিতে আসতে হয়! কথুরা পরিচয় করিয়ে দিতেই আমাকে সে কোন একটুকালের মধ্যে অনেককালের আপন করে নিল। এমনি করেই হয়তো সবাইকে ওদের আপন করে দিতে হয়, নইলে ওরা নিজেরাই ঠকে। বড়ভালো লাগলো আমার। জিজ্ঞেস করলাম: 'নাম কি?—নলদে? সুহাসিনী? ওর হাসির সঙ্গ ওর নামের অশুভ একটা মিল খুঁজে পেলাম। কিন্তু আর নয়, সেদিনের মতো এখানেই ইতি।'

বলে একটুকাল দম নিল ছেলোট।

জিজ্ঞেস করলাম: 'তারপর?'

—'তারপর?'' ছেলোট বললো:

'তারপর নিজেই একদিন গিয়ে উঠলাম তার ঘরে। আমাকে সেদিন সো স্বস্ত করে খাবারের সোফার থেকে খাবার আনিয়ে খাওয়ালো। বললো: 'তোমাকে সেদিন দেখেই কেন যেন মনে হয়েছিল—তুমি আর পাঁচ জনের মতো নও, তুমি একেবারে, স্বজন্ম। আচ্ছ মনে হচ্ছে—তোমার মতো ভালো বড়ির আর কেউ নয়। তোমাকে কখন

বলে ভাবতে ভালো লাগে। বলে আবার একটুকাল থামলো ছেলোট, তারপর বললো: 'আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, সুহাসিনীর কথা শুনে আমার চোখে হঠাৎ কেন যেন জল এসে গিয়েছিল। সেই জল লক্ষ্য করলাম সুহাসিনীর চোখেও। ওর একখানি হাত আমার হাতের মতোয় টেপে নিয়ে বললাম: 'তোমাকে যদি কোনদিন এখান থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারি, সেইটেই হবে সত্যিকারের বন্ধুর কাজ। শুনে অশ্রুস্রব্দ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সুহাসিনী বললো: 'নেবে, নিতে পারবে আমাকে?—বললাম: 'যদি না পারি, তবে আর তোমার এখানে আসবো না।—সুহাসিনী বললো: 'তা কেন, এরপর তোমাকে না দেখতে পেলে আমিই হয়তো পাগল হয়ে যাবো।'

বলে আর একবার এক অশ্রুত শব্দে হো-হো করে হেসে উঠলো ছেলোট, বললো: 'আপনি বিশ্বাস করেন, মেয়েরা কখনও পাগল হতে পারে?'

জানতাম—যে জবাবই দিই, তা নিয়ে চর্ক করবে ছেলোট; তাই শব্দ বললাম: 'সেই বাই হোক, তারপর কি হলো বলো?'

—'তারপর বা হলো, তার জন্যে আমি নিজেও প্রস্তুত ছিলাম না।' পুনরায় বলতে শুরু করলো ছেলোট: 'সেদিন বোধকরি আমি খুব প্রকৃতিস্থ ছিলাম না; এই অবস্থায় গিয়ে হঠাৎ উঠলাম সুহাসিনীর ঘরে। ইচ্ছে হলো—সুহাসিনীকে নিয়ে খানিকটা উল্লাস হই। বললাম: 'এক বন্ধু কাছে এসে আশো আঁচরে বস। তাকিয়ে দেখলাম—সুহাসিনীর চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে। বললাম: 'কি গো; পড়িয়ে মারবে নাকি; তা—আমি তো পড়তেই এলাম।—শুনে সুহাসিনী মনে হলো কানে আচ্ছল দিল। বললো: 'শেষ পর্যন্ত তুমিও চরিত হারালে, হিঃ, যাও, চলে যাও এখান থেকে, আর কোনোদিন এখানে এসো না।—তার কথার পর কথা বলবো, এমন সাহস হলো না, শব্দ নিঃশব্দে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পথে আসতে আসতে মনে হলো শব্দ সুহাসিনীর কাছে নয়, আমার নিজের কাছেই আমি আজ কত ছোট হয়ে গেছি।'

বলে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ছেলোট।

ভাবলাম—সেই সুহাসিনীর মতো আমিও ওকে বলি: 'কাল থেকে তুমি আর এখানে এসো না,' কিন্তু মুখে এসেও আলা! ভিতের নিচে কথাটা হারিয়ে গেল। ফুলবো কেমন করে যে, ও কবি, ও শিল্পী, ওর আসা-যাওয়া তো কোনো ভৌগোলিক

দেবতা

মায়া
দেবী



বিয়ের আগে থেকেই বাসনা চকরী করতো। বাবার সন্সারটা সেই চালাতো। বিয়ের আগে সুমন্তও চাকরী করতো—কিন্তু বিয়ের পর আর চাকরী করে না। চাকরী করতে তাব ভালো লাগে না এখন। সন্সার চালায় বাসনাই। আজকালকার দিনে একা চাকরী করে একটি ছেলে নিয়ে চারদিক দামলাসে খুবই শক্ত। বাজারে জিনিসের দাম দিন দিন তো বেড়েই চলেছে। খাম-খেরালী সুমন্তের সোঁদকে হুঁস নেই। তার ওপর আজ তিন মাস হলো বাসনারও চাকরী গেছে। এখন কী যে হবে কে জানে। আর মাঝে মাঝে তাকে সুমন্তকে বিরক্ত করতে হয়। বাজার করা, রেশন আনা, খোকার দুধ এ সব জোগাড় করতে হাতে যা কিছু তার ক্ষমোছিল তা সবই খরচ হয়ে গেছে।

সুমন্তকে তার কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। চকরী-চাকরী করবে না, ঘরে বসে থাকবে আর খোস গল্প করার সময় কাটাতে সে আবার কেমন পছন্দ। শেষে নিজের ইচ্ছেই কিছুমুখই বাসনাকে বলতে হয় : একটা চাকরীর চেষ্টা দেখ না? বসে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আর কতদিন কাটাতে।

সোজা উত্তর দেয় সুমন্ত—চকরী করা মানেই দাসত্ব। দাসত্ব করতে ভালো লাগে না। পরের চাকরী সে করবে না যদি কিছু টাকা জোগাড় করে স্নেহ বাসনা তাহলে সে ঘরসা করতে পারে। আগুনের মত জ্বলে ওঠে বাসনা : আমার টাকা কোথায়? এ তিন মাস ধরে যা জমা ছিল সে-টি টাকা সবই খরচ হয়ে গেছে। তাছাড়া বিয়ের পর থেকেই তো দেখছি তুমি ঘুমেই বেড়াও। চাকরী-চাকরীর কোন খোঁজই কর না। এইভাবে কি চলে?

: না চলে চালাও না। তাই বলে আমি দরজার দরজার চাকরী চাকরী করে ঘুরতে পারবো না বলে দিলাম।

: দিন-রাত তো বন্ধুর হোটেল বসে থাকছো আর ভাল-মন্দ গিলছো, এদিকে যে বাড়িতে হাড়ি ছেড়ে না তার খবর রাখো? একটি ছেলে, সে একটু দুধ পায় না সেটুকু ভাবো কোন্‌দিন?

পদ্ম হোটেল কাম বার মেন্সতা সুমন্তের কাছে তখন বং, আলোর ঝিলিক। এ সব ব্যাঙে কথা তাব শুনতে একটুও ভালো লাগে না। এরা কি? মেয়েরা কি টাকা ছাড়া আর কিছু জানে না। চিক্কার করে সুমন্তের বলতে ইচ্ছে করে জীবনটা তার কাছে রোমান্স—টাকা পয়সা চাকরী ওর একটুও পছন্দ নয়। সুমন্তকে চাপ করে থাকতে দেখে বাসনা বললো : চাপ করে রইলে যে।

: ভাবছিলাম তোমাকে আগে অন্যরকম ভাবে চিন্তাম বহলজ জীবনে। এখন তুমি টাকা ছাড়া দেখছি কিছুই চেন না।

মুখে এসেছিল বাসনার : হ্যাঁ চিন্তাম সবই, তোমার সঙ্গে বিয়ের আগে যখন তোমার সঙ্গে এক কলেজে পড়তাম। তখন বাইরে থেকেই দেখেছিলাম তোমাকে, আজ যা দেখছি তাবপর আর কিছু দেখবার বা চেনবার প্রবৃত্তি নেই। যত বেশী চিনতে চেষ্টা করবো তত্ত্ব ততই বাড়বে বৈ কমবে না।

সুমন্তের ঠোঁটের কোণে বাকা হাসি খেললো গেল : মেয়েরা যতদিন বিয়ে না করে বেশ রোমান্টিক থাকে। যেই বিয়ে করে ঘরের গিন্নী হয়ে এলো—তৎক্ষণাৎ রসকথ বর্জিত গিন্নীপনাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো মেয়ে-দের। একবার দুটো ভুরু কুচকে এসেছিল বাসনার, কিন্তু নিজেই সংযত করে গলার কথাগুলো মধু চলেই তাকে বলতে হলো : দেখো, আমার জন্য ভাবি না, খোকার জন্যেই তোমার কাছে এসব টাকা-পয়সার কথা বলতে

বাধ্য হই। যতদিন আমাব চাকরী ছিল 'তউ-দিন খোকার জন্যে টাকার কথা তোমার কাছে বলি নি কিন্তু এখন আমি কী করি বলো তো! সৌভাগ্যে ব্যাঙ্কের টাকা কটাও তো— : সব সময় টাকা আব টাকা। এই জন্যে আমার আজকাল বাড়ি আসতে ইচ্ছে করে না। বন্ধুর দোকানে বিনামূল্যে খাওয়া কাটলেটের একটা ঢেঁকুব সম্বরণ কথ্য সুমন্ত বললো : হোটেলের যে মেয়েটি সবায় দেখাশুনো করে সে মেয়েটি বড় ভালো। আমায় জোব কবে তিন খানা কাটলেট খাইয়ে দিলো—

মেয়ের ওপর খোকা বসে খেলছিল। কাটলেটের কথা কানে যেতেই বলে উঠলো : আমি কাটলেট খাবো বাবা—

বাসনা জ্ঞানলাগে দিকে মূখ ফির্সিয়ে নিজেই সামলে নিলো, তারপর খোকাই কোদল তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কড়ের মত।

একটা আশ-ময়লা বাতিল টেনে নিয়ে

সেটা মাথায় দিয়ে শূতে শূতে সুমন্ত
বললে : ময়লা বিছানাপত্র—শূতেই ঘেমা
করে—হ্যা—

শূত আজই এমনটি হলো না, এ ওদের
ঝাড়ুর প্রতিদিনের দৃশ্য। বাসনা একা
জারিয়ার সপে লড়ে বিচিতে চাইছে আর
সুমন্ত যেন তার অদৃশ্য হাতে পায়ের তলায়
খাব কেটে ওকে টেনে নামাতে চাইছে অভলে।
খোকা যদি না থাকতো তাহলে ও কবে
এ-সব ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতো।
কিন্তু খোকার মৃশের দিকে তাকিয়ে বাসনা
অহরহ নিজের মনের মধ্যে গুমরে মরে।
বাবার পক্ষে যা সম্ভব মার পক্ষে তা একান্তই
অসম্ভব। সুমন্ত তার কথা না ভাবতে পারে
কিন্তু সে কি করে ফুলে থাকবে? বাসনা
জ্ঞানে বেশি ঝগড়া-ঝাটি করলে
সুমন্ত কন্দু বিজয়ের হোটলেই
ঘাতে থেকে যাবে, বাড়ি আর
আসবে না। আর বিজয়ের হোটেল মানেই—
অমেক কিছ। কন্দুর অনুগ্রহে সেখানে
কিছুই অভাব হবে না। চাকরী না করে
করে—করে বসে থেকে থেকে আর পরের পর-
সায় খেয়ে পবর্তিত সুমন্ত কাজ করতে ভয়
পায়। কোকিলের মত ডিম পাড়বে পরের
বাসার, সন্তান মানুষ করবার দায়িত্ব নিতে
তার ভালো সাপে না। কেবল হাসি আন্দ, গান
বাজনা-কঙ্গ এই সবই তার পছন্দ—
কাজের কথা শুনলে তার মাথা মাঝ পড়ে যেন।

সকালে উঠেই নিজের আলাদা করা
আলমারী থেকে একটা গম্ব তেল বেত্র করে
মাথায় সযত্নে মাখতে মাখতে গান ধরলো
সুমন্ত : ওঘাটে জল আনতে যাব না যাব
না—ও ললিতে—ঘরের মধ্যে কড়ের মত
চুকলো বাসনা। সুমন্ত নানা ভাবে মৃখ
ভাঙে করছে আর গান গাইছে।

একবার সে দিকে তাকিয়ে বাসনার মৃখ-
খানা ঘাগে লাল হয়ে গেল। কঠাব ন্বরে
সুমন্তকে উদ্দেশ্য করে বললো : আমার
বন্দু মীরা তিন মাসের জন্য মেটখনিটি
লিভে বাছে ওই কাজটা আমার এই সময়ের
জনা দিয়ে যাবে। পরে পোল্টটা পাকা হতে
পারে। আমাকে কাল দশটার মধ্যে বেরিয়ে
যেতে হবে। তুমি কাল সকালে আমি না
আসা পর্যন্ত বাড়ী থাকতে পারবে? নইলে
খোকা—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে সুমন্ত
বললে, কাল আমার সাতটার বেরতে হবে—
বেলারানী, সেই ওয়েট্রেস খুব অনুগ্রহ কবে
আমার যেতে কলেছে—ও আমার জন্যে
অপেক্ষা করে থাকবে। ওর যেন কী কাজ
আছে। মাথার মধ্যে বেন দপ করে আগুন
করে উঠলো বাসনার কিন্তু সুমন্ত বসন্তের
কোকিল, সে শীত-গ্রীষ্মের কেউ নয়—অনু-
গ্রাহে কাঁপতে লাগলো বাসনা—কি যে উত্তব
জবে বুকতে পারলো না সে।

হঠাৎ সে হু-হু করে কেঁদে উঠলো।

সকালবেলা উঠেই বাসনা কোনো-
মতে দুটি রেখে খোকাকে খাইয়ে দিলো।
তাকে আজ তাড়াতাড়িই বেরতে হবে।
গ্রাম-বাসের যে অবস্থা তাতে অস্তত খানিকটা
সময় হাতে না রেখে গেলে ঠিক সময়ে
পৌছনোই যাবে না। সুমন্ত অনেক
সকালেই বেরিয়ে গেছে—তা না খেয়েই।
হয়তো ভেবেছে বেশি দেরি করলে -তাকে
খোকার পাহারায় বাসনা রেখে যাবে।
কাজেই পাশের ঘরের মানীমায় জিম্মার
খোকাকে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাসনা।

ইন্টারভিউ দিয়ে নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে
বেরতে বেরতে পাটটা। শীতের বেলা।
এখনই বেন অম্বকার নেমে এসেছে পথে।
দোকানে দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে।
মেঘলা দিন বলে অম্বকারটা বেন আরো
বেশি লাগছে। ইন্টারভিউ তার অনেক-
ক্ষণ আগেই হয়ে গেছে মীরাই তাকে এতো-
ক্ষণ আটকে রেখেছিল। শ্মির হাওয়ার
দুলতে দুলতে নেমে এলো বাসনা। মীরা
টোমে উঠলো। বাসনাকে আর একটা এগিরে
বাস ধরতে হবে। বাস আসতে ভারি দেরি
করছে আজ। হঠাৎ সামনে এসে একটা
মেরুন রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে দেখো : বাসনা
তুমি?

: মৃময়?—চমকে উঠলো বাসনা।
এখানে দাঁড়িয়ে যে—এসো বলে প্রায়
জোর করেই ওকে গাড়িতে ফুলে নিলো।
তোমার সপে দেখা সেই কলেজ ছাড়বার
পর—এই প্রথম। কেমন আজ—?

: ভালো—বাসনা সখস্বপ্ন উত্তর দিলো।
: তুমি?—বাসনা পাট্টা প্রশ্ন করলো।
: খুব ভালো।—শেষের কথাগুলো একটা
বেশি জোর দিয়েই বললো মৃময়।

: খুব ভালো তো বোধ হচ্ছে না। বাসনা
মৃময়ের আপাদমস্তক একবার খুব ভালো
করে দেখে নিলো।

: মাস কয়েক ভুগে সম্প্রতি হাসপাতাল
থেকে ছাড়া পেরেছি। একটা প্র্যাকটিসডেন্ট
হয়েছিল। সে কথা থাক, তুমি কোথায় গিয়ে-
ছিলে?

: একটা চাকরীর চেষ্টায়। আমার বন্দুর
সপে তাদের ফুলে গিয়েছিল। কাজ হয়েছে
আমার।—আমার বাড়ি যেতে হবে তুমি বরং
ট্রাম স্টপ পর্যন্ত আমার পেঁাছে নাও।

: ভারি পর হয়ে গিয়েছি আজ আমি।
কিন্তু একদিন আমি ছাড়া তোমার আর
কেউ আপন ছিল না।—মনে পড়ে?

: পড়ে।—স্মান হয়ে গেল বেন বাসনা।—
খানিকটা চুপ কবে থেকে সে আবার জিজ্ঞেস
করলো।

: বিয়ে করছে তো নিশ্চয়ই—।—মৃময়ের
মৃশের দিকে তাকালো বাসনা।

: কথা ছিল তোমাকে ছাড়া আমি আর
কাউকে বিয়ে করবো না। তাই তোমার পেলাম।
না বলে বিয়েও করা হলো না। থাক সে
সে সব বাজে কথা। বাসনা, তোমার সপে

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, স্বপ্ন খিদেও পেয়েছে।
চল একসঙ্গে কিছু খেয়ে নিই। তাছাড়া
তোমার চাকরী পাওয়াব অনারেও তো আজ
তোমাকে আমার খাওয়ানো দরকার। আমি
আজ তোমায় না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বো
না। চলো একটা বেস্কারায় গিয়ে বসা থাক,
আগের দিনেব মত।

গাড়ি মৃময় নিজেই চালাচ্ছিল। ছুটে
চলেছে গাড়ি। বাসনা বেন নিজীব হয়ে বসে
আছে। নিজের মধ্যে যেন সে ভাসিয়ে গেছে
একেবারে। কলেজ জীবনে সুন্দর দিনগুলোর
বধাই সে ভাবছে। খোকাব কথাও ভুল গেছে
এই মুহুর্তে। মৃময় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো
: তোমার কথা তো কিছুই শুনলাম না।
তোমার স্বামী কী করেন?

: বিজ্ঞানসন্মান—কী গলায় বাসনা
উত্তর দিলো।

: ও তা বেশ। ছেলেপুলে কীটি?
: একটি—।

গাড়িটা একটা রেস্কারার সামনে এসে
দাঁড়ালো।

: আমার ছেড়ে দাও মৃময় আজ—।
আর একদিন হবে।

: তা হতে পারে না বাসনা। আজ আমি
তোমাকে খওয়াবই; জোর করে হাত ধরে
টেনে ভেতরে নিয়ে গেল তাকে।

ওরা দু'জনে যখন ভেতরে ঢুকলো তখন
রেস্কারা একবারেই জমজমাট। কোথাও
একটা বসবার জায়গা নেই। কাজেই ওদের
বাইরেই বসতে হলো অগত্যা।

সামনের টেবিলে যে লোকটা বসেছিল
সে তার সহচরীর সপে সমানেই বেলেপালা
করে চলেছে।

হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়তেই বাসনা
বেন যেম উঠলো : আমার শরীরটা বন্ধ
থারাপ লাগছে মৃময়, আমি বাড়ি যাব—
: এর মধ্যে কি হলো তোমার। এই তো
বেশ ছিলে এতক্ষণ। এখন কি হলো।

বলতে বলতেই ছুটে বেরিয়ে যেতে
গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ালো সুমন্ত :
একটা কথার উত্তর দিয়ে যাও, চাকরীর
নামে কি তুমি এসব করে বেড়াও।

অসাড় শবীবটার ভর দেওয়ালের ওপর
এলিয়ে দিয়ে বাসনা পাট্টা প্রশ্ন করলো
ক্লান্ত গলায় : তোমার কাছে আমি কোন
কৈফিয়ৎ দেব না।

এতক্ষণ মৃময় বেন নাটক দেখাচ্ছিল
হঠাৎ তার সম্ভবত ফিরে এলে ছুটে গিয়ে
সে সুমন্তের গলার কলার টেনে ধরলো।

: স্ট্রিপড! মহিলার সম্মান রেখে কথা
বল।—তোমার এ সব কথা জিজ্ঞেস করবার
কী অধিকার আছে? প্রচণ্ড ঝাঁক খেয়ে
খানিকটা খতমত খেয়ে সুমন্ত বললো
: অধিকার? কি অধিকার আছে ওকে
জিজ্ঞেস কর।

: বাসনা—ব্যাপার কী! ও তোমার কে?
সংজ্ঞা হান্নাবার আগে ওর গলায় ক্লান্ত
আওয়াজ শোনা গেল : আমার স্বামী।

দূর নায়িকা



রুদ্ধপ্রসাদ কবিতা

আইকে কিস্করদলের নাম ঘোষণার কিছু পরে ওয়া স্টেজে এসে দাঁড়াল। একটি পুরুষ অকল্পন নারী। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কি এক যাদুঘরে যেন সমস্ত পরিবেশটাই বদলে গেল। আধুনিক গান আর যন্ত্রসঙ্গীতের কুপায় এতক্ষণ ধরে যে হালকা মেজাজের সৃষ্টি হয়েছিল দর্শকদের মধ্যে তার পরিবর্তে একটি ভারী আর ধমকমের আবহাওয়ার অভ্যুত্থান ঘটে গেল।

এই ধমকমের আবহাওয়া দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, এই নারী আর পুরুষ শিল্পীটি এখানকার প্রবাসী বাঙালীদের পূর্ব-পরিচিত। আমার প্রবাসী আত্মীয়া পাশেই বসেছিলেন। তিনি এখানকার মহিলা

সামান্য সেক্রেটারী। তাই মধ্যে মধ্যে গুঁকে আসন ছেড়ে উঠতে হচ্ছে, মধ্যে পরিমিত মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বলতে হচ্ছে—আসুন মিসেস ভার্গব, মেয়েরা সর কোথায়? না না কিস্করদলের অনুষ্ঠানে বালা বোকার দরকার করে না। ইট ইক্স এ সিম্পল মেলডি ওপন টু, অল, ওদের আনলেই পারতেন। আরে সুখাদি যে কখন এলেন, কমা করবেন তাই দেখতে পাই নি, না না ওখানে কেন সামনে গিয়ে বসুন।

মাঝে মাঝেই এই ধরনের নানান কথা কানে আসছিল। তার মধ্যেই চলেছে স্থানীয় শিল্পীদের গাওয়া বাংলা ফিল্মের গান কিংবা সেই সব গানই সিটায়ো বাজিয়ে

তোলার চেষ্টা। এককথায় আমাদের দেশে পাড়ায় পাড়ায় পুজো বা রবীন্দ্র-জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে বালক-বাধিকাদের মধ্যে যেমন কিণ্ডিং সংস্কৃতি চর্চা হয়ে থাকে এও তাই।

অথচ এখানে আসার আগে আমার প্রবাসী আত্মীয়া বলেছিলেন, ইট ইক্স এ গ্লানডার; দেখো তোমার ভাল লাগবে।

প্রশ্ন করি সেটা কি জিনিস?

মহিলাটি মুখে গ্লানডার হাসি ফুটিয়ে বলেছিলেন, সময় হলেই জানতে পারবে।

তাবপর কিস্করদলের নাম ঘোষণা হতেই ওয়া এল। একজন পুরুষ অনাজন নারী। আর সঙ্গে সঙ্গে অভ্যুত্থানের হালকা বাতাস ভাবী হয়ে প্রথমত করতে লাগল।

ওদের দেখে হঠাৎ আমার মধ্যে এমন কোণ ভাবনতর ঘটে থাকবে যা লক্ষ্য কবে আত্মীয়া প্রশ্ন করলেন, কি হ'ল, তুমি মেয়েটাকে চেন নাকি? অবশ্য চিনলেও চিনতে পার, ভোম্মাদেব কলকাতারই মেয়ে। শোনা যায় বিষে-সাদিও করি সব ছেড়ে

মিসেস চ্যাটার্জী, ইউ আর টু লেট।
চলুন চলুন সামনে চলুন। এই মেসেজ,
তোমরা কি করছ। দেখতে পাছ না মিসেস
চ্যাটার্জী কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন।

এবার ভাল করে স্টেজের দিকে তাকাব
সুযোগ পাওয়া গেল। মহিলাটিকে কেবল
সুন্দরী বললে ভুল হবে, বলা উচিত
অসামান্য সুন্দরী। ওর বাকী ছদ্ম জোড়ার
নীচে টানা চোখ, সে চোখের দৃষ্টি শাণিত
অশ্রুর মত। শরৎকে রোদে চক্ৰমক্ করছে,
যেন রাজপুত্র বীরের তলোয়ার। আর সেই
বাকী তলোয়ারের মত দৃষ্টিটা মাত্র কয়েক
হাত তফাতে বসে আমার চোখ দুটোর
উপর এসে কিছুকাল আটকে থাকল।

এর পর দীর্ঘ সুন্দর চোয়ারার একটি
মানবকে স্টেজে দেখা গেল, তিনিই নাকি
কিন্নরদলের ম্যানেজার। অনুষ্ঠানের ভূমিকা-
স্বরূপ স্বল্প ভাষণের ফাঁকে বাংলার বাইরে
বাংলা লোকসাহিত্য প্রচারে কিন্নরদের
অবদানের কথা বলে তিনি দর্শকদের অভি-
মনন্দন জানিয়ে গেলেন। বিদায় নেবার আগে
সহসা হার্মোনিয়ামওয়ালা সেই পুরুষ
শিল্পীটির দিকে চোখ পড়ে ম্যানেজারের।
লোকটা এতক্ষণ প্রায় অভিনেতার মতো
করেই দাঁড়িঁয়েছিল। ম্যানেজারের নির্দেশে
লোকটা এবার পূর্বোক্ত অভিনেতার মতো
ফেস করে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা
অস্বাভাবিক আচরণ করে আমাকে চমকে
উঠতে হল। কোন দুর্ভাগ্যবান পুড়ে যাওয়া
একটা বিভৎস মুখ। অমন সুন্দরীর পাশে
এ মুখ দেখাখ জন্ম মোটেই প্রস্তুত ছিলাম
না।

ঠিক তখনই আমার কানের কাছে মুখ
এনে প্রবাসী আত্মীয়া বললেন, চমকে উঠলে
তো? প্রথম দেখে আমিও চমকে উঠেছিলাম,
একে বিভৎস মুখ তার ওপর সম্পূর্ণ অন্ধ।

আরও স্টান্ট দেবার ভাগ্যতে মহিলা
বললেন, কিন্তু জান, এনসব সত্ত্বেও এ হার্মো-
নিয়াম বাজিয়েটাই হিবে। ওরই আকর্ষণে
মোটেটা নাকি ঘর ছেড়ে কিন্নরদলে এসেছে।
কেউ-কেউ অবশ্য ম্যানেজারের কথা বলে
থাকে। কিন্তু আমি হলফ কবেই বলতে
পারি ম্যানেজার সাইফার। কাউকে সত্যি বদি
ভালবাসে মেয়েটা তাহলে ঐ মুখপোড়া
অন্ধ লোকটাকে। জোর গুরুত্ব শুনতে পাই
ওদের নাকি বিয়েও হবে কিন্তু ম্যানেজারও
তাখ দাবী ছাড়তে রাজি নয় বলেই আটকে
আছে বিয়েটা।

ওদিকে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে যায়।
বাংলা দেশের অতিপরিচিত লোকসঙ্গীত।
ময়মনসিংহ গীতিকার নির্বাচিত অংশ।
কিছু কথা কিছুটা গানের মধ্যে দিয়ে

মরার উপদেশের উত্তরে নদের চাঁদ গানেই
ছাত্র উত্তর দিচ্ছে—

কোথায় পাইবাম কলসী কন্যা

কোথায় পাইবাম দাঁড়

তুমি হও গহিন গাঙ

আমি ডুইয়া মরি।

গান এমন কিছু আহামরি নয়, কিন্তু
হার্মোনিয়াম বাজনা শুনে চমকে উঠতে হয়।
যন্ত্রটাই যেন গান কবছে। 'তুমি হও গহিন
গাঙ আমি ডুইয়া মরি'। একবার গেয়েই
শেষ করল লোকটা। কিন্তু তারপর বেশ
কিছুক্ষণ ধরে ঘুবিয়ে-ফিরিয়ে গানের,
কলিটা বাজিয়ে গেল। দক্ষ শিল্পীর আঙুলের
ছোঁয়া সেগে যন্ত্রটাও মানুষ্যের কণ্ঠে গেয়ে
উঠল—তুমি হও গহিন গাঙ আমি ডুইয়া
মরি।

চমকে ওঠার মত একটা অপ্রতুত ব্যাপার।
জীবনে অনেক বড় বড় বাজিয়ে দেখেছি
কিন্তু ঠিক এমনি করে একটা সিগনল
রিভের হার্মোনিয়ামকে গান গাওয়াতে
কখনও শুনি নি।

তাকিয়ে আছি। ওষ বিভৎস পোড়া
মুখে কখন জলেব ধাবা নেমেছে, আব গলায়
ঝোলানো হার্মোনিয়ামটা নাখাভাবে নাখকা
মহুয়াধ কাহে এপিপল করে চলেছে। সমস্ত
অভিনেতার মনোমুগ্ধ। আমার চোখেব
সামনে থেকে এসব দৃশ্য ক্রমেই ফিরে হয়ে
যাচ্ছে তার পরিবর্তে স্পষ্ট হয়ে ফুটে
উঠছে দশ বছর আগেকার দেখা একটি ছবি।

সেবার আমাদের পাড়ায় প্রথম রবীন্দ্র-
জয়ন্তী। এতদিন বোসেদের বাড়িতে যে
অনুষ্ঠান হত সেটা ঠিক পাড়ার বলা চলে
না। তাই ঠিক হল পাড়ায় একটা আলাদা
ফাংসন হবে। সেই আমাদের প্রথম রবীন্দ্র-
জয়ন্তী। মনে আছে দু-চারটে মামুল গান
আবৃত্তি দিয়ে অনুষ্ঠান শব্দ হলো শেষে
জামিষে দিল মীরাদি আব বুটুদা এসে।
মীরাদি আর বুটুদার বোগাবোগাটো সেদিন
ছিল দেহাতই আকস্মিক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাড়ার স্থানীয়
শিল্পীদের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেল। কেউ
কেউ একবারের জায়গা দা বার করে স্টেজে
এসে বসল, কিন্তু তারপর? হয়তো অনু-
ষ্ঠান শেষ হয়ে গেল বলে ঘোষণাই করতে
হত, ঠিক এমন সময় কে যেন কানে কার্ণ
বলে দিল—একবার মীরাদি চ্যাটার্জীকে ধব না,
বেশ গায মেয়েটা। মীরাদি আমার দিদিব
বন্ধু, এ পাড়ায় নতুন ডাড়াটে।

ভিডেব মধ্যে প্রোভা সেজে বসেছিল
মীরাদি। ওকে গানের জন্যে ধরতেই বলল,
গাইতে পারি কিন্তু আমি যে বাজাতে পারি
না।

উত্তরে বলি, হার্মোনিয়াম বাজানোব কথা
বলছ তো তার জন্যে ভাবতে হবে না, বুটুদা
আছে। আমাদের দি প্রোট হার্মোনিষ্ট
বুটুকেবর নন্দী।

হার্মোনিয়াম বাজিয়ে এই অর্থে বুটুদা
নিজেই নিজেকে বলত হার্মোনিষ্ট। আমরাও
তাই বলতাম।

আমাদের চৌকি পাতা স্টেজে বুটুদা
মীরাদিয সঙ্গে বাজাতে বসল। প্রথমটা
ওষ দিকে ফিরেই তাকায় দি মীরাদি। অবশ্য
ফিরে তাকাব মত কিহুই ছিল না ওষ।
না পোখাক, না চেহাবা। কিন্তু ওকে ফিরে
তাকাতেই হল সেটা ওর গানের মাঝামাঝি
সময়।

এদিন আঁখি কোন ববে গো খুলে দিল স্বাধ
আজকে দিনে সুখ ওঠা সফল হ'ল কার।

মীরাদি গাইছে। গাইতে গাইতে
শ্রমেছে ঠিক যতটুকু দম নেবার
জন্মে থামা দমকার, ঠিক ততটুকু। কিন্তু
আখ পরেব লাইনটায কিছুতেই যেতে পারল
না সে। বিস্ময়ভরা চোখ দুটো কতক্ষণ
আটকে থাকে বুটুদার মুখেব ওপর।

মীরাদি প্রথমে ভেবেছিল ওষ সঙ্গে
হার্মোনিয়ামওয়ালাও বাকি গাইতে আবশ্য
করেছে। পরে ওর সে ভুল ভাঙল। শুনল,
বুটুদার হাতের যন্ত্র বারবার ঘুরে-ফিরে
সেই একটি কলিই গেয়ে চলেছে।

সত্যি বলতে কি বুটুদা ছিল আমাদের
প্রথম জীবনের বিস্ময়। আমরা তখন
আড়ালে-আবডালে বিড়ি-সিগারেট ধরেছি।
বুটুদা ছিল এই পরম সুকুমের গুরু আব
ওর দেশলাই বাজের মত একমুঠো স্বখানা
ছিল আমাদের সিগারেট খাবার আস্থা।
আমরা গেলে বুটুদা সিগারেট দিবে
আপ্যায়ন করত বিদিয়ে আমাদের শুনতে
হত ওর গান। আহামরি এমন কিছুই গাইত
না সে কিন্তু গান গাওয়াতো ওর যন্ত্রটাকে
দিবে। সে কথা বুটুদা নিজেও জানত।
তাই সময় সময় তাকে দুখ কয়ে বলতে
শুনোছি, আমার চেয়ে যন্ত্রটাই ভাল গায়
মাইরি গাইবে না, কার যন্ত্র জানিস তো,
আমার মাষেব। জানিস আমার মা এই
যন্ত্রটায মধ্যেই সব গান ঢেলে দিবে গেছে।
হাসিয কথা নয়, সত্যি বলছি এক এক সময়
মনে হয় যন্ত্রটায যেন প্রাণ আছে। দেখিস
না কেমন মানুষ্যের গলায গাইতে পারে।
সৌন্দর্য আভার বসে আমরা একটা সিগারেট
চাপ জনে ভাগ কবে খাবাব চেষ্টা করছি।
এমন সময় বুটুদা ঘোষণা কবল আমি আব
গাইব না।

আমাদের চোখে-মুখে বিস্ময়। লক্ষ্য
করে বুটুদা আবাব বলল, ভগবান আমাকে
গাইবে কবে পাঠান দি, পাঠিয়েছেন বাজিয়ে
কবে। আজ কর্দিন থেকেই ও আমাকে বলছে
তুমি গান ছেড়ে দিবে কেবল বাজাও, তোমাব
নাম হবে।

এই ওটিকে তখনও ঠিক ধরতে পারি
নি আমবা। আমাদের অজ্ঞতায় হেসে উঠল
বুটুদা। বললে, মীরাদি কথা বলছি। আজকাল
ওষ সঙ্গেই তো বাজাতে যাই। কি করব বল

না, সেলে ছাড়ে না একে-তাকে পাঠিয়ে ঠিক করে নিয়ে যায়। এই তো বাই নি বলে আজ সকালেই নিজে এসে হাজির।

এব পয় পাড়ার মীরাদি আর বুটদাকে নিয়ে জোর গুজব ছড়াতে লাগল। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে আমার সেক্সাদ বলল, জানিস দীপদ আমাদের মীরার সঙ্গে বুটদার বিয়ে।

তাই নাকি, কবে?

তা জানি না, কলেজের ওরাই বলাবলি করছিল। জানিস আজ কলেজ সোসাইল মীরার সঙ্গে বুটদা বা বাজাল না কি বলব।

পাড়ার মীরাদি আর বুটদার সেই রোমান্টিক কাহিনী যতই দানা বাঁধতে লাগল আমাদের সিগারেট খাওয়ার আড্ডায় ততই ভাটা পড়তে লাগল। বুটদাকে আজ-কাল বাড়িতেই পাওয়া যেত না। দৈবাৎ দেখা হলেও আমাদের মত আবারচীনদের সঙ্গে আড্ডা দেবার মত সময় ছিল না ওর। মাঝে মাঝেই বুটদা বলত, এটা হ'ল আমার সাফল্যের সময়, আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করতে পারব না।

এব ঠিক বছর দুয়েক পরের কথা। একদিন বাড়িতে হলদে চিঠি এল। সেক্সাদির বন্ধু মীষা চ্যাটার্জীর বিয়ে। না বুটদার সঙ্গে নয়, কোথাকার এক মৃগাঙ্ক মৃগাঙ্কীর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। একটা আঘাত লাগল মনে। সত্যিকথা বলতে কি বুটদার জন্যে কোথায় যেন গোপন একটা ভাঙ্গাবাসার স্কাবন সঞ্চিত ছিল, এতদিন বুঝতে পারি নি।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম বুটদার সন্ধানে। বাড়িতে নিজেই বসেই পাওয়া গেল ওকে। ঘরে ঢুকতেই বুটদা বলল, এসেছি, তোর কথাই ভাবছিলাম, শুনোইস তো সব কথা।

হ্যাঁ।

সহসা আমাকে চমকে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বুটদা বললে, বিয়ে ওর হবে না—তার আগেই ওকে খুন করব আমি। জানিস, আমার বাবা একরাতে চার-চারটে খুন করে ফাঁসি গিয়েছিল। আর সেই দৃষ্টান্তে আমার মা গলায় কুর চালিয়ে সুইসাইড করে। মনে পড়ে আমার এই ছোট হার্মোনিয়ামটা মায়ে গলাকাটা রক্তে ভিজে গিয়েছিল। তুই বিশ্বাস কবতে পারবি না দীপেন আজও আমি এর গায়ে বস্তুর গন্ধ পাই। বালিসের বদলে এই ফলটার ওপর মাথা রেখে মা সেদিন গলায় কুর চালিয়েছিল। সে কথা বাকি, বিয়ে ওর হবে না দীপেন, দেখিস তার আগেই ওকে খুন করব।

না, বিয়ে বাড়িতে খুনোখুনি কান্ড ধটে নি। উপরন্তু বেশ নির্বিঘ্নেই বিয়ে মিটল। এমন কি আবার মাসের বিয়ে বলে যে জল-টলের ভয় ছিল সেদিক থেকেও কোন বিষয় ঘটল না। বাড়ির প্রথম মেয়ের বিয়ে তাই ভোজের আয়োজন বেশ রাজকীর

ধরনের হয়েছিল, সর্বোপরি মীরাদির অমন সুন্দর বর দেখে আমারও মনে হ'ল কথাটা, না, খুব ভাল বিষয়ই হয়েছে মীরাদির।

কেবল একটা ছোট ঘটনা কীটার মত গেঁথে রইল। ঘটনা ঘটল বিয়ের পর বাসর-ঘরে। সবাই মীরাদিকে ঘানের জন্যে পীড়া-পিড়ি করতে থাকলে সে বলাইল, কে বাজাবে বল আমি যে বাজিয়ে গাইতে পারি না।

সঙ্গে সঙ্গে মীরাদির বর বলে উঠলেন, বেশ আমিই না হয় বাজিয়ে দেব তুমি গাও। গান ধরল মীরাদি। ওর সেই প্রিয় গান। একদিন যে গান গেয়ে পাড়ার রবীন্দ্র-জয়ন্তীর আসর মাং করেছিল।

এদিন আজি কোন ঘরে গো

খলে দিল দ্বায়.....

সঙ্গে সঙ্গে হার্মোনিয়ামের প্রচণ্ড শব্দে মীরাদির গান চাপা পড়ে গেল। সহসা গান বন্ধ করে মীরাদি ধাক্কার দিলে ওঠে, থাক আপনাকে আর বন্যাহাঙ্গের বাজনা বাজাতে হবে না।

মীরাদির বিয়ের ঠিক একদিন পরেই বুটদা কোথায় চলে গেল। শুনোই হাবার সময় ওর প্রিয় হার্মোনিয়ামটা ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নেই নি। সংসারে এক দুঃ-সম্পর্কের মামা ছাড়া বুটদার নিজের বলতে কেউ ছিল না যে খোঁজ নেবে। তাই মহা-কালেব ব্যাপারে কোথায় হারিয়ে গেল আমাদের সেই দি গ্রেট হার্মোনিষ্ট বুটদাকের নন্দী, সে খবর কেউ রাখল না।

ভাবতে পারি নি দীর্ঘ দশ বছর পরে এই অবশ্যাব্য আবার ওদের দেখা পাব। বুটদা আর মীরাদির কথাই বলি মীরাদিকে স্টেজে দেখামাত্রই চিনেছি। বুটদাকে এই বিভবস মূখে মোটেই উপায় ছিল না। চিনেছি ওর বাজনা! কারণ জানি সিঙ্গল বিডের একটা হার্মোনিয়ামকে দিয়ে গান গাওয়াতে এক-মাত্র বুটদাই পারে।

তখনও ওদের অনুষ্ঠান শেষ হয় নি তার মধ্যেই আমার সেই আত্মীয়টাকে গ্রীন্দ-রুম থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। ওর চোখে-মুখে অবাক হওয়া ভাব, কাছে এসে বললেন, ঠিক ধরেছি তুমি মেয়েটাকে চেন, অথচ সে কথা গোপন করে গেলে, যাও গ্রীন্দরুমে ডাক পড়েছে।

না, কোন ভুল নেই। গ্রীন্দরুমের দরজার বাইরে নারিকা মহুয়ার চন্দ্রবেশে মীরাদিই অপেক্ষা করে আছে। আবার দেখে খুশির আতশাঘো ছুটে এল মীরাদি তারপর আমার কাঁধ দুটো ধরে শরীরটা একটু ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, ওং, হাট গ্ল্যাড টু সি ইউ দীপেন। স্টেজ থেকেই কেমন চিনেছি বল ত! কতদিন পরে দেখা হল, প্রায় একশুধ তাই না?

তা বছর দশেক হবে, তোমার বিয়ের পর এই প্রথম দেখা।

তুমি নিশ্চয়ই আগে চিনতে পার নি?

পেছোছি। তোমাদের দু' জনকেই।

আমার উত্তর শুনে মীরাদি একটু চমকে উঠল যেন, তাবপর বললে, যাত্রা দু' জনকে চিনলে। কেন আর একজনকে চিনতে পারলে না। বাকি চিনতে যখন পার নি তখনই হয়েছে। কলকাতায় গিয়ে ওদের অনেক রোমান্টিক গল্প শোনাতে পারবে।

উত্তরে আমারও অনেক অপ্রিয় কথা বলার ছিল, কিন্তু কিছুই বলা হ'ল না, তার আগেই মীরাদি আমার একটা হাত পরম নির্ভরে দু' হাত জড়িয়ে ধরে বলল, কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর দীপেন এ ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিল না। হয়তো তোমরা জান না আমি পছন্দ করেই বিয়ে করেছিলাম। বুটদাকে বিয়ে করব বললে কেউ সেদিন আটকাতে পারত না। পাড়ার আমাদের নিয়ে কথা হত, নানান গুজব ছড়াত, কিন্তু কোনদিন ওকে আমার স্বামীর আসলে কসাবার কথা কল্পনা কবতে পারি নি। ওর সেই অমৃত্ত প্রতিভার কথা ভেবেও না। কারণ আমি তো প্রতিভাকে বিয়ে করতে চাই নি, বিয়ে করতে চেয়েছি এক পুরুষকে। তাই অনেক বেছে একজন পুরুষকেই বিয়ে করেছিলাম। কেবল পুরুষ বললে বলা হবে, বলা উচিত শেক্সপীয়ার ত পুরুষ। ওর পাশে ওখেলোর নম্রাকি করোঁছিল, এমন হুই কিংসল নিয়ে মুর বেজোছে। ও সেই প্রথম আর বলার দায় থেকে রেহাই দিলেন কোন এক মিসেস চ্যাটার্জী।

বাকি নিজেই এক-ধীরে ধীরে মুখে কয়ে নেব। ভাবছি ঠিক এমন সময় কাঠের দেওয়ালে দীর্ঘ ছায়া ফেলে ম্যানেজার এসে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে মীরাদি নিজেই আমার হাত ছেড়ে দিয়ে একবার ওর দিকে ফিরে হুকুটি করল, তারপর চোখের হুকুটি মিষ্টি হাসিতে মুছে ফেলে মীরাদি বলল, ভয় নেই ম্যানেজারবাবু আমার ফ্যানটায়ন নর, জাস্ট এ ব্রাদার, কলকাতায় আমরা এক পাড়ার লোক। আর দীপেন ইনি আমাদের কিংসলদের ম্যানেজার।

আই এ্যাম গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

ভুললোক মূখে মাথা হাসি ফুটিয়ে কথাগুলি উচ্চারণ করেন। তারপর মীরাদিকে লক্ষ্য কবে বললেন—হঠাৎ এমন অসম্মত গ্রীন্দরুম ছেড়ে বেরিয়ে এলে কি-না, তাই দেখতে এলাম। মাত্র মিনিট দশেক পরেই কিন্তু তোমার এনট্রান্স।

কয়েকপা গিয়েই আবার ফিরলেন তিন, আর একটা কথা, ও কলাইল, প্রথম দিকটার নাকি বিশেষ জমতে পার নি,

[শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়]

কবে যেন একদিন শান্তিনাথের
 জ্যেষ্ঠামশাই মনোরমাকে শান্তিনাথের জন্য
 পছন্দ করে ফেলেন। আদিত্য তার মা
 মনোরমার মুখে শনেছে তার বাবা
 শান্তিনাথ কতবার কতো কাঁড় করে-
 ছিলেন বিনে ভাতবার জন্য। শান্তিনাথ
 অন্যান্য অনেক সম্বন্ধ বোনামী চিঠি দিয়ে,
 বিয়েতে নিজের অক্ষমতার নানা কল্পনিক
 বিবরণ দিয়ে, ভেঙে দিতে পেরেছিলেন।
 কিন্তু এই সম্বন্ধটি যেন নিরাসিত মৃদুত্বের



রহস্যের মত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।
 কথাবার্তা যখন অর্ধ-পল্ল অবস্থায়,
 শান্তিনাথ সেই সময় মনোরমার বাবাকে
 বুকের একটা অন্তত যন্ত্রণার কথা বলেন
 ছিলেন। অন্তত সেই যন্ত্রণাকে মৃত্যু-
 যন্ত্রণাই বলা যেতে পারে। যন্ত্রণা যে
 সর্বক্ষণ হয় তা নয়, তবে কখন যন্ত্রণা
 দেখা দেবে এই যন্ত্রণায় সানাক্ষণ আশংকায়
 কার্গাসটে মেরে থাকতে হয়। যন্ত্রণা এলে
 বুকেরটা ধড়ফড় করে। একা থাকতে ভীষণ
 আতঙ্ক হয়। তখন মনে হয় এইবার মরে
 যাবো।

শান্তিনাথের বালিষ্ঠ, ব্যায়ামপুষ্ট
 চেহারা দেখে কে বলবে শান্তিনাথের
 বুকের কোটবে মৃত্যুবীজ আশ্রয় নিয়েছে
 আর সেই কারণে শান্তিনাথকে সহ্য করতে
 হচ্ছে অসীম যন্ত্রণা। অনেকেই শান্তিনাথ

জাশের এই মানসিক অসুস্থতা নিয়ে সন্দেহ করেছিল। শান্তিনাথের পিতা-মাতা কেউ ছিলেন না। তাঁরা জীবনের বৃন্ত থেকে অনেক পুঁবেই অকালে বয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা হয়তো শান্তিনাথকে বৃকতে পারতেন। শান্তিনাথের এই অদ্ভুত উপলব্ধির জন্য তার কোন বন্ধু ছিল না। কেন না বৃক হতে গেলে ড'সর্বক্ষণ ছায়ার মত ফিরতে হবে শান্তিনাথের পিছ পিছ। সুতরাং শান্তিনাথ দুর্বোধ থেকে গেলেন। জেঠামশাই ভাবলেন, বিয়ে দিলেই এ পাগলামি সেরে যাবে। মনোরমার বাবা কিন্তু অন্য প্রকার সন্দেহ করেছিলেন।

শান্তিনাথের বলিষ্ঠ চেহারা, খোঁচা খোঁচা চুল, বড় বড় চোখ আবার তার

বলতেও গিয়েছিল। কিন্তু সে সময়ে চোন্দ বছরের নোলক-পরা, ডাবের মত ভরাট, চিকণ মুখের বালিকার কথায় আন দেবে কে? তার কিশোরী মনের আলোছায়ায় সংকেত অন্য কে বুঝবে, সেই কি বুঝতে পারতো? তার পাড়াবেড়ানী, একা-দোকা খেলা বন্ধুরা কি কথা শোনাতে পারতো তখন? মনোরমা নিশি রাতে ছাদের ওপর শূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্টভাবে ভয়ের ছবি আঁকতো। আর মহাকাশীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে প্রার্থনা করতো, দেহি, দেবি পরং সুখম্,

মনোরমার বাবার কিছু জায়গা-জমি ছিল চম্বশ পরগণা জেলায়। তার কিছু রেখে বাকী সবই

শেয়ার—সব মিলিয়ে শান্তিনাথের দক্ষিণে তখন সৌভাগ্যদায়িনী লক্ষ্মী, বাস, বিদ্যা-দায়িনী বাণী, সঙ্গে বলপূর্ণী নর্তকীর আর সিঁধদাতা গণেশ। মেয়ের মেয়ে-দের মায়েরা তাদের মেয়েদের জন যেনন জামাই চান, একবারে অক্ষবে অক্ষরে মিলিয়ে শান্তিনাথ ঠিক তেমনটি

আশীর্বাদ হয়ে গেল। শান্তিনাথের ক্ষীণকণ্ঠের আপত্তি সকলের আনন্দ চীৎকারে কোথায় ভেসে গেল। আশীর্বাদ হয়ে গেলেও শান্তিনাথ একবার শে-চেঁটা করেছিলেন। এ অঞ্চলের পোশাক-পরিচয় তখন একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি। শান্তিনাথ তাঁকেই ধরলেন। বললেন, মশাই, সত্যি-কথাই বলছি। আমি স্বদেশী-বদশী করি না। ওরকম দুর্মতি আমার কখনো

এ জন্মের দেনা



সমীর মুখোপাধ্যায়

ওপর বিবাহে সম্পূর্ণ আনন্দ দেবে মনোরমার বাবার সন্দেহ হয়েছিল শান্তিনাথ বোধ হয় স্বদেশী করেন। হয়তো কানাইলাল, ক্ষুদীরামের মন্ত্রাশ্রম। কে জানে অন্য কোন কিসফোড়ের গাড়ি লক্ষ্য করে এ বৃক মনে মনে বোমা ছোঁড়বার জন্য তৈরি হচ্ছে কিনা। শান্তিনাথকে একরকম ধরেবেঁধেই আশীর্বাদের সময় আনা হয়েছিল। শান্তিনাথ যখন মনোরমার বাবাকে বললেন, আপনার মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সত্য কথাই বলছি। বৃকে আমার কঠিন রোগ আছে। মনোরমার বাবা ঝাঁ করে শান্তিনাথের বৃকের চাদর খুলে ফেলেন। মুহূর্তের মধ্যে তিনি পাজাবী ও গেঞ্জিতে ঢান দিলেন। শান্তিনাথ ওরকম - বৃডোলোককে সৌজন্যের খাতিরে বাধা দিতেও পারলেন না। তারপর শান্তিনাথকে সেই অবস্থায় খালি গায়ে টানতে টানতে সকলের সামনে এনে দাঁড় করালেন। শান্তিনাথের বৃকে একটা বৃসি মেরে আনন্দে চীৎকার করে বললেন, বিরাট্রিশ হীণ্ড বার বৃকেন ছাতি তার বৃকে রোগ? হা-হা-হা—। উন্মত্তের মত হেসে উঠলেন মনোরমার বাবা। স্পটই বৃকলেন, এ ছেলে স্বদেশী-দের একজন না হয়ে যায় না।

আদিত্য তার মায়ের কাছে শুনেছে, সেই সময় মায়ের বৃক অজানা আশংকায় কোঁপে উঠেছিল। মনোরমা কিছু একটা

বিক্রী করে তিনি পনের টাকা জোগাড় করতে লাগলেন। ঠুয় শান্তিনাথকে ভীষণ পছন্দ। না হবারও কোন কারণ ছিল না। শূর, রূপবান, স্নাত্যবান ছেলেই নয়, এদিকে বি-এ পাশ করেছে। কিছু ঐশ্বর্যও আছে। শান্তিনাথের জেঠামশাই-এর বিষয়সম্পত্তি ওই পাবে। গিরিডি়র প্রকাশ ভাড়াটে বাড়ি, ছোট-বকুলপদ্র গ্রামের চোন্দ বিবে ধেনো জমি, কশ-বারোটি বিল, কিছু একশনে-ওখানের

হয় নি। মতিলাল নেহরুরকে চোন্দে দেখবার জন্য রাস্তার ভিড় করোঁছলোয় একবার। জি-ও-সি-সুভাষচন্দ্র ঘোড়ায় গাড়ি সাজিয়ে তাঁকে নিয়ে আসাছিল। দেশবন্দু চিত্তরঞ্জনের নামটা মাত্র শুনেছি। কিস্মনকালোও খবরের কাগজ পাড়ি না। কানাইলাল, ক্ষুদীরামের বৃতান্ত জানি। ওসব শুনে গেয়ে রক্ত একটু চনমন চনমন করে। বাস, এই আমার দশাই স্বদেশী ক্র্যা। আমি এ বিবে কেন, কোন

বিয়েই করতে চাই না। মেয়ের বাপ যদি জানে আমি অন্য পাত্র খুঁজে দেখতে পারি। আপনি একজন বি-এ। আপনি কি জানে আমি জেনেশুনে ভদ্রলোকের মেয়েকে অনুবিয়ে ফেলবো? বৃকে সত্যি আমার রোগ আছে। সব সময় মৃত্যুচিন্তা আসে। মরে যাবো মরে যাবো মনে হয়। সব সময় মনে হয় ঘর ছেড়ে কেউ বেন না কোথাও চলে যায়। সবাই চোঁচামোঁচি করুক। গোলমাল করুক। তাহলে বৃকের কষ্ট সম্বন্ধে আমি অনমনস্ক হয়ে যেতে পারি। আপনি শিক্ষিত লোক। কোল-কাতার আমার সঙ্গে একসঙ্গে হোস্টলে থেক পড়েছেন। আপনি ভাই এ বিয়ে রোধ করুন। পোস্টমাস্টার ভদ্রলোক নাকি বলছিলেন, সে কি মশাই? এ কৃষ্ণ কখনো কি আমার স্মারা হয়? হিন্দু ব্রাহ্মণের কন্যা। আশীর্বাদ হয়ে গেছে। এখন লোকে শুনবে কেন? আপনার কথা আমি না হয় সত্যি বলে বিশ্বাস করলাম। এ অবস্থায় আমি যদি বাধা দি বিয়েতে, তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছেন? আপনি তা' মশাই অনবরত আপনার কথাই ভাবছেন। দর্গা বলে বৃকে পড়ুন। যা' হয় হবে। আপনি না পুরুষ মানুষ?

এরকম একটা অদ্ভুত রোগের আস্তিত্বের কথা কেউই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে নি কেন, এ কথা ভেবে আদিভ্য বিস্মিত হতে পারে বটে, কিন্তু সেদিন এ ধরনের রোগের কথা ভাবা অন্যায় ছিলো বলেই কেউ তখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় নি। শান্তিনাথের জ্যেষ্ঠমশাই অবশ্য ডাক্তার, কবিরাজ কিছুই বাকি রাখেন নি। সকলেই একবাক্যে বলেছিল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, বৃকে কোন রোগ নেই। এ এক রকমের মানিয়া। মৃত্যুচিন্তা আসবে কেন? কেন এভাবে শান্তিনাথ বন্দনা পেয়ে যাবেন? গৌতম পুস্তকের মনে হয়েছিল মৃত্যুর কথা। জীবনের জটিল বস্তুর কথা। তাঁরা সব ক্ষণে সত্যপ্রচার করতে এসেছিলেন। তাঁরা বড় বড় মানুষ। যুগ যুগ ধরে তাঁরা আলো হয়ে আছেন। আদিভ্যের বাবা ভো বড়মানুষ ছিলেন না। তিনি যে মাপের মানুষ তাঁর বন্দনাও সেই মাপের হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এরকম অসাধারণ বন্দনা কেন? সত্যপ্রচারের জন্য তিনি তা নির্বাচিত হন নি। সাধু-সন্ন্যাসীর মতন তাঁর রকম-সকম ছিল না। মৃত্যু মানে কি? জীবনের পুঁজি যখন ফুরিয়ে যায়। কিন্তু শান্তিনাথের তখন তা' পরিপূর্ণ যৌবন। মৌচাকের খোপে খোপে তখন সূদা। কৃষ্ণ থেকে তারার অমৃত ক্ষরিত হয়ে পড়ছে। প্রবহমান নদীর মতন তখন জীবনের ধারা। শান্তিনাথের জ্যেষ্ঠমশাই অনেকটা ঐ ভাবেই

জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। শান্তিনাথের এ ধরনের রোগ আসলে শুরুর-বসে থেকে চিন্তার জীবর কাটা থেকে অর্জন করা। অফিস আদালতে কাজ করে না। অল্পচিন্তা নেই। একটু নির্জনতা প্রিয়। সেই জন্যেই এই সৌখীন খেয়াল। তাছাড়া ডাক্তারেরাও তা' একে কোন রোগ বলে নির্ণয় করেন নি। সংসারের জোয়াল কাঁখে পড়লে ওসব বড়মানুষ খেয়াল বাপ বাপ করে পাগাবে। শান্তিনাথের জ্যেষ্ঠমশাই সেদিনের মানুষ। তাঁরা চুটিয়ে জীবন উপভোগের সুযোগ পেয়েছিলেন। চুটিয়ে জীবন উপভোগ করে গেছেন। তাঁরা জানতেন যৌবনকাল উপভোগের কাল। আর বার্ষিক ঈশ্বর উপাসনার। জীবনকে এইভাবে সরল দুইভাগে ভাগ করে ফেলতেন। সেই জন্যে তেমন কোন জীবনের জটিলতাও ছিল না। যৌবন উপভোগকে যেভাবে নিতেন ঈশ্বর উপাসনাকেও সেই একই সহজ, সরল, মৃদুভাবে। তাঁরা মৃত্যুর রহস্য কেমন করে বুঝবেন? অপরিণাম যন্ত্রণার কথা? মৃত্যু যে কতো বেশে, কতো রূপে, কতো বর্ণে অনবরত মানুষের যৌবনকে প্রলুপ্ত করছে শান্তিনাথের জ্যেষ্ঠমশাই-এর তা' অনুভব করার কথা নয়।

চাঁপা বছর বয়সেও পচাষার কুস্তির আখড়া থেকে গায়ে মাটি মেখে লেংটি পরে দাঁতন করতে করতে উদ্রী নদী এপার-ওপার করে তবে ফিরতেন গিরিডি শহরে। বাদাম-পেস্তা মেশানো খাঁটি ভাইসের দৃষ সেরটাক টেনে নিয়ে হাঁকতেন, রাম সিং? রাম সিং দারোয়ান সাঙ্কোয়ান। তবু শান্তিনাথের জ্যেষ্ঠমশাইকে তেল দিয়ে ভজতে ভজতে বেচারী গলদখম হয়ে যেত। এরপর কানে আতর ভেজানো তুলো গুঁজে চমনলাল রাজগাড়িয়ার গদীতে ম্যানেজারি করতে যেতেন। রাত আটটার পর শুরুর হত বাড়ির বৈঠকখানায় গানের মঞ্জলিশ। রাত এগারোটা পর্যন্ত এসব চলতো। শোবার আগে প্রতিদিন রাতে আট আউন্স মদ্যপান ছিল অবধারিত।

স্ট্রীলোক ব্যতীত আর সব ভোগের ব্যাপারে তিনি ছিলেন তাঁর কালেরই যথার্থ মানুষ। সত্তরাত্তর শান্তিনাথের মৃত্যুচিন্তা ও তৎক্ষণাত যন্ত্রণাবোধ তিনি কেমন করে বুঝবেন? আদিভ্য তার মা মনোরমার কাছে শুনেছে, শান্তিনাথের নির্দেশমত গণংকার নাকি বাঙ্গালীমুদ্রক রূপনগরে এসে মনোরমার করকোষ্ঠী বিচার করে বলেছিল, এ বিয়েতে তার সর্বনাশ হবে। সত্তরাত্তর সময় থাকতে সাবধান। সময় থাকতে সাবধান হলেও যে তাতে সময়ের বিশেষ কিছু এসে যায় না এসব তখন তা' শান্তিনাথ জানতেন না। এসব জানার মত তিনি যখন জানী হলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিয়ে হল। আর শান্তিনাথ নিয়তির অনিবার্যতাকে

মনে নিলেন। বিয়ের পর ছটা বছর সোটাটুকু মন্দ কাটলো না। চোন্দ বছরের বালিকার আটাশ বছরের বয়। গিরিডি থেকে রূপনগরে আসা অনবরত তা' সম্ভব নয়। খুব কমই আসতেন শান্তিনাথ। প্রফুল্ল মুখ। বড় বড় চোখে প্রায় নিরাল্প, শান্ত দৃষ্টি। সংযত, ধীর কথাবাতা। মনোরমার বন্ধুরা বিয়ের সময় বিশেষ পাস্তা পায় নি। মানুষটা কেমন তাদের জানতে কৌতূহল ছিল। তারা যা' যা' শান্তিনাথকে জিজ্ঞাস্য করেছিল শান্তিনাথ সে সবের ঠিক ঠিক জবাব দিয়েছিলেন। তারা মনে করেছিল তাদের সম্বন্ধে শান্তিনাথের কোন প্রশ্ন থাকতে পারে। মনোরমার বন্ধুদের সম্বন্ধে শান্তিনাথের কোন কৌতূহল ছিল না। ফলে শান্তিনাথ তাদের কোন কিছু জিজ্ঞাস্য করেন নি। তারা চলে যাবার সময় বলল, আসি। শান্তিনাথ স্মৃষ্টি হেসে বলেছিল, আসুন। শব্দরবাবাড়িতে শান্তিনাথ নিজের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নির্বিঘ্ন মনে বসে থাকতেন। মনোরমা দিনের বেলা কৃষ্ণ কদাচিৎ শান্তিনাথের কাছে আসতো। শান্তিনাথ তাঁর বড় বড় শান্ত চোখের দৃষ্টি মেলে মনোরমাকে বলতেন, এভাবে দিনের বেলা আসতে নেই। গুঁরা হাসাহাসি করবেন। এর জবাবে বালিকা মনোরমা সদ্য শেখা পাকামী দু'-একটা কাছ লাগাতে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। শান্তিনাথের শান্ত, বড় বড় চোখই তখনো করেছিল। মনোরমা তারপর আর দিনের বেলা শান্তিনাথের কাছে আসতো না।

যৌবনের উত্তাপ শান্তিনাথের ছিল না বটে, কিন্তু যৌবনের স্নিগ্ধতা ছিল। বেল-ফুলের কুঁড়ি শান্তিনাথ ভালোবাসতেন, নিজের বালিসের তলায় রেখে ঘুমাতে। মনোরমার বালিসের তলায় বেঙ্গফুলের কুঁড়ি শান্তিনাথ অলঙ্কার রেখে দিতেন। একটি গোপন, অন্ধকারিত, তাকানের তারকার মত মৌন, শান্ত, ছন্দময় ছিল শান্তিনাথের প্রেম। শান্তিনাথ কখনো চোঁচিয়ে কথা বলতেন না। সাঙ্ক্যায় নামমাত্র বিলাসিতা ছিল না বটে, মনোরমার মূখের চোঁচও কিন্তু পবিত্রতার পরিচ্ছন্ন ছিলেন শান্তিনাথ। বড় বড় সুপদারি কটকট করে কামড়ে মনোরমার যখন সম্মুখ তাঁর সামনে যেত তখন তিনি বিয়েতে পাওয়া সুদৃশ্য রূপালী জাঁতি দিয়ে তার হাত থেকে সুপদারি নিয়ে সুন্দর, পরিপাটি কুঁচিকুঁচি করে মনোরমাকে খেতে দিয়ে বলতেন, শশ্ব করে খেতে নেই। মনে থাকবে তা'। কথা শেষ করে সুদৃষ্টি হেসে আশ্চর্য শান্ত বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকতেন।

শান্তিনাথের শহের দাবীও ছিল সংযত, কুঁঠিত, সংকোচপূর্ণ। কোথাও যেন একটা প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধ এসব ব্যাপারে কাজ করতো। বহুদিন হয়ে গেলেও মনোরমা শান্তিনাথের থামি গা

কখনো দেখে নি। এসব মিলিয়ে মনো-
রমার ক্রমে ক্রমে একটা ভয়ই জন্মে গিয়ে-
ছিল মনে। তার আর আর বন্ধুদের
বরদের কথা শুনেছে। সেই সব বরেরা
হাসতে হাসতে চেঁচাতে চেঁচাতে এমন সব
অসভ ইয়ারিকির কথা ঘোষণা করতো যে,
মনোরমাকে কানে আঙুল দিয়েও লম্বা
ঠেকাতে দিতো না, গাল লাল করে তবে
ছাড়তো। এদের বোহায়া মনে হলেও
খারাপ লাগতো না। ববেবা তা' এমনিই
হয়। বন্ধুদের বরদের মধ্যে কেউ
কেউ ছিলো অসম্ভব রাগী। বৌগলিকে
ছোট পেয়ে হাঁকডাক করে ভড়কে দিতো।
মদ খেয়ে এসে সমর বিশেষে মারধোর
করতো। আবার আদরও কবতো যখন-
তখন লীগলির প্রাণ একেবারে খোঁষয়ে
থেন। তবু তারা কেউ অস্বাভাবিক
ছিল না। বন্ধুরা তাদের বরদের ভয়
করতো না। সময় বিশেষে মখও খুলতো
রূপনগরের হাটে বাটে মাঠে ছড়ানো ছড়ার
রস মিলিয়ে।

শান্তিনাথ ওদের মত ছিলেন না
বলেই মনোরমা ওঁব সঙ্গে বেশি মাথা-
মাথি কবতে ভয় করতো। গোড়ায়
ভেবেছিল অহংকার। আব না হবেই বা
কেন? অহংকার কববার শান্তিনাথের
বিষয়ের সম্ভাব কি? আর সেই জন্যেই
এই নিষ্পত্তি ভাব। কিন্তু তারপর ছোট
ছোট বিবরণগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে
মনোরমা বুঝে তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিল
মানুষটির অনেকটাই অপার অহংকার।
এক একসময় চেনা মানুষটির প্রকাশ্যে,
রাজপথে এব হয়ে পড়ে বাটে, কিন্তু সে
একটা গম্ভীর মতন, স্মৃতির মতন,
আড়ালে গা-ঢাকা চোরা ভালোবাসার
মতন। শব্দ করে সম্পূর্ণ হাসি শান্তি-
নাথ হাসতেন না। হাসিব একটু, আভা
মুখে ফুটো উঠতো। ঠোঁট দুটি অল্প
কাঁপতো। সেই ফাঁক দিয়ে দু'-একটি
শব্দ হঠাৎ চলে উঠতো। তারপর মুখটা
অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠতো। তার-
খানা এই এককম হাসা হাসিব বাজে খরচ।
হাসাই উচিত নয় জীবনে। কি এতো
সম্পদ জীবন আমাদের দিয়েছে যার জন্যে
হাসিকে আমাদের এ্যাতো দেখাতে হবে?
হাসির কারণ নেই কোনো তবু এই
মানুষকেই হাসতে হয়, এই জনেই বার্ষিক
শব্দ কবে ভুলগী করে সুন্দর কবে হেসে
ওঠা!

মনোরমা গান জানতো না। রূপ-
নগরে ছেলেদের অল্পপ্রাসনে, জুসাতে,
মেয়েদের বিরক্ত ব্যবহার কববার জন্যে
এক এককমের ছড়া আঁহ। বখনো-
সখনো কোন উদাস দু'পরে, চোখের দীর্ঘ
অপবাহে, ভিজে বর্ষার অন্ধকারে অসহায়
গলায় মনোবমা সেই সব ছড়াকেই হাঁসত
কবে তুলতো। গিরিগিড়ির শব্দস্বরঝড়িতে
বসে-এই সব হাড়ার ভেতর দিস যখন

মনোরমা রূপনগরের আরাধনা করতো
আনন্দে, বেদনায়, তখন হৃষ্যভরা দুটি
অপবৃপ চোখ ভুলে শান্তিনাথ ধীরে ধীরে
কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে স্নিগ্ধ-
স্ববে বলতেন, মনো, তোমার এখানে বড়
কষ্ট না?

কষ্ট? হ্যাঁ, তা' বড় কষ্ট বৈকী।
কিন্তু সে কষ্ট আর পাঁচ জনের
কষ্টের মতন নয়। তাহলে কষ্ট তো
আর কষ্ট থাকে না। সেটা সহ্য হত।
কিন্তু এই এক রহস্য, সে কষ্টটাকে
মনোরমা ঠিক ছুঁতে পারতো না। অথচ
তার কষ্ট হত। সে এই সব স্নিগ্ধ
কথায় কেঁদে ফেলতো। চোখ দিয়ে বড়
বড় ফোটার অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়তো। আর
আশ্চর্য, অন্য বররা যা' করে, চোখ মুছিয়ে
দেখ, পিঠে হাত বুলিয়ে দয়, কতো
ভালোবাসার কথা বলে, কতো সোহাগ
করে, সে সব শান্তিনাথ করতেন না।
অত্যন্ত স্নিগ্ধ শান্তভাবে মনোরমার
কাঁদাকে দেখতেন। তারপর, অশ্রুত,
গালত মোষে মতন নরম গলায় কতদিন
মনোরমার কাঁদা দেখতে দেখতে বলতেন,
এই কাঁদা ভালো।

এতোক্ষণ মনোরমা তার নিজের
কষ্টকে চিনতে পারতো। এ কষ্ট শান্তি-
নাথকে চিনতে না পারার কষ্ট, বসন্তে
না পারার বেদনা, জানতে না পারার
যন্ত্রণা। এ বড় সহজ কষ্ট নয়।

মনোরমা একটা পানও সে সময়
ভালো করে সাজতে পারতো না বলে
শান্তিনাথের জেঠামশাই মনোরমাকে বড়
একটা রূপনগর থেকে আনতে চাইতেন
না। কাজ গিরিগিড়ির শব্দস্বরঝড়িতে ছিল
না তেমন। একমাত্র কাজ, রাণি-রাশি
পান সাজা। সন্ধ্যার সময় বৈঠকখানা
ঘরে গানের আসর বসবে। সেই আসরের
গুণীদের জন্যে খিল-খিল পান সেই
পানই যদি সাজা করে না সাজতে পারলো
মনোরমা তবে আর তার গিরিগিড়িতে
থাকার কি মানে? পান না সাজতে
পারলেও যে শান্তিনাথের জন্যে মনো-
রমার এখানে প্রয়োজন আছে, মনোরমার
বিয়ের আট-ন' বছর আগেই শান্তিনাথের
জেঠাইমা মারা গিয়েছিলেন বলে শান্তি-
নাথের জেঠামশাইকে এ সহজ কথাটা বলে
দেবার মানুষ ছিল না কেউ।

অতএব বছরের পর বছর রূপনগরের
গংগাব ঘাটে বটগাছের ছায়ায় মনোরমাকে
বসে বসে চেউ গুনতে হত। মাঝ মাঝে
উড়ে আসতো এক একটা দিন, গলানো
গিনিসোনোর মত এক অলিঙ্গনীয়
উজ্জ্বলতা, অনেক মেঘছায়ায় পব এক
অবাস্ত আনন্দ, স্বপ্নের মত উপস্থিত হতেন
শান্তিনাথ। আবার দু' চারদিন থাকবার
পব অদৃশ্য হতেন। একা কখনো
আসতেন না। সঙ্গে সর্বদাই থাকতো

একটি লোক। মনোবমা কখনো জিজ্ঞাসা
করে নি। মনোবমার দাপেব বড়ই
লোকেরাও না। কিন্তু কিছু একটা তাঁর
ভাবেন, এই মনে কবে শান্তিনাথ মনো-
বমার খোঁপায় জড়ানো বেলফুলের মতো
ঘাণ নিতে নিতে বনতেন, একটা লোক
আমাব সঙ্গে নাগিই চাই। কেন জানো?
আমি একা চলেবো কবে? শান্তি-
তেমন। মনোরমা চেনে নিতেন মনো-
বমুটো। অল্পসল্প হঠাৎ শান্তিনাথ
বুঝতে পারতেন সেই মনোবমুটো। নিজে
বলতেন, আমাব গানি ভর হয়। এ'র
থাকার ভয়। পান কি করে একা গানি
আমি তা' জানি না। মনো, তুমি বরতো
একা থেলে না। তারপর ভাব যে মনো-
মানুষ তিনি ভাপি বিড়ী একটা বর
বলতেন। মনো, আমি তোমাব খেতে
দশ বছরের বড়ো। সুতরাং আমাবই
তোমাব আগে যাবার কথা। তা'চাও
আমাব বুকে বোগ। অবশ্য এখন এ'র
কম। অনেক কম। নব তোমাবট জনো
কিন্তু এবকম কম কিছুদিনের মধ্যে নাও
ধাকতে পারে। তখন তুমি কি লববে?
আচ্ছা, এবকম কবে বললে কবে না বুকে
মধ্যে গুড়গুড় করে ওঠে!

মনোবমা কথা বলতো না
তখন তো সে কোন বর
জানতো না। কথা জেনেছিল মনোবমার,
অনেক পবে, অনেক দূরখে। সে কথা
এখন থাক। মনোবমা আঁটেপটে চোঁজবে
ধরতো শান্তিনাথকে ভালোবাসার ভয়।

শান্তিনাথ সন্দেহে বলতেন, আমাব
মবণের পর তুমি কিন্তু এ'র থেকে
না। ঈশ্বর-ফিলস নাচে দখা।
সন্তান অবশ্য ভালো চিনিস।
কিন্তু তা' চেয়েও ভালো তার ম'নই
থাকা আমাব পবে তোমাকে যে ভাণো-
বাসতে চাইবে। অশ্রুত 'অশ্রুত' বাতাক,
বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে অলসভাবে মনো-
ফ্যাল করে মনোরমা চেনে চেনে যে তা
শান্তিনাথকে। শান্তিনাথ মনো-
হাসতেন। এ'র চেয়েও অবাক হবার প'না
আসতো যখন শান্তিনাথের গিরিগিড়ি ভেলে
যাবার সময় আসতো।

বুঝ বিষয় মনে শান্তিনাথ তখন
ডাকতেন মনোবমাকে। গম্ভীরভাবে
বলতেন, যাবার ভাড়া নেই আমার কাছে।
তোমার কাছে আনা জেঠামশাই ঠিক
পছন্দ কবেন না। কখন এ'রটা ভাঙে।
কাণগটাও অশ্রুত। সেই এ'রই বাতালি।
তুমি পান সাজা জানো না। তোমাব
লক্ষ্মীর ভাতারে আছে কিছু ব'লু তা?

বাঁতিমত চমৎকৃত হয়ে মনোবমা রূপ-
নগরের মেলায় রঙবেরঙের চাড়ি, জোটে
সিঁদুর, তবল আঁতা, হিমালী পদুম নাচ
দেখাবার জমানো পয়সাব দবটাই শান্তি-
নাথের হাতে তুলে দিতো। টাকার কটি
ব্যাগের মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে ম'খটা



শান্তিনাথ মনোরমার খোঁপায় জড়ানো বেলকুণ্ডের মাথার ঘ্রাণ নিতে নিতে
বলতেন

শান্তিনাথের অসম্ভব বিবর হয়ে উঠতো। শান্তিনাথ নিম্বাস বন্ধ করে থাকতেন। বোঝা যেত, বুকের মধ্যে দারণে একটা ব্যস্ততা হচ্ছে। অতি কণ্টে আস্তে আস্তে শান্তিনাথ বলতেন, এই শব্দ হল। এ এক অসম্ভব খেলা। এ খেলার তুমি শব্দ দিয়ে যাবে। আর আমি মধু বুজে নিয়ে যাবো। তোমাকে কখনো আমি কিছু দোব না।

মনোরমা এ কথা শুনে অর্ধটুকু সেদিন রুদ্ধতো। মনোরমা মনে করতো! প্রত্যেক স্বামীর যে ইচ্ছেটা হয় তার স্ত্রীকে কিছু কিনেদেতে দিতে, যে কোন কারণেই হোক, সেই ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারছে না বলে প্রত্যেক প্রেমিকের মত একটা বুক-ছেঁড়া ব্যস্ততা হচ্ছে হয়তো শান্তিনাথের। কিন্তু এ কথা আরো এক গভীর তাৎপর্য ছিলো। আদ্যে এক গঢ় সংকেত ছিলো। যেখানে পৌঁছোতে মনোবাক্যে আরো অনেক বছর, অনেক সময়, আরও সবশ্রেষ্ঠ

অংশগুলির অপচয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

শান্তিনাথ চলে গেলে মনোরমা আবার গল্পার ঘাটে বটগাছের ছায়ায় বসে জলের ঢেউ গুনতো। এই বাঁধানো বটগাছটি তাকে কেন এতটা টানে এসব গভীর রহস্যের কথা বোঝবার সত্যি তখনো তার সময় আসে নি। একদিন যখন সংসার সমাজের প্রতি তীব্রবিরক্ত হয়ে, চারিদিকের মার খেতে খেতে কালাপালা হয়ে কোথাও একটা জড়োবার মত জায়গা চোখে পড়বে না, তখন রূপনগরের প্রতিটি হতভাগিনী মেয়ের মতনই এই বাঁধানো বটগাছটির তলায় চান করবার অছিলায় তাকে এক একদিন আসতে হবে। রূপনগরের ঘরে ঘরে চৈত্রদিনের-শিমূল-ফাটা হাহাকার। প্রতিটি মেয়ের বুকে গম্বুজে গম্বুজে ওঠা ধোঁয়া। চোখে চোখে ছাই। কে তাদের বাধা বুঝবে? তখন ভীষণ ভালো এই নদী। কেন না সে কুটিল আয়তন।

তখন ভীষণ ভালো এই ফটগাছ। না তার বটের ঝুরিতে অনেক দূরের হাতছানি।

এই সব ঘটনাব তীক্ষ্ণ চোখ এঁড়িয়ে মনোরমার একদিন জুইকদল ফটগো। বাধার কেঁপে উঠলো মনোরমা। তাৎপর্য তার কোলে এলো।

শান্তিনাথের জেঠামশাইকে আদিত্যের মনে নেই। যদিও বছর পাঁচ বয়েস পর্যন্ত আদিত্য শান্তিনাথের জেঠামশাইকে দেখেছে।

জেঠামশাই মারা গেলেন অসুস্থভাবে। এসব তখনকার কালের মরণ। এখন আর এভাবে কেউ মরে না। শরীফটা ইদানীং তাঁর খারাপ হয়ে আসছিল। কোন কিছুতে বিশেষ খেয়াল রাখতে পাবতেন না আর। চট করে চটে উঠতেন। হয়েছিল কি, কে একজন বাড়িতে এসে তার বরান্দার চাল পায় নি। হয়তো গোলমালে বাড়ির চাকরের চোখ এড়িয়ে গেছে। বরান্দার চাল যে পায়নি সে চলে না গিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে, জেঠামশাই দেখানে ঠান্ডা বিছানায় সেদিন বেশ একটু জ্বর গায়ে শুষে আছেন, সেখানে গিয়ে নালিশ করে।

এই কথা যেই না শোনা, রাগে অগ্নি-শর্মা হয়ে গেলেন শান্তিনাথের জেঠামশাই। মাথার মধ্যে কিছু একটা কন্ডুশন শব্দে বেজে উঠলো। পায়ের তলায় মাটি যেন ঠেলা দিলো। চাঁৎকার কবে বললেন, অতিথি নারায়ণকে বাড়ি থেকে ফিরিয়ে দিলে? আজ থেকে আমি জলগ্রহণ করবো না। সেদিনটা তাঁকে কেউ খাওয়াতে পারলো না। তার পরের দিনও না। তার পরের দিন খেলেন সামান্য। তাবপর গুরুতর অসুখে পড়লেন। ডাক্তার মৃত্যুর পর বলেছিলেন, পর পর দুদিন অনশনই এই কালরোগের জন্যে দায়ী। বৃষ্টি মারা গেলেন। পিছনে রেখে গেলেন দীর্ঘতর দীর্ঘস্থায়ী দিন আব এক ছিন্নিচ্ছিন্ন মানব।

জেঠামশাই-এর গুরুতর রোগে মারাত্মক রাত জাগার জন্যে শান্তিনাথ সাংঘাতিক অসুখে পড়লেন। অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রইলেন হুঁমাস। মনোরমা তখন গিরিডি়র বাড়িতে। ইঠাং সেও রোগে পড়েছে। চাকরবাকব-ছাড়া দেখবার কেউ নেই। আদিত্য তখন আট বছরের বালক। তাকেই তখন মা ও বাবাকে ওষুধ খাওয়াতে হত। একপাশে অনেকক্ষণ শুষে থাকার দরণ ব্যাধি হয়ে গেলে আস্তে আস্তে আর একপাশে চাকরের সাহায্যে আদিত্য বাবা ও মাকে ফিরিয়ে দিতো। হাতে পায়ে, মাথায় টিপে দিতো। পাখার বাতাস করতো। জলের গ্লাস ধরতো মধু। বলতে গেলে আদিত্যের জ্ঞানই হল অসুস্থ মানবকে দেখতে দেখতে। আদিত্য খুব ছোটবেলার স্মৃতি বলতে অনেক বড়ো হয়ে

লেবেল-স্মাট। কয়েকটি ওষুধের শিশি, শিশির লালরঙ ওষুধ, কয়েকটা কাটা ডাব, বিছানায় মৃদুবা বাপ-মা, 'জল দে', 'হাওয়া কর', 'মাথাটা একটু টিপে দে না বাবা' ইত্যাদি কাতোরোক্তি, এর বেশি আর কিছু ভাবতে পারতো না। বস্তুত আদিত্যের ছেলেবেলার স্মৃতি-স্মৃগা আর মস্তগাবন্ধ পিতামাতার দাঁপিগহীন চোখের আলোয় ভরা এক কুস্মেনের শ্বস্ব ব্রগত। মৃত্যুদুঃখে পদশব্দে ভরা নতুন চেতনার এক ভয়ংকর পৃথিবী। শান্তিনাথ একটা ভালো হলে মনোরমার ভাই শঙ্কর গিরিাড়র বাড়িতে ভাড়াটে বসিয়ে বৃপনগরে নিয়ে আসে। শান্তিনাথ, মনোরমা আর আদিত্যকে। বৃপনগর থেকে কোলকাতা খুব কাছে। কোলকাতার সেরা ডাক্তার দেখিয়ে শান্তিনাথকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে তোলা। তাছাড়াও আরি একটা গুরুতর উদ্দেশ্য ছিলো। শান্তিনাথ যেন ভাবেন তাঁর জ্যেষ্ঠমশাই মরে গেছেন বলেই সংসারের দয়া মায়া, স্নেহপ্রীতি সব মবে যায় নি। শব্দব্যাধি বলে একটা জায়গা আছে। শাল্য সম্বন্ধী বলে একটা কথা আছে। শব্দব-শব্দব্যাধি বলে দুটি শব্দ আছে।

একটা কালো মোটরগাড় প্রচণ্ড কড়-জলের ভেতর দিয়ে তাঁর তেড্ডলাইট জ্বালিয়ে উদ্দেশ্যের মত ছুটে চলেছে বহুদিন এই শ্বপন আদিত্যকে মধ্যরাত্রি ঘুম ভাঙিয়ে আতঙ্কে, শংকার শিউরে তুলেছে। গাড়িটা চলছে খুব দ্রুত, তাদের সিনজনের মাথা রক্তে ডেসে গেছে, পরস্পরের মুখ চেনা যাচ্ছে না, আর দুজনের ব্রহ্মচৈব মত শব্দ ওয়াইপার দাঁটি সারিসরি ওপব নড়াচড়া করছে।

আদিত্যের বাবা সেই যে বৃপনগরের শব্দব্যাধিতে খুঁটি গেড়ে বসলেন, তারপর সেখান থেকে বহু বছর আর নড়েন নি। আদিত্যের মায়ের লজ্জা লাগা খুব স্বাভাবিক। এ কিরকম মানব। বৃষতে চাইছে না মেরেমানুষের লজ্জা। মেয়ে-মানব কি পারে বাপেরবাড়িতে বেশীদিন বসবাস করতে? তাছাড়া একা নয় গুদীষ্ট-শব্দ? জামাই না ভূমি? ভূমি কি করে পারলো বছরের পর বছর এক জায়গায় রইতে? এ কিরকম পরুষ ভূমি? এ কিরকম রোগ তোমার? ডাক্তার বলছে, রোগ নেই। এখন তোমার হাটা চলা, কাজকর্ম দেখা চলে। কোন গন্ড-গোল নেই। তবুও ভূমি এখানে থাকবে? গিরিাড়র বাড়ি থেকে বিপজ্জনক খবর আসছে। সামনের দিকের বারান্দাটা ঝুঁকে পড়েছে। যে কোন মুহূর্তে ওটা ভেঙে পড়তে পারে। তখন বাড়ির মালিকের হাতে দাঁড় পড়বে। ভাড়াটেরা, মালিক নেই জেনে যা ইচ্ছে তাই করছে। তিন মাস, চার মাস ভাড়া ফেলে রাখছে। ইচ্ছে মত দু'একখানা ঘর নিয়ে কেউ কেউ

আছে। চাকর-বাকর লটপাট করে ভেগে পড়েছে। এসব কি হচ্ছে? কিছুই দেববে না তুমি? এই সব ভাবতে ভাবতে, এই সব নিয়ে চিন্তা করতে করতে মায় চাক্ষুশ বছর বয়সে মাথাব চলে পাঁকয়ে ফেলল আদিত্যের মা। শান্তিনাথের দুটা বড় বড় শান্ত চোখ, তাঁর সংক্ষিপ্ত কথা-বাতা, সৌম্য আচরণ, নিয়ে মনোরমার একাদন বড় গর্ব, বড় ব্যথা ছিল। মানুসটা অন্য মানুসের মতন নয় এই নিয়ে ছেলে-মানুষি আনন্দ আর বৃষতে না পারার একটা বাণিকাসুলভ আভমান। সে গর্ব আর সে ব্যথা রইলো না। মোহ ভেঙে গেল। পুরাতন বিরোধের জায়গায় দেখা দিল নতুন বিরোধ। পুরাতন জিজ্ঞাসার জায়গায় নতুন জিজ্ঞাসা। কিশোরীবেলা থেকে সম্পূর্ণ বৌবনের তটপ্রান্তে আছড়ে পড়ে মনোরমার সমস্ত আলো-আঁধারি স্বন্দ সমাপ্ত হল। শব্দ হল আর এক শব্দের হৃদয়বিদীর্ণ কাহিনী। কিন্তু তখনো মনোরমা তেমন মূখ বোলে নি। নতুন অবস্থাটাকে বৃষতে চাইছিল। চারিদিকে হিমকুয়াসার মধ্যে কোথায় আছে অগ্নিকোণের সংকেত! দিশেহারার মত অব্বেষণ করছিল মনোরমা। কি হবে? কেমন করে বাঁচবে? বাঁচবে কেমন করে আদিত্যকে? কি করে এই অশুভ মানুসটিকে রক্ষা করবে? পৃথিবীর সব আলো যেন নিভে গেছে। তার বাপের বাড়ির সবাই তার দিকে কেমন করে যেন চাইছে। বৃষদ্রা, যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তারা এসে বলছে, 'মনো, শক্ত হ। শক্ত হাতে হাল ধর।' শক্ত হাতে হাল যে ধরবে তো হালটাই বা কোথায়? একজন তো বলেই বসলো, এর চেয়ে বেশবা হয়ে থাকা ছেল চেব ভালো। কি কপালই করেছিল মনো! মনোর শিবপূজা এ্যাদিন সাথক হ'ল।

কি লজ্জা আর কি ঘেন্না! যে বাপের বাড়ি থেকে অনেক টাকা খরচ করে একদিন সম্মানের সঙ্গে শব্দব্যাধি স্বামীঘর করতে গিয়েছিল মনোরমা আর আজ সেই মনোবমাই নিজের বাপের বাড়িতে দেখ ফিরে এসেছে। শব্দ তাই নয় স্বামী আর ছেলেকে বাপের বাড়ির কাঁধে ফেলে দিয়েছে। এ লজ্জা, এ ঘেন্না রাখবাব জাষণা নেই।

অতি দ্রুত সংকোচ কেটে গেল মনোরমার। পেরাজের খোসা ছাড়ানোর মত মনোরমা মোহের শেষ চামড়াখানা ছাড়িয়ে ফেলল। দুর্ভাগ্য বছর ধরে তার চলার চাকাটা স্তম্ভ হয়ে গ্যাছে। সেই অচল, জড়স্বব চাকাকে চালাতে হবে। লোকটাকে মরণের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রাস্তাব মোড়ে দাঁড় করাতে হবে। ব্যর্থ হয়ে সরে থাকতে দেবে না মনোরমা।

মনোরমা বোঝাতে লাগলো শান্তিনাথকে। শান্তিনাথ স্তম্ভ হয়ে মরণ-

যন্ত্রণারও অধিক লেই মনোরমার মতন সহ্য করতে লাগলেন।

প্রাত্যাদন নিয়ম করে মনোরমা এ-যেয়ে কথাগদ্বাল বলতো। ওঠো তুমি এ তুমি কি করছো? আমাকে দেখবে না? দেখবে না তোমার ছেলেকে? এতলে আমি কি করে থাকি বৃষতো জা? বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে। চলো যা আমরা গিরিাড়র বাড়িতে যাই। তেজ কবে এসেছিলে এখানে তেমন করে এসে যাবে। কোন অনুনিধে হবে না। বাস, তাহলে বলি!

শান্তিনাথ অন্যবার হয়ে বাস লেই একই উত্তর দিতেন আন্তে আন্তে। বলতেন, গাড়িতে উঠে আসি ঘরে বসো। মনোরমা বলতো, তখনো এলে কি করে এখানে? শান্তিনাথ কতলে, তখনো এলে ঘরে চলে এসেছি। তেমনা এখন আর আমাকে কিছু বোনা না। আমি মৃত্যু এখানে থেকে কোথাও যেতে পারলো না।

সবদা হাতের নাড়ি টিপে যা আছেন। এই বৃষি হার্টকেন করেন। মৃত্যু শেষ হয়ে গাল। গাধার চুল এত মেলা। মুখে বিবদ। বৃষালে বৃষা মৃষিচিন্তা। চোখের পাতা বৃষা-ভারি। আদিত্যের বাবা তার মৃত্যু বাড়ির বাইরের দায়গায় ঢুপ করে রাখাছেন; এই ছবি আদিত্যকে তখন মৃত্যু হত অনবরত।

শান্তিনাথ শব্দ চুপচাপ থাকতেন। কখনো কখনো চান্দ্রান চলে গাড়ি গুণতেন। ডেকে ডেকে গা-সঙ্গে আলাপ করলেন। মৃত্যু-ব্যাধি তাঁকে বেশ কায়দায় পেয়েছিল। গা-আর করে কি, পরাহর্ন দেয়া মানব বাবা ততোদিনে মৃত্যু-ব্যাধি সর্নিশিত ভাগ্যের অধিকারী হয়ে গিয়ে মা হয়ে গেছেন পানল, ছোট ভাই-

হোমিওপ্যাথী জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী

অমূল্য গ্রন্থনকল—

ডাঃ প্রসাদ বন্যোপাধ্যায়ের

১। অব্যর্থ ঔষধ (৪র্থ সংস্করণ)—২.৯০
(এ্যালোপ্যাথী এন্টিবায়োটিক্সের হাও
হোমিও ঔষধ, জন্মানিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি
আলোচিত গ্রন্থ)

২। করোনারী প্রসিস—১.০০

৩। দস্তরোগ চিকিৎসা—১.৫০

৪। অম্ল অজীর্ণ রোগ—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা, এম ভট্টাচার্য
কোং, হ্যানিম্যান পার্বলিশিং কোং-
কিং এন্ড কোং, ন্যাশনাল হোমিও
লেবরেটরী, সি বিংগাল। হাওড়া—
হাওড়া হ্যানিম্যান হল, হাওড়া মসাদান
হাওড়া।

প্ৰথমশে' নিজেই আদিত্যকে নিয়ে মাঝে মাঝে গিঁরিগিঁড়ি গিয়ে ওখানকার বাড়ি দেখাশোনা করতে আরম্ভ করে দিব। আর নিঃসঙ্গতায়, গ্রাসে, যন্ত্রণায় একেবারে জঞ্জারিত হতে থাকলেন শান্তিনাথ। শান্তিনাথ কখনো ক্ষুদ্রতা জানতেন না। তাঁকে জানতে হ'ল সুদূরত। শান্তিনাথ মানুষকে ছোট চোখে দেখতেন না। তাঁকে মানুষকে ছোট চোখে দেখতে হ'ল! ক্ষুদ্র জ্ঞানসেব মধ্যে তাঁকে বছরের পর বছর থাকতে হ'ল। কখন, কোন পথে আসবে নিপীড়ন, অসুখহীন শান্তিনাথ সেই ভয়ে সর্বদা আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন।

ছোট ভাই মনোরমাকে বলতো, তুমি এখানে থাকবেই বা কেন, আর আমরা থাকতেই বা দোষ কেন? তোমার ছেলেকে ঘাওয়াবে কে? কে তাকে লেখাপড়া শেখাবে? উত্তর দেবে না? আচ্ছা উত্তর একদিন দাও কি না দাও দেখা যাবে।

তারপর সেই অমানুষিক বর্বরতা! করতো কি, ঘরের মধ্যে আটকে রাখা লক্ষ্মী প্রতিমার মত সুন্দরী, বিদ্যাদময়ী নিজের উন্মাদিনী মাকে বেধড়ক ঠ্যাঙাতো। শান্তিনাথের মনে হত চাবুক প্রত্যেক মার যেন তাঁর পিঠেই পড়ছে।

প্রায় প্রতিদিন মনোরমার ছোট ভাই এসে প্রায় একই ভাষায় অমানুষিক ভয় দেখাতো। এও ওর একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অসাধারণ সংযমেব সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করতেন শান্তিনাথ। মনে হত প্রাণ বৃষ্টি বেরিয়ে গেল। কোন কথা বলতেন না শান্তিনাথ। নিজের মৰ্যাদা কোনক্রমে রক্ষা করতেন। আর উত্তর না পেয়ে ছটফট করতে কবোত মনোরমার ছোটভাই চাবুক হাতে ঘরে বসে করে রাখা নিজের পাগলী মাকে বেধড়ক ঠ্যাঙাতো। বন্য জন্তুর মত শ্বাশুড়ি গোঁ গোঁ করে আগ্রাস্ত করতেন।

আর প্রত্যেকটি চাবুক, ঈশ্বরের দানের মতন, নিভুল সবলতায় তাঁর ঘাড়ে মাথায়, পিঠে এসে পড়ে তাকে রক্তাক্ত জলপিরিত করে দিতো।

অথচ তাঁর চারপাশে চলতো জীবনের উৎসব। হুসু, মৃত্যু, বিয়ে মৃত্যুর এই সংসারের দিকে তিনি সজ্ঞ চোখে চেয়ে থাকতেন।

কিন্তু কোথায় যাবেন শান্তিনাথ? ঘর বৃন্দ। হুদয় মহাভয়ে আড়ষ্ট। হিমশীত গলিয়ে দেবার মতন তখন ধারে কাছে কোন আগুন ছিলো না। এরকম অসুখ অবস্থায় যে তাঁকে সাস্থ্য দিতে পারতো সেই মনোরমার সঙ্গে শান্তিনাথের দেখা হবার আর উপায় ছিল না। সে তখন অবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশভাব কোনরকমে মাথায় জড়িয়ে নিয়ে কৃশাশতায় মতন উড়তে উড়তে শুকনো পাতার মতন পড়ছে জীবনযন্ত্রণায়। আর নির্জন নিঃসঙ্গ মানুষটি তখন পৌষের অন্ধকার



ছোট ভাই মনোরমাকে বলতো—তুমি এখানে থাকবেই বা কেন

রাতে জীবনের প্রায়টকমে একা একা দাঁড়িয়ে। আদিত্যের বাড়ির দেওয়ালে দুটি ছবি আছে, আদিত্যের বাবা আর মা-র। একটি যখন মনোরমার সবে চোন্দ বছর বয়স। আদিত্যের মা শুন দবখ। বাড়ির পাশের পেয়াবাহার ডাঁসা পেয়ারায় কামড় দেবার ইচ্ছেটা আশতত স্থগিত রেখে সেই বেচারী নাক নোলক, পবনে দেউগজী বেনারসী, জব্দবন্দ, পুতুল পুতুল, গোলগাল, ভালো মানুষ এমন এক পক্ষীবাঁলিকা যে পানটো সাফত জ্ঞানে না পরিপাটি, তাড়াতাড়ি কামেরাব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই একই ছবিতে একজন বাবুমানুষকে দেখা যাচ্ছে। কোঁচ-কানো কেশদাম। সুঠাম, বলিষ্ঠ শরীর।

গলায় তখনকার স্টাইলে পাকানো চান্দর। হাতে ছড়ি। চোখে প্যাসনে। শান্ত, বয় বড় চোখ।

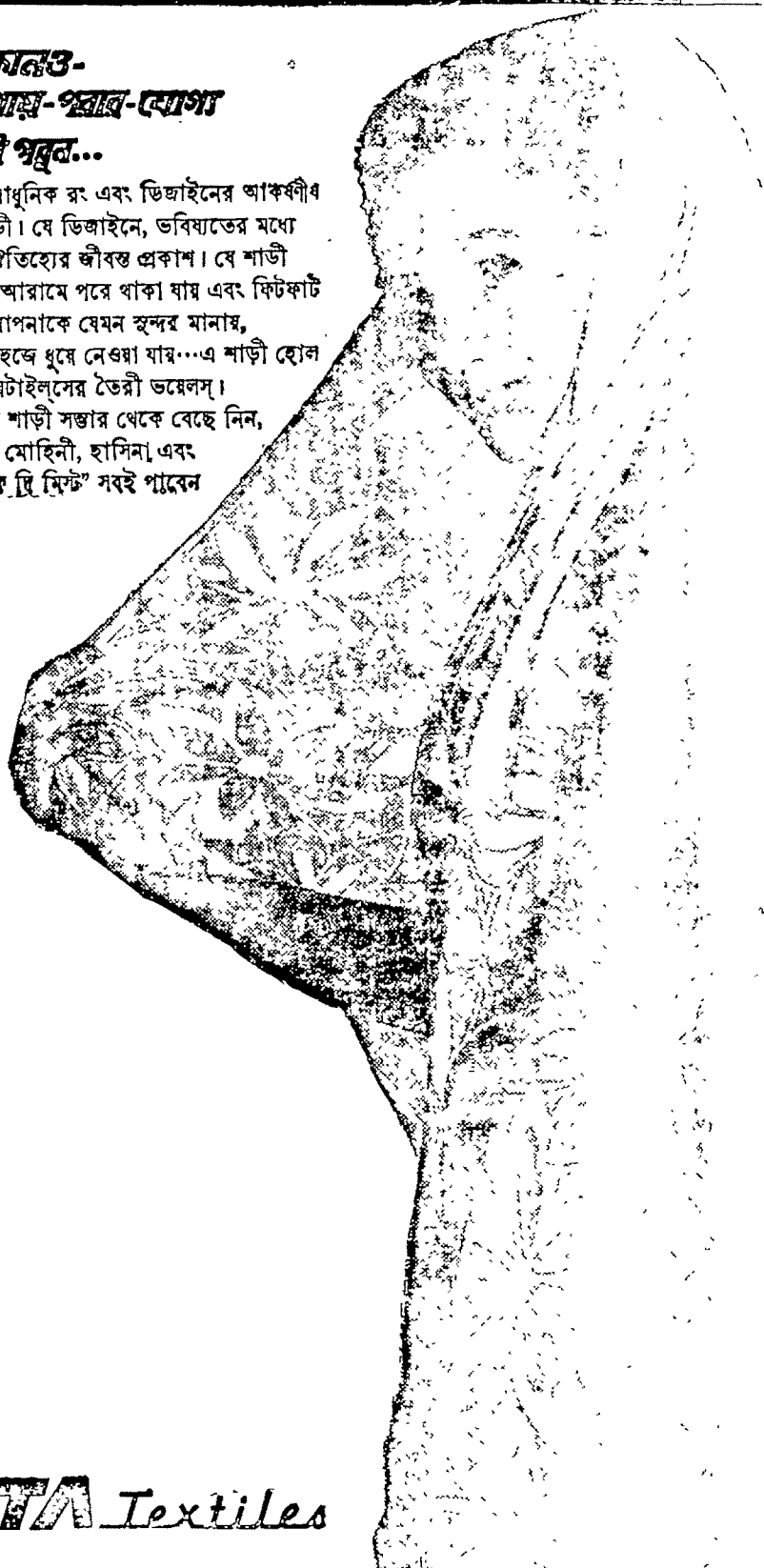
আরো এক ছবি আছে যখন আদিত্যের বাবা রূপনগরের শ্বশুরবাড়িতে বাস টাল। মাটল ঝড়ে শুন্যে ভাসছেন। আদিত্যের বাবার চোখ দুটি অস্বাভাবিক বর্ণহীন। কিস্পস্ত পাকা চুলের রাশ। মুখে অদ্ভুত আতঙ্ক। আদিত্যের বাবা এ ছবিতে দাঁড়িয়ে নেই। ক্রান্ত, অবসন্ন মানুষটি চেয়ারে বসে পড়েছেন। আদিত্যের মা দাঁড়িয়ে আছে। ছবির দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায় তার চেহারা মাথো বিস্ময়কর ভাঙাগড়া আরম্ভ হয়ে গ্যাছে। অন্য কিছু উল্লেখ না করেও বলা যায় বড় বৈশিষ্ট্যময়, বড় তীক্ষ্ণ তার সালের দৃষ্টি। যেন সংসারের সমস্ত সাজানো মোহ ভেদ করে সেই দৃষ্টি কঠিন, রুঢ়, ভীত বাস্তবকে স্পর্শ করেছে।

দ্বিতীয় ছবিতে আদিত্য আছে। সবে বড় হয়ে ওঠা ছেলোটর কপাল মসৃণ নয়। সেখানে কোঁচকানো প্রশ্ন। চোখের দৃষ্টি সরল নয়। সেখানে অতল সংশয়।

রূপনগরের শ্বশুরবাড়ির সে সময় গৃহিণী ছিলেন মনোরমার এক কাকী। তিনি সংসার দেখাশুনো করতেন। কাকা রেলের চাকরী করতেন। তিনি বোশির ভাগ দিন বাড়িতে থাকতেন না। মদ খেয়ে ফাল হয়ে পড়ে থাকতেন এখানে-সেখানে। তিনি মূখে শান্তিনাথকে কিছু বলতেন না। ভাতে মারতেন। সাত্য সাত্য ভাত কম করে দিতেন। একটা হেলাফেলার তরকারী আর স্বচ্ছন্দে নেবে সাতার দেওয়া যায় এমন জলীয়, ভাল নামে এক অদ্ভুত বাটি ভর্তি রান্না। জামাইকে সপূর্ণ অগ্রাহ্য করে মনোরমার ভাই-এর পাতেই ঢেলে দিতেন ঘি। দৃশ্যটা বিদ্রী। কিন্তু এসব তাঁকে স্পর্শ করতে পারতো না। সুদের কারবার করে করে তাঁর মনটা একেবারে শূন্য হয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। মনোরমা এসবই কেমন করে যেন জানতে পারতো। শান্তিনাথ এসব কথা নিয়ে মনে মনে আন্দোলিত কর যে মনোরমাকে বলবেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মনোরমার আর পাঁচজন স্ত্রীর মতনই প্রাণশক্তি ছিল। ও সামনাসামনি কিছু পাওয়াতে পারতো না বটে শান্তিনাথকে। কিন্তু বিকলাবেলা প্রায় প্রতিদিন নিয়ম মত পয়সা জোগাড় করে খাবার কিনে শান্তিনাথকে খাওয়াতো। মনোরমা বুকতে তার স্বামীর অমৰ্যাদা হচ্ছে। এবং এ অমৰ্যাদা যে স্বয়ং তারই এটা বয়ে মনোবদ্য স্বামীর ওপর আরো বিরূপ হয়ে যেতো। যার স্বামী অধব, একটা পয়সাও যে উপায় করতে পারে না, যেটুকু বা ভাড়া বাবদ পাওয়া যায় তা স্বামীর কাম্পনিক রোগেই ব্যয় হয়ে যায়, তাঁর বৌ হয়ে থাকতে গেলে বাপের বাড়িতেও স্ব-

**যে-কোনও-
জায়গায়-প্রবল-যোগ্য
শাড়ী পূর্ব...**

বিচিত্র, আধুনিক রং এবং ডিজাইনের আকর্ষণীয়
নতুন শাড়ী। যে ডিজাইনে, ভবিষ্যতের মধ্যে
অতীত ঐতিহ্যের জীবন্ত প্রকাশ। যে শাড়ী
সারাদিন আরামে পরে থাকা যায় এবং ফিটকাট
থাকে। আপনাকে যেমন সুন্দর মানায়,
তেমনি সহজে ধুয়ে নেওয়া যায়...এ শাড়ী হোল
টাটা টেক্সটাইলের তৈরী ভয়েলস্।
বৈচিত্র্যময় শাড়ী সম্ভার থেকে বেছে নিন,
ভারমধ্যে মোহিনী, হাসিনা এবং
"যেভ অফ দি মিস্ট" সবই পাবেন



TATA Textiles

এর বেশি মর্শাদা পাওয়া যায় না। অনগ্রহেব বেশি আদর আকাঙ্ক্ষা করাও কথ'হীন। বেলা তিনটে চারটেব সময় স্কুল থেকে ফিবে আদিত্য দেখতো তার মা উনুনের পাশে কুঁকড়ে মুকড়ে বসে ডাত খাচ্ছে। ভাত খাওয়া হবে যাবার পর আদিত্য দেখতো তার মা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে। তাব রোজগেরে ভাই-এর আহ্বাদে বোঁ-এর।

বিষয় থাকতে বিষয় নেই। কেন না দেখাশুনো কে করবে? কে খোঁজ করবে শান্তিনাথের জ্যেষ্ঠামশাই কতোগুলো চা-বাগানের শেয়ার কিনেছিলেন? কতোগুলো শেয়ার এখানে শান্তিনাথের নামে অবশিষ্ট আছে? কে তজ্জাস করবে যে চোন্দ বিধে ছর্মি শান্তিনাথের জ্যেষ্ঠামশাই বর্ধমানে কিনেছিলেন সে সব কেমন অবস্থায় আছে? বড় বড় পুকুরগুলোতে কেন একছটাক মাছও পাবার উপায় নেই? কেন ভাড়াটেরা নিজেরাই শান্তিনাথের ভাড়াটে বাড়িতে মোটা ভাড়া বসচ্ছে? ভান্ডা দিচ্ছে না কেন ঠিক মত? এসব হিসেব যিনি রাখবেন তিনি ত' অষ্টপ্রহর হাতের নাড়ি ধরে বসে আছেন। অনববত মরে যাবো মবে যাবো' কবছেন। আদিত্য তখনই বুঝতে পেরেছিল তার মায়ের কোন সান্থনাই অবশিষ্ট নেই। যদি তার বাবা অসুস্থ হতেন, পংগু হতেন তাহলে মনকে বুঝ দেওয়া যেতে পারতো। কোন রোগ নেই অথচ মানবটি দিন দিন ব্যাড়া হয়ে যাচ্ছেন বসে বসে। স্লান ও বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ, সুন্দর দুটি চোখ। এ দুঃখ কি তার মা সহ্য করতে পারে? চোখ কেটে কি সত্যি জল আসে না?

কোন কোন দুপুরে স্কুল থেকে ভাড়া-তাড়ি ছুটি হয়ে গেলে কোনরকম বই-খাতা ফেলে আদিত্য এখন মামাবাড়ির পাশের বিঘাট জঙ্গলের মধ্যে তার এক-মাত্র সঙ্গী কাশীব পোষাবাগাছের মগ-ডালে বসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়তো, কিংবা একগলা বনের মধ্যে পায়ের তলার মচমচে পাতা মাড়িয়ে শুধু, দূরে আরো দূবে তার হেঁটে হেঁটে চলে যেতে ইচ্ছে করতো, তখন শান্তিনাথ বড় ব্যস্ত হয়ে তাকে ডাকতেন। আদিত্য তার বাবার কাছে যেতে চাইতো না। সে সঙ্গ সব কথা বোঝাবার তার বয়েস নয়, তবু নানা কাবণেই সে বিজ্ঞ হয়ে উঠছিল। একথাটা সে বুঝেছিল তার বাবার এই অশ্রুত রোগটার জন্যেই তার মায়ের নিজের বাড়িতে রাধুনীরও অধম হয়ে থাকা, তার স্কুলে মাসেব পর মাস মাইনে বাকী পড়ার দরদে শিক্ষাবদেব এমন কি ছাত্রদেব কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞাব দুর্দান্ত কুড়োনো। রেটাছেলে, পুরুষমানুষ বলতে যে ধারণা তার ছিলো, সে ধারণা তার পুঁজ হয়েছিলো মায়ের শব্দমাকর্ষ ভাই অর্থাৎ তার মামাকে দেখে। বেটাছেলে হতে

গেলে অর্মান হওয়া চাই। গাঁক গাঁক করে রঘুডাকাতের ভাঙতে কথা বলা চাই। বেয়াড়া লোককে পিটিয়ে শালেশতা করা চাই। কোনরকম দয়ামায়া থাকলে আর বাই হোক, বেটাছেলে হওয়া যায় না। এই জন্যে আদিত্য তার মামার তার দিদিমাকে ঠেঙানোও একরকম বরাদ্দান্ত করতো। তার ধারণা ছিলো, এ কাজটা দোষের, কিন্তু বেটাছেলের এসব কাজ ততোটা দোষের নয়। আর যে মন্দির দেখতো যতো জীর্ণ, যার দেবতা যতো ভগ্ন, সেই মন্দির আর সেই দেবতা ততো জীবন্ত, জাগ্রত ছিলো বালক আদিত্যের কাছে। আদিত্য কখনো কখনো গভীর নিষ্ঠায় হাতজোড় করে, কখনো কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করতো, ভগবান আমায় শক্তি দাও। আমার মাকে শান্তি দাও। আমার বাবাকে ভালো করে দাও। 'আমাকে শক্তি দাও'—এই কথাটাই আদিত্য বেশি করে ভগবানের কাছে চাইতো মনে মনে শক্তি অনুভবও করতো। আর আদিত্য তার বাবার কাছে তেমন যেতো না। খালি তার ভয় হ'ত যদি সে তার বাবার মতন হয়ে যায়! যদি তাকেও একদিন 'মবে যাবো মরে যাবো' বলতে হয়! শান্তিনাথ বড় ব্যস্ত হয়ে তাকে ডাকলে আদিত্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। শান্তিনাথ বলতেন, দ্যাখ তো, তোর মা কোথায় গেল। দ্যাখ, দ্যাখ। এখনো চান করে ফিরলো না গঙ্গা থেকে। বোধ হয় সেই বটগাছটার নিচে বসে আছে। বুঝলি, জোর করে ডেকে নিয়ে আসবি। তোর মা না এলে আমি বাঁচবো না।

এক ছুটে আদিত্য চলে যেতো গঙ্গার ধারে।

খাঁ খাঁ দুপুর। গলানো পাঁচ করে পড়ছে তামার পাতে মোড়া আকাশ থেকে। পাকে পাকে ধুলো উড়ছে বিশাল প্রান্তরে। একপাশে শ্মশান। একপাশে বটগাছ। কেউ কোথাও নেই। সামনে তার মায়ের নিবিড় বৃক্কেব মতন বাঁস্তীর্ণ গঙ্গা। সেই বটগাছের তলায় হাটতে মুখ ডুবিয়ে কাঁদছে তার মা। বৃক্কের মধ্যে আদিত্যের দ্রুত নিশ্বাস ওঠা-নামা করতো। চোখের পাতায় জড়িয়ে যেতো কাষা। কেঁপে উঠতো গলা। আদিত্য রুদ্ধগলায় বলতো, মা, মামো।

সঙ্গে সঙ্গে দবজা খুলে যেতো মনো-রমা'ব সামনে তখনকার মতন। মনোরমা আদিত্যকে বৃক্কে জড়িয়ে ধরতো। মনোরমা বলতো, তোর বাবা এইবকম। তাকে মানুস হতে হবে আদিত্য। আদিত্য বিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলো ক্রমশ। সে তখন বলতো, আমায় মানুস কব মা।

চোখের জল মুছে মনোরমা আদিত্যকে মানুস করতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত আদিত্যের মা অথর্ব

স্বামীকে নিয়ে রূপনগরের অন্য পাড়ার অন্য এক বাড়ির একটিমাত্র ঘর ভাড়া করে বাপের বাড়ি থেকে উঠে গেল।

মামাবাড়ি ছেড়ে আসবার সময় আদিত্যের মামা—আশচর্য, তার বাবার একথানা হাত ধরে কেঁদ ফেলেছিলো। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলো, জামাইবাবু, অনেক অপরাধ করেছি। কিন্তু উপায় ছিলো না বলেই। কাছাকাছা নিয়ে আমার এতোবড়ো সংসার। উপাস্নী বলতে কেবল আমি। যা হবে গ্যাছে কিছু মনে কোরো না জামাইবাবু।

তারপর আদিত্যের মাকে বলেছিলো, অন্য পাড়ায় চলে যাচ্ছি বলে আমাদের ভুলে যাস না। বিপদে-আপদে ঠিকই পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

বিশ্মিত হয়ে আদিত্য দেখেছিলো তার বাবা আব তার মায়ের মুখ তার মামার এই কাষায় একটুও নরম হয় নি। ওঁরা কেউ কোন জবাব দেন নি মামার কথায়। কঠিন দুটি ব্রঞ্জের মূর্তিতে একটা আশ্চর্য নির্বিকার ভাব ফুটে উঠেছিলো। পরে বড়ো হয়ে জেনেছিলো আদিত্য পাথরে মাথা ঠকতে ঠকতে যাদের যেতে হয়, তাদেরও একরকমেব শক্তি হয়, যে শক্তির নামে শক্তিমানকেও মাথা হেঁট করে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়।

আদিত্য আরো একটু বড়ো হ'ল। বাপের বাড়িতে সমস্ত দায়িত্ব মনোরমার ছিলো না। এখানে, এই তিনজনের ছোট সংসারের সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়লো মনোরমার ওপর। মনের সংগে অপারিসমীম গড়াই করে শান্তিনাথ আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন নড়াচড়া করতে। এই যন্ত্রণা কেন? এরকম প্রশ্ন শান্তিনাথ অনেকবার করেছেন বুঝতে চেয়েছেন এই মরণযন্ত্রণার মানে। কিন্তু কোন উত্তর পান নি। বিশেষ করে বেছে বেছে এই অপারিসমীম যন্ত্রণার জন্যে তাঁকেই বা নির্বাচন করা হ'ল কেন, একথা অনুভব করতে চেয়েছেন। মংগলময় ভগবানের বিবর্বিধান ত' তিনি ধর্মত লঙ্ঘন কবেন নি কখনো। মানুষের সংসারের বিধানকেও তিনি অলঙ্ঘনীয় জ্ঞান করে এসেছেন। মনেও পড়ে না কোনদিন কোন বড়রকমেব অন্যায় তিনি করেছেন কি না। তবে এটা বুঝতে পারেন তাঁর যন্ত্রণা অনুভবের ক্ষমতা অপারিসমীম। সামান্য সামান্য ঘটনা, লোকে থাকে কোন ঘটনাই বলে না, পাশ ফিরে চলে যায়, সেই সামান্য ঘটনাদুলি তাঁর অনুভবশক্তির গর্বে অসামান্য হয়ে ওঠে। এটা তিনি বরাবর দেখেছেন।

বহু ছোটবেলার দুর্দৃষ্টি-একটি ঘটনা তিনি মনে করতে পারেন। বলা বাহুল্য, দুর্দৃষ্টিই মৃত্যুদণ্ড, এবং দুর্দৃষ্টি মৃত্যুদণ্ডই কুকুরের। এক-একটা কুকুরের এক এক-রকমের মৃত্যু।

ফেন একটা পুজোর সময়, বোধ হয় কালীপুজোর দিন রাত্রেই ব্যাপারটা ঘটেছিলো। তাঁর কোন বন্ধু বেশ একটা বড়ো বোমা তাদের পোষা এক কুকুরের গলায় বেঁধে দিলে তার সলভের আগুন ধরিয়ে দেয়। বোমাটা খানিকটা পর প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গেলে কুকুরটা বিকট একটা শব্দ করে উঠলো আঃ, তারপর সেই দৃশ্য! কুকুরের মাথাটা ঘাড় থেকে বুলে পড়েছে। রক্তের নফারারা ছিড়িয়ে পড়েছে। আর সেই অবস্থাতে কবন্ধ কুকুরটা পাগলের মত তাঁর গম্ভীৰ্ণতায় খানিকটা ছুটে গিয়ে দেয়ালে অশেষ মত ধাক্কা দিয়ে একটা বিস্মী শব্দ করে পড়ে গেল।

আর একটি মৃত্যুদৃশ্য। টাওয়ার ক্রকের পাশে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পলিশ ম্যারাবের সামনে দুটি স্থবির কামান ঘোলাটে চোখে রাস্তার দিকে ভাঁকিয়ে আছে। কৃষ্ণচূড়া গাছের বাঁ-পাশ দিয়ে ঝিলের কালো ধোঁয়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে। আর মনে হচ্ছে এই দীর্ঘ অপরাহ্ন যেন রক্তবর্ষি করেছে। ওপরে যখন এইসব ঘটনা ঘটেছে, তখন ঠিক তার নিচেই আরেকটি অসামান্য ঘটনা ঘটতে চলছিল।

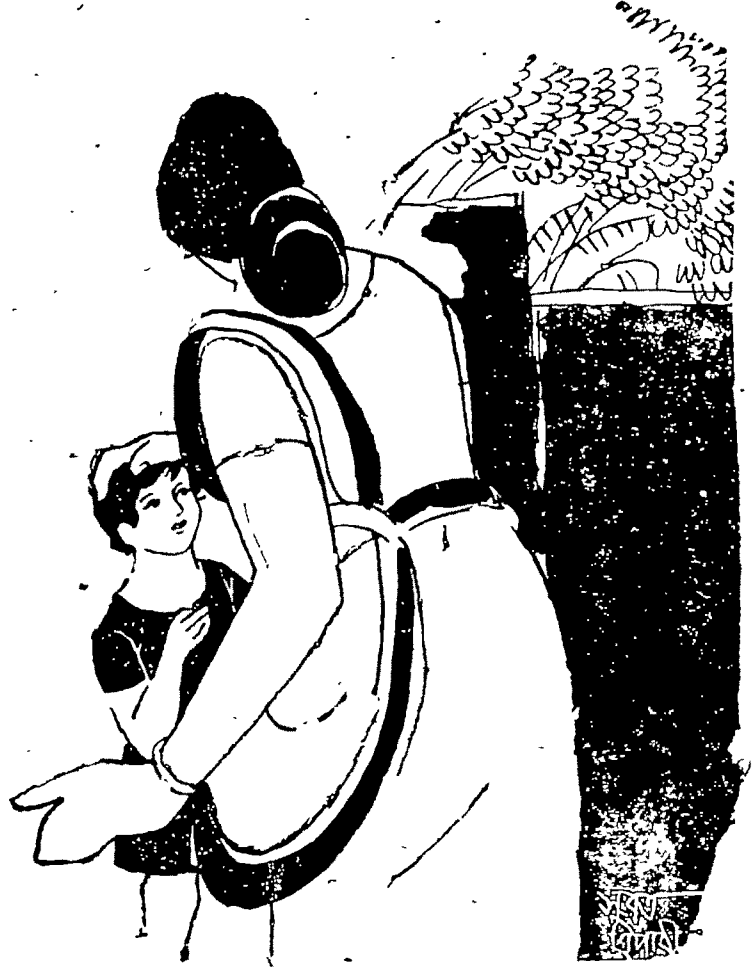
একটা কুকুর সিনেমার সামনে বাঁ-দিকের পাঞ্জির রাস্তায় ঠেকিয়ে পেছন আর সামনের পা দুটিতে অনবরত উঁচু দিকে তোলবার চেষ্টা করছে। স্ক্রিমটা বেরিয়ে এসেছে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। চোখটা ঠেলে বেরিয়ে এসে ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।

অর্থাৎ একটা জলজ্যান্ত কুকুর এই বিকেষে মরতে চলল। কুকুরটা নাকি পাগল ছিল না। অথবা রোগগ্রস্তও নয়। বহুরের এ সদয়টা কুকুরবা নাকি পাগলামি করে ফেলে। পাছে এই দৃশ্য, সবল কুকুরটি পাগল হয়ে যায়, পাগল হয়ে গিয়ে একে-ওকে কামড়ায়, তাই মিউনি-নিপ্যাসিটির লোকেরা খাবারে বিষ মিশিয়ে ওকে মারবার আয়োজন করেছে। দৃশ্যে ভিড় ভরে গেছে। বিনি টিকিটে মজা দেখাব একটা তাঁর উদ্দেশ্যনায়। কেউ একজন আবার হৃদয়বান হয়ে উঠলো। হিন্দু-সংস্কার চাগিয়ে উঠলো। সে পাশের খাবারের দোকান থেকে খানিকটা জল এনে কুকুরটার মূখে ঢেলে দিতে গেল।

মুখ জল যে দু-চার ফাঁটা পেয়ে তা আর খেতে হল না কুকুরটাকে। কুকুরটা তখন শেষ আশ্রয় পাতি খামচে পমচে খবছে। ভিড় থেকে একজন সলল আব জল নিয়ে জ্যান্ত কব্বা যাবে না। মুখে জল গেল মরা ভাগ্যের কথা হে। মানুষেরই জ্ঞান নি তা কবাবব, তাই।

ঠিক সেই সময়, ঘটনার কি আশ্চর্য যোগাযোগ, একটা কোমর-ভাঙা কুকুর, বাসের ধাক্কায় যায় কোমর ভেঙে যায়, লেংচে লেংচে সেখানে এসে দাঁড়ালো।

শারদীয় সাপ্তাহিক বঙ্গমতী : ১০৭৩



তাকে মানুষ হতে হবে আদিত্য

কুকুরটা এমনভাবে লেংচে লেংচে আসছিল যে হাতে হাতে সহজেই মনে করা যেতে পারে কোন খোঁড়া ভিখারী, হাতে লাঠি আর অন্য হাতে কাটা টিন নিয়ে, লেংচে লেংচে আসছে। সেই খোঁড়া কুকুরটা ভিড়ের ভেতরে কোনক্রমে মাথা গলিয়ে দিলো। আর সে দেখতে লাগলো আর এক কুকুরের মৃত্যুদৃশ্য। একটা কোমর-ভাঙা কুকুর যখন আরেকটা কুকুরের মৃত্যুদৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, মানুষের ভিড়ের সংগে মিশে। তখন মানুষের সেখানে দাঁড়ানো ঠিক নয় ভেবে শান্তিনাথ চলে আসেন।

প্রথমটির কথা তেমন মনে আসাত না দিলেও শেষ মৃত্যুদৃশ্য তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। বহুবার তিনি ভুলতে চেয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুতেই ভুলতে পারেন নি কখনো। একথা কাউকে বলা যায় না। লোকে নিশ্চয় উদ্ভাদ ভাবে। লোকে বলবে, এটা কি করে হয়, এ্যাতো মানুষের এ্যাতো মৃত্যু তুমি চোখ দেখলে শান্তিনাথ, সেসব মৃত্যু তোমাকে স্পর্শ করলো না। আর কুকুরের মৃত্যু নিয়ে তুমি এলিঙ্গ রচনা করে ফেললে।

লোকে যাই বলুক, শান্তিনাথ জানেন এ সত্য, কেন না, তিনি এ অনুভব করেছেন। যে যন্ত্রণা সবাই অনুভব করে, সেই যন্ত্রণাই একমাত্র সত্য নয়। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত যন্ত্রণাও সত্য। আর একে মানুষ মূল্য দেয় না বলেই মানুষের, প্রতিটি মানুষের যন্ত্রণা আজ বেড়ে গেছে।

এই কুকুরের মৃত্যুদৃশ্য থেকেই যে বুদ্ধে তাঁর ঐ কালরোগ প্রবেশ করে একথা তিনি হৃদয় করে বলতে পারেন না। কেন না, অনেক কষ্ট পেয়ে শান্তিনাথ একথা বুদ্ধেছেন হৃদয় করে এমন অনেক কথা আছে, যা বলা যায় না। হয়তো এই কুকুরের মৃত্যুদৃশ্য অথবা ঐ ধরনের কিছু, ঠিক কি যে তা বলা যায় না, তাঁর এই সাংঘাতিক যন্ত্রণার জন্য দায়ী।

এই যন্ত্রণাকে মনোরমা কখনো বদ্বতে চায় নি। দু-একবার কুকুরের মৃত্যুদৃশ্যের কথা বলতে গেছেন, কিন্তু ভাবগতিক দেখে বুদ্ধেছেন, ও তাঁকে উদ্ভাদ ভাবে। স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষ বলে মনোরমা তাঁকে ভাবে না এ্যাকেই তার ওপর কুকুর

সম্বন্ধে এই ঘটনাটি যদি শোনে, তাহলে আর রক্ষে নেই।

এই নোতুন ভাড়াটে বাড়িতে এসে যখনই শান্তিনাথের বুকটা ধড়াস করে ওঠে, তীব্র স্মারকিক উত্তেজনা দেখা দেয়। মনে হয় হাত, পা ক্রমশ শীতল হয়ে আসছে, তখন প্রচণ্ড জ্বরে ধমক দিতে থাকে মনোরমা। বিরক্ত লগসেও সেই ধমকে কাজ হয়। মৃত্যুযন্ত্রণাটা তখনকার মত আস্তে আস্তে চলে যায়। আদিত্য কতোদিন শ্রমচ্ছে তার মাকে ধমক দিতে। মনোরমা বলছে, কি হয়েছে তোমার? কিছু হয় নি। বুকের রোগ? বাজ্ঞে কথা। কোন রোগ কোথাও তোমার নেই। বড় বড় ডাক্তারেরা কি গাধা? তারা ঘাস খায়? রোজ রোজ ঘেরকম 'মবে যাবো মরে যাবো' কবো, বোগটা যদি সত্যি হ'ত, তবে কবে দাঁত ছরকুটে পড়ে থাকত। লজ্জা করতে শেখো। ছেলের দিকে তাকাও। আমার দিকে তাকাও। ঘেন্না হয় না তোমার, কি অবস্থায় আমাদের চলছে।

মিনিট পনেরো ধরে এইরকম এক-নাগাড়ে বলবার পর আস্তে আস্তে আদিত্য দেখেছে তার বাবার মূখ থেকে মৃত্যুযন্ত্রণার কালোছায়া সরে গ্যাছে। কিন্তু তখন না হোক, সেদিন না হোক, অবধারিতভাবে আসবে মরণযন্ত্রণা, তাকে বুঝে কুয়ে থাকবে।

সেই কুবুজের মৃত্যুদশাই হোক, অথবা সামান্য ঘটনা থেকে যন্ত্রণা ছেঁকে নেবার অপারিসমী ক্ষমতার জন্যেই হোক প্রতি-দিন মরণযন্ত্রণা অনুভব করতে করতেও কিন্তু শান্তিনাথ তাঁব স্ত্রী ও পুত্রের জন্য কিছু একটা করতে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতেন। যদি কোনক্রমে একবার এই যন্ত্রণার শেকলটা ছিঁড়তে পারতেন! যদি একবার! তাহলে তাঁর জন্য কষ্ট থেকে এদের মুক্তি দিতে কোন চেষ্টাই বাকী রাখতেন না।

শান্তিনাথ আদিত্যকে ইংটেব ওপর বসিয়ে চুল কেটে দিতেন। সে যে দেখতে বিগ্ৰী এই বোধ আদিত্যের তখন থেকেই জগতে আরম্ভ করেছে। শান্তিনাথ খুব ছোট আর এবড়ো-খেবড়ো কবে চুল কেটে দিতেন। তাতেই আদিত্যের লায়ক বন্দুরা আশ্চর্য্য পেয়ে আদিত্যকে খুব ফাগাতো। আনান্য বড় বিগ্ৰী দেখাতো নিজেকে। ফলে চুল কাটতে বসা দাবাব কার্চর সামনে, সে সময়টা একটা পীড়নের মতন লাগতো আদিত্যের। অথচ উপায়ও ছিল না। মা এসব বেষাদাপি সহ্য করবে না। থাবড়ে সিধে করে দেবে পালিয়ে যাবার পাকামি। ইতিমধ্যে শান্তিনাথের কানে এসেছে, পলাশগড় ফ্যাক্টরিতে বয়ের কাপড়ের জন্য লাইনে দাঁড়ানো শত নয়! তখন সেই দিন, যখন ফ্যাক্টরীর ফোরম্যান ডেকে নিয়ে কাজ দিতে। ফ্যাক্টরীকে

লোকে বলতো, 'কল'। কলে ধারা বাবদুর কাজ করতো, তাদের বলতো 'কলাইয়া বাবদ'। ওদের নাকি জাতক্সম থাকে না। মদ-ভাং খায়। বিলাসপদুরী মেয়ে নিয়ে পড়ে থাকে। এমনি ধারা নানা গল্প।

শান্তিনাথ এসব কথা আদিত্যের ব্যাপারে ভাবেন নি। শান্তিনাথ তখন যন্ত্রণায় মাথার চুল ছিঁড়ছেন। কি করে সংসারের কিছু সাশ্রয় হয়, কেমন করে ঘরে দুটি পরসা আসে, ছেলে বৌ-এর মধ্যে হাসি ফোটে, তার জন্যে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছেন। একদিকে ভেতরের অপারিসমী কষ্ট আর বাইরের এই সাংঘাতিক জ্বালা। কি যে করবেন কিছুই ভেবে পেতেন না। সমস্ত দিন ধরেই যে মরে যাবার ভয়ে শান্তিনাথ আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন তা নয়। কিন্তু মরণের এই ভয়টা কখন, কি মর্তিত যে আসবে ভেবে পেতেন না। যেই মনে হবে আমি বড় একা, আমার কেউ নেই, তখন একটা আরশোলা দেখেও থতমত খেয়ে যাবেন। সেই জন্যে অষ্টপ্রহর ওর সংগে একজন কেউ থাকে দরকার। কিন্তু থাকেই বা পাওয়া যায়? কে আর এভাবে ভুতের বেগার খাটতে রাজী হবে। সেই জন্যে ছুটির দপদুরগুলিতে অন্তত আদিত্য কোথাও যেতে পারতো না। আদিত্য পাছে পালিয়ে যায় ঐ জন্যে শান্তিনাথ বাগিসে মাথা দেবার আগে ওর কাপড় নিজের কাপড়ের সংগে গিট দিয়ে বেঁধে রাখতেন। কি কঠিন শাস্তি আদিত্যের! এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদে কুলেব আচাব শূকোতে দিয়েছে কতো বাড়ির কতো মেয়ে। এক ছাদ থেকে আবেক ছাদে লাফিয়ে একটু একটু চাকতে চাকতে একের পর এক বাড়ি পাব হবে যাওয়া কি মধুর। দেবতার হাতেব উজ্জ্বল সুন্দর পুরুস্কারের মত ক্ষীরের মত মিষ্টি ঘন-আটায় চটচটে সোনালি নোনালিকে ইষ্ট মেবে মাটিতে নাবিয়ে আনাব মমো কি অপারিসমী তৃপ্তি! অথবা এসব কিছুই নয় বৃপনগরের পশ্চিম দিকে যে গভীর অবণ্য রয়েছে, শূকনো পাতার ওপর মচ-মচ শব্দে চলতে চলতে, নবতুলসী গাছের উগ্র, বুনো গাঙ্গে দিশে হাবিয়ে অবশেষে বিশাল গংগাব মূখোমুখি হওয়া কি বিচিত্র!

বিকেলবেলাও কোন কোনদিন আদিত্য খেলতে যেতে পেত না। রাস্তায় ধাবই ছিল মদন সাকবাব বাড়ি, তার লগোষা ও ৬ কার্চর একটা মাঠ। সেই মাঠে এ-বাড়ি ও-বাড়ির টুনটুনি, কুলবলি, কমলা, মীরা, গীতা এসব মেয়েদা হাড়-ডু খেলতো। ওরা অন্য ছেলোদব সংগে খেলতো না। তবে শান্তিনাথ স্বভাব আর ওর দুটি বিষয় চোখেব জন্যে আদিত্যকে সকলে খুব পছন্দ করতো। কিন্তু শান্তিনাথের জন্যে আদিত্য ওদের

সংগে মিলতে পারতো না। বড়োব মতন কতোদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আদিত্যকে শান্তিনাথের সংগে কতো গাড়ি পাশ দিয়ে এলো গেল, অথবা কটা চেনামুখ চোখে পড়লো তার হিসেব রাখতে হ'ত। চোখের ওপর দিয়ে দুপদুরগুলি নষ্ট হয়ে যেত। চোখের ওপর দিয়ে বিকেলগুলি নষ্ট হয়ে যেত। এগুলিকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করেও কোন লাভ হ'ত না। শান্তিনাথ আদিত্যকে ছাড়তেন না।

শান্তিনাথ আদিত্যের মনের কষ্ট যে বঝতেন না, তা নয়। কিন্তু কি করে একা থাকবেন? যন্ত্রণা যখন হয় না, তখনো যে ভয়, একা থাকলে সর্দিবে পেয়ে যন্ত্রণা যদি আবার আসে? যদি আবার হাতের মূঠোর মধ্যে তাঁকে পেয়ে যায়? আর আদিত্য মনে মনে ছটফট ছটফট করতো। দুপদুরে চেয়েও বিকেলে ওর কষ্ট হ'ত অপারিসমী। কষ্ট হচ্ছে শান্তিনাথের। তার জন্যে উনি ফলভোগ ববুন। এর জন্যে আমি কি করবো। আমি কষ্ট-ভোগ করব কেন? খেলার মাঠ থেকে সংগিনীদের উৎসাহজনক এক-একটা আওয়াজ আসতো আর শেকলবাধা বন্য জন্তুর মত ভেতরে ভেতরে আদিত্য অস্থির হয়ে উঠতো। কেন না, আদিত্য তখনও জানতো না একজনের কষ্ট কিবকম করে অণবের কষ্ট হয়ে যায়, কেমন করে এক-জনের যন্ত্রণা আরেকজনকে বেহাই দেয় না এবং একটা অনন্ত বিস্তৃত কণ্টেব শেকলে গোটা মনুষ্যসমাজ অনেকদিন থেকেই বাঁধা পড়ে আছে।

পলাশগড় ফ্যাক্টরীর কথাটা কানে গ্যাছে শান্তিনাথের। অথচ আদিত্যকে ছেড়ে দিলে তিনি কি কবে দুপদুর বা বিকেলের নির্জন মূহুর্তগুলি কাটাবেন, এও এক সমস্যা। শান্তিনাথ বাড়ির পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রায়ই দেখতেন একটি পাগলকে। মাথায় ছোট অপবরস্ক ছেলোট, নাম ছিল মধু। মধু বিশেষ কোন উপদ্রব কবতো না, কিন্তু প্রায়ই এর-তার বাড়ির খাটেব তলায় চাপচাপ ঢুকে পড়তো। বাড়ির মেয়েবা ন জেবে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলে হাততালি দিয়ে হা হা করে হেসে কুটিপাটি হ'ত, হাসতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল গড়াতো। শান্তিনাথ কিছু একটা মনে কবে একদিন ওকে ডাকেন। ও মস্তেব মত কথা শোনে। তাবপব দুজনে একটি মিষ্টিব মোকানে ঢুকে নিজে কিছু খেলেন আব ওকেও কিছু খাওয়াশেন। মধু তাবপব থেকে তাঁব সংগ আর ছাড়তে চায় না। তন্ত-প্রহবের সংগী। চান কবতে যাবেন সংগে মধু। ভাত খেতে যাবেন সংগে মধু। কেবল রাতে নিতান্ত অনীহা সহ্যেও মধুকে চলে যেতে হ'ত ওর নিজের আস্তানায়। মানুস ছেড়ে দিয়ে শান্তিনাথকে শেষ পর্যন্ত একটা পাগল নিয়ে থাকতে হ'ল।

শান্তিনাথ ধীরে ধীরে আবিষ্কার করলেন,
এ পাগল বলেই এ অনেক সহনীয়। মানুষ
হলে তারা দু'জন দু'জনকে বেশিক্ষণ
সহ্য করতে পারতেন না।

সুতরাং আদিত্যকে পলাশগড়
ফ্যাক্টরীতে বয়ের কাজে ঢোকাবার প্র্যাক
শান্তিনাথ ছকে ফেললেন। মনোরমা
ব্যাপারটা জানতো না। শব্দ হঠাৎ
আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলো আদিত্য
শব্দ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বাড়ির কারদর
কপার ঠিক জবাব দিচ্ছে না। সব সময়
মনমরা ভাব। বাড়ির বাইরেও কোথাও
যাচ্ছে না।

মুখ-চোখের অবস্থা স্বাভাবিক নয়।
বারবার মনোরমা জিজ্ঞেস করে, ব্যাপারটা
কি? তুই এ্যাতো চুপচাপ কেন? প্রতি-
বারই আদিত্য জবাব দেয়, পরে জানতে
পারবে। গতকাল সন্ধ্যায় নয় জেনে
মনোরমা শান্তিনাথকে বলে, তুমি ওকে
কিছু বলেছো? শান্তিনাথ বিস্মিত হয়ে
বলেন, আমি? আমি ত' দুর্দীন ওর
টিকিরই পাত্তা পাই নি তবে ছেলেরা
ওবকম ক্ষ্যাপামি করছে কেন? একা
থাকলেই বসে বসে কাঁদে। মনোরমা
তাকালেন শান্তিনাথের দিকে।

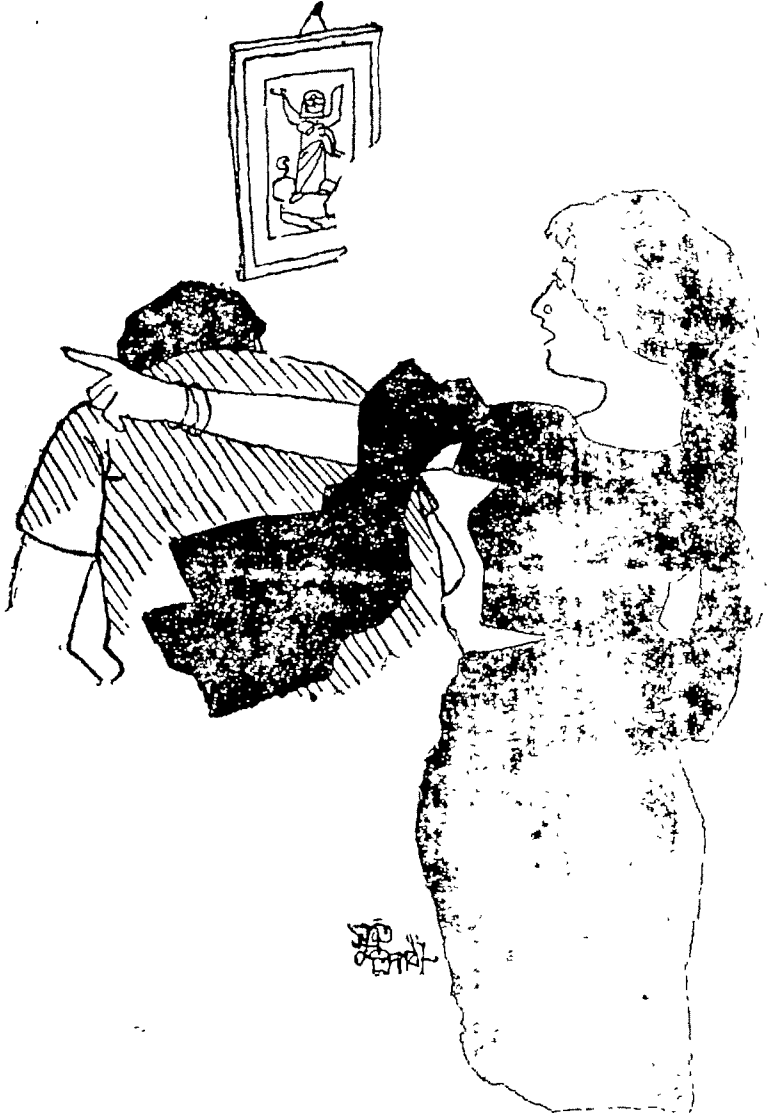
কাঁদে? শান্তিনাথ বিস্মিত হলেন।
তারপর একটু ভেবে মাথা চুলকে বললেন,
ও বোধ হয় জেনেছে ওকে ফ্যাক্টরীতে
ঢোকাবার চেষ্টা করছি।

ওকে? ওইটুকু দুখের ব্যাছাকে?
মনোরমা ব্যাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়লো,
বলল, হ্যাঁগো, তোমার কি সত্যি মাথা
খারাপ হ'ল এ পাগলটার সংগে মিশতে
মিশতে? শান্তিনাথ উদাস হয়ে বললেন,
সংসারের ত' এই হাল। আমি কিছু করতে
পারছি না। এখন চা-বাগানের শেয়ারের
টাকা কিছু পাচ্ছে তাই। কিন্তু যদি এক
বছর দিতে ফেল করে? তাহলে ত'
চিন্তিত। সেই জন্যেই দেখছি ওকে নিয়ে
কিছু ক'বা যায় কি না?

মনোরমা বলল, একদুটি আমার টাকার
দবকাব নেই। এখন ওর লেখাপড়ার
সময়। শান্তিনাথ আহতস্বরে বললেন,
গৌ ধরে ত' থাকবে। কিছুতেই ত' আমার
কথা শুনবে না। ভালোর জন্যেই বলে-
ছিলাম।

মনোরমা সে কথাব জবাবে বলল,
আমার ভালো যদি চাও ত' বর্ধমানে চান্দ
বিধে জমি তোমাব যে আত্মীয় এ্যাতো-
দিন ভোগ করছেন, তাঁকে কিছু কিছু
দিতে বল। কিছু চাল পাঠাক। এখানকার
হাটে বিক্রি হয়ে যাবে। খড় পাঠাক।
পুকুরের মাছ পাঠাক। সারা বছরের
মোরাকীকে খোরাকী, উল্টে নগদ কিছু
টাকা আসবে ঘরে।

শান্তিনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে
রইলেন মনোরমার দিকে। এটা কি
করে হয়? একটা লোক, তাঁর আত্মীয়,



ওকে? ওইটুকু দুখের ব্যাছাকে?

দীর্ঘদিন লোকটা তাঁর জমি ভোগ
করছে, তাকে কখনো কিছু বলেন নি,
এমন কি জেঠামশাইও এসব ব্যাপারে
চুপচাপ থাকতেন, বিশেষ করে ও
জমিটুকুর ওপর লোকটার সারাটা বছর
চলে, সেই জমির ভাগ নিজের হলেও
শান্তিনাথ কি করে চাইবেন? দক্ষিণত
হলেন শান্তিনাথ। এ তো অধর্ম।
এ তো তিনি পারবেন না। চোদ্দবিধে
জমি সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক করা
চলে। কিন্তু যে জমি লোকটাকে অন্য-
হার থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই জমিটা
নিজের হলেও ছিনিয়ে নেওয়া বর্বরতা,
আর এটা তর্কের বিষয় নয়। শান্তি-
নাথের দিন যাহোক করে চলে যাচ্ছে
কিন্তু লোকটার কি হবে? মনোরমা
অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন
শান্তিনাথের মুখের দিকে। মুখের
প্রত্যেকটি রেখা, ভাঁজ, বিষম, স্থান

চোখ দুটি, কানের পাশে ঝুলন্ত পা-
চুল, বড়শীর মত নাক, বিবর্ণ ঠোঁট।
তারপর আস্তে আস্তে বলল, আত্মীয়-
কাছে ভালোমানুষ মজতে চাও। কিছু
পেরেছি। তা বোধ। লোকে
বলতে হয় আমাবেই বন্দক। আমি
নিজের জন্যে চাইছি না। চাই-
ছেলের জন্যে। বিবর্তী আম-
চর-জোতুরী করছি না।

মনোরমা একদিন আদিত্যকে নি-
বর্ধমান গেল।

বাবার কথা ভাবতে ভাবতে আদিত্য
চোখের সামনে দেখতো দু'দিন চাই-
আলোয় ঘেরা বরফে ঢাকা একটি গা-
সেই গাঠের একপাশে আকাশের চ-
ছোঁওয়া কঠিন নিষেধের মত এক-
পাহাড়। যে পাহাড়ে গান্ধী কখনো
পায়চারি করতে পারেন না। পাহাড়ী
তার নীরবতা আর রহস্য নিয়ে সিন্ধি

হয়ে থাকে। তার বাবাও যেন এইরকম অনেকটা। শান্তিনাথকে আদিত্য সহ্য করতে পারতো না। লোকেরদের বাবা ছেলের জন্যে পাথর ভাঙছে আর তার বাবা শুধু চুপচাপ বসে থাকেন। তার মা দাসী-বাঁদীর মত পরিশ্রম করে। তাতেও হচ্ছে না। তাঁর বাবা এবার ছেলের পরিশ্রমের ফলটি ভোগ করতে চান। কিন্তু আদিত্য পরে বড়ো হয়ে জেনেছিল সে যে জীবনে বিশেষ কিছু করতে পারবে না তার বাবা কৈমন করে যেন আগে থেকে তা টের পেয়েছিলেন। অনবরত মৃত্যুচিন্তা করতে করতে জীবন সম্বন্ধে তাঁর একটা প্রখর বোধ জন্মে গিয়েছিল। কেন না বড়ো হয়ে আদিত্য দেখেছিল যেমন অনেক বাস্তব জিনিস তিনি বুঝতে পারবেন না, তেমনি আবার জীবনের অনেক জটিল প্রশ্ন ছিল খুব সহজভাবে জানা। কিন্তু সব সময় যে শান্তিনাথ সম্বন্ধে তার ভয় ছিল, রাগ ছিল তা নয়। এক এক সময় শান্তিনাথকে আদিত্যের চমৎকার লাগতো।

হয়তো এক সংগে বসে আছে আদিত্য। কোথাও তার যাবার উপায় নেই বাবার জন্যে বন্দুকা মাঠে, বিকেলের আকাশের রং আর চিলের চকিত চাঁৎকাবে দূরে যাবার ইসারা, বাবার পাশে বসে থেকে মন ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে। অশ্রুত এই লোকটার পীড়ন করবার সাংঘাতিক পদ্ধতিগুলির অমানুষিকতা যখন সে ভাবছে, ঠিক সেই সব মূহুর্তে তার বাবা হয়ে উঠতেন রহস্যময়। যাদুকরের পোষাক গায়ে চড়িয়ে হাতে যাদুদণ্ড নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে, বাঁশ্টিতে ভেজা নেবু-ফুলের গন্ধ ছাড়িয়ে দিতে গায়ে, খুশীতে আনন্দে ভরে উঠতো আদিত্য।

হয়তো মা গ্যাছে সাবাবিনের কাছ সেবে পুকুরে চান করতে, অবসর অল্প, শান্তিনাথ জানেন ছেলের চরিত্র কবিত্বের মত শক্ত তাঁর করবার বাসনায ছেলেকে মনোরমা চা পর্যন্ত খেতে দেয় না, এটুকু অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত শান্তিনাথ চা তাঁর করে ফেলতেন আর এক কাপ চা নিজে খেতেন আর ছেলের হাতে তুলে দিয়ে জাবি মিষ্টি হাসতেন। তাবপর সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে আদিত্যকে বলতেন, খবরদার তোমার মা যেন টের না পায়। পোলে ভূমি আর আমি কেউই আস্ত থাকবো না। বাবার হাতের তাঁর চা তাও আবার মাকে না জানিয়ে, কি যে অপদর্বা লাগতো সে আর বলার নয়।

এক একদিন আদিত্য হয়তো নিচে আছে, সেদিন তার খেলতে যাওয়া বারণ, বৃকের কসুখটা হয়তো একটা ক

আছে কিংবা ঘেসেনি তখনো কাছে, হঠাৎ জোনাক-জ্বালা আধো অন্ধকারে ছাদ থেকে শান্তিনাথ ডাকতেন, আদিত্য, একটা অশ্রুত ব্যাপার, কুইক। আদিত্য হাতের জিনিস ছুড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি হাদে উঠতো।

বাবা একমুখ খুশি নিয়ে বলতেন, ঐ দ্যাখ তিনটে ঘুড়ি। কারা কেটে দিয়েছে কে জানে। আমাদের ছাদে এসে লেগেছে। ভারি গজার, না রে? বোধ যদি এমন হয়।

এইসব মূহুর্তে বাবাকে যে তার কি সুন্দর লাগতো, মনে হত তার বাবা বৃকের অসুখ নিয়েও জগতের আর আর বাবাদেব চেয়ে অনেক বেশি রহস্যময়, অনেক মিষ্টি, ভারি মায়াবী একটা মানুষ।

সব ছুটির দুপুরে আদিত্যকে ডাকতে হলেও সব দিন শান্তিনাথ ঘুমোতেন না। বৃকের যন্ত্রণা না থাকলে বলতেন, দ্যাখ, তোর গা গোয়ালে গেছে। তায় দুজনে মিলে তোর মাকে ভয় দেখাই।

এক একদিন এক এক রকম ভূত সাজতেন। রোজই যে মাকে ভয় দেখাবার জন্যে তা নয়, এমন কি তাকেও, বা পরিত্রিত কোন ছোট ছেলেকে কোন বেলাগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কখনো গালে গালপাটা লাগিয়ে মামদো ভূত সেজে, কখনো ফর্সা ধবধবে খালি গায়ে চক-চক পৈতে এক হাতে স্পর্শ করে, অপর হাতে কমণ্ডলু ধরে রক্তদৈত্য সেজে নানারকম গলায় সকলকে ভয় দেখাতেন।

বাথা একটু কম থাকলে শান্তিনাথ পরম উপভোগ্য হয়ে উঠতেন। এমন কি মাকে নিয়েও পীড়াপীড়ি করতেন। তার মা কেমন করে চলে, কেমন করে 'ওগো শুনছো' বলে কথা বলে, কিভাবে ঠুর সংগে ঝগড়া করে, অবিকল শান্তিনাথ নকল করে করে ছেলেকে শোনা-বেন, লজ্জাটক্সা করতেন না।

মনোরমা পর্যন্ত হেসে মরতো। শান্তিনাথ এইসব যখন করতেন, ভালো লাগলেও, মনোরমা এ কথা না শুনে পারতো না, দ্যাখ, আমি যেখানে মাথা ফাটিয়ে ফেলছি ও কেমন আহ্বাদে আছে। বাড়ির ট্যান্ড রিতে হবে উনি ভুলে মেরে দিয়েছেন। ওনাকে মনে করিয়ে দেবার দায় আমার। ইলেকট্রিক বিলের টাকা কি করে জোগাড় কবতে হবে তার ঝিন্ড একমাত্র মনোরমারই। চা-বাগানের টাকাটা বছরের শেষে আসে। গিরিডির বাড়ি থেকে ভাড়া ঠিক ঠিক পাওয়া যায় না। বর্ষমানের চান্দ বিয়ের জমি জেঠামশাই-এর আমল থেকে যে ব্যক্তি ভোগদখল করছেন তিনি শহর পোষ মাসে নতুন খান গঠার পর

শুকনো খড় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু বারো মাসের খরচটা চলবে কি করে? এ সমস্ত ভাবনা শুধু মনোরমার। উনি যে কোন কিছু ভাবেন না তা তা বোঝা যায় না। একটা কোন কিছু পরামর্শ চাইতে গিয়ে মনোরমা দেখেছে যে, ব্যাপারটা বহুদিনের পুরোন, যার সংগে অনেকদিনের জ্বালা, যন্ত্রণা জড়ানো, সেই ব্যাপারটাই ফের গোড়া থেকে ওনাকে বোঝাতে হয়। সুতরাং উনি কি করে পরামর্শ দেবেন? রাগ করে বলতেই হয়, থাকো তোমার নাড়ি ধরে। তোমায় কোনকিছু জিজ্ঞেস করাই বকমারি। আশ্চর্য লোক বাপু ভূমি। সমস্তটাই কি ভুলে মেরে যেতে হয়! ভুল। শুধু ভুল। সত্যিই শান্তিনাথ কিছুতেই খুব প্রয়োজনীয়, সাংসারিক ব্যাপারগুলি কিছুতেই মনে রাখতে তেমন পারেন না। বাবার হেনস্থা হয়ে উনি একটা খাতা করেছেন। তাতে কি বাবদ ঠুর কি পণ্ডনা আছে, কোথায় কি মিটিয়ে ফেলতে হবে, এমন কি কাকে কি কথা বলবেন, সে কোন কথা বলবে, এ সবও পুস্তখান-পুস্তভাবে লেখা আছে। কেন না শান্তিনাথ দেখেছেন যার সম্বন্ধে তাঁর মনে মনে অভিযোগের অন্ত নেই তাকে হাতের নাগালে পেয়েও ঠিক উপযুক্ত সময় তার সম্বন্ধে অভিযোগগুলি তাঁর কিছুতেই মনে পড়ে না। কিন্তু এ্যাতো সতর্কতা অবলম্বন করেও, আশ্চর্য, ভুলগুলি শুধু অজস্র ভুল জমেছে সাবা জীবনভোর। তিনি যেন নিজে ভগবানের একটি ভুলের মানসাত্মক। নানা ধাঁধা আর জটিলতার ঘোরপ্যাঁচে ঘেরা একটি দুর্বোধ্য রহস্য। আর সংগে সংগে নিজেই হীন, অত্যন্ত হীন, মনে হতে থাকে। বোধেন কিছু একটা করা দরকার। তাঁর স্বাধী কাছে কোন মর্ষাদা নেই। ছেলেদের কাছে কোন সম্ভ্রম নেই। সব ব্যাপারে পরের মূখের দিকে সর্বদা তাকিয়ে থাকতে হয়। সর্বদা একজন না একজনকে কাছে চাই। বাড়ির কারুর কোথাও যাবার উপায় নেই। গেলে শান্তিনাথ নিজের তপ অনুভব করবেন। এবং সংগে সংগে আসবে যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা আবার যেমন-তমেন নয়। যখন শব্দ হয় তখন এক অমানুষিক কণ্ঠ। যখন চলে যায় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য তার পবও স্তম্ভ হয়ে বসে তার চলে যাওয়ার ধাক্কাটা সামলাতে হয়। এবং এই যন্ত্রণাটা তাড়াতাড়ি জন্মেও দরকার হয়ে মনোরমার যমক।

কিন্তু এ ছাড়াও আরেকটা যন্ত্রণা এবং এটাও প্রায় বৃকের যন্ত্রণার মত শক্তিশালী, ক্রমে ক্রমে তাঁকে আচ্ছন্ন করছে। আজকাল তিনি বেশ টের পান।

মনোরমা আর আদিত্য তাঁর দিকে
কেমন চোখে যেন চায়।

কোন কোন সময় তিনি আদিত্যকে
হয়তো কোন কিছুর, হয় ঘড়ি কিংবা
বিস্কুট কিনে দিয়েছেন, হয়তো তার
চেয়েও বেশি, আদিত্যকে তেল মাখিয়ে
দিয়ে চান করাতে নিয়ে গেছেন,
আদিত্য ফস কর বলেছে, আমি কিন্তু
আজ থাকতে পারবো না। শীশের
খেলা দেখতে যাবো। মনে মনে সংগে
সংগে আহত হয়েছেন শান্তিনাথ।
তাঁর ছেলে যে তাঁর বকের যন্ত্রণা
বুঝতে চাইছে না এ জন্যে তাঁর কষ্ট
থাকলেও তিনি জেনে গেছেন যার
যা যন্ত্রণা তা তাকেই অনুভব করতে
হয় শেষ পর্যন্ত, এবং এ ছাড়া অন্য
উপায় নেই। কিন্তু এই যে নতুন কষ্ট
এর নাম কি। হয়তো আদিত্য শীশের
খেলা দেখতে না গিয়ে তাঁর কাছে
থাকলে তিনি বেশি সন্তুষ্ট থাকবেন
কিন্তু এই মূহুর্তে তিনি তাঁর ছেলের
কাছ থেকে অন্য জিনিস চাইছেন।
তিনি এ সব কান্ডগুলি কবছেন কোন
কিছুর পাবার জন্যে নয়। তাঁর কাছে
আদিত্যকে আটকে রাখার জন্যে নয়।
তিনি করছেন ভালোবেসে। তাঁর বুকে
অমানুষিক যন্ত্রণা হয় বলে তিনি একা
থাকতে পারবেন না আর সেই জন্যে
একজনকে না একজনকে কাছে রাখা
দরকার হলেও সাধারণ বাপের বুকে
যেটুকু ভালোবাসা থাকতে পারে সেটুকু
কি তাঁর স্বার্থপর বুকে থাকতে পারে
না? আদিত্য কি তাঁর কাছ থেকে
কোনদিন ঘৃণ ছাড়া ভালোবাসা পায়
নি? ভালোবাসা কি নির্ভেজাল হতে
পারে না?

হতে যে পারে না এটা যখন মর্মে
বেঁধে গেল তখন অম্ভুত একটি
সচেতনতা শান্তিনাথকে কিছুদিন
অনুরণিত করে রাখলো। মনোবমার
দিক থেকে ঘটনাটিকে বাজিয়ে নেবার
প্রয়োজন দেখতে আর চাইলেন না।
পুত্রের দিক দিয়ে ঘটনাকে দেখতে গিয়ে
আহত হয়েছিলেন। স্ত্রীর দিক দিয়ে
ঘটনাটিকে দেখতে গেলে রক্ত হতে
হবে অতএব তিনি যেটুকু দেখেছেন,
যেটুকু আতঙ্ক বোধ করেছেন, যেটুকু
শূন্যতাবোধের সম্মুখীন হয়েছেন
তাতেই সন্তুষ্ট থাকলেন। আর পুত্র না,
স্ত্রী না, কতব্যবোধ না, প্রেম না, কোন
আদর্শবোধ না শুধুমাত্র অত্যন্ত বাস্তব
যাক একেবারে সাদা কথায় রক্ত-মাংসের
আবেগ বলা যায় তারই তাড়নায় শুধু-
মাত্র টিকে থাকবার জন্য, নিজের অস্তিত্ব
কোনরূপে রক্ষা করবার জন্য, নিজের এই
শূন্যতাবোধকে ভুলতে তিনি কাজে
নেবে পড়লেন। তা ছাড়া আর কি
জানোই বা মানুষ কাজ কবে!

তখন যুদ্ধের সময়। তখন সেই
সব দিন যখন কথা ফিরে আসছে গান
থেকে, যখন সব জানা সব বোঝা হয়ে
গেছে, বিকেল যখন আর বিকেল না,
রাগির অসম্পূর্ণ আয়োজন, রাগিও রাগে
নেই আব, সকাল, প্রকাশ্য একটি ক্রো-
টির মত সাদা, শূন্য, দাঁত বার করা,
যখন চিমনির ধোঁয়া থেকে কালো
বেরিয়ে আসছে, পাইপের ধোঁয়া কালো,
মানুষের চোখের দৃষ্টি কালো, চাল
কালো, টাকা কালো, বিকেল কালো,
রাস্তার ধারে দয়া করে জ্বালা ইলেক-
ট্রিক আলোর মুখে কালো ঘোমটা।



শান্তিনাথ নকল করে করে
ছেলেকে শোনাবেন

শান্তিনাথ চায়ের দোকান করলেন
যুদ্ধের সময়। ভাড়াটে বাড়ি থেকে
একশো হাত দূরে। ভোর পাঁচটায়
মনটাকে প্রফুল্ল করবার জন্যে শান্তিনাথ
আপন মনে গুনগুন করে গান গাইতেন।
যখন বুঝতেন মন এইবার একটু প্রশান্ত
হয়েছে তখন দোকান খুলতে যেতেন।
দোকান ভালোই চলতো। মনোবমা
রাধা করে দিতো মাংস, পরোটা, আলুর
দম। কাছাকাছি ওয়ার-টেকনিসিয়ান-
দের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ঐ
প্রতিষ্ঠানটাই ছিল কাছাকাছি দোকান-
গুলির লক্ষ্য। আদিত্যের মনে আছে

অজিত সিনা বলে একজন ব্রহ্ম-
টেকনিসিয়ান দোকানে ঢুকতে ঢুকতে
বলতো, শান্তিনাথদা, আমার জন্যে
কেকের মাথা। অবশ্য তিনি
একাই কেকের মাথা খেতেন না। কেউ
মাথা অনেকেই খেতেন। তাতে দ্রুত
নেই। কেকের মাথার সংগে সংগে তার
তলে যে তাঁরা দোকানের সামনে
থাকতেন সেটাই শান্তিনাথের পছন্দ।
জীবনে দুঃস্বপ্ন কারণ হলে
ভগ্নমেষ্ট সার্ভিস। বর্ডার
অতএব পাশাপাশি বান্দু ব্যবসায়ী
ওদের টিপে টিপে ধান দিয়ে
শান্তিনাথের দোকানের অসম্ভব বিক্রি।
তারা মোটেই ঈর্ষান্বিত হত
কেন না প্রায় সবটাই চলতো ধান
একটা চাকর ছিল আদিত্যের।
ছিল কেউ। সে রাতেও দোকান
থাকতো। এক এক জার নান্দে
বিস্কুট কিংবা ফেক সে প্রাতিদিন
খেত। ভাত খেতো না। খালি
চোখে পড়তো শান্তিনাথের অনেক তুলনা
দেঁরতে। খোঁচ নিলে কেউ বলতো,
ইন্দুর এখানে। কেউ তো কেউ
মানুষকেই খেয়ে ফেলত।
রাতের বেলা খাবার জন্যে টানাটানা
কবে। একদিন দেখি মালা বাক্সি
নেই। শুষ্ট ওয়াড়টা পড়ে আছে, মাইরা
কেউ খেয়ে খেয়ে নবীরাটা বাগিরে
দেশে পিটান দিলে আব কোন উপায়
অবশ্য তাতে বেশি উপায় করে
অর্থাৎ শান্তিনাথ খস্ট চেঁচা করে
বটে কিন্তু বিশেষ চারিদিকে নতুন
পাবতেন না। ব্যবসাবুদ্ধি ছিল না
নয়। ওটা প্রথমই সবার হয় না।
ব্যবসাবুদ্ধি নিয়ে জন্মান না।
ব্যাধিই এর জন্যে দায়ী। দোকানে
মেলাতে মেলাতে বুড়ো
কবে উঠতো। আব মনে হত কি
একহাতে নাড়ি ধরে চপচাপ
থাকতেন। এইভাবে কি দোকান চলে
মনটা তো আব ছিল না ব্যবসা।
মন তো সব সময় নাড়ি ধরে
নিসংগ হয়ে বসে আছে। দোকান
আর দম দেওয়া বন্ধ নয় যে
নিয়মে চলবে?

এই দোকানকে কেন্দ্র করে শান্তিনাথ
আর মনোরমা পরস্পর বহুবার
আসছিল। ক্রমাগত। আবার সেই সব
গুলি ফিবে আসছিল, আদিত্য
কথা। বিষয়তা সোপা কেটে
শান্তিনাথের। জনগণ মনোবমার
হাসি ফুটছিল। কিন্তু একদিন
থেকে আদিত্য বিব্রত হয়ে
তার মা নিভোনো উদ্ভাবন ধার
দুটি মুড়ে তাতে গুঁড় রেখে চপ
বসে আছে। আব তাব বাবা দোকান
গিয়ে ওখান থেকে একটি দার

মধ্যে চুপচাপ চাদর মড়ি দিয়ে বসে
আছেন।

বাবা কিছুর বলেছেন মাকে? মা
কিছুর বলেছে বাবাকে? কেউ মরে গেল?
মরে যাবার মত তাদের যারা আশ্রয়
ছিল তাদের কাছে তারাই ত' মরে
গেছে কতোদিন আগে। নতুন করে কেউ
মরলো নাকি?

আদিত্যের একবার মনে হল এই
বিকেলের সে জিগোস করবে নাকি কেউ
মারা গেছে কি না। কিন্তু সংগে সংগে
আদিত্য অশ্রুত একটা মরা মরা গন্ধ
পেল। সে স্পষ্ট দেখতে পেল তার বাপ,
তার মা মরে গেছে। অন্য কেউ মাঝে
কি না কিংবা কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে
কি না এসব জ্ঞানার আগ্রহ আর তার
রইলো না। পাশে খেলার মাঠ থেকে
সংগিনীদের সহর্ষ চীৎকার ভেসে আসছে।
বিকেল এখনো রাঙা। মা ভাগ্যস খাবার
জন্মে ডাকলো না। বাবা ভাগ্যস তাকে
দেখছেন না। আদিত্য দুই মৃতদেহের
পাশ দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চুপিচুপি
চলে এলো। তারপর হাসতে হাসতে
টুনটুনি, বদলবদলি, গীতা, মীরা হয়ে
গেল।

এই সময়ের একটা ব্যাপার মনে আছে
আদিত্যের। মনোরমা বর্ষমানের ছোট-
বকুলপুর গ্রামে যাবে তদারকি করার
জন্মে। সব ঠিকঠাক। বাঁধাছাঁদা হয়ে
গেছে। আদিত্যকে এখানে থাকতে হবে
তার বাবার কন্ঠের জন্মে। মনোরমা একাই
যাবে। ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে
দরজায়। মনোরমা গাড়ির পাদমিনতে পা
দিতে যাবে হঠাৎ বিকট চীৎকারে কি
হল রে বলে ছুটে চলে গেল মনোরমা
ঘরের ভেতরে। আদিত্যও সংগে গেল।
গিরে দেখে তার বাবা মেঝেতে পড়ে
গেছে। একবারে রক্তারক্তি কান্ড। খুল
খাড়তে নাকি গিরেছিলেন ঘরের। তারপর
টল থেকে পা পিছলে এই অবস্থা। এই
অবস্থায় মনোরমা আর কি কবে যায়?
মাত্র আদিত্য শূন্যে শূন্যে স্পষ্ট শুনতে
পাচ্ছে তার মা-বাবাকে ধমকানো, ছিঃ।
আমার যাওয়া বন্ধ করতে নিজেই খুন
হতে বসেছিলে? আমি হলফ কবে বলতে
পারি তুমি। ইচ্ছে করে, পা পিছলে
পড়েছে। আমি চলে গেলে সংগে সংগে
মরে যাবে? নিজে ত' বিষয়-আশয় কিছু
দেখবে না। এদিকে আমি যদি যাই
তাতেও বাগড়া দেবে? এর জবাবে তার
যাযা ক্ষীণকন্ঠে বলছেন, আমি হীন।
অতি হীন। সত্যি আমি গালাগালেব
যোগ্য। আমি জানি আমার নরকেও স্থান
হবে না।

মনোরমা আর একটি কথাও বলল না।
ধানিক পব তার নাক ডাকার শব্দ পাওয়া
পেল। আর মাঝে মাঝে থেকে থেকে
নিজে যে মানুষ নন, অতি হীন তিনি

এই কথাটা নিজেকে বোঝাচ্ছেন ওখনো
শান্তিনাথ কান্না কান্না ভাবায়।

আমি যে একবারে নষ্ট হয়ে গেলাম।
শুধু 'বুদ্ব' করে মলাম। কোনদিকে
দেখলাম না। কোনদিকে না। কোনদিকে
না।

শান্তিনাথের মৃত্যুভয় এবং তার জন্য
এই বাড়ির সর্বস্ব কত' মনোরমার
হাতে চলে যাওয়া, মনোরমাকে অনেক
বিশি মনে চলা, প্রায় দেবতা বলে ভাবা
এই আবহাওয়া ধীরে ধীরে আদিত্য
অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। চোখের ওপরই
আদিত্য দেখতো তাদের মা না হলে চলে
না। এমন কি দুধের বন্দোবস্তের
জন্মেও। এটা সেই সময় যখন কোল-
কাতায় জাপানী বোমা পড়েছে। লোক
পালাচ্ছে হন্যে হন্যে। দেহাতীরা পালাচ্ছে
দেশে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ, গরু,
বাহুর, মোষ, গরুরগাড়ি, ঠেলাগাড়ি
জি-টি রোডের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে।
পালাতে পালাতে যে যে-রকম দর পাচ্ছে
সেই দরে যে-গুলো বেচে দেবার সে-গুলো
বেচে হালকা হতে চাইছে। গরুটা
মনোরমা কিনে নিলো কিষণলাল আহীর
বলে মজফরপুর জেলার এক দেহাতীর
কাছ থেকে। তেল-হলদ দিয়ে গরুকে
বরণ করে গোয়ালে তোলা হ'ল। নাম-
করণ হল, শান্তা। সেই যুদ্ধের ডামা-
ডোলের বাজারে আদিত্যরা বলতে গেলে
দুধ খেয়ে বেঁচে ছিল। শুধু দুধ
খেয়েই যে শক্তি হয় না তার সংগে যে
যইও পড়তে হয় এ বোধ মনোবমাব
ছিল। সে বই যে বই হোক। নিজে
ক্লাস টু অবধি পড়লেও বিদ্যাই যে শ্রেষ্ঠ
অলংকার এ জ্ঞান মনোরমার ছিল
টনটনে।

শান্তিনাথ আদিত্যের অতো বই-
পড়া ভালোবাসতেন না। কি হবে অতো
পড়ে? কি লাভ? সামান্য সেটুকু না
পড়লে জীবিকার সংস্থান হয় না সেটুকু
পড়ে নাও। বেশি পড়লে মানুষ বেশি
জেনে ফেলে। শান্তিনাথের আপত্তি
জেনেই মনোরমা তর্ক করতো, বই
পড়বে না বেশি? না পড়লে যে জ্ঞানী
হবে না?

শান্তিনাথ অশ্রুত বিস্ময় গলায়
বলতেন, কি হবে অতো জ্ঞানী হয়ে?
মনোরমা এরকম কথার সংগে কি করে
আর তর্ক করে। তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে
বলতো, কি আর লাভ? যতো লাভ
তোমার ঐ চুপচাপ নাড়ি ধরে বসে
থাকতে!!

এসব কথায়, বিশেষ আদিত্যের
সামনে, শান্তিনাথের শীতল রক্তও চঞ্চল
হয়ে উঠতো। শান্তিনাথ গম্ভীরভাবে
বলতেন, ছেলের সামনে আমাকে ছোট
করে তুমি কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করছো।
এর পর ও আমাকে মানতেই চাইবে না।

তারপর অশ্রুত এক ভঙ্গিতে শান্তিনাথ
একটু হেসে বলতেন, ছেলে ছেলে
ছেলে। ঐ ছেলেতেই তোমায় খাবে।
আমি যেন কিছু নই। কেউ নই।

মনোরমা প্রথমটা এ রকম কথার
ধমকে যেত। তারপর গজগজ করতো
সামনে, নয় তো কি। আমার ত' বেঁচে
থাকা ওর জন্যেই। ও যদি মানুষ না
হতে পারে ত' আমি গলায় দড়ি দোব।

এমন একটা বাড়ি এটা। তার বাবার।
এমন একটা এই রোগ, এমন তার গলায়
অবস্থা যে এখানে তার মানুষ না হতে
পারার জন্যে তার মায়ের গলায় দড়ি
দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তার মাকে
আদিত্য চিনতে পেরেছিল।

যে-কোন সামান্য মৃত্যুকে মা
ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সংকট মৃত্যু করে
তুলতে পারে। সেখানে যে-কোন ছোট-
খাটো কম্পই ভূমিকম্প, যে-কোন
আগুনই আগ্নেয়গিরির আগুন।
শান্তিনাথ আর মনোরমা দু জনেই তাকে
ভীষণ ভয় দিয়েছিল। তাবা ভালো
করে নি, তারা ভালো করে নি।

শান্তিনাথ দমে গেলেন না। লেখা-
পড়া শিখেছেন। এবার শেখা বিদ্যেটাকে
কাছে লাগাতে গেলেন। একটু, একটু
করে ছাত্র-ছাত্রী জুটতে লাগলো। প্রথমটা
অতো ভেবে করেন নি। যাহোক একটা
কিছু সাধারণ সংসারের হবে এটা ভেবেই
এরকম করা। কিন্তু বছর দুই যেতে-না-
যেতে যখন ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়ে শান্তিনাথ
প্রায় ঢাকা পড়েছেন তখন একদিন রায়ে
মনোরমা একটু শাণিত হেসে বলেছিল,
দ্যাখ, রাগ করো না। ভগবান যে যেমন
চায় তাকে ঠিক তা জুটিয়ে দেন। তুমি
একা থাকতে পারো না। লোক চাও।
তুমি লোক পেলে।

শান্তিনাথ ভেতরের শৌচাটিকে
বুঝতে পেরে চমকে উঠলেন। ব্যাপারটা
মনোরমা চিপটেন কেটে যা' বলল তা
অনেকটাই সত্যি। ওদের পড়াতে পড়াতে
তিনি অনেকটা আশ্চর্যম্বিত হয়ে যান।
কমটা তেমন অনুভব করতে পারেন না।
কিন্তু মনোরমার উদ্দেশ্যটা কি? সে কি
বলতে চায়? শান্তিনাথ কি ছাত্র-ছাত্রী-
দের সংগে ইয়ারকী কবেন? গড়ানোটা
কি ফাজলামো? তারা এমনি এমনি
টাকা দেয়? তিনি কি ওদের কাছে পাওয়া
টাকার সবটাই মনোবমাকে তুলে দেন না
হাতে? আর পড়াতে তাঁর কি খুব
আরাম লাগে? সময় সময় মাঝে কি
বিগড়ে যায় না? কম হয় না তাঁর?
তাহলে? এ রকম করে যা দেওয়া কেন?
যখন কোন ছাত্র 'সেরমনি' কথাটি উচ্চারণ
করে বারংবার বলে দেওয়া সত্ত্বেও তখন
লাগে কি রকম? যখন হি ডিম্যান্ডস ফুড
কুইকলি' কথাটি বারংবার মন্থন করে
কোন ছাত্র লেখে, হি ডিম্যান্ডস ফুড

কুইকলি তখন? এইসব নিরেট মর্খতার স্তূপের ভেতর অন্তপ্রহর বসে থাকা, বসে বসে বকবক কবা, অমন হাজার-বার পড়ার প্রতিদিনের চোঁয়া চোঁকুর উৎসাহ করতে গেলে মনোরমার জিভ অস্তত বেরিয়ে যেত! এদের পঙ্খায় পড়ে তিনি যে সব শিখেছিলেন সে সব ভুলে যাচ্ছেন। ভুল বানানগুলিকেই মনে হচ্ছে রাইট বানান। ভুল উচ্চারণ রাইট উচ্চারণ। বাড়িতে একটা দবকারি কথা বলে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাব ছাত্র-ছাত্রীর মতন বোমালুম ভুলে যান। রাত নটার সময় তিনি যখন এদের হাত থেকে ছাড়া পান তখন মাথাব মধ্যে গুব্বরে পোকা বোঁ-বোঁ করে ঢুক দিতে থাকে। তাঁর মাথাব ঘরণার মধ্যে অনবরত মনে হয় এইভাবে আরো দু'-চার বছর চললে তাঁর দফা রফা হয়ে যাবে। তাঁকে আর করে খেতে হবে না।

তারপর এ্যাতো যে পড়ানো তার ফল কি? বছরের শেষে, পরীক্ষা হয়ে গেলে কেউ আর কলাটি ঠেকাবে? সব পালাবে। বাড়িতে টাকা ঠিকই দেয় কিন্তু ওরা দেয় না। মেরে দেয়। বছরের শেষ হয়ে গেলে আবার দুঃশ্চিন্তা। আবার ওদের জোগাড় করতে হবে। একে বলে রাখা, হ্যাঁ, ভাই একটু দেখ। বস্তু টানা-টানি যাচ্ছে। ওকে ধোসামোদ কবা, না হলে হবে না ভাই। দিতেই হবে এক-জনকে। এর পর তো প্রতি মাসে বাড়ি বাড়ি মাইনে আদায় করতে যেতে হয়। রাখো। যা ছেঁচড়ার কাজ। একটা পেস্টবোর্ডে যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা বৈতন দেয় না তাদের নাম লিখে রাখেন শান্তিনাথ। ওরা যাতে, যাবা মাইনে দিয়েছে, তাদের সামনে লম্বা পায়। কিন্তু লম্বা ওদের দেখেই লম্বা পায়। ওরা পেস্টবোর্ডে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। আর শান্তিনাথ আলু-অলা, পটু-অলা, দুপু-রের খাবার যারা বিক্রী করে বাড়ি বাড়ি, কিংবা কাবলী-অলা যারা সুদের টাকা আদায়ের জন্যে এখানে-ওখানে ঘোবে ঠিক ওদের মত শান্তিনাথ অভিন্যাসকদের দরজায় দরজায় ফেবেন! গিয়ে ওদের মত ত তন্নিব করতে পারেন না। খুব বিনীত, ভদ্র ভাষাতে একটু কেশে বলেন, ইয়ে হয়েছে। ওটা কি এখন দেবেন? দু' মাস হয়ে গেল। নিতান্ত বিবস্ত্র অভিন্যাসক রসকসহীন শব্দকনো ছোবড়ার মত মুখে বলেন, দু' মাস হয়ে গ্যালা? তাই তো হে। ভাবিয়ে তুললে। আচ্ছা নিয়ে যাও এখন পচি টাকা। পরে, বিকেল নাগাদ না হয়—

এইভাবে পড়াতে পড়াতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শান্তিনাথ একটি স্বতন্ত্র-জগৎ তৈরি করে ফেললেন। মনোরমা আগে শান্তিনাথের যাও-বা খাবা-ছোঁওয়া পেতেন, এখন ছাত্র-ছাত্রী-বাহু ভেদ করে

শান্তিনাথের নাগাদ পাওয়া ব্রহ্ম শব্দ হয়ে দাঁড়ালো।

এখানকার এই বাড়িতে আদিত্যের কৈশোর প্রায় দ্বৈতবশেন ভরা।

মনোরমা সর্বদা বলতো, পরের বাড়ি। এই এ্যাতো গোলামাল করিস নি। বাড়ি-অলার ঘুম ভেঙে যাবে। এই এ্যাতো বেশিক্ষণ চান করিস নি। বাড়িঅলা রেগে যাবে। এই ছাদে দৌড়োদৌড়ি করিস নি। বাড়িঅলা বিরক্ত হবে।

আদিত্য ওসব কিছুই কবতো না শব্দ ভয়ে ভয়ে বাড়িঅলা নামক অশ্রুত প্রাণীটাব দিকে চেয়ে থাকতো। বাড়িঅলা ওদের সঙ্গে কখনো ভাড়া চাওয়া ছাড়া কথা বলতো না। ওদের সঙ্গে কখনো হাসতে দেখে নি। সব সময় মুখখানা রাগি রাগি। ভাবখানা এই, হাসলেই, কথা বললেই, কেউ একটু, সুবিধে নিয়ে নেবে। আদিত্য ভাবতো সে-ও তো বাড়িঅলা। এখানকার না হোক, গিরিডিব বাড়ির। ওই একই হল। তার বাবা মালিক মানেই সে-ও মালিক। সে-ও কি যখন বাড়ির ভাড়া আদায় কবতে যাবে তখন বাড়িঅলার মতন যাবে? হাসবে না হাসির কথা শুনলেও? কাঁদবে না কাঁদার কথা শুনলেও? শব্দ বলবে, কই, দেখি ভাড়া? না ভাড়া পেলে ক্ষম মনে বলবে, এখানে যখন পোষাছে না তখন কস্তী-টস্তী দেখলেই হয়। ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আদিত্য মাকে বলতো, মা আমি বাড়িঅলা হবো না। মনোরমা বলতো, তোকে হতেই হবে বাড়িঅলা।

বহুদিন পরে যখন গিরিডিব বাড়িতে আদিত্য ভাড়া আদায় করতে যেতো, তখন এইসব দিনের ভয়ঙ্কর স্মৃতি তার মনে সজীব হয়ে থাকতো। ওব মনে হত, ও যেন এ বাড়ির মালিক নয়। ও তার নিজের বাড়ির ভাড়াটে। আর ভাড়াটেরাই বাড়ির প্রকৃত মালিক।

মাথা হেঁট করে নিজের বাড়িতে ও ঢুকতো। ভাড়া নিতো মাথা নীচ করে। যেন ভয়ঙ্কর একটা অন্যায্য কাজ নিতান্ত লজ্জা আর পরিতাপের সঙ্গে তাকে করতে হচ্ছে।

একদিন বোমা পড়লো। শান্তিনাথের তখন বেজায় জ্বর। শান্তিনাথ কোনক্রমে আদিত্যের কাঁধে ভর দিয়ে মোকতে নেবে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় চলে গেলেন। দ্বিতীয় বোমার নিদাঘ শব্দ ঘরের ভেতরকার খিল একঝটকা খুলে ভেঙে পড়ে যায়। ধুঁমুড় করে মনোরমা উঠে বসে নিচের বিছানায়। আদিত্যদেব ঐশ্বর্যের মধ্যে ছিল প্রকাশ্যে একটা দেয়াল-খড়ি। আদিত্য অতিক্রমে, আস্তে আস্তে দেয়াল-খড়িটা নাবাচ্ছে। খড়ির কাঁচটা কাঁপছে। মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটা স্তম্ভ। হাঁটু দুটি ঠকঠক করে নড়ছে।

কোনক্রমে নাইল। ভীষণ আতঙ্কে উঠেছিল।

আরেক দিনের কথা আদিত্যদেব মনে আছে। ভাত খেতে বসেছে আদিত্য। দুধ দিয়ে ভাত খাচ্ছে। অনেকগুলি ভাঙ খাবার পর ভাতে নজর পড়েছে। পডামাশ্র আদিত্য দেখছে অসংখ্য ছোট ছোট কালো-মুখ শাদা শাদা পোকা ভাতে কিলবিল কিলবিল করছে।

আদিত্যের কিশোর বেলার একপ্রান্তে বোমাবিদীর্ণ হাহাকার আর অনর্গদকে অসংখ্য কালো-মুখ শাদা শাদা পোকায় আতঙ্ক ভাতে। ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট পুরোন ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে বলরাম সেনের গলিতে নতুন ভাড়ায় বাড়িতে ওরা উঠে গেল।

আদিত্যেরা বাড়ি ছাড়তে চায় নি বাড়িওলা বলল বাড়ি ছাড়তে। ওনার কে না কে আত্মীয় এসে থাকবেন আদিত্য কিন্তু ওর মাকে বলছিল, কেন আমাদের অন্য ঘর দেখতে বলল জানো?

মনোরমা বলল, কেন রে?

আদিত্য বললিছিলো, ও বাড়িওলা তাই।

শান্তিনাথ পুরনো বাড়ি ছাড়তে চান নি। এ অঞ্চলের মানুষজনের মধ্যে তিনি বেশ পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। পরিচিতির দৌলতে তিনি যে কেন দোকানে খার পেতেন। তার চেয়েও বড়ো কথা এখানে আর তেমন তাঁর এত বোধ হত না। ঠিক রাস্তার ধারেই ছিল বাড়িটি। জায়গাটা রাত দশটার সময়েও বেশ জমে থাকতো। এখন যেখানে আদিত্যেরা উঠে গেল সেটা বলতে গেলে পাশের গলি হলেও শান্তিনাথের কাছ তা প্রায় বিদেশ যাত্রা। বাড়ি ছেড়ে চল আসার দৃশ্যটি আদিত্যের বেশ মনে আছে।

গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বোঝাই করা হয়েছে। কুঁজোটা, জুগেব প্লাস্টা হাতে হাতে গেছে। মনোমা আগেই চলে গেছে বলরাম দাস লেনের বাড়িতে তদারকীব অ্যা। শান্তিনাথের মুখ অসম্ভব বিষন্ন। দুল এলোমেলো।

হুপিঙে যন্ত্রণা। শান্তিনাথ কাপড়ের দোকানের বলাইদাকে বললেন, চললাম, চললাম বলাইবাবু। আর আসছি না আপনাদের দোকানে।

শান্তিনাথ এই কাপড়ের দোকানের রোয়াকে বিকেলবেলা এসে বসতেন। পঁয়সা সাত বছর বসে আসছেন। যদিও বলরাম গলি পাশের গলি তবু চোখ দুটি তাঁর আবেগে ভিজ্ঞ এলো। তিনি এখানে, এই দোকানের রোয়াকে আর বসতে পারবেন না।

কাপড়ের দোকানের বলাইবাবু সব

জানেন। অনেকদিন অনেককিছুই শান্তিনাথের দেখেছেন। আহা, অতো-বড়ো একজন শিক্ষিত লোক। কি মিষ্টি কথা। যখনই বলোঁ শান্তিনাথ-বাব, একটা দরখাস্ত লিখে দিন তো মশাই। আমি আবার বাংলা সেরেস্তার কাজ করা লোক। ওসব ইংরেজী টিংরেজী তেমন আসে না। শান্তিনাথ হৃদয়েসে দোকান থেকে একটুকরো কাগজে সুন্দর ইংরেজী অক্ষর ভরিয়ে দিয়েছেন। সেই মানুষ, আহা, বৃকের একটু ব্যাধার জন্যে কিভাবে নষ্ট হয়ে গেল। আবেগে গলা বৃক্ষে এলো বলাইবাবুর।

কেঁদে ফেলে বললেন, আমাকে কে দরখাস্ত লিখে দেবে? কাকে সাহস করে বলবো। আমি মশাই আপনার বাড়ি গিয়ে লিখিয়ে আনবো।

রাস্তার ও মোড়ে পটল সাহা বড়ো মদীখানার দোকান। তিনিও বহুদিন শান্তিনাথকে দেখেছেন। এই অশ্রুত মানুষটির প্রতি তাঁরও গভীর সহানু-

ভূতি। শান্তিনাথ যেখানে থাকে পারলেন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলেন। সামনে গরুরগাড়ি। তাতে মালপত্র চাপানো। আদিত্য পিছনে পিছনে চলছে। শান্তিনাথের পিছনে প্রায় এক-ডজন লোক। নানা কথা বলে তাঁরা শান্তিনাথকে উৎসাহ দিতে দিতে নতুন বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। শান্তিনাথ একা এক গলিতে আসতে পাবেন না। এটা ঠোরা জানেন। হয়তো একা আসতে গিয়ে আতংকে হার্টফেল করে যেলবেন। সকলেই কেমন যেন একটা দায়িত্ব বোধ করলো। আর সত্যি সত্যি যেন বলরাম গলিতে যাত্রাকে বিশেষযাত্রা করে তুললেন শান্তিনাথ, দেশের মাটিতে জন্মে যেন আর আসতে পারবেন না, ক্লান্ত আর বিষণ্ণ এমন ভংগি। শান্তিনাথ ভাব-ছিলেন কিন্তু তখন অন্যকথা।

বলরাম গলির মানুষগুলি কি রকম হবে কে জানে। রাস্তার ধারের মানুষ আর গলির মানুষে তফাৎ আছে। গলিটা বড় বড় বাড়ির জন্য ছায়াচ্ছন্ন। বিরাট

বিরাট পাইপ মাশ্বাতার আমলের ভাঙা বাড়ির গা বেয়ে গলির জেনের ধারে এসে পৌঁছেছে। অর্ধপ্রহর ময়লা জল চাইয়ে চাইয়ে পড়ছে ফাটা পাইপ থেকে। গলি দেখে, গলির এই বাড়িগুলি দেখে শান্তিনাথ আরো বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। হয়তো এ গলির বাসিন্দারা তেমন মিশুক হবে না। এদের সংগে আলাপ জমতে অনেক দেরি হবে হয়তো।

শান্তিনাথ বিভ্রাট করে বললেন, অশ্রুত লোক মশাই আমার বাড়িঅলা। আমাকে দেশছাড়া কবে ছাড়লো।

পটল সাহা, বলাইবাবু ইত্যাদিরা হাসতে হাসতে বললেন, এখানেও জন্মে যাবেন। তখন আর আমাদের মনে পড়বে না মশাই।

শান্তিনাথ কিছু বললেন না। একটু দুঃখের হাসি ফুটলো মুখে। এই সব মানুষগুলি সত্যি কী ভালো। দ্যাখ, কি আর উপকার আমি এদের করছি। অথচ এরা আমার জন্যে কতখানি ভাবছে।

এঁরাও তো জানেন, এই যে তিনি সকলের সঙ্গে কামনা করেন, সে ত' একা থাকার দুর্ভোগ কাটাবার জন্যে, তাঁর নিজের দিকে তাকিয়েই ত', পাছে মৃত্যু-যন্ত্রণা না হয়, বৃক শৃঙ্খল না কবে। তবু সব জেনেও এটাও ঠোরা জানেন শান্তিনাথ সত্যি সত্যি ঠোদের ভাল-বাসেন। ভালো লেগে গেছে ঠোদের।

আর মনোরমা? বর্ধমান যাওয়া বন্ধ করার ব্যাপারে মনোরমা শুধু শান্তিনাথের স্বার্থটাই বড়ো করে দেখলো। সেটা ত' ঠিক, আর কে না জানে যে মনোরমা থাকলে তিনি অনেকখানি ভরসা পান, কিন্তু এইটুকুই কি সব? তিনি কি আব কোন কারণে, বড়ো কোন কারণে, গোপন কোন কারণে মনোরমার যাওয়া বন্ধ করতে পারেন না? নিজের স্ত্রী বৈধ কি রকম আর এই সব লোক, কিই বা এদের সংগে পরিচয়, এরা কি রকম। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিভ্রান্ত শান্তিনাথ এই তুলনা-টিকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারলেন না।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। একটা প্রবল খুশি, বিপুল উল্লাসের মধ্যে আদিত্যের মনে হল পুরনো ভাড়াটে বাড়িটা যেন ইংবেজদের আমলের বন্দী দেশ। ওখানে খালি হুকুম আর নিষেধ। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে নতুন বাড়িতে আদিত্য যেন স্বাধীন দেশের নাগরিকের মতন আনন্দ, মৃদু অনন্দ করলো।

বছর খানেক যেতে-না-যেতেই আবার গোলযোগ দেখা দিলো।

নতুন বাড়িতে এসে মনোরমার শাটদানব চড়ান্ট। গবু বাড়িময়ালীর



আমি মশাই আপনার বাড়ি গিয়ে লিখিয়ে আনবো

গোয়ালে থাকতো বলে বাড়িওয়ালার গোয়াল মনোরমাকেই ধুয়ে-মুছে সাফ করতে হত। বাড়িওয়ালী মৃদুজ্যো-গিষী অবশ্য এসব বলেন নি। কিন্তু গরু নিষে তিনি একটু আপত্তি করে-ছিলেন। অনেক ছোট থেকে তিনি মনোরমাকে চেনেন। ঠুঁদের বাড়ির সবাইকে জানেন। মনোরমাকে বাড়ি ভাড়া দিতে তিনি আপত্তি করেন নি। কিন্তু গরু-টরু আনতে বারণ করে-ছিলেন। গরু নিষে মনোরমা যখন বাড়িতে ঢুকলো তখন তিনি মৃদু একটু ভাবি কবোধিলেন।

মনোরমা মুখ ভার দেখে হেসে ঘলেছিল, আপনার অতোবড়ো গোয়াল। ওখানেই কোনরকমে আমার গরুর একটু জায়গা হয়ে যাবে। অবোলা জীব, কোথায় যাবে। বলুন ত'?

মৃদুজ্যোগিষী বিরক্ত হলেও আব বলেন নি। বছরখানেক চলে যাবার পরেও না। বলবেন কি করে? আপত্তি কর-বার মৃদু রাখে নি মনোরমা। গতর দিয়ে পুষ্টিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু যৌন থেকে মৃদুজ্যোবাড়িতে মদনবাবুকে দেখা গেল সেদিন থেকে মৃদুজ্যোগিষী অতঃপর মনোবমাকে বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি দেখতে বলতে লাগলো, আমি ত' গোড়াতেই যা তোকে বলেছিলাম বাহা গরু নিষে তুই বড় দুশাকিলে ফেলিল আমাকে। তোর গরু বাড়িটাকে নোংরা করে ছাড়লো। বাড়ির কি হাল হয়েছে দেখ দিকি? না, না। একমাসের ভাড়া তুমি না হয় না দিও। তুমি অন্য বাড়ি দেখ।

মনোরমা প্রথমটা অবাক হয়ে গিষে-ছিল। তারপর কিছু একটা বুঝে চুপ করে গিয়েছিল। কোন উত্তর দেয় নি। আদিত্য অনেক পরে জেনেছিল মনো-রমার মৃদু যখন জানলে আদিত্যের কোন ক্ষতি হবে না। মদনবাবু আর মৃদুজ্যোগিষীর ছোটমেয়ে সম্পর্কে মামাতো ভাইবোন। কিন্তু তাদের দুজনের সম্পর্ক ঠিক ভাইবোনের সম্পর্ক ছিল না। এই জন্যে মৃদুজ্যোগিষীর ছোটমেয়েকে তাঁর স্বামী পরিত্যাগ করেন। মদনবাবু কলেংকারী করে সিংহলে চলে গিয়েছিলেন। সকলেই ভিবেছিল উনি আর ফিরবেন না। কিন্তু উনি ফিরেই গোলমাল বাধালেন। মদু শেয়ে বাড়িতে ঢুকে 'বোঁ বোঁ' বলে চোঁচাতেন। বানের ছেলটাকে জোর করে বলাতেন 'বাবা'। সে যতো বলতো 'মামা' ততো তিনি রেগে যেতেন।

বোধ হয় ভেতরের রহস্য সমস্ত ফাঁস হয়ে যাচ্ছে দেখে মৃদুজ্যোগিষী

ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠাছিলেন। মনো-রমাকে তাড়াবার মতলব করছিলেন।

মৃদুজ্যোগিষী রোজই ঘানে ঘান করেন। মনোরমা অতিষ্ঠ হয়ে শান্তি-নাথকে যা নয় তাই বলে। শান্তিনাথের গয়গজ্ঞ ভাব। কেটে যাচ্ছে যাক না। গালমন্দ করছে করুক না। কতো করবে? কানে আঙুল দিয়ে থাকলেই হল। গায়ে ত' আর ফোসকা পড়বে না।

আসলে আদিত্য পরে বুঝেছে এর মূলেও শান্তিনাথের অজান্ত মৃত্যুচিন্তা। একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ঠাটবদল যে কতো মারাত্মক, কতো করুণ, কুরোখানি শোকাবহ সে ত' আদিত্য পূরনো বাড়ি থেকে চলে আসতে গিয়েই খানিক জেনেছিল। এই নতুন বাড়ি এসে একবছর অতিক্রান্ত হবার পরও শান্তিনাথ স্বাভাবিক হতে পারেন নি। প্রায়ই অসহ্য কষ্টে ভুগতেন। ছেলে-মেয়ে পড়ানোর ব্যাপারে নাম হয়ে গিয়ে-ছিল। বঙ্গবাম গলিতেও ওরা আসতো দলে দলে। পড়ালে সংসারের আয়ও বাড়তো। শান্তিনাথ কিন্তু পড়াতে তেমন আর পারতেন না। টিউশ্যানী ছেড়ে দিতেন। লোকজন বেশি থাকলে সেই একা থাকবার ভাবনাটা আর আসবে না জেনেও। মনোরমার চাঁৎকার বেড়ে উঠতো ক্রমশঃ। আদিত্য ক্রমশঃ বড়ো হচ্ছে। স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হতে চলেছে। এ বাড়ির ভাড়াও বেশি। চা-বাগানের শেয়ার থেকে টাকা আসছে না। শূদ্র গিরিভব বাড়ি থেকে পাওনা। তাও তো বছরকাব বাড়ি সারানো আছে। তাব জন্যে অমন পাঁচ-ছশো টাকা যায়।

মনোরমা দেখতো জীবনটাকে যতোই সে দাঁড়ি করতে চাইছে ততোই শান্তি-নাথ মনোরমার পদ দুটি ক্রমাগত মাটিব দিকে, অন্ধকারে টানছেন। মনোরমা থাকতে পারতেন না চুপ করে, গর্জে উঠতো, ছেড়ে দিলে, টিউশ্যানী ছেড়ে দিলে? মাগো, অতোগড়লো টাকা। একবার ভাবলে না চলবে কি কবে? মরণ, মরণ। হার্টফেল হয়ে যাবে। ত' যায় তো যাবে অমন পচা হার্ট ফেল হবে। ও রেখেই বা কি হবে? কি লোক বল ত' তুমি? ঐ যে বলছি, আমি না থাকলে তোমার হাড়ের দুর্গতি হত!

শান্তিনাথ এখন আর চুপ করে থাকতে পারতেন না। মডটা সম্ভব কথা না বলবার চেষ্টা করতেন। অপরাধী, কুশ্চিন্তভাবে মনোরমার প্রত্যেকটি অভি-যোগ মাথা পেতে নিতেন। কিন্তু মনো-রমার এ সময়ে হয়েছিল কি, মনোরমা একবার কোন কিছু আরম্ভ করলে আর সহজে ছাড়তো না। বিবেক বলে একটা কথা অবশ্যই আছে। কিন্তু বিবেক ত' সেই মানুষেরই। সুতরাং তারও সহন-

শীলতার একটা সীমা আছে। অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও শান্তিনাথ আর নিজে অপরাধকে অতো বড়ো করে দেখতেন না। তাঁর অতবড়ো ব্যাধি আব সেই জন্মেরই সংসার তথা মনোরমার এ দুর্গতি।

কিন্তু এই ব্যাধি ত' ইতো কবে তিনি বুকে গোষণে নি। সমস থাকতে মনোবমাব বাবাকেও তিনি সাহ-যান করে দিয়েছিলেন। ভাড়াটা আগে যা হবার তা হয়েছে, এখন ত' তিনি নড়াচড়া করছেন। বুকেব অসহ্য বাট নিষেও টিউশ্যানীর পর টিউশ্যানী বলে যাচ্ছেন। এই সেদিনও করেছেন। এই নতুন বাড়িতে এসে উপাত্তটা আবার বেড়েছে তাই একটু ক্ষান্তি দিয়েছেন। তাঁর অপরাধ কোথায়? সুতরাং শান্তি-নাথ বলতে ছাড়তেন না, কি অব দূর করো? আব যাই কবো টাকা বেগেব ত' তুমি করো না।

ও। ভাবি টাকা পোজগাব তো তোমাব লজ্জা আছে? কুটোটি লগে এক করো না। এদিকে আবার কথ্য, ঠাকুবা। বাড়ি ভাড়াব বিলে সই বগে, চা-বাগান থেকে টাকা এলে কাগজে সই দাও। এই তো কাছ। বিবল্টাও বদ নিজেকে কবতে হত, বুঝতাম দুশেব! মৃদু নেড়ো না, বুঝলে?

শান্তিনাথ তবু মৃদু নাড়তো। মাঝে মাঝে ফোড়ন কাটতেন। এক রাতে বিবেকের দংশন অনুভব করে না। মনোবমা নিষেধ কবতো। কিন্তু শান্তি-নাথ ছাড়তেন না। তিনি মনোরমার হেড গা, কপাল চিপে দিতেন। সীতে হামা, অনায়া, ফেবতব অনায়া, ছুঁনি মাতা, জন্যে এ্যাডো বব, সেই তোমাব সই বগে তর্ক করা। সৈগেব মত শান্তিনাথ হই বই করতেন।

শান্তিনাথ বাদবাব বগেব না মনো বলো, ভবি আগার মত বগেব। মনোরমা প্রথমটা কিছ; বগেব না। সাবাদিনেব শান্তিব গব এই মত বগেব ভাগো লাগতো। বিবল্টা এ মত ন্যাকাসি ধবানো কথান হইবো মনো-রমাব জলে মেত। বগেব মত বগেব ভাবে মনোরমা বলতো, হইবো কফা কবোহি। এখন সামনে বগেব বগেব ত' আদিত্য ইয়াযিলে বগেব বগেব আলোয় বই পড়তে পড়তে বগেব-গোয়েব কথোপকথনে কান পেতে বগেব। মনোরমাব মনটাকে এতটা বগেব থেকে ভাবতে চেষ্টা কবে এই বগেব একটা চমকে উঠতো যে শান্তিনাথের প্রতি মনোবমাব তেমন কোন মেহ, প্রীতি প্রম্মা ইত্যাদি ভাবাবেগ কখনো দেখে নি। শূদ্র দেখেছে এক অশুভ বগেব বাবো এবং তা শূদ্র বাবার প্রতি মনো, তা প্রতি, অনান্য আত্মিয়ে প্রতিও

মনোরমা কাজ করতে করতে আপনমনেই বলতো, 'কর্তব্য'। 'শুদ্ধ' কর্তব্য করতে সংসারে আসা। 'শুদ্ধ' সকলের জন্যে করে যাও। চেও না কিছু কারো কাছে থেকে। ভালোবাসা, ভালোবাসার ঘেন্না ধরে গেল।

এসব কথা শান্তিনাথকে উদ্দেশ্য করেই বলা নির্ঘাৎ ভেবে শান্তিনাথ আরো জোরে জোরে সাবান-মাথা, নিজের কাপড় কাচতে আরম্ভ করতেন বিকৃত-মুখে।

মুখরজ্যোতিষ্মীর বাড়ি থেকে দু-বছর পর উঠতে হল। ব্যাপারটা সৈদিন চরমে উঠলো। সারাদিন ধরে সৈদিন অসামান্য দুর্যোগ। মুষলধারে বৃষ্টি। আদিত্যদের গরুটাকে দাঁড়ি ছিঁড়ে এই ঘন বর্ষার দিনে কোথায়, কোন বনবাড়িতে সৈদিন পালিয়ে গিয়েছিল ওরা তার হৃদিস পায় নি। অমন দুর্যোগ, তবু মনোরমা স্থির থাকতে পারে নি। আদিত্যকে বলেছিল, হ্যাঁবে, চুপ করে থাকবি? অবোলা জীবটা কোথায় গেল দেখবি না? দ্যাখ না বাবা একবার পাউন্টলে। না হলে কোথায় বাবে বল?

মনোরমা যদি হুকুম করতো, চড়া কথা বলতো আদিত্য তাহলে 'শুনতো' না। কিন্তু মনোরমার মুখে এই ধরনের কথা হালেকালে শোনা যেত। এ ধরনের কথা, আদিত্য দেখতো, তার শূকনো বসকসহীন মাঝেও আশ্চর্য লাভগায়স্বী দেখাচ্ছে। মাঝে মনে হচ্ছে অনেক দূরের, ঠিক চেনা নয়, অচেনাও নয়, আবার কেমন যেন করুণ, কাম্বার মত, সন্ধ্যাবেলার দিগন্তের মতন। আদিত্য ঝড়জলে বার হয়ে সর্বত্র ঘুরে এসেও গরুকে তখন পায় নি। রাত তখন অনেক। ঝড় একেবারে থেমে গেছে। আকাশে মাঝে মাঝে রাগির ঝিলিক। বৃষ্টি পড়ছে চুপি চুপি। কালো কালো বৃষ্টি। মনোরমা বলল, দেখ তো, দুয়ারে কিসের শব্দ হল? ওই বোধ হয় শান্তা এসেছে।

সত্যিই তাই। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলো আদিত্য। গরুটাব সর্বাংগে কাবা। জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে। পিঠে, মাথায় লতা জড়িয়ে রয়েছে। বড় বড় দুটো চোখে গভীর আশংকার ছায়া। মনোরমা তাড়াতাড়ি গোয়ালের দিকে গেল। কিন্তু একি? টেবের অলোয় দেখা গেল মুখরজ্যোতিষ্মীর গোয়ালে প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। ভেতর থেকে গুঁদের গরুর জাবকটাব শব্দ আসছে। মনোরমা চোঁচিয়ে ডাকলো শান্তিনাথকে, ওগো, এখানে একবার এস ত'।

শান্তিনাথ তাড়াতাড়ি এলেন। হতভম্বের মত সকলের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর সকলেই



মনোরমা তাড়াতাড়ি গোয়ালের দিকে গেল

এক একবার করে তালায় গায়ে হাত বোলালো। বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না যে জিনিসটা আর কিছুই না, তালা। একবার কি মনে কবে আদিত্য মুখরজ্যোতিষ্মীর ঘরে বাবার দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে চাইলেন। শান্তিনাথ বললেন, না। মনোরমা একবারও মুখরজ্যোতিষ্মীকে বলল না, আমাদের একটিমাত্র ঘর। গরুটাকে কোথায় রাখবো? অন্তত গোয়ালটা আজকের মত খুলে দিন।

বাইরে আবার ঝড় 'শুদ্ধ' হয়েছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকচ্ছে।

মনোরমা শান্তাকে ঘবে নিয়ে এল। আর শান্তিনাথ, আদিত্য, মনোরমা হাসি না, কান্না না, 'শুদ্ধ' এক নিপারদুর্ভাগ্যকে যেন সকলে বসেস জুড়ে। এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বাত জুড়ে, একসঙ্গে অনভব করতে লাগল। দুঃখে আর যন্ত্রণায় গরুটা পর্যন্ত বোবা হয়ে গেছে।

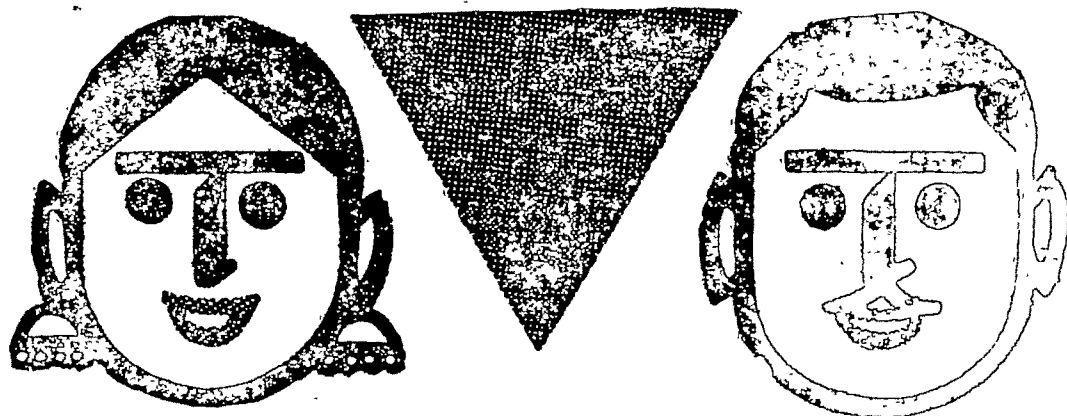
শান্তার চোখ দিয়ে অবশেষে জল গড়িয়ে পড়ল।

তারপরের দিনই মনোরমার আর একটা গাশিতে বাসা বদল করে ফেলল। এই নতুন বাড়িতে, এই পালপাড়ায় এসে

প্রকৃতপক্ষে আদিত্য বড় হল। তম্পশ্চ-ভাবে আদিত্য বুঝতে পারল তাদের সকলের যা হবার তা হয়ে গেছে। আর কিছু হবার নেই। এখান থেকে যতখানি হেঁটে যাওয়া যাবে ততখানিই অস্বকার।

শান্তিনাথের বুকে বস্ত্রা হত ঠিকই কিন্তু শান্তিনাথ যেন একটু একটু করে বস্ত্রা ভেলবার শক্তি পাচ্ছিলেন। কি করে এমনটা হল এটা জানা যেত না। কেন না এ সব আলোচনা, ব্যাকর এই বস্ত্রা সম্বন্ধে যে কোন আলোচনাতেই শান্তিনাথের বথেষ্ট আপত্তি ছিল। 'উনি পছন্দ করতেন না। কেন, আর কি কোন আলোচনা নেই? কোন কথা নেই তাববার? আমার এই কণ্ঠ নিষে আলোচনা কবা মানে ত' আমাকে হেনস্থা করা? কি লাভ তোমাদের? এমনি আমার কণ্ঠ অনেক। তার ওপর আবার আমাকে নিয়ে রসিকতার আয়োজন? সহানুভূতি? কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ শান্তিনাথ তাঁর কণ্ঠ তাঁর নিজের কাছেই গাঁজিত রাখতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি কখন কোন আপোস করেন নি। কেন না তিনি জানতেন তিনি গুরুতব কোন পাপের বোঝা নিঃশব্দে বহন করে চলেছেন। একটা কুণ্ঠিত, রসত, বিপর্যস্ত ডা

আর এখন হলে নয়



তিনের পায়ে কখনও নয়

dayp 70/152

সর্বদাই তাঁর সঙ্গে ছিল। অশ্রুত ধরনের আত্মশ্লানিতে ভুগতেন। আদিত্য তার বাবাকে অনেকদিন বাত্রে দেখেছ বর্ষটির ছাঁট যাতে মায়ে শোবার জায়গায় আসতে না পারে, তাব জন্যে আদিত্যকে জানলা বন্ধ করবার আদেশ না করে নিজেই বিছানা থেকে ঘুমের ঘোরে টলতে টলতে উঠে, জলে ভিজতে ভিজতে রাস্তার দিকের জানলা বন্ধ কবছেন। মায়েব ঘুম যাতে ভেঙে না যায় তাব জন্যে বাইরের বোমাকে হল ঢেলে ভিজিয়ে বাতেন যাতে বাত দশটাব পব অংশপাশের লোকেরা বসে বসে গজালি না করতে পারে। মৃৎশ্বেজাগমীর বাড়িতে টিউশানী তেমন করতে পারতেন না। এই বাড়িতেও বৃকে অসহ্য কষ্ট হত কিন্তু তথাপি মনের মধ্যে গভীর একটা শান্তি অনুভব কবতে করতে মরতে মরতেও শান্তিনাথ অসংখ্য টিউশানী করতেন।

যখন মনোবমা খিচিমিচি লাগতো তখন শান্তিনাথ অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন ঠিকই কিন্তু আদিত্য যখন বলতো, মা ভীষণ চেষ্টায়। পাড়ার লোকেরা ভাবছে এদের বাড়িতে খনোখনি কান্ড চলছে। কার্কাচিল বসতে পারে না এমন চীৎকার। আমাদের আর এ গলিতে মান-সম্মান নিয়ে থাকা চলে না। তখন শান্তিনাথ আদিত্যকে সমর্থন কবতেন না। সর্বদাই মনোবমাব পক্ষ অবলম্বন করতেন। বিষাদ-জড়ানো আন্তরিক, ভিজ্জে গলায় বলতেন, ওর দিকটাও তা ভাবতে হবে। সেই চোন্দ বছর বয়েস থেকে তাকেই সংসারে। কোনদিন শান্তি পাব নি। তোমাকে তা কটাটা ফেলে এক করতে হয় না। সব ঐ কথানা হান্ড মশ্ববুজ্জে কব যাচ্ছে। একবারও কি ভাবো, গিবিডিব বাড়ির কথা? বতো আমাদের বাড়ির টাক্স জানা? ভাড়া কতো পাই জানো? ঐ তোমাব মা, মৃত্যু মেয়েছলে, সব জানে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিস্ট্রীদের শব্দ কাজ দেখে না। বাড়ি মেঝেমতের সমব নিজে মজুবলীর সঙ্গে বসে খোষা ভাঙে। বন্ধুতে চেয়েছ এসব? ও যদি একটু, চোঁচিয়ে শান্তি পায় তাতে, আমাদের খাবাপ লাগলেও, কিছ, বলার নেই। ঠিক এবকমভাবে যখন শান্তিনাথ কথা বলতেন তখন শান্তিনাথের দিকে তাকায় তাঁর ছেলে আদিত্য ভাবতো, শিল্পী হতে গেলে বাবার কলিক্ততা আমাব হওয়া চাই। মৃত্যকে গভীর করে জানা চাই। মৃত্যব উপলব্ধিব ভেতব দিয়ে জীবনকে নতুন কবে স্পর্শ করতে পারবো। আর তার বাবার জন্যে কবুণা হত। হায়, শিল্পী যে অভিজ্ঞতায পড়ল মহং শিল্পী হয়ে যায় সেই একই অভিজ্ঞতা তাঁব হল, কিন্তু জ্ঞানের সীমানাম্বতার জন্যে সেরকমের উপলব্ধি তাঁব হল না।

তিনি থেকে গেলেন অন্ধকারে, বিহীনতায়। রাস্তার মোড়ে আলো-শেষ বিকেলে গভীর, বিষয় মূখে একা একা বসে হৃৎপিণ্ডে মৃত্যুশব্দ শুনতে থাকা এক অসহায়, বিপন্ন, ব্যর্থ বাবার ছবি আদিত্যের মনে চিরকালের জন্যে মূদ্রিত হয়ে রইলো। তাব ফলেই জীবনের দাফল্য সম্বন্ধে আদিত্যব আর কোন আশা অবশিষ্ট ছিল না। সে আর শেষ পবীক্ষাটা দিলে না। বোধ হয় সে কাবণে তার জুতেতে কোনদিন পাগিশ পড়ে না সেই কাবণে। অর্থাৎ তার সাইকেল যদি কেউ মেঝামত করে কার্কাচিট শব্দ-গুলি হতে না দেয় তাতে তার আপত্তি নেই কিন্তু যদি চলছে চলক না সাইকেলটা কিছুত আওরাজ করতে করতে। জীবনে কতকগুলো দঃখ যে অবধারিত এ জ্ঞান তাব হাষে গিয়েছিল। একজন গণকব একবার ছেলেবয়সে তাব করকোষ্ঠী বিচার কবে বলেছিল সেও নাকি তাব বাবাব মত হবে। অর্থাৎ বাবাব এই অশ্রুত রোগটি তাতেও বর্তাবে। কথাটি অবৈজ্ঞানিক। পড়াশনো করার চিন্তা শব্দ করার পব এ তথ্য জ্ঞানলেও একটা অশ্রুত উৎকণ্ঠা আর ভবে মারো মাঝে আদিত্য আড়ষ্ট হয়ে উঠতো, যদি কখনো সত্যি সত্যি তাকেও রাস্তাব মোড়ে হাতে নাড়ি ধবে অবিকল তাব বাবাব মত বিপন্ন মূখে বসে এ জন্মের দেনা মেটাতে হয়?

অফিসে কাজ করতে করতে সে নিজে ওপরে কতোখানি উঠতে পাববে তার একটা হিসেব সে করে নিসেছিল। বেশিদূর সে যাবে না এটা ছিল ধ্রুব। তবে সে ক্ষতবিক্ষত হবে। তব, সান্দ্রনা এই, জীবন মানে কি, তা জেনে যেতে হবে ক্রমশ।

মাঝে মাঝে শূন্যব দিকে তাকিয়ে তার চেয়েও নোঁরা, অশ্লীল নীচ লোকটাকে জিগোস করতে ইচ্ছ হত, কিছুই কি তাকে দেবার ছিল না? বিষয়তা বোধ করার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছাড়া? লোকে বড় বড় কাজ করে। রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি। সত্যি সত্যি এ সবের কোন মানে ছিল না তার কাছে। বড় একা বোধ হত। এ একটা অশ্রুত ব্যাপার। দিনেব পর দিন কালো ছবি অঁকা। এখন থেকেই যেন নিজেই প্রস্তুত কবতে পাবা যায় চরম সমবেব জন্যে। আব আশ্চর্য, হত্যা ও খুন সম্বন্ধে তখন আকর্ষণ জন্মেছিল। মনে মনে আদিত্য অসংখ্য লোককে হত্যা করতে। মূখে এদের কার্যকারিতা আদিত্য জানতো না বটে কিন্তু দ-চারটে হত্যা তার দ্বারা সংঘটিত হোক। এ আদিত্য মনপ্রাণে চাইতো। মানুষের চান্দচলন, ভীল, কথাবার্তা সবটাই আসলে মূখ

ভ্যাচানো। দয়া-মায়া অত্যন্ত ফাকা কথা। ভালোবাসা অর্থহীন। আদিত্যের নিজের জীবনেরও যে কোন প্রয়োজন আছে এমন মনে হয় নি। আত্মহত্যাই করে ফেলতো আদিত্য, এই বাড়িতে থাকতে থাকতে সেই আশ্চর্য ঘটনাটি যদি না ঘটতো। রিজাওয়াল, বিড়ওয়াল, খুনে, গুন্ডা, লস্পট, দালাল এদের কাউকেই ভালো করে আদিত্য চিনতো না। বটে কিন্তু এরাই আদিত্যব নিজের লোক বলে মনে হত। অভিজ্ঞত, অজ্ঞানের আদিত্যের স্বভাবের গড়নই ছিল ঐরকম। গোড়ার দিকে তাব কিছু বন্ধ জুটোছিল। তারা ছিল অশ্রুত। আদিত্যের স্বভাবের গড়নই ছিল অশ্রুত। হয় সাহিত্য না হয় রাজনীতি—এ দুয়ের একটা তারা বেছে নিয়েছিল। এতে তারা অনেক রস পেতো। আদিত্য মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে ভিতোহ। শব্দ তাই নষ। ওরা কিছু একটা করবার জন্যে সব সময় উত্তেজনায ফটতো। দারুণ বিস্ময়ে আদিত্য ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতো। এ্যাতো ভালো কাজ কিন্তু তার জন্যে এ্যাতো উত্তেজনা কেন? কিছু একটা করতেই বা হবে কেন?

ওদের সঙ্গে সব ব্যাপারেই থাকতো আদিত্য। কিন্তু এসব ভালো লাগতো না। মানুষেব মশল করবার দায় মানুষ মেনে নেবে কেন যখন সে তার নিজের দায়ই মেটাতে পারে না। এই সহজ কথাটা বন্ধুবা বৃদ্ধে চাইতো না।

কিশোরবেলায ভালো লাগতো হাঁটিতে, মাইলেব পর মাইল। আব আবো বড়ো হয়ে যখন কিছুই তেমন ভালো লাগতো না তখন কোন কোন বিকেলে নিজের নিস্তব্ধ মাঠে শুরে শুরে দাঁড়ি ওড়াতে ভালো লাগতো। কোলকাতার অফিসে যখন যেতে লাগলো তখন ছুটির দিনগুলিতে সমষ কাটানো ছিল তপস্যা। কি আর কবে আদিত্য? বাড়ি থেকে নির্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে কোলকাতা চলে যেতো। ফিবতো রাত নটা-দশটা। অফিসের বন্ধুদের দ-একজনের মেসে গিয়ে কবে তাস পিটে আসতো। বন্ধুদের কেউ কেউ ওর এই অসাধারণ তাস প্রীতির জন্যে অবাক হয়ে বলতো, কি হে! ডেলিপ্যাসেঞ্জাব হাষেও ববিবারে কোলকাতা চলে আসো রাজ্জ? ওখানে কি তোমাব কোন বন্ধ-বান্ধব নেই?

মুখটা বিমর্ষ করে আদিত্য বলতো, ওরা কেউ তাস খেলে না। তবে ওরা কি খেলে? রাজনীতি আর সাহিত্য। গটি-কলেক হাই তুলে মূর্খের কাছে ডুড়ি বাজিয়ে আদিত্য বলতো, দূর, দূর। কি হবে ও সব? তাব থেকে ঢের ভালো তাসখেলা। বলে ময়লা, তেল চটচটে,

[শেষাংশ ১৬২ পৃষ্ঠায়]

সামনের ছোট ফটক খুলে একটা মানুষ ঢুকলো, যেন কালো পাথর খোদাই করে তৈরী হয়েছে তার দেহ। একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলো—“সমুদ্রে চান করবেন না কি গো?”

পূর্বী নুদিয়াদের আমি এর আগেও দেখিছি, কিন্তু মানুষটাকে দেখে শিউলি একটু হকচকিয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝিয়ে চললুম শিউলিকে। শিউলি রকের ওপর বসতে বললে ওকে। জিজ্ঞেস করলুম—“কি নাম তোমার?”

—“চক্রবর্ত্তর গো বাবু,”—হেসে জবাব দিলে চক্রবর্ত্ত।

বললুম—“বাবু চক্রবর্ত্তের সঙ্গে মিলিয়ে তোমার বাবা-মা তোমার নাম রেখেছিল। তা তুমি নাও কত করে?”

চক্রবর্ত্তের কুণ্ঠিত ভাব—“খুশী হয়ে যা দেবেন।”

শিউলিকে জিজ্ঞেস করলুম “যাবে নাকি চান করতে?”

—“না বাবা। সাতার জানি না, শেষে কি ফুবে মরবো,”—ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে শিউলি।

শিউলির জবাব শুনে হো হো করে হেসে উঠলো চক্রবর্ত্ত। হাসি থামিয়ে বললে—“হাই দ্যাখ, কি বলেন গো মা ঠাকরুণ। চক্রবর্ত্ত সঙ্গে থাকতে ফুবে যাবেন কি গো। স্যাই-ই, স্যাই-ই সেদিন কত সব ফিলিম ইন্টার এলেন পূর্বী বেড়াতে। কে তেনাদের চান করিয়েছিল? এই চক্রবর্ত্তর।”—নিজেব বকের দিক লক্ষ্য করে নিজের ডান হাতের তর্জনীটা বাড়িয়ে দিলে চক্রবর্ত্ত।

শিউলির সিনেমার কৌকি খুব বেশী। ফিল্ম স্টারদের কথা শুনে উৎসাহ বেড়ে গেল। বেশ উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে—“কে কে এসেছিল?”

—“অনেক এসেছিল গো মা।”

শিউলি এক একটা নাম বলে, চক্রবর্ত্ত কোনটা হ্যাঁ, কোনটা না বলে জবাব দায় শিউলির জিজ্ঞাসার। একজনের নাম করতই চক্রবর্ত্তের সে কি হাসি—“ডেনার কথা আর বলেন কেন? সাতার কাটার পোষাক পবে আমাব সঙ্গে তো নামলেন জলে। বললুম, মা জননী, এ তোমাদের সখের দিগি নয় গো। এখানে সাতার কাটার চেষ্ঠা কোরো নি। তা কে কাব কথা শোনে। এক ডেউ-এ আছড়ে এসে পড়লেন পাড়ে, ফিবতি ডেউ টেনে নিয়ে গেল বশিটাক দূবে। সঙ্গী সামস্ত ধাবা পাড়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখাছিলেন, গেল গেল করে উঠলেন। কি কবি, খাঁপিয়ে পাড়ে খললুম চেপে চলল বকুটি। তাবপব নিয়ে এসে আছড়ে ফেললুম বালিব ওপর। বেশী কিছু হয়নি, শব্দ থানিকটা নোনতা জল খেয়ে ফেলাছিলেন। তাও পেটে চাপ দিতেই খামি হয়ে বেরিয়ে গেল।”

একটু মজা করার জন্য শিউলি বলে উঠলো—“আমাকেও তাহলে চলল বকুটি খরে নিয়ে এসব তো?”

—“আরে ছ্যা ছ্যা। আপনি তো আর পোষাক পরে সাতার কাটেতে যাবেন না।”—জিভ কেটে বোলে উঠলো চক্রবর্ত্ত।

—“না বাবা, দরকার নেই আমার সমুদ্রে চান হবে।” কিছতেই রাজী হল না শিউলি। চক্রবর্ত্ত অনেক কাহুতি মিনতি করলে, কিন্তু শিউলির সেই এক জবাব—“না আমি সমুদ্রে চান করবো না।”

শেষে বিরক্ত হয়ে বললুম—“ও থাক চক্রবর্ত্ত। চল, আমি যাচ্ছি।”

হাফ প্যান্ট পরে কোমরে গামছা জড়িয়ে যখন বোবিয়ে আসছি, রাজা বায়না ধরলো “আমি যাবো, আমি যাবো।”

শিউলি রাজাকে থামবার জন্যে এগিয়ে আসাছিল। তার আগেই চক্রবর্ত্ত ছোঁ মেরে রাজাকে কাঁধে তুলে নিয়ে একেবারে ফটকের কাছে এসে হাজির। শিউলি রকের ওপর দাঁড়িয়ে আকুল কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে—“ও চক্রবর্ত্ত, ওকে নিয়ে যেকো না। ওকে রেখে যাও।” ফটক পেরিয়ে যাবার সময় চক্রবর্ত্ত শব্দ বললে “কোন ভয় নেই গো মা ঠাকরুণ। চক্রবর্ত্ত থাকতে আপনার ছেলে ফুবে মরবে না।”

দেখলুম সমুদ্রে চান কবানোর কার্যদাটি চক্রবর্ত্তের ভারী সুন্দর। শব্দ একটা হাত ধরে ডেউ-এর ওপর দেল খাওয়াতে খাওয়াতে অনেকটা দূরে নিয়ে যায়। ডেউ এলেই মাথাটা ধরে টুপ করে ফুবিয় দ্যার তলায়। ওর নিজের ও সব মাথা ডোবাবার বালাই নেই। ও যেন ডেউকে আলিঙ্গন করে বকে টেনে নেয়। রাজাকেও কাঁধে চাপিয়ে চান করালো। ডেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্ত্ত যখন টেলে উঠছে ওপরে রাজার সে কি আনন্দ। রাজাকে নিয়ে যখন ও তাঁরে উঠে এল, মোখ মনে হল, এতটুকু জলও রাজার পেটে যায় নি।

এরপর থেকে চক্রবর্ত্ত বোজই আসতো। সকালে চা খাবার সময় এসে হাঁক পাড়তো—“চলেন গো, চান করায় নিয়ে আসি।” রকের ওপর বসা মাত্রই বাজা দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে আসতো ঘব থেকে। চক্রবর্ত্তের সঙ্গে সমুদ্রে চান কবা বেন একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল বাজার কাছে। শিউলি এক কাপ চা বাড়িয়ে দিয়ে বোলতো “খাও।” প্রথম দিন চায়ের কাপ দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল চক্রবর্ত্ত। বলেছিল—“আমাকে।” “হ্যাঁ। তুমি চা খাও না?” চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিল চক্রবর্ত্ত—“মা আমাব অল্পপুল্লা।” সেই থেকে চায়ের বসান হয়েছিল চক্রবর্ত্তের। চা-পর্ব শেষ হবে চক্রবর্ত্তের সাধসামনা চলতো—“চলেন মা, আজ চলেন। আপনাকে চান কবায় নিয়ে আসি।” শিউলির সেই এক জবাব—“না বাবা,

সমুদ্র আমার মাথার থাক। যা ডেউ, দেখলেই আমার বকু কেপে ওঠে।”

রাত্রের দিকেও প্রায়ই আসতো চক্রবর্ত্ত। একটা টাকুতে মতো জড়াতে জড়াতে এসে হাঁক পাড়তো—“মা ঠাকরুণ কই গো?” অধিকাংশ দিনই রাজা তখন ঘুমিয়ে পড়তো। আমি, শিউলি আর চক্রবর্ত্ত হয় ওপরের বারান্দায় নয় তো নিচের বকে বোসে গল্প করতুম।

চক্রবর্ত্তের দেশের কথা শুনতুম, শুনতুম ওদের অদ্ভুত জীবনের কথা। সমুদ্রই ওদের সব। সমুদ্র ওদের মা, সমুদ্র ওদের প্রতিপালক। সমুদ্রের আকর্ষণ ওদের জীবনের পাকে পাকে জড়িয়ে আছে, সমুদ্রের প্রেমের ওরা বিভাব। শিশুকাল থেকে এই সমুদ্রই ওরা দেখে আসছে, মৃত্যুর পরও এই সমুদ্রের বকেই ওরা শান্তির আশ্রয় পায়।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম চক্রবর্ত্তকে—“আচ্ছা চক্রবর্ত্ত, বড় নেই, জল নেই রোজই তো দেখি তুমি সমুদ্র চবে বেড়াচ্ছো। এতে তোমাদের অসুখ করে না?”

“অসুখ!” একটুকাল চুপ করে রইল চক্রবর্ত্ত। দৃষ্টিটা চল গেল দিগন্তে। তারপর বললে—“বনের পাখীরা জলে ছেজে, রোসে পোড়ে, তাদের কি তাতে অসুখ করে? এই সমুদ্রের ভেতরেই তো কত জীব-জন্তু আছে, তারা তো দিশি থাকে। আমবা যে সমুদ্রের পোকা গো বাবু। একাট বার অন্তত জলে না নামলে আমাদের অসুখ করে। আপনারা বোকেন না, আমরা বুঝি। সমুদ্রের কথা আমরা বুঝতে পারি। সমুদ্রের আমাদের ডাকে, সে ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই আমাদের। একদিন হল কি, সকাল থেকে জ্বরে বেহুস। নড়বাব-চড়বার শক্তি নেই। সমস্ত দিন মড়াব মতন পড়ে রইলুম। সন্ধ্য পেরিয়ে রাত হল। অন্যটা কিরকম ফস্ফস্ করতে লাগলো। পান্তা ভাত খেয়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে শুষে পড়লুম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ মাঝ বাতে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হ’ল কে যেন ডাকছে আমাকে—“কি রে, আজ একবারও এলি না আমার কাছে। আমি যে তোরা জন্যে কেঁদে মারা হয়ে যাচ্ছি। আর আর, শিগাগির আর” তখন ঘব ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লুম। বাইরে তখন বেশ জ্বরে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির মধ্যেই ছুটেতে ছুটেতে গিয়ে খাঁপিয়ে পড়লুম সমুদ্রের বকে। মনে হল কে যেন হাত বালায়ে দিলে সাবা অঙ্গে। ঠান্ডা হয়ে গেল সমস্ত শরীর। অনেকক্ষণ রইলম জলের মধ্যে। তাবপব আস্তে আস্তে উঠে এসে বাছেই একটা বাড়ীর বকে শুষে পড়লুম। সকালে যখন ঘুম ভাঙলো মনে হল শরীরটা বেশ ভালো। জ্বর তখন আমাব দেহ ছেড়ে কোথায় পালিয়েছে।”

মন্ত্রমগ্ধ মত শুনছিলাম চক্রবর্ত্তের

কথা। কি বিচিত্র জীবন এদের! কি অশ্রুত বিশ্বাসের জোর। সন্নল গ্রাম মানুষ চক্ষুর, শিশুকাল থেকে যা সত্য বলে জেনে এসেছে এখনো। জেনেইটেকই আঁকড়ে আছে। স্বাভাবিক বা বিজ্ঞানের খার খারে না। সমুদ্রই ওদের সব।

চলে আসার আগেরদিন যথারীতি সকালে এল চক্ষুর। চায়ের কাপ শেষ করে একেবারে নাছোড়বান্দা করে খরে পড়ল শিউলিকে।—“সে হয় না মা। পুরীতে এসে সমুদ্রেরে চান করবেন না। মহাপ্রভু যে তাহলে রুখত হবেন গো মা।”

শিউলি দু'একবার সেই একভাবেই “না না” করলো, কিন্তু সেদিনের “না” বলার মধ্যে ভাগেকাব সে জোর নেই। শেষ পর্যন্ত চক্ষুরেব অনুরোধ এড়াতে পারলো না। চান করতে যাবার জন্যে বোরিয়ে পড়তে হ'ল চক্ষুরের সঙ্গে।

শিউলিকে চান করিয়ে ফিরে এল চক্ষুর। সে কি আনন্দ চক্ষুরেব—তার অল্পপূর্ণা মার আজ মিতালি হ'ল। তাব আদি জননী সিন্দুর সঙ্গো।

সেই রাতিই ছিল পুরীতে আমাদের শেষ ব্যাচ। তাই সমুদ্রের খার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। শিউলিও ইচ্ছে আরো খানিক থেকে যাই। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। চাঁদ কখনো মেঘের মধ্যে ঢুকছে আবার বোঁবয়ে এসে আলোয় ভাবিয়ে দিচ্ছে দিগন্ত-ব্যাপী সমুদ্রকে। সমুদ্রের সে এক অপূর্ণ রূপ। দিগন্তবিস্তারি একখানা বুগোলী চাদব যেন ঢেউ-এ দূলে দূলে উঠছে। সতর্কতা বিছিয়ে বাঁলব ওপর বসেছিলুম আমবা তিনজন—আমি, শিউলি আব রাজা। বসে বসে দেখছিলাম তরঙ্গমালা। কি বিচিত্র বর্ণাঢ্য শোভা। তুষারের মতট মাথায় পাবে এক একটা ঢেউ আছড়ে এসে পড়ছে পাড়ে। শত সহস্র নাগিনী মাথাব মণি জ্বালিয়ে ফণা বিস্তার করে রুদ্ধ বিক্রমে তেড়ে আসছে মাটির পৃথিবীর দিকে। যুগ-যুগান্ত ধরে এই বিদ্রোহ চলে আসছে।

হঠাৎ একটা বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল পাড়ের অনেকটা কাছে। তীরের প্রবল জল-খাবা আমাদের কাপড় ছামা ভিজিয়ে দিয়ে ছিটকে পড়ল বাঁগির ওপর। আমবাও ছিটকে গিয়ে পড়লাম হাত দুয়েক দূরে।

আমি আব শিউলি দুজনেই ভাড়াভাড়ি উঠে বসলাম। কিন্তু কই, রাজা কোথায়? ঐ কি একটা পুটলিও মত জিনিস ফিরাতে ঢেউ যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল না? সে দৃশ্য দেখে শিউলি কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো। আমিও বেশ জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম। আমাদের

চীৎকার শুনে কিছু দূরে যাবা বসে ছিল, তাবাও ছুটে এল। আমবা যখন চীৎকার চেঁচামেচি করছি ঠিক সেই সময় একটা ভীষণকার দৈত্যের মত মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে। মহাত্মা দৈত্যটা বাজাকে

তুলে এনে নিজের মাথার ওপর রাজ্য পোটটা রেখে ঘোরাতে লাগলো। দু'একবার বমি করল রাজা। বমিটা ছিটক পড়লো দৈত্যটার গায়ে মুখে। কয়েক সেকেন্ড..... তখন রাজাকে নামিয়ে দিলে শিউলির ঠিক সামনে।

ঠিক তখন চিনলাম দৈত্যকে। আরে এতো চক্ষুর! আমরা দুজনেই—আমি আর শিউলি, যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলুম। চক্ষুরকে সামনে দাঁড়াতে দেখেও আমাদের মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

চক্ষুরই মুখ শুললো—ঐ হোথায় বসে জাল বুনাছিলুম গো মা। আপনাব কান্না শুনেই বাড় ফিরিয়ে দেখি—আমার রাজা বাবা ফিরতে ঢেউ-এর সাথে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু বাবে কোথায়? চক্ষুরের থাকতে ছেলে আপনার কোথায় বাবে? আমি তো বলেছিলাম, চক্ষুরের থাকতে আপনাব ছেলে ডুবে মরবে না।

রাজা ততক্ষণে খানিক সুস্থ হয়ে উঠেছে। শিউলির কোলে উঠে মিটিমিটি চেয়ে দেখতে। চক্ষুর হাত দুটো বাড়িয়ে এগিয়ে গেল শিউলির দিকে—“এস গো রাজাবাবু, তোমাকে বাড়ী পৌঁছোদি।” রাজাকে কঁপে চাপিয়ে আগে নাচতে নাচতে চললো চক্ষুর।

পরদিন সকালে যথায়িয়ে এল চক্ষুর। শিউলির দেওয়া চায়ের কাপ শেষ করে যথারীতি বললে—“চলুন, চান করিয়ে নিয়ে আসি।”

বললাম—“আজ থাক চক্ষুর। ও বেলায় তো যেতে হবে। জিনিসপত্র সব বাঁধা-ছাঁদ করতে হবে তো।”

চান করতে যাব না শুনে চক্ষুরের মুখটি বিষম হয়ে গেল, বললে—“তবে থাক আমি তাহলে উঠি বাবু।”

রক ছেড়ে উঠতেই ওকে বাধা দিয়ে বললাম—“একটু বসো। কথা আছে তোমায় সঙ্গো।”

ওর সঙ্গে আমার কি কথা থাকতে পারে বুদ্ধিতে পারলে না চক্ষুর। তবু রকের ওপর বসে বোকার মত চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

গত রাতেই স্বামী-স্বাীতে সলা-পরামর্শ করে ঠিক করছিলাম চক্ষুরকে কিছু বক-শিশ করা আমাদের উচিত। ও না থাকলে রাজাকে আমরা আর ফিরে পেতুম না।

একটু ভাবতা করে বললাম—“দ্যাব চক্ষুর, রাজাকে আমরা ফিরে পেয়েছি শুধু তোমাবই জন্যে। বল কি চাই তোমাব, কি পেলে তুমি খুশী হও।”

চক্ষুর তখনো আমার মুখের দিকে বোকার মত চেয়ে রইল। একটু পরে বললাম—“সে আবার কি কথা গো বাবু। রাজাবাবু, আমার বাবা যে।”

বললাম—“তা হোক, তুমি কিছ

না দিলে যেন বড় দুঃখ থেকে যাবে চক্ষুর।”

কথা শুনে হেসে উঠলো চক্ষুর, বলল—“শুনুন মাঠাকরন, নাবু। কথা শুনুন একবার। ছোট বোয়াল ঘামি একবার ডুবে যাচ্ছিল। এ.টা মোটা সাহেব আমাকে টেনে তুলে এনেছি। কিহুই তো আমবা দিই নি তাকে।”

শিউলি এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। ওকে মধ্যস্থতা মানাতে গুণ বুঝলে এবার বললে—“আমরা খুশী হ'ল দিহুই তোমাবো দিতে দোব কি? তুমি তো ভিক্তে চাইহো না বা জোর-অবহদন্ত করে বিহু আদায়ত করছো না। বল, কত টাকা পেলে তুমি খুশী হও।”

ছি ছি কয়েকটি করে বলে উঠে চক্ষুর—“মা ঠাকরন অনন্য আমি তো লোকের কাছে চেয়ে-ভিনেই আসি। দিন চলে, সন্ধ্যা। তাই বলে দ্যাব এত জন্যে টাকা নেহো। না, না, মাঠাকরন, সে আমি পারবো না।”

পর মধ্যাহ্নেই চক্ষুরের বক্তব্য দাঁতগুলো বেঁচেয়ে পড়লো, না। “মাঠাকরন বক কিছ দিতেই চাই। আমাকে একটা বানারসী পাড়ী দাও। আপনাব পরা পুসোমো ব্যাপার ই চলেবে। বিয়ে হওনা ইত্যক চেনিয়ে। আমাকে একটা বানারসী পাড়ী দাও। বানারসী পাড়ী কেনার পরা পাড়ী পার? পহিবাকো মনের ইচ্ছেটি আঁপু রুগ করতে পারি নি। যদি চান তো একটা বানারসী পাড়ী দান। বড়ী মোটা মনের ইচ্ছেটি তাব পূর্ণ হোক।”

চাইলাম নিউ'লম যুগেপে দিহে চক্ষুরে। কথা শুনে বললো—“—তার দ্যো কি হলেহে। তোমায় বেনারসী পাড়ী। আমাব করে দেনে তোমাব বউকে।”

চক্ষুরের মুখটি খুশীর হাওয়াতে উঠলো।

শিউলি রক থেকে উঠে তেমন একটা আমিও শিউলির পিছা পিছা করে চলে চুকলাম।

সার্টেকেন বলে শিউলি এত দ্যো কণ্ঠী রংরা জীবন ভাড়াভাড় দ্য দেওয়া পাড়ী বার বার চাই দিহে দি, কি বক? আমি অহা এতটা পরি না।”

বললাম—“কিন্তু এতো বেনারসী পাড়ী নয়। এটা তো একটা মনভা পাড়ী।”

আমায় যুগের দিকে দ্যো শিউলি বললে—“আসল বেনারসী এম আমি কোথায় পাই? আব ওকে বেনারসী মনে ও যনে করবে এটাই বেনারসী পাড়ী।”

মাথের এই মানসিক অসুস্থতা নিয়ে সন্দেহ করছিলেন। শান্তিনাথের পিতা-মাতা কেউ ছিলেন না। তাঁরা জীবনের বৃন্ত থেকে অনেক পুর্বেই অব্যবহৃত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা হয়তো শান্তিনাথকে বৃন্তে প্যারতেন। শান্তিনাথের এই অসুস্থত উপলক্ষ্যে জন্ম তার কোন বন্ধু ছিল না। কেন না বৃন্ত হতে গেলে তা সর্বক্ষণ ছায়ার মত ফিবেতে হবে শান্তিনাথের পিছনে পিছনে। সুতরাং শান্তিনাথ দুর্বোধ্য থেকে গেলেন। জেঠামশাই ভাবলেন, বিষে দিলেই এ পাগলামি সেরে যাবে। মনোরমার বাবা কিন্তু অন্য প্রকার সন্দেহ করছিলেন।

শান্তিনাথের বলিষ্ঠ চেহারা, খোঁচা খোঁচা চুল, বড় বড় চোখ আবার তার

বলতেও গিয়েছিল। কিন্তু সে সময়ে চোন্দ বছরের নোলক-পরা, ভাবের মত স্ফুট, চিকণ মুখের বালিকার কথাই কান দেবে কে? তার কিশোরী মনের আলোছায়ার সংকেত অন্য কে বুঝবে, সেই কি বৃন্তে প্যারতো? তার পাড়াবেড়ানী, এক্সা-দোক্কা খেলা বন্ধুরা কি কথা শোনাতে প্যারতো তখন? মনোরমা নিশি রাত্রে ছাদের ওপর শূন্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্টভাবে ভয়ের ছবি আঁকতো। আব মহাকালীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে প্রার্থনা করতো, দোহি, দোহি পরং সুখম্,

মনোরমার বাবার কিছু জায়গা-জমি ছিল চম্বিশ পরগণা জেলায়। তার কিছু রেখে বাকী সবই

শেয়াব—সব মিলিয়ে শান্তিনাথের দক্ষিণে তখন সোভাগ্যদায়িনী লক্ষ্মী, বাবে, হিদ্দা-দায়িনী বাণী, সঙ্গে বলপূর্ণী বাঁতবেয় আর সিদ্ধিদাতা গণেশ। মেঘেরা মেয়ে-দের মায়েরা তাদের মেয়েদের জন্য যেমন জামাই চান, একবারে অক্ষবে অক্ষরে মিলিয়ে শান্তিনাথ ঠিক তেমনটি।

আশীর্বাদ হাথে গেল। শান্তিনাথের ক্ষীণকণ্ঠেব আপতিত সকলের আনন্দ চাঁৎকারে কোথায় ভেসে গেল। আশীর্বাদ হলো গেলেও শান্তিনাথ একবার শেগ চেষ্টা করছিলেন। এ অশ্লেল পোস্টমাস্টার তখন একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি। শান্তিনাথ তাকেই ধরলেন। বললেন, মশাই, সত্যি-কথাই বলছি। আমি স্বদেশী-ফদেশী করি না। ওরকম দুর্মাতি আমার কখনো

এ জন্মের দেনা



সমীর মুখোপাধ্যায়

ওপর বিবাহে সম্পূর্ণ আনন্দ দেখে মনোরমার বাবার সন্দেহ হয়েছিল শান্তিনাথ বোধ হয় স্বদেশী করেন। হয়তো কানাইলাল, ক্ষুদিরামের মস্তাশিষ্য। কে জানে অন্য কোন কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে এ যুবক মনে মনে বোমা ছোঁড়বার জন্য তৈরি হচ্ছে কিনা। শান্তিনাথকে একরকম ধরেবেঁধেই আশীর্বাদের সময় আনা হয়েছিল। শান্তিনাথ যখন মনোরমার বাবাকে বললেন, আপনার মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সত্য কথাই বলছি। বুকে আমার কঠিন রোগ আছে। মনোরমার বাবা ঝাঁ করে শান্তিনাথের বুকের চাদর খুলে ফেলেন। মনোরমার মধ্যে তিনি পাঞ্জাবী ও গেঞ্জিতেও টান দিলেন। শান্তিনাথ ওরকম বুড়োলোককে সৌজন্যের খাতিবে বাধা দিতেও পারলেন না। তারপর শান্তিনাথকে সেই অবস্থায় খালি গায়ে টানতে টানতে সকলের সামনে এনে দাঁড় করালেন। শান্তিনাথের বুকে একটা ঘাসি মেয়ে আনন্দে চাঁৎকাব করে বললেন, বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বার বুকের ছাতি তার বুকে রোগ? হা—হা—হা—। উন্মত্তের মত হেসে উঠলেন মনোরমার বাবা। স্পষ্টই বুঝলেন, এ ছেলে স্বদেশী-দের একজন না হয়ে যায় না।

আদিত্য তার মায়ের কাছে শনেছে, সেই সময় মায়ের বুক অজানা আশংকার কৈপে উঠেছিল। মনোরমা কিছু একটা

বিক্রী করে তিনি পনের টাকা জোগাড় করতে লাগলেন। ঠিক শান্তিনাথকে ভীষণ পছন্দ। না হবারও কোন কারণ ছিল না। শূন্য রূপবান, স্বাস্থ্যবান ছেলেই নয়, এদিকে বি-এ পাশ করছে। কিছু ক্রেশ্বরও আছে। শান্তিনাথের জেঠামশাই-এর বিষয়সম্পত্তি ওই পাবে। গিরিডির প্রকাশড ভাড়াটে বাড়ি, ছোট-বকুলপুত্র গ্রামের চোন্দ বিষে যেনো জমি, দশ-বারোটি বিল, কিছু এখানে-ওখানের

হয় নি। মাতাল লেহেবুকে চোখে দেখবার জন্য রাস্তায় ভিড় করছিলেন একবার। জি-ও-সি সূচ্যচন্দ্র ঘোড়ার গাড়ি সাঁজিয়ে তাঁকে নিয়ে আসছিল। দেশবন্দু, চিত্তরঞ্জনের নামটা মাত্র শুনিয়ে। কাম্বিনকালোও খবরের কাগজ পাড়ি না। কানাইলাল, ক্ষুদিরামের বৃত্তান্ত জানি। ওসব শুনলে গায়ের বস্ত একটু চনমন চনমন করে। বাস, এই আমার ঘনাই স্বদেশী করা। আমি এ বিষয়ে কোন

বিয়েই করতে চাই না। মেয়ের বাপ যদি চান আমি অন্য পাত্র খুঁজে দেখতে পারি। আপনি একজন বি-এ। আপনি কি চান আমি জেনেশুনে উদ্ভলোকের মেয়েকে অনুবিধে ফেলবো? বুকে সত্যি আমার রোগ আছে। সব সময় মৃত্যুচিন্তা আসে। মরে যাবো মরে যাবো মনে হয়। সব সময় মনে হয় ঘর ছেড়ে কেউ যেন না কোথাও চলে যায়। সবাই চেষ্টামোচি করুক। গোলমাল করুক। তাহলে বুকের কণ্ট সম্বন্ধে আমি অনামনস্ক হয়ে যেতে পারি। আপনি শিক্ষিত লোক। কোল-কাতায় আমার সঙ্গে একসঙ্গে হোস্টেলে থেকে পড়েছেন। আপনি ভাই এ বিয়ে রোধ করুন। পোস্টমাস্টার উদ্ভলোক নাকি বলছিলেন, সে কি মশাই? এ কুজ কখনো কি আমার স্মারা হয়? হিন্দু গ্রামের কন্যা। আশীর্বাদ হয়ে গেছে। এখন লোকে শুনবে কেন? আপনার কথা আমি না হয় সত্যি বলে বিশ্বাস করলাম। এ অবস্থায় আমি যদি বাধা দি বিয়েতে, তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছেন? আপনি তা মশাই অনবরত আপনার কথাই ভাবছেন। দুর্গা বলে বুকে পড়ুন। যা হয় হবে। আপনি না পুরুষ মানুষ?

এরকম একটা অদ্ভুত রোগের আশ্রিতের কথা কেউই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে নি কেন, এ কথা ভেবে আদিভা বিস্মিত হতে পারে বটে, কিন্তু সেদিন এ ধরনের রোগের কথা ভাবা অন্যায় ছিলো বলেই কেউ তখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় নি। শান্তিনাথের জ্যেষ্ঠমশাই অবশ্য ডাক্তার, কবিবরাজ কিছুই বাকি রাখেন নি। সকলেই একবারো বলেছিল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, বুকে কোন রোগ নেই। এ এক রকমের মানিয়া। মৃত্যুচিন্তা আসবে কেন? কেন এভাবে শান্তিনাথ বন্দুগা পেয়ে যাবেন? গোতম পুন্ড্রের মনে হয়েছিল মৃত্যুর কথা। জীবনের জটিল বন্দুগার কথা। তারা সব ক্ষণে সত্যপ্রচার করতে এসেছিলেন। তারা বড় বড় মানুষ। যুগ যুগ ধরে তারা আলো হয়ে আছেন। আদিভার বাবা তো বড়মানুষ ছিলেন না। তিনি যে মাপের মানুষ তাঁর বন্দুগাও সেই মাপের হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এরকম অসাধারণ বন্দুগা কেন? সত্যপ্রচারের জন্য তিনি তা নির্বাচিত হন নি। সাধু-সন্ন্যাসীর মতন তাঁর রকম-সকম ছিল না। মৃত্যু মানে কি? জীবনের পটঞ্জ যখন ফুরিয়ে যায়। কিন্তু শান্তিনাথের তখন তা পরিপূর্ণ যৌবন। মৌচাকের খোপে খোপে তখন সূখ। কৃপ থেকে তারায় অমৃত ফরিত হয়ে পড়ছে। প্রবহমান নদীর মতন তখন জীবনের ধারা। শান্তিনাথের জ্যেষ্ঠমশাই অনেকটা ঐ ভাবেই

জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। শান্তিনাথের এ ধরনের রোগ আসলে শূন্য-বসে থেকে চিন্তার জ্বার কাটা থেকে অর্জন করা। অফিস আদালতে কাজ করে না। অস্বাচিন্তা নেই। একটু নির্জনতা প্রিয়। সেই জন্যেই এই সৌখীন খেয়াল। তাছাড়া ডাক্তারেরাও তা একে কোন রোগ বলে নির্ণয় করেন নি। সংসারের জোয়াল কাঁধে পড়লে ওসব বড়মানুষ খেয়াল বাপ বাপ করে পালাবে। শান্তিনাথের জ্যেষ্ঠমশাই সেদিনের মানুষ। তাঁরা চাটিলে জীবন উপভোগের সন্ধান পেয়েছিলেন। চাটিলে জীবন উপভোগ করে গেলেন। তাঁরা জানতেন যৌবনকাল উপভোগের কাল। আর বার্ধক্য ঈশ্বর উপাসনার। জীবনকে এইভাবে সরল দুইভাগে ভাগ করে ফেলতেন। সেই জন্যে তেমন কোন জীবনের জটিলতাও ছিল না। যৌবন উপভোগকে যেভাবে নিতেন ঈশ্বর উপাসনাকেও সেই একই সহজ, সরল, মূল্যবোধে। তাঁরা মৃত্যুর রহস্য কেমন করে বুঝবেন? অপরিসন্ন বন্দুগার কথা? মৃত্যু যে কতো বেশে, কতো রূপে, কতো বর্ণে অনবরত মানুষের যৌবনকে প্রলুপ্ত করছে শান্তিনাথের জ্যেষ্ঠমশাই-এর তা অনুভব করার কথা নয়।

চাঁদ্রশ বছর বয়সেও পচান্নার কুস্তির আখড়া থেকে গায়ে মাটি মেখে লেগে পেরে দাঁতন করতে করতে উত্তীর্ণ নদী এপার-ওপার করে তবে ফিরতেন গিরিডি শহরে। বাদাম-পেস্তা মেশানো খাঁটি ভাইসের দশ সেরটাক টেনে নিয়ে হাঁকাতন, রাম সিং? রাম সিং দারোয়ান সাজোয়ান। তবু শান্তিনাথের জ্যেষ্ঠমশাইকে তেল দিয়ে ডলতে ডলতে বোচারী গলদঘর্ম হয়ে যেত। এরপর কানে আতর ভেজানো তুলো গুঁজে চমনলাল রাজগড়িয়ার গদীতে ম্যাজারি করতে যেতেন। রাত অটটার পর শূন্য হাত বাড়ির বৈঠকখানায় গানের মজলিশ। রাত এগারোটো পর্যন্ত এসব চলতো। শোবার আগে প্রতিদিন রাতে আট আউন্স মদ্যপান ছিল অবধারিত।

স্ট্রীলোক ব্যতীত আর সব ভোগের ব্যাপারে তিনি ছিলেন তাঁর কালেরই যথার্থ মানুষ। সুতরাং শান্তিনাথের মৃত্যুচিন্তা ও তৎক্ষণাত বন্দুগাবোধ তিনি কেমন করে বুঝবেন? আদিভা তার মা মনোরমার কাছে শুনেছে, শান্তিনাথের নির্দেশমত গণগতার নাকি বাঙ্গালমল্লুক রূপনগবে এসে মনোরমাব করকোন্ঠী বিচার করে বলেছিল, এ বিয়েতে তার সর্বনাশ হবে। সুতরাং সময় থাকতে সাবধান। সময় থাকতে সাবধান হলেও যে তাতে সময়ের বিশেষ কিছু এসে যায় না এসব তখন তা শান্তিনাথ জানতেন না। এসব জানার মত তিনি যখন জ্ঞানী হলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিয়ে হল। আর শান্তিনাথ নিয়তির অনিবার্যতাকে

মেনে নিলেন। বিয়ের পর ছটা বছর মোটামুটি মন্দ কাটলো না। চোন্দ বছরের বালিকার আটাশ বছরের বয়। গিরিডি থেকে রূপনগরে আসা অনবরত তা সম্ভব নয়। খুব কমই আসতেন শান্তিনাথ। প্রফুল্ল মৃদু। বড় বড় চোখে প্রায় নিলম্ব, শান্ত দৃষ্টি। সংযত, ধীর কথাবার্তা। মনোরমার বন্দুরা বিয়ের সময় বিশেষ পাস্তা পায় নি। মানুষটা কেমন তাদের জানতে কৌতূহল ছিল। তারা যা যা শান্তিনাথকে জিজ্ঞেস করেছিল শান্তিনাথ সে সবের ঠিক ঠিক জবাব দিয়েছিলেন। তারা মনে করেছিল তাদের সম্বন্ধে শান্তিনাথের কোন প্রশ্ন থাকতে পারে। মনোরমার বন্দুদের সম্বন্ধে শান্তিনাথের কোন কৌতূহল ছিল না। ফলে শান্তিনাথ তাদের কোন কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। তারা চলে যাবার সময় বলল, আসি। শান্তিনাথ সন্মিষ্ট হেসে বলেছিল, আসুন। শ্বশুরবাড়িতে শান্তিনাথ নিজের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নির্দিষ্ট মনে বসে থাকতেন। মনোরমা দিনের বেলা কাঁচিং কদাচিং শান্তিনাথের কাছে আসতো। শান্তিনাথ তাঁর বড় বড় শান্ত চোখে দৃষ্টি মেলে মনোরমাকে বলতেন, এভাবে দিনের বেলা আসতে নেই। ঠাণ্ডা হাসাহাসি করবেন। এর জবাবে বালিকা মনোরমা সদ্য শেখা পাকামী দু-একটা কান্ডে লাগাতে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। শান্তিনাথের শান্ত, বড় বড় চোখেই চক্ষুশান্ত করেছিল। মনোরমা তারপর আর দিনের বেলা শান্তিনাথের কাছে আসতো না।

যৌবনের উত্তাপ শান্তিনাথের ছিল না বটে, কিন্তু যৌবনের স্নিগ্ধতা ছিল। বেলফুলের কুড়ি শান্তিনাথ কালোবাসতেন, নিজের বালিসের তলায় রেখে ঘুমোতে। মনোরমার বালিসের তলায় বেলফুলের কুড়ি শান্তিনাথ অলক্ষ্যে রেখে দিতেন। একটি গোপন, অনুচ্চারিত, আকাশের তারকার মত মৌন, শান্ত, ছন্দময় ছিল শান্তিনাথের প্রেম। শান্তিনাথ কখনো চেষ্টা করে কথা বলতেন না। সাধারণ্যায় নামমাত্র বিলাসিতা ছিল না বটে, মনোরমার মৃদুর চোখেও কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন শান্তিনাথ। বড় বড় সুপুর্নি কটকট করে কামড়ে মনোরমার যখন সম্মুখ তাঁর সামনে যেত তখন তিনি বিয়েতে পাওয়া সুদৃশ্য রূপালী জাঁতি দিয়ে তার হাত থেকে সুপুর্নি নিয়ে সুন্দর, পরিপাটি কুঁচিকুঁচি করে মনোরমাকে খেতে দিয়ে বলতেন, শস্য করে খেতে নেই। মনে থাকবে তা! কথা শেষ করে সুমিষ্ট হেসে আশ্চর্য শান্ত বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকতেন।

শান্তিনাথের দেহের দাবীও ছিল সংযত, কুণ্ঠিত, সংকোচপূর্ণ। কোথাও যেন একটা প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধ এসব ব্যাপারে কাজ করতো। বহুদিন হয়ে গেলেও মনোরমা শান্তিনাথের থালি গা

পড়ছেন আর ভুলছেন। আর আমি সেই কবে বইখানা পড়ছিলাম তবু আসার সময় ঠিক করে রেখেছি যে, আর কিছু দেখা বা নাই দেখা কবির বাড়িখানা দেখে আসতেই হবে। ওরা সবাই কেমন হোটেলে গিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছে, আর আমি এই নিজনি নিঃসঙ্গ পাহাড়ে উঠছি তো উঠছিই। আমার মতো লোক আনন্দ পায় যত, কষ্টও পায় তত। ওদের কষ্ট নেই, তেমন আনন্দও তো নেই—কথাটা ভাবতেই আমার ভীষণ ভালো লাগল, পা বলল, চলো এগোই—সন্ধ্যা হয়ে আসছে যে।

আরো ওপর, আরো, আরো। এরই নাম 'নর্দাদিক'? পাহাড়ী লোকদের কাণ্ডই আলাদা, ওদের কাছে হয়তো এটা কিছুই নয়। কাল সকালে সন্ধ্যা চকের কাছে যখন বসে ছিলাম তখন পাহাড়ী স্নেহগদুলোকে দেখেছি কি অবলীলারূপে পিঠে মোটা বোঁচকা কি কাঠ—কি অন্য কিছু নিয়ে চলেছে খাড়া রাস্তায়। আমরা শহরের লোক, এগারো বছরের বালক—গায়ে গরম কেট, মাথায় টপি, বাবাব সঙ্গে চুপটি করে চলেছে কাঁপনে.....এই সামনের পাথরটা ভিত্তিতে গেল বাহক, কিংকি বলছে রি-রি, ঐ পাইনটা ঠান্ডা হওয়া ছাড়িয়ে দিল বালকের চোখমুখে, বালক অবাক, বিস্ময়ে পুলকে রহস্যে হতবাক তেমনি অবাক পাইন, মরশুমি ফুল, পাহাড়ী বাতাস, ছোটবড় পাথর, ক্ষীণ স্বপ্নাঃ আবে, এতেন চেনা-চেনা, কোথায় যেন দেখেছি একে, কোন্ কালে কোন্ বয়ে যেন ও আমাদেবই মধ্যে একজন হয়ে ছিল। বালকও তাই ভাবে—আমি যেন এদের কোথায় দেখেছি—পবে নিজেকেই বোঝায়, হয়তো বা স্বপ্নে, যখন হিমালয়ে বাবার আহ্বান আসে বাবাব কাছ থেকে সেই সময়ের স্বপ্নে, রাতের স্বপ্নে, দিনের জাগরণে—ঐ দেখ বাঁবি, আমরা প্রায় এসে গেলাম।

আমি সাগরে ওপর দিকে তাকাই। কিন্তু কোথায় পথের শেষ, কোথায় বাড়ি। সামনে শব্দই রসিকতায় খিলখিল করে হেসে লুটো-পুটি খাচ্ছে এই শব্দকো পাথরে পথ। আর তো পারা যায় না। শেষের সীমানা যদি দেখতে পাই—তাহলে নতুন করে বল পায় আমার শবীর। কিন্তু এসব ভেবে কি লাভ—এগোতে যখন হবেই তখন হনহনিয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভালো। পাইনগাছগুলি কালো কালো হলো, ঠান্ডা হাওয়ায় ফট করে হঠাৎ কানে তাল বেগে গেল। তাড়াতাড়ি কোটটা গায়ে পরে নিই। যত ওপরে উঠছি তত ঠান্ডা বাড়ছে—হাটলে তবু তেমন নয়, দাঁড়ালেই, কপালের গালে ঘাড়ের ঘামটুকু শুঁছেই শরীরের ভেতরটা ঠান্ডায় শিউবে ওঠে। 'বাবা, আমার ঠান্ডা জলে স্নান করতে শীত করে।' গিঁধি রাঁবি, আমরা ছেলেবেলায় আরো ঠান্ডা ফনফনে জলে স্নান করতাম। যাও, দৃষ্টান্ত করে না—দেখো, স্নানের পরে কেমন আরাম লাগবে! ও ভাবলেই গা শিউবে ওঠে,

আপনা থেকেই যেন দাঁতে দাঁত লেগে যায়। তবু মন ভাবতে ছাড়ে না। শীতের ভোর অধিকারে ঢাকা, আকাশে তখনো ধুলজ্বলে তারার হাট, কনকনে ঠান্ডা হাওয়া, অথচ বাড়ি অনুযায়ী সকাল। কারণ চারটে বাজল। লেপের তলায় বালক অধোরে ঘুমোচ্ছে। 'রাঁবি ওঠো—ওঠো পড়ো। শোনামাত্র রাঁবির ঘুম ভাঙল, রাঁবিকে উঠতে হলো। 'নরঃ নরো নরঃ, নরম্ নরো নরান'—মোমবাতিব সন্দের পাশে বই রেখে বালক শব্দরূপে মুখপথ করে। আজো কান পেতে শুনলে হয়তো সেই স্বর কোনো না কোনো সময়ে কানে এসে বাজতে পারে। যাই হোক, আপাতত শোনানয়, চলি আর চলা। আরে, আরে—এতো, একটা বাড়ি! সাজানো-গোছানো, সুন্দর। কষ্ট করলে কেউ মিলবেই। পা চলল ষটখট আওয়াজ করে ঘোড়ার খুরের মতো, পকেটের খুচরো পয়সাগুলো ঠুনঠুন করে গতির তালে তালে বাজতে লাগল—যেন ঘোড়ার বগলায় গালানো ছোট ছোট ঘুমুরগুলি ছন্দ কবে বাজছে। শরীরটা যেন হাওয়ায় ভাসা পালকের মতোই কপলকের মধ্যে চলে এলো সেই বাড়ির গেটের সামনে। ফটকের সামনে একটি বড়ো গাছের গাড়িতে টিনের ফলকে লেখাঃ লেফটেন্যান্ট কর্নেল অমর সিং। মনটা দমে গেল ভীষণ, পা দ্রুত অবসর হসে কাঁপতে লাগল। পথ তো এখানে এসেই ফুরিয়ে গেছে—তাহলে "স্নোডন" কোথায়! হঠাৎ মনে পড়ল সেই ঘাসকাটা লোকটার বাণী। তাহলে ঠিক স্নাস্তাতেই এসেছি—এখানেই আশেপাশে কোনো গাছের কি কোনো বনের আড়ালে লুকিয়ে আছে "স্নোডন" অথবা ফবগেট-মি নট। চীৎকার বললাম, কোই হায়? চৌকিদার?

আমাব চিৎকারের তীক্ষ্ণতা বাতাসে মিলিয়ে বাবাব আগেই বাড়ির ভেতর থেকে একেবারে ভেড়ে এলো এক অ্যালেশিয়ান কুকুর। সজ্জয়ে দু' পা গিঁধিয়ে গিয়ে বললাম, 'এই হাট্টা! কাঠের সেটেব ঠিক ওপাড়েই দাঁড়িয়ে গেল কুকুরটা, তাড়া করবে কিনা কে জানে, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে অবিবাম। এখানে আমি একা, নিরস্ত—কাজেই ঐ কুকুর আমাব চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী। চকিতে বৃষ্টি এসে মাথাষ, একটা বড়ো পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিলাম হাতে, ডাকলাম,

'চৌকিদার! সাদাসাৎ নেই কোনো স্নোডন' তাহলে এই কুকুরটাই এখানকার চৌকিদার নাকি? তা কাজট এ সূচনতা দই বহুঃ চোরে ছাড়া কে তার এই সন্ধি কোনো এখানে আসে! চোবে আর পাগলই আসে। নিঃশব্দে যারা জানত পাগল বলে তারা ভাবত পাগলামির জন্যে গর্ভবোধ করে। অস্তিত্ব তাদের থেকে কিছু ব্যতিক্রম নই। বিন্দু আপাতত এইরকম ন বয়ো ন তাম্বা হয়ে কতক্ষণ থাকা যায়! বাথ' কেনও অবত তারস্বরে চিৎকার কব্বাম, 'এ'হা কোই আর্-হায়? আর অমনি দু'বেব একটি কোণে আড়াল থেকে দু' নম্বর ঘাসকাটার আবির্ভাব হলো। আনাব মনে আনাব একে একে দু' সাহস আশ্বাস সপ যেন ফিরে এলো।

বললাম, "স্নোডন" কিম্বা হায় তাই কি?

"স্নোডন"?

ইস্ রাস্তে সে সিনে লে বইতঃ নদীর যেমন শাখা নদী, তেমন পাহাড়ী পথেরও একটি উপপথ সে আমার দর্শন দিল। সেটিকে সে ঘাস্তা বসে বা আনাব আমার সাধ্য ছিল না তা বোঝা।

'এইসে আউ' কির্তান দরে হায় ও কোঠি?'

'নর্দাদিক হায়!'

বড়ো সাংঘাতিক ঐ 'নর্দাদিক' দর্শন! যাই হোক, আপাতত এতটুকু ভাবনা লোকটিকে সে কণা বলতে সে গেট খুলে অবলীলারূপে অমর সিং-এর বাঁতর নীলনে প্রবেশ করল। কুকুরটা এখনো ঘেঁটে ঘেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে দিল্লু এমন চান পান বশত নয়, অভ্যাসবশত। জা এলো। তার ট পান করলাম। তবপব, এতজন বাদ, এতটা সিগারেট খালাম। লোকটি লীলনীর মুমুনে, তাকে বললাম, 'তুমি চৌকিদার হার? গিঁধি নেহী ও মেরা দোস্ত হার!'

কেন্দ্রা নাম হায় তুমহানি?

চতুধলাল!

আউব এ হুস্তা কা? কুকুরটির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন বাকি।

'ইসকা নাম বাঘ' হার



বাঘা অথবা বাঘ আর একবার চিংকার করে তার চতুর্বাণি দেখাল।

আবার ওপরে ওঠা শুরু হলো। এবার **শুভা** বলতে তেমন কিছুই নেই। পা বাড়ালেই রাস্তা গোছের ব্যাপারটা। বাঘাঘা ডাক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এলো। পিছন ফিরে ফেলে-আসা কুঠিটিব দিকে একবার তাকালাম। শত বছর আগে ওখানে না ছিল বাঘা, না ছিলেন অমর সিং, না ছিল বাড়ি—হয়তো বিস্তীর্ণ কেল্লার ছিল। ঐ শাদা শাদা থোকা থোকা ফস্ফেট-মিনারেল পিত্ত পদার্থেরা এখানে দেখেছে একটি পালককে লাঠি হাতে করে একা একা ঘুরে বেড়াতে। দু'চোখ মেলে আকাশ পাছাড়া গাছ পাথর পথের ধুলো দেখতে। দেখতে আর ভালোবাসতে। ইস্কুল পালানো ছেলে—লোমাপড়া ভলোবাসে না বলে নয়, সীতা করে ভালোবাসে বলে। এই গাছপলা নির্মল পাখি সবই তো বই...জয়ন্তু ওয়াড'সোয়ার্থ'।

ঐ, ঐ যে বাড়ি। এরপর আর বাড়ি থাকতে পারে না কারণ, এরচেয়ে উচু একমাত্র আকাশ। হ্যাঁ, সীতাই এসেছি, কটকে সেনাডল লেখা। হিমমাহার ছোট বাঙালো ধরনের বাড়ি, সামনে বাগান, দুটি বেগু, (বাবা, পা খেয়ে গেছে), গদির জটলা, অ্যান্টার, নাম-না-জানা আরো কত ফুল আর গোলাপ। একটা গোলাপ কলকাতার পাঁচটা গোলাপের সমান। ঘুম আছে, আছে শীতল বাতাস, আছে গাছ পাথর আকাশ, নেই মানুষ। কচের জানলা বসানো ঘরগুলি ভেতর থেকে কথ, সদর-দরজায় বাইরে থেকে তালা কলছে। চারিদিকে একেবারে ফাঁকা, কোথাও কোনো লোক নেই। এই কোথের ঘরটিতে হয়তো রবীন্দ্রনাথ থাকতেন, আমি যখন ভাবছি থাকতেন এবং ভাবতে যখন আমার ভালো লাগছে তখন নিশ্চয় থাকতেন...এই জানলায় যাবে তাঁর খাট পাতা, কত রজনীতে তারার অঙ্গপট আলোর দেখেছেন লাল কালি গায়ে একটি মোমবাতির স্নেহ নিয়ে মহাবি চলছেন কাচের আবরণে কোয়া বাইরের বারান্দায় উপাসনা করতে। মৃদু বালক মনে মনে পিতাকে প্রণাম করেছে, একটি পবিত্র সিন্ধু স্নেহ ভাব তার দেহমানে দোলা দিয়ে গেছে—খীয়ে ধীরে আধার উঠেছে গড়ে যেখানে উত্তরকালে একদিন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এসে নিবন্তর বাসা বেঁধেছে। যেখানে অহরহ বর্ণে বর্ণে গন্ধে ব্রহ্মবরুণে হয়েছেন আবির্ভূত। এই বারান্দার বসে বালক পিতা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উপাসনাদের স্তোত্র আবৃত্তি করেছে—এই হিমালয়ের মতোই সুপ্রাচীন সম্রাট সর্বাশাল ও ব্যাপক সেই মন্দের অন্তর্নিহিত অর্থ যা ভুলে গেছি বলেই—আমাদের জীবনে আজ এত অনর্থ, এত অভাব, এত অন্ধকার। ঐ যে সূর্যের শেষ ব্রহ্মস্ট্রোম মিলিয়ে যাচ্ছে পাহা-

ড়ের পা থেকে, আকাশ **হুমকির** হয়ে যাচ্ছে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি আবছা হয়ে আসছে, হিমশীতল বাতাস বইছে উত্তর থেকে দক্ষিণে—এ সবই **বেন** একই অর্থ বহন করে আনছে, আমাদের জীবনের সমাজের জগত্তে রবি ডুব গিয়েছে—দীর্ঘ প্রান্তর সূর্যকটন তপস্যার স্মারা আবাব যদি নিজেদের তপস্যার স্মারা আবাব যদি নিজেদের আমরা নিষ্পাপ নিরহংকার ও প্রেমিক করে তুলতে পারি তাহলে আবার প্রভাত হবে, আবার আলোর হেসে উঠবে সমস্ত জগৎ, আবার আমরা সুখী হব, পূর্ণ হব, সার্থক হব। কি অসহ্য জীবনব্রহ্মণা আমাদের! মনে পড়ল ঘরের কথা: নেই বিশ্বাস, নেই প্রেম, নেই ক্ষমা, নেই সহিষ্ণুতা, নেই মূল্যবোধ। সবাই পাপ করছে, সবাই স্বার্থাশেষী—অতএব আমাকেও তাই করতে হবে; জগতে ভালোর স্থান নেই—একথা তামসবরে বলে বেড়াচ্ছে—খাড়াপেরা আর আমরা মূর্খের মতো তাই বিশ্বাস করে যে বত পারি অন্য়ার করছি, স্বার্থাশেষণ করছি, ঠকাছি—ঠকাছি। আমি যে কি মূল্যবান জিনিস নষ্ট করছি, কত ভাগ্যবলে যে আমার এই অস্তিত্ব আমি পেয়েছি, কত কি যে আমি করতে পারি, ভাবতে পারি, হতে পারি সে সব বুঝতে গেলে, তার জন্যে অনুশোচনা করতে গেলে, নিজের জীবনকে সংশোধন করার জন্যে প্রয়াসী হতে গেলে, সবার আগে প্রয়োজন অবসরের। চতুর মানবসমাজের শিরোমণি বারা তাম্রা ভা জায়ে—আর তাই তারা নিরাস্তর সন্তে চক্রান্ত করে আমাদের নিরস্তর ব্যস্ত করে রেখেছে জীবন-মৃদু, আমরা সকাল থেকে রাত্রি অবধি শব্দে মৃদু করে বাচ্ছি জীবনের সন্তে, আমাদের অস্তের আঘাতে ফুলগুলি মরে যায়, দূষিত কটু বিষাক্ত আবহাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়া দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে ভব্দ মাসকাবারী মাইনে এনে ভাবি: আমার জীবনের কতখা আমি কবলাম। হায়রে জীবন আর হায়রে কতখা! কত মনোবী কত কথা লিখে গেছেন আমাদের মঙ্গলের জন্যে, আমরা তা পাড়ি না তা নয় কিন্তু তার মূল্যায়ন করতে পারি না, পায়লেও চাই না কারণ বর্তমান যুগে ওগুলি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও নিরর্থক। অর্থ-হীনতা নিষ বেষ কেটে যার আমাদের জীবন, আমারও—কিন্তু হঠাৎ এই ওপরে এসে একা একা এই প্রাচীন পবিত্র মন্দিরে বসে মন বিদ্রোহ করে ওঠে, বকের মধ্যে যাকে এতদিন ঘুম-পাড়িয়ে রেখেছিলাম সযয়ে, আজ সে হঠাৎ জেগে উঠে আমার বকে অনুশোচনার ঢেউ বইয়ে দিল, আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে, প্রতিটি রক্তকণায় সেই আদি অকৃত্রিম শব্দ ভাব গান গেরে উঠল,

আমার শরীর ও মন **ধীরে** **ধীরে** দেবতার পূজার উপযুক্ত একটি অঙ্গরূপ রচনা ফুল হয়ে উঠল। মৃত সমাজ নিচে থেকে যতই হাত বাড়াক আনাকে শিকার করার জন্যে, আমি সেই হাতের ধর্যাহারার ওপরে বসে আছি, আমি এখন কিছুকণ নিতান্তই আমার, আমি যে এখন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে বসে আছি! বালক বলল, জ্ঞানো, আমি একদিনে রবীন্দ্রনাথ হই নি, কত বন্দুর পথ আমার অতিক্রম করতে হয়েছে, কত সাধনা, কত আরাধনা করতে হয়েছে, কত বেদনা সহ্য করে করে বেদনার যন্ত্রণাকে ভালোবেসেছি, কত দুঃখ পেয়ে তাকে সুন্দর বলে বরণ করে তার চরণবন্দনা করেছি, কত গভীর সুখ দিনের বেলা বাঁশি বাজিয়ে, গভীররাতের ঘুম ভাঙিয়ে আমার উভলা করেছে, কত দুঃপূরে তার নৃপবের আওরাজ আমার মনকে নিয়ে গেছে মন্দনকাননে—সেই সুখ আর দুঃখ মিলেমিশে একাকার হয়ে আমার দেহ-মনকে আলোছারার দোলায় দুলিয়ে দুলিয়ে ধীরে ধীরে নিয়ে গেছে সেই আশ্চর্য গ্রন্থসময় জগতে, যেখানে আমি পেয়েছি এই হিমালয়ের মতো আশ্চর্য এক অনুভূতি যা অবির্ভবনীয়, অজৌকিক, ঐশ্বরিক। আমার মানস সরোবরে প্রতিদিন ফুটেছে ভাবকমল, তাই নিজে আমি জীবন-দেবতার অর্চনা করেছি, আমি রবীন্দ্রনাথ হয়েছি।

মৃদু হয়ে বালকের দিকে তাকিয়ে থাকি, দেবদর্শনে বিহবল হয়ে ওঠে সমস্ত মন, পূজকে মুগ্ধিত হয়ে থাকে সমস্ত দেহ। বালক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সিন্ধু হাসি হাসে, আমি কাতর হয়ে দুঃহাত বাড়িয়ে বলি, আমার তুমি কৃপা করে একবার, শব্দে একবার স্পর্শ করো, আমার পবিত্র করো, তুষ্ট করো, দুষ্ট করো।

বালক দূর থেকে বলে, তুমি তো পবিত্র হয়ে গেছে—তুমি যে এখন নিজেকে স্পর্শ করো।

আমি বলি, তবে ঐ দূর থেকেই বলো কি করে তুমি সংসারের মধ্যে থেকেও এমন করে নিজেকে গড়ে তুললে, কেন তোমাকে বিভ্রান্ত করল না পার্থিব ক্রোধ, কলুষ, মোহ, অন্ধকার; কেন করে তুমি সারাজীবন রবি হয়ে রইলে! তোমরা, তোমার মতো সাধক-পাগল প্রেমিকেরা কার কাছ থেকে পেলে সেই আশ্চর্য প্রেরণা, সেই দিবা বারতা!

বালক বলল, সে কথা তো কতবার কতভাবে বলেছি। কিন্তু তুমি অজ্ঞান ছিলে বলে বোঝ নি। ক্রান্ত মোহ-গ্রস্ত মানুষ কি বই পড়ে কিছু তার অর্থ করতে পারে! আজ তোমার সামনে এখনই সব গ্রন্থ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিন্তু আমার সামনে তো কোনো বই নেই।

বালক বলল, 'বই নাই বা-রইল-
আমিতো আছি।'

পাহাড়ী সন্ধ্যা নেমে এলো। পাখিরা
ফিরে গেল কুলায়, গাছের অশ্বকাবেব কবলে
গা মূড়ে পড়ল ঘুমিয়ে, আকাশে একটি
একটি কবে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে উঠতে লাগল।
নিচ থেকে প্রলোভন এলো আরামেব,
উষ্ণতার, আহা রেব, নিদ্রাব। আমার আত্মা
তা জয় কবল। নিবাপত্তা বলল, 'আমি
বিপন্ন'; আমার আত্মা বলল, 'তুমি নগণ্য,
অতি নগণ্য।'

অশ্বকাবে মিলিয়ে গেল ডালহোঁসি,
বজ্রোটা; 'স্লেডন'—ও এলো আবছা হয়ে।
আমাব দৃষ্টিপথ চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ
করে কে যেন তাকে উর্ধ্ব তুলে ধরল,—
আমাব দৃষ্টিকে, আমার সত্যকে, আমার
আমি-কে। একটি দৃষ্টি দৃষ্টি একশটি
হাজারটি করে তারা ফুটে উঠল চোখের
সামনে এই কৃষ্ণপঙ্কজ পদ্মী ভিড়ের
আকাশে। কলকাতা থেকে কতদিন-
দেখোছি আকাশ, দুয়ের আকাশ, ধোয়ার
আকাশ, ধূসর আকাশ, তাবাব চমকি
বসানো আশমানি ধোব বেনারসী আকাশ
ছেঁড়া ছেঁড়া, বহু ব্যবহাব মলিন, প্রাচীন।
এ আকাশ জ্বর আকাশ, কত নিকট,
কত উজ্জ্বল, কত বিস্তারিত। প্রতিটি
তারায় যেন নিজস্ব রূপ; কৃষ্ণিকা, বোহিনী,
অরুণ্যতী, স্নাতী, বিশাখা, অন্দুরাধা
সবাই যেন আমাব মন ভোলাবার জন্যে
আজ নতুন কবে সেজেছে। দেবতাদের রাজ-
পথ হয়ে উজ্জ্বল থেকে দীক্ষণে আকাশের
বুকে নিশ্চয় হবে ফুটে উঠল ছায়াপথ।
অস্পষ্ট গুঞ্জন এলো পাশ থেকে, একান্ত
হয়ে শুললাম, ঐ যে জ্বলজ্বল করছে
পশ্চিমে ঐটি হচ্ছে সন্ধ্যাতারা বা শুলক্রহ,
ঐ দেখ সপ্তর্ষিমণ্ডল, ঐ যে অবনততী,
অনুবাধা, প্রবণা, ধনিষ্ঠা, রেবতী—আর
ঐ দেখ উত্তরে উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। সবাই
স্থান বদল করে কিন্তু ধ্রুবতারা থাকে
অবিচল। এই সমস্ত জগতের যিনি পিতা
তার প্রতি ভক্তি যেন তোমার চিরদিন অবিচল
থাকে, বেশ বলতে পারো, তোমাকেই করিয়াছি
জীবনের ধ্রুবতারা।

মুখ বালক ওপরে চোখ রেখেই
প্রশ্ন করে, 'এই কি সব বাবা?'

না, এ হলো দেখার জগৎ। এরও পরে
আছে কত অজানা সৌরমণ্ডল, কত
মন্দর।

'তা কি কোনোদিন দেখব না বাবা?'
দেখবে, নিশ্চয়ই দেখবে। যেদিন তুমি
মুখেতে পাখবে যে চোখে দেখার বাইরেও
দেখা আছে, সেদিন তুমি সব দেখতে পাবে।'
সব? সে যে আমার পাগল করে দেবে।'

মহাশি হেসে বলেন, 'যেন সেই পাগলই
তুমি হতে পারো। তোমাব মুখে যেন প্রলাপ-
বচনই ফোটে। সবাই বলবে, 'তুমি জীবন-

শারদীয় সাপ্তাহিক বঙ্গমতী : ১৩৭৭

তুই নায়ক

[১২৯ পৃষ্ঠার পর]

একটু অমায়নন্দ হয়ে পড়াছিলে এরপর
ভাল করা চাই কিন্তু।

মানেকার যাবার পর মুহূর্ত করে
চোখ বন্ধ করে আলোচনার পূর্ব সূত্রটা
ধরবার চেষ্টা করে মীরাদি। হ্যাঁ, যা বল-
ছিলাম, এ ছাড়া আমার অন্য কোন উপায়
ছিল না দীপেন। ওর যদি মা-বাবা থাকতেন,
নিনে একটা বউ, তাহলে আমাকে এ পথে
আসতে হত না। অথচ লোকটাকে তুমি চেন
না, একবারে-আসত গুড্ডা। আমাব সেই
ওখেলো প্রকৃতির স্বামীর কথাই বলছি। ও,
হরিবিশ, বুটুদার মুখটা দেখ নি, কি
করেছে বলত। বিভৎস। আর চোখ দুটো,
সহ্য করতে পারি না। এসব ওই গুড্ডাটার
কাজ বুদ্ধলে।

কিন্তু কোন অপরাধে বুটুদার এই
শাস্তি?

ওর কথা আর বোলো না, বিয়ের পর
সবে দু-চার দিন শব্দেব বাড়িতে এসেছি
সহসা একদিন শূন্য পাশের বাড়িতে বসে
ও হার্মোনিয়াম বাজাচ্ছে। ওর বাজনা শুনে
ভুল করার উপায় ছিল না। স্বর নিয়ে শূন্য
বাবব নাকি কিস্করদল শোলা হয়েছে।

মরণের সীমা দিয়ে ঘেরা, 'তুমি বলবে,
'আমি অসীম, কোথাও আমার শব্দ নেই,
কোথাও আমার সারা নেই।' সবাই বলবে,
'আমরা চাই অর্থ সম্মান প্রতিপত্তি,'
তুমি বলবে, 'আমি চাই অমৃত, ব্রহ্মজ্ঞান।'
সবাই একদিন যখন শূন্যবে, 'কোথায়
তোমার ব্রহ্মা, কোথায় তোমার অমৃত্যুরার
উসে।' তুমি বলবে, 'আমিই-যে তিনি।'
তুমি যেন এমন পাগল হতে পারো।
দেখা-না-দেখা, জানা-না-জানা গ্রহতাবকায়
আলোয় যদি নিজেই অলোকময় করে তুলতে
পারো তাহলে জীবনের সমাজের অজ্ঞতার
অন্ধকার কোনোদিন তোমার নাগাল পাবে
না, মানুষ তোমায় না চিনতে পারে,
ঈশ্বর তোমার চিনে নিতে ভুল-করবেন না।

ধীরে ধীরে আমি ওপরে উঠতে লাগ-
লাম। আলোয় ছায়ায়, তারায়
তারায় কত কানাকানি, কত জানাজানি।
ছায়াপথ ধরে এগিয়ে চললাম আমি। তাকে
ছাড়িয়ে আরো দুর্গম, আরো গভীর,
আরো উজ্জ্বল এক পথ ধরলাম এবার।
আমার অন্তর প্রসারিত হয়ে স্পর্শ করল
জগতের সমস্ত গ্রহতারা সৌরমণ্ডলকে,
সমস্ত চন্দ্রসুধের আলোকবনায় আমার
সকল সঙ্কীর্ণতা, মনিলতা, পাপ দ্রবীভূত
হয়ে গেল, ভেসে গেল—আমি শূন্য পবিত্র হয়ে
অমৃতলোক পান করে অমৃতের পত্র হলাম।

কৃষ্ণ বলল, 'বুদ্ধলে তো।'

বাংলা দেশের বাইরে প্রবাসী বাঙালী
সমাজে ওরা লোকগণীত পেয়ে বেড়াবে।
যাবসার গন্ধ পেয়ে দু-চার জন করে পৃষ্ঠ-
পোশক জুটেতে থাকল। কিন্তু দুর্দিন্যার এত
জায়গা থাকতে কিস্কর-কিস্করীয়া আমার
নাকের উগায় মরতে এল কেন? এই কেন
ভূত চাপল আমাব ওখেলোমার্কা স্বামী-
টির ঘাড়। আস্ত গুড্ডা ছিল লোকটা,
সে তো আগেই বলেছি। তার ওপর সন্ধ্যা-
অসমবে হার্মোনিয়ামের গান শুনিয়ে বুটুদা
নিজেই ওর সন্ধ্যার আগুনটাকে নিগদণ
জ্বালিয়ে তুলল।

যদি অপরাধের প্রশ্ন তোলো দীপেন
তাহলে বলব, ওই গুড্ডাটার নিবেব নড়েও
বুটুদা ওর যন্ত্রণ গান কষ কবে নি। এই
ওর অপরাধ। আর ওর বাজনা শুনে
আমি নাকি মাঝে মাঝেই অসমনা হয়ে
পড়তাম এই ওর উপরাধ।

কিন্তু সেদিন এমন দহনভাবে এই
অপরাধের শাস্তি না দিলে হয়তো ওর
সঙ্গে চলে আসতে পারতাম না। এ্যাসিডে
পুড়ে ওব চোখ দুটো পুরোপুরি অন্ধ
হয়ে গেলে আমার সেই প্রথম মনে হল,
ওর প্রতিভাকে কোন্‌মতেই নষ্ট করা চকবে
না। বুদ্ধেছিলাম আমি ওব পাশে গিয়ে
দাঁড়াতে না পারলে ও একদিন দেখে
অগণিত অশ্রু ভিড়ির ভীড়ে হামিগে যাবে।
সময় দেখার উদ্দেশ্যে মীরাদি আমাব
ঘড়িসমেত হাতটা একবার চেপে বাহে
তুলে ধরল।

এবার তাহলে চলি, অন্তঃকরণে পরে
আর কিছু আমাদের দেখা হবে না। বেনা
হলেও তখন গল্প করার অনুমতি গাব না
এটাই দলের নিয়ম।

একটা কথা।

বল।

তোমার স্বামী এসব মেনে নিলেন বা
করে?

বলেছি তো লোকটা ছিল পুণ্য
গুড্ডা। ওরা সাধারণত যা করে পারে সেই
গুড্ডামী করার চেষ্টাই করেছিল। তাতে
সুবিধে করতে না পেবে শেষে এতদিন
দুরন্ত শিশুর মত মূব করে গাহনে এসে
দাঁড়াল, বললে, প্রতিভার কথা ভেবে তুমি যদি
যব ছাড়তে পার আমি বুঝি স্ত্রী নরনার
কথা জেবে তোমাদের এই কিস্করদলের
ম্যানেজার হতে পাখি না।

সহসা আমাদের ঠিক গানে কার্টের
দেওয়ালের ওপর কার দীর্ঘ ছায়া এনে
পড়ল। সেদিকে না তাকিয়েই মীরাদি বলল,
ওই দেখ কখন আবার গ্রীনরুম ছেড়ে পাহারা
দিতে বেরিয়ে এসেছেন।

উত্তরে কিস্করদলের ম্যানেজার ববলেদ,
ঠিক পাহারা দিতে নয়, তোমাব এনাটক-
এর সময় হ'ল সে কথা দ্রবণ করাতে
এলাম—শুনছ না যখনটা কেনন মানবের
কলা ওর নায়কের নাম ধরে ডাকেছে।

১৫১

চেনা মুখ

[৮৭-পৃষ্ঠার পর]

টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে। ছেলোটর হাতে বই-পত্র ছিল, সেগুলো পড়ে গিয়েছে। উন্মত্ত আক্রমণকারীদের পায়ের চাপে বইগুলির ছিন্নপাতা উড়ছে। পল্টু দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওদিকে ট্রাম-বাসগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলোয় উৎসুক দর্শকের ভিড়। ফুটপাথেও লোক জড়ো হয়েছে। পান-বিড়ির দোকানের মালিক কেনাবেচা বন্ধ করে সোডার বোতল সামলাতে আরম্ভ করেছে।

এ দৃশ্যের সংগে পল্টু অভ্যস্ত। তার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে বেশ মজা লাগল। এখন দিনের বেলায় সে দর্শক-স্রোতে সে নায়ক।

ইতিমধ্যে সেই ছেলোটিকে দাঁড় করিয়ে জোর করে তার জামা-পেজি খুলে ফেলা হয়েছে। পল্টু ঘনবাক হয়ে ডাবলে—এই মরেছে ছিনতাই পার্টি লাকি?

কিন্তু পরক্ষণেই শব্দ হল মার। ছেলোটো ঘুরে পড়ে গেল। চলল লাধির পর লাধি। পল্টু বুকল—শালা পার্টির ব্যাপার। নিচুয় রূপ-চটা কথাবার্তা হয়েছে—কিবা পোস্টারের ওপর পোস্টার মেরেছে। একজন বের করে ফেলল ছবি। চোঁচিয়ে উঠে বললে, এত দেরি করার দরকার নেই। সর তোরা, বসেই সে এগিয়ে গেল। আব—

আর সেই মুহূর্তে পল্টুর মনে হল—আহা রে ছেলোটো! এতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে—কেউ ছেলোটাকে বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে না! সংগে সংগে তার কী হল হৃৎকার দিয়ে উন্মত্তের মতো কাঁপিয়ে পড়ল সেই হত্যাকাণ্ডের মধ্য। আর আশ্চর্য—যে লোকগুলো এতক্ষণ কাঠেব পড়তুল হয়েছিল তারাও যেন কোন মন্তে প্রাণ পেয়ে নড়ে উঠল। আততায়ীর দল পালালো প্রাণভয়ে।

পল্টু রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে নিল। খুব পবিত্রম হয়েছিল। তা-হোক। তবু এই মুহূর্তে তার মনের মধ্যে কেমন একটা অশ্রুতের শিহরণ। তার মনে মনে হচ্ছে সে আর কীচি মিস্তির বা ইসাক চৌধুরী নয়। দিনের আলোর তাদের কবর দেওয়া হয়ে গেছে। সে এখন পল্টু মির। সে এখন বুক ফুলিয়ে রাস্তা দিয়ে চলবে। সবাই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। এ দেখো না রাস্তায় লোকেরা এখনো তার দিকে কেমন সসম্মানে তাকিয়ে রয়েছে—এ দেখো না জামালার জানালায় মেয়েদের কী মুগ্ধ দৃষ্টি—এ দেখো না একটি বৃদ্ধ—বোধ হয় নব বৃদ্ধ—টকটক করছে সিঁথিতে

শিখর, গারে গহনা বলমল—কেমন অশ্রুত-ভাবে তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

চোখোচোখি হল। সংগে সংগে বখাউ চমকালো, পল্টুও চমকে উঠল। কিন্তু দু'জনের চমকানো আলাদা।

পল্টু তাড়াতাড়ি চোখ ঢাকবার জন্যে কালো চশমাটা পরে নিল। আত্মগোপন করতে হবে। রাতের মানুষকে আলোর মানুষ চিনে ফেলেছে। চিৎকার করে উঠবে না তো ভবে? ধরিয়ে দেবে না তো পুলিশকে? এ খাপা লোকগুলো ব্যাঘ্র এতক্ষণ সসম্মানে তার দিকে তাকিয়েছিল লেলিয়ে দেবে না তো তাদের?

পল্টু তাড়াতাড়ি একটা অশ্রুকার গলির মধ্যে গা ঢাকা দিল। সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভাবল—আ, রাত হতে আর কত দেরি?

বন্দ

[১০১ পৃষ্ঠার পর]

অর্চনা হাসল, 'তোমার নিম্নমন্দা ব্যাধিগ্রস্ত এ কথা শুনলে তোমার দাদা তোমাকে খুন করে ফেলবেন।'

বললাম, 'ব্যাধিগ্রস্ত আমরা সবাই। কেউ স্বীকার করি, কেউ করি না। আবার কেউ তা নিয়ে গর্ব করি। কেউ করি না।' অর্চনা বলল, 'তুমি কোন দলে?'

বললাম, 'কী জানি। বোধ হয় দুই দলেই আছি।'

দারোয়ানের ঘরের কাছে গিয়ে অর্চনা এবার অনুচ্চ শব্দের স্বরে ডাকল, 'চৌবে!' দারোয়ান সাড়া দিয়ে বসল, 'হাঁ মাইজী!'

অর্চনা বলল, 'গেট খোল দো। সাহব বাহার বানা।'

'আচ্ছা মাইজী!'

বড় একটা চাবির তাড়া নিয়ে বিপুল-গৃহস্থ দারোয়ান গেটের দিকে এগিয়ে এল।

ছেলোট

[১২৪ পৃষ্ঠার পর]

সীমার চিহ্নিত নয়, মনের সীমাহীন জনপদে ওর প্রতিমূহূর্তের বিচরণ। সে ধরস্রোতা নদী তার বেলাভূমির একদিক ভাঙে, সে ঠিক তার আর-একদিক গড়ে দেয়। ছেলোটর জীবনেও আজ বাকি সেই নদী-তরণ বয়ে চলেছে। কথার নৌকো গড়ে সেখানে ভেসে যাওয়া সহজ নয়। চূপ করে ছিলাম, তাই চূপ করেই রইলাম।

ছেলোট আর একমূহূর্তও অপেক্ষা করল না, ধীরে ধীরে উঠে একসমর আমার দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রূপান্তর

[১১৭ পৃষ্ঠার পর]

ছেড়ে কি অনিশ্চিত অশ্রুকারে নামলো কেন তা জানে না। তার দেওয়া অপবাদ-অপমানেরও প্রতিবাদ করে নি সে। কি এক দূর্বীর তেজে ওরা উদ্দীপ্ত হয়ে কি দুঃসহ জ্বালা মিয়ে ছুটে চলেছে।

ওরা শব্দ ভাঙছে—নিজেদের অনেক আঘাতে ক্ষতিবিক্ষত করে তুলেছে।

.....অপিস বেলা হতে হবে, এখন সে অন্য মানুষ। তাই সবই ভুলে যায় সে। ঘসা কাচের পার্টিশন করা সাজানো ঘর—পি-এ; ফাইলপত্রের জগতে হারিয়ে যাওয়া ওই মানুষটা জীবনের নিশ্চিততাকে চিনেছে। মাসান্তে মোটা টাকার বাণ্ডিল—সাজানো ব্যালো, গাড়ি—বৎসরান্তে কাম্বীর, উটির পাহাড় ভ্রমণ—। রাতের অশ্রুকারে ক্লাবে মদির নেশার কোন রূপসীর নিকড় স্পর্শ—সব নিয়ে ও এখন অন্য জগতের মানুষ। ওদের কাছে ঘর, একটি নারীর ভালোবাসা সব কেমন পানসে হয়ে গেছে।

গাড়িটা ভিড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। লাইফ গ্যাংগারদের চকচকে ছবিগুলো দেখাছিল প্রদোষ। হঠাৎ দেখে জনতার কলরব—সমুদ্রের জস্রোতের মত অফুরান জনপ্রবাহ তারই মাঝে চলেছে একটি মেয়ে, চোখে-মুখে ওদের কি প্রদীপ্ত আশা!.....ওই জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেছে শ্রীপর্ণা। এক নজরে দেখেছিল তাকে, ফর্সা রং কোঁকড়ানো চুলগুলো পড়েছে ওর মুখে, ডাগর কালো চোখে কি জ্বালা! ওই মেয়েটিকেই আজ চেনে না প্রদোষ। ওরা হারিয়ে যায়—তবু সেই সোডার শপথ কেন কঠিনতর হয়ে ওঠে।

কীচব ঘোরাটোপে বন্দী একটা মানুষ ওই উত্তাল জনসমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। একদিন সেও ওই জনতার মাঝেই মিশে ছিল—ওর কণ্ঠেও ছিল শপথ, চোখে ছিল আগুন। সেই জীবনটার কথা মনে পড়ে প্রদোষের।

শ্রীপর্ণাকে ওই ভিড়ে আর দেখা যায় না।

গাড়িগুলো আবার চলেছে ওদের বন্ধকে ধরে চলে গেল প্রদোষের গাড়িটাও।

শারদীয় সাপ্তাহিক বসন্তমতী : ১০৭৫

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ
আকাশে তারারূপে আশ্চর্য সুস্পষ্ট হইয়া
উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা
চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ সম্পর্কে আলোচনা
করিতেন। বক্সেটার আমাদের বাসা একাটি
পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল।

‘গুড মর্নিং! প্রিজ সীট ডাউন।’ ভদ্র-
লোক স্মিতমুখে আমার সভাষণ করে
আবার টেলিফোনে তাঁর মাতাভাষায় কথা
বলতে লাগলেন। সুদীর্ঘ মুখ, বলিষ্ঠ দেহ,
ছোটলো পোষ, তৈলচিত্রিত কেশদাম,—
এই রোম্যান্টিক পাহাড়ী সকালের মতোই
ফর্সা, সজীব, সতেজ, সুন্দর।

বলুন কি করতে পারি আপনায়
জানো! বিশুদ্ধ ইংরেজিতে ভদ্রলোক প্রশ্ন
করলেন টেলিফোন রেখা।

‘আমি জানতে এসেছি এখানে দেখবার
কি কি আছে তা যদি একটু—’

‘ডালহৌসি দিজেই দেখবার জিনিস।’
ভদ্রলোক শান্তভাবে হাসলেন। আমিও
হাসলাম, কিন্তু সেই হাসির মধ্যেই বুঝিয়ে
দিলাম যে আমার ছবাব কিন্তু আমি পাই
নি।

ভদ্রলোক বললেন: আপনি কি
কাশ্মীর গেছেন? ওখানে যেমন “গুলামার্গ,”
ডালহৌসিতে তেমনি “খাম্জার”। হোট
জ্যালি—নাইস ভিউ। রোজ আটটার বাস
ছাড়ে এখান থেকে দুটো-আড়াইটের সময়
কিরিয়ে নিরে আসে। ঐ পথেই পাবেন
“কানাটোপ”—ওয়াইল্ড লাইফ স্যাফারারি—
সেটা অবশ্য অনাধিন দেখতে হবে। তা ছাড়া
আছে “সাতধারা”—পান্থ-চক থেকে আন্দাজ
ছ কিলোমিটার হবে।

আমি একটু আমতা-আমতা করে
বললাম, আর কিছু নেই?

‘আছে—সে সব অনেক দূর। রাইডল্
পাথ। ঘোড়ার চাপতে হবে। লোকে সাধারণত
যেতে চায় না। আমরা মতে “খাম্জার”
দেখলে আর কিছু ডালহৌসিতে দেখবার নেই।

‘আপনি আছেন কোন্ হোটেলে?’

‘“গ্র্যান্ড ভিউ” কিন্তু—’

‘তবে আর কি! ঘরে বসেই তো গ্র্যান্ড
ভিউ দেখতে পান। এবার খুব তাড়াতাড়ি
ব্লক জম্বে পাহাড়ের চূড়ায়।’

কিন্তু—

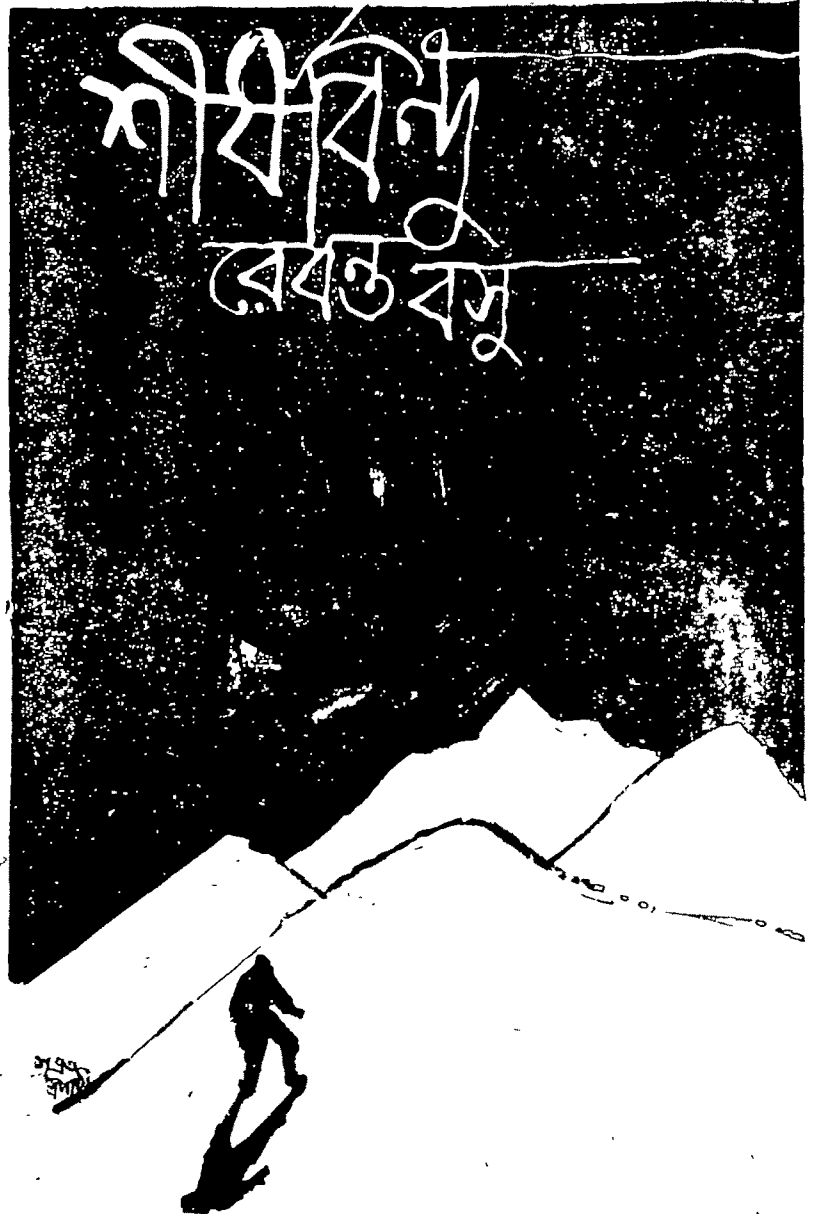
‘হ্যাঁ, বলুন।’

‘আমি বলছিলাম যে রবীন্দ্রনাথ টেগোর
এখানে যে বাড়িতে থাকতেন—মানে ছিলেন
আর কি উইথ হিছ ফাদার—সেটা কোথায়
আপনার যদি জানা থাকে—’

‘হ্যাঁ, বক্সেটা। বক্সেটা পাহাড়ের
মাথায় সেই বাড়ি। নামটা হচ্ছে—ইয়ে—
নামটা হচ্ছে “সেনোডন”। জৈনকা ভদ্রমহিলা
এখন সে বাড়ির মালিক। অবশ্য তিনি
এখানে নেই—বোধ হয় চৌকিদার থাকে।’

‘থ্যাঙ্কউ। বক্সেটা নামটা আমার জানা

শারদীয় সাপ্তাহিক বঙ্গদূত : ১৩৭৭



ছিল কিন্তু বাবার রাস্তাটা যদি দয়া
করে—

‘আপনি এক কাজ করুন। যদি
“খাম্জার” যান তাহলে আসার পথে বাসের
কন্ডাক্টরকে বলে দেবেন সে যেন আপনাকে
বক্সেটার নামিয়ে দেয়। তারপর আপনি
পাহাড়ের উঠে যাবেন—আপনার কন্ডাক্টর কিছু
কম হবে।’

‘থ্যাঙ্কউ।’

‘অবশ্য—ভদ্রলোক বললেন, সেখানে
যেবার কিছুই নেই। না আছে টেগোর
মিউজিয়াম, না আছে অন্য কিছু। তবে
টেগোরের নামে একটা রাস্তা আছে
এখানে—ইম্মাচল প্রদেশ তাঁর বিরাট
স্বীকার করে।’

‘থ্যাঙ্কউ। আমি রবীন্দ্রনাথ ও আমার
হয়ে তাকে আবার ধন্যবাদ জানাই।

‘বক্সেটা, পূর্ণেন্দু, শ্যামল ও মাধব।
চার বন্ধু। তিন জন চাকরি করে—একজন
উকিল। বরষ তেইশ থেকে ছাশ্বিশের মধ্যে।
পূজোর ছুটিতে কাশ্মীর গিয়েছিল—ফেরার
পথে পাঠানকোট থেকে সোজা চলে এসেছে
ডালহৌসি—কটা দিন নিদ্রাবিলিতে বিভ্রাম
চার।

‘একটা কথা জিজ্ঞেস করব?’ পূর্ণেন্দু
বাসের মধ্যে প্রশ্ন করে।

‘বলুন।’

‘আপনি কন্ডাক্টরকে বক্সেটা সবলে
কি জিজ্ঞেস করছিলেন?’

‘আরামটা কোথায় জানতে চাইছিলাম।
ওকে বলে রাখলাম ও যেন ফেরার সময়
আমায় ওখানে নামিয়ে দেয়।’

‘কেন? ওখানে গারবেন কেন?’

‘ওখানে “সেনোডন” নামে একটা

বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এগারো বছর বয়সে।

‘তাই নাকি?’ বিকাশ বলল, ‘আপনি কি করে জানলেন?’

‘জীবনস্মৃতিতে পড়েছি।’

চার জনে কি ফিস্‌ফিস করল। তারপর মাধব ঘোষণা করল : ‘আমরাও তাহলে নামব আপনার সঙ্গে। দেখে আসব সেই বাড়ি।’

‘বেশ তো। অজানা পথে সঙ্গী পেলে তো ভালই হবে।’

‘হ্যাঁ দাদা, আমবা যাব।’

সুধাংশু হালদার ও তাঁর স্ত্রী, তাঁর ভায়েকরাই অনিমেষবাবু ও শ্যালিকা—আব তাদের কমন ফ্রেন্ড প্রোফ ব্যাচলার জগন্নাথবাবু। কামরী ঘুরে তাঁরাও এসেছেন ডালহৌসি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ‘বাস্তবজ্ঞের’ রেন্ট হাউসের বারান্দায় বসে গল্প-গুজব চলছিল বাংলা ভাষায়। চারিদিকে পাইনেব বন আর পাহাড়, সামনেই বিস্তীর্ণ মাঠ—গলফ ফিল্ডের একান্ত লোভনীয় স্থান। দুপুরে কৃত্রিম হ্রদ—সুধাংশুবাবুর মেরে মিল্লিকা ও অনিমেষবাবুর ছেলে স্বপন সেখানে ছুটোছুটি করছে—দূর থেকে তাদের পড়ুলের মতো ছোট দেখাচ্ছে। জগন্নাথবাবু অমৃতসরের গল্প বলছিলেন; সে গল্প ফুরালে তিনি পঁচিশ বছর আগে ডালহৌসির কথা বললেন। সাহেবদের আমলে কত ফিটফাট, কত কেতাদরস্ত ছিল এই ডালহৌসি। রাস্তাঘাট নাকি আরো অনেক সুন্দর ছিল।

‘আচ্ছা, এই ডালহৌসির পত্তন হয় কবে?’ প্রশ্ন করলেন সুধাংশুবাবুর সূত্রী শ্যালিকা। সবাই নিরুত্তর। আমি সিগারেট বোল করতে করতে জগন্নাথবাবুর মুখের দিকে একবার তাকালাম, তারপর বললাম, ‘ডালহৌসি নাম যখন, তখন নিশ্চয়ই লর্ড ডালহৌসির আমলে। শূর্দেহ মিলিটারিদের গ্রীষ্মাবাস হিসেবে এটাকে গড়ে তোলা হয়—“বেঙ্গল বাজার” এখনো মিলিটারি ব্যারাক আছে—দেখছেন নিশ্চয়ই।’

‘হ্যাঁ, তা দেখেছি।’

‘আমি অবশ্য সঠিক কিছু জানি না। তবে একশ বছর আগেকার ডালহৌসির কথা পেয়েছি জীবনস্মৃতিতে।’

‘কার জীবনস্মৃতি?’ সুধাংশুবাবু প্রশ্ন করলেন।

একটু থমকে গেলাম। অবসিটটা কাটিয়ে নিয়ে বললাম, ‘রবীন্দ্রনাথের। এগাবো বছর বয়সে উনি বাবার সঙ্গে এখানে আসেন। সেই ওঁর প্রথম বিদেশ যাত্রা। প্রথমে বোলপুর, তারপর এলাহাবাদ, কনপুর, অমৃতসর; তারপর ঝাঁপানে করে পাহাড় উঠে উঠে ডালহৌসি আসা।’

‘কোন হোটেলে ছিলেন তার কিছু বর্ণনা আছে?’ মিসেস সুধাংশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

এবার আমার হাসি আব বাধা মলল না—তবে ভদ্রতা সীমা লঙ্ঘন করল না।

‘উনি ছিলেন বক্সটো পাহাড়—এখনো আছে সেই বাড়ি, নাম “স্নোডন”।’

‘আপনি দেখেছেন?’ জগন্নাথবাবুর প্রশ্ন।

‘আজ দেখব।’

‘আজ আর কখন দেখবেন! ফিরতে ফিরতেই তো—’

‘আমাদের ফেরার পথেই বক্সটো। কন্ডাক্টরকে বলে দিয়েছি নামিয়ে দেবে।’

‘আচ্ছা, আমাদেরও তো ঘুরে এলে হয়!’ সুধাংশুবাবুর শ্যালিকা সঙ্গীদের বললেন।

‘নিশ্চয়ই!’ জগন্নাথবাবু বললেন, ‘মিস্টার সুধাংশু, আমরা যদি আপনার সঙ্গে যাই তাহলে আপনাকে আচ্ছা?’

‘বিস্ময় নয়। তা ছাড়া আমার অনুমতির প্রয়োজন কি! সঙ্গী হলে তো ভালোই হয়। ঐ যে চারটি বাঙালি ছেলে এসেছে না—ওরাও যাবে বলছে।’

‘ভেরি গুড’। গো উই মাস্ট!’

বক্সটো আ গরু সাব।’

শাড়ি স্নোথো। ময় উত্তরঙ্গা।’

গাড়ি বধিল। সারাদিন যোগ্যার পর চৌকিদারের তৈরি মাসে-ভাত খেয়ে সবাই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। কাঁচের জানলা দিয়ে মিষ্টি রোদ এসে লাগছে গরম পোষাকে—সবাই দিব্যস্বপ্ন দেখছে। চার বন্ধু চারদিকে চোখ রাখল—আমার চোখে কেউ রাখল না। সুধাংশুবাবুর কাঁধে তাঁর ঘুমন্ত স্ত্রীর মাথা এসে ঠেকেছে, অনিমেষবাবু ও তাঁর স্ত্রীর উদাস দৃষ্টি ছুরে আছে দুবেব পাহাড়, জগন্নাথবাবুর চোখ দুটি বোজা—মন বুঝি পুরুর সমুদ্রে কোঁল করছে। আমার গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোল না। পা দুটি খোলা দরজা দিয়ে নেমে এলো রাস্তায়। কন্ডাক্টর দড়াম করে দরজা বন্ধ করল। বেল বাজিয়ে সংকেত দিল জুইভারকে। গাড়ি চলে গেল। আমি একা হলাম। বাঁয়ে খাদ, ডাইনে উঁচু পাহাড়, পায়ের তলায় মসৃণ পিচের রাস্তা। একটু এগিয়ে ডানদিকে আঁকাবাঁকা ছোট পথ উঠে গেছে পাহাড় কেটে ওপরে। চড়াই শুরু হলো। বেলা প্রায় তিনটে—বিকেল ফুরিয়ে আসছে, রোদের বস্তু লালচে, দুটো চাবটে পাখি টি-টি করছে গাছ-গাছালির ছায়ায়। মনেব অনন্দে পথ চলতে লাগলাম সেই মনোবম ঠান্ডা। ভালোই হয়েছে ওরা কেউ অসেনি—আব কেউ থাকলে প্রকৃতি এমন কবে আমার কাছে এসে দাঁড়াত না। পথেব ধাবে গাছ গাছ ফটে রয়েছে ফরগেট-মি-নট; মনে হলো যেন “স্নোডন”ই তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে খাদে পথ চলতে পথিককে তারা বলে, “স্নোডন”—কে দেখে মনেত ভালো না যেন! এই তো কার বাড়ি—সব বন্ধ—না ঐ যে একটি মেয়ে বাগানের গাঁদা ফুলেব

মধ্যে কি যেন কলছে। চাঁকার করে বললাম, ‘এই “স্নোডন” কিধার হায়?’

‘ইস্ রাস্তে সে চলে যাইয়ে। মেয়েটি রাস্তা দাঁখয়ে দিল। একটি পথ গেছে ডাইনে, একটি বাঁয়ে। আমি শেষেরটি নিলাম।’

নাঃ, এই ওপরে শুভাটা শহরের লোকদের পক্ষে বেশ কণ্টকব। এবই মধ্যে তেঁতো পেয়ে গেল, দম নিতে হচ্ছে মূখ হাঁ করে করে। একটু বিশ্রাম নিতে হবে। জুতোটাও বস্তু লাগছে পায়ের। তাছাড়া পোষাকের ভারটা তো কম নয়। শাদা গোল্জি, গরম গোল্জি, নাইলনের কোর্ট, শোশেটার, গরম কোর্ট, গরম প্যাণ্ট গাটা কেমন কুটকুট করছে—কোর্টটা খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিলাম। রুমাল বার করে কপালের ঘামটুকু মুছে নিলাম। একটু জল পেলে হতো। কিন্তু ধারে-কাছে না আছে বাড়ি, না আছে লোক। চারদিকে কেমন ছমছমে, শব্দ পাইন গাছে জগল। আর একটু এগিয়ে দেখা যাক।

একটু কেন, বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এলাম। দুপুরে ঐ পাহাড়ের তুষাবশু চড়াটা কেমন পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, নিচের ফেলে-আসা মসৃণ রাস্তাটা দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না আব। নিচেও জগল, ওপরেও তাই—ক্ষীণ আশার মতো পথটুকু জেগে আছে। আচ্ছা, ঠিক পথ চলাছি তো! ন্যাক মেবোটা ভুল কবে ভুল পথেব নিশানা দিল! অর্থহীন জেনেও চাঁকার করলাম, ‘কেই আদামি হায়?’ একটা ব্যোপের আড়াল থেকে একটি মানুষেব মাথা উঁচু হলো, তারপর তার শরীরেব আরো খানিকটা অংশ। লোকটি ঘাস কাটাছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই “স্নোডন” কিধার হায়?’

‘ইস্ রাস্তেসে সিধে চলে যাইয়ে।’

‘বহুং দুর হায়?’

‘জ্ঞ নেহী, নজদিক হায়।’

যাক, তাহলে কাছেই এসে গেছি। দুপুরে শুভাটা কম কবে খাওয়া উচিত ছিল।—

‘আচ্ছা, এহাঁ পানি মিলেগা?’

‘জ্ঞ নেহী। সামনে অমব সিং কি কোঠি হায়—চৌকিদার বহ সততা হায়।’

‘ঠিক হাব।’

বিকেলের নিস্তব্ধতা কেটে কেটে জুতো আমার ক্রান্ত গোবুর মতো এগোতে লাগল। এবার অথবা গাঢ় বন—দিনের বেলা পাহাড়ি ঝিঝি ডাকছে—বি-বি-বি কবে একটা ভূতভুত, আওয়াজ হচ্ছে। রোদ চলে গেছে পাহাড়ের ওপাঠে—দুপুরে পাহাড়ের চড়াটা বিকেলের ছায়ায় কালচে দেখাচ্ছে। ঘড়িতে চারটে বাজতে চলল। হাঁটছি তো হাঁটছিই। এখনই যদি না পৌঁছতে পারি তাহলে ফিবর কেমন কবে! সে যা হয় হবে, তবু আমায় যেতেই হবে—ফরগেট-মি নট। উঃ, যে সব মানুষ বেশ ভাবে তাদের নিয়ে মহা মুশকিল। সুধাংশুবাবুর দলেব কেউ কি আব জীবন-স্মৃতি পড়েন নি, নিশ্চয়ই পড়েছেন! কিন্তু

উত্তর মেঘ

[১০৬ পৃষ্ঠার পর]

ও কি? অমন হেসে উঠলে কেন?
অমলদা। কি হয়েছে?

—না, কিছুই নয়। তোমার কথাই
ভাবছি।

—আমার কথা?—আমার কথা ত শেষ
হয়ে গেছে অমলদা; শব্দ এই ছেলেটা—
চোখের জল মূছে জাহানারা।

ডবে-বাওয়া সূর্যের সোমালী ছটা
জাহানারার মুখে,—কিন্তু রক্তিম হয়ে
ওঠে তার চোখ-মুখ। কানের পাশে
চিক্‌চিক্‌ করছে সাদা দৃশ্যটি চলে।

তার সূর্য্যাম সূর্য্যোল হাত দৃশ্যনির
দৃশ্যদিকে চেয়ে থাকে অমল। দীর্ঘ ব্যবধান
যুগিয়ে দিয়েছে এই জাহানারা।

জাত আশ ধর্মের লড়াইয়ে রক্তের
বিভাবিকা একদিন দুটি তরুণ-তরুণীকে
এক করেছিল, আবাব ব্যবধানও সৃষ্টি
করেছিল,—প্রবীর হাবিয়ে গেছে। কিন্তু
শিশুটি, এই জয়ন্ত ত কোনো অপরাধ
কবে নি।

প্রবীরের মা-বাবা গ্রহণ করেন নি
জয়ন্তকে।

এই বাজপথের লোকারণ্যে হারিয়ে
গেছে সত্যিকার মানুষ—তারই মাকে
অমলের হাবিয়ে যাওয়া অতীত ফিরে
এসেছে।

এরই মাকে বিহবল হরিণী রামগিরির
জংগলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হারিয়ে গিয়েছে
হরিণ। হরিণীর পিছ পিছ হরিণ শিশু।
সুন্দর, বড় সুন্দর সে দৃশ্য। রামগিরির
উপর দাঁড়িয়ে দেখছে বিচিত্র জগৎ—

বেগবতীকূলে পরিণতফলশায়র জন্মবন-
ছায়ে দশাশ্রয় আর লুকিয়ে নেই।
চোখের সামনে সেই কৈশোর জগৎ—

সেখানের জাহানারা প্রবীল্য মেখে
নাই। তারা যুগ্মবন বিহাঙ্গিনী বন্যপক্ষী
নয়। সে দেশে কন্যামণ্ডলের দিকে সিন্ধা-
গনা নয়, জাহানারা, রূপী, ভবানী,
তরল, সরলা, সুবৃষ্টি সিন্ধা নবধন
হরিণ উন্মনা হয়। সে দেশে পাহাড়ের
সাদা মেঘগুলো খেলা করতে করতে হঠাৎ
মহা বড় তুলে ঘনকালো কব্জালরূপ
ধারণ করে।

আমতলা, বাদমতলার লুকোচুরি
খেলেতে খেলেতে সেই মেয়েগুলো চকিত
চকিত হয়ে ভরে জড়সড় হয়ে, কোমরে
আঁচল জড়িয়ে গাছ ভেঙে মাথায় পড়ল
বুঝি বলে ছোট স্নেহ; বৃষ্টিভেজা তাদের
মুখ—মনে হয় সিন্ধাগানারা ছোট
ছোট কুলিকার মত—ধরে মাটির মায়ার
মাটিতে নেমে এসেছে।

ইভাকুই

[১১৬ পৃষ্ঠার পর]

‘আমি জানি না। তবে বড় ব্যাপারে
খুঁটে খুঁটে ভালবাসা হয়ত অসম্ভব।’

‘তুই প্রশান্তদাকে ভালবাসিস?’

‘হুঁ।’

‘আমাকেও?’

‘বাসতাম।’

রম্‌ হাসল। জীবন কি নেতা হওয়ার
চেষ্টা করবে। তারি গম্ভীর লাগছে ওকে।

‘আমার জন্য তোর কষ্ট হবে?’

‘রম্‌! নেমে পড়। তোর বাড়ির
কাছে এসে গৌহ। তাড়াতাড়ি যেতে
হবে আমাকে।’

রম্‌ নেমে দাঁড়াল।

জীবন একমুহূর্ত ধমকালো, তার
পরই সাইকেলটা কাত করে একটা চক্র
দিয়ে কড়ের মতো বোরিয়ে গেল। রম্‌
তার চাকার ঘূর্ণাবর্ত দেখতে দেখতে
দু-এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল
পাথরের মতো।

‘রম্‌ কোথায়, রম্‌, রম্‌ কোথায়?’
গৌতম উঠে এসেছে। হাতে তার নির্ভীক
একটা লম্বা খাম।

তন্ময় হয়ে ভাবছে অমল।

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে জাহানারা।

জ্যোৎস্না—অস্ফুট স্বর অমলের মুখে।
ফিরে চল আবার।

—কোথায়?

—সেখান থেকে আমরা একদিন চলে
এসিছি। সেখানে, সেই বৃষ্টি-ভরা
দিনগুলিতে।

বিশীর্ণ হাসি জাহানারার মুখে,—
ফিরে কি আর সেতে পারবে?—এ
ব্যবধান যে আর ঘূসবে না অমলদা।
এগিয়েই চলতে হবে।

—তাহলে এগিয়েই চল।

সূর্য ডুবছে, পাখি নীড়ে ফিরছে।
জাহানারার হাতে হাত দ্বাঙ্গল অমল।

—তুমি জ্যোৎস্না নও, তুমি আমার
কাছে সেই জাহানারা। জ্যোৎস্না
মুখে গিয়েছে। তুমি জাহানারা। দেখ না,—
বৃষ্টি, বৃষ্টি আসছে। কালো ধোঁয়াটে হয়ে
উঠছে পশ্চিম দিক। চলা—শিগগীর চল—।

হাত ধরাধরি করে ছুটেছে দুজনে—
অমল আর জাহানারা। অমলের কাছে নতুন-
রূপে ফিরে এসেছে তার হারিয়ে যাওয়া
দিনগুলো,—উত্তর মেঘ সন্ধান পেয়েছে
শব্দ মেঘের।

রম্‌ কাছে এলো, ‘তাকে আবার কি
পরকার?। সিগারেট এনে দিয়ে গেছে
তো।’

‘তুমি কোথায় বাবে বলোছিলে রম্‌,
অনেক দূরে?’

‘ইক, কোথায়?’

‘ঐ যে অনেক দূরে কোথাও। চল,
আমরা কাকাবাবুর ওখানে যাই।
কাসিয়ার।’

রম্‌ কাছে এলো, আরো কাছে,
‘তোমাকে ভীষণ অসুস্থ লাগছে গৌতম।’

‘না রম্‌, এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।
আর যে অসুস্থ গেল, চল না স্বাস্থ্য-
স্বারের জন্য চেষ্টা যাই।’ গৌতম হাসছে।
শ্রমের করে সচরাচর হাফা হাসি হাসে,
ঠিক তেমনিভাবেই হাসছে।

‘রম্‌! চোখে তখনও অবিশ্বাস।

বললে, ‘কী পাগলের মতো বকছ।
আমাকে কি একটু শান্তি দিতে পার না
গৌতম। ভীষণ ভয় করে আমার গৌ।
লক্ষ্যীটি স্নান সেরে এসো। অফিসের
বেলা হ’লে যাচ্ছে না?’

‘আর অফিস যাব না রম্‌। অনেক
অনেকদিন অফিস আর বাড়ি করছি।
এবার বিশ্রাম। পুরো বিশ্রাম।’ গৌতম
বড় খামটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল,
দেখালো, ‘এটা কী বলত?’

‘গৌতম!’ রম্‌র অমরোষ্ঠ স্ফূর্তিত
হ’তে হ’তে কামার দমকে ফাঁক হয়ে
হুতে চাইছে।

গৌতম খুব পরিতৃপ্তভাবে হাসতে
হাসতে বলল, ‘পদভ্যাগ ও পলায়ন। যে
পালান সে বাঁচে। চল দেখি নতুন
করে শব্দ করা যায় কিনা। সেই
ছেলেবেলার কাসিয়ার। রম্‌ কোথায়।
আমার এখনই ঘেনে উঠে বসতে ইচ্ছে
করছে। রম্‌ কি টিকেটটা করে দিতে
পারবে।’

রম্‌ আর কোনো উত্তর দিতে পারল
না। স্বামীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে
তাকিয়ে রইল।

এতোদিনে এই প্রথম মনে হ’ল,
গৌতমের বয়স হয়েছে। মাথার দু-
পাশের চুলে পাক ধরেছে। চোখের
নিচে কুশন। দেহের চামড়া শেন দাঁখল
হচ্ছে। শরীর নুয়ে আসছে তার।

রম্‌ বলল, ‘আর একটু চা খাবে?’

এ জন্মের দেনা

[১৫০ পৃষ্ঠায় পর]

মধ্যে ভেজা 'বিবর্ণ' তাসগুলি ভাজিতে আরম্ভ করতো আদিত্য। অশ্রুত পত্নী একটা আওয়াজ বার করতো। তারপর বলতো, 'এই রে খেল মাইরি। গাধার ডাক আমার খুব ভালো লাগে।' নিজের শীতের রাত্রে চাঁদের আলো বেশ খোলতাই হয়েছে মনে কর হঠাৎ তার মধ্যে থেকে গাধার ডাক শুনলে তুমি। তখন কি মনে হয়? এ্যা, 'কি মনে হয়?' অশ্রুত উদ্ভাসের ভঙ্গিতে আদিত্য বলত, 'দেখ দিকে আগিয়ে আসতো।' গাধা দিয়ে সত্যি সত্যি ভয়ানক চমকে দেওয়া গাধার ডাক ডাকতো। সকলে ভয়ে হিম হয়ে যেত। তারপর ঘর ফাঁটিয়ে হাসতো আদিত্য। এই সব 'মুহুর্তে' ওকে ঠিক প্রকৃতিস্থ বলে মনে হত না। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে অশ্রুত কথা বলতো, 'আমি যদি অবিকল গাধার মত চেঁচাতে পারতাম। কতোদিনকার পুরোনো একটা বগড় বার করতে পারতাম যদি গাধা দিয়ে! মানুষের ভাষায় কথা বলতে বড় বোঝা।'

বেশ্যা ছাড়া কোলকাতার আদিত্য আর কিছু জানতো না। কোথায় কোন্ গলিতে বেশ্যারা কেন, কোন কোন গলিতে ঠাসা, 'দমবন্দ' অন্ধকারে মেয়ে-মানুষের ঠোঁটে সারি সারি বিড়ি জ্বলে, কোথায় কোন গলিতে গাধা দিয়ে মেয়ে-মানুষ দাঁড়িয়ে মদের বোকে গ্যাস-বেলুন ওড়ায়, মেলা বসে, গ্যাসের আলোর নিচে কোথায় মেয়েমানুষ পুরুষমানুষকে শিশু দিয়ে ডাকে, এসব মুখস্থ ছিল আদিত্যের। আদিত্যের আনাগোনা ছিল ম্যাসেজ রিটিনকে, বনেদী বারগলিতে, কোন কোন গাড়িতে, বাইবে থেকে বেগলিকে ক্লাব বলে ডাকানো হত। আদিত্য খিস্তি জানতো। হিন্দী, বাংলা, ইংরেজীতে সাধারণত যতোপ্রকার খিস্তি হয় প্রায় সবই ওর দখলে ছিল। ও সেগলি কথাব মধ্যে এমন চালিয়ে দিতো এমন খাপে খাপে ওগুলি মিশে যেতো মনে হত ঠিক এখানে ঐ খিস্তিটা না কবলে বগাটা জ্বালত হয়ে উঠবে না।

কিন্তু আশ্চর্য, বন্ধুরা ওকে অভিজ্ঞ ভেবে খাতির করলে, উৎসাহের বোকে ও এ্যামন সব নির্বোধের মত কথা বলে বসতো যে ওর বন্ধুরা বলতো, 'সে কি রে! তুই এসবও জানিস না? এ তো চোন্দ-পনেরো বছরের ছেলে-মেয়েবাও জানে। আর সত্যিই তাই।' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেশ্যা দেখলেও মেয়েদেহ ওপর ওর কোন আকর্ষণ ছিল না। বরং একটা ভীত বিতর্ক ছিল। এটাকে

প্রায় বিকার বলেও কী বলা হয়। সেই জন্যে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর কোন জ্ঞান ছিল না। বেশ্যা ছাড়া অন্য মেয়েদের সামনে ও পারতপক্ষে দাঁড়াতে না। পাছে ওর আনাড়িপনা, এমন কি, মেয়েদের চোন্দ বছরের কাঁচামটে চোখেও ধরা পড়ে।

দিনের বেলাতেও নিজের বাড়টাকে আদিত্যের অশ্বকার লাগতো। নিজের বাপ আর মাকে সময় সময় অচেনা লাগতো। সময় সময় মনে হত ওদের দু' জনের মধ্যে একটা খুব মিহি চামড়ার পর্দা লেপে দেওয়া আছে। তাতেই চোখ, মুখ, কান ঢাকা পড়েছে। যদি সেই ওপরকার চামড়াটা ছাড়ানো যায় তাহলে আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটবে। অশ্বকারে দু'দিকে দু'টি শব্দদ চোখ জ্বলে উঠবে। ওদের অনেক দিনের হিংসে ভুলে বাওয়া নখে হিংসে ফিরে আসবে। দাঁতে আসবে চামড়া ছিঁড়ে নেবার হাজার হাজার বছরের পুরোন উত্তেজনা। চোখ ছিঁড়ে রক্ত বার হবে। আতঙ্কে ও ছুটে বাইরে আসতো। বাইরে বন্ধুদের তুমুল জীবন, সাহিত্য আর রাজনীতির খোঁয়ার আপ্সা।

নিজের ভেতরে একটা কি যেন আছে। সেটা নড়াচড়া করলে হঠাৎ ও কাঁপজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রূপনগরে মায়ের ব্যাঙ্গীয় স্বজনদের বাড়িতে ওর গতিবিধি ছিল হালেকালে। মামাবাড়ি মাইল দুয়েকের মধ্যে। মায়ের কাকার বাড়িও নিকটে। কিন্তু আদিত্য সেখানে যেতাই না। সেই কিশোরবেলায় আদিত্যের জীবনে যখন জটিলতা ছিল না তখন খেলখেলার জমতো। এসব বাড়িতে কিন্তু বড়ো হয়ে আর এসব জায়গায় যেতে ভালো লাগতো না। তার মামা ডেকে তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বললে, হেসে হেসে মায়ের, কাকার নানা গল্প করলে, তাদের ছেলে-পিলেরা আদিত্য বলতে অজ্ঞান হলেও আদিত্যের এসবে মন ছিলো না। ভেতর থেকে কারো জন্যে কোন তাগিদ অনুভব করতো না। মামার অসুখ। যন্ত্রণায় ছুটফুট করছে। পাখে মামাতো ভাই খবর দিয়েছে তার মা মনোরমাকে খবর দেবার জন্যে। সে খবর দিতে ভুলে গেছে আদিত্য। মনোরমার মার মাথা খারাপ হলেও বাইরের থেকে কিছু বোঝা যেতো না। উনি একদিন বেলা-দুপুরে স্নান করতে গেলেন গঙ্গায়। বেশা পাঁচটাতেও ফিরে এলেন না। সোঁদিন বিকেলে প্রকাশ্যে বোড়াজাল পড়লো গঙ্গায়। একটা হস্তর ছাড়া কিছুই উঠলো না জ্বালে। মানুষটা লোপাট।

হয়তো জলে ডুবে মারা গেছে। হয়তো বাড়ির অত্যাচারে কোথায় চলে গেছে। এ্যাতোবড়ো খবরটাও বোমালুম ভুলে গেছে আদিত্য। বাড়িতে, অশ্রুত মাকে জানানো দরকার। সে-সব ও কিছুই করে ন। যখন পাড়াশুদ্ধ লোক তেলপাড় করে গঙ্গার ঘাটে ভিড় জমিয়েছে তখন আদিত্য কোন নির্জন মাঠে একা একা আপন মনে ঘুড়ি ওড়চ্ছে। মনোরমার কানে কথা গেলে মনোরমা ছেলের আচরণ দেখে ভয়ে হিম হয়ে গেছে। অশ্রুত এই ছেলে। একে সে কোলোপটে করে মানুষ করেছে। এই সেই ব্রিগশ নাড়ি ছেড়া যন।

কিন্তু অবিকল কি, তার পোড়া অদৃষ্টের মরণ, ওর বাবার মত হতে হয়। উনিও সব ভুলে যান। কিছুই মনে থাকে না। কিছু না। এতো বড়ো খবর, এ্যাতো দরকার, মাগো, আদিত্যও বোমালুম ভুলে গেল?

জিগ্যেস করলে বললে, ঐ বাঃ, ভুলে গেছি।

এক তারপর আর কিছুই করবার নেই? মায়ের মা কি আদিত্যের দিদিমা নয়? শব্দ মায়েরই মা? তাহলে মনো-রমাকে, তার মাকেও তো ভুলে যাবে আদিত্য?

পাড়াশুদ্ধ মেয়েরা, মেয়েদের মায়েরা যখন গঙ্গার ঘাটে ভিড় করে মনোরমার মায়ের কথা ভাবছে, দেখ, মনোরমা তখন তার মায়ের কথা ভুলে তার নিজের কি হবে সেই কথা ভাবছে।

আর কেন সে এ্যাতো বড়ো জরুরী খবরটা মাকে জানাতে ভুলে গেল এই ভেবে ভীষণ মনরমা আদিত্য যখন কোন কুলকিনারা করতে পারলো না, তখন তার চোখের সামনে তার বাবার ভীষণ একা একা, বিষম মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। শ্বাশুড়িকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, শ্বাশুড়ি সম্ভবত জলে ডুবে মারা গেছেন এসব কথা ভারতে ভারতে শান্তিনাথ রাস্তার ধারের রোয়াকে বসে কখন অন্য-মনসত্তা ভাবে ডানহাতটা বাঁহাতে তুলে নিয়েছেন। মরণযন্ত্রণায় সমস্ত শরীরটা আবার ভেঙে তখনই হয়ে যাচ্ছে। ভীষণ ধড়ফড় করে উঠছে বুক। চোঁচিয়ে ডাকতে পারছেন না কাউকে। জিভ শূন্যে একেবারে কাঠ। ভীষণ একা থাকা মৃত্যু যন্ত্রণার এই দারুণ সময়ে হঠাৎ একটি পাখি, করুণ সুন্দর পাখি সবুজ জানলায় এসে বসলো। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে গেলেন শান্তিনাথ। অনেকদিন পর বকের যন্ত্রণাটা হল বলে শান্তিনাথ ভেবেছিলেন এই যন্ত্রণাই শেষ যন্ত্রণা। একে আর ঠেকাতে পারবেন না। কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্তি পেলেন। মৃত্তি দিয়ে গেল ঐ পাখি। হয়তো পাখি না, লাল একটা

আপেল, কিংবা মেয়ের সোনালী, কিশোর
আদিত্যের রাঙা চোঁট, কাঁচামিটে বয়েসের
মনোরমার গ্রীবার কোন অশ্রুত ভাঁগ
বহুবাহু বহু বস্ত্রধার হাত থেকে তাঁকে
মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু শান্তিনাথ তা
ধরতে পারেন নি। এখন মুক্তি বহু
অকস্মাৎ বুঝতে পেরে ওই পাখিটাকে
আর অস্বীকার করতে পারেন না।
পাখিটা সামান্য হোক, মুক্তি সামান্য
নয়। অসামান্য বস্ত্রধার হাত থেকে আঁত
অসাধারণ মুক্তি।

সব ভুল? নিজেকেই যেন আর
বিশ্বাস করা যায় না। আদিত্য তা
এবং কোনদিন ছিলো না। কেন এ্যামন
হল? ভাবতে ভাবতে আদিত্যের চোখের
সামনে আবার বাবার সেই মাঝখক
ছবিটা স্পষ্ট হল।

এই সেই লোক। এই লোকটাই এ
সব করেছে। এই লোকটাই তাকে এ্যামন
করেছে। এই লোকটাই তার মাথার মধ্যে
চুকিয়েছে সংসারে একা থাকার ইচ্ছা।
প্রত্যেকের নিজের নিজের কষ্টই সত্য। এ
ছাড়া সংসারে আর কিছু নেই।

রাত্রির টিউশানীর পর শান্তিনাথ
কোথাও জুড়োবার একটু জায়গা পাতেন
না। তখনো রিক্সা চাপা, ট্রেন চাপা,
সিনেমা দেখা বন্ধ, কারুর সঙ্গে যে
দুঃ দশ আলাপ করবেন—রূপনগরে
এসে পর্যন্ত শব্দ নিজেই নিয়ে আসত
হয়ে থাকার ফলে, সে অভ্যস্ত নেই।
সুতরাং শান্তিনাথ আদিত্যকে বলতো
কোন কোনদিন, চল একটু বোড়ের
আসি।

আদিত্য যেতো না। একটা না
একটা বাজে অজ্ঞহাত খাড়া করে দিতো।
উনি রোগ যেতেন। মৃৎ ভেঙে বলতেন,
তা বাবে কেন? বন্দুরা ডাকলে ঠিক
যাবে। এ যে বাপ ডেকেছে। বাপটা তা
আর রসের কথা জানে না। আদিত্য মাথা
নাড়তো। নয়, এসব কারণ নয়।
শাসলে বাবা তোমার জগৎ ক্রমে ক্রমে
আগার জগৎ হয়ে যাচ্ছে বলে, তোমার
কালো ছায়া আমাকে গিলতে চাইছে
বলে, ভয়ে, আতঙ্কে আমি তোমাকে
সবচেয়ে এড়িয়ে চলছি। ভুল বুঝো না তুমি
আমাকে। শান্তিনাথকে প্রত্যাখ্যান করে
আদিত্য আন্তরিক দুঃখ পেতো।

মনের ওই সংকটজনক অবস্থায়
প্রতিমার সঙ্গে আদিত্যের দেখা হয়ে-
ছিল। তাকে দেখা বলা ঠিক নয়।
দর্শন বললে ঠিক বলা হয়। তাদের বাড়ি
থেকে দুবের মাঠে বসে আদিত্য একদিন
দুর্গপ্রাকারের মত বিশাল, পরিত্যক্ত,
ঈষৎ ভাঙা ভাঙা বাড়ির ওপরতলার
ছাদে এ জগতের সবচেয়ে সুন্দরী এক
অবিস্মরণীয় নারীমূর্তি দেখেছিল।
সেই প্রথম বিস্ময়। সেই বিস্ময়
বিশ্লেষণ ঘটিয়ে দিলো আদিত্যের



মুক্তি দিয়ে গেল এ পাখি। হয়তো
পাখি না, মাল একটা আপেল

মধ্যে। আদিত্যের যথেষ্ট বয়েস হলেও
এর আগে কোন মেয়ের শরীর অথবা
মন সে কিছুই জানতো না। বাবার
সঙ্গে মায়ের সম্পর্কটা ক্রমশই একটা
অশ্রুত অকস্মাৎ মধ্যে গিয়ে পড়ছিল।
আদিত্যের মা সব সময় উঠতে-বসতে
খ্যাচখ্যাচ করতো। আদিত্যের বাবার
কোন দৃষ্টি নেই, শক্তি নেই, ইচ্ছে নেই
বলে। সে এক অমানুষিক কান্ড। বেশির
ভাগ দিন এ খ্যাচখ্যাচানির জন্যে
আদিত্যের বাবা ভাত ফেলে
চলে যেতেন। আর বাবার জন্যে
আদিত্যের কষ্ট হত। ওনার নামের
সম্পত্তিই তো আদিত্যেরা ভোগ করছে।
ইচ্ছে করলে তা তার বাবা রাজার হালে
ধাকতে পারতেন। নিজের সম্পত্তিটা শব্দ
দেখশুনো নিতে পারলে আর ভাবনা কি।

শব্দ এ অমানুষিক রোগটা। এ
জন্মেই তো ওনার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল।
এ জন্মেই নিজের স্ত্রী আর যানছে না
স্বামীকে। ঠিক কবে থেকে এই কগড়া-
খাটি শব্দ হয়েছে তা সাল-তারিখ
মিলিয়ে বলতে পারে না আদিত্য। তবে

এটা বেশ মনে হয়, এসব ক্রমে ক্রমে বেড়ে
চলেছে। আগে, যখন সে নেহাৎ ছোট
ছিল, এই ক্রাস সেভেন-এইটি পড়তো,
তখন তেমন দেখে নি। তখন সংসারে
অভাব-আভিযোগ ছিল একই রকমের,
সব থাকতে কিছু নেই দশা। তবে, তেমন
বড়রকমের কগড়া-খাটি দেখে নি
আদিত্য। কিন্তু সংসারের নৈমকহাবায়
তার মা যতো দেখছে ততো তার বাবার
ওপর রেগে যাচ্ছে। আদিত্যের এক-এক
সময় মনে হত, তার বাবার মৃত্যুবরণ,
বিস্ময়বোধ আসলে ছদ্মবেশ। এসব
কিছু না। দৃশ্যমান। ইঠাৎ একদিন
আদিত্য দেখবে তার বাবা সমস্ত দৃশ্য
ঝেড়ে ফেলে হাতে জাদুকরের জাদু
নিরে বলে উঠবেন, ভানুমতীর খেলা
দেখাচ্ছিলাম এ্যাতোদিন। ইচ্ছে করে
খুলোতে গড়াগড়ি দিয়েছি। আসলে
আমি রাজা। আমার রাজার পাট। কিন্তু
পরক্ষণেই মনোরমার ককশ চীৎকারে
কাঁচের শাশিগলি পর্যন্ত কানকান কবে
উঠতো, রাফোস, রাফোস। আমায় সব
খেল হাউ-মাউ করে। আমার হাড় মাস
মজা সব। আমার অতীত বংশমান,
ভবিষ্যৎ সব। বাকী কিছু রাখলো না।
রাসে স্তান হাবিয়ে মনোরমা কপাটে
ঠুকতো।

যতাবারই কোন মেয়ের মৃৎ মনের
মধ্যে স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছে আদিত্য,
ততাবারই তার বাবার বিষাদ ছড়ানো
মৃৎের মৃত্যুছায়ার মায়ের সাংঘাতিক
হিংস্র, উগ্র অননুভূতীয় মৃৎটা তাঁকে
হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রতিমাকে
দেখেই আদিত্যের মনে হল এই নারী
পারবে তার জীবনকে দারুণ অগচয়ের
হাত থেকে উদ্ধার করতে। অশ্চর্য,
প্রতিমাও যেন আদিত্যের জন্যে অপেক্ষা
করাছিল। ডাকসাইটে সুন্দরী। মায়ের
ডাকসাইটে সুন্দরী মেয়ে। রূপনগরের
যুবকেরা তার মৃৎনাভি-গন্ধে দিগ্‌হারা।
কলেজের রুটিন প্রতিমার মৃৎস্থ নয়।
কিন্তু রূপনগরের এ অঞ্চলের যুবকদের
মৃৎস্থ। সোমবার প্রতিমা দশটার বাস
ঘরে। মঙ্গলবারও কি দশটার বাস
ঘরে? কটার বাস ঘরে প্রতিমা ভুলে
মেয়ে দিয়েছে। প্রতিমাকেই ঠিক করতে
হত বাস থামবার জায়গায় মার্কিমারা
যুবকদের তার জন্যে অপেক্ষা করতে
দেখে। রুটিন মৃৎস্থ করে ওরা এতো
দাঁড়াতো। ওরা সোদিন বাসস্টপের সামনে
দাঁড়াতো না সোদিন প্রতিমা বৃত্ততো
সোদিন তার কলেজ বন্ধ অথবা তার ক্রাস
এখন নয়, দৌরতে।

যেমন অসাধারণ রূপ তেমনি বড়
লোক। ফরিদপুর জেলায় মস্ত
জমিদারী ছিল। সে সব পাকিস্তান
গভর্নমেন্ট দখল করে ফেলেছেন রিনা
ক্ষতিপূরণে। তাহলেও এখানেও কিছু

কম সম্পত্তি ছড়ানো নেই। অবশ্য বাড়ি এখনো তৈরী করা হয় নি। বাড়িতে বাড়িতেই থাকতে হয়েছে। তবে কনি কেনা হয়ে গেছে গঙ্গার ধারের বিকে। ওখানেই চকমিলানো প্রকাশ্য বাড়ি উঠবে। বাপেব এক সন্তান। সুতরাং এমন মেয়ের পা ত' মাটিতে গড়বারই কথা নয়। কিন্তু সবটাকে ঠেলে প্রতিমা শেষপর্যন্ত আদিত্যের গলায় মালা দিল। আর আদিত্যের কাছে এটাই এক রহস্য হয়ে রইলো চিরকালের মত।

সেদিন কি একটা পুজোর দিন ছিল বোধহয়। বাড়ি পুড়ছিল শহরের অন্ধকার আকাশে। আদিত্য আর প্রতিমা পায়ে পায়ে নেমে এসেছিল ঘাটে। ওপারের মিল থেকে অস্পষ্ট আলোর তীর প্রেমিক-প্রেমিকার কল্পিত কথা অজানা আশঙ্কায় স্পর্শ করছিল। নীরব সাক্ষীর মত কয়েকটি মিটিমিটে তারা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আদিত্য সমস্ত শ্বিষা, শ্বশ্ব অতিক্রম করে চলমান নৌকায় আত্মমগ্ন ভাবে প্রতিমার একখানি হাত ধরেছিল। প্রতিমা প্রবল সূখে তলিয়ে যেতে যেতে তন্ময় ভাষায় বলেছিল, হাতটা চিরদিন ধরে রাখবেন ত'? কখনো ছেড়ে দেবেন না? আদিত্য ওর এ-রকম প্রশ্নে কোন উত্তর দেয় নি। এ প্রশ্ন অশ্রুত। এ প্রশ্ন বিচর। ওর সরলতায়, ওর শঙ্কাহীন আত্মসমর্পণে, বিস্মিত, অভিভূত হয়ে আদিত্য কথা ব'জ্ঞে পাচ্ছিল না। মনে মনে সেদিন আদিত্য সঠিক জানতে পারল, এ গভীর মেয়ে। এই গভীর, উপভোগ্য মেয়েটিকে নিয়ে কি করা যায়? একে নিয়ে জীবনের স্রোতে সে বোধহয় ভাসতে পারে। এ বোধ-হয় তার জীবনের বিষ্ণুতাকে দূর করে দিতে পারবে। কিন্তু একটা কিছু প্রতিমার মুখে খুঁজছিল আদিত্য। সিঁড়ি দিয়ে ঘাটে উঠতে লাইটপোন্টের আলোয় 'ভালো করে একবার দেখে নিতে চাইল ওর মুখ। ঐ মুখে তার মায়ের প্রচণ্ড রাগে কঠিন, তীর মুখ উঁকি দিল না। অশ্রুত হ'ল আদিত্য। বড় ভাল লাগল সেই দুঃস্বপ্ন সময়।

প্রতিমার বয়েস বিশ। আদিত্যের পঁচিশ। পঁচিশ বছরের আদিত্যের ভালবাসা ছিল এক উদ্দাম, কম্পনা-জীবি কিশোরের ভালবাসা। প্রতিমার সব কিছুর মধ্যে আদিত্য অলৌকিকতার স্পর্শ পেয়ে সর্বদা ভাববিচল থাকত। কিন্তু সেই রহস্য। সেই রহস্য তাকে পাগল করে মারছিল উঠতে-বসতে। যতবারই আদিত্য বলতো, তোমাকে ভাল লাগার আমার কারণ আছে। কিন্তু কি আছে আমার? কি দেখে

তুমি আমাকে বেছে নিলে? প্রতিমা ততোবারই প্রথমটায় কোন জবাব দিতো না। তারপর খুব সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে বলতো, ঠিক বলতে



হাতটা চিরদিন ধরে রাখবেন তো

পারছি না কেন? আছে হয়তো কারণ। আমি জানি না। কিন্তু তুমি কারণ জানবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? কি হবে কারণে?

কারণ, কারণ, একটা কারণ চাই বৈকি। হাতের মতো পাকাতো আদিত্য। ভালোবেসে তার সুখ যেন পুরোমাত্রায় হচ্ছে না এই রহস্যের কলকিনারী না হলে। অনেক রস যেন আড়ালে থেকে যাচ্ছে। কারণটা জানতে পারছে না বলে প্রতিমা দেখতো তার প্রেমিক কষ্ট পাচ্ছে। প্রতিমা কষ্ট পেত কারণটা বলতে পারছে না বলে। সমস্যা শুধু এইখানেই নয়, মিলনের গভীরতম মুহূর্তেও আস্তিত্ব ভুলতে পারতো না সে রূপহীন, তার মাথায় ইতিমধ্যেই গজিয়েছে পাকা চুল, অতি সামান্য কেরানী সে, আর এ সব নিশ্চয় প্রেমিকের সার্টিফিকেট নয়। প্রতিমাকে বলতো, আজ যখন আমার পাকা চুল তখন তুমি এলে কেন? সেই তুমি এলে কিছু আগে এলে না কেন? প্রেম দিয়ে প্রেম সম্বন্ধে ভাবনা এনে দিলে কেন?

এ কথায় জবাব প্রতিমা দিতো না কথায়। ভীষণ লজ্জায় মুখে তার আঁধার ছাড়িয়ে যেত। চকিতে একবার আদিত্যকে দেখে নিলে, দিশেহারা তার পাগল করা চোখ দুটি বড় বড় পল্লবের নীচে রেখে আরক্ত মুখে দ্রুত সামনে থেকে সরে যেত। কখনো কখনো কৃত্রিম রাগ দেখাতো। অপরূপ ডান হাতখানি মৃদু পাকিয়ে তুলে একচোখে কল্যা, অন্য চোখে হাসি নিয়ে প্রতিমা খানিকটা মিথ্যা করে আদিত্যকে শাসন করতো, আবার! আবার ওসব কথা! আমি সেদিন বারণ করলাম না?

তখনকার মত আদিত্য 'প্রণয়ের শাসন মেনে নিতো। কিন্তু তাঁর মনে প্রশ্ন জেগে ছিল। প্রশ্ন জাগতো প্রতিমার মধ্যেও। তবে সে প্রশ্ন একটু অন্যরকমের। মাঝে মাঝে পথে ভীড়ের মধ্যে দেখা হ'লে হঠাৎ এক-একদিন প্রতিমা ঝাপসা গলায় অস্তিত্ব সূরের এক ঝংকার তুলে বলতো, কি করলেন বলুন ত'?

এ আমার কি করলে? আমি ত' নিজের কথা কিছু ভাবতেই পারছি না। খালি আপনার কথা ভাবছি।

আদিত্য কিছু বলতে পারতো না জবাবে। সে বোকাম মত চেয়ে থাকতো প্রতিমার দিকে। প্রতিমা এ ধরনের কথা বলবার সময় 'তুমি' থেকে নিজের অজান্তে কতো সহজে 'আপনি'তে চলে যেত বলেই নয় সত্যি সত্যি প্রতিমার চোখ, প্রতিমার মুখ, ঠোঁটের ভঙ্গি পর্যন্ত এ অবস্থায় অশ্রুত অপরিচিত লাগতো। তা' লাগুক। কিন্তু একবারও মনে হত না প্রতিমা

ভার এই অবস্থার জন্যে দীর্ঘ বোধ করছে। নানারকম প্রশ্ন দেখা দিলেও, মনে হত, প্রেমের কাছ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ষ পাওনা মানুষের পাবার থাকে, না চাইতেই সেই অনবদ্য দান এখন তাদের সামনে এবং তারা নতজানু হয়ে সেই দানকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

প্রতিমার বাড়ির চাকরের মূখ থেকে আদিত্য শুনতো, যখনই প্রতিমা খানিকটা একা থাকে, তখনই কাঁদে। আদিত্য আশ্চর্য হয়ে শুকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাস্য করতো। বলতো, কেন কাঁদছো প্রতিমা, কেন? আমাকে তুমি ঘোঁকের মাথায় ভালোবেসেছো আমি জানি। তাছাড়া সবাইকে ঠেলে আনার কাছে আসার অন্য কোন মানে হয় না। প্রতিমা কান্নাজড়ানো গলায় বলতো, না।

আদিত্যের বয়েস পাঁচশ। সে জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তর পেয়েছে। সুতরাং তার ধারণা হয়েছিল সে ছেনে ফেলেছে প্রতিমাকে। তাই তো ও বলল, আমি জানি তোমার আশ্বশোস হচ্ছে। ভুল ভেঙেছে তোমার এতোদিনে। কথা দিয়ে ফেলেছো বিয়ের অথচ এখন দেখছো বিয়ে করলে তুমি ঠকবে। তারপর একটু থেমে মরিয়ার মত ভিত্ত একটু হেসে আদিত্য বলল, পুরুষ-মানুষেরা যেমন করে সিগারেটের ছাই ঝড়ে তেমন করে ঝেড়ে ফেলে দাও আমাকে। আমি ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়বো। কাদার ওপর।

প্রতিমা হঠাৎ প্রবল আশঙ্কায় কেঁপে উঠতো। তারপর কৈমন আতঙ্কিত হয়ে আস্তে আস্তে বলতো, আমার থেকে আমার সব চলে যাচ্ছে। এমন কি আমার হাত, পা, চোখ সব তোমাকে ছোঁবার জন্যে, তোমাকে পাবার জন্যে, তোমাকে চোখে একটু দেখবার জন্যে ব্যস্ত। সামনে পরীক্ষা। আমি যে পরীক্ষায় ফেল করবো। এ তুমি আমার কি করলে?

আদিত্য বুদ্ধিতে পারছিল। খুব ধীরে ধীরে, অত্যন্ত ক্ষীণগতিতে একটা কিছুকে স্পর্শ করতে পারছিল। কিন্তু নিয়তি তাকে তখনকার মত মোহমুগ্ধ করেছিল। সত্যের মূখ দেখতে দেয় নি। শব্দ অস্পষ্ট সঙ্কেতের মত স্তম্ভতার অপর পারে একটা অলৌকিক নদী ক্রমশঃ পায় হেঁটে এই দিকেই আসতে চাইছিল। কিন্তু আদিত্যের তখনো উপায় ছিল না। আদিত্য এই আনন্দেরই মন্ত ছিল অবশেষে তার বাবার প্রবল প্রতাপশালী মূর্ত্যবিশিষ্টার অনিবার্য বিষাদকে সে পরাস্ত করতে পেরেছে। সে আজ

জয়ী। আর বাবা তার নাগাল পাবে না। কিন্তু অন্য আরেক বিপদ সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সাবধান ছিল না।

তাই তাদের বিয়ের পর প্রতিমা যখন আদিত্যের সংসারে এসে দু'চারদিন পরই শিল্পের ওপর প্রথম লক্ষ্য বাটতে বসলো তখন তার কান্না দেখে সকলের যেমন মনে হয় আদিত্যেরও তেমন মনে হল, আহা, বড়লোকের মেয়ে, কখনো এসব করে নি, লক্ষ্য-বাটা অভ্যাস নেই, মা যে তার ভবিষ্যতের জন্যে এখন থেকে ট্রেনিং দিচ্ছে, এ্যাভো তাড়াতাড়ি না হলেই এসব হ'ত। লক্ষ্যের ঝাঁকেই বোটার কাঁদছে। লক্ষ্যের ঝাঁকেও হতে পারে অথবা অন্যকোন কারণে, এমন কারণ, তখনকার মতন যেটা প্রতিমা জানে না, শব্দ শব্দে পেরেছিল?

আদিত্য এক ফাঁকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞাস্য করেছিল, কাঁদছিলে কেন?

প্রতিমা হেসে বলেছিল, যা, কাঁদিনি তা! তারপর বলেছিল একটু কৈমন হয়ে গিয়ে, বড়োর মতন খালি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাস্য করা। কাঁদছিলাম এই ভেবে যে আমি ত' কখনো কোনদিন নিজের বাড়িতে লক্ষ্য বাটা নি।

কিছু বুদ্ধিতে না পেরে আদিত্য ফের বলেছিল, মায়ের এ বিলুপ্ত ভারি অনায়া। মা খালি শিক্ষা দিতে চায়। তাড়াতাড়ি তৈরি করে দিতে চায়। এ ঠিক নয়। এসব এ্যাভো তাড়াতাড়ি কেন?

প্রতিমা তাড়াতাড়ি বলেছিল, মায়ের কোন দোষ নেই। মা শিক্ষা দেবেন না? আমি ত' কিছু জানি না। জানতে হবে না তাড়াতাড়ি? তুমি হয়তো আমার কথা ঠিক বুদ্ধিতে পারলে না?

আদিত্য হেসে বলেছিল, তুমিও ঠিক আমাকে-তোমার কথা বোঝাতে পারলে না। প্রতিমা পূর্ণিমার মত গোলাকার, উজ্জ্বল হেসে বলেছিল, তা ঠিক।

প্রতিমার এ ধরনের কান্নাগুলি প্রতিমা সোঁদিন আদিত্যকে বুদ্ধিতে দেয় নি; কারণ প্রতিমার কান্নায় আদিত্যের সোঁদিন সূখ ছিল।

কোলকাতা থেকে মাঝে মাঝে ট্রাফিক জ্যাম্পের জন্যে ফিরতে দেরি হত। প্রতিমা পাগলীর মত কাঁদতে কাঁদতে আদিত্যের বুদ্ধি ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতো, আমার কি অবস্থা বুদ্ধিতে পারো না তুমি? কেন, কেন এতো দেরি করলে? আমি কতোক্ষণ একা একা আছি একটু মনে হয় না? এরকম কেন হয়ে গেল এর মধ্যে?

আদিত্য অভিভূত হয়ে যেত। এসব

কথার ভেতরকার রহস্য বুদ্ধিতে আরো খানিক বিলম্ব ছিল। তাদের এই বাড়ি, তার বাপ, মা, আরো দু'তিনজন আশ্রিত, সবাই রয়েছেন। সকলের মধ্যে থেকেও প্রতিমা নিজেই এমনভাবে একা ভাবছে কেন? বোধহয় এরকম সকলেরই হয়। বোধহয় এ সময় সকলের জগতটাকে দু'জনের সংকীর্ণ জগৎ বলে মনে হয়। এসব ত' পুরাতন কথা। প্রতিমা যদি নতুন কোন কথা বলে? তাহলে সে কোন অস্বস্তিকে রেখে যেতে চাইছে এসব কথার ভেতরে?

বিয়ের পর প্রতিমা সোঁদিন আদিত্যের সঙ্গে সর্বপ্রথম রিক্সায় বেড়াতে বার হয় সোঁদিন বাড়ি থেকে বার হতে না হতে ও রিক্সার হুড খুলে ফেলে। ব্যাপারটা সামান্য কিন্তু আদিত্যের কাছে এই সামান্য ব্যাপারটা সেই সোঁদিনে সামান্য ছিল না। আদিত্য বলেছিল, ওটা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি থাক না।

প্রতিমা বলেছিল, হুডটা সামনে ঝুললে রিক্সাটাকে একটা খাঁচা মত লাগে। এ বন্দীদশা ভালো লাগে না পয়সা খরচ করে।

আদিত্য আর কিছু বলে নি। সঙ্গে সঙ্গে ও বিষ্ণু হয়ে গিয়েছিল। হুডটা সামনে ফেলা থাকলে দু'জনে রিক্সায় ঘন করে বসা যায়। তাতেই কৈমন একটা অপরিচয়ের জগৎ তৈরি হয়ে যায়। একদিন তো তার বাপ, মার মত তাদেরও হয়ে যেতে হবে। এখন থেকেই এ রহস্যের উন্মোচন কেন? থাক না একটু রোমান্টিক অধকার। এখুনি বাইরের দিকে তাকাবার প্রয়োজন কি? এখন ত' তারা নিজেদের রসে ভরপুর। বাহির ভুবনে তাকাতে যখন নিজেদের এই সংকীর্ণ জীবনমন্ডের মত ভেঙে পড়বে।

এমনিতে প্রতিমা ছিল অপূর্ব, পরম উপভোগ্য। কিন্তু এ সব ছোট ছোট নিতান্ত সামান্য ব্যাপারকেও প্রতিমা সবলে আঁকড়ে ধরতো। কেন তার কারণ সোঁদিন আদিত্য জানত না। ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি ছিল।

বিয়ের মাত্র বছর দেড়েক পরই প্রতিমা হঠাৎ গলগল করতে আরম্ভ করলো। আদিত্যের বাড়ির তত্ত্ব প্রতিমার রচিত না। বাড়িতে কেউ নেই। আদিত্য অফিস কামাই করেছে মিথ্যা মিথ্যা। এই নিরিবিলি সময়টুকুকে প্রাণখোলা হাসিতে, প্রগলভতায়, হাঁ, হ্যাঁ, অসভ্যতায় ভরিয়ে তোলবার জন্যে সবে উন্মুগ্ন হয়ে প্রতিমার প্রকাশ খোঁপাটা পিঠের ওপর ভেঙে তখনই করে দিয়েছে, প্রতিমা তখন অদ্ভুত এক কাঠিন্যের সঙ্গে বলেছে, তোমাদের বাড়ির রান্না জঘন্য। কচু-ঘেঁচু খাও

কি করে? আমার একটা ব্যবস্থা কর।
এরকম খেলে আর বাঁচবো না।

বড়লোকের মেয়ে। মদ্য অন্যরকম।
এ আদিত্য জানতো। কিন্তু সত্যি সত্যি
যে গদ্য দিয়ে নাবছে না এ জানত
না। জনার উপরও ছিল না। প্রতিমা
ছাড়া সেও কে নদিন খাওয়ার কথা বলে
নি। হঠাৎই সেদিন বলেছিল।

বিস্ময়ের পর মাত্র দেড় বছর গেছে,
একটা ছেলে হঠাৎ আর এর মধ্যেই
প্রতিমা প্রভাবের নথ ও দাঁত
করুনো না থাকা থেকে বার কবে ফেলল?
সেই সব রোমন্থময় দিন! তখন প্রতিমার
সুখের জন্যে আদিত্য কি না করতে
পারতো? অথচ সে সময় নিতান্ত
খাওয়া-পরা নিয়ে প্রতিমা কি অর্থহীন
প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিল!
আদিত্য আর বেশি ছিল না। ডাল-
হাউসের তেলচিটচিটে কেরানী।
বড়ত দিয়ে হাতে শব্দ মাসে দু'বার
ফাস্ট ক্লাশে নিজেমা দেখার সংগতি
ছাড়া আর বেশি কি থাকতে পারে?
এ অবস্থায় আলাদাভাবে প্রতিমার
খাওয়ার বন্দোবস্ত কিভাবে করা যায়?
কৃত্তোগী মায়েই বুদ্ধবেন, মামলাতার
মত কচি-মেয়েটিকে ঘিরে আদিত্যের
ভালোবাসা তখন একটা নতুন সংকেত
খুঁজে পেতে চলেছে সেই অবস্থায়
তরুণী স্ত্রীর আশ্রয় রক্ষা করতে না
পারলে বুদ্ধের ভিতরে কী ভীষণ কষ্ট
হবে। আদিত্য দিশেহারা হয়ে প্রতিমাকে
বলতো, আমি কি করি বল ত?
আমার যে সামান্য আয়! এ কথার
জবাবে প্রতিমা স্বচ্ছন্দে বলতো, চলো
এখান থেকে আমরা কোথাও চলে যাই।
চল যাবো? ভয়ানক অবাক হয়ে
আদিত্য প্রতিমার দিকে হতভম্বের মত
তাকাতো। প্রতিমা কি পাগলী হয়ে
গেল? এ প্রতিমা বলে কি? রান্না মদ্যে
রচছে না বলে কেউ কখনো বাড়ি থেকে
চলে যেতে চেয়েছে? তাছাড়া আদিত্যের
মা, আদিত্যের বাবা, তাদের বাড়ির
আশ্রিত চাকর-বাকর এরা কি প্রতিমার
কেউ নয়?

না। কেউ নয়। শব্দ আমি ছাড়া
আর কেউ কিছু বলে আমি স্বীকার
করি না। অথচ আমি স্বার্থপর নই।
বিবেচনাশূন্য নই। আমার অস্তিত্ব
আমাকেই রক্ষা করতে হবে।
আমার মর্যাদা আমি ছাড়া
আর কে রক্ষা করবে? এমন কি তুমি,
প্রেমিক, স্বামী, আমার সন্তানের পিতা
তুমি আমার অনেক কিছু বটে, তুমিও
শেষপর্যন্ত কিছু নও। সবাইকে
ছাড়িয়ে, তোমাকে ছাড়িয়ে এমন কি
এই কচি ছেলেটাকে ছাড়িয়েও শব্দ
এই নির্জন, বিপুল, বিশ্বসংসারে
আমি আছি।



চলো এখান থেকে আমরা কোথাও চলে যাই ...

না। না। প্রতিমা এসব কথা তখন
বলে নি। ঠিক কি বলেছিল আদিত্যের
তা মনে নেই।

কিন্তু প্রতিমার হৃদয়হীন রুদ্ধতার
আদিত্য চমকে উঠেছিল। তার এই
রোগে, শোকে, কর্তব্যের ভারে বিপর্যস্ত
মা আর এই সদাবিক্ষণ, অসহায়, প্রায়
পগড় বাবাকে ছেড়ে প্রতিমা তাকে নিয়ে
কোথায় চলে যেতে চায়? এঁদের প্রতি
কোন কর্তব্যই কি প্রতিমা স্বীকার
করে না। না। কোন কর্তব্যই প্রতিমার
নেই। কর্তব্য কি খালি অন্যের বেলায়?
নিজের বেলায় নয়? প্রতিমার কর্তব্য
কি খালি বলির পাঠার মত উদ্যত খাঁড়ার
সামনে দাঁড়ানো? নিজেকে বাঁচানো
নয়? প্রতিমা কেন নিজেকে বাঁচাবে না?
অন্যায় হবে? কিসের অন্যায়? না।
প্রতিমা এসব জানতো না সেদিন। ও
একটা ঘোর কান্ডগূলি করে যাচ্ছিল।
লোকে বিশেষ মেয়েমানুষ যেমন এই
অবস্থায় চাপা দিয়ে, গোপন করে, সবচেয়ে

মনের এই ভাবনাগুলোকে মূড়ে রাখে
সামান্য কথার রাগতায়, নিজের
পাওনাটা কড়ায়-গন্ডায় বুদ্ধে নেয় অথচ
অন্যকে বুদ্ধিতে দেয় না লোহা-গলানো
ভালোবাসার মিথ্যে আঁচে, এমন হেঁচ-
জোড়ে, গাঢ় হতে চায় সকলের কাছে যে
কেউ আন্দাজ করতে পারে না তার
দুঃসঙ্গী, চেহারাটা কেন আগুনে
পাহাড়ের মত ঝলসে ঝলসে উঠছে?
প্রতিমা ছিলো খুবই সরল। রেখে-
দেখে কথাও জানত না। মনের মধ্যে
কিসের একটা কষ্ট কাঁটার মত বিষে
আছে। সেটাকে না তুলে ফেলা পর্যন্ত
সোয়াস্টি নেই। চতুরতা, সতর্কতা,
প্রতীক্ষা এসব বেঁচে থাকার, সর্বাঙ্গিক
বাঁচিয়ে রাখার আঁটপ জ্ঞানত না।
এই বাড়ি, এখানকার লোকজন, এখান-
কার রান্না সবই ওর কাছে, ওর
অস্তিত্বের পক্ষে সেদিন নিবন্ধক বোধ
হয়েছিল। এসবের হাত থেকে ও
পরিগ্রাণ চাইছিল। এমন কি এরকম

কথাও আদিত্যকে বলেছে যদি শেষ পর্যন্ত আদিত্য এখান থেকে চলে না যায় তাহলে তাও আর দরকার নেই, প্রতিমা তার ছেলে নিয়ে স্নেহানুভব চলে যাবে, একটা পাশ বখান দিয়েছে তখন আরেকটা পাশও দিতে পারবে, তার বাপের বাড়িতে স্বামীকে ছেড়ে আসার বিড়ম্বনা নিয়ে থাকতে হবে না।

আমি তেমনকে ছেড়ে চলে যাবোই যাবো। আমি একদম এখানে টিকতে পারছি নে। মাগো। আমি আর পারি না। পাগলীর মত প্রতিমা আদিত্যের বুককে এসব বলে কাঁপিয়ে পড়তো। হাউ হাউ করে কাদিত। কান্নাড়ে, ছিঁড়ে ফেলতো আদিত্যের জামা। আর আদিত্য মধ্যরজনীর গাঢ় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন এই বিষম নাটকের নায়ককে খুঁজতো।

নায়ক ত' প্রতিমা। কিন্তু কে এই নাটকের নায়ক? আদিত্য? তার সাধ্য কি? সে স্নান। সে বিবর্ণ। সে পরাজিত। নায়ক ত' সে হতে পারে না। ও কার বুককে প্রতিমা করাঘাত করছে? নিজের বুককে হিম হাড় স্পর্শ করত আদিত্য। এখানে কি সত্যিই হাড় আছে? এখানে কি সত্যিই বুক আছে? ও কার হাত ধবেছে প্রতিমা বস্ত্রমর্দিত? নিজের হাতটা তখন আদিত্য অনুভব করতে চাইছে। এখানে কি সত্যি সত্যি হাত আছে? প্রতিমা চাপা গালয় হুহু করে কাদিত। হে অন্তহীন, প্রেমহীন, মৃত্যু-হীন সময়, সেদিন আদিত্য তোমাকে চিনতে পারে নি। এ সরলা, সুধাময়ী বালিকা কেনম করে জানবে তখন ও প্রতিবাদ করছে কার কাছে? না বুকলেও আদিত্য সেদিন তোমার মত কিছুকেই অস্পষ্টভাবে খুঁজছিল।

কেন না ঠিক তখনই হঠাৎ আদিত্য অবিকল তার বাবার মত ভাঙতে ডান হাতখানি নিজের বাঁ হাতে তুলে নিয়েছিল, অনুভব করতে চেয়েছিল মৃত্যু-যন্ত্রণার পদশব্দ।

প্রতিমা অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে সেই দৃশ্য দেখে চাপা স্বরে হেসে উঠতো। 'ভীরু প্রতিহিংসার আঙুল তুলে বলতো, ও কি গো! তুমি, তুমি, তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না। অবিকল তোমাকে তোমার বাবার মত লাগছে। কি বললে? ভীষণ চমকে উঠে আদিত্য সজ্ঞারে প্রতিমাকে ধাক্কা দিতো। দেয়ালে প্রতিমার মাথা ঠুকে যেত। মশারীটা উন্মাদের মত টান মেরে ছিঁড়ে ফেলত আদিত্য। তারপর দু' হাতে মৃদু ঢেকে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকত ভোরের আশায়। ভেবেছিলাম, হে বিষম, মদা বিষম, মহাবিষম পিতা, প্রেম দিয়ে তোমাকে প্রতিরোধ করবো, কিন্তু আমার প্রেমের থেকে তুমি, তোমার

বিষমতা অনেক বেশি শক্তিশালী। হে সংবেদনশীল, কেন তুমি এতো দুঃখ দাও? পিতা, পুত্রকে ক্ষমা করো। আমার স্পর্শা ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল। আমি তোমাকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলাম।

আদিত্যের প্রতি প্রতিমার প্রেম ছিল না বিয়ের দেড় বছরের পর এ কথা বলা মানে ও যা ছিল না তাই ওকে দিয়ে বলা নো। বস্তুতঃ, আদিত্যকে দেখা-মার প্রতিমার মৃদু সন্মিলিত হাসিতে ভরে উঠতো। কিন্তু আদিত্য ক্রমে ক্রমে দূরকে দেখার দৃষ্টি আরম্ভ করতে চলেছিল।

এই সময় আদিত্যের মায়ের কন্ঠটা আরো একটু বাড়ে। প্রতিমাকে মনোরমা পড়াতে চাইল। মনোরমা দেখতে চাইল 'কলেজে পড়বো না মা। আপনার তাহলে অনেক অসুবিধে হবে।' এ কথা প্রতিমা অন্তত বেন বলে। কিন্তু প্রতিমা ও কথা বলল না। পড়তেই চাইল। আদিত্যের মা এমনিতে হুকুম দিতো হাকিমের মত। তার আর নড়-চড় নেই। কিন্তু কয়েকটি ব্যাপারে চূপ করে দেখতে চাইতো তার জন্যে কারুর মন, প্রাণ একটুও কাঁদে কি না।

হৃদয়ের ব্যাপারে স্নেহের আর কয়েস বাড়ে না। হায় মুচ বাঁসিকা। চোন্দ বছরের গম্ভী তারা কোনদিনই অতিক্রম করতে পারবে না।

নিজের সুবিধে দেখবার জন্যে আদিত্যের মার জন্ম হয় নি। তুমি যদি আন্তরিকভাবে কিছু কর তবে আদিত্যের মা তা মেনে নেবে। কিন্তু তোমাকে কর্তব্যে অনুপ্রাণিত করে, তোমাকে উত্তেজিত করে, তোমার দুর্বলতার অথবা ভালোমানুষির সুবিধে নেবে প্রতিমা ত' দূরের কথা, আদিত্য এমন কি আদিত্যের বাপের কাছ থেকেও নয়। এখানেও সেই হৃদয়ের প্রশ্ন, মনের জেদাজেদি।

চিরদিনই তাই নিজের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পেলো না আদিত্যের মা। প্রতিমা যেদিন রূপনগর থেকে মাইল দুয়েক দূরে সেলাই-এর স্কুলে সেলাই শিখবে দুপুরের সময় মাকে বলল, আদিত্যের মা তাতে আপত্তি জানালো না। অথচ কাজ ইদানীং বেড়ে গেছে অনেক। আদিত্যের মা একটানা ছুতের মত কাজ করে যেত। কোন কোন-দিন শীতকালে বিকেল পাঁচটা বেজে যেত কাজ করতে করতে। সকলের সব কাজ করলেও বাড়ির বৌ সেলাই শিখতে চলে গেছে প্ল্যাস্টিকের হলুদ ব্যাগ ঝুলিয়ে তার ঘর পরিষ্কার করা, তার মেঝেতে লোটাণো শাড়ি পরিপাটি করে আলনায়া রাখা, সকালবেলায় যে কাপটিতে চা খেয়েছে প্রতিমা, খাটের

তলায় এঁটো হয়ে পড়ে আছে সেটা ধুরে রান্নাঘরে তুলে রাখা, বাসি, ছোড়া শাড়ি জলকাচা করে রোদ্দরে শুকতে দেওয়া—এসব বাড়তি কাজগুলি আদিত্যের বিয়ের পর ক্রমশঃ জমে জমে পাহাড় হচ্ছিল। ছেঁড়া ন'হাত ময়লা কাপড় পরে, কচি বাছুরের মত এই এতোটুকু মান্দুটি অনবরত বকবক করতে করতে, গায়ে জ্বর নিয়ে ধুকতে ধুকতে পাশের ডোবায়া ডুব দিয়ে এনে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভিজ্ঞে কাপড়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপত। আদিত্য, তার বাপ, তার বৌ, তাদের বাড়ির গ্রামসম্পর্কের আরো দু-তিনজন এ বাড়ির আশ্রিত—সকলে মিলে উক চায়ের কাপ হাতে নিয়ে নানাবক্য মৃদুরোচক যোশগল্প তৈরি করত তখন। কেউ একবার লক্ষ্যও করত না, কেউ মৃদুফটে বলত না, ওমা! এই অবেলায় চান করে এলে! ওমা! কি হবে আমার? তোমার গায়ে জ্বর বেগো! গা যে একবারে পুড়ে যাচ্ছে পোড়ারমুখী!

কেউ যখন কাছে ছুটে আসত না, গরম এক কাপ চা এই সময় পেলে আরাম লাগতো, কেউ যখন চায়ের কাপটি আগিয়ে দিত না, তখন প্রতিমিত হয়ে বারকতক সকলের মুখে দিকে গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে আদিত্যের মা তাকাত তারপর আর থাকতে পারত না। হঠাৎ সেই চায়ের গন্ধে মাদির আলস্যের রসে ভরা এতগুলি মান্দুকের মিলিত কুঞ্জে মস্ত সন্ধ্যা হঠাৎ ভেঙে খানখান হয়ে যেত! এই স্বার্থপর, অন্তঃস্বার্থন্য নরশাদক সংসারের চেহারা দেখে আদিত্যের মা মাথার চুল ছিঁড়ে অভিসম্পাত দিতো, সেই চোন্দ বছর বয়েসে এইখানে ঢুকেছি। সংসারের সমস্ত রায় নেওয়া কি সহজ কথা। সব ভাল সামলে গোঁছ আমি মৃদু মেয়েমানুষ। কেউ কুটোটি ভেঙে এক করে নি।

এই নাও। শব্দ হল। বলে আদিত্যের বাবা হঠাৎ অস্থির হয়ে পড়তেন। তিন বছর এইবার সকলের সামনে, ছেলে, বৌ, আশ্রিত আত্মীয়দের সামনে তাঁর খোঁয়াড়ি শব্দ হবে।

আদিত্যের মায়ের চোখদুটি ধবক্ ধবক্ করে উঠতো। অস্তিত্ব একটা সাদা, তীক্ষ্ণ আলো চোখদুটি থেকে ঠিকরে বাইরে পড়ত। খনখনে গলায় সকলের চোন্দপুরুষ উদ্ধার করতে আদিত্যের মা চেঁচাত, নৈমোক-হারাম। নৈমোকহারাম সব। আমার কাজ থেকে যে যতোটা পারবে দূরে নেবে। খয়ের বেহন্দ কাজ করিয়ে নেবে। আর তার বললে আমি একটু কথা

বলেছি বলে গায়ে ফোঁসকা পড়লো? কি করছে তুমি? শূন্য তো শূন্য-বসে কাটালে!

শূন্য-বসে কাটাই বলেই ত' সর্বদা হাতজোড় করে থাকি। যেন পান থেকে চূর্ণ না খসে। আদিত্যের বাবা অজকাল আর চূর্ণ করতেন না। সর্বদা তার জ্বলতো। আদিত্যের মায়ের জন্যে কোন সহানুভূতি তার এই সময় ছিল না বোধহয়। আদিত্যের বাবা বলতো, তোমাকে দেবী করে রেখেছি। তুমি যা বল তাই হয়। তোমার কথার ওপর কোন কথা কোনদিন বলি না। অঙ্গভঙ্গী করে আদিত্যের মা সামনে এসে বলতো, কেন বলো না গো, দয়ায়? আমাকে অনুগ্রহ করে?

আদিত্যের বাবা এরকম প্রশ্নের সামনে ধাঁড়িয়ে যেতেন। ঠিক কি কথাটি বলবেন খুঁজে পেতেন না। তো তো করতেন। মৃদু কান্টা দিয়ে আদিত্যের মা বলতো, দয়া নয়। অনুগ্রহ নয়। ওসব করার পাত্তর তোমরা নও। ওটা তোমাদের কায়দা। নিজেরা দায়িত্ব না নিয়ে আমার কাঁধে চাপিয়ে দেবার কায়দা। দেবী দেবী করবে না? এই যে আমার গায়ে জ্বর, রোজই একটু একটু করে হচ্ছে, খোঁজ নিয়েছ?

আদিত্যের বাবা আরো হতভম্ব হয়ে যেতেন। বলতেন, তুমি যদি না বল তা হলে আমি কি করে জানবো বল?

আদিত্যের মা কাঁপিয়ে পড়ে বলতো, অথচ আমি সকলের খোঁজ নিই এতো কাজ করবার পরও। তোমার গিটে কাল যে বাধা উঠেছিল এটা কি আমাকে কেউ বলে দিয়েছিল?

প্রতিমা তাড়াতাড়ি আলিমারি থেকে ধার্মেমিটার এনে আদিত্যের মায়ের কাছে গেল। আদিত্যের মা শূন্যে হাড়ে প্রতিমাকে এক ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে মৃদু অসীম ফেন্সা নিয়ে বলতো, থাক মা, থাক। ওসব তোমার স্বামী আর মায়ের জন্যে কোরো বাছ। আমি গরীব, দীনশ্রী মানুষ। আমার অতো সেবা সহিবে না।

এই দৃশ্যে আদিত্যের নিজের কোন গাট থাকতো না।

সে সকলের অলঙ্কার তার মাঝে আস্তে আস্তে বলতো, তুমি চূর্ণচাপা শূন্যে থাকতে পারো না? শূন্যে থাকবে। অত কাজ কর কেন? তুমি লোককে জানাছো জ্বর গায়ে থাকলেও আমি কাজ করতে পারি। লোকে এ সুযোগ ছেড়ে দেবে কেন? আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি জ্বরগায়ে তোমার কাজ করা দেখতে। আমরা বিচলিত হবো কেন?

আদিত্যের মা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। কোন কথা না বলে গম্ভীর, ককর্ষ মানুসী অনামনস্ক

হবার জন্যে যা হোক একটু বই মৃদু সমানে তুলে ধরে পড়বার চেষ্টা করতো। কিন্তু সব সম্যাই এরকমভাবে কেটে যেতো না। তারি আশ্চর্য ঘটনা ঘটতো। খবরেকাগজ পড়া হয়ে গেলে চশমাটি চোখ থেকে ন্যাবিয়ে মনোরমা শান্ত হয়ে আপনমনে পুরোন দিনের কথা বলতো। পাশে এসে বসতো প্রতিমা। নিজের অজান্তেই মনোরমার পাতলা নরম পা শানি টেনে নিতো কোলে। গরম তেল-মাশিশ করে দিতো। আর অবাক হয়ে তাকে আবিষ্কার করতে হ'ত এমন যে মৃদুরা মানুষ তারও একটা পুরনোদিন ছিলো আর সৌন্দর্য-গলোও ছিলো রসে ভরা।

মনোরমা মূর্চক মূর্চক হেসে বলতো, তোমার শব্দুর কিরকম লোক ছিলেন জানো? তোমার ত' মা ধারণা আমি মাগীই বদ, খালি চেঁচাই। আর তোমার শব্দুর খুব ভালো মানুষ। ভালো মানুষ উনি কোনদিনই ছিলেন না। গিরিডি থেকে রূপনগরে গণ-কারের গল্প জান ত'। সে সব ওনারই মতলব। এমন কি বিয়ে ভাঙাবার সব মতলবগুলো ওনারই দেওয়া। এমনি বোকা-হাবা মানুষ কিন্তু এসব কুচক-টালে বুদ্ধি খুব সাংঘাতিক।

প্রতিমা উৎসাহিত হয়ে আদিত্যের মার কাছে আরও ঘেঁসে আসতো। চোখমুখ বড়ো করে বলতো, বলুন মা। বাবার কথা শুনতে ভারি ইচ্ছে করে। মনোরমা মৃদু মৃদুকে হেসে বলতো, কি আর বলবো ওনার কথা। দুর্ভাগ্যবান উনি একখানি। আমি কি ছাই গান জানি? আমি জানতাম ছড়া। ইনিরে-বিনিরে এসবই একঘেয়ে সুরে গাইতাম। পাশের ঘরে বন্দুদের উনি বসিয়ে রেখেছেন। তারপর আমার খুব খোসামোদ। তোমার যা' গলা নীহারবালা হার-মেনে যায়। যেতো বলি বাজে বোকো না ততো বাজে বকে। প্রশংসায় একেবারে সঙ্গ তোলে। শেষে আমারও যেন ধারণা হ'ল খুব একটা খারাপ গাই না। ওয়া! মা, আপনার শেষে এই ধারণা হ'ল, হেসে প্রতিমা কুটিপাটি। বোকোর বেহাঙ্গ ছিলাম যে। মনোরমা তেমনি মৃদু মৃদুকে বলতেন, শেষে গেয়ে ফেললাম আমাদের এখানকার যেটাপুজোর সময়কার ছড়া। আর উনি মৃদু কাপড় চাপা দিয়ে হো হো করে কি হাসি। পাশের ঘরে ওনার বন্দুও সমানে। আমার চোখে জল। উনি এমন। সাথে কি বলি মানুষটা ভালো মানুষ দেখতে হলে হবে কি, ভেতরে ভেতরে ভীষণ। আদিত্যই কি কম জ্বালায়েছে? প্রতিমা একবারে লাফিয়ে উঠতো। কি ও করতো মা। বলুন বলুন। খুব ইয়ে ছিলো না?

হ্যাঁ, মনোরমা বলতো, ভীষণ পেটুক ছিল। ওর জ্বালায় একবারে অতিষ্ঠ। গিরিডি স্টেশনে বাজারের সামনে তো আমাদের বাড়ি। বাদাম-ভাজাওয়ালা বাদামের বাস্কাটা রেষে পাশের কোন দোকানে কি একটা দরকারে গেছে, আদিত্য তো ছাব থেকে ঠিক দেখতে পেয়েছে। তারপর দেখেছে কাছেপিঠে আমরা আছি কি না। যেই দেখেছে নেই অমনি ছুটে ছুটে এসে এক খাম্চা বাদাম-ভাজা নিয়ে দে ছুট। বাদামভাজা-ওয়ালা ঠিক দেখতে পেয়েছে। তারপর আর কি। বানামের পরসা আমাকে দিলে দিতে হ'ত। এমনি একদিন নয়, নিত্য নিত্য। ভাড়াটেদের পরোটা আর গুড় চাপা দিয়ে তেল গিষী নিচে রান্না করছে। ওদের মেয়েটা বলছে মা খেতে দাও না। তেলগিষী বলছে, যাও না বাছা ওপরে। নিজে নিয়ে খাও। ডেকাচি চাপা দেওয়া আছে। মেয়েটা ওপরে এসে ডেকাচি খুলে দেখে খাবার নেই। চোঁচয়ে বলে উঠলো, মা, তুমি যে বললে আছে, কই, নেই ত'। তেল-গিষী কাঁকিয়ে উঠে বললে, চোখের মাথা খেয়েছিস পোড়ারমুখী। আমি এই যে রেষে এলাম। আঁতপাতি করে খুঁজেও মেয়ে খাবার পেলে না। তেল-গিষী ওপরে এসে খালি পাত্তরটা দেখে গালে হাত দিয়ে বলল, ওমা! তাই তো গো। ও তাহলে নিশ্চয় আদিত্যর কাজ।

খুঁজে খুঁজে আদিত্যকে পাওয়া গেল। অন্ধকার ছাদে, ভয়ভর নেই। দাঁবি একা একা রয়ে-বসে এতোগুলো পরোটা গুড় দিয়ে মেখে কচিকচি দাঁতে তরিত করছে থাকে।

এ গল্প শুনেন প্রতিমা হেসে একেবারে কুটিপাটি।

এতেই তুমি হাসছ, মনোরমা হাসতে হাসতে বলতো, উনিই বা কি কম যান! শব্দুরবাড়িতে তো গাট হয়ে বসলেন। শরীর খারাপ। ধরাকটে রাখা হয়েছে। ভাত-রুটি বন্ধ। কিন্তু উনি এক অশুভ কাণ্ড করলেন। প্রতিমা চরম উত্তেজনার শব্দভিড়ি হাত দু'খানা চেপে ধরে বলতো, কি করলেন মা, বাবা, চূর্ণ করে যাবেন না। মনোরমা হেসে, আলোয় মৃদু ভরিয়ে বলতো, মাঝরাত্তরে শূন্যি খুঁটখাট, খুঁটখাট শব্দ। আমার ভাই পাশের ঘরে। মৃদু খুব সজাগ। বললে, কিসের শব্দ রে মনো? চোর নয়তো। যেই না বলা, অমনি দড়াম করে বাসন পড়ে যাওয়ার শব্দ, আর দু' মিনিট না যেতেই টেঁচের আলোর-সামনে এঁটো হাতে আমার অদেহ-তোমার বাপ! গল্প শেষ হতে

না হতেই প্রতিমা একেবারে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে ফেলতো। কতো রক্তভাঙাই না জানতেন! মনোরমা মৃৎস্থানাকে তেমনি রহস্যময় করে বলতো, নিজেই একদিন গণ্ডকার সঙ্গে এসেছে। হিন্দীর দেশের মানুষ ত'। হিন্দীটা শুব জানেন। মাথায় পাগড়ি-টাগড়ি পরে, এই এতোবড়ো একটা রক্তচন্দনের ফোঁটা, মৃৎস্থে শুটো, প্রকাশ্যে গোফ, চেনাই যায় না। তা ছাড়া পরপুরুষের মৃৎস্থের দিকে কে আর ভালো করে তাকাচ্ছে বলো। আমার হাত দেখতে চাইলেন। দেখালাম। হাতের পাতা দেখার ঘটা কি। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। হাতটা ধরে একটু টান দিলেন। ভয়ে, আতঙ্কে, লজ্জায় আমি আড়ম্বল হয়ে গেছি। গলা দিয়ে 'রা' বেরচ্ছে না। তারপর আমার চোখ-মৃৎস্থের অবস্থা দেখে উনি নিজের গোফটা যখন টেনে খুলে ফেললেন তখন আমিও ওনার পাগড়ি টান মেরে খুলে ফেলে দিলাম। তারপর সাতদিন ওনার সঙ্গে কথা বলি নি।

এইসব সময় মনোরমাকে ভারি অপর্বে লাগতো প্রতিমার। কি সুন্দর মানুষটি। ছোট, এতোটুকু মানুষ মৃৎস্থের ডৌলটা কি সুন্দর। পাতলা ঠোঁট দু'খানি। গায়ের রঙ পুড়ে গেছে বটে তবু শীতকালে কখনো ফাটে না। এতো জল ঘাটেন তবু হাল্কা করে না পায়। খবরেকাগজ হাতে নিয়ে বসলে তো মনে হবে যেন অনেক লেখাপড়া জানেন।

মা যেন ঠিক তার মায়ের মত। পায়ের পাতা দুটি কি সুন্দর! যেন ঠিক দু'খানি পক্ষপাত। দু'পাশের কান ঢেকে টান টান করে ধোঁপা বাঁধার ধরণটি নিখুঁত। পান খেলে ঠোঁট দু'খানি লাল টুকটুকু হয়ে যায়। কপালে টিপ দিলে, শান্ত হয়ে থাকলে এখনো অপর্বে সুন্দরী দেখায়।

কিন্তু এই চেহারাই সকালে কি রূপ ধারণ করবে তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তখন এক অশুভ, রক্তাক্ত লোক। কোন রসকস নেই। কোন রং-তামাসা নেই। কখনো হাসে না। কখনো গল্প করে না। চলতে-ফিরতে খালি কাজ আর কাজ করে। এক নয়াপয়সার এদিক-ওদিক হলে শব্দশুরই হোক আর বাড়ির দু'জন আগ্রহিত মানুষই হোক তাদের বাপান্ত করে ছাড়ে। বাড়ি-বাড়িটা হয় শব্দশুর কোন গণ্ডগোল পাকালে। করলে ত' সারাদিনের মধ্যে একটা কাজ। কি—না পাঁচফোড়ন এনেছো। তাতেও গোবরের গন্ধ ধরালে? এক নয়াপয়সা কি পয়সা নয়? তা কি উপায় করতে হয় না? কোনদিকে ত' তাকাতে হয় না। আছো

ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। কোনদিন বসেছো হিসেব নিয়ে? ঝাঁটা মারো। এসব শোনার পর শব্দশুর মুখটা যথাসম্ভব করুণ করে বলবেন, অতি ছোটলোক। সামান্য একটা নয়াপয়সা নিয়ে গণ্ডগোল; এমন চেঁচাচ্ছে যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। বস্তি-টস্টি এর থেকে ভালো। ছেলে-বোঁ সকলের সামনে আমাকে একেবারে গোবরে বসিয়ে দিলে। কোনদিকে আর দু'কপাত না করে সোজা বেরিয়ে যাবেন তারপর। আর সমস্ত ব্যাপাবটাই তখন প্রতিমার কদর্য লাগবে। এ কোন সংসারে সে এসে পড়ল যেখানে আস্তে আস্তে কোন কথা বল যায় না? এমন সাংঘাতিক অভাবগস্ত ত' এরা নয়। তবে সামান্য একটা নয়াপয়সা নিয়ে এমন মারমুখী কাণ্ড মা বাধায় কেন? মায়ের সামনে কথা বলতে গেলে কেন এতো ভয় পেতে হবে? শব্দশুরকে যা' নয় তাই বলে গাল-মন্দ করছেন—এই বা কি রকম?

অথচ একদিন শান্তিনাথ এসেছেন

কোথা থেকে পা কেটে। প্রতিমা চুপি-চুপি গিয়ে দেখে পায়ের ফোঁট জড়াত জড়াতে তাব শব্দশুরি কাঁদছে অঝোবে। বলছে, এখন আমরা দুটো বড়োবড়ি এসে ঠেকেছি। কে কখন কার আগে চলে যাই তাব ঠিক নেই। একটু সাবধানে রাস্তায় হাঁটচলা কব, আমরা মাথা খেয়ে। তুমি চলে গেলে আমরা কে দেখবে আর, বঝো না?

নিজের বাড়িতে প্রতিমাকে বসানো কোন কাজ করতে হয় নি। শব্দশুরবাড়িতে এসে ও ভড়কে গেল। প্রতিটি বাজাই ভুল কবতো। আব ভুল করলে আদিত্যব মাথের কাছে কোন ফমা ছিল না। ভুল? এবকম ভুল হবে কেন? একি ভাবে ফেন গালিয়ে ফেলতে বলছি বোঁমা আব অমনি পাখানা পুড়িয়ে বসলে। সব সাজানো পুতুল কাচের আলমারিব। একি! এবকম সময় শূন্যে আছো কেন? শূন্যে থাকতে হবে? কই আমায় ত' কাজে-কম্মে আলিস্যি আস না এতোটা বয়সেও? এই ত' দু'পুবে বেশ টানা দু'



তুমি চলে গেলে আমরা কে দেখবে আর, বঝো না?

ঘণ্টা ঘুমুলে। আমি ত ঘুমাই না কোনদিন। ঐ সময়টা গুরুত্ব নাইয়েছি। খেতে দিয়েছি। রোদে চাঁদ ফেটে যাচ্ছে। বসে বসে গুলু দিয়েছি। বন্ধুতে পেরেছি সব। আসলে শব্দর-শাশুড়ীর ঘর করতে ভালো লাগে না। কথা অবশ্য তুমি বল না। মুখে মুখে তুলো কর না। ওটা দুর্লভ গুণ। কিন্তু মা ঐ পবিত্র। কিন্তু কথা না বলেও, মুখের ওপর চোপা না করেও গম্ভীর থেকে বুদ্ধি দিয়ে দাও তুমি রেগেছো। আমিও ঘাসে মূখ দিয়ে চাঁদ না। সব বুদ্ধি। সব সময় আমার ছেলের কান ভাবী করছে। আলাদা হয়ে থাকতে চাও তাতে ত বাধা নেই। আমি বাধা দোব এমন মা আমি নই। না গোষায় চলে যাও। ঐ দুধের নাটনীটা—ওটার জন্যেই মনটা একটু টনটন করবে। বয়েসকালে স্বামী মতো করলো, ছেলেও বেশি বয়সে ততো করল। আর তুমি আর আমার কি কববে? কেউ পথ আটকে নেই। যেদিকে চোখ যায় আমার ছেলেকে টাঁকে পুঁবে চলে যাও। বড়লোকের মনে, লেখাপড়া জানা, তোমাদের রীতিকরণই আলাদা। বলতে বলতে আদিত্যের মা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠত। আর আতঙ্ক হত প্রতিমার। প্রতিমা সত্যি কোন জবাব দিত না।

আতঙ্কের পরিধি দিনে দিনে বিস্তৃত হত। শিউরে শিউরে উঠতো প্রতিমা। কোন একটা সাংসারিক কাজে পান থেকে চুন খসা ভুল হলেই আদিত্যের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতো। মাঝে মাঝে কান্দতে কান্দতে প্রতিমা বলত, 'এ বড় অশুভ জায়গা। এখান থেকে শীগগির আমাকে কোথাও নিয়ে যাও। কোনদিন তোমার কাছে কিছুর চাইব না। দয়া করে এই ভয়ঙ্কর জায়গা থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আমি ভয়ে আশ-মব হলে থাকতে থাকতে মরে যাবো। মাগো আমি আর পারছি না।

আদিত্যের অবস্থা এই সবসময় হত সাংঘাতিক। সে কাকে সামলাবে? আদিত্য প্রতিমাকে কি করে বোঝাবে যে মাকে তার মতো ভয়ঙ্করই লাগুক আসলে তার মা ততো সত্যি সত্যি ভয়ঙ্কর নয়। অন্তত তার মা স্বার্থপর নয়। স্বার্থপরই যদি হত তাহলে নিজের অনেক অসুবিধে করেও প্রতিমাকে ঊষা সেলাই-এব কারখানায় কাজ শিখতে বাইরে বেরতে দিত না। নিজের দিকেই যদি তাকাবে তাহলে চেহারার ঐ হাসি হয় না। আব মাকেই বা কি করে আদিত্য বোঝাবে যে একটু প্রতিমাকে ক্ষমা করলেই বা দোষ কি? সামান্য ভুলের ব্যাপাকে অসাধারণ অসামান্য বলে কেন মনে করতে হবে? ভুল হয়েছে। ভুলটা ত মাঝাক্ষর অপরাধ নয়। ভুলে যাও। ক্ষমা করো। মনে শান্তি আনো। শান্তি

দাও সংসারকে। আমাকে। মাগো, আমিও আর পারি না।

বুদ্ধি আদিত্য দু' জনের সম্মুখেই তুলে ধরতো আন্তরিকতার সঙ্গে। তার ফলে প্রতিমা বলতো, মাকে বাঁচিয়ে কথা বলতে এসো না। তোমার মত অপদার্থ লোক ভাবাই যায় না। প্রত্যেকে এই অবস্থায় তার স্বীকে সমর্থন করে তা সে ঠিকই করুক আর ভুলই করুক। মাকে বললে আদিত্যের মা বলতো, তুই কেন ওর হয়ে কথা বলতে আসিস? এই জন্যেই ত আমি আরো বেগে যাই। তোর বোঁকে কি কেটে দ' আখানা করে ফেলবো?

বন্ধুতে না পারার মত নিবেট মূখ কোনদিনই আদিত্য ছিল না। প্রতিমার স্বভাবের মধ্যে কোথাও একটা সাংঘাতিক স্বার্থপরতা ছিল বলে আদিত্যের মায়ের ধারণা হয়েছিল। প্রতিমা চোখের নামনে দেখেছে ওর শব্দাড়ি খেটে খেটে হৃদয় হচ্ছে তবু ওর দু'পরের ঘুমের মায়াদ কমছে না। ও চোখের ওপর দেখেছে মা এতোদিন কোনক্রমে কাজ কবে এসেছে, সম্মুখেবেলাটা বসে বসে হাঁফায়, কিন্তু নির্বাসনে এসব দেখেছেনও প্রতিমা বলে, দু'পরেরবেলাটা বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না মা। আমি উষা টেলারিং-এ সেলাই শিখতে যাবো।

আদিত্য ভালমতেই জানত প্রতিমা স্বার্থপর ছিল না। প্রতিমার প্রতি আকর্ষণ থেকে আদিত্য একথা ভাবতো না। বরং উন্মোচন, বরং নিরাসক্তি থেকেই, এসব ভাবতো। শব্দাড়ির প্রতি প্রতিমার পূর্বের দেবী-দেবী ধারণা একটু টেল থেকেও মায়ের প্রতি মাঝে মাঝে প্রতিমা সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও গভীর প্রশ্রয় প্রকাশ করে ফেলতো। আদিত্যের মা যখন সকালে কোন কিছুর সামান্য কারণে গলার শির চিরে চেঁচাতো তখন প্রতিমা কতদিন আদিত্যকে বলেছে, গায়ের ভারি কষ্ট। অতোটুকু একটা মানুষ। ধুবছেন। এরকম চেঁচাতে চেঁচাতে কোনদিন হার্ট-ফেল করবেন। বাবা না হয় এরকম মানুষ। তুমিও তো মানুষের মত মানুষ হতে পারতে।

আদিত্য গভীর বিস্ময় নিয়ে এইসব সময়ে প্রতিমাকে লক্ষ্য করতো। যে প্রতিমা এখান থেকে মায়ের অত্যাচারের হাত থেকে পালাতে চাইছে, কালাপালা হয়ে এখান থেকে চলে যাবার প্রস্তাব তার কাছে বারবার করছে, সেই প্রতিমাই আবার তার মায়ের কষ্টের কথা ভাবছে। ভূতের মুখে রামনামের মত লাগলেও প্রতিমা যা প্রতিমা তাই। আসলে প্রতিমা কখনো লোক খারাপ ছিল না। ও মানুষটা ছিল বাইরে খুব শান্ত আর ভেতরে ভেতরে উগ্র স্বাধীনতাকামী। একটু যদি

মায়ের কাছে ও সন্মিষ্ট ব্যবহার পেতো, এই একটু মিষ্টি কথা, এই একটু হেসে হেসে বোঁমা আমার খুব কাজের এ ধরনের কথা মা যদি তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে বলে বেড়াতো, তাহলে মায়ের প্রতি প্রতিমার ভালবাসা গভীর এক দায়িত্ববোধে পরিণত হতে পারতো।

সংসারের সকলের জন্যে সব করেও প্রতিমার জন্যেও অনেক কাজ করার সময় আদিত্যের মা করে নিত। প্রতিমার পরিগ্রহ লাভব না করে, প্রতিমাকে অনেক খাটিয়ে নিয়েও শব্দুমাত্র মিষ্টি মিষ্টি কথা উপহার দিয়ে আদিত্যের মা সংসারে শান্তি আনতে পারতো কিন্তু ভাগ্য, আদিত্যের ভাগ্য, সে সব কিছুরই হোসে না।

প্রতিমা সংসারে প্রবেশ করেই দেখলো আদিত্যের মা এক আগজ্ঞানন্ত মনোভাব। শব্দু নিজে দাউ দাউ করে পুড়তে আর অন্যকে পোড়াতে জানে। এই প্রথম ধাক্কাতেই ওর মনমেজাজ বিগড়ে গেল। স্বামীর কাছে প্রতিবাদ খাটে। নিজের অস্তিত্বের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। যা ইচ্ছে তাই বলা যায়। আত্মসমর্পণের কোন প্রয়োজন ঘটে না। কিন্তু এই দম্ভাল শব্দাড়ির কাছে নিজের কোন ইচ্ছে খাটানো অসম্ভব। শব্দাড়ি সব পথ খোলা রাখেন অতি সত্যকথা কিন্তু সেও তার ইচ্ছে পথ। তিনি ইচ্ছে করেছেন বলেই। নইলে নয়। সিনেমায় যাও দু' জনে। কোন আপত্তি নেই। স্বামী ছাড়া স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে মেশো শব্দাড়ি উৎসাহ দেবেন। ওসব কু-জিনিস মনেব তিসীমানায় নেই। ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাও। বাধা নেই। কিন্তু এসবে তার স্বাধীনতা কোথায়? এসবে শব্দাড়ি বাধা দিচ্ছেন না, কেন না এসবে তার অনুমোদন আছে। প্রতিমার মনে হত, প্রতিমা স্বাধীনভাবে যে কাজ করছে বলে মনে হত, সেই সব স্বাধীন কাজগুলি এক অদৃশ্য শেকলে অনেক আগে থেকেই বাঁধা। শব্দাড়ির ইচ্ছে ছাপমারা হয়েই কাজগুলি প্রতিমা হতে পারছে। বন্ধুত্ব, আদিত্য ক্রমে ক্রমে ঠিকই বন্ধুতে পারাছিল প্রতিমার ক্রোধ, মান, প্রেম, প্রশ্রয়, হিংসা এ সবকিছুই আর্বাঁত হয় প্রতিমার অদৃশ্য স্বাধীনতা প্ৰহার স্বাধা।

আদিত্যের বাবার কোনদিনই কারুর ওপর একটুও জোর ছিল না। ছোটকালে, আদিত্য তার বাবাকে ভয় পেতো তার মায়ের জন্যে। তারপর শান্তিনাপেশ ভাষার আদিত্যের পিপুল পাকলে বাবুর কথা একদমই শুনত না আদিত্য। শান্তিনাপেশ হয়তো বলতেন, ইনকাম টান্ড অফিসে একবার যাওয়া দরকার। যাবে ত? আদিত্যের বেশ মনে আছে আদিত্য সটান বলতো, না। আমার অন্য কাজ আছে।

[শেষাংশ ১৮৪ পৃষ্ঠায়]



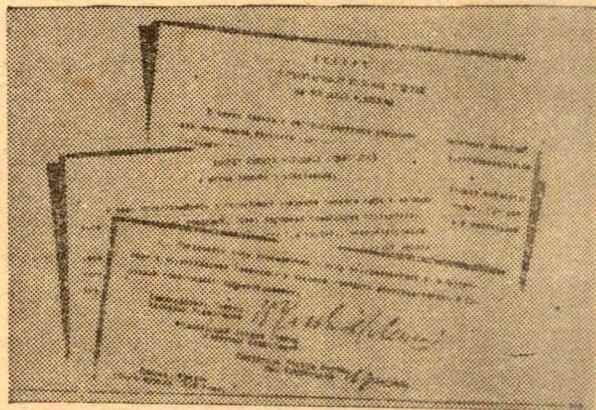
সামাজিক স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও মহান লেনিন আমিয়াকুমার হাট্টি

নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের মুক্তির দিশারী, পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের সর্বজনবরেণ্য কর্ণধার মহান লেনিন। দেশ বিপ্লবের আগে, বিপ্লব চলার সময় ও বিপ্লবের পরে কী অমানুষিক পরিশ্রমই না তাঁকে করতে হয়েছে। প্রায় মৃত একটি জাতিকে নতুন আদর্শের সোনার কাঠি ছুঁয়ে বাঁচিয়ে তুলেছেন তিনি। এই অসাধারণ দেশনায়কের সদাজাগ্রত দৃষ্টি প্রসারিত ছিল সবদিকেই। দেশকে, জাতিকে সুস্থ-সবল-কমঠ করে তুলতে হলে সব আগে দরকার স্বাস্থ্যের। লেনিন এক্ষেত্রেও এনেছিলেন বিপ্লব। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, তিনিই প্রথম সামাজিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবহারিক ভিত্তি স্থাপন করেছেন। সমষ্টিগতভাবে রোগ-ব্যাধি, মহামারী, অকাল মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষ কীভাবে সংগ্রাম করে বাঁচবে তার দিগদর্শন করে গেছেন।

যেমন রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, তেমনই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ও তার কল্যাণভিত্তিক প্রয়োগে তাঁর ছিল বৈজ্ঞানিকের মত দূরদৃষ্টি আর, সব কাজই তিনি শূন্য করেছিলেন যুগপৎ।

কারণ, একাটির সঙ্গে অপরিষ্কার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। যৌথ খামারের প্রবর্তন যেমন দরকার, কৃষক-শ্রমিকের ঐক্য যেমন দরকার, প্রশাসনিক সংস্কার যেমন দরকার, তেমনই দরকার সুষ্ঠু সামাজিক চিকিৎসাবিধি। তাই দেখতে পাওয়া যায়, বিপ্লবোত্তর দিনগুলিতে লেনিন যখন বাহ্যিকবিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন তখনও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কেও গভীর চিন্তা করছেন, তার সম্যক সমাধানের পথ খুঁজছেন, সমাধান করছেনও।

শাকসবজি ও অন্যান্য নিম্নমূল্যের রস সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা করে ১৯০৪ সালে শারীরতত্ত্ববিদ আইভান পেট্রোভিচ পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। শরীরবিদ্যায় তাঁর যুগান্তকারী অবদান হল Conditioned reflex বা শর্তসাপেক্ষ প্রতিফলন। একটা কুকুরের ওপর তিনি এই পরীক্ষা করে দেখান। যখনই একটা কুকুরকে খাবার দেওয়া হচ্ছে, তখনই যদি ঘণ্টা বাজান হয়, তাহলে দেখা যাবে, কোন খাবার না দিলেও শূন্য



বিপ্লবের পর লেনিন-প্রচারিত স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত আদেশপত্র



গৃহসংস্কারের কাজে লেনিন

ঘণ্টার শব্দেই কুকুরটির পাকস্থলীর জরাক রস নিঃসৃত হচ্ছে। লেনিন ছিলেন রাশিয়ার এই জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বিপ্লবের উত্তাল যুগেও পান্ডুলিপি লেনিনের আনন্দকল্যাণ লাভ করেছিলেন।

লেনিন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ১০০ রকমেরও বেশি ফরমান জারি করেন। সব ফরমানের নিচেই তাঁর স্বাক্ষর থাকত। জনগণের কাছে তিনি ছিলেন মন্ডাজাতা মহান বীর। কাজেই তাঁর লিখিত নির্দেশ সবাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। ১৯১৭ সালে রুশ-বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই তাঁর নিজস্ব স্বাক্ষর যুক্ত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফরমান-গুলি সমস্ত প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে, রেলওয়ে স্টেশনে, শহরে ও গাঁয়ের প্রকাশ্য জায়গায় টাঙানো থাকত, যাতে সহজেই জনসাধারণের নজর পড়ে। এই-সব আদেশ-লিপির মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কাজের সময় আট ঘণ্টার বেশি নয়, ১৪ বছর বয়সের নীচে হলে কারকে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা চলবে না। জনসাধারণকে উৎসাহিত করা হ'ত স্বাস্থ্য-বীমা করার জন্যে,

প্রসূতিদের জন্যে নতুন জনগণতান্ত্রিক সরকার যেসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন, তা গ্রহণ করার জন্যে। তাছাড়া ঐ প্র্যাকার্ডগুলোতে লেখা থাকত, মহামারীর বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, জনসাধারণের কী করা দরকার ও কোথায় কীভাবে জনসাধারণ এই ব্যাপারে সহযোগিতা করছে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে লেনিন তাঁর দেশে নিবারকমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সংগঠন করতে চেয়েছিলেন। আধুনিক স্বাস্থ্য-বিধির অভিমত হ'ল, রোগ সারানোর চেয়ে রোগ যাতে না হয়, তারই দিকে প্রথম নজর দেওয়া। লেনিন লিখছেন : “স্বাস্থ্যই সব। সব রোগের বিরুদ্ধে এটিই হ'ল নিবারকমূলক ব্যবস্থা।”

লেনিন কথামত কাজও আরম্ভ করলেন। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে তিনি আদেশ দিলেন, সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে মহামারী বসন্ত রোগের টিকা নিতে হবে। প্রায়ই যে মহামারী মদ্যব্যাদান করে অজ্ঞান বলি গ্রহণ করত, তা দূর হয়ে গেল।

পরের বছর মার্চ মাসেই আবার ডাক দিলেন তিনি মস্কোবাসীদের “নোংরা

আবজর্না দূর কর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ শহর এবং বাসগৃহগুলি, আর দৃষ্টান্ত স্থাপন কর সমস্ত দেশের সামনে—যাতে রোগ আর মহামারী তোমাদের বিপদগ্রস্ত করতে না পারে।” এই সময়ে মহান লেনিন সকলের সঙ্গে মিলে নিজেও আবজর্না সাফাই-এ অংশ গ্রহণ করেছেন।

১৯১৮ সালের জুলাই মাসে লেনিনই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে জন-স্বাস্থ্যমন্ত্রক (Ministry of Public Health বা Commissariat) গঠন করেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন গুরুত্বপূর্ণ দিকটি এর আগে আর কোথাও নজর পড়ে নি। এই স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মধ্য দিয়েই সমগ্র দেশে সামাজিক চিকিৎসা-বিধিসমূহ প্রবর্তন করেন। এর মধ্যে সর্বপ্রগ্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সর্বসাধারণের জন্যে বিনামূল্যে চিকিৎসার সর্ববিধ সুযোগ লাভ। পৃথিবীর আর কোন দেশে এর আগে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নি। এছাড়াও চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন, অনুশীলন ও নানাবিধ গবেষণা-মূলক কার্যক্রমের ওপরেও তিনি যথোপ-যুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।



ঘর একটাই। তবে আজকালকার তুলনায় বেশ বড়। দরকার হলে পার্টিশান দিয়ে ধরা খানা করা যেতে পারে। সলেন্সন বারান্দার এককোণ ঘরে রক্তার জায়গা। অ্যাটচ বাথ-প্রিভি।

এসব ছাড়াও পছন্দ হবার অন্য কারণ ছিল পরমার। ওদের দোতলার এই ঘরের সামনে দিয়েই একটা রাস্তা সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। আর সেই খোলা রাস্তা দিয়ে ছুটে-আসা-বাতাস লুটিয়ে পড়ছে ঘরের মধ্যে। দক্ষিণমুখো ঘরটার চার-চারটে জানলা। হাওয়ার রাজ্য।

সারথি মনে মনে ঘরটার মাপ করছিল। দালাল বন্ধুবাবু বলেছেন, ঘরটা বাইশ-বারো। তাই কি? একেবারে তার বকের কাছে এসে দাঁড়াল পরমা। সমস্ত মুখে একটা প্রশ্ন চিহ্ন। চোখ দুটো তুলে বলল, ভাবছ কি? এটাই নিয়ে নাও। বড় রাস্তা এক মিনিট। ঘরের দোরে বাজার। এমন খোলামেলা। আর এর চেয়ে কম ভাড়ার বাসযোগ্য ঘর পাওয়া যাবে না।

—তোমার পছন্দ তো? সারথি দুটো হাত পরমার দৃষ্টিতে রাখল।

পরমা যেমন নিশ্চেষ্ট মিন্টি হাসি হেসে থাকে, হাসল। বাড়টা ঈষৎ হেলিয়ে বলল, তোমার পছন্দ হয় নি?

—ঘর তোমার, ঘরগী হবে তুমি—তোমার

পছন্দই আমার পছন্দ—সারথি নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করল পরমাকে।

এখন সেই ঘরটা স্বন্দকার। এহমাত্র সুইচ অফ করে দিল সারথি। যে খাটটার ওপর কাত হয়ে শব্দে সারথি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, সুইচ-বোর্ডটা তারই কাছে। ওপাশের জানলার সামনে একটা বেতের চেয়ারে বসেছিল পরমা। বেন অনেক ক্লান্ত, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, উঠতেও ইচ্ছে করছে না, এমন কি ফিরে তাকাতেও—সেই ছড়ানো পা, এলানো গা, হাতটা কলে পড়েছে একপাশে—পরমা মৃদুস্বরে বলল, আলোটা বন্ধ করে দাও।

আম্বেত আম্বেত উঠল সারথি। হাত বাড়িয়ে সুইচটা ওপর দিকে ঠেলে দিল।

ঘরটা অন্ধকার। বাইরের রাস্তায় সারথি নিয়ন আলো। বৃষ্টি পড়ছে। বেশ জোরে। রাস্তায় জল। লোকজন নেই।

প্রায় বছরখানেক হল এ-পাড়ার বাসিন্দা ওরা। সারথি আর পরমা। স্বামী আর স্ত্রী। অথচ এমন দিন যাব নি, যেদিন সন্ধ্যাবাত্তে তারা বাড়ি থেকেছে আর অমল কি বিনয়, দীপঙ্কর কি সুপ্রকাশ সারা সন্ধ্যা এখানে গল্পগুজব কাটায় নি।

কলেজ থেকে ফেরার কোনো দুর্নির্দিষ্ট সময় ছিল না সারথির। যাবারও নয়। তাহাতা টিউশন থাকত প্রায়ই।

ভালহোসী থেকে বাড়ি ফিরে এ হাতা বেজে যেত পরমার। যেদিন সারথি বাড়ি থাকত, সারথিই তা বানাত। এই নিয়মে দীপঙ্কর ঠাট্টা করত, আপনার মতন ভগবতী মহিলা এ যুগে আর কেউ জন্মায় নি—

পরমা বলত, তা ঠিক, দশটা-পাঁচটা আপিসের চেন্নেও বাস-জার্নির লক-বন্দোবস্ত সহ্য করার সৌভাগ্য যখন অর্জন করেছি, তখন নিশ্চয়ই জাগ্যবতী—বলতে বসতে তোয়ালে হাতে নিয়ে বাবরুমে ঢল বেতে পরমা।

চা খেতে খেতে আলোচনা উঠত। বি বিষয় নয়? বলা যেতে পারে সবচেয়ে বড় বিষয় প্রকাশিত হয়—সব কিছুর।

কেবল রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠলে তেমন বিমর্ষ হয়ে যেত পরমা। আদ্যোদেহ উত্তর কয়েক ভাগি বাড়লেই সে বলত, তবু এক-রাউন্ড চা হোক, কি বলেন সুপ্রকাশবাবু, আলোচনাটা জমবে ভালো, বসে আড্ডা দিকে চোখ ফিরিয়ে বলত, অমলবাবু, তেমনো-ভাজা আনাবো না কি?

সুপ্রকাশ হাসত। চা হচ্ছে স-সময়ের পানীয় আর আপনার হাতেব চা, তাই মিস, সারথির দিকে ফিরে বলত

সারাথির হাতের চা-সাতা এমটা বিশেষ
স্বাদ আছে।

—কেন, এ-বাড়িতে কি চা আপনার
বন্দুই রোজ রোজ করেন নাকি?—বলে যেমন
মিস্টি হাসি হাসে পরমা, নিঃশব্দে হাসল
সারাথির দিকে তাকিয়ে।

সারাথি হাসিমুখে হাসি ফুটিয়ে দিল।
বলল, সুপ্রকাশবাবু, আমাদের দু'জনের
চির চায়ে কোনো তফাৎ নেই?

সুপ্রকাশ বলল, আমায় বোকা ভেবেছেন
সারাথিবাবু। আমার রায় বার বিপক্ষে যাবে,
তিনি কি আর আমার খাতিব করবেন?

সুপ্রকাশের বলার ভঙ্গিটা বড় সুন্দর।
সবাই হেসে উঠল। বিনয়, যে কাছাকাছি
একটা স্কুলের টীচার এবং কথা বলে কম, ১৯
এবার বলল, মিসেস চক্রবর্তী, অমলবাবু কি
বেন একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন একটু আগে—
অমলবাবু ভুলে গেলেন নাকি?

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল পরমা। কাপড়টা
একটু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, ঠিক করে
নিরে টেবিলের ড্রয়ার খুলল। তারপর ভেতরের
বারান্দার গিঁড়ে ওদের রান্না করে দিয়ে যায়
যে স্ট্রী লোকটি, তাকে তেলভাজা ফিল্মে
দোকানে পাঠিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিল।

সুপ্রকাশ কি বিনয়, দীপঙ্কর তি
অমল—সবাই ব্যাচুলায়। সবাই যে রোজ
আসত, তা-ও নয়, কিন্তু ছুটির দিনে কেউ
যাও যেত না। সুপ্রকাশ একদিন বলল,
মিসেস চক্রবর্তী, আমি সুপ্রকাশ ভট্টাচার্য,
বর্তমানে ভবানীপুরের এক মেসের বাসিন্দা,
আপনাদের একদিন চোরগাঁর কোন এক অস্বা-
বিত ধবংসের রেস্টোরাঁর সামান্য কিছফ্রশের
জন্য নিয়ে যেতে চাই—অনুগ্রহপূর্বক যাবেন
তো?

না যাবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।
আপিস ফেরতায় বিয়ের আগে অনেকদিন
সারাথির সঙ্গে অনেক মাঝারি ধরনের
রেস্টোরাঁর অনেক সম্মা কাটিয়েছে পরমা।
বলল, আগে বলুন, কি খাওয়াবেন, তারপর
খাওয়ার কথা ঠিক হবে।

সারাথি এ কথা শুনে একবার তাকাল
পরমার মুখে। সেই নিঃশব্দ মিষ্টি হাসির
সংকত পরমাব ঠোঁটের প্রান্তে তখনও আটকে
গিয়েছে।

—সেটা, খাওয়ার টেবিলেই সেন্দ্র কাড'
দেখে আপনিই ঠিক করে দেবেন—সুপ্রকাশ
হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল।

সে রেস্টোরাঁর কখনও আসে নি পরমা।
খাওয়ার পর বিয়ার নিল ওরা, সারাথিও। বেশ
অবাক হল পরমা।

—মিসেস চক্রবর্তী, এটা হল পিকনিক
মুন্ডের মতন। আমরা দু'একবার এরকম
দু'এক চমুক এর আশে পান করছি—

বোশ নয়—দীপঙ্কর গেলাস্টা, টেবিলে রাখতে
রাখতে বলল।

না, বাড়ি এসে কোনো অভিযোগ করে নি
পরমা। কেবল রাতে বিছানায় শোবার সময়
বলল, তোমাব মুখে গন্ধ নেই তো?

সারাথি হাসল। বলল, আমি তো বুদ্ধিতে
পারাছি না, আছে কি নেই—সেটা বুদ্ধিতে
ভুলি।

একজন শূন্য করলে তপরজনকেও বোশ
হয় নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা চলে না। পরের
মাসে দীপঙ্কর ওদের নিয়ে একটা পার্টি
দিল। জ্বাব সেদিনও মদেব গেলাসে চমুক
দিতে কাপ'থ্য করে নি ওরা। দীপঙ্কর রেস্টোরাঁ
থেকে বেরিয়ে বলল, মিসেস চক্রবর্তী, আপ-
নার কিন্তু এসব সংস্কার থাকা ঠিক নয়।

—কোন সব—পবমা ঠিক বুদ্ধিতে পারল
না।

—আপনি কি মনে করেন, দু'চাপ চমুক
মদ খেলেই মানুষ নষ্ট হয়ে যায়।

—মোটাই মনে কবি না, পরমার চোখের
কোণে নিঃশব্দ হাসিটা আভাসিত হয়ে উঠল,
মনে করলে, প্রতিবাদ করতাম।

—কিন্তু, নিজে তো কোনোদিনই নিলেন
না—

—সবাই কি সব জিনিস খায় আপনিও
একদিন বলেছিলেন, আপনি চ্যাড়স, কুন্ডো
আর কি কি যেন খান না—

শীতাতপ পথের নিচ্ছিন্নতা কয়েকটি হাসির
টুকরোর ক্ষণকাল—মুখের হয়ে উঠল।

—সত্যি—আপনি বড় সুন্দর বলেছেন,
দীপঙ্কর বলল, আপনার অ্যানালায়াজ কি
করে অস্বীকার করি বলুন—

সারাথি, যে সেদিন দু'দুটো টিউশনি কানাই
করেছিল, বাড়ি ফিরে পরের দিনের রুটিনটা
আলাতে বলল। পরমা শাড়ি বদলে সারাথির
খুব কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, তোমার আর
দু'জন কথু যদি এরকম বদোবস্ত করেন,
তোমার যেতে দেব না, আমি তো যাবই না।

—মনে হচ্ছে চটেছে—সারাথি মুদ্র হাসল।

—ভুলি তো কেবল আমার রাগটাই দেখ—

সহাস্যে সারাথি বলল, সব স্বামীরাই ফল
থাকেন, রাগলে তাঁদের স্ত্রীকে নাকি বড়
সুন্দর দেখায়—

—সে সব মধ্যমুগে দেখাত—একুগে রাগ
বেশ দেখতে গেলেই ডিভোর্স—ওসব যাচ্ছে
কথা থাক—সুপ্রকাশ কিন্তু আজকাল বড়
আলগা আলগা কথা বলছে।

বেশ অবাক হল সারাথি। পরমা কি
ক্যান্সার ভুটিচ্ছ হয়ে পড়ল নাকি? এমন
কিছু কি অশালীন মন্তব্য সুপ্রকাশ করেছে?
সারাথি একটু ভাবল।

পরমার ঠোঁট দুটো বেশ পাতলা। পরমা
আজ খুব হাল্কা করে তাতে রঙ মাখিয়ে-
ছিল। অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশভূষার আজ

সুপ্রকাশ বলল, মিসেস চক্রবর্তী, আজকে কিন্তু
সারাথির চেয়ে আপনাকে অনেক, অনেক ছোট
লাগছে।

দীপঙ্কর বলল, ইগজ্যাক্টলি, সারাথিটা
পাড়িয়ে পড়িয়ে এর মধ্যেই বড়োটে হয়ে
গেছে।

তখন, মনে পড়ল সারাথির, তখনই একটা
খুব হাল্কা ধরণের কথা বলেছিল সুপ্রকাশ,
মেয়েদের বয়স কমানোর অস্ত্র অনেক, হাত
কাটো, পেট কাটো, গলা কাটো আর—
একটা বিশিষ্ট অঙ্গ-ভাঙ্গ করে দেহের উদ্ভ-
দিকে চোঁতয়ে তুলে ধরে সে বলাইছিল, বাজি
মাং। আঠাশ কি আঠারো বোম্ববার জো নেই।

—দেখো, সারাথি পরমার চোখের দিকে
তাকাল। সুপ্রকাশের বলার ভঙ্গিটা হয়তো
ঠিকমত হয় নি, কিন্তু ভুল বলেছে কি কিছু?

পরমার শান্ত চোখে সেই মিষ্টি হাসিটা
দেখা দিল। বলল, তোমার বন্দুদের বলে
দিও, ওটা অনাধিকার চর্চা।

অবশ্য রেস্টোরাঁর আর যেতে হয় নি।
টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরে সারাথি একদিন
দেখল বিনয় তখনও বসে আছে।

—কি ব্যাপার বিনয়, দশটা বাজে,
এখনও বসে,—কোনো কথা আছে—

বিনয়কে কোনো কথা বলতে হয় নি।
তার আগেই কথা বলে উঠেছে পরমা।
তোমার বন্দু, আমার জন্ম কবতে চান—আমি
কেবলই নিবেদন করছি, বলছি, এব কোনো
প্রয়োজনই নেই। উনি শুনছেন না—আমিই
আটকে রেখেছি।

জামা খুলে মুখটা মুছে বসল সারাথি।
বলল, কি ব্যাপার বলা তো? .
পরমাই বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। বিনয়
আসছে রোববার সবাইকে খাওয়াতে চায়—
তবে রেস্টোরাঁর নয়—সারাথিরই বাড়িতে—
বাজাবহাট যা করবার সব সে-ই করবে—শুধু
রান্নার দায়িত্বটা নিতে হবে পরমাকে।

পরমা বলেছে, বেশ তো আপনারা সবাই,
সামনের রোববার আমাদের এখানে খাবেন,
সমস্ত ব্যবস্থা আমার—কিন্তু বিনয় তাতে রাজি
হচ্ছে না।

সে রবিবারটা বড় আনন্দে কেটেছিল
সবার। বিনয় দশ বার বাজার ছুটেছে। প্রতিটি
রান্না একবার কবে স্টেট করেছে। ঘবে এই
খাটেরই ওপর বসে খাটা দেখতে দেখতে সারাথি
কখনও ওদের উচ্চ কলহাস্য শুনতে পেয়েছে,
কখনও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পরমা।

সমস্ত মুখ তেলতেলে। ঘাসে লেপটে
আছে কপালের ওপর কমা চিহ্নের মত ছোট
ছোট খুঁচুরো চুলগুঁড়ো, বকের কাছে শাড়িটা
এলোমেলো, নিচের দিকে শালাটা দেখা যাচ্ছে

—কিছু বলছে? সারাথি প্রশ্ন করেছে।

—মাসেটা একটু টেস্ট করে দেখো তো।
পরমা ভিটা এগিয়ে ধরেছে।

—আবার আমার। বিনয় তো মনে হচ্ছে
এ সব ব্যাপারে একস্প্যারট—

—দায়ব। নিঃশব্দে নয়, সশব্দে হেসে
উঠল পরমা—ওই শোনো, উনি খুঁত
নাড়ছেন—

মাসের চকুরোকাটা খাওয়া হয়ে গেলে
পরমা বলল, বেশ টেস্ট হয়েছে তো? ওরা
নিদ্বেদ করবে না—

সারথি নিঃশব্দে হাসল। বলল, তুমি
রোংগে শুনলেই সুপ্রকাশের ভাল লাগবে—

—এই, চোখ বড় করল পরমা—ইয়ারকি
করো না—বলে রাসায়নিক চলে গেল পরমা।

থেকে বসে সবাই উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল।
এবং খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে রাত
এগারটা বেজে গেল। অতিথিরা যখন বিদায়
নিল তখন সমস্ত পাড়া নিম্নলিখিত।

প্রান্ত দেহটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে, পরমা
বলল, তোমার বন্ধুরা এতো খেতে পারবে,
তা ভাবতেই পারি নি—তারপরেই সারথির
দিকে ফিরে বলল, তুমি কিন্তু আজ বস্ত্র কম
খেবেছ—

সারথি পরীক্ষার খাতার বান্ডিল গোছাতে
গোছাতে বলল, সারাদিন আচ্ছ তোমার খুব
খাটনি গেছে, এবার শূন্যে পড়ো।

সে কথার কান দিল না পরমা। বলল,
আমার মনে মনে ভয় ছিল, কি জানি যদি
রাসা খারাপ হয়ে থাকে—তাহলে তো সমস্ত
আনন্দটাই মাটি—

সারথি শয়ে পড়ল। পরমা তখন চল
আঁড়াল। শাড়ি বদলাল। মুখে ঘাড় পড়িডাব
দিল। গুনগুন করে পান করতে লাগল।
সাবধি সব দেখল। বসে দু' চোখে। তবু ঘুম
এল না।

সুস্থের পর টিউশানি নিলে বিরক্ত হয়
পরমা। সাবান আঁপস থেকে ফিরেও যদি
একা একা থাকতে হয়, তাহলে ভাল লাগে
না। সাবধি না থাকলে বন্ধুরা কেউ বড় একটা
বসতে চায় না বেশিক্ষণ। চা খেতে যেটুকু
সময়, তাই পড়েই চলে যেতে চায়। পরমাই
আটকে রাখে বসে না, ও এখনি এসে যাবে।

—সাবধি কতায় আসবে বলে গেছে?
‘দম্ভ জিজ্ঞাসা করল।

—বলে তো গেছে আটটার ফিরবে—পরমা
হাতখড়ির দিকে তাকাল।

—সাবধি আটটা মানে নটী—অমল উঠে
দাঁড়াল।

পবমও উঠে দাঁড়াল, না হয় আপনার
বন্ধু নেই, আমি তো আছি, আমার সঙ্গে
দু' দণ্ড কথা বলতে তো পারেন—

অমল তাকাল পরমার দিকে। মুখে
একটা মিষ্টি হাসির রেখা। চশমার কাচের
ভেতর দিয়ে চোখ দুটোও যেন হাসছে। এই
মুখ দেখেই চেহারাটায় এমন একটা
বাদকাজ এর আগে কোনোদিন দেখেনি অমল।
আবার বলল সে। এবং সিনেমা, সাহিত্য

এমন কি সাম্প্রতিক গানের প্রসঙ্গ আলোচনা
করতে করতে ঘণ্টা দেড়েক সময় পার করে
দিল। বারবার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল
পরমা। বলল, আবার আসবেন।

শূন্য যে অমল; তা নয়; বৌদিন
সুপ্রকাশ একা আসত। চা খেত। পাঁচ বার
খড়ির দিকে তাকাত। সারথির টিউশানির
মোহ নিয়ে ঠাট্টা করত। বলত, আচ্ছা মিসেস
চক্রবর্তী, আপনার রোজগার, সারথিবাবুর
রোজগার—তার ওপর এই টিউশানির জ্বালা
কেন, বলুন তো?

—আপনার বন্ধুর কথা আর বলবেন না—
বলে, একশো পঁচিশ টাকা ঘরভাড়া দিচ্ছি—
টিউশানি না করলে চলে।

—আসলে, সিগারেটের ছাই জড়তে
জড়তে সুপ্রকাশ বলল, আপনারই পরোক্ষ
সম্মতি আছে— না হলে সারথির সাধা হত
না এত টিউশানি করার।

—তাই নাকি? সেই মিষ্টি হাসিটা
পরমার চোখে, টোটে দেখা দিল। বলল,
আপনারা তাহলে আপনারদের বন্ধুকে চেনেন
না?

—আপনার কথা শোনে না, বন্ধুরা
স্ট্রেইনজ্।

—সত্যি, আপনারদের বন্ধু না বিচার
মানুষ, আমি এমন লোক এর আগে দেখি
নি—

—ইক্সকিউজ মি, সুপ্রকাশ বলল,
আপনারা বিয়ের আগে বছর চারেক তো
মিশেছেন—তখন বোঝেন নি।

হঠাৎ নিজেকে সামলে নিল পরমা। বড়
প্যারসোনিয়াল কথাই চলে, আসতে চাইছে

সুপ্রকাশ। পরমা উঠে দাঁড়াল। বলল, বন্ধু
একমিনিট, আর একতাপ চায়ের জল চাড়া
আসি।

—আলোটা জ্বালিয়ে দেবে—পরমার
গলার স্বরটা যেন একটু অস্বাভাবিক বোধ
হল সারথির। আস্তে আস্তে উঠে সুইচটা
নামিয়ে দিল সারথি। ওপাশের জানলার কাছে
তেমন পা ছাড়িয়ে গা এলিয়ে চেয়ারে বসে
আছে পরমা। মুখের এপাশে আলো এসে
পড়েছে। মনে হচ্ছে সে খুব ক্লান্ত।

সারথি দুটিটা ফিরিয়ে আনল। এখনও
বৃষ্টি পড়ছে। বেশ জোরেই। রাস্তায় জল
আরো বেড়েছে।

ধীরে ধীরে ঘাড়টা ফেঁদাল পরমা।
শুকনো গলার বলল, কটা বেজেছে?

টোঁবলের ওপর টাইম পীসটার দিকে
তাকাল সারথি। সাড়ে আটটা।

—মোট—পরমা ঘাড় ফিঁবিয়ে নিল।

বিছানায় কাত হয়ে শূন্যে সারথি বলল,
হা বৃষ্টি, আজ আব ওরা কেউ আসতে
পারবে না বোধহয়—

—চুপ করো—চিবকার করে উঠল পরমা।
আওয়াজটা কান্নার মতন শোনাল। বাঁ হাতটা
ভুলে চোখটা আঁড়াল করল সে। তারপর, বেশ
কিছু সময়ের বিরতির পর অক্ষুটে বলল,
আলোটা নিভিয়ে দাও।

ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল আবার। দু' জন
জানলার দু' জন বসে রইল। কারুর মুখে
কোনো কথা নেই। কিন্তু মনের ভেতর অসহ্য
বহুশা। অন্ধকারে সে বহুশাকাতর মুখ কেউ
কাউকে দেখতে দিল না।

॥ মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম ॥

কলিযুগে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া স্বয়ং দেবাদিদেব
এই মহাপ্রস্থতের উপকৃত-সূচনায় মহিমাকীর্তন করিয়াছেন—স্বয়ং শ্রীমুখে—
কলিদোষে দীন স্বাক্ষর ক্ষত্রিয়ের পবিত্র-অপবিত্রের বিচার থাকিবে না। সুতরাং
বেদবিহিত কর্মস্বারা তাহারা কিরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে? স্মৃতি,
সংহিতাদির দ্বারাও কলিযুগের মানবগণের ইচ্ছানিষিদ্ধ হইবে না। প্রিয়ে? আমি
সত্য সত্য—সম্পূর্ণ সত্য বলিতেছি, কলিযুগে আগম-পথ ব্যতীত মানবের আর
গত্যন্তর নাই।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুদিত

বোর্ড বাঁধাই। মূল্য: বারো টাকা

বসুমতী (প্রা.) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২



সন্ধ্যাটা দিন মেঘলা-মেঘলা ছিল, বিকেলের দিকে কিছুটা পরিষ্কার হল আকাশ। জ্ঞানালার দিকে মূখ্য করে জব্দধব্দ শুনিয়েছিল গীতি। নিকট-দূরে অজস্র উচ্চ-নিচু বাড়ির মাথায় রাস্তা পাখি, হাওয়ায়, লুটোয় পাখা। খুশিতে যুগপৎ শব্দ তোলে।

চুপ হয়ে এসব দেখতে দেখতে গীতি ভুলে যায় সে অসুস্থ, গীতি ভুলে যায় তার শীর্ণ, দুর্বল শরীর, একদা বিম্বরকব মোহিনীমায়ায় উজ্জ্বল তার আনত চোখের কোলে স্থায়ী বিমূঢ় বিষাদ। ইচ্ছা জাগে একছটে বাইরে চলে যেতে, ব্যালকনিতে ভব করে একটুকাল দাঁড়াতে। রাস্তায় অনেক লোক। রাস্তায় সাঁ-সাঁ ছটে চলা অজস্র গাড়ি। কতদিন—কতদিন সস এসব দেখেছি! ভবিষ্যতেও আর কোনদিন দেখতে পাবে না, কেন না গীতি জানে, সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। অবশ্য

ভাতারবাড়, ভরসা দিচ্ছেন খুব, সুকুমার ভরসা দিচ্ছে, কিন্তু গীতি বোঝে, এসব নিছক সান্দ্রনা মাত্র, এর মধ্যে গভীরতা নেই। সে মরে যাবে—হঠাৎ, কাউকে কিছু না জানিয়ে তার ক্ষয়ে যাওয়া বৃকের অবশিষ্ট রিনরিনে স্পন্দনটুকু ধেমে যাবে একদিন। তখন স্তম্ভিত হয়ে যাবেন ভাতারবাড়, গম্ভীর মুখ নত করবেন। সুকুমার কাঁদবে, ক্রমাগত ধারাবাহিক দ্রুত চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াবে তার। হয়ত মূহুর্মূহু মনে পড়বে সুপের দিনের কথা, মনে পড়বে একদা তারও প্রিয়জন ছিল কেউ—যার কোমল মুখে সুন্দর গোলাপী আভা, মোহিনী চোখ, চাঁপার কলির মতন হাতের আঙুল। সে হাসলে মস্তা ঝরত, অর্ধাং মস্তার মতন খুশি ঝরত, ঠোঁটের ওপর শোভনতালে নাচত তিনটে ভিল। তারপর সময় যত গড়াবে, সুকুমারের বৃক থেকেও বিন্দু বিন্দু ঝরে যাবে স্মৃতি।

মাঝে শব্দ এই কটা দিন, চতুর্দিকে সুখ শিস্ দিয়ে উড়ছে, কিন্তু গীতি। সে মৃত পাণ্ডুলিপির মতন সারাক্ষণ পাখির বিছানায় শূন্যে।

সুকুমার কি আজ একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারে না? এলে ভালো হয় খুব। এত ক্লান্ত লাগছে আজ। হাত-পা অসম্ভব ঠান্ডা হিম, কি যেন স্বেদ মতন অহরহ বিধ্বস্ত বৃকে। সেকি স্মৃতির উৎসব?

সেই কোন ভোরে বেরিয়ে গেছে সুকুমার। রোজই যাব এইরকম। ফিরে আসে রাত দশটা সওয়া দশটার পর। তখন আর প্রাণ খুলে গল্পটপ করার মতন অবস্থা থাকে না। মানুষটাকে দেখে বড় কষ্ট হয় গীতির, সাবাটা দিন খেটে-খুটে বড় ক্লান্ত, অবসাদগস্ত। খাওয়া-দাওয়া সেরে টলতে টলতে এসে শূন্যে পড়ে গীতির পাশে। একটা-দুটো কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ভোরবেলা চোখ মেলেতেই সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। কোমরে হাত বেড় দিয়ে দ্রুত কাছে টেনে নেয় গীতিকে।

গীতি বেশ পরিষ্কার টানা গলায় আস্তে করে বলে—আজ একটু উঠি গো, শরীর এত ভালো লাগছে—

সুকুমার গীতির ধ্বংসের পিঠে নাক ঘষতে ঘষতে বলে—না-না—

গীতি নাছোড়, গীতি জেদী। সে বলে—অবস্থা হযো না লক্ষ্যীটি। আমার আর ভালো লাগে না এভাবে শূন্যে থাকতে। সত্যি বলছি—সত্যি—বিশ্বাস করো, আমার এত কষ্ট হয়। এভাবে থেকে আমি ক্রমশঃ রুগ্ন হয়ে যাচ্ছি, শক্তিহীন—নিঃশেষ—

সুকুমার চুপ। সুকুমার যেন বোবা শান-পাথর।

—তাছাড়া, শিবুর মা এত নোংরা কাজকর্ম করে।

—করুক গো।

—রোজ ওই সব হাজিবাঙ্গি খেতে তোমার কষ্ট হয় না?

—ধনস, তা কেন। সুকুমার ঘুম-চোখে হাসল।

—না, আমি জানি, তুমি একদিনও ভালো করে খাও না।

—কে বলল এসব?

—শিবুর মা।

সুকুমার অস্বস্তিবোধ করে। কি জ্বাব দেবে ভাবে একটু সময়। তারপর মনে মনে একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে বলে—সকালে এত তাড়াতাড়ি থাকে কিছুই ভালো লাগে না। দোকানে গিয়ে খাই পেট ভরে। দেবেন বোজ আমাব জন্য খাবার নিয়ে আসে। সত্যিই, খুব ভালোবাসে আমাকে দেবেন। তোমার সম্বন্ধেও নিয়মিত খবর-টবর নেয়।

গীতি চমকিত। সে হাসতে থাকে—তাই বুঝি। কি বলেন?

—এই—মানে—কেমন আছো, শবীর-টবীর সারছে কিনা—এই সব।

—বাঃ, আমাকে তো উনি দ্যাখেনই নি কখনো। তবু, এত আগ্রহ?

—তা কেন, বিয়ের সময় দেখেছিল তো। তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা বিগড়ে গিয়েছিল ওব। সেট থেকে প্রসঙ্গ উঠলেই ও তোমার চোখের বর্ণনা দেয়—

গীতি হাসে, অনর্গল হাসতে থাকে।

—আমি কিন্তু স্মরণ করতে পারছি না। কোন লোকটা বলো তো, সেই যে লম্বা মতন, বেশ ফর্সা, আর—

—না না, দেবেন লম্বা নয় খুব, ফর্সা নয়, এই আমারই মতন হবে।

বাপর ঘরে খুব কি কথা কইছিল? যে গান গাইছিল?

—দূর, সে তো বর্ণজং। দেবেন খুব কম কথা বলে, একটু ভীতু, লাজুক লাজুক ধরণের।

সহসা গীতি শূন্য—আজ্ঞা, দেবেন-বাবুবা কি কখনো খিদিরপুর ছিলেন?

সুকুমার অবাধ—কই না, বব্ববব্বই তো পাটনা না কোথায় স্কুল মাস্টারী করত।

গীতি আস্তে আস্তে বলল—পাট-না! শেষে হেসে ফেলল, বলল—সে তো অনেক দূর।

সুকুমার বলল—হ্যাঁ, বিহারে।

হঠাৎ কণ্ঠস্বব অনাবকম করে গীতি বলল—তুমি বাপু ঠুঁব সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা কর না। কে জানে কার মনে কি।

সুকুমার তাড়াতাড়ি বলল—না না, দেবেন খারাপ লোক নয়, ওর অনেক প্রান আছে, জানো। চিং হয়ে শব্দে শব্দে

বলল সুকুমার। বহর করেক এই রকম ছোট ব্যবসা-ট্যাবসা নিয়ে থাকবে, তারপর হাতে কিছু জমলে চলে যাবে শহরতলীর দিকে, একটা-কারখানা খুলবে, বাচ্ছাদের পুতুল তৈরি হবে সেখানে। আমি ডিজাইন বানাব, ও তৈরি করবে।

সুকুমার এখন বেশ চাপা, চোখে ঘুসের জড়তা নেই, শরীরে আলস্য নেই। গীতি ক্রমশ একটু একটু করে স্বামীর বুকের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে আস্তে করে বলল—ওসব বন্ধি না বাপ, তুমি সরল মানুষ, একটুতেই কাত। আমি আগে দেখব আলাপ করে। একদিন নিয়ে এসো না ঠিকে।

সুকুমার বলল—ও তো আসতেই চায়। আমি সময় করে উঠতে পারি না। রোজ এত দৌরি হয়ে যায়।

বাড়ি থেকে বেরোবার আগে সুকুমার বোজকার মতন গীতির জন্য ওষুধপত্র গুছিয়ে রাখল হাতের কাছে। পরম আগ্রহে আদর করল। গীতি চুপ করে, অন্তঃপূর্ণ অনুসাহী।

বারোটা-একটার পর থেকে আর কাটতে চায় না দিন। শূন্যে শূন্যে কত আর বই-কাগজ পড়া যায়। যদিও বারণ, তবু গীতি দেয়ালে ঠেস দিয়ে কিছু সেলাই-ফোড়াই করে। বহুদিন থেকে লুকিয়ে একটু একটু করে সুকুমারের জন্য একটা সোয়েটার বুনছে, তা নিয়ে বসে। একটানা কুড়ি-ত্রিশ মিনিট কাজ করার পর ঘামতে থাকে, গায়েব জামা ভিজে চুপচুপে, আর তা থেকে বিস্তীর্ণ গন্ধ, তখন কি অসম্ভব দুর্বল লাগে। লম্বা লম্বা শ্বাস টেনে হাঁপায় গীতি।

সিঁতাই ভালো লাগে না। বড় অসহায় মনে হয়, রিক্ত অভাজন। কেউ আসে না তার কাছে, কোন আশ্বীষ-স্বজন এমন কি ফ্লার্টের কোন মেয়েরা, কেউ না।

গীতি সকাল থেকে একা, সারাদিন একা, সারারাত—সুকুমার স্বপ্ন পাশে শূন্যে অঘোরে ঘুমোয়। তখনো একা। আর এই সব সময় প্রতিদিন একটু একটু করে ছদর থেকে বুক থেকে ঝবে যায় ব্যাপক সুখের জ্যোৎস্না, আত্মগেব ঝগ, মনোরম মজি।

বিছানায় কাত হতে হতে গীতি সরে যায় জানালার দিকে। লীলিম আল্প স্বফুরিত আকাশের দিকে তাকায়। শীতের কুয়াশা দেখে। দুপুর থেকে আস্তে আস্তে কেমন ধোঁয়াটে হয়ে আসে সবদিক। উঁচু উঁচু বাড়িগুলি অসম্ভব বিরক্ত।

ঘাড় নীচ করলেই দেখা যায় গিলির পথে অজস্র মানুষ। একা, দল বেঁধে লাইন দিয়ে, কথা বলতে বলতে হেঁটে চলেছে। কতরকম ভাঙ্গা তাদের। কেউ কেউ খুব আস্তে সাবধানে পা ফেলে ফেলে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে

পথ হাঁটে। কেউ বা হন হন করে চলে যায়, একখানা হাত দোলাতে দোলাতে যায়। কেউ বা, সবদিকে খেয়াল আছে, অথচ উদাসীন, ঠিক একই সময় দু জন মধ্যবয়স্ক বাড়ি ফেরেন। তারা হয়ত স্কুল মাস্টার, কিম্বা কলেজের অধ্যাপক, অপিসের কেরানীও হতে পারে, কারো গায়ে তো আর ছাপ মারা থাকে না, ওটা চলন-বলনের ধরণ দেখে আঁচ করতে নিজে হয়। ও দু'জন ব্যক্তিগত দেখে গীতির প্রথমেই মনে হয়েছিল ওরা স্কুল মাস্টার। এদের মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব ছিল একসময়। তখন ওরা পাশাপাশি হাঁটত, কীমে কীম মিলিয়ে কথা কইত, কখনো উচ্চস্বরে হাসত—দু'জনেই হাসত। কিন্তু আজ—কাদা অন্যরকম হয়ে গেছে। দু'জনেই, যদিও একই সময় ফেবে। একই ফুটপাথ ধরে হাঁটে, কিন্তু একাউও কথা বলে না।

এইসব দেখে ভারি অন্যাক লাগে গীতির।

তারপর আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়। আলো জ্বলে ওঠে সর্বত্র। সমস্ত দিক নিব্বনে থমথমে।

সুকুমার কি আজ একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারে না? এলে ভালো হয়। খুব ভালো হয়। শরীরটা এত খারাপ লাগছে। শূন্যে শূন্যে আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে এই সব ভাবছিল গীতি। এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। গীতির মূখ খুঁশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সন্ধ্যাই এত সকাল সকাল ফিরে এলো সুকুমার।

সে তাড়াতাড়ি খাটের ওপর থেকে নামল। দরজার খিল খুঁলে দিলে যেমন কি তেমন বিজ্ঞানায় এসে শূন্যে গড়ল। অন্যদিকে মূখ ফিরিয়ে শূন্যাল—এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?

সুকুমার চুপ।

গীতি আপন মনে বলতে থাকল—শোন, একটু আগে না, তন্দ্রাব ঘোরে অশ্রুত একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সুন্দর বিশাল দীঘি, রূপোর মতন টলটলে জল, তাব ওপর একজোড়া বাজহাঁস। ডানায় জল কেটে কেটে তির-তির করে এগোচ্ছে।

—সহসা—গীতির কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল—মাথার ওপর একটা ধূর্ত বাজপাখি। উঃ, কি ভীষণ তার চোখের দৃষ্টি, পলকে ক্ষিপ্ত, প্রসারিত। তাই দেখে হাঁস দুটি এমন ভয়াব্ধ, ময়না গতিতে তারা ছুট দিল ডাঙার দিকে। ধূম না ভাঙলে আরো কত কী হয়ত দেখতুম। অশ্রুত বাজপাখির চোখের সামনে ভীত রাজহাঁস, লাল শিরায়ুক্ত বিচিরা বৃষ্টি—তাই ছুঁয়ে আয়ত আকর্ষণ চোখ।

এইটুকু বলে থামল গীতি। এম্বোয়ারে নিব্বনে। বড় দুর্বল শরীর। নিঃশ্বাস অসাড়। এমন অবস্থা, পাশ ফিরতে পর্যন্ত ভালো লাগছে না। অথচ দারুণ ইচ্ছা সুকুমারের মূখখানা একবারটি দেখে।

গল্পটা শুনে তার ভিতর ঠিক ভাব-পরিবর্তন ঘটল তা লক্ষ্য করে।

বাইরের দিকে মূখ করে শূন্যেছিল গীতি। প্রতি মূহুর্তে সে ভাবছিল, সুকুমার তার কাছে সরে আসবে, সজোরে কোলে টেনে নেবে। কিন্তু সুকুমার কেন এমন শব্দহীন বিনিময় নিখরী?

ভাবখানা এই রকম—সে যেন হাসপাতালে এসেছে। কোন প্রিয় আত্মীয়, যিনি অসুস্থ, তার পাশে বিবাদপূর্ণ, চোখে বসে আছে, আর ভাবছে—এ বড় অসহ্য—এই ভীবন—প্রতিদিন কত সমস্য। নীচু গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বোধ হয় বললও—শোন, তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠো। বিশ্বাস করো, বড় অসহ্য, আমি আর পাচ্ছি না।

—কেন, পাচ্ছো কেন? তুমি না সমর্থ পুরুষ। তোমার একটা দায়িত্ব আছে। কী, স্বীকার করো কি না?

—করি।

—তবে, তবে কেন এত বিরক্ত, অসমর্থবোধ করো?

—না, ঠিক তা নয়, বিরক্ত অসমর্থবোধ করি না। তা যদি করতুম, তাহলে কি তুমি আমাকে রোজ হাসপাতালে দেখতে পেতে। এখানে—এত গুমোট, অহরহ বাখাভরা নিঃশ্বাস, এসব কিছুই আমার ভালো লাগে না।

—সে তো কারোই লাগে না। কিন্তু সংসারে সর্বদা বিশৃঙ্খল আলো হাওয়া ফুল তাই বা আশা করো কি করে? দুঃখ হতাশা ব্যথা এ তো ধান্দেই—যেমন থাকে আনন্দ সুখ ও সুদিন। কি বলো, ঠিক কি না?

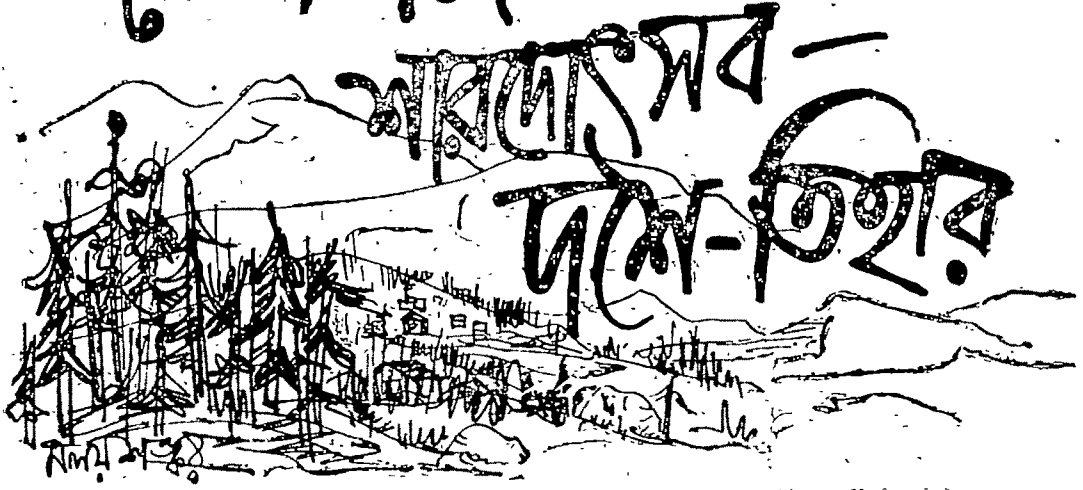
সুকুমার তখনো চুপ। সুকুমার চানরের নিচে হত গাট্টিয়ে বসে আছে শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধের মতন।

ঘরে নীল আলো জ্বলছিল। তার জন্য শাদা দেয়ালটা ঘুসর আকাশের মতন মনে হচ্ছিল। আসবানপত্রের স্থান ছায়া-ছায়া। অন্যদিন এসেই সুকুমার বড় আলোটা জ্বলে দেয়। আজ তা দিল না কেন? ওষুধপত্র মিনিয়ো দেখে ঠিক ঠিক খেয়েছে কি না, কিন্তু আজ তাও দেখল না।

গীতির ক্রমশ বিস্ময় বাড়ছিল। তার যদিও খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল, পাশ ফিরে সুকুমারের দিকে তাকায়। চুপ হতে বসে বসে সে কি করছে তা দেখে। কিন্তু গীতি নড়তে পারছিল না, হাত-পা অবশ্য হিম। মূখ না ঘুরিয়েই সে শূন্যাল—কি হয়েছে গো তোমাব, কথা কইছ না কেন? শব্দীয় খারাপ?

সুকুমারের মূখে তথ্যটি কোন রা নেই। আশ্চর্য ভে, মানুষটা ভূতমের মতন বসে বসে কি ভাবছে অত?

নেপালীদের হরেন ঘোষ



পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলের — দার্জিলিং জেলার পার্বত্য ভূখণ্ডে নেপালী, ছুটিয়া, সিকিমী, তিব্বতী জাতি বসবাস করে বাঙালী ও ভারতের নানা প্রান্তের অধিবাসীদের পাশাপাশি। নেপালী ভাষাভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। প্রধানতঃ নেপালীরা হিন্দুধর্মাবলম্বী, কিছু বা বৌদ্ধ, কিছু খ্রিস্টান। বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে এই অঞ্চলের অধিবাসী নেপালীদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মিশ্রণ ঘটেছে, তাই নানা উৎসব, অনুষ্ঠান, লোকচাচা পূজা-পার্বল্য একের প্রাতি অপরের প্রভাব চোখে পড়ে।

বর্তমান নিবন্ধে নেপালীদের শ্রেষ্ঠ দুটি উৎসব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার ইচ্ছে আছে। নেপালীরা উৎসবপ্রিয় জাতি। মাস্তা বছরই কোন না কোন পূজা-পার্বল্য,

উৎসব-অনুষ্ঠানে দিন কাটাতে ভালোবাসে। শব্দকালের দুটি উৎসবই মুখ্য উৎসব। একটি দশাই অন্যটি তিহার বা তেওহারা।

দুর্গাপূজার সময় অনুষ্ঠিত হয় দশাই। সারা বছর প্রত্যেকটি লোক, ধনী বা দরিদ্র এই দিনকটির জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। কিছু কিছু সময় করে রাখে এই সময় মনের কুর্তিতে দরাজ হাতে খবচ করবে বলে। দুর্গের মানুষ ঘরে ফেরে। কাজ ফেলো ছুটির আনন্দে মেতে উঠতে চায় সবাই।

আশ্বিন মাসের প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত এই দশ দিনব্যাপী এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়—তাই নাম হয়েছে দশৈ। এই সময় নতুন জামা-কাপড় পরে সকলে, ধাড়ি-রকশি অর্থাৎ সুদ্রা-পান চলে, নানা ধরনের ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত হয়। সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে শেলরুটি—জিলিপি মত চালের গুড়ো দিয়ে তৈরি। আর আছে প্রতিদিন গৃহপালিত মেঘ ও ছাগকর্তন। শীতপ্রধান দেশে মদ্য ও মাংস নিষিদ্ধে উৎসবকে সর্বাপেক্ষা সন্দেহ করে তোলে। ইদানীং কিছু কিছু বারোয়ারী দুর্গাপূজা হচ্ছে শহরাঞ্চলে, বাঙালী পূজার অনুকরণে। তবে প্রধান উৎসব হচ্ছে বিজয়া-দশমীর দিন। এই দিনে অযোধ্যামিথিত দশরথপুর রামচন্দ্র স্ত্রীর পরী অশ্বরসকারী লক্ষ্মীপতি রাবণকে পরাভূত করে অসুর শক্তি নাশ করেন। বিজয় স্মরণে এদের এই বিজয়া। এই দিন মা-বাবা এবং অন্যান্য গুরুজন ছোটদের কপাল জুড়ে দই ও চালের বিজয়ান্তিক পরিবেশ দেন। এমা বলে টীকা উৎসব। শত্রু মিত্রের কোন ভেদ থাকে না, সবাই আপনজন বিজয়ার দিনে।

নেপালীদের সবচেয়ে বড় উৎসব-তিহার।

মহোৎসব বা পবমোৎসব। তিহারের অন্য নাম বমপম্ভক। বমরাজ্য পাঁচ দিন নিজেদের সব কাজ বন্ধ রেখে ছোট বোন বমদেবীর বাড়িতে বিদ্রাম নেন।

বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়, ঘর জাগান হয়। তারপর গাঁদাফুলের মালা, কলাগাজ ও দাঁপের সাহায্যে উৎসবের রূপ দেওয়া হয়।

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের শ্রাদ্দশরী দিন গণেশপূজা দিয়ে তিহার আরম্ভ করা হয়। চন্দ্রোদয়ী দিন কার্তিকতিহার ও চতুর্দশী দিন কুকু তিহার। কাক ও কুকুর বমরাজ্যের আশ্রিত, প্রিয়পাত্র—তাই তাদের তুষ্ট করা হয়। কাকের জন্যে বাবার ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। পথের কুকুরেরও কপাল খুলে যায়। তাদেব যবে গলায় মালা পরান হয় ও আদর করে খেতে দেওয়া হয়।

অমাবস্যার দিন সকালে হয় গাড়ীপূজা। এই দিনের নাম গাই তিহার। এই দিন রাতে বাড়ি বাড়ি লক্ষ্মীপূজা হয়। বিশেষভাবে তাল কলস ও অন্যান্য বাসনপত্র একত্র করে মৃতদীপ জ্বালিয়ে, ধূপধূনো সহযোগে পূজা করা হয়। কালীপূজার প্রচলন নেই বিশেষ। এই দিন রাতে লক্ষ্মীপূজার পর মহিলারা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মঙ্গলিক গান গায় ও দক্ষিণা নিয়ে বিদায় নেয়। সূর্য সহযোগে এই সমবেত সঙ্গীতকে বলা হয় ঠৈলো-গীত। গানেব মর্মার্থ এই রকম—ঘর-দুখাব পরিষ্কার রেখো। শরৎকালে তোমাদের শ্রুতকামনা জানাই লক্ষ্মীর কৃপা যেন পাও তোমরা। আমাদের কিছু, দক্ষিণা দাও, আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নেব আমরা।

[শেষাংশ ২২৫ পৃষ্ঠায়]





এই পৃথিবীতে হাবিয়ে যাবাবও বড়ি জায়গা নেই।

অধ্যাপক খালিল আমেদ তাঁর স্টাডিতে বসে বসে ভাবছিলেন। হাতে তাঁর বই একখানা আছেই যেমন তাঁর সব সময়েই থাকে। যে পর্যন্ত পড়া হবেছে আঙুলের চিহ্নে সেখানটা চেপে রেখেই কয়েকটি মন্তব্যের জন্যে চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন তিনি।

এমনি একটা ভাবনা কর্দির ঘবেই অধ্যাপকের মাথার ঘূর্ণপাক খাচ্ছিল।

আচ্ছা, কটা দিন কোথাও গিয়ে পালিয়ে থাকলে হয় না?

এই প্রশ্নটাই অধ্যাপক আমেদকে এমনভাবে ভাবিয়ে চলছে। পালিয়ে থাকা কি তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব? আঠাশ বছরের অধ্যাপক জীবনে অন্তত হাজার দুই ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে পড়ে গেছে। তাবা ছাড়িয়ে আছে দেশের চারিদিকে। কেউ কেউ বিদেশেও রয়েছে। তাছাড়া জানাশুনোব পরিমিই কি কম?

কাজেই পালাবাব উপায় নেই। সংসবে হাবিয়ে যাবার মতো জায়গাই নেই, এমনি একটা দার্শনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন অধ্যাপক ডঃ খালিল আমেদ।

সম্রাট শাহজাহানের দরবারে ওপর খিসিস লিখে স্নাত সাত বছর আগে ডক্টরেট পেয়েছেন ইতিহাসের অধ্যাপক খালিল আমেদ। এমনিতেই

তাঁর অতুলনীয় খ্যাতি অধ্যাপনার, তার ওপর আবার ডক্টরেট। কাজেই নামমশে মহানগরীতে তিনি এখন প্রথম সারিরই মানুষ।

হ্যাঁ, ঢাকা এখন আর একটি শহর মাত্র নয়, ঢাকা বাস্তবিকই এখন এক মহানগরী। প্রায় দশ লাখ লোকের বাস যেখানে, তাকে কি আব শহর বলা চলে?

ভীড়, কেবল ভীড়। মানুষের এই ভীড়কে একবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না ডঃ আমেদ। আগেও পারতেন না এখনো পারেন না। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা মানুষের ভীড়ের ভয়ে ভুললোক বিয়ে করতেই সাহস পেলেন না।

এ নিয়ে কি কম ঝগড়াঝাটি হয়েছে খালিল সাহেবের তাঁর বড়ি মায়ের সঙ্গে?

মা যতই বিবেক কথা বলতেন ততই এড়িয়ে যেতেন খালিল আমেদ। তিনি বলতেন, সাদি করলেই তো হলো না, লোকের ভীড়ে মাথাটা বিলকুল খারাপ হয়ে গেলে তখন আমার চাকরিটাই খতম হয়ে যাবে।

ছেলেব সঙ্গে কথায় এটে উঠতে পারতেন না মা। কাজেই প্রতি বারেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে চাপ কবেই যেতে হতো। তাবপব বছর বাবো আগে মায়ের এতেকাল হল সেই থেকে কেউ আর অধ্যাপক আমেদকে সাদিব কথা বলতে আসে নি। তিনিও একবারে নিশ্চিন্ত।

হ্যাঁ, গত বাবো বছর ঘবে অধ্যাপক ডঃ

আমেদ বেশ নিশ্চিন্তেই আছেন বলা চলে। মায়ের মৃত্যুর পর সত্যি সত্যি তিনি বাধ্য-বন্দনহীন। তবু যেটুকু বন্দন তিনি অনুভব করেন তা হলো ইতিহাসের বন্দন।

বাস্তবিকই সমাজে থেকেও যে মর্তির পরিবেশ খালিল আমেদ দীর্ঘকাল ধরে ভোগ কবে আসছেন তা দুলভ। কিন্তু ইতিহাসের কবল থেকে তাঁর মুক্তি নেই। ইতিহাস তাঁকে আশ্চর্যপুষ্টে বেঁধে বেঁধেছে যে।

প্রায় সাতশ' পৃষ্ঠার খিসিস—নিজের গবেষণা গ্রন্থ 'দুঃখী বাদশা'র দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। নতুন সংস্করণের তাঁর সেই গবেষণা গ্রন্থই অধ্যাপক গভীর আগ্রহে পড়ে চলছিলেন এবং চিহ্নিত করছিলেন যেখানে যে ভুল তাঁর চোখে পড়ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় তখন বন্দ। গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে। কাজেই অতল সময় ডঃ আমেদের ইতিহাসের সংগ লাভেব।

মুস্তাক সকালে এসে ঘরদোব সাফ করে দেয়। খানা পাকায় এবং নির্দিষ্ট সময়ে সাহেবকে তা পরিবেশন কবে দিজে খোঁজে-দেখে দিনের মতো বিদায় নিয়ে যায়। সন্ধ্যায় আবার আসে, সেই একই নিয়মে সব কবে হাসিল কবে সে বাড়িতে ফিরে যায় উদারিতে। দেতে যেতে তাব রাত এগাবটা হয়ে যায়। পল্টন থেকে উয়ারি পথ তো আর কম নয়।

ডঃ আমেদ দু' তিন বার বলেছেন মৃত্যুতাককে তাঁর বাড়িতেই রাখিবাস করতে। প্রথম প্রথম লক্ষ্মীর হানি ছাড়িয়ে দিয়ে উত্তর এড়িয়ে গেছে মৃত্যুতাক। কিন্তু শেষটার আর সে কিছু ঢাকবার চেষ্টা করে নি। পরিষ্কার বলে দিয়েছে, 'হেইটা কি আর অন্ন সহ্যব, বাড়িতে দুইটা বিবি আছে না। বাইরে রাইত কাটাইলে দুই বিব জোট বাইন্দা আমার মাথা একেবারে কাঁচা খাইয়া ফালাইবো।' সে কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন অধ্যাপক আমেদ সাহেব। তারপর একটু ধেমে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন মৃত্যুতাককে, 'আমি তাহলে সাদি না করে বেশ ভালোই করছি, কি বুলো?'

মৃত্যুতাক মাথা চুলকোতে চুলকোতে সাহস করে একটা কড়া জবাবই দিয়ে ফেলেছিল। সে বলছিল, 'না সাহেব সাদি না কইরা আপনে ভালো আছেন হেই কথা আমি মানি না। মাইনবের দেহটাও লোহার তৈয়ারী নয়, মনটাও নয়। আর সব মাইনবের দেহ-মন বা চান আপনের দেহ-মনও তো হেই একই জিনিষ চাইবো। এইটা মিছা অইতে পারে না, অন্য রকম অইতে পারে না। আমাকা খামাকাই আপনে এককাল ধইরা এত কষ্ট করতে আছেন।' বলেই সাহেবের মূখের দিকে তাকায় মৃত্যুতাক। তার মনে হয় সাহেবের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সে বোধহয় খুব বেশি বাড়ি-বাড়ি করে ফেলেছে। তাই ক্ষমা প্রার্থনা করে সে খুব উৎসেগের সঙ্গে। বলে, 'ক্ষমা করবেন সাহেব মোহেরবানী কইবা। পুত্রই কসব হইয়া গেছে, অশন খ্যাল অইতে আপনোগো মতন বিম্বান লোকের লগে অমন কইরা খোলাখুলি কথা কইতে নাই।'

না, না তাতে কি? নির্ভয়েই তুমি তোমার সব কথা বলে যাও। আমি তাকে খুশিই হবো।—বললেন আমেদ সাহেব।

কাচমাচ করে মৃত্যুতাক তখন আবার তার মনের আসল কথাটা বলতে শুরু করলো। সে বললে, 'আমার কথা কি জানেন সাহেব, আপনার কাছে তো বেশ ডাঙব ডাঙর মাইয়াও লেখাপড়া বসতে আছে মাঝে মাঝে। তাগো মধ্যে দুই চাইবটা বেশ সন্দরী মাইয়াও আমার চোখে পড়ছে। আমি দেখছি, আপনে তাগোই বেশ কইরা মন দিয়া লেখা পড়া শিখায়েন। হেই রকম দুই এক জনেরে সাদি কইরা যদি বিবি বানাইয়া লইতেন তাহলে দেখতেন, সংসারটারে আপনার কাছে আর মরুভূমি বইলা মনে অইতো না। পলংসা খাওনের কথা আপনে আব তখন চিন্তা করতেন না।'

মৃত্যুতাকের এ কথায় এবার সত্যি সত্যি একটা ধাক্কা খেলেন খালি আমেদ সাহেব। তবে কি কিছু দিনের মতো হারিয়ে যাবার জন্যে যে ইচ্ছেটা তিনি অনেকদিন ধরে আপন মনে গোপন করে আসছেন মৃত্যুতাক তাহলে কি তা টেব পেয়ে গেছে? আর তাঁর কোনো ছাত্রীর সঙ্গে যে মিষ্টি সম্পর্ক তাঁর গুড়ে উঠেছে তাও কি সত্যি সত্যি সে লক্ষ্য করেছে?

টেব বদি পেয়েই থাকে মৃত্যুতাক, সব কিছু সে যদি দেখে বা জেনেই ফেলে থাকে তাহেই যা কি আসে যায়?

এই কথা ভাবতে গিয়ে নিজের জীবনের ইতিহাস মূহুর্তের মধ্যে তাঁকে গ্রাস করে ফেলে। একের পর এক অনেকগুলি নাম অধ্যাপকের মনের ভাৱে ভাৱে কংকত হয়ে ওঠে। এই নামের মালিকেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ তাঁর এক একজন কুতী ছাত্রী।

ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ খলিল আমেদের জীবন ইতিহাস তো আসলে তাঁর এসব কুতী ও কাছের ছাত্রীদের নিয়েই।

সেই ইতিহাসের সগা লাভ ডঃ আমেদের কাছে অনেক বেশি উপভোগ্য সামাজিক জীবনের আর সব হে-ঠে থেকে। যে সব ছাত্রীকে তিনি মনে পেখে বেখেছেন যখন তখন তাদের কথা চিন্তা করে সময় কাটাতে তাব ভাবি ভালো লাগে। তাবা যে তাঁর নিজের ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়।

অনেকদিন পব মৃত্যুতাকের সেই পুরনো কথাটা সোঁদন সকালে মনে পড়ে গিয়েছিল অধ্যাপক আমেদেব। যাদের তিনি ভালো-বেসেছিলেন তাদের দু' একজনকে সাদি করে নিলেই তিনি বেশি সুখী হতেন, মৃত্যুতাকের সেই কথাটা আরেক বার ঘাচাই করে সবার ইচ্ছে হলো আমেদ সাহেবের। দু'পদর বেলায় খেতে বসে পরিবেশনরত মৃত্যুতাককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মৃত্যুতাক, তুমি তো আমাকে সাদি করার পরামর্শ দিয়েছিলে। তুমি নিজে তো সখ করে দু' দুটো বিবি নিয়ে ঘর করছো। আচ্ছা কটা বাল্চা পয়সা হয়েছে তোমার?'

'তা সাহেব, দেখতে দেখতে তো ঘুড়া বইন্যা গেলাম। খোদার দোয়ায় সাতটা ছাইলা-মাইয়া। বড় বিবির তিন মাইয়া আর এক পোলা আর ছোটটার দুই ছাওয়াল আর এক মাইয়া।'

উরে সাবাস, এতো সংসার নয়, একটা জাহাজ বিশেষ। যাই বুলো মৃত্যুতাক, আমি অনেক ভালো আছি। আমার ঘরে অত লোকের ভিড় জমলে আমি পাগল হয়ে যেতাম।—মৃত্যুতাকের দুই গিন্নীর ছেলেমেয়ের সংখ্যা গণে মাথার হাত দিয়ে এই মন্তব্য করেন অধ্যাপক আমেদ।

মৃত্যুতাক উত্তরে বলে, কী যে করেন সাহেব, ছাওয়ালপান বাড়িতে না থাকলে—দু'মিয়াটা শুন্য শুন্য মনে অন্ন না আপসেগ? আর দুই পাশে দুইটা বোঁ থাকলে কী যে মজা তা আর কী কইরা বুঝাইম আপনারে?

থাক, থাক আর বঝে কাজ নেই। মেয়েরাও অনেক, সাদি করে না। মেয়েরা যদি বিয়ে না করে জীবন কাটাতে পারে তা হলে পুরুষ হয়ে অবিবাহিত জীবন আমি কাটাতে পারবো না কেন? নিশ্চয় পারবো।—এই বলেই চিরকুমারী জাহানারা বেগমের জীবন-কাহিনী বলতে শুরু করে দিলেন অধ্যাপক।

জাহানারার ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী নিয়ে একশ পৃষ্ঠারও বেশি লিখেছেন অধ্যাপক আমেদ তাঁর পবেষণা গ্রন্থ দৃষ্টান্ত বাদশার। নিজের লেখা সেই কাহিনী পড়তে পড়তে নিজেরি তিনি চোখের জল ফেলেছিলেন সকাল বেলা।

মৃত্যুতাক সে দৃশ্য দেখে ফেলেছিল বলেই জাহানারার গল্প শুনে মনে মনে আরো দু' টুকরো গোস্ট দিতে দিতে বলছিল, ও, তার লাইগাই তাইলে সকাল বেলায় অমন কইরা কানিছিলেন আপনে?

এ প্রশ্নে হকচকিয়ে ওঠেন ডঃ আমেদ। তা হলে তাকে কীদে দেখে ফেলেছে মৃত্যুতাক! থাকগে, তাতে আর কি হবে? অমন যে শাহান শা বাদশা শাজাহান তাঁকেও কত কান্দতে হয়েছে শেষ জীবনে। দৃষ্টান্ত বাদশার দৃষ্টান্তের একটা বড়ো কারণ তাঁর হতভাগিনী কন্যা জাহানারা। বিবি মমতাজকে হারিয়ে তাঁরই গড়া মমতাজমহলেব ছায়া দেখে যমুনার জলে, চোখের জলে ভেসেছেন বাদশা। জাহানারার জ্যোত মূর্তি সব সময় সামনে থেকে তার চোরে কম কান্দেন নি শাজাহান। সেই দিক থেকে বিচার করতে গেলে দৃষ্টান্ত বাদশার অভাব নেই এই জগতে। এমন কি এক এক সময় নিজেও একজন দৃষ্টান্ত বাদশা বলেই মনে হয় অধ্যাপক খলিল আমেদের।

সে সব ভাবতে ভাবতেই ভোজন পর্ব শেষ করে উঠে পড়েন আমেদ সাহেব। মৃত্যুতাককে বিদায় দিয়ে তিনি গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে শুয়ে পড়েন। খাওয়া দাওয়ার পর একটা চুরুট ধরিয়ে টানতে টানতে গিয়ে শুরুর পড়া এবং আখ ঘটটাক গড়াগড়ি দেওয়া, এ তাঁর অনেক কালের অভ্যাস।

ঐ আখ ঘটটার মধ্যেই নিজের খাওয়া দাওয়া শেষ করে অন্যান্য দিন যেমন সব গুরুগাছ করে সে চলে যায় সোঁদনও তেমনি বেলা দুটো নাগাদ চলে গেছে মৃত্যুতাক।

বাইরে থেকে দরজাটা আবজানো থাকে। ভয়ে কিছু নেই। কড়া পাহারাদার থাকে বারান্দায়। অধ্যাপকের প্রিয় কুকুর জিল সেই ভেজস্বী প্রহরী। জিল সর্বক্ষণ তার চোখ কান খোলা রেখে বারান্দার বসে থাকে। লোহার বেড়ার ভেতর দিয়ে সে সব দেখে। এমন কি কোনো চেনা মানুষ এলেও দরজার সিঁড়িতে পা ফেলবার আগেই সে এমনি জোব চোঁচিয়ে ওঠে যাতে যে কোন লোকের পক্ষেই ভয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়, তার প্রভুকেও ছুটে না এসে আর উপায় থাকে না। তবে এমন ঘটনা খুব কদাচিৎই ঘটে। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে মাঝে মাঝে কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী ছাড়া পল্টনে ডঃ খলিল আমেদের বাড়িতে কেউ বড়ো একটা আসে না, তাঁর নিরালা বাড়ির নিবিড় শান্তি কেউ ভাঙতে চায় না।

কিন্তু সোঁদন জিলের আকস্মিক চিৎকারে গোটা পল্টন অশ্রুলাই যেন কেঁপে উঠলো।

জুলাই মাস। ভরা বর্ষাকাল। একটু আগেই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। অধ্যাপক

আমেরা সেই বন্দিরা সময় হয়তো তাঁর মনের চরমটের মতো এ্যাসট্রেতে টিপে রেখে দিয়ে ভাবছিলেন আহানারার কথা, এমনি বর্ষার আহানারার একা শূন্যে শূন্যে কী ভাবে তাঁর প্রেমাম্পদের কথা ভাবতেন সেই কথা। তারপর বন্দির আমেরা তিনি হঠাৎ একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলেন।

ঠিক সেই সময়েই জিলের প্রচন্ড হাঁকে ডঃ আমেরাকে শয্যা ছেড়ে বারান্দায় আসতে হলো। আসতেই চপ্প হসে গেল জিল।

ব্যাপারটা কিছই নয়। ডাক্তারপাওন এসেছে। ফরেন মেলের একখানা নীল খাম অধ্যাপকের হাতে তুলে দিয়ে পিওন বিদায় নিয়ে গেল। শাবার সময় বলে গেল, ইউনিভার্সিটি বন্ধ না থাকলে সেখানেই তাঁর সব চিঠি দিয়ে আসা ভালো। যে বাধা কুসুর।

কথাটা ঠিক বলে গেল পিওন। তবে জিল এমনি কড়া পাহারার থাকে বলেই নিশ্চিন্তে একটু ঘুমেনো যায়। যে দিনকাল !

মনে মনে এমনি দু' চাবটে কথা ভাবতে ভাবতেই খামখানা উল্টে পাশে একবার দেখলেন অধ্যাপক। কানাডার সীল এবং টিকিট রয়েছে খামের ওপর। কিন্তু সুন্দর ঐ দেশ থেকে কে তাঁর কাছে এমনি একখানা জরি চিঠি লিখবে বা লিখতে পারে তা ভেবেই পাচ্ছেন না ডঃ আমেরা। আর ভেবে সময় নষ্ট না করে নিজের ইঞ্জি চেয়ারখানায় গিয়ে বসে

পড়েন তিনি এবং খামের মূখ্য ছিড়ে ফেলে চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করে দেন।

আরে এ যে চপ্পার চিঠি! চপ্পা এ্যালেন কানাডা থেকে চিঠি লিখেছে। কবে গেল ওরা কানাডায়?

চপ্পা লিখেছে, সাত মাস হলো আমরা কানাডায় চলে এসেছি। আসার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে আসা সম্ভব ছিল না, কারণ কবাচী থেকে আমরা আর ঢাকার ফিরে মাই নি। তবে করাচী ছাড়বার মাস তিন আগে তোমায় একখানা চিঠি দিয়েছিলাম, ক্ষমা চেয়ে। আমি সে চিঠির উত্তরেব আশার আশায় মাসের পর মাস কাটিয়ে শেষটার দিবাশ হয়ে গিয়েছি। কবাচীর হোটলে আমাদের কানাডার ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম যাতে তোমার কোনো চিঠি এলে কুইবেক আমার হাতে সে চিঠি এসে পৌঁছতে পারে সেই আশঙ্কায়। কিন্তু সবই ব্যা। বঝতে পারলাম তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারলে না। না পারবারই কথা। যে অন্তহীন ভাজোবাসা দিয়ে তুমি আমায় নিজের করে নিয়েছিলে তাব সত্যি সত্যি তুলনা হয় না। বিপুল পান্ডিত্যের অধিকারী তুমি। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো অধিকার তুমি আমার দিয়েছ, অমন বিরীত মানুষকে তুমি ধলে সম্বোধন করতে বাধ্য করে। মনে করেছিলাম, তুমি যখন আমার ক্ষমা করতে পার নি তখন এ চিঠি আপনাকে সম্বোধনেই লিখবো। কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গাই মনে হলো তা' হলো তুমি ত্রীমখ মূখ্য পাবে। তাই যে ভাবে তুমি আমায় তোমাকে ডাকতে অভ্যস্ত করেছিলে সে ভাবেই চিঠিখানা লিখছি।

সুদীর্ঘ এই পত্রে তার পরেই চপ্পা লিখেছে তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সুখ-পাতের কথা এবং অধ্যাপক খালিল আমাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা। সে বলছে, আল্লা এই সুন্দর দেশ থেকে তোমায় চিঠি লিখতে শব্দ করে ফেন মনে হচ্ছে, অতীতের স্মৃতি-গুলো সব হৃদয় থেকে পড়তে চাইছে। এতখানো ভাবতে সত্যি ভাবি ভালো লাগছে যে, তোমার ক্লাসে প্রথম দিনই আমার ধারণা হয়েছিল, আমার ওপর তোমার স্নেহ-দৃষ্টি পড়েছিল। লক্ষ্য করতাম, তুমি ক্লাসে ছেলে-মেয়েদের যখনই প্রশ্ন করতে আমায় প্রশ্ন করতে কোনো দিনই ভুল করতে না। আব আমায় এমন সব জোজা সোচ্চা প্রশ্ন করতে যাব উত্তর দিতে আমায় একটুও ভাবতে হতো না। মাঝে মাঝে তুমি আমার আমদের পরীক্ষাও নিতে। ব্রীড-মতো লেখার পরীক্ষা। একটি বা দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিতে। ক্লাসের শেষে উত্তরপত্র-গুলো বাড়িতে নিয়ে যেতে। পরের ক্লাসে খাতাগুলো যখন ফেরত দিতে আমায় বাড়ায় দেখতে পেতাম তুমি সুন্দর করে সব উত্তর লিখে দিয়েছ। এমনি করেই ধীরে ধীরে আমার মনকে তুমি তোমার মনের কাছে টেনে

সব মানুষের জন্য সব বয়সের জন্য

সুলেখা

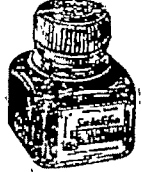
সুলেখা
স্পেশাল
পার্মানেন্ট :
ব্লু-ব্ল্যাক * রয়েল ব্লু
ব্ল্যাক * ব্রাউন
ওয়াশেবল : রয়েল ব্লু
রেড * গ্রীণ



সুলেখা
একজিকিউটিভ
পার্মানেন্ট :
ব্লু-ব্ল্যাক * নেভি ব্লু * সুপার-ব্ল্যাক
ওয়াশেবল : রয়েল ব্লু * এয়ারেবল গ্রীণ
কার্ভার রেড



সুলেখা
ডেনারেল
পার্মানেন্ট : ব্লু-ব্ল্যাক
ওয়াশেবল :
রয়েল ব্লু * রেড * ব্ল্যাক



ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ের
গৌরব-ধন্য

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ,
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

নিবেছ। কিন্তু আশ্চর্য প্রথম একটা বছরে তুমি আমার ভেতর কখনো একটি কথাও বলেছ এমন মনে পড়ে না। বোধহয় কথা বলতে তোমার খুব লজ্জা হতো।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হলো পরের বছর। সে কথাই চম্পা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছে এর পরে। লিখেছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনটির কথা ভুলবো না। ঈসের ছুটির কয়েকদিন আগের কথা। আমার তখন সিল্লথ ইয়ারে। একটু বোধহয় লেট হয়েছিল আমার সেদিন—পরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই চমকে গেলাম। তোমাকে যেন হঠাৎ সেদিন মনে দেখাছিল। এতদিন যাকে খুবই গুরুগম্ভীর বলে মনে হয়েছে, সেদিন বেশ হাসিখুশি। ছাত্রছাত্রীরা খুব মন দিয়ে তোমার কী কথা যেন শুনছিল। হঠাৎ হো-হো করে তারা সবাই হেসে উঠলো। দেরিতে ক্লাসে আসায় একেই আমি অপসৃত—তাব ওপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই হাসির বহর, কেমন যেন সঞ্চিত হয়ে পড়লাম। তুমি রেজিস্ট্রার বইখানা খুলে জিজ্ঞেস করলে, কী নাম তোমার? নাম বলতেই তুমি বোধহয় আমার উপস্থিতিটা নোট করে নিলে, কিংবা আগেই প্রজেক্ট মার্ক করা ছিল, ও একটা হলনা। তুমি কি আর আমার নামটা জানতে না!'

এরপরেই চম্পা সিল্লথ ইয়ারে অধ্যাপক খিলি আমেরের পড়ানোর একটা বিশেষ ভাগিয়ার কথা ভুলেছে। বলেছে, 'তারপর আবার শব্দ করলে পড়ানো। সেদিন কী পড়াছিলে স্পষ্ট মনে নেই, তবে তোমার 'দুঃখী বাদশা' খিসিসের বইখানা তখন সবে বেরিয়েছে—বোধহয় সে বইখানা থেকেই আমাদের কিছু বলছিলো। খুব সম্ভব জাহানারা বেগমই ছিল তোমার পড়বার বিষয়, তাই সে নামটা যেন এই মুহূর্তে আমার মনে বাজছে। তবে সেটা আমার কাছে বড়ো কথা নয়, বড়ো মন হয়েছিল তোমার সেদিনের পড়ানোর ভাগিয়ার। সত্যি সত্যি একটা নতুন কিছু পেয়েছিলাম তোমার কাছে। শব্দমাত্র কি গলার স্বর, কলাব ভাগিতেই সেই নতুনদের ঘাভাস ছিল? না কি অন্য কিছুতেও?'

এ পর্যন্ত একটানা পড়েই একবার দম নিলেন ডঃ আমেদ। তাঁর মনে হলো, ইতিহাস যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলে চলেছে। সে ইতিহাস তাঁর ইতিহাস, চম্পার ইতিহাস। তার বিবরণ প্রসঙ্গেই চম্পা লিখেছে, 'এরপর থেকে উদ্ভূত হবে থাকতাম তোমার ক্লাসের প্রতীক্ষায়। কী করে যে একটি ঘণ্টা কেটে যেতো বসন্তে পারতাম না। ক্লাসের বাইরে দেখা হবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু প্রায়ই মনে হতো যদি একটু আলাপ করা বসযোগ পেতাম। সে বসযোগ এলো এবং অনতিবিলম্বেই এলো।'

এবার তারই বর্ণনা দিচ্ছে চম্পা। সে বলেছে, 'ফিরেদে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা দুই বন্ধু—আমি আর আয়েসা। তুমি আমাদের সামনে দিয়েই চলে যাচ্ছিলে। আমার সানিলী

গারে পড়ে ঘেঁরে, আলাপ জমালো। তোমার সঙ্গে। বললে, পরীক্ষা তো এসে গেলো স্যার, কিছু সাজেশন দেবেন না? কি কি পড়বো স্যার একটু বলুন তো! আমি চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়েই ছিলাম। অথচ বাম্ববীর প্রশ্নের জবাবটা যেন তুমি আমাকেই দিলে। আমাকে লক্ষ্য করেই তুমি বললে, বেশ যেও একদিন, পড়াশুনা সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।'

'যাব? আমিও?—সেই মুহূর্তে এমনি একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল তার মনে, চম্পা লিখেছে।

আব ঠিক তখন আয়েসা তাকে বললে, 'এই যা, তোকে নিয়ে আব পারা গেল না। তুই সলো থাকলে, আমি লক্ষ্য করছি, তাকে ছাড়া আমাকে যেন কেউ দেখতেই পায় না। অথচ বলতে নেই, আমাব দশাই চোখাবাখানা তো অন্তত তাকে আড়াল করে বাধারই মতো।'

পড়তে পড়তে হাসি পেয়ে যায় অধ্যাপক আমেরের। কী সব লিখেছে চম্পা! আবার বলেছে, 'আমরা দু' জনেই খুব হেসেছিলাম। কিন্তু আয়েসা সত্যিই তোমার কাছে। প্রথম দিন একাই গিয়েছিল এবং আমাকে একদম না জানিয়েই। সে কথা অবশ্য তুমিই আমাকে পরে বলেছিলে।'

অধ্যাপক ডা° কিভাবে চম্পাকে বলেছিলেন এবং তা নিয়ে তাদের দু' জনের মধ্যে কী কথা হয়েছিল এরপর সেই বর্ণনাই রয়েছে চিঠির মধ্যে। 'আয়েসার সঙ্গে তুমি সেদিন কেন এলে না পল্টনে আমার বাড়িতে, বল তো?—ক্লাসের বাইরে হঠাৎ একদিন মুখো-মুখি হতেই এই প্রশ্ন করলে তুমি। আমিও অরাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি? করে? তুমি ব্যাপারটা তখন খুলে বললে এবং সেই সংগে জানালো, আমন্ত্রণটা তুমি আসলে আমাকেই করেছিলে, আয়েসাকে নয়।'

ডঃ আমেরের সে মন্তব্যের পর চম্পার মানসিক অবস্থা যে সেই মুহূর্তে কী দাঁড়িয়েছিল তাই সে বলার চেষ্টা করেছে চিঠির পরের অংশে, 'না, সে অনুভূতির কথা ভুলবো না। আর যা শব্দ অনুভবই করছি তা যে সত্যি একভাবে মিলে যাবে তা তো ভাবি মি। তাই কথা দিলাম তোমাকে, হ্যাঁ যাবো—কালই যাবো। কোথায় যাবো, কখন যাবো তুমিই সব বলে দিবেছিলে।'

এরপর আরো বলেছে চম্পা, সেদিন গোটা রাতটা প্রায় জেগেই ছিলাম। কী এক অস্বস্তি বারবারই চোখের ঘুম ভাঙিয়ে বেড়াচ্ছিল। মাঝে মাঝে শরীর গরম হয়ে উঠছিল—আবাব বেশ বসন্তে পারছিলাম, মাকে মায়ের শব্দে কেমন যেন ঠান্ডা নৈমে আসছে। ঐ প্রচণ্ড অস্বস্তির মধ্যেও সময় সময় আবাব একটু যেন সুখের আমেজও অনুভব করছিলাম।—একেই কি বলে ভালোবাসা, না কি আর কিছু! আমি কি কাউকে ভালোবেসে ফেললাম? জাহোবাসার কষ্টপার সেই বোধহয় আমার

প্রথম স্পষ্ট অনুভূতি। বেশ বসন্তে পারছিলাম, আমার মনে একটা ডর-হাসের ঝড় শব্দ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ভালোবাসার যা যা লক্ষণ সবই আমার মধ্যে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে।'

তারপর কি হলো। পরদিন দায়িত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো কি করে? সেই সুখ-বিহবল অভিসারের বর্ণনাই তারপরে প্রকাশ পেয়েছে চম্পার পরে। সে লিখে চলেছে, 'পরদিন বিকেলে সেই প্রত্যাশিত লগ্ন এলো। আমি বেশ সেরেছিলাম মনে পড়ে। আমি বরাবরই কম সাজতাম বলে আয়েসা আমার টিটকির দিতো। বলতো, বুকোছি, বেশি সাজলে বেশি লোকের চোখ পড়ে যান, এই ভয় তো তোর। তবে এও বলে রাখি, তেমন ভয়ব তোর কারণ নেই, কেন না তুই এমন কিছু আহামরি সুন্দরী নোস।'

এক খুস্টান ব্যারিস্টারের মেয়ে চম্পা মন্ডল এবং ধনী ব্যাপারী আমের গণির মেয়ে আয়েসা বাতুলের মধ্যে যত ভাবই থাকুক ডঃ আমেদ তাকে নিয়েই যে ওদের দু' জনের স্নেহেরিষাটা তা' বিশেষভাবেই অনুভব করতেন। কাজেই যাতে তাঁর সঙ্গে দুই বাম্ববীর কখনো একত্রে দেখা না হয় তেমনভাবেই প্রাণ কবে চলতেন তিনি। চম্পার প্রথম অভিসারের বিবরণ পড়তে শব্দ করে খিলি আমেদ থমকে যান। স্মৃতির বেড়াঙ্কালে তিনি যেন জড়িয়ে পড়েন।

চম্পা আরো স্মরণ করেছে তার অবি-স্মরণীয় সেই সন্ধ্যার অভিসারকে। স্মৃতি-চারণার সে বলেছে, 'বাম্ববীর কথায় আমি হাসতাম। সেদিনও হেসেছিলাম আকাশ রঙের একটি জরিপাড় টাঙাইল শাড়ি পরিপাটি করে পরতে গিয়ে। ঐ শাড়িটি নাকি আমাকে খুব মানায়, বলতো বাম্ববী। তার সঙ্গে পরলাম ম্যাচ করা হাতকাটা ব্লাউজ। নিজেই আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে যা কিছু করার সাধ্যমত করলাম। রাস্তায় নেমে নিজেই অপরিচিত মনে হচ্ছিল নিজের কাছে। তুমি কিন্তু আমাকে বেশ শানিকটো দূর থেকেই চিনে ফেলেছিলে। আমিও চিনতে পেরেই এগিয়ে এসেছিলাম তোমার দিকে মমতাজ হোটেলের দক্ষিণ পাশ থেকে। সেখানেই তুমি অপেক্ষা করতে বলেছিলে আমাকে। অপেক্ষা আমাকে করতে হয় নি মোটেই। দু' জনেই যে আমরা চম্বকের আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। দু' জনেই একটু আগে আগেই এসে পড়েছিলাম নির্দিষ্ট সময় থেকে। আমার ঠিক পরে পরেই তুমি এসে-ছিলে তারপর আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম সদর ঘাটে। সেখানে একটা জয়গর বাংলা ভাষার শহীদদের স্মরণে, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর স্মরণে বড়ো একটা সভা চলছিল। বরকত, সালাম ও রফিক প্রমুখ রক্তের জঘদানি উঠাছিল আকাশ ভেদ করে। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তুমি বলেছিলে, একেই বলে ইতি-হাসের বন্ধন—এ থেকে ব্যক্তি, সমষ্টি ও জাতি এমন কি জগতেরও মুক্তি নেই। তোমার সেই

কথাটি আমার আর ভালো লেগেছিল, তাই
আজো তা ভুলতে পারি নি।

ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ খলিল আমেদ
আশ্চর্য হয়ে গেলাম চম্পার অশ্রুত স্মরণ-
শক্তি পরিচয়। প্রায় বছর চার আগের একটি
ছোট্ট কথাকে সে অবিকলভাবে মনে রেখেছে এ
নিশ্চয়ই খুব প্রশংসার। আর এ যে ডঃ
আমেদের একেবারে জীবনভরুর কথা। তাই
আরো বেশি আগ্রহের সঙ্গে তিনি চম্পার
চিঠিখানার শেষ অংশটুকু পড়তে থাকলেন
চরুট টানতে টানতে। চরুটেব খোঁয়ায়
আজ্ঞে অধ্যাপক তখন নিজের ইতিহাসের
একেবারে মনোমুগ্ধ, খুব কাছাকাছি।

সেই স্মরণীয় দিনটির কথা চম্পা আরো
জানাতো, সভা শেষ হবার আগেই বুদ্ধিগঙ্গার
তীব্র ধরে ধরে আমরা অনেকটা এগিয়ে
গেলাম। সেই সময়ের মধ্যে তুমি তোমার
মনকে অনায়াসেই খুলে ফরছ আমার কাছে,
কিন্তু আমি তা কিছুতেই পারছিলাম না
লক্ষ্যব। ইচ্ছে তত্ত্ব আগমন মনের হাঁড়িতে
ভাব তখন টগবগ করে ফুটছিল। কুতাবী
অধ্যাপক তুমি, ইতিহাসের অসংখ্য চারুক
তুমি বিশ্লেষণ করেছ। কাজেই আমার চোখ-
মুখ দেখেই তোমার মনকে দিয়ে আমার
মনকে তুমি বেশ পরিস্কারভাবেই বকে নিজে-
ছিলে। অল্প পরেই আমিও তা টের পেয়ে-
ছিলাম সদর ঘাটের নিরালায় একটি খালি
বেশিগতে গিয়ে পাশাপাশি খুব কাছাকাছি হয়ে
বসবার যখন আমরা সুযোগ পেলাম। সেখানে
বসেই তোমার সঙ্গে 'তুমি' সম্বোধনে কথা
বলতে আমার তুমি এমনভাবে চাপ দিলে যে
আমি আব অসম্মতি জানাতে পারলাম না।
তারপর রাত একটু ঘন হয়ে উঠলে একটা
ঘোড়াব গাড়িতে চড়ে আমরা যখন বাড়ির
দিকে রওনা হলাম তখন তো আমি সম্পূর্ণ-
ভাবেই মত্তচালিত। তুমি ওঝা হয়ে গিয়েছিলে
বেশ কিছুক্ষণের জন্যে, আর আমি সাপ।
ওঝা প্রভাবে সাপ নিশ্চর। সত্যিকথা
বলতে কি, অশ্রুত এক আনন্দে প্রাণব বোধ-
হব তখন জানই প্রায় লোপ পেয়েছিল।
বাড়িতে যখন ফিরলাম তখন বেশ রাত।
আর কোনোদিন এতো রাত হয় নি বাড়ি
ফিরতে। তাই বেশ দু-চারটে কথাও শুনতে
হয়েছিল। শেরটায় তোমার স্পেশাল ক্লাসের
কথা বলে বেহাই পেয়েছি। তেমনি স্পেশাল
ক্লাসের ডাক কোনো দিনই আমি উপেক্ষা
করতে পারি নি।

সেই চম্পা কী করে অধ্যাপক আমেদকে
ছেড়ে যেতে পারলো, ভুলে থাকতে পারলো
তা খুব আশ্চর্যের বৈ কি। কিন্তু আশ্চর্যের
হলেও অসম্ভব কিছু নয়। বিশ্ময়কর অনেক
ঘটনাই ঘটে বসে পরিবেশ অনুসারে। সে
কথাই প্রকাশ পেয়েছে চম্পার পত্রের উপসংহারে
যেখানে সে লিখেছে, 'প্রায় বছর দুই ধরে
গভীর ঘনিষ্ঠতার পর কি করে আমি তোমার
কাছ থেকে অনেক দূরে ছিটকে গেলাম তার
কিছুই তোমার অজানা নেই। বরং বলবো,
তুমি নিজেই তেমনি একটা অকথা সৃষ্টি

করেছিল আমার জন্যে। জর্জ এ্যালেনের সঙ্গে
আমার যখন বিয়ে ঠিক হলো সব কথাই আমি
তোমাকে খুলে লিখেছিলাম। আমার বিয়ের
অনুষ্ঠানে তুমি উপস্থিত হতে পারো নি।
মানসিক কারণেই হয়তো তোমার পক্ষে তা
সম্ভব হয় নি। তাই করাচী থেকে যা কিছু
ঘটেছে তার জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে
এবং আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর কথা জানিয়ে
তোমার একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। সে চিঠি
পেয়েছ কি না জানি না, অন্তত তার কোনো
জবাব যে আমি পাই নি তা আগেই লিখেছি।
নিশ্চয় তুমি ভুলে যাও নি, দু' বছর আগে
কানাডা থেকে পাঁচ জনের এক ইতিহাস
অধ্যাপকদের শ্রুদ্ভেজা মিশন' পাকিস্তান সফরে
এলে তাদেরকে পূর্ব বাঙলার ঐতিহাসিক
স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখাবার জন্যে তুমিই
আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-প্রতিনিধি হিসেবে
সহায়ক দলে পাঠিয়েছিলে। সরকারের প্রতি-
নিধি হিসেবে আরো একটি মেয়ে ছিল আমা-
দের দলে। কিন্তু বেশি বাহবা পাবার জন্যেই
হোক কিংবা সরকারী প্রতিনিধির কর্তব্য
হিসেবেই হোক শ্রুদ্ভেজা মিশনের নেতাকে
নিজেই প্রায় সর্বক্ষণ সে ব্যস্ত থাকতো।
এদিকে মিশনের কনিষ্ঠতম সদস্য তরুণ
অধ্যাপক জর্জ এ্যালেনের চোখ যে আমার
ওপর বিশেষভাবে পড়ে গিয়েছিল প্রথম দু'
দিনের মধ্যেই আমি তা বসতে পেরেছিলাম।

তারপর? 'তারপর' সাত দিনে পূর্ববঙ্গ
সফর শেষ করে ঢাকায় ফিরে এসে হঠাৎ এক-
সময়ে এ্যালেন আমার অসম্মতিতেই জিজ্ঞেস
করে বসলো আমি অন্য কারো সঙ্গে 'এনগেজড'
কি না এবং যদি না হয়ে থাকি তাহলে সে
আমার পাণি-প্রার্থী। অকস্মাৎ তার এমন
কথায় আমি হকচাকিয়ে উঠেছিলাম। দু' দিন
সময় নিয়েছিলাম তার কথার জবাব দেবার
জন্যে। দু' দিন দু' রাত অনেক ভেবেছি,
বিশেষ করে তোমার কথাই ভেবেছি। তা
ভাবে গিয়ে বার বার কেবল মনে হয়েছে
বিষয়ে তোমার মন সেই, তুমি ইতিহাসেই
ডুবে থাকতে চাও, কিংবা কোনো নতুন ইতিহাস
সৃষ্টি করার তোমার অভিলাষ। তবু দু'-একবার
আমার মনে হয়েছে, চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তের
জন্য তোমার সঙ্গে আমার একবার কথা
বলে নেওয়া উচিত। কিন্তু সত্যি বলছি, দু'
হাতে আমি এতটুকু সাহস কুড়তে পারি নি
যাতে এ প্রসঙ্গ নিয়ে তোমার কাছে গিয়ে কথা
ভুলতে পারি। মাকে সব বলেছিলাম, মা-বাবা
দু' জনেই মত দেওয়ার অজ্ঞানার সম্মুখে
কাঁপিয়ে পড়লাম আমি, এ্যালেনের প্রস্তাবে
সম্মতি দিলাম। সেই সবসেই আজ আমি
কানাডায়, কুইবেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ অধ্যা-
পক জর্জ এ্যালেনের সঙ্গে সহ-অধ্যাপনায়
নিযুক্ত। আমরাও তোমার যতোই ইতিহাসের
বন্ধনে বাধা পড়ে গেছি। আসলে মানুষ মাত্রই
তো ইতিহাসের অংশ। সম্রাট শাহজাহান হওয়া
সবার পক্ষে সম্ভব হয় না বলেই সবাই ইতি-
হাসের পাতায় স্থান পায় না এবং তোমার
মতো পশ্চিমের গবেষণার বিষয় হতে পারে

না। তাহলেও তোমার কাছ থেকে বাচ্ছ
হয়ে এত দূরে চলে এলেও তোমার আমি
যে ভুলতে পারছি না, এতো ইতিহাসের
বন্ধনের অর্থও তুমি-আমি মিলে লে ইতিহাস
সৃষ্টি করেছি, সেই দৃঢ় শৃঙ্খল-তেনারই এ
স্পষ্ট পবিচয়। আশা করবো সেই চেতনার
বশেই তুমিও আমার চিঠি লিখে তোমার
প্রাণের চম্পাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করবে।

এবপরেই কুশল কামনা জানিয়ে চিঠি শেষ
করেছে চম্পা। এদিকে চিঠি পড়া শেষ করে
ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চরুট টানতে
টানতে চোখ বুজে কি ভাবতে শুরু করে
দেন ডঃ খলিল আমেদ।

সংসারে ঘরে ঘরেই তো দুঃখ বাদশ্য
ছড়াছড়ি। দুঃখের ব্রহ্মকক্ষের থাকতে পারে,
কিন্তু দুঃখী সবাই। সম্রাট শাহজাহানও
দুঃখী, সম্রাটকন্যা জাহানারাও। অধ্যাপক ডঃ
আমেদ চোখ বুজে সে কথাই ভাবছিলেন।
তিনি নিজেও কি কম দুঃখী? তাব চম্পার
দুঃখেরও শেষ সেই, কানাডার প্রাচুর্য মতো
গিরেও নয়। মনের ষিঁদে বিষম বিদ।

এমনি চিন্তার জাল বুনতে বুনতে
ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ খলিল আমেদ কখন
যে তাঁর ইতিহাসের গবেষণা গ্রন্থ 'দুঃখী
বাদশা' বইখানা হাতে ভুলে নিয়েছেন তা তাঁর
শেয়ালাই নেই। তিনি ভাবছিলেন, সুখে
যেখানে অভাব, সেখানেই দারিদ্র্যের দুঃখ।
'দুঃখী বাদশা'র পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে জাহানাবা
প্রসঙ্গে শেষ কথার আসতেই অধ্যাপক লক্ষ্য
করলেন চিন্তা তাঁর ঠিক পথেই চলছে। আপন
সমাধি-লিপিতে খোদিত সম্রাটনন্দন জাহা-
নারার উদ্দ কবিতায় লেখা রয়েছে :

বহু মূল্য আচ্ছাদনে কবো না
সম্মিত কতু সমাধি আমা,
কৃপ শ্রেষ্ঠ আবরণ-জাহানারা
দীনা এই সম্রাট কন্যার!

আঙুলেব চিহ্নে বইটাকে বন্ধ বরং স্প্রেণ
আবার কি চিন্তা শূন্য করতেই ছিল হঠাৎ
চোঁচেরে উঠলো ঘেউ, ফেউ করে।
অধ্যাপকের রেন থেকে ভাবনার অন্তর্ধারে
তিনি দেখলেন মস্তাক এসে গেছে।
সম্মা হয়ে গেছে তাহলে!

বিবাহে • উৎসবে
উপহারে • নিত্য প্রয়োজনে
PHONE: 67-4441
নিউ গুয়াই ব্রাদার্স
কেন্দ্রীয় এণ্ড জেনারেল স্টোর
১২০, নেতাজী সুভাষ চৌধুরী রোড, বেনারস

এ জন্মের দেনা

[১৭০ পৃষ্ঠার পর]

আদিত্যের বাবা স্পষ্ট বুঝতেন আদিত্য মিথ্যে বলছে। শান্তিনাথের ঘাণ-শক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল বলে তিনি ঠিক গম্ভীর পেতেন। শান্তিনাথ একটু আহত হয়ে বলতেন, তাহলে যাবে না?

না। আদিত্যের উত্তর বরাবরই কঠিন ও রুঢ় ছিল। আচ্ছা বেশ। এর বেশি আর কোন কথা বলা শান্তিনাথ ব্যা-জ্ঞান করতেন। উনি আর দাঁড়াতেন না। এরকম ব্যবহারের পেছনে আদিত্য কয়েকটি যুক্তি খাড়া করেছিল। আদিত্যের মা যে অতো বকবক করতো, অতো কষ্ট পেত, রোগে, বাগে জীর্ণ হয়ে গিয়ে ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাচ্ছিল, এর জন্যে আদিত্য তার মায়েরই মত তার বাবাকেই দায়ি করতো। তাব মায়ের প্রত্যেকটি আগুন-সে-কা কথা আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে তার অবাক করে বলতো, তুমি, তুমি। তোমার জন্যেই আমার, আমাদের এই দুর্গতি। সেই চোন্দ বছর থেকে—। সুতরাং একটা কুশিষ্ট অপরাধবোধ শান্তিনাথের নবাবরই ছিল। আর আদিত্যেরা তার সুযোগ নিতো পূর্ণমাগায়।

আদিত্যের বাবা ঐ অপরাধবোধের জন্যে কোনদিন ছেলের সঙ্গে ঠিক বাবাব মত আচরণ করতে পারেন নি। আদিত্যের বাবা কখনো কখনো জ্বারে আদেশ করতেন না যে তানয়, কিন্তু তাঁর আদেশ তাঁর দুর্বলতার জন্যে অলঙ্ঘনীয় বিধান হয়ে আদিত্যদের ঘাড়ের পড়ে নি। আদিত্য দেখেছে তার বাবা তার মায়ের নামে এককুড়ি নিষেধ করার পক্ষমুখ্যেই স্নেহ দিয়ে, যুক্তি দিয়ে তার মাকে বুঝতে চাইতেন। গভীর নৈরাশ্রমিথিত কণ্ঠে বুকেব সেই অস্তুত ব্যাখ্যার হাত বোলাতে বোলাতে বলতেন, এই জন্যে, এই জন্যে আমি কিছু করতে পারবাম না। আর ও-ও জ্বলে-পুড়ে মল। কি পেল ও আমাব কাছ থেকে? কিছুই না। আদিত্যের বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন।

আদিত্যের বোঁ যদি তার শব্দবৃদ্ধের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে থাকে তবে তাকে ঘোষ দেওয়া যায় না। এই সর্বশেষ ভাড়াটে বাড়িতে এসে প্রত্যেকদিন সকালে আদিত্যের মা চেরা বাঁশের মত গলায় বাড়ি ফাটিয়ে ফেলতো। উপলক্ষ্য কখনো থাকতো। কখনো থাকতোই না। উপলক্ষ্য উপস্থিতমত তৈরি করে নেবার প্রতিভা মনোরমার সেই সময় আরও এসেছিল। পাড়াপ্রতিবেশীবা প্রথম প্রথম যন্ত হয়ে উঠতো চাঁককারে, ভাবতো ভায়া-নিশ্চয় আদিত্যদের গোয়ালে আগুন লেগেছে। তারপর যখন তারা

উপলক্ষ্য দিলে দেখে বসন্তো গোয়ালে নয় এদেব কথায়, এদের চালচলনে, এদের ব্যবহারেব জামা-কাপড়ে দাউ দাউ আগুন জ্বলে গেছে, তখন নিজেদের ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যে আস্তে আস্তে সরে যেত। যাকে নিয়েই ঝগড়া বাধুক, অথবা কোন-কিছু না নিয়েই ঝগড়া বাধুক আদিত্যের মা সমস্ত ঝগড়াকেই শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবে শান্তিনাথের দিকে তাড়িয়ে যেত। আর আদিত্যের বাবা 'গ্রাহি গ্রাহি' রব তুলে পরিগ্রাণ পাবার রাস্তা মরায়ার মত হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতেন। তিরতিরিক্ত হয়ে মাগী জ্ঞানিয়ে খেলে ওই একটি বাক্যের স্বারা মনোরমার সমস্ত আচরণ, সংসারেব খুঁটিনাটি সমস্যা সম্বন্ধে তাব প্রাণপাত পরিগ্রাণ সমস্ত ভুলে গিয়ে তাব সম্বন্ধে রায় দিয়ে ফেলতেন শান্তিনাথ। এই একটি বাক্যই ছিল যত। আর মনোরমা নিজেই ছিল আগুন। দাউ দাউ অগ্নিকান্ড শব্দ হয়ে গেলে সামলাতে না পেরে, কৌচাব কাপড় মাটিতে লোটাতে লোটাতে শান্তিনাথ নিজেই ঘরে আসন করতে বসতেন। আসনে পেটের উপকার হয়, পয়সা খরচও এতে নেই অতএব টিকে থাকবার জন্যে আসনটা প্রতিদিনই করতেন শান্তিনাথ। কিন্তু এই-সব বিশেষ মনোভবে আসনটা আর ব্যায়ামের পূর্বসূরী পড়তো না। আসনটা এ সময় হত তাঁর আশ্রয়। শীর্ষাসন, কুম্ভকাসন ইত্যাদি। আসনের মধ্যে শান্তিনাথ নিজেকে ধ্যানস্থ করার চেষ্টা করতেন। উনি বুঝাই ভাবতেন এইভাবে খানিকটা আত্মরক্ষা করতে পারবেন।

কপাট ভেঙিয়ে দিতেন। জ্ঞানস্থ বন্ধ করে দিতেন। তবু জানলার ফুটো দিয়ে, কপাটেব একচিলতে ফাঁক দিয়ে বুলেটের মত ঝাঁকে ঝাঁকে কথা এসে শান্তিনাথকে বিদ্ধ করতো। আদিত্যের মা ঝগড়ার কেন্দ্রস্থল রাজ্যধবেই বসে থাকতো না। শান্তিনাথের ভেজানো দরজার সামনে এসে আদিত্যের মা সমানে দাপাতো। শাপমুনি করতো। মাথা ঠুকতো দেয়ালে। আর আদিত্যের বাবা মনুষ্টাকে যথা-সম্ভব কঠোর করে, মনকে যথাসম্ভব সংযত করে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে একের পর এক আসন করে যেতেন।

মুখুজ্যোগিনীর বাড়ি থেকে আদিত্যেরা যে পালাগিনীর বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে উঠে এসেছিল, এখানেও শান্তিনাথ তাঁর অভ্যস্ত নিয়মে একটি গোলামাল পাঠিয়ে ফেলিয়েছিলেন। এর আগে আদিত্য যখন ছোট ছিল, স্ত্রান-বৃদ্ধি সবে যখন একটু একটু খুলছে

সেই সময় আদিত্য তার বাবা আব মায়ের ঝগড়ার সময় শুনেছে তার বাবা নাকি কোন কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেন না। সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে এমন একটু ছিদ্র রেখে দেন যে, সেই চুল-পরিমাণ ছিদ্র-পথেই ট্রাজেডির বিখ্যাত কীট প্রবেশ করে। সব ফুল নষ্ট হয়ে যায়। পালা-গিনীর বাড়িতে এসে হঠাৎ আদিত্য বড়ো হয়ে উঠলো। আদিত্য জানতে ও বুঝতে শিখলো। এই ভাড়াটে বাড়িটা ছিল রিস-ভারের সম্পত্তি। কিন্তু আদিত্যেরা তা জানত না। পালাগিনী নাকি শান্তিনাথকে বন্ধিয়েছিলেন, তুমি রূপনগরের জামাই। তোমার কাছ থেকে ভাড়া নেবার প্রশ্ন ওঠে না। এখন আমাদের সেই আগেকার বোলবোলা আর নেই। পড়ন্ত অবস্থা এখন। সেই জন্যে বাবা তোমার কাছ থেকে ভাড়াটাই নেব। রিসিদ্ তোমাকে দিয়ে তোমার সঙ্গে ব্যবসাদারি সম্পর্ক বন্ধায় রাখব না। এসব কথা শোনার পর সুতরাং, শান্তিনাথ আশ্বাসিদ্ চান নি কোনদিন। শান্তিনাথ, আদিত্যের বাবা সত্যিই আশ্চর্য। উনি যেন প্রতারণিত হবার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যে যা ওনাকে বোঝাতো উনি তাই বিশ্বাস করতেন। শব্দ যদি বজা একটু মিষ্টভাষী হন। সংসারের কাছ থেকে পাওয়া লাভ বা ক্ষতি সম্ভবতঃ ওনার কাছে বড়ো ছিল না। উনি বোধ করি কাবুর কাছে বিশেষ কিছু প্রত্যাশাও করতেন না। শব্দ যে কটা দিন এ সংসারে আছেন সে কটা দিন একটু, মিষ্ট ব্যবহার একটু, সুমিষ্ট হাসি, একটু, সক্রিয় চোখের শান্ত দৃষ্টি তিনি দেখে যেতে চান। সুতরাং শান্তিনাথ রিসিদের ব্যাপারে গা দেন নি। পালাগিনী বছর চারেক পর হঠাৎ ভাড়া বাড়িয়ে দেবার কথা বললেন। আদিত্যদের ঘরে অথবা নীচের বিস্তৃত উঠানে উনি কখনো নাবতেন না। সম্ভবতঃ তাতে ওনার দাবী প্রেক্ষিত ময়লা হয়ে যাবে। কোন কিছু বলার থাকলে ওপরের জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলতেন। সোদিনও গলা বাড়ালেন। বুড়ভাবে পালা-গিনী বললেন, ভাড়া বাড়াবার জন্যে কোন কৈফিয়ৎ আমি দেব না। আগামী মাস থেকে যদি এ ভাড়ায় এখানে থাকা পোষার আপনারা থাকবেন। না পোষায় এখান থেকে চলে যাবেন। কথাটা এমন রুঢ়ভঙ্গীতে এবং এতো অকস্মিকভাবে পালাগিনী ওপর থেকে ছুঁড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন যে, এমন যে আশিষটির মত মনোরমার মন সে মুখেও কিস্ময়ে কুলপ পড়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। মনোবমা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

শান্তিনাথ হতভম্ব হয়ে একখানা হাতভাঙা চেয়ারে চপচাপ বসে রইলেন। আর আদিত্য বসলো একটা কিছু হয়েছে। মনোরমা বলল, একটা কিছু



বোরোলীন-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা

গুরুভিত্ত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম বোরোলীন-এর কোমল
পেলব স্পর্শে আপনার ত্বক হয়ে উঠুক নির্মল-নিরাপদ।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩



ব্যবস্থা কর। এখন তা হাটাচলা করতে পারছে। দেখনা আর কোথাও যদি আশ্রয় জোটে। এখানে আর নয়। শান্তিনাথ কোন কথা বললেন না। মনোরমার ভীর্ণদৃষ্টির সামনে ভীর্ণ চেহারা দাঁড়িয়ে গেল। মনোরমা বলল, এই অপমানের পর এখানে আর কি থাকার ঠিক? শান্তিনাথ তাক গিলে বললেন, ঠিক নয়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত আর একটি কথাও না। মনোরমা তা অবাক। ওমা! এবে চেনার চপচাপ বসেই রইলো। নিজেই বলছে এই অপমান গায়ে মেখে বসে থাকার যাত্রা না? অথচ তারপরও কি করে মানুষ গা এলিয়ে দিয়ে চেনার বসে থাকতে পারে?

ধন্য তুমি। মনোরমা বলল, এর একটা জবাব দেবে না? কোন বিহিত করবে না? কি পদ্ম তোমার চামড়া, গাভার, গাভারও হার মেনে যায়। কোন কিছুতেই তোমাকে চতানো যায় না।

শান্তিনাথ বিরক্ত মুখে বললেন, আর চেষ্টা কর নেই।

মনোরমা ভীর্ণদৃষ্টিতে শান্তিনাথের অপরাধীর মত চোখে দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল, নিশ্চয় গাভগোল পাকিয়েছে কিছ? শান্তিনাথ মুখটা বিকৃত করে তাড়াতাড়ি, হড়হড় বলে গেলেন, গাভগোল আমি করবো কেন? ওই পাগলাম্যই যতো নষ্টের গোড়া। বললেন, রসিদ তোমাকে কি দাব? তুমি না আমাদেরও জামাই? এখন এ বাড়ি ছেড়ে উঠতে গেলে বছর তিনেকের ভাড়া দিই নি বলে মামলা রুজু করলে কোর্ট ঘাড় ধরে আমাদের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করে ওদের হাতে তুলে দেবে। মাগী! এমন পাঞ্জি! উঃ কি সম্বন্ধে মেয়েছেলে! আমি তখন এতোটা বড়ি নি। মনোরমার রাগে রক্তভাল পর্বত গরম হয়ে উঠেছে। মাথার ভেতর থেকে তাপ উঠছে। কি বলবে ওই অশুভ লোকটিকে? শব্দ বলতে ইচ্ছে করে, ওগো, তোমার জুলনা তুমি!

তাহলে ওদের খুশীমত ভাড়া ওরা বাড়ানেন। আর ইচ্ছে না থাকলেও ভাড়াটা আমাদের জুগিয়ে যেতে হবে? শান্তিনাথ এই শান্ত; নিরুত্তাপ অথচ কঠিন শাড়াসীর মত গলা চেপে ধরা কথায় আতনাদ করে উঠে বললেন, উঃ, মাগী! জরাগিরে খেলে। সর্বদা উল্লেখ-খুশুহুম করে মারছে। এ কি জেরা রে বাবা, সেন চারের দায়ে ধরা পড়ছি।

মনোরমা আস্তে আস্তে, কেটে কেটে বলল, একটা কাজ নিজে দেখে নিইনি, অমনি ছুঁবিয়ে দিলে। রসিদ না নিজে কখন কেউ ভাড়া দেয়? এমন অহাম্মুক কোথাও কেউ আছে? এখন ঠাণ্ডা সামলাও। একটা সমস্যা মেটাতে পারি না! উল্টে সমস্যা আরো বাড়িয়ে দেয়।

পালিগঙ্গা যখনই দরকার তখনই খুশীমত ভাড়া বাড়াতেন। যখন তখন আদিত্যদের কাছে ধার করতেন। আদিত্যদের ঘাড় হেঁটে করে, যেখান থেকে হোক জোটাতে হতো। এমনকি ধারের টাকাও জোর করে চাইবার সাহস হতো না। ধার না দিয়েও উপায় থাকতো না। না পেলে পালিগঙ্গা চটতেন। চটে গিয়ে যদি কোর্টে মামলা রুজু করে দেন? মাসে চল্লিশ টাকা করে হলে তিন বছরে সে যে অনেক টাকা।

তিন বছরেরও অনেক তিন বছর পরে প্রতিমা যখন আদিত্যদের সংসারে এলো ততোদিনে শান্তিনাথ অনবরত জুল করার, যে কোন কাজ আখ্যাটিড়া করে, রাখার, সমস্ত সম্পদে তার মাথখানে একখানি ছিন্নপথ করে রাখার ব্যাপারে হাত পাকিয়ে দরমত হয়ে উঠেছেন বেশ।

আদিত্যের মা, আদিত্য, আদিত্যের বৌ, আদিত্যের আত্মীয় আশ্রিত দু'একজন যারা ওদের সংগেই থাকতো বরাবর তাদের সামনে শান্তিনাথের খোঁয়াড় শব্দ করতেন, বিশেষ করে শান্তিনাথের সাক্ষাতে।

শান্তিনাথ প্রথমে চপ করে থাকতেন। খানিকক্ষণ যেতে না যেতে দেখতেন মনোরমা আলোচনাকে গুটিয়ে না এনে ক্রমাগত সূতো ছেড়ে চলোছ। তখন উনি প্রতিবাদ করতেন প্রবলভাবে। তাতে কোন ফল হত না। উল্টে, মনোরমা বলতো, ঐ জন্যেই ত' তোমার ওপর রাগ হয়। তুমি অনবরত জুলও করবে অথচ স্বেীকারও করবে না। অন্যায় করে অন্যায় স্বেীকার করো না কেন? প্রতিমা এসব আলোচনায় যোগদান করতো না। কিন্তু বসে বসে উপভোগ করতো। শান্তিনাথ ভীষণ বিরক্ত হতেন। একি, এ কিরকম শব্দ! বাড়ির বৌ-এর সামনেই শব্দরের জুল-জুটির লম্বা ফর্দ দিচ্ছেন হাসতে হাসতে! ধন্য সংসার। ধন্য এই ধরাধাম।

রাগে কঠিন হয়ে উঠতেন শান্তিনাথ। কিন্তু পাছে কথা আরো বেড়ে যায়; কথা বেড়ে গেলে যেসব জুলগুদলি, এখনো বিশ্বাসিত নীচে, সেগদলি-হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে তাঁকে ষাতে চাদরের মত ঝড়াতো না পারে তার জন্যে গদম হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। কিন্তু ভাবটা এই, যেন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে যাচ্ছেন।

প্রতিমা যখন এ সংসারে এসেছে, তখন তার শব্দরের অশুভ বোগটাকে ভালো করে বোঝবার তার উপায় ছিল না। রোগটা ততোদিনে তার ভীর্ণতা খানিকটা হারিয়েছে। সেই ভয়ংকর বঙ্গবনের দিন-গুদলি তখন অনেক দূরে। প্রতিমা শব্দ দেশতো মানবটি সিনেমা দেখতে পারে না। বাসে চড়তে পারে না। একটু বেশী দূর হাটাচলা করতে পারে না। কিন্তু পালিগঙ্গা, বাড়িতে বসে যতোখানি পালিগঙ্গা

করা চলে, তার জিহ্বা পরিশ্রম উনি করেন।

থেকে থেকে শান্তিনাথ প্রাণমাকে বলতেন, মা, বড়ো যন্ত্রণা হচ্ছে বুকে। হটব্যাগে একটু গরম জল পুরে দাও। মনোরমা হিংস্রভাবে চিংকার করে উঠতো সংগে সংগে, বুক বুক করেই গেলে। যে রকম যন্ত্রণা-যন্ত্রণা কর, সত্যি সত্যি তাই যদি হোত তাহলে আর দু' দশ রোঁতে থেকে আমার হাড় চিবিয়ে কালি করতে না। রেহাই দিতে।

শান্তিনাথ বুকতে পারতেন না মনোরমা কেন অমন নির্মমভাবে তাঁকে ওরকম বলছে। মনোরমা চোঁচিয়ে, কটকথা বলে, হেঁটে করে যন্ত্রণাটা খামাতে চাইতো। তাতে আগে যেমেছেও বহুবার। কিন্তু এখন আর এতে কাজ হয় না। শান্তিনাথের যন্ত্রণা উল্টে জাবে রেড়ে যায়। মুখটা ক্রমশ করে অসহায় শান্তিনাথ করণ চোখে বলতেন, যাও বা দু' দিন বাঁচতাম, ওই মাগী! আমার চলে যাবার দিন ঘনিয়ে আনছে ক্রমশঃ। এই সব মনুষ্যে প্রতিমার যে মনটা সকলের প্রতি বিধিয়ে থাকতো সেই মনটাই শান্তিনাথের প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণিমার নব্বীর মত ষোলোকলায় পূর্ণ হত।

প্রতিমা কতোদিন আদিত্যকে বলেছে, সত্যি মায়ের এরকম বাবাকে বকাবকা করা উচিত নয়। একটা অসহায়, করুণ মানুষ। কেন তাকে নিয়ে টানাটানি করা? তাঁকে ধরেই নেওয়া হোক না কেন যে তিনি কোন কাজের মানুষ নন?

প্রতিমা যে তাঁর প্রতি সহানুভূতগীল, চারিদিক থেকে রুঢ় আঘাত খেতে অভ্যস্ত, শান্তিনাথ সেটা বিলক্ষণ জানতেন। সুতরাং শান্তিনাথের যে ব্যক্তিগত আদিত্যদের কাছে, এমনকি তাদের আশ্রিত আত্মীয়দের কাছে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে থাকতো, সেই ব্যক্তিগতই মাঝে মাঝে প্রতিমার সামনে অশুদ্ধ ফুলে কঙ্গাগাছ হয়ে উঠতো। প্রতিমার হয়তো ইচ্ছে হয়েছে সিনেমা যাবার। রাতের শোয়ে আদিত্যের সঙ্গে যাবে। আদিত্যকে অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছে। অনুমতি শ্বশুরদির কাছ থেকে নেওয়াই আছে। সিনেমা-টিনেমা দু'জনে যখন-তখন গেলে, খুব একটা সংসারের কাজের ক্ষতি না হলে, মনোরমা বারণ করে না। এর জন্যে অনুমতি নেবারও দরকার থাকে না। এটা দেওয়াই থাকে। এর পর শান্তিনাথের কাছে অনুমতি চাইবার প্রয়োজন হয় না। কেন না, নতুন মানুষ এ সংসারের যে সেই প্রতিমাও জানে এ বাড়ির আসল কর্তা কে? শান্তিনাথকে কোন ব্যক্তির মধ্যেই ধরা হয় না। উনি রাখাযাবে বসে আছেন রাত তখন সাড়ে সাতটা। আটটার হুপলগার সিনেমা হাউসের শো। আর

শ্রদ্ধা আধ্বনটা। টিকিট দু'খানা কাটা আছে। সাজপোজ সমাপ্ত। শব্দ মূখের মেকআপ একবার শেষবারের মত দেখে নিরে বাইরে অপেক্ষমান রিক্সায় গিয়ে বসে পড়লেই হল। শব্দাড়ি সন্ধ্যার সময় যেমন প্রতিদিন আপেক্ষিকতার আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি বেড়াতে যান ধুকতে ধুকতে আজো বেরিয়েছেন। তাঁরও ফেরার টাইম হল। শান্তিনাথ হঠাৎ প্রতিমাকে ওভাবে সাজসজ্জা করে বেরুতে দেখে হঠাৎ রুট হয়ে উঠে বললেন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? নিশ্চয় সিনেমা? রাত-বিরেতে ছাড়া ত' যাওয়াই যার না কোথাও। তারপর একটু খেমে শান্তিনাথ যেন শেষবারের মত রায় 'দয়ে ফেললেন, যাওয়া হবে না।

বারে, যাওয়া হবে না কেন? এতো কষ্ট করে আদিত্যকে রাজী করিয়েছে প্রতিমা, সব কাজ গঠিয়ে রেখেছে, মশায়টা পর্যন্ত টাঙিয়ে ফেলেছে রায়ে এসে আর টাঙাবার হেসাজং পোয়াতে হবে না বলে আর উনি বলছেন, যাওয়া হবে না? প্রতিমা আস্তে আস্তে বলল, মাকে বলছি। আর শালে কে থায়? শান্তিনাথ হৃৎকার দিয়ে উঠলেন, মাই সব? শব্দুর, শব্দুর কিছ' নয়? ঐ রকমই তোমাদের মায়ের শিক্ষা। রাগটা আদিত্যবাবুও হল। হঠাৎ এ আবার কি রুগড়া? ব্যাপারটা ঠিক বদলেছে। শব্দু ব্যস্ত ফলানো এতে নেই। আজ এর চেয়ে গুরুতর বিষয়, বরাবরই যেটা থাকে, সেই একা একা থাকার কষ্টটাও এই ব্যস্ত ফলানোর সঙ্গে একত্র জড়ানো। কিন্তু ওনার ব্যক্তিগত সমস্যার সঙ্গে আরো দৃষ্টি মানবের ভালো লাগা মন্দ লাগাকে অথবা পড়ান করা কেন?

ঠিক এই সময় আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলো মনোরমা। মাকে দেখে প্রতিমা জোরে জোরে কেঁদে উঠলো। কান্না কান্না গলা বলল, বেশ আমি যাবো না। টিকিট দুটো আমি ছিঁড়ে ফেলছি। আমার ঘাট হয়েছে। মনোরমা শ্রান্ত হয়ে দূ-চার মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা কি হয়েছে সঠিক জানতে চাইলো। শান্তিনাথ তো তো করে বললেন, এমন কিছু নয়। এই রাত-বিরেতে, এ সময়টা, বাড়িতে কেউ নেই, ধরো একটা চোরই ঢুকে বসে থাকে, তাই—

মনোরমা হাত তুলে বলল, সংক্ষেপ করো। অতো রয়ে বসে শোনাবার সময় আমার নেই। আটটা বেজে গেছে। এই-বার আমার শোবার সময়। আমাদের দু'খের শরীর। সারাদিন খেটে খেটে গিয়ে হাতে বাধা। অতো ধান-ই-পানাই করছো কেন? যা বলবার সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করবে। শান্তিনাথ প্রথমটা মনোরমার নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত তুলে সংক্ষেপ করাব ইংগিতটা বদলে চাইলেন। তারপর

সকলের সামনে চরম অপমানিত হয়েছেন এই মনে করে 'দূর মাগী' বলে হন হন করে বাইরে বার হয়ে গেলেন।

বাড়িতে ৩৭ ৩৭ ৩৭ করে আটটা বাজলো। মনোরমা নিজের ঘরে ঢুকে দরজার খিল তুলে দিলো। একবারও জিগোস করলো না আদিত্য অথবা প্রতিমাকে, ব্যাপারটা কি ঘটেছিলো। কতো বড় বড় ব্যাপার আছে সংসারের সেন্স দিকে কারুর মাথাবাধা নেই অথচ অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অযথা সবাই সোরগোল পাকাচ্ছে। ঝাটা মারো। দু-চার মিনিট পর সুইচটাও নিভিয়ে দিলো মনোরমা। সমস্ত ঘটনাটা তারিখে তারিখে উপভোগ করবার কলিাসিতা তার জন্যে নয়। ভোর পাঁচটায় তাকেই উঠে সর্বপ্রথম উঠে আঁচ দিতে হবে।

শান্তিনাথ চলে গেলে আদিত্য প্রতিমাকে বলল, চলো সিনেমা যাই। সময় এখনো আছে। বই বড়ো। ট্রেলার দেখাতে দেখাতে আমরা ঢুকে পড়বো। না। প্রতিমা নিজেই চোঁট কামড়ে অস্থির গলার বলল, সামান্য সিনেমা যাওয়া নিয়ে কি রকম কান্ড হয়ে গেল। মা বকবক করলো। বাবা বেরিয়ে গেলেন। ঝকঝকি হয়েছে সিনেমা যাওয়া নিয়ে। আমার এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। তুমি আমাকে নিয়ে এখান থেকে কোথাও চলে যাও।

প্রতিমা, যখনই কোন ব্যাপার ঘটতো বাড়িতে ঝগড়া অথবা গোলমালের, ও ওর আঁজটা বেশ জোরের সঙ্গে জানিয়ে রাখতো। চোখের ওপরই আদিত্য দেখতো প্রতিমা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। মূখে আগে কারসে-অকারসে হাসি কলমল করতো। সে হাসি এখনো আছে। তবে সে মরা নদীর হাসি। স্থান ও বিবর্ণ করুণ চাঁদের মতন। বৃষ্টিতে পারতো বৌকি আদিত্য, প্রতিমা মিহিমিহি ও কথা বলছে না। সে ত অন্য মেয়েদের মতো ছিল না। অন্য মেয়েরা যে কারণে স্বামীদের নিয়ে একা একা থাকতে চায় ও ঠিক সে কারণে বাড়ির বাইরে যেতে চাইতো না। ওর কারণ ছিল স্বভাব, মৌলিক ও ব্যক্তিসংগত।

ওর স্বামী এমন কিছু লাখ পঞ্চাশ উপায় করে না যে, ও বাইরে গিয়ে ঠাকুর-চাকর রেখে রাণীর হালে থাকতে পারবে। শব্দাড়ির চিল-কীংকারে প্রতিমা অস্থির হয়ে উঠতো। অবশ্য সে জন্যে এখান থেকে অন্ত চলো যাবার কথা ওঠে না। প্রতিমা মেরেটি ছিল নির্বিরোধী। ভালো মানুষ, কোন গাছের মত সে শব্দু শান্ত সুন্দর ফুল ফোটাতে এসেছে। কিন্তু এখানে ও প্রতি মূহুর্তে দেখলো ওর স্বাধীনতা, ওর ব্যক্তিগত বিপ্লব হতে চলেছে। ও দেখলো ওর চারদিকের

যেটা সবচেয়ে জোরালো জিনিস, সেই জিনিসটা প্রাচুর্যে চোট খাচ্ছে। ওদেব বাড়িতে জীবনের প্রবাহ ধীরগতিতে সর্বদা বয়ে গেছে। কিন্তু এখানে জীবন দ্রুততালে ছুটেছে জলতরঙ্গে। কোন মিল নেই। হাঁক আর ডাক। পান গেছে চূর্ণ খসলে বদতে হবে খসে গেল বৃষ্টির একটি পঞ্জির। অশ্রুত, অশ্রুত এরা। শব্দাড়ি উল্টুনে চাপানো কেউলীর জলের মত সর্বদা ফুটেছেন। সংগে সংগে মূখ থেকে ছিটকে আসছে বাঁক বাঁক বলেটের মত কথা। বাবা, মানুষ এতো কথাও বলতে পারে। শব্দুর ভালো মানুষ। কিন্তু যে মানুষের ব্যক্তিগত নেই তিনি ভালো হতে পারেন কিন্তু তিনি মানুষ নন। একবার প্রতিমার কাছে নিজের স্ত্রীর নামে লাগাচ্ছেন, শালা, মূখ না ত' যেন আঁশবাঁটি। আবার পবন্ধেই স্ত্রীর কাছে ছেলের বৌ-এর নামে লাগাচ্ছেন, বৃষ্টি, তুমি যদি আমার আগে যাও তাহলে এই বৌ-এর হাতে পড়লে আমার যে কি দুর্দশা হবে ভেবে মাকে মাকে অস্থির হয়ে উঠি। প্রতিমা শব্দু চেনে নিজের স্বামী আর নিজের মেয়ে। আমাদের স্পষ্ট পর বলে মনে করে।

এইভাবে যার কাছ থেকে ঘটতেই শব্দু যেমন করে হোক আদায় করতে চান শব্দুর। কি বলছেন, কি করছেন কোন জ্ঞান নেই। একবারে শব্দুর মতন। শিশুকে নিয়ে ত' চলা যায় না যদি সেই শিশু হন বাপের বয়সী। স্বামীটিও বাড়ির সঙ্গে দাঁবা খাপ খেয়ে গেছে, খাপছাড়া বাড়ির খাপছাড়া মানব হিসেবে। বৃষ্টিতে পারে না প্রতিমা আদিত্যকে। এদিকে ও তার এতো কথা শোনে, গাধার মত কলকাতা থেকে খেটে আসে, কোন মাড়োয়ারীর গদিতে আবার ফেরার পথে একটু হিসেব-নিকশের কাজ করে আসে, প্রাস্তি নেই, ক্রান্তি নেই, বলতে হয় না, নিজেই মশারী টাঙিয়ে নেয়, একবার মাত্র হাত পা একটু টিপে দিতে বলেছিল প্রতিমা, সেইটে মনে রেখে প্রতিমার হাত পা টিপে দেওয়াকে প্রতিদিনের বরাদ্দ কাজ হিসেবে ধরে নিয়েছে, কোনদিন বলেন 'ওগো, আমাকে এক প্লাস জল দাও', উল্টে তাকেই তার মূখেই ধরেছে জলের প্লাস, সত্যি এদিক দিয়ে আদিত্যের কোন ফুলনা পায় নি প্রতিমা। কিন্তু শব্দু একটি ব্যাপার, সেই একটি ব্যাপারে আদিত্যকে বৃষ্টিতে গরুর নি প্রতিমা কোন দিন। এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া বা না যাওয়াটা ছিলো প্রতিমার কাছে জীবনমরণ সমস্যা। ঠিক এই জায়গাটায় আদিত্যের প্রতিমার সংগে আশ্চর্য মিল ছিল। বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া বা না যাওয়া ওপর আদিত্যেরও জীবনমরণ সমস্যা ছাড়িত ছিল। এ বাড়িতে কেমন করে আদিত্য

এটা যেমন প্রতিমার প্রত্যেক দিনের সমস্যা ছিল তেমনি এ বাড়ি ছেড়ে প্রতিমার জেদাজেদিতে অন্যত্র কোথাও ঘাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল আদিত্যের পক্ষে অসহ্য।

অথচ ঠিক কেন যে প্রতিমা এখান থেকে চলে যেতে চায় এটা যেমন প্রতিমার কাছে স্পষ্ট ছিল না তেমনি আদিত্যের কাছেও স্পষ্ট ছিল না, কেন সে এখান থেকে চলে যেতে চায় না।

প্রতিমা বলতো, আমার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার বলেছে প্রোটিন খেতে। কি খাওয়াচ্ছে তুমি? কবো ত একটা পাচা অফিসের চোতা কাজ। আমার পরিচয় দিতেও বেম্বা করে।

প্রতিমা বলতো, তোমার মা সবসময় গল্প গজ করেন। বিদ্রী কথ্য বলেন। তুমি নিজেও তাই। কি পেলাম তোমার কাছে? বিয়ের পর সকলেই তাদের স্ত্রীদের কতো কি দেয়। তুমি কি কোনদিন কিছু দিয়েছো? নিজে ত ফুর্তি করতে কলকাতা যাও। এনেছো কখনো হাতে করে একটা সপের জিনিস? শাড়ি কিংবা ব্লাউজ?

প্রতিমা বলতো, একটা পছন্দ পর্বন্ত নেই। অন্য স্বামীদের কতো পছন্দের কথা শুনি। বললাম, গোলাপী রঙের নাইলন ফিতে আনতে। নিয়ে এলে তোমার মত হুতুফিত কালো ফিতে। কান পেতে শোনাও দরকার মনে করো না।

প্রতিমা বলতো, তোমার রূপ নেই। যৌবন নেই। অর্থ নেই। অথচ তোমার দারীর কুলনা হয় না। শান্ত হয়ে থাকতে হবে। শ্রম্যা চাই। ভালোবাসা চাই। আবার সত্যিও চাই। অশ্রুত ত।

প্রতিমা বলতো, যেমন করে হোক টাকা উপায় করো। তারপর যা খুশী তাই করো। রাস্তার বেলা ইস্কা হলে আসবে। শরীরটা অস্তিত্ব পাবে।

শরীর, প্রতিমার শরীর। তখন এটাকেই আদিত্য তার জীবনের ভয়ংকর সর্বনাশের মূর্ছক ষড়কুটোব মত হুকড়ে ধরে কোনক্রমে আশ্রয়স্থল করতে চেয়েছে সেদিন। এর আগে আদিত্যের কোন নারীদেহের সংগে পরিচয় ছিল না। প্রতিমার শরীরও সে একদিনে আবিষ্কার করেনি। শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ধীবে ধীরে সে জ্ঞানবদ চেষ্টা করেছিল। আর প্রত্যেকটি আবিষ্কারে আদিত্য এক জগতের বিশাল দরঙ্গা তার সামনে আস্তে আস্তে খুলে গেছে। বিকল্প হয়ে যাবার কারণ তখন যথেষ্ট ছিল কিন্তু এই সব আবিষ্কার সেই ক্রমেই বিকল্পতাকে অশ্রুতভাবে ঠেকিয়ে রেখেছিল। আদিত্যের অনেক দিন পর্যন্ত মনে হত যে কোন একটা পরমেশ্বরের পক্ষে সর্বজনকর্তা নারীর শরীরের সমস্ত রহস্য

বুঝে ওঠা এক জীবনের পক্ষে রীতিমত কাঠন। তার ওষ্ঠ, সুগঠিত স্তন, বিপুল শ্রোণদেশ, পৃথুল জঘন, অসামান্য চোখ, ছুরুর জোড়াসাঁকো, লীলাসিত আঙুল, আঙুলের রক্তিম নখ, তাছাড়া উল্লংগ দেহের নানা বিচিত্র ভয়ংকর, এই সব দেখতে দেখতে, দেখার পর প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা অথবা সম্পূর্ণভাবে চিন্তা করতে করতে এমন একটা জগতে পুরুষের পক্ষে পৌঁছানা সম্ভব যেখানে নারীর মন পাবারও আর তেমন প্রয়োজন হয় না। আদিত্য সেই সময় এইভাবে সিদ্ধিদিন বেঁচে ছিল। প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিমার পক্ষে পায়ে আদিত্য ফিরতো। প্রতিমা চলে, মুখে, দেহে কোন সুগন্ধি ব্যবহার করতো না। ফলে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পৃথক পৃথক গন্ধ ছিল। আর গন্ধগর্ভি, সুগন্ধি ব্যবহার না করার দরুণ, প্রভাবনা করতো না। অন্ধকারে প্রতিমা যেতোই পা টিপে টিপে প্রবেশ করত না কেন, আদিত্য বুঝতো, ওই এসেছে, ওর গায়ের কাঁচা, কিশোরী কিশোরী গন্ধটা বিয়ের অনেক বছর পরও ছিল, মা হবার পরও। আর এই অশ্রুত কিশোরী গন্ধটাই শেষ পর্যন্ত আদিত্যকে, প্রতিমা তার কাছে যেতো অপরাধী করত, তার মনকে নানা বিরোধী চিন্তার আঘাতে রতো ক্ষত-বিক্ষত করত, ওকে কঠিন শাস্তি দিতে বারংবার বাধ্য দিয়েছে। লোকে মন দিয়ে শরীর জানে। আদিত্য বেশ দিনের জন্যে প্রতিমার মন পায় নি। কিন্তু প্রতিমার শরীর আবিষ্কার করে ওর মন আদিত্য ছুঁয়েছিল। তাই বারংবার আশ্বস্ততার নানা কুহক, চাতুর্য ও সংকেত আদিত্য দুর্জয় সাহসে অব্যবহার করতে পেরেছিল।

মৃত্যুর যে অনিবার্য চিন্তা প্রত্যেক পুরুষ মানুষকে কোন না কোনদিন স্পর্শ করে, যে সর্বব্যাপী রিষাদ পুরুষকে ভীষণ একাকী করে দেয়, সেই সব বিরাদ আর মৃত্যুর উপলক্ষকে অনেকটা ঠেকিয়ে রাখা যায় সুন্দর কোন নারীদেহের সম্পর্কে এলে। আসলে নারী আর পুরুষের উপলক্ষের জগতে মন আর শরীরের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। যে কোন একটা জানলেই হল, ভাবো করে জানলেই হল, চিন্তা করলেই হল। স্থূলতার হাত থেকে সে রক্ষা পাবেই।

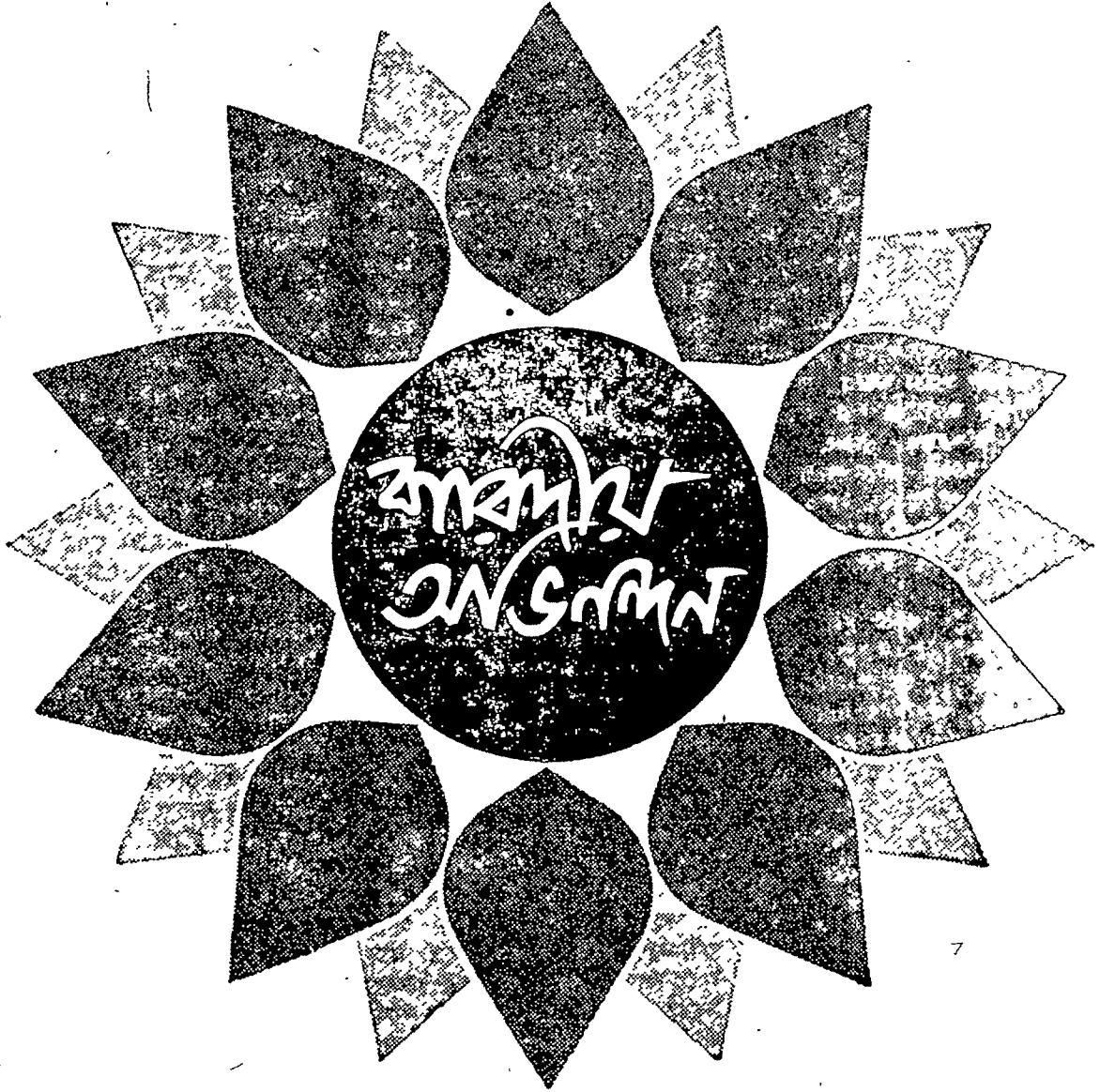
সেই একদিন জানলায় একটা সবুজ পাখি বসেছিল। সামান্য একটা পাখি কিন্তু কি মন্ত্র যে দিল শান্তিনাথের কানে—শান্তিনাথ মন্দির একটা পথ যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন।

তিনি ঠিক করলেন খুব সাধারণ কোন জিনিস যা পাখির মত সহজে আসে তাকে তিনি ভালোবাসবেন। বড়ো কিছু পাবার জন্যে তিনি আর কোন

চেষ্টা করবেন না। এই যে কষ্ট ওই কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া এ জীবনে যদি সম্ভব না হয়, তবে সেই অসম্ভবের প্রত্যাশায় জীবনের সহজ সহজ আনন্দ, ছোট ছোট সুখ, একফোটা শিশুরের জলের মত টলটলে আনন্দকে তিনি ব্যর্থ হয়ে যেতে দেবেন না।

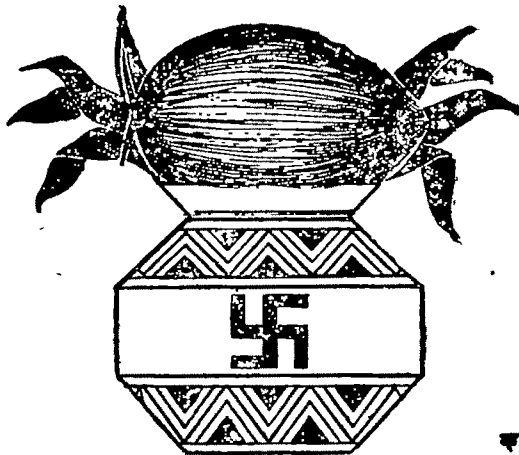
বাড়ি থেকে মিনিট দশেকের পথ বাজার। এই দশ মিনিটের পথ তিনি এতোদিন পার হন নি। পরে হবাব কথা কোন দিন চিন্তা করেন নি। বেন না বাজারটা তাঁকে এতোদিন তেমন টানে নি। কিন্তু এখন বাজারে যেতে ইচ্ছে করলো দারুণ। মনকে বোকাগেল এই বস যে, আমি ত দূরে কোথাও যাচ্ছি না, যাবার ইচ্ছেও নেই, শক্তিও নেই, যাচ্ছি বাজারে।

এটুকু পথ ঠিক যেতে পারবো। কতো বছর এ্যাতোখানি পথ পার হই নি। একদিন পার হওয়া কি সোজা? বুকটা গুড় গুড় করে উঠলো অজানা ভয়ে। যদি হার্টফেল করে? যদি মরে যান? মরে যাবেন? বোকান থেকে মিষ্টি কিনলেন। খিদে পায়নি। কিন্তু শান্তিনাথ কিছু ছানার জিনিস খেয়ে নিয়ে শান্তি সন্ধ্যা করলেন। যদিও এসবই ছেলেমানুষি। কিন্তু সত্যি সত্যি কিছু খেয়ে শক্তিশাল্য করলেন যেন একটু। আচ্ছা, পা টিপে টিপে চলাই ষাক, যেতো দূর হোক। বাজারে যে যেতেই হবে তার কোন মানে নেই। যেখানে পৌঁছে বকে কষ্ট হবে সেইখানে থেমে যাবেন। জেদাজেদি করে কণ্টাকে বাড়িয়ে মরণ পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়া বোকামি। সূতরাং ভীতু মনটাকে মনে মনে শাসাতে, শাসাতে, করনো একটু মিষ্টি জিভে ঠেকিয়ে, করনো সেই করুণ সুন্দর পাখিটার কথা ভেবে আস্তে আস্তে একটা অপূর্ণ জগতের স্মরণপ্রান্তে এসে যেন উপস্থিত হলেন। এই দশ মিনিটের পথের বাঁকে বাঁকে এ্যাতো আনন্দ। মৌচাক থেকে টুপটাপ শব্দে অমৃত ক্ষরিত হয়ে পড়ছে। মুহূর্তে মুহূর্তে এ কি অপূর্ণ মুক্তি! একটা ছোট ছেলের হাত থেকে লাঠি পড়ে গেছে। তার হাতে লাঠি তুলে বিলেন। ছেলেটা হেসে সরে গেল। কি সুন্দর রে তোর হাসি ওরে অবোধ ছেলে। ছেলেটার সুন্দর হাসিটার কথা ভাবতে লাগলেন শান্তিনাথ। এ্যাতোখানি হেঁটে আসার উত্তেজনার বকে একটু কষ্ট হতে যাচ্ছিলো। শান্তিনাথ মনে মনে ছেলেটার হাসিটা ভাবতে লাগলেন। ছেলেটার হাসি শুধু ঠোঁটে লেগে নেই। ঠোঁটটা রাঙা করে দিয়ে পাগল হাসিটা চোখ দুটিকে পর্যন্ত মুগ্ধ করে দিয়ে গেছে। বাবা! বাজাবে এ্যাতো বড়



চরমপূজার এই উৎসব যেন
আপনাদের জীবনে শান্তি ও
সমৃদ্ধি বহন করে আনে।

এই শুভকক্ষে আপনারা
আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন। এই সাথে এও
আমরা জানাচ্ছি যে জাতির
সেবায় আমরা নিজেদের
উৎসর্গীকৃত রাখব যাতে
আমাদের দেশ আরও সমৃদ্ধি-
শালী হয়ে ওঠে।



স্বাধীন
ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক

১৮৯৫ সাল থেকে জাতির
সেবায় নিয়োজিত
কাঠোড়িয়ান : এস. সি. ত্রিখা

ENTERED IN P.N.B. 176

বড় সাইজের কুমড়া আসে ? কুমড়া দু' একটা টিপেটাপে দেখলেন শান্তিনাথ। বড়ো ছোটখাটো জিনিসগুলোকে তিনি ছুঁয়ে ফেলাছেন ততোই হাসনগুণে বহুবর্ণ খায়গ করে আরো কিছু ছুঁবে দেখবার সংকেত জানাচ্ছে। কখনো বাজার করেন নি শান্তিনাথ। আচ্ছা, বাজাব কবে দেখবেন কেমন লাগে ? কই, কণ্টা ত' আর হচ্ছে না। বারে, বেশ মজা ত'। একদুনি বেশি মজা যাওয়া ঠিক নয়। কিছু বলা যায় না। হতেও পারে একদুনি স্বপ্নগা শূন্য ? বেশি আস্বাদ করে কাজ কি বাবা ? তার চেয়ে কুমড়োর দর যাচাই করা ভালো। কখনো বাজার করেন নি কিন্তু গলায় অবিকল বাজার করতে অভ্যস্ত মানুষের সহজ সাংসারিক সদর ফুটিয়ে ফেললেন শান্তিনাথ, বঙ্গেন, ওহে হালদার পো, মালটা ওজন করো ত' বাপু। এঁা, বলো কি হে, অতো দর! তার চেয়ে এই যে গলাটা এগিয়ে দিচ্ছি, দাওনা বাপু দাখানা দিয়ে দ' ফাঁক করে।

একটা কুমড়া ওজন করে কিনে ফেললেন শান্তিনাথ। অশ্রুত আনন্দ হল। জিনিস কেনা এ্যাতো রোমাঞ্চকর এ একটা অভিজ্ঞতা। পাঁচ নয়া পয়সা ঠকাতে পেরেছেন কুমড়াজলার ?

এই মাগিগণ্ডার বাজারে নগদ পাঁচ নয়া লাভ করা কি সোজা কথা ? আশ্বপ্রসাদের হাসি হাসলেন শান্তিনাথ।

এমনিভাবে প্রায় প্রত্যেকদিন এই ধরণের এক একটি ছোটখাটো আনন্দ শান্তিনাথ আবিষ্কার করে ফিরতেন সে সময়।

রূপনগর স্টেশনে গেলেন একদিন। কিছুই নয়। বসে রইলেন চুপ-চাপ প্ল্যাটফর্মে। একটু গরম চা খেলেন। বেশ লাগলো। বাড়িতে চা খেয়ে ত' এ্যাতো মজা হয় না। খানিক পর কম কম শব্দে তুফান এক্সপ্রেস এলো। ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনগুলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় অসভ্যতার মত তীব্রগতিতে বিস্ময় ছড়াতে ছড়াতে ছুটে আসছে। কতো দূর দুরান্তর যায় ঐ সব গাড়ি। এমনি সব সন্ধ্যায়, কিংবা আরো একটু রাত হলে, ঐ সব বড় বড় দূরদেশগামী গাড়িতে চেপে যাবার জন্যে শান্তিনাথের বৃকের মধ্যে হু হু করে উঠলো।

বাড়িতে সব সময় খিচিমিচি, নিজের জীবনের পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতা, তাঁকে ভালোমানুষ পেয়ে চারিদিক থেকে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যে তাঁর অনিবার্য দৃঃস্বাধ—এসবের ভেতর দিয়েও সব সময় শান্তিনাথ প্রত্যেকদিন এক একটি ছোটখাটো আনন্দের কণাকে অসীম যত্নে বাঁচিয়ে

রাখতেন। সারাদিনের পর রায়ে যখন শূন্যে পড়তেন তখন অশ্রুত আনন্দের সঙ্গে শান্তিনাথ দেখতেন তাঁর জন্যে একটা না একটা আনন্দ প্রত্যেকদিন তাঁর ভাস্কারে ঠিক সঞ্চার করে রাখে। গভীর তৃপ্তি নিয়ে ঘুম থেকে উঠে শান্তিনাথ হয়তো যখন হাতে চায়ের কাপটি নিয়ে মচমচে সকালটি কড়কড়ে ভাজা পাপরের মত একটু একটু চেষ্টে চেষ্টে চিবাবেন ঠিক করেছেন ঠিক তখনই দূর্ঘর্ষ যোষ্মার মত মৃত্ত কৃপাশে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতেন মনোরমাকে। পেটে চা পড়তেই মনোরমা কাজের কথা পাড়তো। স্যাকরা মিনষের কাছে গিয়েছিলে ? চমকে উঠতেন শান্তিনাথ। মনোরমার কথার রসকে ঠিক কোন পর্যায়ে ফেলা যায় তাই তিনি ভাবতেন। এরই নাম বোধ হয় রৌদ্ররস। সময় হিসেবে মাঝে মাঝে বাঁভৎস রসের কম্পনা পর্যন্ত করে ফেলতেন যদিও আলাংকারিক অর্থে নয়। মনোরমার কথা তো সে সময় শূন্য ঝাঁঝালো কথা মাত্র ছিল না। চাবুক ছিল। চাবুকের মত গায়ে কেটে কেটে বসতো। মগজের ঘিলু শুকিয়ে যেত। মনকে প্রসঙ্গ করে নিয়ে শান্তিনাথ নোতুন দিনটি সবে আরম্ভ করতে যাবেন হঠাৎ এ কি উপাত্ত!

স্যাকরার কাছে গিয়েছিলে ? মনে মনে ভেঙে উঠলেন শান্তিনাথ। কেন, বাপবেটাই বা যাবে কেন ? দৌরানমন্দ ছেলে কি করছে ? শান্তিনাথ উঠতে বসতে যে সময় পান না সংগে সংগে সে সব মনে পড়তো। সারি সারি কাঁটাতার। সঙ্গীন উদ্যত করে বসে আছে সবাই। ছাত্র, ছাত্র, ছাত্র। অসংখ্য নিরেট মূর্খতার স্তূপ। তাদের আশা দাও। তাদের ভাষা দাও। উঃ, অসহ্য। কোন রকম শান্তি হয়ে শান্তিনাথ বলতেন, বড়ো বাপই বা সব কাছে যাবে কেন ? তোমার নন্দদুলালকে যেতে বলতে পারো না ? মনোরমা বলতো, বলতে হয় তুমি বলো। কেন, আমিই বা বলবো কেন ? ছেলে ত' তোমারও। বলতে পারো না তুমি ?

না। কেন তিনি বলবেন ? বলতে গেলে তো ছেলের কাছে মিশ্র্য অপমানিত হওয়া। ওতো বলেই বসে আছে, কাজ আছে আমার। শান্তিনাথের যেন মনে হত মনোরমা ছেলের শান্তিভংগ সহজে করতে চায় না। এ এক অশ্রুত মমতা মাগীর। শান্তিনাথ তাই বলতেন, ছেলে, ছেলে, ঐ ছেলের হাতে অশেষ দুঃগতি তোমার। তোমার হাড়ে একদিন ডগডগি বাজাবে ও।

মনোরমা বলতো, বাজায় বাজাবে। আমার কপাল ত' এরকমই। সারাটা জীবন অসুস্থ স্বামী নিয়ে গেল। এখন ছেলে আর ছেলের বৌ নিয়ে যাবে।

শত্রু, শত্রু সব। আমি ত' জানি আদিত্য যেই একটা ভালো কাজ জোগাড় করতে পারবে আমি বৌ ওকে নাকে দাঁড় দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে এখান থেকে। আমার কাজ ত' আমি করে যাই। সবাই সমান। ওরা যতো নোমো-কহারাম তুমিও তাই। গোবরের এপিঠ আর ওপিঠ।

যৌবনে শান্তিনাথ রবিঠাকুরের গান শুনিয়েছিলেন। আদিত্যকে প্রায়ই বলতেন। প্রতিমাকেও বলতেন। গানটি, ঘরেতে প্রমর এলো গুনগুনিয়ে। মনোরমার চিল চাঁৎকার প্রমরের গুনগুনানিই বটে। তবে এ প্রমর অসহ্য। এর গুনগুনানিও অসহ্য। বলতেন আর হাসতেন শান্তিনাথ। মাঝে মাঝে শান্তিনাথের বৃকের মধ্যে মনোরমার জন্যে অসহ্য কষ্ট হত। মানুষটা যখন তুচ্ছ কষায় রেগে উঠতো, রেগে ঠকঠক করে কাঁপতো, কাঁপতে কাঁপতে চোখ-মুখ লাল করে ফেলতো, তখন বড় কষ্ট হত তাঁর। ঠিক ঐ অবস্থায় মনোরমাকে কিছু বলতেন না। তাঁকে লক্ষ্য করেই রাগগুলো রচিত হত বলে, তিনিই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন বলে তাঁর নিজেরও মন মনোরমার ওপর চটে থাকতো। হতে পারে তিনি অক্ষম, তিনি ব্যর্থ তাই বলে তাঁকে একেবারে কাদায় বলিয়ে দেওয়া ? এ পাড়ার জানতে আর কারুর বাকী নেই শান্তিনাথ অথর্ব, ঠুটো জগন্নাথ, তার বারোটা অনেকদিন বেজে গেছে। শান্তিনাথ বৌ-এর হাতে শূন্য মারটাই যা খায় না। সকালবেলাটা মনোরমার উত্তপ্ত হবার সময়। ঐ সময় ঘরে ঢুকতে শান্তিনাথের আতঙ্ক হত। এই রে, এইবার বোধহয় আরম্ভ হবে। আর হোতও।

তাঁকে দেখামাত্র মনোরমা জ্বলে উঠতো। উপলক্ষ্য সব সময় হাতের কাছেই পাওয়া যেত। হয়তো বাড়ির ট্যাক্স জমা দিতে ভুলে গেছেন। মনোরমা পই পই করে তাঁকে মনে করির দেওয়া সন্তুও, অফিস থেকে চিঠি এসেছে আর ঠিক সেই সময় হয়তো চূপচূপ শান্তিনাথ ছাত্র পড়িয়ে এসে বাড়িতে ঢুকছেন, লেগে গেল ভুলকালাম। সে এক সাংঘাতিক অবস্থা। সেই চোম্ববছর বধৈস থেকে কি কি কষ্ট মনোরমা পেয়ে এসেছে তাঁর সমস্তই একে একে মনোরমার মনে হবেই, আর এই সামান্য ট্যাক্স জমা দিতে ভুলে যাওয়া শান্তিনাথের এক অমার্জিত অপবাদ হয়ে দেখা দেবে। এই সব সময় না হোক, তার কিছু পরে, যখন চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে, কেঁদে কেঁদে মনোরমা ক্লান্ত হয়ে গেল, তখন শান্তিনাথের মনোরমার জন্যে একটা অসহ্য বেদনা হত। আগে তাঁর নিজের একটা প্রচ্ছন্ন অপরাধ বোধ

হিঁদু মনোরমার প্রতি। একটা কুণ্ঠিত ভাব। এখন কিছুর এসব নেই। তাঁর খালি মনে হত এ কোন পথে চলেছে মনোরমা। যে সব দৃশ্য মনোরমা পেয়েছে সেগুলো অনেক বড়ো বটে কিন্তু এগুলো কি বড়ো যাতে কিছুতেই মনোরমার বিস্মৃতিও তাকে অতিক্রম করতে পারে না? দৃশ্য মানুষকে পেতে হবে। কিন্তু আমার অনেক দৃশ্য এ কথা ভাবলে, এর জন্যে চোখের জল ফেললে দৃশ্য অমানি গলে যাবে? উল্টে, দৃশ্য ত পাখরের মত জমাট বেঁধে চেপে ধরবে। দৃশ্যের সংগে, কণ্ঠের সংগে, যন্ত্রণার সংগে লড়াই-এর এ পথ নয়। দৃশ্যকে অতিক্রম করার জন্যে মনোরমা কতকগুলি বাস্তব, সাংসারিক পরিবর্তন চায়। এ পরিবর্তনগুলি নিশ্চয় দরকার। যেমন গিরিডি়র বাড়ীটাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসা, সম্পত্তি বাড়ানো এমনি ধারা আরো কতো কী। কিন্তু এ করলেও তা যন্ত্রণার শেষ নেই। হ্যাঁ, আনন্দ এর মধ্যেও পেতে হবে। সুস্থকে এর মধ্যেও আদায় করে নিতে হবে। সংসারের ছোটখাটো অনেক ব্যাপারের মধ্যে রস আছে। সেই রস পাওয়া চাই। নাহলে মরতে হবে। মরো। সংসারের মার খাও। মনোরমার জন্যে শান্তিনাথের কন্ঠ হত কেননা শান্তিনাথ এসব কথা মনোরমাকে বলতে পারতেন না। এসব কথা বললেই মনোরমা অশ্রুত অশ্রুভাগি করে বলে বসবে, রস পাবো? আনন্দ পাবো? কতো রসের, আনন্দের ব্যবস্থা করে রেখেছো যে? যাও যাও। চোন্দ বছর বয়েস থেকে আমি জরলেছি। আমার সামনে আর দাঁড়িয়ে দিক কারো না।

শান্তিনাথ যে মনোরমার জন্যে কিছু করবেন তারও উপায় ছিল না তখন। আদিত্যদের গিরিডি়র বাড়ির নিচেরস্তার ভাড়াটে কালী গোলকলে কাজ করে। ও আদিত্যদের কোন পরামর্শ না নিয়ে দোতলার খালি ঘরে একজনকে বসিয়ে দিল মোটা সেলামি আদায় করে। ব্যাপারটা যখন মনোরমা শান্তিনাথকে বলল, তখন সব শুনে শান্তিনাথ বললেন, তাতে আর হয়েছে কি? যেই ভাড়াটে বসাক সে ত একই ভাড়া দেবে। ভাড়া না দিয়ে ত তার কোন উপায় নেই।

জিনিসটা এক হল? মনোরমা শান্তিনাথকে শিঁচিয়ে উঠলো, বলল, তোমার জিগ্যেস করাই ভুল। সামনেই ছিল প্রতিমা। শব্দরের হেনস্থায় ও মূর্খ টিপে হাসিছিল। প্রতিমার ঐ হাসিই হল কাল। শান্তিনাথ কর্কশ গলায় বলে উঠলেন—তবে মাগী জিগ্যেস করাই বা কেন? অতো যে গোবর তোমার মাথায় বসতে পারিনি যে।

মনোরমা গল্গল করিতে আরম্ভ করলো। উঃ, বসে থেকে থেকে কিছু আর মগজে খেলে না। আসলে কি জান? তোমরা সব মজা পেয়ে গ্যাছো। মনে মনে ঠিক ধরে নিয়েছো সব কিছুর জন্যে ও মাগী ত আছেই। ওই ভাববে। আর আমরা মজা লোটবার বেলা মজা লুটে নোব। নইলে সামান্য সামান্য বিষয়, ঠিকমত ভাবলে, নিজের জিনিস বলে ভাবলে ঠিকমত উত্তর দেওয়া যায় না? সেদিন কথা ওইখানেই শেষ। কেননা সুখ প্রসন্ন হিঁদু জন্মঃ। কোথাও বেরুতে গেলে মনোরমা আজকাল সকাল সকাল না বেরিয়ে পারে না। সুবের তেজ্ঞ জতোটা সূত্ব করতে পারে না। মনোরমা সকাল সকাল আদিত্যকে নিয়ে গিরিডি় চলে গেল। কালীর জন্যেই যাওয়া। আইনে আছে, ও সাবলেট করতে পারে। ওর বিরুদ্ধে সহজে কিছু করা যাবে না। কাঠখড় পোড়াতে হবে অনেক। কে আর গিরিডি় ছুটে ছুটে এসে মামলা মোকদ্দমার তাম্বুর তদারক করে। অথচ এইভাবে যদি ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া যায়, কালীকে দু কথায় যদি মনোরমা নাও বলে ত ভাড়াটে সবাই পেয়ে বসবে। তাহলে ত নিজেদের বাড়ি বলে আর কিছু থাকবে না। অতএব খানিকটা নিজের গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যে, খানিকটা অন্য ভাড়াটেদের সামনে দৃষ্টান্ত রাখবার জন্যে মনোরমা গিরিডি়র বাড়িতে গেল। দোতলার সেই ঘর। দেখা গেল, ওই ঘরে অন্য ভাড়াটের এক বৌ বসে বসে তরকারী সাঁতলাচ্ছে। কালীর নিজের ঘর নিচের তলার। সেখানে কালীর বৌ রাখা করছিল। মনোরমা কালীর বৌকে একটা কথাও বলল না। সোজা দোতলার ঘরে ঢুকে, সম্পূর্ণ অপরিচিতা ঐ বৌ মানুষটিকে বলে বসলো, আপনার স্বামী কালীবাবু কোথায়? বৌটি থতমত খেয়ে বলল, আমার স্বামী ত কালীবাবু নন। কালীবাবু আমার স্বামীর বন্ধু। মনোরমা ওসব গ্রাহ্যই করল না, বলল, আপনার মত মেয়েছেলেদের স্বামী একটা কি দূটো বা সঠিক স্বামী কে আমি তা কেমন করে জানবো। কালীবাবুর নামে যখন এই ঘরের ভাড়া পাই তখন ধরে নোব ২২ কালীবাবু আর একটা মেয়েমানুষ রেখেছেন নয়তো আপনিই কালীবাবুর বৌ। আমি খারাপটা ধরিনা।

আপনার স্বামী কালীবাবুকে বলে দেবেন, ভাড়া যেন না ফেলে রাখেন। মনোরমা আর দাঁড়ালো না। আদিত্য লম্বায়া এ্যাতোড়কু। দোতলার ঘরের ভদ্রমহিলা ডয়ে, বিস্ময়ে থতমত। আদিত্য মনোরমাকে থামাতে চেষ্টা

করে। বলে, উত্তেজিত হোষো না। তোমার শরীর খারাপ। মনোরমা এক দৃবড়ানিতে আদিত্যকে থামিয়ে বলল—তুই থাম। এরপর নিজে তড়বড় তড়বড় করে দোতলার রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়ালো। সকলের মগজে যাতে বেদন ভাল করে ঢোকে এমনভাবে গলা চড়িয়ে মনোরমা শাপ-শাপান্ত আরম্ভ করলো—আমি যদি রাস্তাঘের মেয়ে হই তাহলে তোদের গারে আমার অভিশাপ লাগবে। ছোট্টোলোক সব। যতো ভালো ব্যবহারই করিনা কেন ততো আশ্কারা পেয়ে মাথায় উঠতে চায়। ওই রঘুনন্দন, মনীবাজারে আলুপটল বেচে। হাত ভেঙে পড়লো। মাসের পর মাস ভাড়া দিতে পারে না। তবু রেখেছি দয়া করে। যার যখন দরকার পড়ছে ওপরের ঘরখানা এমনি ব্যবহার করবার জন্যে আমি তার হাতেই চাঁবি তুলে দিছি। যা না তোরা, খোঁজ কর না, কোথায় এর থেকে সস্তায় ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। সেই মাথাভার জন্মলের রেট যা আমার শব্দর করে গেছলেন তাই এখনো বজায় রেখেছি। এক পয়সা সেলামি নিই না। এ্যাতো ভালো ব্যবহার আর তার প্রতিদান কিনা এই, সাবলেট করা? আমার সংগে বেইমানি? ঘরের মধ্যে বেশ্যা ঢোকানো? বদমাইসি ঢোকানো? সর্বোনাশ হবে তোদের। মরবি ষড়ফড়িয়ে। মরা বেটার মূখ দেখাবি।

মনোরমা এসব বলার পর যখন দেখলো কেউ কোন প্রতিবাদ করছে না, বুঝলো কাজ হয়েছে, সুড় সুড় করে সকলে ভাড়া দিয়ে যাচ্ছে, এমন কি কালী, যার ভাড়া দু মাস পড়েছিল সেও দিয়ে গেল, তখন খানিকটা মনের ঝাল মেটাতে পেরেছে বলে, আর উত্তেজনা খানিকটা ক্রান্ত হয়ে পড়েছিল বলে, ফিরে আসার সারাটা পথ মনোরমা শান্তমনেই এলো।

তারপরের দিন সন্ধ্যার পর মনোরমা আর আদিত্য রূপনগরে এলে শান্তিনাথ সমস্ত ব্যাপারটা শুনলেন। মনোরমা কোথাও কোন কাজ করে এলে, সেটা গুরুদৃষ্টপূর্ণ হোক অথবা সাধাবণ মামদুলী কোন কাজই হোক, আদিত্য বরাবরই দেখেছে শান্তিনাথ যেখানেই থাকুন ঠিক সময় করে মনোরমার পাশে যান। এমনিই নাকি নিয়ম। না হলে মা ছুঁলে যাবে। কাজকে কাজ করবো না, এদিকে কাজের কাজ করে আমি এলাম, আমার দুটো কথা শোনবারও দরকার নেই? মনোরমা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে শান্তিনাথের জাম্ব করে ছাড়তে আদিত্য মাঝে মাঝে দেখেছে।

সারাদিন কাজ করার পর আদিত্য দেখেছে সন্ধ্যার পর তার মায়ের কোন

শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। তার মা তখন ছুপচাপ বসে থাকে। মনোরমার স্বভাব নয় শব্দাভির মত বৌ-এর সেবা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিমা আজকাল সমস্ত ক্ষুধিত পাবে। এই খরখরে, দুর্দম্, রোদে পোড়া মানুষটার ভেতরে ও চলে যেতে পারে। মানুষটা যখন সকালে পেটে চা পড়ামাত্র ছিল চাঁৎকার করার শক্তি হারিয়ে নিজস্বীবের মত সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্লান্ত, শান্ত হয়ে আস্তে আস্তে নিজের সারাটা জীবনের দুঃখ-জ্বালার কথা প্রতিমাকে বলে, তখন প্রতিমা আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না, এই মানুষটার জন্যে গভীর সহানুভূতিতে চোখ দিয়ে টপ টপ করে তার জল পড়ে। প্রতিমা তাড়াতাড়ি মিতুরির সরবৎ নিয়ে ছুটে আসে। শান্তিনাথ নিজেও মনোরমাকে কখনো কখনো পাথর বাতাস করেন। আর মনোরমার প্রতিটি কথাকে সমর্থন করে, প্রতিটি আচরণকে তারিফ করে শান্তিনাথ উজ্জ্বল প্রকাশ করে বলেন, তুমি ঠিক বলেছো। এর চেয়ে ভালো উত্তর আর হয় না। তারপর আদিত্য আর প্রতিমার নিকে ফিরে বলেন, দেখলি! কি বৃদ্ধি বল ত'!

আদিত্য এসব উজ্জ্বলের কোন জবাব দিতো না। মৃদু হেসে হাসির ক্ষীণ আভা খেলে যেত। তার যেন মনে হত এই সময় তার বাবা খানিকটা তার মাঝে ভোষামোদ করবার জন্যে, - খানিকটা সত্যি সত্যি মায়ের বৃদ্ধির স্মার প্রভাবিত হয়ে মাঝে উৎসাহ দিতেন।

এমনও দেখেছে আদিত্য, কোন কোনদিন রাঁধে তার মা যখন অন্য ঘরে দরজায় খিল এটে ঘুমোচ্ছে, তখন তার বাবা আদিত্যের সামনে বসে দুঃখ-প্রকাশ করে বলছেন, আমি হয়েছি অকর্মণ্য। তোরও কিছু না। সব কাজের বার। ও একা মেয়েমানুষ। ওর ওপর দিয়ে অত্যাচারটা খুব গেল। বাবার দিকে এই সময় আদিত্য চেয়ে থাকতো, এই সব বিরল মুহূর্তে। এক অশ্রুত কৃষ্ণা, ঠান্ডা বিষাদ, তাঁর অনুশোচনার, তার বাবার রেখাজটিকা মুখটা হঠাৎ কমনীয়, লাবণ্যময় লাগতো। এই সব মুহূর্তে তার মনে হত, তার বাবা মহৎ ব্যক্তি। সংসার সমরাংগনের সহযোগিতার প্রতি এই গভীর সহানুভূতি আদিত্যকে বিচলিত করতো। আর সে তখন তার বাবাকে দেখতো না, বাবার অশ্রুত মৃত্যুশব্দটাকে দেখতো। বছরের পর বছর একটা মানুষ মৃত্যু-কক্ষণা পেয়ে এসেছে। অনেক সময় তার গেছে শব্দ মস্তুর কণা ভেবেই। এমন মানুষের ত' পুরোপুরি স্বার্থপর হওয়াই উচিত।

এক অসাধারণ ঘটনার মধ্যে পতিত হয়েও কি করে তার বাবা তার মায়ের

প্রতি এতোটা সহানুভূতিশীল হতে পারেন! আদিত্য ভেবে অবাক হয়ে গেছে মানুষের ভেতরকার শক্তির এই বিস্ময়কর প্রকাশ। অবশ্য, আদিত্যের খুব খানিকটা হাসি এলো মনে এই কথা ভেবে যে, কাল সকালেই শান্তিনাথ আর এরকম করবেন না। কাল সকালেই তার বাবা বদলে যাবেন। মনোরমা যদি শান্তিনাথকে বলে বসে, বদলে দোতলার ভাড়াটেকে অতোটা বলা ঠিক হয় নি। আহা, গরীব দুঃখী মানুষ। ওর আর দোষ কি। শব্দ শব্দ মৃদু শুনলো। ঠিক বলেছো তুমি। সত্যি ওকে ওরকম করে বলা উচিত হয় নি। শান্তিনাথ পায়ের খাঁচাটা ঠিক করতে করতে নিশ্চিন্তা মহিলাটির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে ফেললেন। এই সহানুভূতিতে তেতেপুড়ে মনোরমা শান্তিনাথকে হকচকিয়ে দিয়ে বিদ্রোহগীততে আক্রমণ করে যেই বলবে, তবে যে কাল বললে কাগীর বোকে তুমি যা বলেছো ঠিক বলেছো? হিঃ হিঃ রে অনেক। একটা মানুষ নেই পরামর্শ চাইবার। যা' করবো তা' আমাকেই করতে হবে। মরগে যা মাগী। মাগী আসতে কাটে যেতেও কাটে। বলে শান্তিনাথ তাঁর অবসরীতে অস্থির হয়ে চলে যাবেন তাঁর ছাত্রীর বাড়ি। এবং মনে মনে প্রাণ করবেন, এ বাড়িতে, এই হাড়জ্বালানে মাগীর কাছে আর না। মরি আর বাঁচ আমি আলাদা থাকবো। নিজে যা' উপায় করি নিজের পক্ষে যথেষ্ট। মাগী ত' আমাকে দেখামার জ্বলছে।

বেশ কিছুদিন আগে থেকেই পালিগঞ্জী মৃদুস্রো গিল্লীর কায়দায় আদিত্যদের পেছনে লাগাছিলেন। নানারকম অশ্রুত আইনজারি, বিচিত্র আশ্বাস, নতুন নতুন অভিযোগ তিনি আদিত্যদের ব্যতিব্যস্ত করে মারছিলেন। অথচ পালিগঞ্জী নামক ভ্রমহোদয়কে বোঝারবারও উপায় ছিল না যে আদিত্যরাও নিভাস্ত চাল-চলোবিহীন হাঘরে নয়। তাদেরও ছোটবকুলপুড়ে চোন্দ্র বিষে যেনো জমি আছে। গিরিডিতে বিরাট ভাড়াটে বাড়ি আছে। পালিগঞ্জীর বাড়িতে স্নানঘর ত' চুলোয় বাক, স্নানের জায়গাটা একটু ঘেরা করাও ছিল না। পাইখানার অবস্থাও ছিল শোচনীয়। অথচ প্রাকৃতিক উপদ্রবগুলি সম্বন্ধে নির্বিকারও হওয়া যায় না একেবারে। অর্থাৎ এ বাড়িতে আদিত্যদের নানা-প্রকার অসুবিধার মধ্যে থাকতে হয়েছিল। এসব কথা পালিগঞ্জীকে বলবারও উপায় ছিল না। বললেই

তিনি বলতেন, বেশ ত' যাও না। কে আর থাকতে বলেছে। আদিত্যরা উঠতেও পারতো না। কেন না পালিগঞ্জী তাদের দুর্বলতার কথাও ভালোভাবে জানেন। আদিত্যের বাবার নির্বুদ্ধিতাই সেই গোপন অস্ত্রের সন্ধান পালিগঞ্জীর হাতে তুলে দিয়েছে। সুতরাং আদিত্যদের বেশ কায়দায় পেয়ে তিনি তাদের তখন উত্থাপন করে মারছিলেন।

বারংবার ভাড়াটে বাড়ি বদলে বদলে আমাদের এই চলা আমাদের অলক্ষ্যে কিছু দাছ, কিছু ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল নিশ্চয়।

গোপনে একটা কিছুই আয়োজন চলছিল। সেই আয়োজনের স্বেচ্ছাচরিত-প্রকাশ মাঝে মাঝে মনোরমার আচরণে প্রকাশ পেত।

মনোরমা যখন যে বাড়িতেই থাকুক সেই বাড়ির ঘরগুলির আসবাবপত্র মাসের মধ্যে দু'বার অন্ততঃ ঠাইনাড়া করতো। এ এক অশ্রুত খেলা আদিত্যের কাছে। চৌকিটা রয়েছে ডানদিকে। প্রতিমা মনোরমাকে বলল, বিস্তী দেখাচ্ছে চৌকিটা। মনোরমা তাই শব্দে 'ওমা তাই তো' বলে আদিত্য আর তার বাপ আর প্রতিমাকে জড়ো করে কাছে লাগিয়ে দিতো। শব্দ চৌকিই বদল নয় প্রায় সর্বকিছুই বদলে যেতে ঘরের। ঘরও বদলে যেত মাঝে মাঝে। মনোরমা পাগেটে পাগেটে এ-ঘর ও-ঘরে থাকতো। ফলে সবাইকে সকলের ঘর বদলে ফেলতে হত। আর এই ঘর বদলের সপ্নে সপ্নে নিজের নিজের ছোট ছোট অত্যাগ্রে রপ্ত কিছু বই, ছোটোখাটো টেবিল, পানের বাটা, এনালার্জ করা ফটো, সৌখীন হার-মোনিগ্রাম ঠিক ঠিক জায়গায় পেঁছে যেত। আর বাই হোক আদিত্যের মায়ের ঘরে সৌখীন হারমোনিগ্রামের কম্পনা পর্যন্ত করা যায় না। এসব যিনি মৃত্যুশব্দণায় কাতর, বিষাদে আচ্ছন্ন আদিত্যের বাবার সঙ্গেই সুন্দর মানানসই। আদিত্যের এসব মন্দ লাগতো না। একটা কিছু আদর্শ করতে পারতো কিন্তু ঠিক অনুমানটি তখনো পর্যন্ত ড্রপিসনের আড়ালে ছিল। শান্তিনাথ এর আগে সম্প্রতি কিছু কেনাবেচা করেছিলেন। সুতরাং এটা ধরে নেওয়া গিয়েছিল শান্তিনাথ দলিল-দস্তাবেজ অন্তত আদিত্যের মায়ের থেকে ভালোই বোঝেন। সেই শান্তিনাথই একদিন আদিত্যের মাঝে বললেন, ওগো, ওপরের পালিগঞ্জীর বাসামতলায় ওদের যে জমি আছে সেই জমি থেকে তিন কাঠা জমি বেচে দিতে চান। দাম বেশি নয়। জায়গাটা আমি গিয়ে দেখে এসেছি। একেবারে জটশনের ধারে। যদি বাড়ি না করে জমি যদি এমনি ফেলে রাখো তাহলেও

হুঁচকার বহুরে বিগুণ দাসে বেচেতে পারবে।

আদিত্যের মা সবিম্বস্নেহে শান্তি-প্রার্থের সপ্নে চোঁচিশ বছর ঘর-করা অভিজ্ঞ চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, বলো কি, তুমিও এসব ভাবো নাকি! বাড়ি-করা দরকার। আর বাড়ানো দরকার। এসব যে ছুতের মধ্যে রামনাম শোন-ছো। বলোই আদিত্যের মা হেসে ফেললেন। মায়ের মুখের হাসি আদিত্য বড় একটা দেখেছে বলে মনে হয় না। আদিত্য স্পষ্ট দেখলো, হাসি, মুখে অল্প একটু, শূঁশির ছেঁয়াচ লাগলে, বহু অভিজ্ঞতায় পেড় খাওয়া, তামাটে, শক্ত শক্ত রেখা-আকীর্ণ তার মায়ের মুখ অপরূপ হয়ে ওঠে। এমনি যেসব হাসি সরল ও প্রাণশোলা যেমন প্রতিমার হাসি, সেসব হাসি কেবলমাত্র সুন্দর হাসি, যেমন হাসি গোলাপের। কিন্তু মনোরমার হাসিতে আছে জীবন, যে জীবন বেদনা আর বণ্টনা আর একটানা কর্তব্যবোধে আচ্ছন্ন।

শান্তিনাথ বললেন, আমার ব্যাখ্যা তো সারাজীবন ধরে করে চলেছে। আরো অনেক কিছু পরে ব্যাখ্যা করবার পাবে। এ জমিটা সম্বন্ধে কিছু বলবে? বাড়ি কবে তুলতে পারবো জানি না। মনোরমা বললো, নিয়ে নাও। তোমার ত' আবার নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস। নিজের ওপর অতো বিশ্বাস না রেখে এ ব্যাপারে আমার ভাই-এব সপ্নে পরামর্শ করো। এতে মানে ছোটো হবে না। শান্তিনাথ হতাশা করে চলে গেলেন। এই ঘটনার সামান্য কিছুদিন পরে তার মায়ের এক অদ্ভুত ছবি আদিত্য দেখেছিল।

বেদিন অস্পষ্ট অন্ধকারে যখন চেনাগুলিকে অচেনা করে দিয়েছে, ল্যাম্পপোস্টের আলোয় এসেছে জীবনের অতল রহস্য, অল্প অল্প ক্ল্যাশায় সংশয় আর দুর্বোধতা, তখন রাত কতো হবে আদিত্য জানে না; আদিত্য ভরাব্রত মনে কোথায় যেন যেতে চেয়েছিল, এমন সময় তার মাকে ঠুক ঠুক করে, একা একা ফিরতে দেখেছিল এই গলি দিয়ে। মনোরমা কোথায় গিয়েছিল? শান্তিনাথ ত' বেশিদিন যেতে পারেন না। প্রতিমা আর আদিত্যের গন ভালো নেই। অজবাব আত্মীয়-স্বজনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব মনোরমাকেই বরাবর পালন করতে হত। মনোরমা গিয়েছিল অনুরাধাপুর। আদিত্যের মামীর বাড়িতে মামীর ছেলেকে দেখতে। রিক্সা করে যাওয়া যায়। রিক্সাওয়ালা বেশি পরস চাইকে। সংসার থেকে মনোরমা ঠিক ষেটুকু পরস নেহাৎ না নিল নল সেইটুকুই গ্রহণ করবে। রিক্সা চড়বার

পরস নেবে কেন? বাসের জন্যে ঘণ্টা দুয়েক না হয় দাঁড়াতেই হল। সেই মনোরমা অস্পষ্ট অন্ধকারে এখন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এই গাল দিয়ে ফিরছে। তাকিয়ে দেখলো আদিত্য, তার মা আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে না। ময়লা, ছেঁড়া একটা সস্তা ছিটের কাপড় জড়িয়ে, কাঁপতে কাঁপতে, মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে গলির অন্ধকারটা পার হচ্ছে। এতোদিন আদিত্য তার মাকে দেখেছে আর মায়ের মুখের সবল কথাবার্তার মত। মায়ের ভেতরে ভেতরে যে এ্যাভোখানি ঘুণ ধরেছে এ গলির মোড়ে এমন করে না দাঁড়ালে আদিত্য টের পেতো না। আদিত্য সেই প্রথম দেখলো তার মা বঁকে গেছে। কর্তব্যের বোঝা আর যেন বইতে পারছে না। বইতে পারছে না বটে কিন্তু ছাড়ছেও না। যেন দু'পা করছে শেষ পর্যন্ত। একটা কিছু অন্ধকারের কাছে গাছিত না রেখে আলোর ফিরিয়ে দেবে। মনোরমা পা টেনে টেনে আদিত্যের পাশ দিয়ে চলে গেল ছেঁড়া কাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে। একবার তার দিকে যেন চাইলো ক্লান্ত, বিষন্ন চোখ তুলে। বোধহয় চিনতে পারলো না। মা কি আর বেশিদিন বাঁচবে না? অনেকক্ষণ অবিধি আদিত্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অনেকক্ষণ ধরে মনোরমা চলে যেতে লাগলো। তারপর দুর্বোধ ক্ল্যাশ, রহস্যময় ল্যাম্পপোস্টের আলো আর সে চপচাপ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

মনোরমা কিন্তু এরপর থেকেই জমি, বাড়ি ইত্যাদি নিয়ে মেতে উঠলো। বাদামতলার মাঠে তিন কাঠা জমি কেনার পর থেকে নতুন কর্তব্যবোধের নিশানা পেয়ে গেল। আদিত্যের মনে হল, মা আমার বঁচে গেল। সেই সময়টা আদিত্যদের বাড়িতে এমন দিন ছিল না যেদিন খবরের কাগজে দেখা জমি, বাড়ি ইত্যাদি নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা হতো।

দু' তিন বছর কাটবার পর আদিত্যের পনেরো বছর আগে পঞ্চাশ টাকা কাঠায় কেনা জমি মনোরমা বেচে দিলো। মনোরমা ছোটবকুলপুরের চৌদ্দ বিঘে জমি সেটাও বিক্রী করে দিলো। ফলে হাতে জমে গেল বেশ কিছু টাকা। হাজার চৌদ্দ টাকা দিয়ে মনোরমা ঠিক করলো কালিঘাটের কাছাকাছি বা বরানগরে, অথবা কোলকাতার কাছাকাছি যেখানে দ্রুত উন্নতি হতে পারে এমন কোন অঞ্চলে যদি এককাঠারও জমি পাওয়া যায় মনোরমা তাও নেবে।

মাকে নিয়ে জমি দেখতে যেত আদিত্য। মনোরমা প্রায়ই ট্রেনে যেতে

যেতে প্রতিমার কি কি সদগুন তা আলোচনা করতো। মনোরমা ত' কারুরই ধার ধারে না। কলেরাই মনোরমাকে ভয় লাগে। তবে মনোরমা আদিত্যকে তার স্থায়ী সদগুণে কথাই শোনাতো? মনোরমা বলতো, একটু মিষ্টি কথা বললে ও গলে যায়। বড় ভালো মেয়ে রে। আজ রামা যা করেছে মুখ একবারে ছেঁড়ে গেল। তাই ত' পেটপুড়ে খেলো। ও তো কিছুই জানতো না। এই ক' বছরে শিখেছে অনেক। আমি যদি কড়া না হতাম, শক্ত কথা না বলতাম, তাহলে এসব ত' ও পারতো না। এখন আমি সন্ন্যাসে ওকে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে ওখানে-ওখানে চলে যেতে পারি। ঐ ঠিক সামলে নেবে। ওকে কত বাকি! কিন্তু একটু মুখে কথা নেই। রেগে যায় বটে। অনবরত গজগজ করলে ভালো কথাতেও লোকের রাগ হয়। কিন্তু রাগ হলেও ও কথার জবাব দেয় না। এই রকমই মেয়ে হওয়া দরকার। লোকে দেখে থাক।

আদিত্যের প্রসঙ্গ কোথাও আলোচনা হোক আদিত্য সর্বান্তকরণ তা' চাইতো না। কিন্তু মায়ের কাছে প্রতিবাদ বৃথা। এমন অনর্গল কথার মতোধারার মধ্যে আদিত্যের ক্ষীণকণ্ঠের প্রতিবাদ কোন বাধা নয়। প্রতিমার অনেক গুণ আদিত্য তা জানত। আদিত্যেরও স্নেহ অনেক গুণ আছে প্রতিমারও তা' অজান ছিল না। তবু আদিত্যবা সর্বদা একটা অঘোষিত সংগ্রামে দু' জনে প্রতি মুহূর্তে জর্জরিত হয়েছিল। এসব কথার কোন জবাব আদিত্য দিতো না। মায়ের প্রশ্ন সা শূনে তার হাতে পড়ে প্রতিমার স্নেহ অশেষ দুর্দশা এই কথা ভাবতো।

ট্রেনে থেবে ট্রামে তারপর রাস্তায় নেবে পড়তো মনোরমা ও আদিত্য আগে আগে যখন মাকে নিয়ে কোলকাতায় আদিত্য এসেছে তখন রাস্তা পার করাতে গেলে তার মা ভীষণ রাগ করতো। তার মায়ের বরানগর ধারণা আদিত্য তাকে রাস্তা পার করাতে চাইলে একটা-না-একটা অঘটন ঘটবে। আসলে নিজের ওপর মনোরমার ছিল অগাধ বিশ্বাস, যতোই গাড়ি-খোড়াকে ভয় পাক। জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মনোরমা প্রথমে চোখ দুটি বুজে ফেলতো। বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিতো। তারপর ক্রোন্দিকে ন' তাকিয়ে হনহন করে রাস্তা পার হত আদিত্য এই রাস্তা পার হওয়া নিয়ে হাসাহাসি করতো। চিরদিন একটা মানুষ আদিত্যের বিপজ্জনক রাস্তা পার করিয়ে এলো আর এখন কোলকাতায় একটা জনবহুল রাস্তা পার হওয়া নিয়ে কতো ভাবনাই ভাবছে।

সেদিন কোলকাতায় রাস্তা পার



আমি যদি কড়া না হতাম, শত্রু কথা না বলতাম, তাহলে ওগর ত 'ও' পারতো না

ছওয়ার সময় মনোরমার হাতটা ধরতে গেল আদিত্য মনোরমা রাস্তা পার হতে দেরি করিয়ে দেয় বলে। মনোরমা কিন্তু, আশ্চর্য, গজগজ করলো না। বিরক্ত হোলো না। হাত ছাড়িয়ে নিলো না। আদিত্য হাতটা ধরতেই আশ্চর্য-সম্পর্কের অসহায় ভাগি ফুটে উঠলো। আদিত্য আবার মৃত্যুকে স্বচক্ষে দেখতে পেল। আবার সেই পুরোন ভাবনাটা এলো। মায়ের আর বেশি দেরি নেই। দেরি নেই। আব। মা এবার যাবে। নিঃশব্দে এইবার আদিত্যকে প্রস্তুত করতে হবে। যে কোন মৃত্যুর জন্যে। চলে যাবে, একজন কেউ চলে যাবে আদিত্যদের মাঝখান থেকে।

অবশেষে আদিত্য আর তার মা জমি দেখতে পেল। ঢালীগঞ্জ ছাড়িয়ে অনেকখানি গিয়ে টেকনিক্যাল স্কুল। ঠিক এর উল্টোদিকে ছ' ফুট দীর্ঘ একটি গলি। 'মিনিট তিনেক পথ অতিক্রম করার পর সামনে প্রকান্ড মাঠ। মাঠের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। দু'রে পুকুর। জল-টলটল স্নিগ্ধ চোখ। যেখানে জমি সেখানটা অস্বাভাবিক গলু। মনোরমা একটু দূরে দাঁড়ানো সদ্য তৈরি বাড়ি। একজন মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো, এখানে বাড়ি তৈরি

করলে ভাড়া কি রকম পাওয়া যাবে? ভদ্রমহিলা বচালেন, ভাড়া এখানে ভালোই পাবেন বাড়ি যদি ভালো করে তৈরি করেন। এক এক্ষয়ের ভাড়া একশো টাকা ত' বটেই। তার ওপর বেশ মোটারকম সেলাম। বাড়ি আড়াই দিনও পড়ে থাকবে না।

আদিত্যের মা ত' আর আদিত্যের মত সন্দেহ আর সংশয়ে ভুগতো না। তাই ছবি'র মত পরিপাটি জায়গাটি দেখে মায়ের খুশি আর পরে না। মায়ের চপলা বালিকা মৃতি আদিত্যের সংশয়কে আবার দূর করলো। পরিপাটি ছবি বেখতে হল বলেই সন্দেহে আদিত্যের ভুরু বোঁকে গেল। আদিত্য দেখলো, সবই প্রায় ঠিক আছে। মেন রাস্তা থেকে জমি খুবই কাছে। কর্পোরেশনের মধ্যেই জায়গাটা। সামনে, পেছনে রাস্তা খোলা। চারিপাশে বেশ আলো হওয়া। দামটাও দূরে পোষাচ্ছে। পল্লিসন হিসেবে অপূর্ব। কিন্তু জমিটা অস্বাভাবিক জলু। আদিত্য ত' তার মায়ের মত - ছিল না। সে ত' লড়াই জনতো ন্ন। সে জানতো সন্দেহ আর সংশয়। আদিত্য দেখলো জমিটার কাছে-পিঠে কয়েকটি ওপড়ানো নারিকেল গাছের অকর্তৃত শেকড়। আতংগুণি চাপড়া চাপড়া নারিকেলের শেকড়

বেশ মনোরমাকে বলল, পুকুরের ঠিক সামনেই এই চালু জমি, জমির ঠিক আশেপাশে নারিকেলের শেকড়। আমার কেমন ভালো লাগছে না।

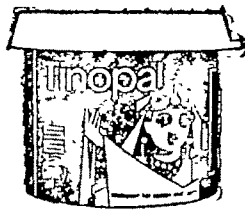
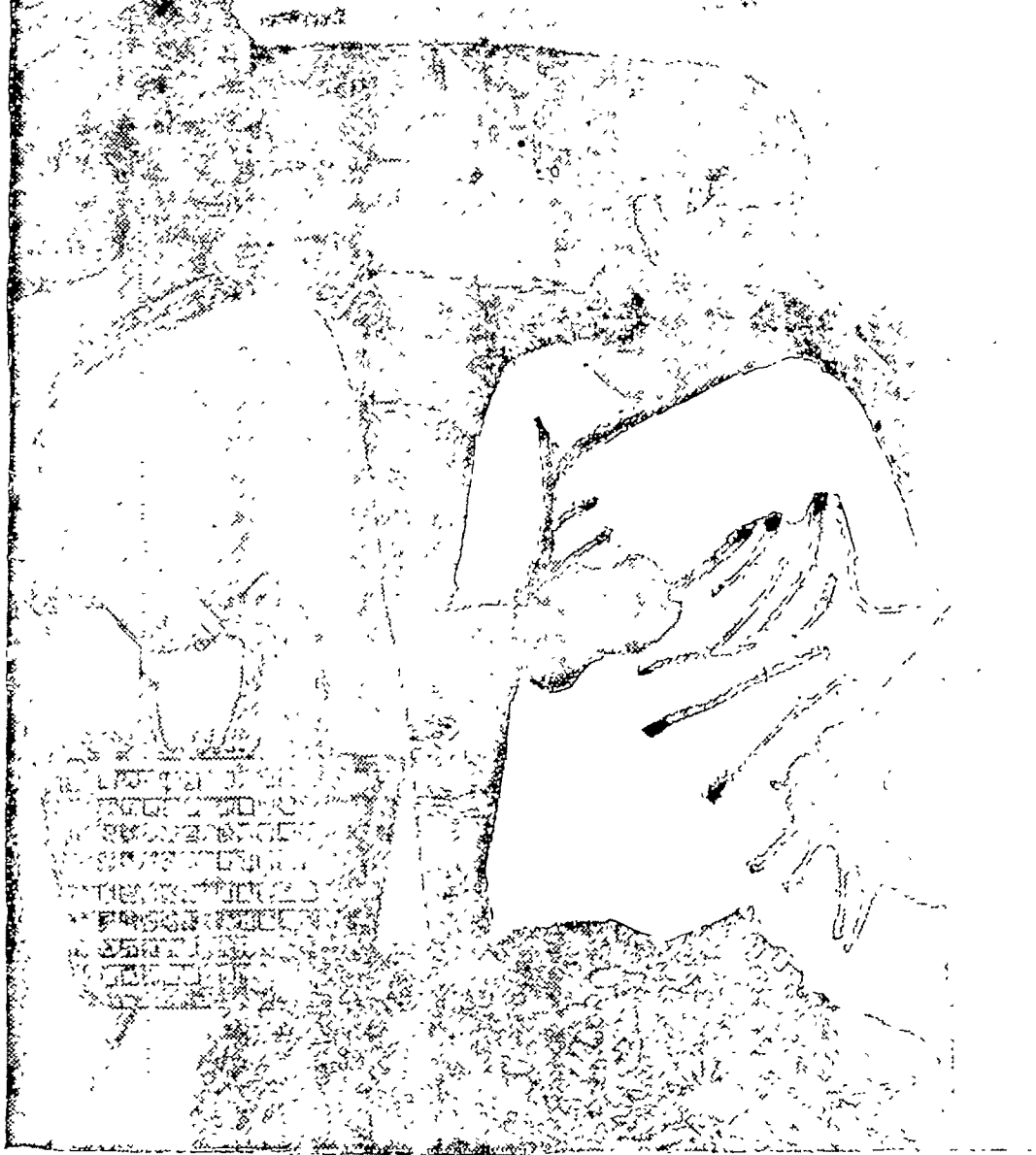
ভালো লাগছে না? মনোরমা ব্যস্ত হয়ে বলল, কেন, বেশ ত' জমি।

আদিত্য সে কথার কোন জবাব দিলো না। সে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো।

ক্রমশঃ তার সন্দেহ আরো দৃঢ় হচ্ছে। তার অনুমান যে সঠিক এরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু এই চপলা বালিকাকে কি বলা যায়? আদিত্য তাকালো মনোরমার দিকে। মনোরমার মুখে এখনো খুশির আভা। চোখ দুটো আনন্দে এখনো উজ্জ্বল। তবু সত্যকথা বলার একটা দায়িত্ব অনুভব করলো আদিত্য। এই তার কাজ। সত্য বলে যেতে হবে। আদিত্য মনোরমাকে বলল, এই জমিটার নিচেই আছে পুকুর। হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। জল শুঁকিয়ে গেলে ছাই বা ঘ্যাঁশ ফেলে শুকনো পুকুরটিকে ভরাট করা হয়েছে। মনোরমা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে, ত'হলে এ জমি কেনা ভুল হবে। ভিত ভ' শব্দ হবে না। আদিত্য বলল, কেনা তোমার ইচ্ছে। আজকাল এ রকম জমি অনেকই নেয়। লোহা দিয়ে বাঁধিয়ে নেয়। খুব একটা অসুবিধে হবে না। মনোরমা মুখ ভার করে বলল, আমি এ জমি নোব না। তারপর আদিত্য আরো দু' তিনটে জমি দেখলো দু' তিনটে জায়গায়। এ রকম প্রায় রবিবারেই ঘটেতো। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট থেকে জমি ছেড়েছে। জমির ডাক হবে। জমি পছন্দ করে যেত মাঝে মাঝে। মনোরমা আর আদিত্য দু'রদু'র দু'কে যেখানে ডাক উঠবে সেখানে গিয়ে দাঁড়তো। মনোরমার চোখেমুখে কখনো আশা কখনো হতাশা। এই সে আগ্রহ ব্যাকুল হয়ে ভাবছে জমিটা যদি পাওয়া যায় তাহলে কি কি সে করবে। সবিস্তারে হাজার বার, বলা কথা আরো বারকতক আদিত্যকে শোনানো। আদিত্যের ভালো লাগছে না তবু 'হু' 'হু' দিয়ে যাচ্ছে আর বড় মায়া হচ্ছে মনোরমার ওপর। ভগবান সে মানে না, তবু ভগবান বলে যদি কেউ এই সময় এ্যাভোপুলো টাকাঅলা লোককে হটিয়ে মনোরমাকে বাড়িটা পাইয়ে দেন অথবা জমিটা তাহলে বেশ হয় কিন্তু, মায়ের মৃত্যুর হাসিটা তাহলে অমর হয়ে থাকবে, এই সব ভাবছে আদিত্য।

আবার কেউ গম্ভীর ভরাট গলায় ডাকের টাকা বাড়িয়ে ফেলছে যেই সংগে সংগে দু'গুণে, কোভে, বেদনায় একেবারে ভেঙে পড়ছে মনোরমা। তারপর অন্য কেউ যখন বেশি টাকায় কিনে ফেলতো

দেখুন! পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে টিনোপাল সবচেয়ে সাদা ধবধবে করে



পরীক্ষা করে দেখা গেছে। সামান্য একটু টিনোপাল
ধোয়ার সময় দিলেই কি চমৎকার ধবধবো সাদা হ
সাদা শুধু টিনোপালেই সম্ভব। আপনার শাট, শাড়ি
চাদর, তোয়ালে—সব ধবধবে।

আর, তার ধরচ? কাপড়পিছু এক পয়সারও কম
পাল কিনুন—রেওলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিং
বালতির জন্যে এক প্যাকেট।



® টিনোপাল—সে.আর.গাঙ্গুলী এন্ড.এ., কলকাতা
হাইডারাবাদ-এর রেজিস্টার্ড এজেন্ট।

সুন্দর গাঙ্গুলী লি., পোঃ আঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বে ২০

Shalpi HPMA 1 0 0 0

সম্পত্তি তখন মনোরমা আর থাকতে পারতো না। তার কাছে ভীড় ঠেলে চলে যেত, উস্কা-ধুস্কা মদ্য, চোখের কোণে জলের রেখা, কপালে এলো-মেলো লেগে আছে দু' চারগাছি পাকা চুল, তেউড়ে-খেউড়ে গেছে মদ্যটা, জোর করে খুশী হবার চেষ্টা করে তাকে মনোরমা বলতো, সুন্দর জমি। পয়মন্ত লোক আপনি। আপনার খুব ভালো হবে। তারপর নিজের বেদনা আর ঢাকতে পারতো না। প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলতো, ঐ জমিটা আমার খুব পছন্দ ছিল। তা' আমার ছেলে যে দু'-চার হাজার টাকা জোগাড় করে দেবে সে মুরোব ত' ওর নেই।

আমার কতী টিউশ্যানী করে কতো আর উপায় করবে। তা' থাক। একজন কেউ পেলেই হল। বাড়ি ভুললে নৈমন্ত্য করবিন।

শেষ কথাটা বেশ হাসিমুখে বলতে গিয়েই মনোরমা ফ্যাসাদ বাঁধতো। করতো কি, কেঁদে ফেলতো। তারপর আসতো বাড়ি ফেরার সময়। সে এক অশ্রুত পরিস্থিতি। সমস্ত সময়টা হয় মনোরমা, নিজের ভাগ্যকে কল্পনাতন্ত্রে করতে করতে আসবে। নয়তো আদিত্যকে অথবা শান্তিনাথকে অনবরত দুশবে।

আদিত্য বলতো, কি হয়েছে? ওদের টাকা আছে তাই কিনেছে।

মনোরমা বলতো, তাদের টাকা নেই কেন?

আদিত্যের টাকা নেই কেন অতো বেশি এ দেশের অবস্থা মনোরমা ভালো-ভাবে জানে বলেই মনোরমাকে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া বিড়বনা। চুপ করে থাকতো আদিত্য। আর শ্বশুরভাবে সে মনোরমাকে বুঝতে চাইতো। লোকে পরাজিত হয়। লোকে জয়লাভ করে। আদিত্য বারবার এসব সহজভাবে নিতে অভ্যস্ত। সুতরাং পরাজয়ে মাকে এভাবে বিধবস্ত হয়ে যেতে দেখে ও বিস্মিত হত। একটা সামান্য ব্যাপার, তার মা এই সামান্য ব্যাপারটাকে এরকম ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এ্যাংতাবড়ো করে তুলছে কেন? শেষ পর্যন্ত জমি কিনতে পারা অথবা মনোমত্ত জমি পয়সা বেশি না থাকার জন্যে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ব্যাপার আদিত্যের মায়ের কাছে জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে চলেছিল। শুধু কি ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তার জন্যে মনোরমা এ রকম উদ্বেগ হতে উঠেছিল? না। আদিত্যের তা' মনে হয় না। কেউই পরের জন্যে ততো বেশি উদ্বেগ নয়। সকলেই খানিকটা ভান করে বৈকি। ভানটাকে সত্য বলে ভাবতে চায়। তথ্যটি যা' অসত্য তা' স্বপ্নো সত্য নয়। আর সত্য নয় তা'

অসত্য। সারাদিন অমানুষিক ষোঁরাখুঁরির পর মনোরমাকে যখন আদিত্য বলতো, এবার তোমার কিছু খাওয়া দরকার। সেই সকালে খেয়ে বেরিয়েছো দু'খানা বাসি রুটি। এখন বেলা পাঁচটা। সঙ্গে সঙ্গে মনোরমার মুখে একটা অস্বাভাবিক উন্মত্ততার ভাব ফুটে উঠতো, স্থান কাল ভুলে প্রকাশ্য রাজপথে চাঁৎকার করে উঠতো মনোরমা গলার গির ফুলিয়ে, খাবো? কেন খাবো? খেতে হয় তুমি খাও। এই নাও পয়সা। চা বিস্কুট খেয়ে নাও। আমাকে খাবার কথা বোলো না। আদিত্য বুঝতো, জমিটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পরাজয়ের শ্মানিটা মনোরমা ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

আদিত্যের ওপর মনোরমা অস্বাভাবিক হারিয়ে ফেলেছিল অথচ তাকে ভখনো বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকতে গেলে একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরা চাই। আদিত্যের মনে হয়, তার মা বেঁচে থাকার জন্যে শেষ পর্যন্ত জমিকেই আগ্রহ করেছিল। জমি কেনার নেশা ভুলে পাওয়ার মত মনোরমাকে ধরেছিল।

মনোরমার শেষ অবশি জমি নিয়ে এমন একটা মরিয়্যা ভাব এসেছিল হয়তো কমকম বৃষ্টি পড়ছে, সেই জল মাথায় নিয়ে রাস্তা দিয়ে কেউ যাচ্ছে না, আদিত্য দাঁড়িয়ে পড়ছে কোন বাড়ির দওয়ার ওপর, মনোরমার কোন অক্ষেপ নেই, সময় বয়ে যাচ্ছে, মনোরমা নেবে পড়তো পথে, নিজের মনেই চলতে চলতে বকবক করতো, বৃষ্টি কখন ধামে তার ঠিক নেই। এইভাবে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে বিলাসিতা করবার জন্যে ত' আসি নি। বৃষ্টি ছাড়তে ছাড়তে একখানা প্লট দেখা হয়ে যায়।

ফলে আদিত্যকেও জলে নাবতে হত। জলে ভিজে টাইটুম্বুর দিক সীমানাহীন প্রকাশ্য প্লট পড়ে রয়েছে সামনে। কাদায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে ডুবিয়ে আদিত্যের মা চলেছে সামনে সামনে আর পেছন থেকে মনোরমার মাথায় ছাতা ধরে আদিত্য চলেছে পিছু পিছু এরকম কতোদিন হয়েছে।

মনোরমা এরই মধ্যে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেষ্টা করতো। শান্তিনাথ এখনো লোকজন না হলে বাড়ি থাকতে ভালো বাসতেন না।

ইতিমধ্যেই একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন আদিত্যের চোখে পড়তে শুরু করেছিল। অন্যান্য সময় শান্তিনাথ বাড়িতে থাকতেন। আজকাল পা হওয়ায় স্টেশনেও অপেক্ষা করতেন। বাড়িতে এসে মনোরমার পাশটিতে এসে বসতেন। মনোরমা কি কি করলো, কোথায় কি রকম জমি দেখল, কোথায়

কি রকম বৃষ্টির পরিচয় দিন মেরে হলেও, কতোখানি কষ্ট পেলে, এই সব ধারাবাহিক বিবরণ শুনতে শুনতে 'আহা, তোমার কি কষ্ট', 'সত্যি তুমি যদি লেখাপড়া শিখতে তাহলে উকীল-বারিস্টার হার মেনে যেত', 'দেখলি, তোর মায়ের বৃষ্টিটা একবার দেখলি', 'আহা, তাই তো গো', এই রকম মন্তব্য শান্তিনাথ করতেন মদ্যে একটা আধা-স্বাভাবিক, আধা-কৃত্রিম কৌতুহল বজায় রেখে। কিন্তু বেশ কিছুদিন হল শান্তিনাথকে বাড়িতে আর পাওয়া যেতো না মনোরমা সম্ভ্যার সময় ঠিক ফিরে আসবে জেনেও। মনোরমা রীতিমত অবাক হত। আদিত্য রীতিমত অবাক হয়ে ভাবতো তার বাবা কি তার মায়ের মদ্যকেও ভুলে গেছেন? এ মায়ের পাশে এসে বসে তার অভিযানের বিবরণ না শুনলে সকালে কি বিপদ হবে পিতা শান্তিনাথ কি তা' জানেন না? আদিত্য ভাবতো মনোরমা বৃষ্টি ভয় পেয়েছে শান্তিনাথ কোন দুর্ঘটনায় পড়েছেন ভেবে। অথবা বৃষ্টির অসুখ বেড়ে যাওয়ার দরের কোন ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়েছেন।

আদিত্য ক্রমে ক্রমে বুঝেছিল এ ভয় সে ভয় নয়। তার বাবা আর মায়ের মধ্যে যে বন্ধন এই সৈদিন পর্যন্ত অটুট ছিল, বহু বছর একসঙ্গে ঘর করার পর সেখানে ভুল বোঝাবুঝির অনেক গ্রন্থি পড়লেও সে বন্ধনের অক্ষয়-বটের পরমায়ু আদিত্য এমনিই জানতো।

বগড়ায় আর বিবাদে মানুষের মনের আক্ষেপ দূর হয়ে গিয়ে চিন্তা-শুদ্ধি হয়। শান্তিনাথ আর মনোরমা বারংবার বগড়া আর বিবাদের মধ্য দিয়ে গিয়ে চিন্তাশুদ্ধির পথে খানিকটা এগিয়ে গেছেন। আদিত্যের গাঢ়া হয়েছিল এরকম। কিন্তু এসব ধারণা ভুল ছিল। মনোরমা ভয় পেরেগিয়েছিল শান্তিনাথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

পালীগঞ্জবীর বাড়িতে যখন বিকেল নাবতো তখন টালির হাদের পিছনে আমার বোলের গন্ধে চারিদিক ভরে উঠতো। পড়ন্ত ছায়া দীর্ঘ হয়ে বাড়তো। পাখি-পাখালির ঘরে ফেরার চাঁৎকারে সহসা কখন কপালে চাঁদের টিপ সম্ভ্যা আসতো স্থান। মনোরমার এই সময়টাই খবরকাজ পড়ার সময়। সকল কাজ সারার পর মনোরমার ঐটুকু মাত্র বিলাস। এক একদিন সেই কাজও খুঁজে পাওয়া যেতো না।

সকালে কাগজ আদিত্য কোথায় পড়েছে কোথায় রেখেছে ঠিক মনে করতে পারতো না পরে। শান্তিনাথ আত্ম তীর ছাত্র-ছাত্রীরও পড়তে পারে। শান্তিনাথ নিজে কোথায় রাখতেন কে জানে। প্রতিমা কাগজ পড়তো না। আদিত্যরা

সকলেই জানতো। মনোরমার ঐ কাগজ পড়তেকুই যা আরাম। সেই আরাম-টুকুকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাই আদিত্য করতো না। মনোরমার অলঙ্ঘ্য আদিত্য তার অবিস্মরণীয় চরিত্র, অদম্য কর্তব্যবোধ, প্রচণ্ড স্বার্থভ্যাগ এসব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতো। এসব আলোচনা যে নিতান্তই হৃদয়শূন্য এটা মনে করার কোন কারণ নেই। অথচ মনোরমার আত্মটুকু আরামকেও মর্যাদা দেওয়ার কথাটা মনে থাকতো না কারুরই। ফলে, খবরের-কাগজ না পেয়ে তাঁর নিখাদে মনোরমা চাঁৎকাব তুলে আদিত্যদের অভিসম্পাদ দেবার ভাণ্ডারে বলতো, সামান্য খবর-কাগজ পড়ি। এটুকু মাত্র নেশা। কোন কাজ ত' আমার জন্যে করতে বাল না। সকলের সব কাজ ত' আমি করি। একটা খবরেরকাগজ, তাও ঠিকমত গ্রাধা যায় না? না বাক। এবার ওটুকুও ঘাটুক:

মনোরমা চাঁৎকার না করলে আদিত্য কি করতো বলা কঠিন হয়তো কাগজ খুঁজতে গা ঘামাতো না। কিন্তু এরকম বলসানো কথার পর তাবা প্রত্যেকেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতো: দর্শনীয়! হয়ে উঠতো তাদের অভিযান। ইন্দরের মত চঞ্চলগতিতে বাড়ির বৌ, ছেলে, বাড়ির কর্তা সকলে মিলে, সাজানো গোছানো সম্মা উল্টে দিয়ে খাটের তলা, কুলুঙ্গির গর্ত, বাগিসের তলা, ভাঁই করে রাখা বই-পত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজত। তারপর খবরেরকাগজ না পেয়ে এ ওকে দোষারোপ করতো।

শান্তিনাথ বলতেন আদিত্যকে, একটু আগে তুই ত' পড়াছলি। কোণার পুঁজড়ে রেখেছিস?

কেন যে পড়িস তাও বুঝি না। আদিত্য চুপ করে থাকতো না। বলতো, একটু আগে মানে দুপুরের দিকে আপনার হাতেই ত' ছিল খবরের-কাগজ। আমার বেশ মনে আছে।

তুই ভয়ানক মিথ্যাবাদী। শান্তিনাথ রাগ রাগ মশ্ব বিকৃত করে বুলতেন, দুই দুই। তোর সঙ্গে কথা বলাও পাপ। দুই দুই।

মনোরমা দাঁত-মুখ গিচিয়ে বলতো, নাও। এ ওকে দোষ দাও। খবরের-কাগজ খোঁজা এখন চলোয় গেল। তোমাদের কিছু বলই শুন্যায়। কাগজ আমি বিছানার তলায় রেখে দি। সেখান থেকে তোলা হয় কেন? আমার সবই ত' গেছে। ওটুকু পড়ে একটু আনন্দ পাই। তাও পড়বো না এখন থেকে। মনোরমার চোখে-মুখে জ্বলে উঠতো আগুন। আর কথাগুলো তখন আদিত্যদের সামনে দপদপ করে জ্বলতো। আর সেই প্রথম, আদিত্য শান্তিনাথকে দেখলো, এ ব্যাপারে

তাঁরও যে অন্যায় আছে, এ ব্যাপারে তাঁরও যে একটু খরদৃষ্টি রাখা উচিত ছিল সেটুকু বেমালুম ভুলে গিয়ে উনি কৌতুকের সুরে বললেন, সেই ভালো। কাগজ আর পোড়ো না। খচ করে উঠলো আদিত্যের কবের ভেতবটা। শান্তিনাথের জামাকাপড়ে অবস্মাৎ আদিত্যের নজর গেল। ধবধবে পরিষ্কার জামাকাপড়। হাতে একটি গাংপাল ফুল। আদিত্যের বিস্ময় মায়া ছাড়িয়ে গেল।

ক্রমেই আদিত্য বিশ্বমতার পথে বাড়িল। বাড়িতে আব কেমন থাকতে পারতো না। মনোরমার সঙ্গে জমি-জমার ব্যাপার নিয়ে আদিত্যের চুটির সময় কেটে যেত একরকম। খেসব রবিবারে মায়ের সঙ্গে আদিত্য যেতো না সে সব দিনগুলি ক্রমেই কাটানো শব্দ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। যেদিন থেকে প্রতিমা আবিষ্কার করলো আদিত্য কেবল তার শরীরই চেনে, মন চেনে না, চিনতে চায় না সেদিন থেকে প্রতিমা তার শরীর সম্বন্ধে আস্তে আস্তে সচেতন হয়ে উঠলো। আদিত্যের একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। এ মানব সন্তানই যে কেবল প্রতিমাকে আদিত্যের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছিল ঠিক তা নয়। অন্য কিছু, আরো বড়ো কিছু আদিত্যের কাছ থেকে প্রতিমার শরীর আগলে বাগছিল। আদিত্য রাত হলে প্রতিমার কাছে যেত। প্রতিমার গায়ে হাত লাগলেই ফোসকা পড়তো। প্রথম প্রথম সংগ্রামের কৌশলটায় একটা আর্দ্র ছিলো। রাগ করতো না প্রতিমা। অঙ্গহত খাড়া করতো। বলতো, লক্ষ্মীটি, এমন কোরো না। সামনে শেলাই-এর পরীক্ষা। পরীক্ষাটা মন দিয়ে দিতে দাও। বাড়ির রান্না আর কাজ এর ওপর সেলাই আর শেলাই-এর পড়াশুনো। ঢাপ পড়ে না? ভূমিই বসো। কিছু বলতো না আদিত্য। ক্ষমা মনে সরে যেতো। এই বলে আদিত্যের কাছ থেকে প্রতিমা মাস-তিনেকের ছুটি চেয়ে নিতো। অবশ্য সময় সময় একেবারে যে নিরাশ করতো তাও ঠিক নয়।

তবে আদিত্য এগলিকে দোহাই বলেই মনে হত। কেননা এই সব উপসর্গ যেদিন থাকতো না সেদিন প্রতিমা বলতো, ভয়ানক বদম পাছে। রাত দশটা বেজে গেছে। তোমার আর কি। আমাকে উঠতে হবে ছুটায়। উঠেই উননে আঁচ দিতে হবে। এই রকম বাধা দিতো প্রতিমা। আদিত্য তার বিবাহিত জীবনে একদিনও দেখলো না প্রতিমা কখনো আদিত্যের কথামত ওর শরীরে আদিত্যের অধিকার স্বীকার করে নিচ্ছে। কিন্তু এক একদিন যখন প্রতিমার মনের জটিলতা গলে যেত তখন আদিত্যকে ওর কাছেই যেতে হতই। এ ব্যাপারে প্রতিমা

ছিল অত্যন্ত উগ্র। ওর দবা ও হৃদয় করে ছাড়তো। তবে এগব বহুদে দু' চার দিনের বেশ নয়। এল আদিত্য যেতাই প্রতিমার শরীর স্পন্দন পরতে পারতো না ততাই হুও হয়ে যেতো। পাগলের মত হয়ে হাতের কাছে যা থাকতো তাই দিয়ে আশমার, খটো, আর্শ ফাটরে ফেনতো। ছিড়ে ফেনতো মশার। বইগুলি ধবে ঢুকরো ঢুকরো করতো। প্রতিমা ক্রোধে ব্রহ্মচর্য বটে কিন্তু রাগ বাহরে প্রকাশ না করার আশ্চর্য শাস্ত্র ওব মধ্যে সর্বদা সঞ্চিত থাকতো। ও আদিত্যকে গ্রাহ্যই কবতো না। কখনো মৃদু হাসতো। কখনো মৃখটা শূদুমার কঠিন করে থাকতো। কখনো দু' চার টুকরো কথা বলতো। সেই দু' চার টুকরো কথা আদিত্যকে বলসানোর পক্ষে যথেষ্ট। প্রতিমা বলতো, কামুক। কখনো বলতো, আমি টাকা দিচ্ছি যাওনা সেখানে। কখনো বলতো, বাড়ির ওই বিটা, ওতো আছে। ওকে পাবে। কিন্তু প্রতিমাকে আদিত্য কোকোতে পারতো না আসলে আদিত্য কি হারাতে চলেছে। আদিত্যের দেহের ক্ষুধা ছিল। তাকে আদিত্য অস্বীকার করতে চাইতো না। অত্যন্ত উলঙ্গ, অভব্য, জ্বলন্ত সেই ক্ষুধা। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো আরো এক ক্ষুধার সন্ধান আদিত্য ক্রমে পেয়েছিল। প্রতিমা যেতাই শরীর শব্দ করে রাখছিল, দাঁতে দাঁত চোপ তার সংস্পর্শ বাঁচাতে চাইছিল ততাই সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তারপর যখন তার দৈহিক শক্তি প্রতিমাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করতো, প্রতিমা নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়তো, তখন আসতো তার সুবর্ণ-সময়। সেই সময়ের দ্রুত সম্ব্যবহারের পর আসতো অসীম ক্রান্তি। এ আমার কি হল? এতো স্তম্ভ নয়। এতো পরাজয়। আমি জোর কবে আধিগত্য বিস্তার করতে গিয়ে এখন এ-কি গ্লানি ফোভ, অনুশোচনাময় মনোমুখ? আদিত্যের মনে হত হা হা করে সে কে'দে উঠুক। বিশ্বজগত কে'দে ভাসাক। দেহের ক্ষুধা বড়, তার চেয়েও বড় ক্ষুধাব তীর তাড়নায় আদিত্য তখন অস্থির হয়ে উঠতো। প্রতিমা ক্রমেই তার মূঠো থেকে পালাচ্ছে। ওকে আদিত্য অধিকার করতে চাইতো। কত'ই আনতে চাইতো। কিন্তু সেই উপরিসীম উল্লামবী নাবী আদিত্যকে তার অধিকারের অন্ন দেবে না কিছতেই। মনে হত, ওকে আদিত্য টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফলে। প্রতিমা আদিত্যের সমস্ত আক্ষেপ দেখতো স্থির হায়ে।

প্রতিমা দেখতো আদিত্যের চোখ দুটো কেবল পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। দু' দুটো কেমন কুঁচকে গোছ। উল্জনার আদিত্যের হাত-পাগুলি কেমন কাপছে।

কিন্তু আশ্চর্য এসবে ও একটুয়ো ভয় পেতো না। একটুয়ো উত্তেজিত হত না। জুথটা কঠিন করে প্রতিমা বলতো, যদি এখানে থেকে আমাকে নিয়ে যেতে পারো তবে আমাকে পাবে। না হলে নয়।

সেই প্রথম প্রতিমাকে আদিত্য চিনল। এই ভয়ংকর নারীকে অন্ত নিম্নে যেতে হবে? সেখানে এই ভয়ংকর স্বাধীনতাকামী নারীর সংগে একা একা দিন কাটাতে হবে? সেখানে এই নারী কি তাকে তার হাতের মৃত্যুর মধ্যে পেয়ে যাবে না? এরকম দয়ামোহন্য কঠিন হাবার মত মন যায়, তাব সংগে প্রতিমার মনোভেদ লড়াই-এ আদিত্য ত একা পেবে উঠবে না। এখানে তার বাবা আছে, মা আছে। পাড়াপ্রতিবেশী আছে। এদের সাহায্য পরোক্ষে সে প্রতিমার হাতে পাচ্ছেই। কোন কোনদিন রাগে পাগল হয়ে গিয়ে চাঁৎকার করে উঠেছে আদিত্য, ওর ভয়ংকর চুপ করে থাকার, মৃদু হাসিতে আদিত্যকে বিখণ্ডিত করার, একটা আঙুল তুলে আদিত্যকে অসাড় করে দেবার সাংঘাতিক শীতল ক্ষমতা দেখে আতঙ্কে আদিত্য চাঁৎকার করে ডেকেছে, যা, মা! রাত বাবাটা কি একটা হবে, মনোরমা তাড়াতাড়ি কি করেছে বো বলে ধড়মড় করে ঘুমচোখে উঠে এসেছে। তখন কোনরকমে নিজের লজ্জা আর অপরিচিন্তা শানি সামলে ও বসেছে, ভয় পেয়েছিলাম খারাপ স্বপ্ন দেখে। তুমি যাও। মনোরমা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাদের দু' জনের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলে প্রতিমা চোমাল শব্দ করে আস্তে আস্তে গলেছে, ভীত, ভীত, কোথাকার। মায়েব আঁচল ধরে ভেবেছো পরিচয় পাবে? ডাকো তোমার মাকে। সত্যি কথাটা জানিয়ে দাও। আমি কাউকে ভয় খাই না। মোখ কে আমার কি করে।

সংগে সংগে আদিত্য চুপসে যেত। এই অসীম শক্তির নারীর সামনে ও নতজানু হয়ে বসে পড়তো। চোখে জলে বুক ভেসে যেত। কাদছো কেন? প্রতিমা হাই তুলে বলতো, মেয়েহলে। এমা, এতবড়ো লোক, ছোট ছেলের মত কাদে! বলতে বলতে প্রতিমা গোলাপের মত হেসে উঠতো।

ক্রমশঃই মনে হত আদিত্যকে তার বাবা প্রবল বেগে টানছেন। রূপনগরের সুন্দরী মহিলারা, চটকদার টাইটি পরনে যুবকেরা, ডিস্পেনসারী ঘরে বসে থাকা প্রফেসর দল, পাকের উপবিষ্ট বৃদ্ধের জটলা, অফিসের সামনে দণ্ডায়মান অপরাধ বৃক্ষচূড়া, ওপারের হুমায়ুন চিশনী, স্ট্রীমারের সম্ভার সাইরেন, জেলোপাড়ার নগর সংকীর্তন-কোন কিছুই আর আবেশ জাগাতে সক্ষম হচ্ছে না। বেশ কিছুদিন ধরে মনের কন্ট

অসহ্য হয়ে উঠেছে। রাত্রি মিলন, আদিত্যের অকৃতার্থ ধীবনের মত কুণ্ঠিত এক চাঁদ ওঠে। বটগাছগুলির নীচে ক্রমেই জমাট হয় দৃশ্য। পাকের দিনে দিনে বৃষ্টির সংখ্যা বাড়ে। দোকানে বেশি করে খুন্দো দেয় দোকানদার। কাঁচা কয়লার উন্মূলগুলি গৃহীণীদের সম্মুখটিকে রীতিমত বিঘ্ন করে তোলে। রাত বাড়লে স্থলিতকণ্ঠ মদ্যপের বিচিত্র সংলাপ শুন। রাত আরো বাড়লে একদল যুবকের মধ্যে 'রাইট', 'লেফট' নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কানে আসে। অকস্মাৎ রাত্রিকে সচকিত করে বুকচেরা স্ট্রীমারের সিটি-বাঞ্চে।

মনোরমার বুকনি বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। সে এক অমানুষিক অবস্থা। মনোরমা চাঁৎকার করে বলছে, দরজাটা যে একটু বন্ধ করে যেতে হয় তা' কেউ জানে না। এখন এসব বললেই দোষ। দরজা খুলে মহাপ্রভু (শান্তিনাথ) বাইরে গেছেন। তারপর চারি হোক, যার যাবে তার যাবে। যারা বাড়িতে আছে তাদের কোন হুঁশ নেই। প্রতিমাকে মনোরমা বলল, সেলাই-এর পড়া আর এমন কি পড়া যে একটু এদিকে নজর রাখা যায় না? দরজাটা খোলা। ওটা ত' বন্ধ করতে হয়। প্রতিমা আদিত্যকে উদ্দেশ্য করে বলল, ও তো ভেতরে আছে। মনোরমা দ্বারকার দিকে বলল, তোমার ও-ও যেমন, তুমিও তেমনি। সবাই যদি এক রকম হয় তবে তো সবাই লুপেপুটে নেবে। এ হয়েছে কি জানো? হোটেলগানায় বাস। যার যখন ইচ্ছে বাড়িতে আসছে। যা ইচ্ছে তাই করছে। কারুর কি কোন হুঁশ আছে সংসারটা কিভাবে চলছে।

আদিত্য আস্তে আস্তে দাঁড় মাঝতে মাঝতে নেবে এলো সিঁড়ি দিয়ে। আদিত্যকে নিশ্চিন্তে সিঁড়ি বেয়ে নাবতে দেখে মনোরমা আরো জ্বলে উঠলো তেলেবেগুনে, সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না। মা মাগী জোগাড় করে আনবে ভিলের তেল। তারপর অল্প মৃদুতে। রা. উঃ, ভিলের গন্ধ উঠে আসছে তরকারী থেকে। কেন, ব্যাটাছেলে হয়েছে, জিভের তরিরং হয়েছে, কলকাতা থেকে 'আগ মার্কা' তেল নিয়ে এলেই হয়। সেটুকুও পারো না? গতকর সব আগুন লেগেছে।

আদিত্যের ছেলোটোরও ঘুম ভেঙেছে সে সময়। সে ঘুম ছেড়ে উঠে নিয়ম-মায়িক কাদতে আরম্ভ করলো। কাম্মা শুনো তিতিবিরক্ত পিণ্ডি-টটকানো ভেতোগলায় মনোরমা আবার চিল-চাঁৎকার করে উঠলো, কাম্মা কেন? শুলে যাবার নাম শুনলেই কাম্মা? আমি আর পারি না। আর আমার সহ্য হয় না। নাও ঐ ছেলের কান্না থামাও।

যা না হারামজাদা। শুলে যা না। পাঁচ বছরের হারামজাদা পেটভরে বুকনি খেয়ে শুলে গেল। তারপর শুল থেকে ফিরে এসে বলল, আমাকে একটু দোলনায় দোলাও না। মনোরমা ঠিক শুনতে পেয়েছে। রাগাধর থেকে। মারমুখী ভংগিতে মনোরমা চাঁৎকার করে উঠলো, এইবার তোর মরণবাড় বেড়েছে। শেষ-কালটা আমাকে দায়ী করা-ইচ্ছে। হাত-পা না ভেঙে একটা কাণ্ড না-বাধিয়ে তো থামবি না। খবরলাব, দুলতে পারবি না। মেয়ে পিঠের ছাল তুলে ফেলবো।

শান্তিনাথকে খানিকটা নিশ্চিন্ত দেবার জন্যে, বোকার ওপর শাকের আঁটি, মনোরমা বাজারে যাবার ভারটাও নিজের কাঁধে নিয়ে নিলো। আদিত্য বাজার যেতে পরতো না যে তা' নয়। সময় আছে। কিন্তু যখন মনোরমা নিজেই বাজারে যাচ্ছে, তখন আর আদিত্য বাড়তি উৎসাহ কেনই বা দেখায়? পরিগ্রহটা তা বেঁচে গেল। আর বাজারে যাওয়া মানে যুদ্ধ জয় করতে যাওয়া। ওখানে হেলাই কাম্মো। ও মা বুকে নিক। মনোরমা এজন্যে কিছু বলল না আদিত্যকে। আদিত্য স্বার্থপরতাব চরম দৃষ্টান্ত দেখলেও মনোরমা কখনো তাব কোন দোষ দেখতে পেতো না।

কখনো কোন অনুযোগ করলে না। হাঁফাতে হাঁফাতে যতোটা পেরেছে ততোটা বোটাছেলের কাজ করে গেছে। কখনো কুটোটি নেড়ে এক করতে দেয়নি। কিন্তু শান্তিনাথ যখন হারমোনিয়ম বাজারে একটু গান করে মনটাকে প্রফুল্ল করে নিতে চান, তখন যেন সাপের ল্যাঞ্চে পা পড়ে, মনোরমা ফোস করে উঠে বলে, বাজারেও শেষ পর্যন্ত আমাকে পাঠালে? লোকলজ্জা পর্যন্ত নেই। আরে আর ত' তোমার কন্ট দেখে যেতে চাইবোই। তা' বলে তুমি একটু রাখা দেবে না? এবার কি খোবার বাড়িতেও আমাকে যেতে হবে?

শান্তিনাথ হাস ছেড়ে দিলেন হারমোনিয়মের। দাঁড়িয়ে উঠলেন। বিরস, বিরস গলায় বললেন, মাগী জ্ঞানিলে খেলে। মাগী যেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। মনোরমা যখন এভাবে বকবক করছে, তখন ছেলোট আদিত্যের বারান্দার দোলনায় অপার আনন্দে দুলছে। ওর দিকে মনোরমার চোখ পড়ে গেল। মনোরমা অশ্রুত একটু হেসে বলল, তোরা আছিস ভালো। সবাই দুঃখিস আনন্দে। তোর দাদুর কোন ভাংনিচিন্তা নেই। হারমোনিয়ম নিয়ে সাতসকালে বসেছে নতুন গান তোলায় জন্যে। মিংসের ভীমরতি হয়েছে। হারমোনিয়ম কোনদিন এর আগে বাজাতে দেখলাম না। গোড়ায় গোড়ায় কত বর্গেছি, ওগো ওটা নীজাও।

জন্মে জন্মে ওটা যে নষ্ট হয়ে গেল। তখন কে শোনে কার কথা। এখন বয়েস যখন ষাট পৌরিয়ে সন্তবে পড়তে চলল এখনই তো হারমোনিয়ম বাজাবার সময়। খন্য তোর দাদু। খুব দেখালে বাবা। আর তোর বাপ, অফিসে একবার কাজ করতে যায় বলে অন্য কোন কাজে তাকে আর পাওয়াই যাবে না। তোর মা সেলাই-এব পড়াশুনা সাংগ করতে চলেছে। তাবপর পরীক্ষায় যেই পাশ হয়ে যাবে অর্মান বাইবে কাক্সর শুজুহাত দিয়ে পালিয়ে গিয়ে শামাকে বড়ো আঙুল দেখাবে। এদিকে ধতো দাশ ধতো দায়িত্ব আমার। আমাব হয়েছে স্বকমারি। তোরা সকলেই দর্লাছিস দোলনায়। একটু আস্তে দোল। আদিত্যের ছেলে শেষে কখাটাব মানে বুদ্ধতে পেয়ে আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে দুলতে লাগলো।

শান্তিনাথের পরিবর্তনগুলি ধীরে ধীরে শব্দ মনোরমার কেন সকলেরই চোখে পড়তে লাগলো। একটা বিস্ময়কর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মানুখটি যেন অন্য মানুখ হয়ে যাচ্ছে।

আদিত্য সেদিন কোথায় যেন যাচ্ছে বিস্ময় মনে।

শান্তিনাথের সংগে পথে দেখা হয়ে গেল। শান্তিনাথের পাশে একটি মেয়ে। শব্দ জন্মে গুঁরা হেঁটে হেঁটে ভরাটকলের হকদ আলোর ভেতব দিয়ে কোথায় যেন চলেছেন। আদিত্য বিস্মিত হয়ে গেল তার বাবার এতোখানি বাস্তব পায়ে হেঁটে চলে আসার ক্ষমতা দেখে। শান্তিনাথ আদিত্যকে দেখতে পেয়ে এগার লক্ষিত হয়ে উঠলেন যেন আদিত্যের উচিত হয়নি হঠাৎ তার সামনে আসা। শান্তিনাথ লক্ষ্য লক্ষ্য শব্দে বললেন, তোমার কি সময় হবে? আদিত্য রীতিমত চমৎকৃত হয়ে জিগোস কবলো কিসের সময়?

এই, একটু। শান্তিনাথ জমলেন। তারপর পয়সটি বছরের তাল আঁটির মত শক্ত মৃখটায় অপম্প লক্ষ্যার সিঁদুর ছাড়িয়ে মাথা হেঁটে করে বসলেন, সিনেমায়। যাবে? চন্দনাও যাচ্ছে।

এবার আদিত্যের বীতিমত বিস্মিত হবার পালা।

আদিত্যের যে বাবা গিরিডি থেকে এসে এখানে এই রূপনগরে পয়ত্রিশ বছর পার হবার পব সিনেমা কেন কাজে-পিঠে কোন খিয়েটাব, বাগা দেখেন নি, এই সেদিনো যিনি দ্দ পা হাঁটিতে গিয়ে বক ধড়ফড় করে মরতেন, গাড়ি চাপতে আজো ভয় পান তিনি আজ এতোখানি পথ হেঁটে এসে সিনেমা দেখতে যাচ্ছেন। এ ছাড়াও, শান্তিনাথ আদিত্যকে সিনেমা বাবাব নিঃসন্দেহ জানাচ্ছেন চন্দনার বৌবনের বিজ্ঞাপন দিয়ে? তাকিয়ে দেখতো আদিত্য চন্দনাব দিকে। চন্দনা ভগবানের

একটি অভিনব রচনা। রাজী হয়ে গেল আদিত্য। বাবা বললেন বলে নয়। পিতার অতো সুবোধ সন্তান কোনদিনই আদিত্য ছিল না। চন্দনার জন্ম নয়। বাবাব বিস্ময়কর পরিবর্তনটা যদি আচম্কা হঠাৎ বুঝে নিতে পারে তাই। কি সিনেমা সে দেখবে? ওসবে তার কোন-দিনই রুচি ছিল না। একেবারেই ভালো লাগতো না। জীবনে এতো যন্ত্রণা জমতে সদর কবেছে যে খোলামনে কোন কিছু উপভোগ করার মত মানসিক ষৈব তার তখন ছিল না। আদিত্য সিনেমা হলে তার বাবাকেই দেখতে থাকলো। এ রূপ ওনার দেখা ছিল না। সিনেমায় আসা আদিত্যের সার্থক হল। শান্তিনাথ অম্মত অম্মত কথা বলছিলেন। বোঝা গেল, উনি ইতিমধ্যে বেশ পরিশ্রম করে সিনেমা এ্যাকট্রেস এ্যাক্টবদের নাম মৃখস্থ করে ফেলেছেন। অনেক সিনেমাই ইতিমধ্যে দেখেছেন। চন্দনার সংগে উনি যখন কথা বলছিলেন, সেই কথাতৈ টের পাচ্ছিল

আদিত্য। কিন্তু চেহারা আজো গলিয়ে ফেলেন। তাই নিয়ে চন্দনা আদিত্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝে বুঝে চাপা দিয়ে হাসছিল। শান্তিনাথ এমন উম্মত উম্মত নাম বলছিলেন যে আদিত্যকে দেখিয়ে দেখিয়ে, চন্দনাকে হেসে গাড়িয়ে যেতে হচ্ছিল। আদিত্য কিছু জানে না মনে করে তাকে বুঝি বললেন, ওই যে লোকটা গান গাইলো ও নিজেই গলায় গাইলো না, বুঝি? ও লিপ' দিলো। শব্দ টাট নেড়েছে। পেছন থেকে অন্য লোক গেয়েছে। এ কথা বলতে বলতে শান্তিনাথের মৃখ আনন্দে আলোকিত হয়ে উঠলো। আব আদিত্য, যে রহস্য আজকাল গায়ের পেটের ভাবী শিশুর কাছেও রহস্য হয়ে নেই সেই রহস্যের ব্যাখ্যা, পাছে পাশের অন্যকোন লোক শব্দে ফেলে তাকে ভাড়া ভেবে বখেট আনন্দ উপভোগ কবে বয়ে এই লক্ষ্যার সে আড়ষ্ট হয়ে থাকলো।

শান্তিনাথ বখেট উৎসাহ নিয়ে



শান্তিনাথ লক্ষ্য লক্ষ্য শব্দে বললেন, তোর কি সময় হবে?

কোথায় পরিচালকের টি, কি রকম করে গল্প সাজালে ভালো হত, গ্যাশ-পার্শ্বিত কি-এইসব সম্বন্ধে উল্টো-পাল্টা নানাকথা বলেছেন। পেছনের সাঁট থেকে কেউ উত্থিত হয়ে বলে উঠলো, আঃ, এ বড়োটা দেখছি জরালিয়ে খেলে। তবু সব শুনেও উনি থামছেন না, ষোঁবনোচিত উৎসাহ নিয়ে, এস্তার ভুল করতে করতে চন্দনাকে, আদিত্যকে নানাকথা বোঝাচ্ছেন আদিত্যের মন তখন সিনেমার ছিল না, চন্দনার প্রতি ত' নয়ই, এই বম্ব ঘরের লোকজন ছাড়িয়ে, পর্দার ভিত্তি ভিত্তি গল্প ছাড়িয়ে এখান থেকে অনেক দূরে, যেখানে এই ভরা-বিকলে আদিত্যের মা সংসারের সমস্ত কাজ শেষ করে, ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে আদিত্যের ছেলের জন্যে ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করতে করতে এ সংসারের কি করলে আর বাড়ে এই সব ভাবছে, শুনকো মূড়ি চিবোতে চিবোতে— আদিত্যের মন ছিল সেখানে।

হঠাৎ আর একদিনের ছবি আদিত্যের মনে পড়ে গেল। কলকাতা থেকে সন্ধ্যায় ফিরে সেই প্রথম বৈদিন মনোরমা শান্তিনাথকে বাড়িতে তার জন্যে অপেক্ষা করতে দেখলো না সৈদিন হ্যানিকেনের রক্তাক্ত আলোয় মনোরমার মুখের ছবি স্পষ্ট হয়ে আছে আদিত্যের কাছে। মনোরমার সেই মুখে কি ছিলো সৈদিন আদিত্য তা ধরতে পারে নি। ভেবেছিল বাবাকে দেখতে না পেয়ে মা ভারছে বড়ো মানুষটা বোধ হয় দৃষ্টান্তীয় পড়েছে অথবা বুকের ধড়ফড়ানি হুতো বেড়ে গেছে অনেক তাই ডাক্তারখানায় গেছে। কিন্তু আজ, এখন, সিনেমা হলে শান্তিনাথের এ চেহারা না দেখলে আদিত্য এমন করে জীবনের রহস্য বুঝতে পারতো না। মনোরমা সৈদিন ভয় পেরেছিল অন্য কারণে। মনোরমা অস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যার জন্যে সে জীবন দিয়ে দিলো সে মানুষ আর তার নেই। আর তাকে দরকাব নেই।

হল থেকে শান্তিনাথ বেরিয়ে এসে রীতিমত কৃপাপ্রার্থী হয়ে বললেন, তোমার কি সময় হবে? যদি মাঝে মাঝে পড়া-শুনোর ব্যাপারে চন্দনাকে একটু দেখ। চন্দনা লজ্জার মুখ লাগ করেছিল। আর আদিত্য সময় কাটাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গিয়েছিল। চন্দনা অনেককাল আদিত্যের দিকে গভীর হৃদিত্বের তাকিয়েছিল। তাতে শব্দ কৃতজ্ঞতার লজ্জাই ছিল না।

অবশেষে বাদামতলার জমিই কেনা হল। অতি সুন্দর পজিসন। সামনে বিশ ফুট রাস্তা। দু' পাশই খোলা। একটু দূরেই বাস রুট, আশেপাশে সুন্দর বাড়ি। একটু পিছনে বিস্তৃত দিঘী।

চন্দনার পাক। মনোরমা জমির বন্দোবস্ত করে রীতিমত খুশি হয়ে উঠলো। এতোদিনে আদিত্যের জন্যে যেন কিছু একটা করে দিতে পেরেছে। মনোরমা জমির বন্দোবস্ত করে চপলা-বাঁলিকা মূর্তিতে হঠাৎ আশ্বাস ধরে বলল, কিছু খাওয়া বাপদা! মনোরমাকে খাওয়ানোর অঙ্গুর পীড়াপীড়ি আদিত্যকে করতে হয়। তাতেও কখনো সারাদিনের মধ্যে বড়জোর চার অথবা সাত নম্বাপসার বাদাম-ভাজা ছাড়া আর কিছু তাকে খাওয়ানো যায় না। আজ কিন্তু দিবা দু' দটো রাজভোগ পেটের মধ্যে চালান করে দিলো মনোরমা। সৌভাগ্য থাকলে এমন দৃশ্য দেখা যায়।

আদিত্য তার মাকে কখনো কোন ভালো জিনিস খাওয়াতে পারে নি। নিজে থেকে জোর করে যে কিনে আনতো চার আনার একটা মিষ্টি এই সামান্য জোরটুকুতো তার ছিল না। মায়ের জন্যে কিনতে গিয়ে আদিত্য বিয়ের আগে নিজের জন্যে কিনে এনেছে ভালোমন্দ। বিয়ের পর স্ত্রীর জন্যে কেনাকাটা করেছে। মাকে কিছু কিনে দেবার, কিছু খাওয়ানোর আর অবসর পেল কোথায়? অবশ্য মনোরমাকে কিছু কিনে দিলেই যে মনোরমা তা ভোগ করবে মনোরমা সে বান্দাই ছিলো না। আদিত্যের সেই মাই হাওড়া স্টেশনের শাবারঘরে বসে দু' দটো রাজভোগ নিজে খেতে চেয়েছে, পৃথিবীতে এর চেয়ে আশ্চর্যের আর কি আছে! গভীর কৃষ্ণের সংগে মনোরমা থাকে। এ দৃশ্য আদিত্যের চোখে সৈদিন জল এসে গিয়েছিল। জল আরো আসতো যদি তখন আদিত্য জানতো এই হাসি তার মায়ের শেষ হাসি।

বাদামতলার জমি নিয়ে এবার রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠলো মনোরমা। এ ছাড়া মনোরমার বেঁচে থাকার কোন উপায় ছিল না। অতএব এখানে বাড়ি তুলতে হবে। তারপর সেই বাড়ির নিচটায় দোকানঘর অথবা গরি ইত্যাদি রাখবার বন্দোবস্ত করে ওপরতলাটার নিজের থাকবার মত একটা বন্দোবস্ত খুব তাড়াতাড়ি করা চাই। বসে থাকলে চলবে না। টাকা কোথায়? গিরিডির বাড়ি আছে। বাড়িটা জবরজুং। পুরাতন জামলের সিম্ধুকের মত। ওখানকার ভাড়াটেরাও সুবিধের নয়। বাড়িটার বয়েস হল অনেক। আজ এদিকে ভাঙছে। কাল ওদিকটা। নড়বড়ে দাঁতের মত অবস্থা বাড়িটার। এর সমস্ত দায় এখনো মনোরমা সামলে ধাচ্ছে। মনোরমার অবর্তমানে পারবে আদিত্য এতে দায় এ এক বাড়ি নিয়ে সামলাতে? সত্যতঃ ওটা বিক্রী করতে হবে। সংগে সংগে পুরাতন বাড়িটাকে মনে হল বিভীষিকা। ওটা চোখের সামনে থেকে সবার কোন

দৃষ্টান্তকে যেন লালন করছে। বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে আদিত্যকে মনোরমা ভাড়া লাগাতে লাগলো। শান্তিনাথকে বলল, বাড়ির প্রায় কোন ভালো লোককে দিলে করিয়ে নিতে। বাদামতলার জমি। অতএব বাদামতলার মিউনিসিপালিটিতে জোটা-ছটি করতে লাগলো আদিত্য। এদিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গেছে হিন্দী ও বাংলা কাগজগুলিতে। সমস্ত চিন্তা মনোরমার। আদিত্য শব্দ হুকুমমত কাজ করে গেছে। মনোরমা জমির ভ্যান্ডেশন বিবেচনা করে দাম ধরেছিল আটটিশ হাজার টাকা। কিন্তু বৃন্দের জুটেতে লাগলো না তেমন। যতো দিন যায় মনোরমা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একি! হচ্ছে না কেন বিক্রী? মনোরমার কোন দিকে হুঁশ নেই। যেমন করে হোক একটা বাড়ি। পুরাতনকে বিসর্জন দিয়ে একটা নতুন কিছুর একুশি-হেসে ওঠা চাই। সমস্ত ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করা বসতাবে আদিত্যের। কোন জিনিসকে সে সঠিক ভাবে ভাবতে পারতো না। তাই মায়ের এই চাপল্য জরুরোত্তর রুগীর হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত হাত-পা নাড়া বলে বারবার মনে হয়েছে। আরম্ভটা যার এত সুন্দর, আদিত্য যেন উপলব্ধি করতে পারতো, তার পরিণতি অমোঘভাবে বিসাদেব। এতো ভালো ভালো নয়। খোঁজ নিয়ে আদিত্য জেনেছিলো ভাড়াটে বাড়ি সহজে কেউ নিতে চায় না, কেননা অনেক রক্তাক্ত আর কাঁঠড় পুড়িয়ে তবুই ভাড়াটেদের তোলা যায় কেননা আইন নাকি ভাড়াটেদের প্রতি সন্তানুভূতিশীল। প্রতিমার সঙ্গে আদিত্যের সম্পর্ক তখন আর তেমন ছিল না। মন যখন ও পার্যনি তখনো হাতের কাছে ছিল দেহ। সেই দেহও দলভ হল। বোঝাটাকে কোন বন্ধন আদিত্য টের পেলো না সন্তান ছাড়া। সে সন্তানও আবার প্রতিমার সর্বস্ব। নেশার ঘোরে আদিত্য তার মায়ের সংগে কাজে নেবে গেল। তাকিয়ে দেখতো না আদিত্য প্রতিমার দিনগুলি তখন কেমন চলছে। প্রতিমাকে ঘিরে কোন আনন্দ অথবা বেদনার বোধ তখন আর ছিল না। প্রায় স্যাংসনের জন্যে মনোরমার পরামর্শ মত আদিত্য টিফনের সময় ভদ্রলোকটিব-হাতে একশো টাকার নোট গুঁজে দিলো। সদর নাথডিভিশন্যাল অফিসে গিয়ে সিমেন্টের জন্যে একে ওকে বস দিলো। মাসের পর মাস চলে গেল। সিমেন্ট যিনি তদারকি করেন তিনি বললেন, আপনাদের ত' বেকমেন্ট হয়ে গেছে। এ্যালোটেমেন্ট শব্দ বাকি। এ্যালোটেমেন্ট কবে হবে? না, মাল এলেই হবে। আদিত্য বলল, আমাদের কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট উপপ্রায়োরিটি দিচ্ছেন। সিমেন্ট যিনি তদারকি করেন তিনি বললেন, ওরকম উপ প্রায়োরিটি ম্যাজি-

ଆଦିତ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟ

ଲିଲି
 ବ୍ରାଣ୍ଡ
 ବାଲି



ଲିଲି ବାଲି ମିଲ୍ସ, ଶ୍ରୀ: ଲିଃ କଲିକାତା-୫

স্ট্রেট সবাইকে দেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে একটা ইস্যু পারামিট লিখিয়ে আনুন। আর এদিকে খোঁজ নিন কোন ডিলারের কাছে মাটি এসে পৌঁছেছে কি না। ম্যাজিস্ট্রেটকে বলতে ম্যাজিস্ট্রেট সাফ জবাব দিয়ে বললেন, ওসব কথা এখানে নয়। আপনি এস, ডি, ও-কে ধরুন।

আদিত্য র্যাকে যে নেবে তারও উপায় নেই। গাড়ি গাড়ি মাল পাচার হচ্ছে যাচ্ছে তার বেলা এনফোর্সমেন্ট স্বাণ্ড কিছু বলছে না। আর এদিকে যেসব বোঝাই গাড়ির ভেতর লুকিয়ে দ্রুত চার বস্তা মাটি আনলেই কলার চেপে ধরছে। শান্তিনাথ এমন সাংসারিক ব্যাপারে বিশেষ থাকতেন না। মনোরমা যখন বাড়তি টাকা না থাকার জন্যে সিমেন্ট র্যাক থেকে কিনতে পারছে না বলে হাঁসফাঁস করছে সেই সময় শান্তিনাথ মনোরমাকে একটা প্রস্তাব দিলেন।

শান্তিনাথ বললেন, আজকাল আইন হয়েছে। বাপের সম্পত্তিতে মেয়েরও অংশ আছে। তুমি তোমার ভাই-এর কাছে থেকে তোমার অংশ চেয়ে নাও। তোমার স্বর্গগত পিতা বরং এতে খুশীই হবেন।

শোনামাত্র মনোরমা জ্বলে উঠলো। এমন টাকা কেউ যোগাড় করতে পারে না, যে একশো টাকা দিচ্ছে সে আজন্ম একশো টাকার বেশি এক আধলাও দিচ্ছে না, এদিকে পরের টাকার দিকে লোভ?

কেন, পর কেন, ওতো তোমার টাকা শান্তিনাথ বললেন, ওতো তোমার পাওনা। মনোরমা বলল, আমি মনে মনে ঠিক করছিলাম ও টাকা আমি আমার ভাইকে নিয়ে দোব। ওর বড়ো সংসার। অনেক দায়। অনেক দায়িগ। সে হিসেবে ত' আমি ঝাড়া হাত-পা। আমার একটা মেয়ে পৰ্ব্বন্ত নেই যে তার বিয়ে দিতে হবে। না, না। ওদিকে তুমি তাকিয়ে না। যেতো কটেকচালে তোমার বৃদ্ধি। শান্তিনাথ তখনকার মত আর কিছু বললেন না। দিন যায়। আবার গিরিডিব বাড়ি নিয়ে কামেল্য। শুরুর হয়। আবার একজন প্রজা সাবলেট করেছ। সিঁড়ির দুটো ডুম পাওয়া যাচ্ছে না। ওপরের কলটা কে ভেঙে দিচ্ছে। শরীরটা মনোরমার ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি নিয়ে এইসব উপপাত-গুলো ক্রমশঃ বাড়ছে। বাড়তির একটা গতি হচ্ছে না। খন্দের দু' চারজন যে আসছে না তা নয়। তারা আসছে, যাচ্ছে, তারপর একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার দিয়ে মোটের গিয়ে উঠছে। এদিকে বাদামতলার জমির ট্যাক দিয়ে যেতে হচ্ছে। নিভুলভাবে। আশেপাশে সুন্দর সুন্দর বাড়ি উঠে গেল। শুরুর আদিত্য-

দের জমিটাই তখনো খালি। প্লান তখনো স্যাংসন হয় নি। সিমেন্ট এখনো পাওয়া যায় নি। মনোরমা মৃদু মেনে-ছেলে। একা কতো আর করতে পারে। মনোরমা মাঝে মাঝে অদৃষ্টাণে জমি-টাকে দেখে আসে। শুরুর একবার চোখে দেখে আসা। শান্তিনাথ সব শ্রুনে ফের বললেন, সবই তো বৃদ্ধি। টাকার অভাবে সব পড়ে আছে। প্লান 'সাংসন করতে গেলে আরও ঘুস দিতে হবে। সিমেন্ট যে দেবে তাকে দিতে হবে মোটরকম। এতেও হবে না। র্যাক থেকে কিনতে হবে। তার জন্যে টাকা চাই। এই ত? টাকা ত' তোমার কাছেই আছে। তোমার সম্পত্তি তুমি চেয়ে নাও। তোমার জন্যে চাইছো এটা ভাবছো কেন? তুমি আমি আর কদিন। চাইছো তোমার ছেলের জন্যে।

মনোরমা এবার আর চোঁচামেচি করলো না। যম-ধরা মৃদু সবটাই শ্রুনে গেল। তারপর অসুস্থ মৃদুটা থেকে পাকা চুল সারিয়ে আস্তে আস্তে কল, ভায়ের অবস্থা ধারাপ জেনেও আমি চাইছি। সম্ভানই বলা আর যাই বলা, এইভাবেই ত' মানুষ ছোট হবার একটা অঙ্গহাত খাড়া করে। যা পারো করে।

শান্তিনাথ বললেন, সম্পত্তি তোমার, চাইতে যারো আমি?

তা' না হলে কে চাইবে? মনোরমা খাঁকিয়ে উঠে বললে, দরকার তোমার? আমি ত' আমার সম্পত্তি মনে মনে ভাইকে দিয়ে দিয়েছি। আমি অন্তত নীচ নই, লোভী নই, এটুকু গর্বও তোমার সংসার আমার রাখতে দিলো না। আমি কোথায় মৃদু লুকোই বল ত? বলতে বলতে মনোরমা অঝোরধারে কাদতে লাগলো। শান্তিনাথ রাগ করে নিজেই চলে গেলেন মনোরমার ভাই-এর কাছে। মনোরমার ভাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সব কথা শ্রুনে আ তারপর আস্তে আস্তে বলল, ঠিক আছে। অনেক দিন থেকেই শান্তিনাথ ভেতরে ভেতরে ব্যথিত হয়ে উঠছিলেন মনোরমার জন্যে। উনি চাইছিলেন মনোরমাকে নিজের নিয়মে বাঁচাতে। উনি একদিন বললেন, ও বাদামতলার জমিতে বাড়ি উঠবে না। ওসব দুরাশা ছেড়ে দাও। টাকা যোগাড় করাই শুরুর সমস্যা নয়। তোমার ছেলের অফিস। আমি অতোদূর যেতে পারবো না। তুমি একা মেয়েমানুষ। কখনো সম্ভব তোমার পক্ষে ওখানে বাড়ি তোলা? দেখটা কি মারা পড়বে পাক্ষম করতে করতে? মনোরমা সিবস্ময়ে চেয়ে দেখলো শান্তিনাথের দিকে। লোকটা কোনদিন কোন কাজ করলো না কিন্তু কাল পশু কবে দেবার অশ্রুত ক্ষমতা লোকটার। জমিটা কেনা হয়েছে মাত্র বছরখানেক। এমন কি কতি হয়েছে। থাক না পড়ে আরো দ' বছর। ইতিমধ্যেই আমেলা

চোকাবার জন্যে গারে ঠান্ডা জল ঢেলে দিচ্ছে। মনোরমা রেগে হিংস্র হয়ে স্বাধিক চোখ দুটি দিয়ে আগুন বার করে বলল, কে তোমাকে উপদেশ দিতে ডেকেছে? তার চেয়ে পাকা চুপে কলপ লাগিয়ে ফলকোঁচা হাতে নিয়ে ফরফুরে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াও। শান্তিনাথ কলপ লাগানো চুল ঠিক করতে করতে 'বেশ' বলে মনঃক্ষুদ্র হয়ে চলে গেলেন।

চন্দনার ব্যাপারটা আদিত্য ঠিক বৃদ্ধতো না। ও আসতো তাদের বাড়ি। শান্তিনাথের কাছেই আসতো। শান্তিনাথ ওর সঙ্গে রগরসিকতা করতেন। শান্তিনাথের ব্যাপারটা আদিত্য বৃদ্ধতো। শান্তিনাথ এ বাড়িতে কারদ্বয় সঙ্গে পেতেন না। মনোরমা ত' সবদাই দু'ব দু'ব করতো। প্রতিমা আর আদিত্য তাদের দু'বোঝা সম্পর্ক নিয়ে, নিজেরদের অস্তিত্ব নিয়ে সর্বদা এমন বিপদ থাকতো যে বাবাকে কেন, সকলকেই তারা ভুলে গিয়েছিল। স্নানমৃদু ক্রমশঃই তাবা কয়ের পক্ষে বাড়ছিল। আদিত্যের নিঃসঙ্গ পিতা কি আর করেন? শুরুর ছিল যে কটা দিম আরো বেঁচে থাকেন সে কটা দিনকে সহ্য কবাব ক্ষমতা আয়ত্ত করা। সে ক্ষমতা, সিবস্ময়ে আদিত্য দেখতে লাগলো, তারা আয়ত্ত করতে পারে নি বাট, একটা দিন বেঁচে থাকাটা তাদের কাছে প্রতিদিন সমস্যা হয়ে দাড়িয়ে, কিন্তু এই মানুষটি, তার বাবা, শান্তিনাথ তিনি দ্রুত আয়ত্তে আনতে চলেছেন।

চন্দনাকে শুরুর করতে নানারকম গল্পের বই পড়েন। তাকে গল্প শোনান। চন্দনা নিজে সিনেমা যেতে পারে না একা একা। দাদর বয়সী যদি কোন পরিচিত লোককে পাওয়া যায় তাহলে তার বাবার সিনেমায় আপত্তি নেই। চন্দনাই শান্তিনাথকে নিজের অজান্তে বৌবনের উত্তাপ দিয়ে, মাদকতাময় চোখ দিয়ে, স্নেহ আর সুমিষ্ট ব্যবহার দিয়ে ক্রমশঃই সুস্মার তীরে পৌঁছে দিচ্ছিল। চন্দনাকে আদিত্য পড়ার। চন্দনা কি শোনে চন্দনাই জানে। ও অর্ধপ্রহর আদিত্যের দিকে চেয়ে থাকে। কি দেখে ওই জানে। মাঝেমাঝে বিনাকারণে পড়তে এসে গোল্জ হয়ে থাকে। আদিত্য কোন গর্ব বা অহংকার প্রকাশ করে না তবু থেকে থেকে গভীর রহস্যময় ভাবের বলে 'আপনি বড় অহংকারী'। আদিত্য বোঝে না এ অতোটুকু একটা মেয়ের মধ্যে কি সব খেলা শুরুর হয়েছে!

চন্দনা মাঝে মাঝে বাবার তৈরি করতো নিজের হাতে। খোঁজ নিতো আদিত্য খেয়েছে কি না। না খেলে সেদিনকার মত কথা বলা কথ করতো। শান্তিনাথ ক্রমশঃই সুন্দর হয়ে উঠছিলেন। পরিষ্কার করে দাড়ি কামাতেন। ভোব-

বেলা গিয়ে ঘসে ঘসে ডেল মেখে গঙ্গা স্নান করতেন। ছবাক্সমশকাম-স্বকে প্রণাম নিবেদন করতেন। চুলে কলপ দিতেন। পরিপাঠি করে তাচড়ে টাক ঢাকা দিতেন। ফসাঁ ধুতি-পাঞ্জাবী পরতেন যথাসম্ভব। একটু এসেন্সও ঢেলে দিতেন জামা-কাপড়। বাড়িতে থাকতেন না বেশিরভাগ সময়ে। বাড়িতে অর্ডপ্রহর মনোরমার কক'শ টীংকাল আর, কাম্বাকাটি, শাপশূনি লেগেই থাকতো। দীর্ঘদিন এসব ত' শুনেন এলেন। এখন আর এসব শুনতে বা সহ্য করতে একদম পারেন না। ওর কাছে এখন আর বাড়ির লোকেরা কেউ নয়। মনোরমার জন্যে কতো দরদ ছিল শান্তিনাথের। আদিত্য এসব কিছু, কিছু দেখেছে। আদিত্য কতো স্নেহ, ভালোবাসা পেয়েছে। এখন যেন আদিত্যদের বাড়ির মানুষগুলি প্রত্যেকেরই পাতাকের জন্যে আলাদা করে এক-একটি নির্জন জগৎ তৈরি করে ফেলেছে। সে জগৎকে নিম্ন-কানুন প্রত্যেকেরই ভিন্ন। প্রতিমা নিজের অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহাকে নিয়ে কি করবে সেই চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত। আদিত্য তার যাবার মৃত্যুচিন্তার অনিবার্য বিষাদকে ভাড়াবার জন্যে একদিন প্রতিমার আগ্রহ নিয়েছিল, আর সে আগ্রহ ভেঙে গেলে মনোরমার বাড়ি তৈরিবার পরিকল্পনাকে বিভোর হয়ে যেতে চাইলো। শান্তিনাথ প্রত্যেক দিনকে সুন্দর করবার রহস্য জেনে ফেলে তাকে বাহার কবছেন গুড়ী বিন্ধ্যায়। হয়তো এক প্লাস জল দিতে বলতেন প্রতিমাকে। প্রতিমা এক প্লাস জল দিলে গভীর তৃপ্তিও সঙ্গে সেই জলটুকু পান করতেন। সুন্দর করে বলতেন, যা ভেঙা পেয়েছিল না, তুমি আমার বাঁচালে। তুমি না দিলে জল খাওয়াই হোত না। ভারি ভালো তুমি। মনোরমাও বিভোর হয়ে থাকতো বাড়ির স্বপ্ন নিয়ে অসুস্থ শরীরে। মনোরমা গজ গজ করলে শান্তিনাথ জোরে জোরে হারমোনিয়ম বাজাতেন। মূর্চকি মূর্চকি হাসতেন। একটুয়ো অন-যোগ করতেন না। বিরক্ত হোতেন না। আর চিরকালের সংশয়ী আদিত্য তার পিতার এই রূপান্তরকে কেমন নির্ভর মনে হত। শান্তিনাথকে ও বলতো বাড়ি নিয়ে একটা কিছু করুন। ঘেস, চপ, সুন্দরিক কোথা থেকে আনতে হবে এর একটা ব্যবস্থা করুন। সবই মা করবে? আমায় আর কেন? শান্তিনাথ হাসতেন। আদিত্যকে বলতেন, তোমার মাক এখানে বাঁচাতে পাবে। বাদামতলার জমিতে বাড়ি কখনোই উঠবে না। যদি ওঠে তবে তোমার মায়ের হাড়ের ওপর উঠবে।

মনোরমা কোথায় থাকতো কে জানে। মাজাভাড়া কোমরটা যথাসম্ভব খাড়া করে

মনোরমা বলতো, দরদ বেখাতে এসো না, বুঝলে? দরদ আমি বুঝি। আমার ঘুম পাতলা। পাছে ভেঙে যায় তাই সকলকে চাপ করতে বলতে। বারান্দায় যাতে উটকো লোক বসে চেঁচামেচি না করতে পারে, সারাদিনের খাটনির পর যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, সেই জন্যে বারান্দায় জল ঢেলে রাখতে, যে কোন কারণেই হোক আমাকে খুঁজতে সব সময়। এখন ত' বাড়িই থাকো না একদম। সে সব দিন নেই আর। পাছে লোক নোষে তাই আগে থেকে দোষ কাটিয়ে রাখছো। একটু থেকে মনোরমা আবার অদম্য হয়ে উঠতো। একটু নুয়ে পড়ে আবার সতেজ হয়ে উঠতো, ঘোষণা করার মত চোঁচিয়ে বলতো, এই শোন তোমরা। বাদামতলার বাড়ি আমি ভুলবোই। আমি নিজে গিয়ে এই ভাড়া শরীর নিয়েও মজুরণীদের সঙ্গে খোয়া ভাঙবো। দরকার হলে ইন্ট বইবো মাথায় করে। দোঁখ, বাড়ি ওঠে কি না।

প্রতিমা হঠাৎ একদিন আদিত্যের ডান হাতখানা ধরে টানলো। আদিত্য চমকে উঠলো। ব্যাপার কি। আদিত্যের গায়ে যে প্রতিমা হাত দিতে পারে এটা আদিত্য ভুলেই গিয়েছিলো। কি হল আবার? প্রতিমা ধর ধর করে কাঁপতে

কাঁপতে বলল, কি ভেবেছো? অহংকার হয়েছে দেখছি।

মনে পড়লো অহংকারের বদনাম আদিত্যকে চন্দনাও দিয়েছিলো। সেদিনো ওর কথাটা বুঝতে পারে নি আর এখন প্রতিমার অভিযোগটাও তেমনি বুঝতে পারলো না। বললাম, রহস্য করছো কেন? অহংকার ত' তোমার। গায়ে হাত দিয়ে ফেললে তোমার জ্বর আসে। প্রতিমা তখনো ধর ধর করে কাঁপছে তবু যতোটা সম্ভব স্থির গলায় বলল, দেখ, বাড়াবাড়ি কোরো না।

আদিত্য শান্ত গলায় বলল, বাড়াবাড়ি আমি করি না। আমি সব জেনে গেছি। যে সব জানে সে কি বাড়াবাড়ি করে?

আদিত্যের কথা প্রতিমা বুঝতে পারলো না অথবা বুঝতে চাইলো না। নিজের চিন্তার নির্জন জগতে ডুবে থেকে ধীরে ধীরে ও বলল, তুমি কাছে আসো না কেন আর? আমি না হয় আসতে দিই নি। আগেও ত' দিতাম না। তখন ত' আসতে। এখন আসো না কেন? মানুষ বলে যদি মনে না কর মেয়েমানুষ বলেও মনে করো না আমাকে এতো তোমার অহংকার? আমাকে চাই না তোমার? এক সম্ভানের বাবা হয়েই মনে করছো মন্ত বড়ো বাবা হয়ে গ্যাছো?



প্রতিমা কথাস্থাপন করে ভড়ক করে কেঁদে উঠলো। আদিত্যের বুদ্ধি, আঁপের পড়লো। তাঁরপর উগ্র আক্রোশে আদিত্যের জামা দুহাতে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলল। কিন্তু আদিত্য ঠিকই বলেছিলো। এখন আর সে চণ্ডল হতে পারে না। ধীরভাবে সে বুদ্ধিতে চাইলো প্রতিমাকে। স্পর্শই সে দেখলো—এ প্রতিমার প্রেম নয়। এ সেই পুরাতন, পরিচিত, সেই অদম্য স্বাধীনতা স্পর্শ। একদিন আদিত্য ওকে চেয়েছিলো স্বামীর অধিকারে, প্রেমের দাবীতে, পুরুষের প্রয়োজনে। আদিত্য চেয়েছিলো বলেই যে প্রতিমা তার অধিকার মেনে নেবে, প্রেমের জন্যেও এতটা প্রস্তুত প্রতিমা ছিল না।

আর এখন আদিত্যকে অস্বীকার করে করে ও আদিত্যের মধ্যে এমন একজনকে জাগিয়ে নিয়েছে যে নিজেও পারে সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করতে। কঠিন হওয়া আদিত্যের উচিত ছিল না। শেষ অন্তত আদিত্যের চোটে মানার না। তবু আদিত্য আস্তে আস্তে বলল, তোমার জন্যে দুষ্ট হচ্ছে প্রতিমা। তোমার কি সাংঘাতিক শক্তি ছিল আমাকে অস্বীকার করার, এই সেদিনো? এখন তুমি আর পারছো না। ফুরিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমা তখনো থর থর করে কাঁপছিল। অসম্ভব চোখ দুটি থেকে একটা অস্বাভাবিক দীপ্ত ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ প্রতিমা ফিট হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

বাড়ি তৈরীর কাজ বিপুল উদ্যমে চলেছে বাদামতলায়। আদিত্য কাজ দেখতে পারছে না। শান্তিনাথের পক্ষে অতোদূরে গিয়ে কাজ দেখা সম্ভব নয়। কিভাবে যে মনোরমার ওখানে দিন কাটছে তা অবশ্য আদিত্য জানে।

আদিত্য অফিস থেকে ফেরার পথে প্রতিদিনই ওখানে যায়। মনোরমা একাই সব কিছু বন্দোবস্ত করে। কে জোগাড়ের কাজ করবে, কোথায় আছে বিলাসপুরী ছান পিটুনীর দল, কে কাজ করবে ফুরোনে, কে করবে মজুরের কাজ, কোন ইন্ট 'এ' ক্লাস, কোন কোন জায়গা থেকে চন্দ-সুদরীক-বেস আসবে, মিস্টারীরা শোবে থাকবে কোথায়—এসব বন্দোবস্ত মনোরমা একা মেয়েছেলে করেছে। সমস্ত দুপুর ঠায় এ চক্রে রোদে দাঁড়িয়ে থাকে। মিস্টারী অথবা মজুর কাজে এতো-টুকু ষাতে গাফিলতি না দেখাতে পারে। বাড়ি এসে আবার প্রত্যেকের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে খাতায় প্রতিদিন হিসেব রাখে। রাখতে রাখতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যায়। খিদে থাকে না। কোন রকমে গা-টা একটু ধুয়ে একখানা শুকনো রুটি চিবিয়ে চপচাপ শুয়ে পড়ে অসুস্থ শরীরে স্বপ্ন নিয়ে। স্বপ্নে যে আছে তা

জানায় না। কোনরকমে হঠাৎ গায়ে হাত দিয়ে ফেলালে টের পাওয়া যাবে শুধু। অন্য সময় আদিত্য দেখতো তার মা ছোট মতো একটা ছাউনি করে নিয়ে মিস্টারীদের কাজ দেখাশুনা করছে। বারণ করবে কি অতো পরিশ্রম করতে নিষেধ করে? আদিত্যকে দাবড়ে দিয়ে মনোরমা বলতো, নিজের কাজ, পরের কাজ ত নয়। পরিশ্রম করতে হবে না? এমনি হবে? হাওয়ার?

কিন্তু আদিত্য স্পর্শ দেখতো, কেমন একেবারে বোঁকে গেছে তার মায়ের। মিস্টারীদের সঙ্গে চীৎকার করে করে গলার স্বর একেবারে বেসে গেছে। দুটো হাত খোয়া ভাঙার জন্যে ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

আদিত্য বলতো, এ পাগলামি। এতো তাড়াহুড়ো কেন?

তাড়াহুড়ো? মনোরমা অস্বস্তি গলায় বলতো, পঞ্চাশ বছর বয়স হল আমার। কাল মরণ হলে কাল বাঁচি। শুধু এই বাড়িটা। এটাই আমার আটকে রেখেছে। এ বাড়ির শেষ হলে আমারও শেষ।

তোমার এতো অহংকার কেন? আবছা অস্বাকারে শান্তিনাথ আদিত্যকে একেবারে বিমুগ্ধ করে দিলেন।

কেন, কিসের অহংকার? সবিস্ময়ে আদিত্য তাকালো শান্তিনাথের দিকে। একটা মেয়ে তোর সঙ্গে একটু মিশতে চায়, গল্প করতে চায়, তোর সঙ্গে একটু বেড়াতে চায়, তোকে একটু ভালো-বাসতে—

কথা বলতে বলতে শান্তিনাথ ইলেকট্রিক আলোর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাকী কথাটা আর শেষ হল না। স্বর স্বর করে শান্তিনাথ কেঁদে ফেললেন। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে আদিত্য সেই সাতসটি বছরের বন্ধুকে সন্তোরা বছরের চন্দনার জন্য কাঁদতে দেখলো। কিন্তু আদিত্য কি করতে পারে? আদিত্য চন্দনার হাবভাব দেখে নি যে তা নয়। ওর চোখে কিসের ক্ষুধা ও জানে না যে তা নয়। ওর চলনে বলনে কিসের ইসারা আদিত্য যে বোঝে না তা নয়। কিন্তু প্রেমকে গ্রহণ করার মত মানুষ তখন তা আর সে ছিল না। ততো দিনে ও পাথর হয়ে গিয়েছিল। তবু মানুষ বোধ হয় একেবারে পাথর হয় না। তাই শান্তিনাথের চোখের অঙ্গুর ধারায় আদিত্য তার বাবাকে নোতুন করে আবিষ্কার করলো। আদিত্য চন্দনাকে স্বীকার করে নেবার যোগ্য নয় কিন্তু আদিত্য দেখলো তার বাবা চন্দনাকে কোন-না-কোন ভাবে স্বীকার করে নিতে চলেছেন। যশগা আর স্নায়ুপীড়ন, হতাশা আর মৃত্যু, খিঙ্কার আর দংশে দংশে মরার ভেতর দিয়ে ক্রমাগত হেঁটে হেঁটে পার হবে আজ তার বাবা সুর্ষোদয়ের পথে। আদিত্য স্পর্শ

দেখতে পেলে সাতসটি বছরের পলিতকেশ লৌলচন্দ্র বন্ধুর পক্ষে সন্তোরা বছরের তরুণীর প্রতি যে ধরনের আবেগ সম্ভব সেই আবেগের মধুর দায়ে শান্তিনাথ এখন পড়ছেন। নিষ্করণ একাকীষের হাত থেকে শান্তিনাথ অপরূপ মুগ্ধ পেলেন। আদিত্য মুগ্ধিপথযারী পিতাকে দু'হাত তুলে মনে মনে নমস্কার জানালো।

কদিন ভয়ানক খরা গেছে। আজ আকাশ খোলো খোলো কালো জামের মত মেঘে নিবিড়, রসোচ্ছল হয়ে উঠলো। মনে হল ধন্য রাজার পুণ্য এই দেশে জল আজ নামবে। স্বাম্যকম জল পড়তে লাগলো। নল বেয়ে মোটা ধারায় হু হু শব্দে। তাই দেখে প্রতিমা হাত দু'খানি জলে বাড়িয়ে দিলো। রবিবারের দুপুরে আদিত্য শুয়ে শুয়ে আড় হয়ে বলল, ও কি হচ্ছে? সর্দি হবে। শুধু শুধু ডাক্তার ডেকে গচ্চা দেওয়া।

প্রতিমা বলল, ঘামাচি মারচি গো। মারবে না কি? মেরে যাও না দু'চারটি? বিছানা থেকে আদিত্য উঠলো না। অস্পর্শভাবেও তার মনে হল না, এই সেদিন, ঠিক তার বিয়ের পরের বছর প্রথম যেদিন জল হল তারা দু'জনে নলের মোটা ধারায় হু হু করে ভিজ্ঞে-ছিল। মিনিট খানেক পর প্রতিমা আদিত্যের কাছে গিয়ে দেখে বৃষ্টির দাপটের চেয়ে আদিত্যের নাকের দাপট নেহাৎ কম নয়। আজকাল আর প্রতিমার কথায় ভেতন কান দেয় না। আগে হলে—এই আগে হলে কথাতো আর একটু বেশি মনে মনে নাড়াচাড়া করলেই সহজেই একটি নদী তৈরী হতে পারতো। কিন্তু নদী আজ আর অতো সহজে কেন, কোন ভাবেই তৈরী হবার নয়।

খানিক পর বৃষ্টি থেমে যেতে সিনেমা শাবার সময় এলো। টিকিট কাটা হয়ে গেলেও হাতে তখনো ছিল এক ঘণ্টা সময়।

ওরা যখন হল থেকে কিছু দূরে মাঠে হাওয়া খাচ্ছে তখন কোথা থেকে জুটে গেল সুলতা, প্রতিমার বন্ধু। সে আর শাবার নাম করে না। অতএব আদিত্য দু'খানি সেকেন্ড ক্লাস টিকিট দু'জনের দিকে বাড়িয়ে দিলো। সুলতা শুধুই হয়ে সরলভাবে বলল, ভালো ট্রেনিং দিয়েছিস বৃন্দু, আছে দেখছি বরমশায়ের। এরকম স্যাক্রিফাইস মাঝে মাঝে করতে হয়। আদিত্য সুলতার কথা বুদ্ধিতে পারলো না। 'স্যাক্রিফাইস' কথাটা মগজে ঢুকলো না। ঢুকলে, সুলতার কথা বুদ্ধিতে পারলো একটা নদী বইতে পারতো। একটু ব্যথার, একটু সুখের ছোটখাটো ঘরোয়া নদী। কিন্তু সেসব কিছুই হল না।

পাশেই বার লাইব্রেরী। ওরা চলে গেলে বার লাইব্রেরীতে গিয়ে আদিত্য খবরের কাগজে মন দিলো। আজকের কাগজ নোতুন একটি সংবাদ এনেছে।

ভেবে ডাকের স্বাধীনতার ঘোষণা হারান গোষ্ঠার ক্রোধ সামান্য তেমনই
গ্যাগারিন মহাকাশ অভিযানে বার হবার
পৃথিবী পরিভ্রমণেরে আবার পৃথিবীতে
ফিরে এসেছে। এটা পড়ে আনিতোর খুব
ভালো লাগলো। কিন্তু হঠাৎ কেন যে
এতো খুশী হল তা' বুঝে উঠতে তখনো
দেবী।

রাত হয়েছে। ভাত খাওয়া হয়ে
গেছে দু'জনের। উৎসাহ দিয়ে প্রতিমা
সিনেমার গল্প বলতে গিয়েছিল কিন্তু
পরিচিত কয়েকটি হাই ঘূমের কথা
স্মরণ করিয়ে দিতে আদিত্যকে সবটা
বলতেই ইচ্ছে হল না। আদিত্যও সবটা
শুনতে পারার আগ্রহ প্রকাশ করলো না।

হঠাৎ একসময় প্রতিমা বলল, এসো
বিছানায়। গায়ে হাত দিয়ে আবার
অসভ্যতা কোরো না যেন। আদিত্যের
কিন্তু প্রতিমার গায়ে হাত দেবার
কথা মনেই ছিল না। প্রতিমা বলল
বলে মনে হল। সুতরাং গায়ে হাত
দিতে হল। প্রতিমা হাতটা সরিয়ে
দিয়ে বলল, বুড়োলোকের মত ঠান্ডা
হাত। কিন্তু এ কথার আদিত্যের রাগ
হোল না।

আদিত্য শব্দ ভাবলো বেচে থাকা
আজ কি কঠিন। জীবনের ছোটখাটো
ব্যাপারে রস আছে একথা ঠিক।
শান্তিনাথ সেই ছোটখাটো ব্যাপারগুলিকে
আঁকড়ে ধরতে পেরেছিলেন। কেন না
শান্তিনাথের সব গেজেও ছদ্ম ছিল
তখনো অক্ষত। তাই দিনের শেষে যখন
সব আলো নিভে গেছে মনে হয় তখন
দেখা দিলো আলোর প্রতিমা। শান্তিনাথ
বেঁচে গেলেন।

কিন্তু আদিত্যের কি হবে? কি
হবে প্রতিমার? এদের যে হৃদয়ও
আজ আর অক্ষত নেই। এদের
জন্মে যে কোন সামান্যই অবশিষ্ট নেই।
এই কথা ভাবতে গিয়ে অস্পষ্ট ঘূমের
ঘোরে আদিত্যের মনে হল বিফেলের
বার সাইরারীর কাগজে পড়া কবীর
গ্যাগারিনের কথা।

প্রতিমা আর তার অর্ধহীন, বিবক-
হীন, নির্ভর পাশাপাশি শূন্যে থাকা,
তাদের দু'জনের আবার অনেকদিন
আগেকার রোমাঞ্চজন দিনরাত ফিরিয়ে
আনার মত শব্দ ইচ্ছা, তাদের প্রেমের মত
গঢ়া, পেরোন পৃথিবী পেছনে ফেলে
বীর গ্যাগারিন চলে গেছে দুর্জয় আশ্বাসে
আরেক নতুন পৃথিবী নতুন স্বপ্ন, নতুন
সম্ভাবনাব জন্মকে আসন্ন করতে।

এই ঠান্ডা মত অপ্রেমের বিছানায়
আপাতত কোন স্বপ্ন নেই। সত্য নেই
জেনে আদিত্য মনে মান: নতপায়ে হাটে
গেল মতাকালেশ উৎসাহ যেখানে বিদ্যুতের
মত নোতুন বাঁক নিতে চলেছে।

তারপর একদিন বাড়ি ভৈব শেষ
করে গাচন্দ্র জীব নিয়ে আদিত্যের মা



লব জেনেই আমি অশ্রুত থেকে গেলাম।

শ্রীতকালের এক সম্ভার কাঁধামুড়ি দিয়ে
কাঁপতে কাঁপতে আদিত্যদের বাড়িতে
চুকলো। সেই ন'হাত ধুকড়ি ছেঁড়া
কাপড়ে গিঠ দিয়ে। কাজকে কিছু না
বলে নিজের ঘরে ঢুকলো। ঘরের মেঝে
কাঁট দিয়ে বিছানা পেতে, মশারী ফেলে
শূন্যে পড়লো।

শান্তিনাথ মনোরমাকে দেখেই
বললেন, কি অশ্রুত বল তা' তুমি। কি
দরকার ছিল তোমারে বিছানা পেতে
নেবার, ঘর কাঁট দেবার! তুমি ত জানো
এ সময়ে আমি কোথা থাকি। চন্দনাদের
বাড়িতে। একবার তাকলেই ত—
আদিত্যের মা অশ্রুত হেসে বলল, সব
জেনেই আমি অশ্রুতই থেকে গেলাম।
তোমাদের মত স্বাভাবিক হাত পল্লাম
কি? আমাকে আর বাকিও না। ছড়িতে
আটটা বাজে। জানো তা' এ সময়ে শঠ।
আমাকে এবার ঘুমোতে দাও। আদিত্য
তাকিয়ে দেখলো ঘড়ির দিকে। সত্যিই
আটটা বাজে। আটটার সময় তার মায়ের

প্রতিদিন ঘুমোবার সময়। ওখান থেকে
সকলে চলে এলো।

ভাত খাবার পর ওরা তিনজন নোতুন
বাড়ি সম্বন্ধে আলোচনায় নসবে। সময়
কাটবে ভালো।

সকালবেলা মনোরমা স্নেহন ঘুম থেকে
ওঠে সেদিন আর সে তা করলো না।
আরো একটু বেলা হ'লে বোঁজ পড়লো।
মনোরমার ঘরে মনোরমাকে পাওয়া গেলে
না। তার বদলে একটা ছোট চিঠি পাওয়া
গেল। ভাঙা ভাঙা অক্ষরে লেখা।
অতিকষ্টে পড়া যায়।

এই জ্বরই আমার শেষ জ্বর। বিছা-
নার শূন্যে থাকলে তোদের সেবা নেওয়াতে
আমাব বড়ো বেদনা। তোদের সেবা কোন-
দিন নিই নি। লজ্জাও ক'বে। মরে পড়ে
থাকলে তোদের কষ্ট ক'রে পোড়াতে
হ'ত। তোদের সে দায়ও বাঁচলো।

আমি আমার মায়ের মত এবার
ঠান্ডা জলে আমার শরীর জড়োবো।
আদিত্য, প্যারিস জ' বড়ো বাপকে দেখিস।



তিলোত্তমা

“না। এমনি। তোমাদের নীচেটায় ভাড়াটে বসিয়ে দাও, নইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে যায়।”

মালতী বলল, “ভাড়াটে এলে তোমার কি লাভ?”

“চটপট দরজা খুলে দেবে।”

“তাদের বয়েই গেছে। এসো।”

প্যাসেঞ্জ একটা হোট-পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। এই স্তিমিত আলোর মালতীর মত স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না।

আগে-আগে হেঁটে চলেছে মালতী। আমি তার পিছন-পিছন ধীরে-ধীরে হাঁটছি।

উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মালতী হঠাৎ আমার দিকে ফিরল, “তার মানে?”

চমকে গেলাম, থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, “কি?”

“নীচেটা ভাড়া দিতে বলছ কেন।” বললাম, “বললাম যে। চলো, উপরে গিয়ে বসে কথা হবে। সারা বাড়ি খাঁ-খাঁ করে, ডেকে সাড়া পেতে দেঁর হয়—এই জন্যে বলছিলাম। এটা তন্দুরোধ নয়, এটা একটা প্রস্তাব মাত্র।”

মালতী অস্বদুটে বলল, “কালে-ভদ্রে আসা হবে কবে, তাই দরজা খুলে দেবাব জন্যে সারা বছর ভাড়াটে বসিয়ে রাখতে হবে বদ্বি?”

উপরে যাবার সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মালতী বলল, “আশ্চর্য মানসে কিন্তু তুমি।”

কয়েকবার কড়া-নাড়াব পর ভিতব থেকে সাড়া পেলাম। সাড়া পাওয়ার পরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হ’ল। উপর থেকে নেমে উঠান আর প্যাসেঞ্জ পার হয়ে আসতে সময় কিছুটা লাগবেই।

দরজা খুলল। দরজা খুলতেই দেখি মালতী।

আমাকে দেখে সে একটু অবাক হবার মতন করে বলল, “ওঃ, তুমি?”

বললাম, “ইয়েস। আমি। এসাম। এসে পড়লাম। তুমি ভেবেছিলে কে।”

মালতী বলল, “বিশেষ করে কারও কথা ভাবি নি। কিন্তু তোমার কথা একটুও মনে হয় নি।”

প্যাসেঞ্জ পা দিতে-দিতে বললান, “এর হেতু?”

“হেতু কি নেই কিছু? তুমি ভুলেও আর পা দাও এ বাড়িতে?”

একটু অভিনয়ের ভাঙ্গতেই বললাম, “মিথ্যা এ অভিযোগ, মালতী। মিথ্যাই এ অভিমান।”

এর কোনো উত্তর না পেয়ে বললাম, “পিসিমা নেই?”

“আছেন। কেন?”

অনেক দিন পরে অনেক আশা নিয়েই আছি গিয়েছিলাম। মনে-মনে অনেক জল্পনা-কল্পনাও ছিল।

দু’ পাশে পানাস-ডরা দুটি পুকুর, তার মাঝখানে দিয়ে সরু রাস্তা। এই রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে চলেছি। খুব সন্তপণে হাঁছিলাম। কোনো ইন্টে হেঁচট না-খাই, কোনো গর্তে পা না-পড়ে। মনের মধ্যে একটু শ্বিধা ও জড়তাও অবশ্য ছিল। কেন যেন বেশ সংকোচও বোধ করছিলাম।

রাস্তাটি ফুরলেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে কড়া নাড়লাম। অন্দরমহলা এই দরজা থেকে বেশ অনেকটা দূর। একটা লম্বা প্যাসেঞ্জের পর উঠান, উঠান পেরিয়ে পুনরায় সিঁড়ি, তারপরে ঘর। ঘরের পা দিয়ে উপরে যাবার আবার সিঁড়ি। তারপরে ষে-ঘরটি, সেখানে থাকে মালতী আর তার পিসিমা।

এ কথা শুনে আশ্চর্য হলাম, বললাম, “করলাম কি?”

“কিছু না। এসো।”

ক্রমে উপরে এসে পৌঁছলাম। উপরে গিয়ে দেখি সারা বাড়ি অগোছালো। আলনার শাড়ি স্তূপ করে রাখা। দেয়ালের ক্যালেন্ডার খাতাসে কবে উলটে গিয়েছে, সোজা করা হয় নি। ওদিকে আলমারির সঙ্গে কলছে আর একটা ক্যালেন্ডার—গত বছরের। পুরনো জজ্ঞান ফেলে না দিয়ে এভাবে পুঁখে রাখা হয়েছে কেন, তাই ভাবছিলাম। ওদিকে মেঝের এককোণে নীচু জলচৌকির উপরে লক্ষ্মীর পট-প্রতিবিম্বের পুঁজো করা হয় বলে সেইখানেই ঘেঁটুকু সামান্য পারিপাঠ্য। আলনাটাও ময়লা হয়ে আছে, চিরুনির সঙ্গে ছিড়িয়ে আছে একগোছা চুল।

চারদিকে তাকাতে লাগলাম। সব কেমন অশুভ আর অস্বাভাবিক ঠেকতে লাগল। এ বাড়ি খুব পরিপাটি নই হলেও এমন এলোমেলো আগে দেখি নি। চৌকির মশারির তিন কোষ বাঁধ, এককোণের দড়ি খোলা।

পিসিমা এতক্ষণ সন্ধ্যা করছিলেন। এবার ফিরে বসে বললেন, “কেমন আছ। অনেক দিন আস না। মালদার তো ভীষণ রাগ।”

মালতী এ কথা শোনামাত্র বাধা দিয়ে উঠল, বলল, “রাগ তুমি দেখতে গেছ। যত সব রাজ্জ কথা। বলার কথা বুঝি আর খুঁজে পাছ না তুমি?”

“কী আর বলি।” পিসিমা বুঝি একটা নিশ্বাসই ফেললেন, “খোঁজটোজ পেলো খবর দিয়ে, নীলকণ্ঠ।”

মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিসিমা ঘাড় ফিরিয়ে মালতীর চলে-যাওয়াটা লক্ষ্য করলেন। কিছুক্ষণ চপ করে থেকে বললেন, “ওর রকম-সকম একেবারে বদলে যাচ্ছে। যেন মন নেই কিছুতেই। বাড়ির হাল দেখেই বুঝছ। কী-যে করি।”

আমি এর কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না। তবু, কিন্তু না বললে নয় বলে বললাম, “তাই তো। কী আর করা যাবে! একটা কাজ করুন। ওকে চোখে পাঠান। এত বড় বাড়িতে এইভাবে একা-একা থাকে, এতে মন একঘেয়ে হয়ে যায়।”

পিসিমা বুঝলেন, বললেন, “স্বা বলেছ। মনের বদল তো দবকাই। বয়সও তো হল। তাই বলছিলাম খোঁজটোজ একটা রোখো। এত বঙ্গবান্ধব ভোমাদের, একটু চেষ্টা করলে কি আর পাও না?”

নিজেকে কেমন সামান্য আর ক্ষুণ্ণ

বলে মনে হতে লাগল। মনে হল, পিসিমা যেন আমাকে হিসেবের মধ্যেই ধরেছেন না, বোধ হয় ষোণ্য বলে মনে করেছেন না। তাই আমাকে বাদ দিয়ে আমার বঙ্গবান্ধবদের খুঁজছেন।

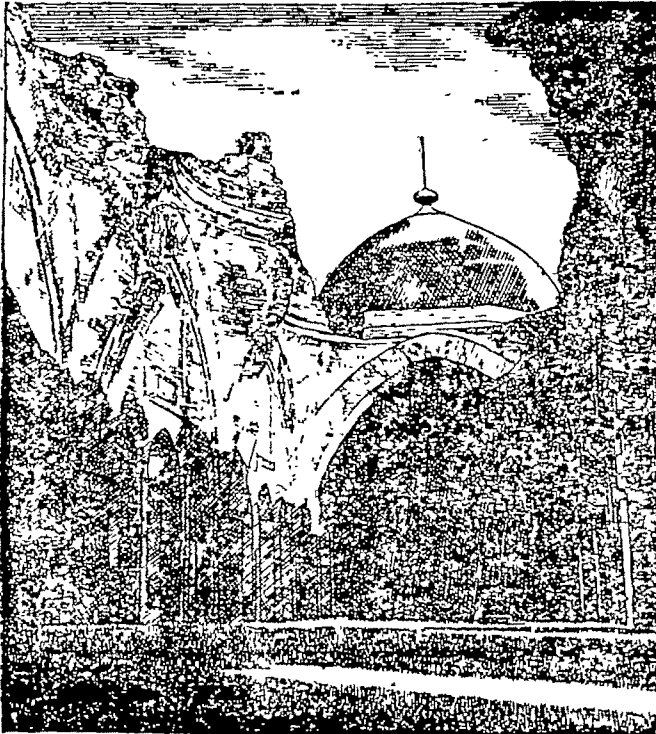
“বিয়ের একটা বরেন্দ আছে। সেই বরেন্দে বিয়ে না হলে মেয়েদের শরীর যেমন শূন্য হয়ে যায়, মনও চপলে যায় তেমনি। মালদার হয়েছে তেমনি। দেখ না, ওর চেহারা?”

আজ প্রায় একবছর বাদে এখানে এসেছি। এই সময়ের মধ্যে একটু বদল যে ঘটেছে তা লক্ষ্য করছি। কিন্তু মালতীর চেহারার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না লক্ষ্য করার সযোগ্য পাই নি।

পিসিমা অনঙ্গল কথা বলে যেতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর সব কথা আমার কানে গেল না। তিনি বলে, যেতে লাগলেন তাঁদের বংশের লম্বা ইতিহাস, মালতীর ব্যাব অকালমৃত্যুর কথা, মালতীর মায়ের মৃত্যুর কথাও। কিন্তু এর সবই তো আমার জানা। আমাকে নতুন করে সেই পুরনো কথা শুনিয়ে, এভাবে সময় তিনি নষ্ট করছেন কেন।

ফললাম, “ও গেল, কোথায়?”

আছে এখানেই কোথাও। একে



বাংলার ইতিহাসের একটি অধ্যায়

মুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-নবাব মুর্শিদকুলিয়ার নিমিত্ত মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ বঙ্গের স্থাপত্য-শিল্পে এক অনবদ্য সংযোজন। ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মামুগ্ধ মুর্শিদকুলির অন্তিম বাসনা। অমুযায়ী কাটরা মসজিদের সোপানতলে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়, যাতে মসজিদে আগমনকারী সাধুসন্তদের পবিত্র পদচারণার সমাধির উপর বর্ষিত হয়। যশ, ক্রোধ ও শিল্পস্থাপত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদাবাদের তুলনা মেলা ভার। বাংলার সেদিনের রাজধানী মুর্শিদাবাদ দর্শন আমাদের ঐতিহ্যেরই অঙ্গীকরণ। মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে বহরমপুরের ট্যুরিস্ট লজে ওঠাই সুবিধে।

বিলাসে কিংবা স্বল্পব্যয়ে থাকার জন্য নিজের ঠিকানা যোগাযোগ করুন।

ট্যুরিস্ট ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩/২ দিন-বাস-দীর্ঘ বাস

(ভালহোঁসি স্টোর) দ্রষ্ট, কলিকাতা-১

ফোন: ২০-৮২৭১ গ্রাম: 'TRAVELTIPS'

TCR/BI80A3

বারেই এক। তোমরা গায়ে-মাগে এলে
ও খুশি হয়।”

খুশি তো হয়। কিন্তু তার খুশির
মুনা যা দেখছি তাতে খুব যেন উৎসাহ
পাচ্ছি নে। আমি এসেছি এবং এসেছি
এতদিন বাসে, অথচ মালতীর আমাকে
এড়িয়ে এই অন্তর্ধানের হেতু কি।

পিসিমা বললেন, “এক-এক সময়
ভাবি নীচের ভাড়াটে বসাই। লোকজন
এলে সঙ্গীসাথী পেলো ওর মন হয়তো
ভালোই থাকবে। কিন্তু এতে আবার
আপত্তি দেখি ওরই। ওর নাকি এমনি
একা থাকতেই বেশি ভালো লাগে! কে
বুঝবে বলো ওর মন।”

বললাম, “ঠিকই বলাছেন। মন
বোঝা খুব কঠিন।”

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে আছি। আর
ফী কথা বলি যায় ভাবছিলাম। ভেবে-
ভেবে কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছি নে।
এমন সময়ে পিসিমা বললেন, “উঠে গিয়ে
দেখ তো বাবা, ও ঘরটা। ও কি করছে।
হয়তো চাই-ই করতে গেছে তোমার
ছনো।”

এ কথা শুনে একটু হাঁফ ছেড়ে
যেন বাঁচলাম। কিন্তু এমন ভাব দেখলাম
যেন খুব অনিচ্ছাতেই উঠছি, সেইভাবে
উঠে চোকাঠ ডিঙিয়ে বারান্দার
দাঁড়লাম।

“বাতে কাহিল মানুষ আমি,
নইলে আমিই যেতাম! কিছু মনে
কোরো না যেন।” পিসিমার গলা
পেলাম।

তার কথার জবাব দিলাম না।
ওদিকে গিয়ে সামনের ঘরে উঁকি
দিলাম। জানলা দিয়ে গেল্লির কাবখানার
আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই আলোর
দেখলাম পর ফাঁকা। ছাতে পেলাম,
সন্ধানও কেউ নেই। ছাতের পাশের
ছোট কুঠুরিতে দেখি তাম্বকারে কে-যেন
ঘসে আছে।

বললাম, “কে?”

“কেউ না।”

তা বটে। কিন্তু গলা শুনে বললাম
অবশ্যই কেউ। কাছে গিয়ে লিঙ্গাসা
করলাম, “এখানে একা যে।”

“এমনি। এতক্ষণে খোঁজ নেবার
সময় হল?”

ফিসফিস করে বলার মত করে
বললাম, “পিসিমা যে কিছুতে ছাড়-
ছিলেন না।”

“এবার ছেড়েছে তো? তবে
বোসো।”

মালতীর পাশে বসলাম। এব আগে
এমন নিবিড়-কাছে বসি বসি নি
কখনো। রোমান্টিত হতে লাগল সারা
শরীর। কেমন নারসাসও বোধ হতে
লাগল নিজেকে। বললাম, “মনে হচ্ছে
বোগ আছি।”

আঁচলের কোণা আঙুলে ঘড়াতে-
ঘড়াতে মালতী বলল, “রাগব কেন।
রেগে কী লাভ। কিন্তু মনটা কেন
বিলী লাগে। কেন জানো?”

“কেন?”

“যখন ভাবি, তুমি নিভে গেলে, তুমি
শেষ হয়ে গেলে।”

আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, বললাম,
“কি রকম?”

অনেকক্ষণ চুপ করে বইল মালতী।
কি-যেন ভাবতে লাগল। তারপর বলল,
“তুমি আস না বটে, কিন্তু তোমার
বইটা যে পাঠিয়েছিলে সেজন্যে
খন্যবাদ। একনিশ্বাসে পড়ে ফেলো
উপন্যাসটা। পড়েই বুঝতে পারলাম—
তুমি শেষ হয়ে গেলে, নিভে গেলে।
আর লিখতে তুমি পারবে না।”

একটু কাছে সবে বসে বললাম,
“এমন সাংঘাতিক কথা তোমার মনে
হল কেন।”

“মনে হওয়া কি ভুল? মনে হওয়া
কি অপব্যব? যাকে কেন্দ্র করে
তোমার এত দাপট, এত অহংকার—”

মালতী একটু থেমে বলল, “সে যদি
মরেই গেল—”

বললাম, “কিছু বুঝতে পারছি নে,
একটু খুলে বলো।”

“না না না। এর চেয়ে পরিস্কার
করে বলতে আমি পারব না। আমাকে
ক্ষমা করো।” আঁচল দিয়ে মালতী চোখ
ঢাকল।

প্রবোধ দেবার জন্যে কথা খুঁজ-
ছিলাম, একটু তোষামোদ করলে যদি
কাজ হয় তবে তাই-বা কলা যায় কী
ভাষায়?

বললাম, “কেউ না থাক, তুমি তো
আছ। তাহলে আমার আব ভয় কি?”
“থাক।” চোখ থেকে কাপড়
নামিয়ে মালতী আমার মুখের দিকে
চোরে বলল, “ওভাবে মিথ্যে কথা বোলো
না তুমি।”

কথাটা যা বলে ফেলোছি তা যে
মিথ্যে, ঠিক এই মূহুর্তে অম্বকারের
এই নিবিড়-সামিথ্যে বসে আমার নিজের
তা মনে হয় নি। এ কথা মিথ্যে কি
সত্যি তা যাচাই করে দেখাশ অবসর এটা
নয়। এ অবসরে যে কথা বলা যায় তা
শত মিথ্যে হলেও সহস্র সত্যের মতই
শোনানো স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল
আমার মুখে কথাটিই নয়, এই
রোমান্টিত মূহুর্তটুকু যেন মালতী এক
ফুৎকাবে উড়িয়ে দিল।

বললাম, “বিশ্বাস করলে না?”

একটা নিশ্বাস ফেলে মালতী
বলল, “যদি চাপ দাও তাহলে ভদ্রতার
খাঁতিবে আপাতত বিশ্বাস করতে হবে,
কিন্তু চিরকালের বিশ্বাস বলে তা
মানতে পারব না।”

তার হাতটা ধরে চাপ দিলাম।
যেন বলতে চাই—কেন এই অবকাশটুকু
এভাবে অর্পণে সে করছে, কেন এই
অনাবিল সম্মাটা এভাবে অর্পণচ্ছন্ন
করে তুলছে।

মালতী বলল, “ছাড়ো। হাত ছাড়ো।
তুমি আর সে-তুমি নেই। অনেক দূরের
হয়ে গেছে। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ নয়,
দুঃখ তোমার পরিণামের কথা ভেবে। আর
পারবে না তুমি, তোমার জীবনের শেষ
উপন্যাস পড়ে ফেলোছি। বুঝেছি, তুমি
খতম হয়ে গেছ।”

তার কথা শুনে ভীত বা শঙ্কিত
না হলেও মর্মহত হয়ে উঠলাম। যে কি
বলতে চায় তা অনুমান করতে পারলেও
প্রতিবাদ করার ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু
ইচ্ছে হচ্ছিল পরিস্কার করে তাব মনের
কথাটা জেনে নেবার। বললাম, “তোলোটা
ছবালি, কি বলো।”

“থাক-না। বেশ জে আছি। অম্ব-
কার যদি ভালো না লাগে, তাহলে
জানলা দিয়ে বাইরে ঐ আকাশের দিকে
তাকাও। ওখানে অনেক ভালো, অনেক
তাবার ভিড়। তাছাড়া, গেল্লি-কলের
আলোও তো দেখতে পাচ্ছ ও-বাড়ির
দেয়াল জুড়ে পড়েছে।”

বললাম, “তোমার অভিযোগটা এবার
খুলে বলো।”

মালতী হাসল, বলল, “ধরা পড়ে
গেছে তো? অত ভাষার কারিকুরি,
বর্ণনার বাহাদুরি, ঘটনার ছল-চাতুরী—
সব ডিঙিয়ে আসল ব্যক্তিটিকে ঠিক চেনা
গেছে। শত চেষ্টা করেও তাকে তুমি
ঢাকতে পার নি। তোমার নায়িকার যে-
নামই তুমি দাও না, সে যে সত্যিকারের
রংপুরের সেই বকুল, এ কথা কোন
বোকায় না বুঝবে। এর জন্যে ঘটনাকে
ছুটিয়েছিলে আলিপুর-দুয়ারে। সত্যি
না? তোমার উপন্যাসের নায়কও
তেমনি কত-না দৌড়-খাঁপ করল, কিন্তু
শেষ পর্যন্ত হল কি। তাকে বুঝতে
পারলে? রাখতে পাবলে? সে পালাল
না?”

স্তম্ভ হয়ে বসেছিলাম। বললাম,
“বলো।”

“তোমার নায়িকা পালাল। আসলে
সে যে মরে গেল তা অবশ্য তুমি বলো
নি।”

বললাম, “তা বলব কেন। মরে তো
সে যায় নি।”

মালতী হাসল, বলল, “বকুল মারা
যায় নি?”

“তা হয়তো গেছে, কিন্তু—”

“আর কিন্তু বোলো না। আর
গোপন করতে চেষ্টা করো না। ধরা
তুমি পড়ে গেছ। এখন আর পাছাবার
চেষ্টা করে কী লাভ?”

তক' করে লাভ নেই। বৃষ্টিয়ে বলেও লাভ নেই। সবই যে বৃষ্টি বসে আছে, তাকে কী করে বোকাব-সে, উপন্যাসের নায়িকায় কেউই একটি ব্যক্তি নয়—সকলেই তিলোত্তমা। নানাজনের মধ্যে থেকে তিল তিল করে সংগ্রহ করে তাঁর ক'বে নিতে হত তাদের।

মালতী বলল, “আর কি। এবার তোমার ছুটি। কলম ফেলে দিবে এবার নতুন অভিযানে বের হও।”

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, “তাহলে চলি।”

“কোথায়?”

“নতুন অভিযানে।”

এবার মালতী উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধবল, বলল, “তুমি থেপেছ। মাপ করো আমাকে। এতদিন যে তাপ চেঁচা করে চেপে বেঁচেছিলাম, হঠাৎ তা বেরিয়ে পড়েছে।”

“ঠিকই করেছে তুমি। ঠিক শিক্ষাই দিয়েছে। হাত ছাড়ো, আমি চলি।”

অনেক দিন পরে এসেছিলাম। মনে হতো, এতদিনের জমা কথা আজ বসে-বসে একে-একে গুছিয়ে বলা যাবে। কিন্তু সে সব কথাই আজ ঐ আলনার জামাকাপড়ের মত কেমন-বেন এলোমেলো হয়ে গেছে, দেয়ালের কাল্পনিক মতন দমকা বাতাসে উলটে গেছে।

মালতী বলল, “কমা করো। অনেক কঠিন কথা বলে ফেলেছি তোমাকে। বলছি, দুঃখেও বটে আনন্দেও বটে। তোমার জীবন থেকে আজ ছটকে চলে গেছে একটা তারা; আমি সেই অশুকার জায়গায় নিজে বসিয়ে নিতে পারব—এই আশা।”

প্রেম করতে গেলে মানুষ কেমন বেকুব হয়ে যায়। হয়তো আমিও তেমন বেকুব হয়ে গিয়ে থাকব। তার মূখের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। গুছিয়ে বলব এমন একটা কথা পেলাম না।

মালতী বলল, “তুমি মস্ত হয়েছ। এটা আমারও মস্তি।”

তার মাথার উপরে হাত দিয়ে বললাম, “কেমন অস্বাভাবিকভাবে কথা বলছ যেন, হল কি তোমার।”

“বললাম যে, আজ আমি মস্ত। কিন্তু নায়িকা বলে আমাকে গ্রহণ করো না। আমি তোমার সঙ্গিনী।” একটু থেমে মাথা নীচু করে বলল, “জীবনসঙ্গিনী।”

বললাম, “বেশ তাই। কিন্তু কলমটা কি এবার আবার কুড়িয়ে নেব না, যা ধরেছিলে তাই করব?”

কোনো জবাব দিল না মালতী। তার প্রকম দেখে মনে হল, সে যেন বৃহৎ একটি যন্ত্রে জরী হয়ে বিজ্ঞানোন্মাদের দীপ্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। গম্ভীর

কলের তেজী আলো ও-বাড়ির দেয়াল থেকে প্রাতিফলিত হয়ে তার মুখে পড়েছে।

অনেক শপথ আর অনেক তর্জীকারের পালা সাঙ্গ করে যখন ছোট কুঁদুরি থেকে বেরিয়ে ছাড়ে এসে দাঁড়ালাম, রাত তখন অনেক। কেমন সংকোচ বোধ হচ্ছিল, পিসিমা কি মনে করছেন।

মালতী বলল, “ঐ কথা রইল। মাঝে-মাঝে যেন দর্শন পাই।”

এরপর মালতীকে দর্শন দিয়ে এসেছি অনেক বার। এখন গিয়ে বাইরের দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়তে হয় না। দু-একবার খুটখুট করলেই দরখা খুলে যায়।

উপরে গিয়ে বললাম, “এই ভালো হয়েছে। বাড়িটার যেন প্রাণ এসেছে। ভাড়াটেরা লোক কেমন?”

পিসিমা বললেন, “বেশ ভালো। যেমন মিশ্রকে, তেমনি আলাপী। একেবারে আপনান-জন হয়ে গেছে।”

সত্যি, বাড়িটার হালচালও যেন বদলে গেছে। আলনার আর দেয়ালের হাল যেমন বদলেছে, মালতীর চেহারাও জোঁলুস এসেছে তেমনি। এবাব এদের দেখে বেশ ভালো লাগল।

মালতী এখন আর মুখ ভারি করে নানা অভিযোগ দিয়ে অনাবিল সম্বা-গুলো অপরিচ্ছন্ন করে দেয় না। বলে, “এবার কি লিখছ, বলো।”

বলি, “তেমন কিছু না। তেমন বলার মত কিছু না।”

“বড় আলসে তুমি, বড়ই কুড়ে।”

বৃষ্টিয়ে বলি, “ব্যাপার কি জান। একটা প্রেরণা চাই, একটা উৎসাহ। তা না হলে সব থিতিয়ে যায়।”

একথা শুনে মালতী কী যেন ভাবল। হয়তো তার সেই পুরনো অভিযোগের কথাটা মনে পড়ে গেল। হয়তো সে কথাটা আবার তুলে আজকের এই অবসরটা সে বিমর্ষ করে তুলতে চাইল না। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “কি ভাবে প্রেরণা দিতে পারি বলো।”

বললাম, “সে প্রণালী যদি জানতাম, তাহলে ফরমাস করে উৎসাহ আদায় করে নেওয়া যেত। মানুষ কিসে যে প্রেরণা পায়, কিসে যে নিস্তত্ব হয়ে পড়ে, মানুষ নিজেই তা জানে না। আসল কথা কি জানো, জীবন বত একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে। নতুন ঘটনা নেই একেবারে।”

মনোযোগ দিয়ে শুনে মালতী, কোনো মন্তব্য করল না। মাঝে-মাঝে কেমন-যেন অনামনস্ক হয়ে যেতে লাগল। খোঁপা থেকে কাঁটা তুলে নিষ সিঁথি চুলকে আবার খোঁপায় কাঁটা গুঁজে দিতে-দিতে বলল, “বলোছিলাম-না তুমি নিজে গেছ, তুমি ফুরিয়ে গেছ।”

মনে হল আমাকে সেন ঘা দিয়ে

রাগিয়ে দেবার জন্যে মালতী আজ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তার চোখে তেজস্বী, পাওয়া যাচ্ছে তারই স্বপ্ন-দাঁড়া।

বললাম, “ঠিকই ধরেছ হয়তো। আমি হয়তো আর নেই।”

বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল মালতী, বলল, “ঠিক। থাকতে, যদি সে থাকত।”

বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল, “তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি মাপ করো।”

তার কথা মনে বদলাম না। উঠে পড়লাম। ছাড়ে একটু, দাঁড়িয়ে ধীরে-ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে বাবান্দা ও প্যাসেজ পার হয়ে জোড়া পুকুরের মাঝখানের রাস্তা ভিঙিয়ে সোভা এসে পড়লাম সদর সড়কে।

এরপর কিছুদিন ওদিকে যাই নি। কিন্তু একটা টান ছিল, আকর্ষণও ছিল। সেই চক্রে পড়ে একদিন গিয়ে হাজির হলাম।

আমাকে দেখেই পিসিমা এগিয়ে এলেন, বললেন, “ঠিকানা জানতাম না। খবর দিতে পারি নি। শূভ সংবাদটা শুনেছ নিশ্চয়।”

“কি?”

“মালতীর বিয়ে হয়ে গেল হঠাৎ। নীচে যারা ভাড়া এসেছিল তাদের ছেলের সঙ্গে। দিবা ছেলে। ভালো চাকরীও করে।”

যেন কিছুই না। এইভাবে একটা ঢৌক গিলে বললাম, “তারা কোথায়?”

পিসিমা একটু হেসে বললেন, “বৃষ্টি নে তো কিছু। হিনমুন না কি-যেন বলে তাইতে গেছে পুরী।”

একটু থতমত খেয়ে গেলাম। কি জবাব দেব বৃষ্টি পেলাম না।

উঠে পড়লাম। তর-তর কবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে এলাম। মধ্যাহ্নিক সাঙ্গ করে ফিরে এলে দেখা নিশ্চয় হবে। তখন সমস্ত অহংকার জাহির করে বাক ফুলিয়ে তাকে বলতে হবে—তবে নাকি নিজে গোছি আমি, তবে নাকি শেষ হয়ে গোছি একেবারে। তোমরা থাকতে ফুরিয়ে যাব, এমন মাথা কি আছে?

কানাইলাল মিশ্রের

লিভারসল

অমূল্য, অজীর্ণ, অনিমান্দ্য, কালিক শেন, লিভারের দোষ, ডিসপেপসিয়া ইত্যাদি যে কোন পেটের পীড়ার উপকারী।

ডাক্তারখানায় খোঁজ করুন

অথবা ২৬/১০ই, সিমলা রোড, কলিকাতা-৩



ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন রায়ের কাছে অনেক বিরল পুরোনো পুঁথি ছিল। ঢাকার ইতিহাসের উপকরণ আহরণের সময় এগুলো সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। বাংলাদেশের অনেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তাঁর কাছে এসে পুঁথিগুলি নাড়াচাড়া করতেন। পূর্ববঙ্গের যে-কোনও অঞ্চলের ইতিহাসকে বুঝতে তারা অপরিহার্য ছিল।

একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রাচ্যবিদ্যাশিষ্যরদ এসে যতীন্দ্রমোহনকে বললেন, মালীবাগের সৌমারবন গোস্বামীর বিষয়ে যে পুঁথিখানি আছে আপনার কাছে, সেটা আমি দেখতে চাই।

একটু চমকে উঠে যতীন্দ্রমোহন বললেন আমার কাছে যে, সৌমারবন গোস্বামীর বিষয়ে কোন পুঁথি আছে, সে কথা কাব কাছে শুনেছেন আপনি?

শুনোছিলাম র—বাবুর কাছে।—জবাব দিলেন প্রাচ্যবিদ্যাশিষ্যরদ।

কয়েক মূহুর্ত চুপ করে থেকে যতীন্দ্রমোহন বললেন, পুঁথিখানি আমি হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছেন!—স্নান হয়ে ওঠে প্রাচ্যবিদ্যাশিষ্যরদের মূখখানা।—শুনোছিলাম ঐ পুঁথিখানি মধ্যম মধ্যমই সৌমারবন সম্বন্ধে সত্য তথ্য রয়েছে।

ভুরু কুঁচকে প্রাচ্যবিদ্যাশিষ্যরদের মূখের পানে তাকিয়ে যতীন্দ্রমোহন বললেন, ঢাকাব ইতিহাসে সৌমারবন সম্বন্ধে যা লিখেছি, তার মধ্যে সত্য তথ্য নেই বলতে চান?

—আপনি নিজেই তো লিখেছেন যে, ওটা একটা কিংবদন্তী। কিংবদন্তীকে সত্য বলে মেনে নিতে বলেন আপনি?

—না, তা বলি নে। কিন্তু কিংবদন্তীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন সত্যকে বুঝে নিতে বলি আমি।

—সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের কয়োর মধ্যে ঢুকে থেকে শত শত বৎসর ধরে সৌমারবন

তপস্যা করছেন এই অসম্ভব ব্যাপারকে সত্য বলে মেনে নিতে চান আপনি?

স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষের পক্ষে কোন কিছই অসম্ভব ব্যাপার নয়।—শান্তভাবে বললেন যতীন্দ্রমোহন।

আর আজিমপুরার সা-আলি সাহেবের ব্যাপারটা!—প্রাচ্যবিদ্যাশিষ্যরদের গলার স্বরে উত্তেজনার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।—সেটাকেও সত্য বলে মেনে নিতে বলেন আপনি! সেই যে বাঘের পিঠে চেপে সৌমারবন গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মালীবাগে এসে তাঁরও সেই কয়োর মধ্যে ঢুকে পড়া! এই অসম্ভব ঘটনাকেও সত্য বলে মেনে নিতে চান আপনি?

সা-আলি সাহেবও সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ।—মৃদু হাসি ফটে ওঠে যতীন্দ্রমোহনের মুখে।—তাঁরও অসাধ্য কিছ নেই। সৌমারবনের সঙ্গে একসঙ্গে সাধনার নিরত হয়েছিলেন তিনি ঐ কয়োর মধ্যে।

—হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে সাধনা করছেন এও কী কখনো সম্ভব হতে পারে?

—নিশ্চয়ই। পূর্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও ধর্মের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছিল। রাজনৈতিকরা প্রতিকূল না হলে উভয় ধর্মমতাবলম্বী সাধকরা মিলে একটি যুগ্ম ধর্ম সৃষ্টি করতে পারতেন।

প্রাচ্যবিদ্যাশিষ্যরদ বিদায় নিলে পর যতীন্দ্রমোহন বললেন, র—যে ঐ পুঁথিখানি কথা কাউকে বলবে ভুলেও কখনো ভাবি নি আমি ও কথা।

কি ছিল ঐ পুঁথিতে?—কোঁতুহল চাপতে না পেরে আমি প্রশ্ন করলাম।

—পুঁথিতে যা লেখাছিল তা পড়ে সৌমারবন গোস্বামীর মত মহাপুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাতে পারে, কাজেই পুঁথিটা আমি নিশ্চিহ্ন করেছি।

—কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাশিষ্যরদকে আপনি বে বললেন পুঁথিটা হারিয়ে গেছে।

সত্যের অপলাপ ঘটে নি তাতে।

—গম্ভীর মুখে বললেন যতীন্দ্রমোহন।

—নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া জিনিসের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া জিনিসের কোন পার্থক্য নেই—বাস্তব অস্তিত্ব দুয়ের কোনটারই নেই।

কিছুদিন বাদে ইঠাং গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়লেন যতীন্দ্রমোহন। আমাকে ডেকে বললেন, আমার মনে হচ্ছে সত্যকে চেপে রাখা অনুচিত। সৌমারবন গোস্বামীর সম্বন্ধে তাঁর শিষ্য এংবারবন গোস্বামীর যা লিখেছেন তাকে চেপে রাখলে সৌমারবনের চরিত্রের একটা বিশিষ্ট দিক অজ্ঞাত থেকে যাবে চিরকালের মত। যে সৌমারবন স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর একটা মানবসত্তা ছিল। তাকে উপেক্ষা করলে সৌমারবনের মহাশ্বাটা অলৌকিক হয়ে দাঁড়াবে। সৌমারবন সম্বন্ধে যে কিংবদন্তীর কথা আমি আমার চাকাব ইতিহাসে লিখেছি, তাতে সত্য তথ্য বীজাকাবে প্রচ্ছন্ন আছে—তাব মর্মোন্মাদ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আমি ঠিক করেছি যে, এংবারবন গোস্বামীর পুঁথি থেকে সৌমারবনের জীবনের সত্য তথ্য প্রকাশ করে দেব।

সে কী করে হবে!—আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম। পুঁথিটাকে তো আপনি নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিলেন।

—আমার মন থেকে তো আর নিশ্চিহ্ন করে ফেলি নি। পুঁথিটির প্রতিটি পংক্তি আমার স্মরণে আছে। আমি মূখে মূখে বলে যাচ্ছি, তুমি লিখে নাও।

আমি কাগজ-কলম নিয়ে এসে বসতেই বলতে শুরু করলেন যতীন্দ্রমোহন :

সময় ১০০০ বঙ্গাব্দ. স্থান ঢাকার উত্তরে মালীবাগ। একটি আমবাগানের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। মন্দিরের সামনে একটি বৃক্ষচন্দনগাছের নিচে শ্বেত-

পাথরে বাঁধানো বেদীর ওপরে বসে যখন-
ভজন করতেন সৌম্যরবন গোঁস্বামী।
সকলে তাঁকে স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষ বলে
জানত। ঐ বেদীর ওপরে বসে কঠোর
তপস্যা করে তিনি নাকি সিংহাসন করে-
ছিলেন। সৌম্যরবনের সৌম্য মুখশ্রী ও
প্রদীপ্ত দেহের কান্তির মধ্যে যেন সদৃশ
স্বর্গের আলো পরিস্ফুট হয়ে উঠত।
তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর শূচিশ্রুত
তপঃপুত মনের স্পর্শ পাওয়া যেত।
সাধারণতঃ মৌনী থাকতেন তিনি। অস্ত-
রঙ্গ শিষ্য ছাড়া কারুর সঙ্গে কথা বলতেন
না।

সৌম্যরবনের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ছিলেন
অভিমুদ্রার সাধকশ্রেষ্ঠ সা-আলি
সাহেব। মাঝে মাঝে মালীবাগে আসতেন
তিনি সৌম্যরবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।
সা-আলি সাহেব এলে সৌম্যরবনের
মৌনতা ঘুচে যেত—মুখের হয়ে উঠতেন
তিনি নানারকম আলোচনা-আলোচনায়।

একদিন সা-আলি সাহেব সৌম্যরবনকে
বললেন, চল আমার সঙ্গে—দেশদর্শন
করবে, দেশের মানুষদের দেখবে।

সৌম্যরবন বললেন, আত্মদর্শনের মধ্য
দিয়ে দেশদর্শন হয়ে গিয়েছে আমার।
শুধু দেশের মানুষ কেন, বিশ্বশাস্ত্র
সকল মানুষকে একাবলম্বভাবে দেখেছি,
প্রয়োজন কী? দেশের মানুষদের আঁতাদা
করে দিলাম।

সা-আলি সাহেব হেসে ফেলে বললে,
সে তো মানুষের ভাবরূপ, তাতে সাধারণ
মানুষের সুখ-দুঃখ বা হাসি-কান্নার স্থান
নেই। মানুষকে যদি দেখতে চাও বা
জানতে চাও, তোমার এই সাধনার গম্ভীর
থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। চল আমার
সঙ্গে।

সা-আলি সাহেবের আহ্বানকে উপেক্ষা
করতে পারেন নি সৌম্যরবন। তাঁর সঙ্গে
বেরোলেন তিনি দেশ ভ্রমণে।

সাধনার বেদী ছেড়ে সৌম্যরবনের
সা-আলি সাহেবের সঙ্গে দেশভ্রমণে
বেরিয়ে আসাকে সন্দেহের দেখেন নি
সৌম্যরবনের শিষ্যরা। কিন্তু তাঁকে কিছু
বলার মত সাহস তাঁদের ছিল না।

প্রায় দু' বছর বাদে মালীবাগে
ফিরলেন সৌম্যরবন। তাঁর সঙ্গে গেরুয়া-
রঙের শাড়িপরা একজন স্ত্রীলোক। এমন
অসামান্য রূপযোবন কদাচিৎ চোখে পড়ে।

সৌম্যরবনের শিষ্যরা তাঁকে স্বাগত
জানাতে এসে স্তম্ভিত হলেন
স্ত্রীলোকটিকে দেখে। নির্বাক বিস্ময়ে
জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁরা
সৌম্যরবনের দিকে।

সৌম্যরবন স্থির গম্ভীর গলায়
বললেন, ইনি আমার শিষ্যা আনন্দময়ী।
আমাদের আখড়ায় এ'র থাকার ব্যবস্থা
কর।

আমাদের আখড়ায় ইনি থাকবেন!—

চমকে উঠলেন—এ'বারবন!—এখানে তো

তো স্ত্রীলোকের স্থান নেই গুরুদেব।

—স্পান নেই কে বললে? এ পর্যন্ত

স্থান হয় নি বলে যে কখনোই স্থান

হবে না, তার কোন কথা নেই।

সা-আলি সাহেবের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে
বেরিয়ে স্ত্রীলোককে বাদ দিয়ে সাধন-
ভজনের অসারতাকে উপলক্ষ্য করেছি

আমি। স্ত্রীলোক থেকে বিচ্ছিন্ন
জীবনযাত্রা যেমন কম্পনাতীত, তেমনি

স্ত্রীলোকের স্থান নেই গুরুদেব।

অজ্ঞান ও অসম্ভব।

সিদ্ধপুরুষ হয়ে এই কথা বলছেন

আপনি!—এ'বারবনের চোখ দুটি

কপালে উঠবার উপক্রম হল।

সিদ্ধপুরুষ আমি নই এ'বারবন।

—গলার স্বর নামিয়ে বললেন

সৌম্যরবন।—আত্মনিরোধ করে যে

সাধনা করেছি, তাতে সম্পূর্ণ সত্যো-
পলক্ষ্য আমার ঘটে নি।

নিম্নেব রত্নবর্ণ হয়ে উঠল

এ'বারবনের মুখ। রাগে কাঁপতে কাঁপতে

তিনি বললেন, আপনি আমাদের

ঠিকিয়েছেন—তার জন্য প্রার্থীকৃত করতে

হবে আপনাকে।

প্রার্থীকৃত করতে হবে!—ঈশ্বর

আত্মকণ্ঠে বললেন সৌম্যরবন।—আমার

চিন্তের মধ্যে কোন স্পানি বা পাপ বোধ

তো নেই—প্রার্থীকৃতের প্রয়োজন কী!

—দোরতর পাপী আপনি, কাজেই

পাপ বোধ নেই আপনার মনে।

প্রার্থীকৃতের জন্য আপনার চিন্তে কোন

ভাগিদ না থাকলেও আমরা আপনাকে

দিয়ে প্রার্থীকৃত করাব। দরকার হলে

বলপ্রয়োগ করতেও পেছপা হব না

আমরা।

বলে এ'বারবন তাঁর গুরুভাইদের

উদ্দেশ্য করে বললেন, শঙ্করাচার্যের

অনুগত 'বন' উপাধিধারী উদাসীন

সম্প্রদায়ভক্ত সন্ন্যাসী আমরা। কোনও

রকম নৈতিক স্থলন আমরা সহ্য করব

না। আমাদের সম্প্রদায়ের নিম্নতম অনু-

সারে ভ্রষ্টাচারী গুরুদেবকে কঠোর

শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তবপর সৌম্যরবনের দিকে

তাকিয়ে এ'বারবন বললেন, চলুন

গুরুদেব, আজ থেকে মাটির নীচে গুপ্ত

কক্ষে বসে সাধনা করবেন—বাইরের

আলো বাতাসের সঙ্গে কোন সংস্রব

আপনার থাকবে না।

শিষ্যরা সকলে মিলে জোব করে

সৌম্যরবনকে সিংহেশ্বরীর মন্দিরের

নীচে একটি অন্ধকার কুঠবীর মধ্যে

বন্দী কবে রাখল।

সৌম্যরবনকে বন্দী করেই আনন্দ-

ময়ীকে আখড়া ছেড়ে চলে যেতে বল-

লেন এ'বারবন।

এ'বারবনের পা দুটো ছাড়িয়ে করে
আনন্দময়ী ব্যাকুল স্বরে বললেন,
আখড়া থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিও না
বাবা। গুরুদেব আমাকে আমার স্বামীর
চিতা থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন।
তোমরা আমাকে আগ্রহ না দিলে আমার
স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের খপ্পরে পড়ে
যাব আবার।

সেই ভো ভাল।—কঠোর স্বরে

বললেন তিনি। সা-আলি সাহেব

থেকে যে উঠে আসে, তার বাঁচবার

অধিকার নেই কোন। তোমার স্বামীর

সঙ্গে সহমরণের পদ্য থেকে তুমি

বঞ্চিত হলেও তোমার স্বামীর আত্মীয়-

স্বজনরা নিশ্চয়ই তোমাকে বেঁচে থাকার

পাপ থেকে রক্ষা করবে।

মালীবাগ থেকে সোজা আজিম-

পুরায় এলেন আনন্দময়ী। সা-আলি-

সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা

বললেন তিনি। সা-আলি সাহেব

বললেন, তুমি আমার এখানে থাক মা,

তোমার কোন ভয় নেই। তোমার

স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের সাহস হবে

না আমার ডেরার চৌকাঠ মাড়তে।

কিন্তু গুরুদেবকে ছেড়ে আমি

বাঁচব কী করে ফকিরসাহেব।—অবরুদ্ধ

স্বরে বললেন আনন্দময়ী।

—তোমার গুরুদেবকে আমি উদ্ধার

করে নিয়ে আসব মা, তুমি নিশ্চিন্ত

থাক।

কিছুদিন বাদে সা-আলি সাহেব

মালীবাগে এলেন তাঁর পোষা বাঘটিকে

সঙ্গে নিয়ে। বাঘটিকে নিয়ে তিনি

সিংহেশ্বরীর মন্দিরের আখড়ার কাছে

আসতেই চোখের নিম্নে আখড়া ছেড়ে

পালাল সবাই। তারপর মন্দিরের নীচের

গোপন কুঠরী থেকে সৌম্যরবনকে

উদ্ধার করে আনতে কোন চেষ্টা

হল না সা-আলি সাহেবের।

সৌম্যরবনকে নিয়ে আজিমপুরায়

এলেন সা-আলি সাহেব। আজিমপুরায়

বৌশদিন থাকেন নি সৌম্যরবন। মাস-

খানেকের মধ্যেই আনন্দময়ীকে নিয়ে

পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা কবলেন তিনি।

কোথায় গেলেন কেউ জানে না

মহাজাতি ইঞ্জিনিয়ারিং

—ওয়ার্কস—

১২৭, বরাসংল দত্ত রোড

হাওড়া ☎ ফোন : ৬৬২২২৭

সংবাদ ও সাংবাদিকতার কাণ্ডেখা

মত্যানন্দ ভট্টাচার্য

বস্তুজগতে বৈপ্লবীভাব বা তাব তৎকালীন পরিচিত সত্ত্বার ও গুণের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ অপর উপাদানের সংঘাতই ঘটনার উৎস। দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতে মানব সমাজের উত্থানপতনের ইতিবৃত্ত, ক্রমোন্নতির পথের সংঘাতের দৈনন্দিক ঘটনাই সংবাদ। বস্তুজগতের সমস্ত ঘটনাবলীকে স্পর্শ করে, তাকে অনুভব করে সেইসব ঘটনাকে পরিবেশনের পথে আবেগ সঞ্চার সংবাদেব অন্যতম কাজ। ঘটনার সঙ্গে আত্মীয়তা, তাব সঙ্গে নৈকট্য না এলে মনো-জগতে তার দ্বারা কি পৃথিব্য ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হচ্ছে তার উপলব্ধি হবে না এবং তা না হলে তাকে বস্তুজগতের সঙ্গে সঙ্গীত বোধে উন্নততর ও ব্যাপকতর পর্যায়ে বিকশিত করে তাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগণের কাছে তাদের অনুভূতির জন্য বহুজনের আত্মপদনযোগ্য করা সম্ভবও হবে না। ঘটনার ধারী তাই সাংবাদিকতা এবং পালিষদীও বটে। তার মধ্যেই সাংবাদিকতাব সার্থকতা। ঘটনার পরিবেশন তাই সমাজের চলিকাশক্তি অধিকজনের গ্রহণযোগ্য সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় তা গোপনীয়তার সামিল হয়।

পদার্থের বিকশিত উন্নততম রূপ হচ্ছে মস্তিস্ক। এই মস্তিস্ক দিয়েছে মানুষকে বিশ্লেষণ ক্ষমতা। বস্তুজগতই মনোজগতের প্রদীপ হলেও মানুষের চিন্তা বা চৈতন্যেরও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তবে আত্মা প্রকৃতির অতিবিশিষ্ট কিছু নয়। বাহ্যিকপ্রকৃতিই হল প্রাথমিক। বস্তুজগতের গতিপ্রকৃতির অন্ত-নিহিত নিয়মকানুনের সূত্র প্রযোগে মানুষই বস্তুজগতের রূপান্তর ঘটায়। মনের পটে সে অতীতে ঘটনার ছবি ধরে রাখে, বর্তমানে ঘটনার তুলনা করে তার রূপ ও

চরিত্র বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের ঘটনার ছবি আঁকে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের সংবাদ পরিবেশনের কার্যদায় মানুসেব অন্তরে যোগায় নতুন ব্যবস্থা সৃজনের প্রেবণা। চেতনার দ্বারা মানুষের অস্তিত্ব নির্ধারিত হয় না। মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব দ্বারা বরং চেতনা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সামাজিক অস্তিত্বের বাহক হচ্ছে সংবাদ এবং সেকারণে সংবাদই মানুষকে সঙ্কীর্ণ গল্ডীর অভ্যন্তরে আটকে না রেখে, সব কিছুকে অবশ্য ভাবিতব্য বলে গ্রহণ না করে—তার বিকাশ সাধনের দ্যোতনা দেয়। সংবাদেব ক্রিয়া তাই শৃঙ্খল সমাজের ঔপরিভল নিয়ে নষ। সাংবাদিক তাই শৃঙ্খল সমাজের বাহিরেব জন্য ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করে না অন্তরংগ তার লক্ষ্য এবং একাজ তাই সমাজের জন্য। এ-বৃত্তি তাই শৃঙ্খল উপজীবিকা আইনের ক্ষেত্র নয়—সমাজের সেবার।

মানুষ নিরন্তর পরিবেশকে ফিডের অনু-কূলে পরিবর্তন করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির যাবতীয় বস্তু এবং ঘটনাবলীর মত মানব ইতিহাসেব বিকাশ ধাবাও স্বন্থেব মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিরোধী শক্তির সংঘাত ও একীভবন হচ্ছে এই পৃথিবীর প্রাণবস্তু। প্রতিটি ঘটনাব ও বস্তুই বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, একাধিক বিরোধী সত্ত্বার সমন্বয়ে তার পূর্ণ রূপ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বিকাশের ক্ষেত্রে সমন্বয় নয় সংঘাতই হচ্ছে চিবন্তন সত্য। যেখানে বিরোধ সেখানেই সংঘাত হচ্ছে শব্দবত নিয়ম। সম্পূর্ণ বিরোধী শক্তির সংগ্রাম ও সংঘাতের মাকে নিষ্পত্তিই অবশ্যম্ভাবী পরি-গতি। রূপ-রস-গন্ধেভাব্য এই পৃথিবী। আচার-ব্যবহার, সংগ্রাম সংঘাত ভালবাসা, প্রেম-বোধেব মমতার বিচিত্র অভিব্যক্তিতে ব্যক্তমানুষ—রূপময় এই দুনিয়া মানুষের এবং

মানুষ বিভিন্ন ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই তাকে নবরূপে সজ্জিত করার কল্পনা করে। বর্তমানের ঘটনার ক্ষেত্র আঘাতে আঘাতে লীন হয়ে যায় মানুষের কর্ম-প্রবাসে। নতুনেব আবির্ভাব সমাসন্ন করে তোলে মানুষ। বিভিন্ন ঘটনাব উৎস ও ঘটনার পরিবেশনে ‘সংবাদ’ নতুনের এই কেতন ওড়ায়।

যে ঘটনা সংবাদ হয়ে, বহুজনের মনে আলোড়ন সৃজনে সার্থক হয় তা হয়ে, যাব সামাজিক সম্পত্তি। বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে আত্মস্থ করে তার দ্বারা অপরের চেতনাকে অনুবিস্ব করার ক্ষমতাতে সাংবাদিকেব দক্ষতা। সংবাদেব মাধ্যমেই সমাজজীবনেব গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। তাই ঘটনার স্থলিত ও বিপর্যস্ত উপস্থাপন, সাংবাদিকেব কাজ নয়। সংবাদ হচ্ছে তাই একটি সজীব শক্তি—এবং বহুলাংশে প্রত্যক্ষেই সমাজ রূপান্তরের একটি উপাদান। সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে সংবাদেব ক্রিয়া তাই সূচকীয়।

সৃষ্টি লক্ষ্যে উপনীত হতে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সংঘাত ও সংগ্রাম সমাজ-জীবনে তাই সংবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ঘটনার দিবাচন জীবনের গভীরতার ডুব দিয়ে, ভালভাবে অনুশীলনেই সংবাদেব নির্বাচন সম্ভব। সমাজ বিকাশের তাৎকালীন ধাবার উত্তাপের মধ্যে নিমগ্ন না থাকলে এই অধ্যুসন্ধান ও বিশ্লেষণের পথে বিচার করা সম্ভব হয় না।

পরিবেশ ও ভোক্তার নতুন মন সৃজনে সংবাদেব ভূমিকা অতুল্যীয়। সংবাদ দেখে যে, বিশ্বজগতের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সমূহের বিবট প্রবাহ বা পরম্পরায় একটা প্রগতিশীল বিকাশ, নিরন্তর থেকে উচ্চতর অভিমুখী বিকাশ নিজেব প্রমাণ করছে।

সমাজের আভ্যন্তরিক কোন বিরোধ কোথায় প্রত্যক্ষ-সংঘাতের ক্ষেত্র সৃষ্টি করছে তা ঘটনার উপস্থাপনের মাধ্যমে সংবাদ নির্দেশিত করে দেয়। সামাজিক কাঠামোর সান্নিধ্য বিরোধগুলোর সম্মুখীন ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায়। আব সেই ঘটনার মাধ্যমে বিরোধের আভ্যন্তরিক দিক দেখে সংবাদ। তবে উপলব্ধিতে ঘূর্ণন থাকলে সেই বিরোধকে হাজির করার দিকটা চেপে বাওয়া হয়। স্বল্পই যে সমাজপ্রগতির মূল পরিচালিকা শক্তি একথা তখন স্বীকৃত হয় না। ব্যাপক জনগণ কিন্তু সঙ্কট জর্জরিত দুর্নিয়াল পরিবর্তন কামনা করেন এবং ঘটনার ইতিবৃত্ত ও ঘটনাসমূহের মাধ্যমে উপস্থাপিত সমাজের আভ্যন্তরিক সান্নিধ্য বিরোধগুলো সম্মুখীন হয়ে তার সমাধানের বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পন্থা গ্রহণের স্বাধীন সমাধানে প্রস্তুত। ঘটনাব উপস্থাপন হবে সংবাদের মাধ্যমে। পাঠক পরিবেশিত সংবাদে মাধ্যমে বিবোধে উপলব্ধি করবে এবং সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কীভাবে ঐ বিরোধের সমাধান করে সমাজকে উন্নতর নতুন অবস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে তার ইঙ্গিত দেবেন সম্পাদক তাঁর মন্তব্যের মাধ্যমে প্রবন্ধের পাতায়। স্বল্পের অন্তর্গত উদ্ভব ও সমাধানের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অগ্রগতির পথ এইভাবে ক্ষর দেবে সংবাদপত্র। বিপ্লবী ভক্তের সঙ্গে ত্রুটির যোগান দেবে সংবাদপত্র। একাধিক সংবাদপত্র একটা শক্তিশালী হাতিয়ার।

মানুষের কর্মবিকাশের ইতিবৃত্ত যেমন শ্রেণী সংঘাতের ইতিহাস বহন করে এসেছে তেমনিই সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে রয়েছে শ্রেণীস্বার্থের প্রতিবিম্ব। একটা শ্রেণী পরিবেশে মানুষের মানসিকতা গঠিত। সমাজের প্রতিফলন, বস্তুজগতের প্রতিবিম্ব তার চেতনাকে অহবহ রূপান্তরিত করে একটা মানসিকতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সাংবাদিকের মানসিকতাও এই প্রতিফলন বহির্ভূত নয়। সাংবাদিক তার পরিবেশ ও সমাজদেহের সান্নিধ্য মানসিকতার বাইরে নয়। সাংবাদিকের মনে বস্তুজগতের যে প্রতিফলন পড়ে ভাবাবেগ সৃষ্টি করে, তারই বাজনা মর্ম আভ্যন্তরিক হয় পরিবেশিত সংবাদে। প্রকাশিত বা পরিবেশিত সংবাদ হচ্ছে সাংবাদিকের ব্যক্তিমানসের আভ্যন্তরিক ও চিন্তার প্রতিফলনের ফল। উদ্দেশ্যহীন, বিমূর্ত সংবাদ সেবা সম্ভব নয়, হতে পারে না। নিরপেক্ষ স্বাধীন অর্থে নিরপেক্ষভাবে একটি শ্রেণীর এবং সমাজের একাংশের সেবা। তাকে স্বাধীনতার নামাবলী দিয়ে ঢেকে ফেঁটা চন্দন পরিণত অপর অংশ বা অপর শ্রেণীকে কুহক জালে ফেলে রাখার চক্রান্ত মাত্র।

সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বা সাংবাদিকতার আসরে দুটি বিবোধী শ্রেণীর জীবনদর্শন তাই পরিষ্কৃত হবে ওঠে। সংবাদ নির্বাচন ও পরিবেশনের ধারায় দুটি ভিন্নমুখী নীতির আভ্যন্তরিক একটা লক্ষ্য করলেই ধবে ফেলা যায়। মেহনতি মানুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে সমাজ বিকাশের একটি ধারা, অপরটি ধনবাদী

সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদীদের নীতিতে তাদের সংরক্ষণের প্রথম পদক্ষেপ প্রতিক্রিয়াশীল ধারা।

সংবাদের জন্য সংবাদের সত্যগান্ধী অগ্নি-ক্ষরার পথের পথিকরা স্বাভাবিক ধারার অনুসারী। মানুষকে সত্য অবিলম্বে উপভোগের মধ্যে আচ্ছন্ন করে রেখে, তার মুক্তি-আশ্রয়ী বিজ্ঞান-নিষ্ঠর চেতনার বিকাশ বাধা দিয়ে তাকে মিথ্যা আশা, ভয় এবং ইচ্ছার সর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকতার দূষিত পাকে ডুবিয়ে রাখে, তার অহতনীয় শোষণের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এরা সংবাদকে নিজস্ব চক্ষে পরিবেশন করে এবং ঘটনাকে তদনুসারে ঢেলে সাজিয়ে রঙ মাখিয়ে হাজির করে। পরিবর্তন ও পরিবর্তন এদের মূলমন্ত্র।

উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণে মুদ্রিতময়র-আধিপত্যের ফলে সমাজের একাংশ জীর্ণ ও অপরাধ অপবের শ্রম আত্মসাতের ফলে হয়ে উঠেছে মোদবহুল। এই অসম নিয়ন্ত্রণই সমস্ত ঘটনার উৎস। তাদের সংরক্ষণ এদের উদ্দেশ্য তাই সংবাদের মাধ্যমে তার সমাধানের পথের নিশানা সম্পর্কে বিস্তারিত সূচী দেয় এদের কাজ।

সংবাদের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি মেলে। অর্থনীতি হল ভিত্তি এবং রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ। ঘটনার পরিবেশনে সংবাদ হিসাবে মূল্য নির্ধারণিত হয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপের স্বাধীন।

নিরপেক্ষ, নিষ্ঠুরতার আত্মসাজা পরিহিত সাংবাদিকেরা বিচারাসনের অধিকারী হিসেবে নিজেকে জাহীল করে মানবতাবাদের প্রচার করে। এরা ধুব বিপক্ষজনক। জ্বালালো কায়দার এই সব সাংবাদিক অতিমানবেরা মোহন্তমূলভ ভ্রম্যমীতে সামন্ততান্ত্রিক অভ্যাস, পান্ডাই-পুত্রোহিতদের অনাচার ব্যাচারাতে ঢেকে তাদের শোষণকে আড়াল করে দুটো পুরুষ, একটা হাসপাতাল বা একটা কলেজ ক্ষরার ব্যবসায়ী পন্থাতিকে মহত্ত্বের পর্যায় টেনে নিয়ে গেছেন। এদের মানবতাবাদ হচ্ছে বস্তুবাদী স্বল্পভক্তের পাটো অঙ্গ। সংগ্রাম ও সংঘাতের মাঝে বিকাশের পরিবর্তে উদার মানুসের একটা ছোট অঞ্চল নিয়ে সুখী সমাজ গড়ার ছবি ও এরা তুলে ধরে। তুলে চলবে না যে, ধনিকশ্রেণীর মানবতা শোষণশ্রেণীর প্রতি এক ধরনের মমতা। শোষণের মানবতার দোঁড় কতদূর তা সহজেই বোঝা যায়। শোষণ বজায় রেখে এবং শোষণকে আড়াল করার জন্যই তাদের দায়-সাক্ষ্য। সেই কাজকে বড় করে দেখান, ঐ সব ঘটনাকে মনোহর করে তুলে ধরে মানবতার মরীচিকা দেখান এই সব গোমস্তা সংবাদ ব্যবসায়ীদের কাজ। আর এই প্রচারণার যে মিথ্যা প্রচারণাভিযান ছাপার পাতায় ঢালায়, সরল বিশ্বাসী সাধারণ মেহনতি মানুষ তাকে সত্য বলে ধরে নেয়। যুগ যুগান্তরের আঁতড়াতে এসে এই মানবতারাদী সাংবাদিকেরা তাদের মরীচী ও

স্বাধীনতার দোঁড়ো হাঙ্গামে দেখায় এবং সামাজিক সৌহারদের অমূল্য বাণী দেয়। পত্র-গণ্য সমাজের লালনের মধ্যেই এই ধনবাদী সভ্যতার শত্রুদেরা জীবনরস খুঁজে বের করে। ধনবাদী শোষণের চূড়ান্ত স্তর সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম-যুগে ঔপনিবেশিক দস্যুদের অত্যাচার, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, শোষণ ও বৃত্তান্তগার বিবরণে শোষণিত মানুসের মুণ্ডিসংগ্রামে জীবনের রস না দেখে দেখেন শত্রু মৃত্যু করাল ছায়া। মানবের চূড়ান্ত অবমাননা থেকে মুক্তির সংগ্রামকে ঘটনার বিবৃত্ত করেন। বিবৃত্তি এবং মন্তব্যে এরা করেন ব্যঙ্গ। মুক্তির পান্নায় ক্ষয়-ক্ষতিব বিবেচনার অকিঞ্চিৎকরতা তাদের কলমে স্থান পায় না। ছেলেমেয়ের মৃত্যুতে পিতৃহৃদয়ের জন্য শোক এদের আছে। কিন্তু জনগণের জন্য পুত্রের আত্মদান যে গৌরবের সে কথ এদের লেখনীতে স্থান পায় না। মার্কসিক অনুভূতির নামে শোক করো—কিন্তু শোকের ঘণ্টা এবং ঘণ্টা ক্রোড়ে রূপান্তরিত ববর ধারাকে চেপে ধান।

অর্থের ক্ষমতাভিত্তিক একটা সমাজে মুদ্রিতময়র করেকজন ধনীকে পরগাছা হলেও মহীরুহের সম্মান সংবাদের পাতায় দেওয়া হয়েছে। উপরিভলার বা সুপার শীকচয়ে রুডারদের প্রাধান্য দিয়ে তাদেরই সমাজের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে উপস্থাপন এই সব সাংবাদিকদের কাজ।

সংবাদপত্রের পাতায় সমাজের সংঘাতের তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপনার পরিবর্তে মৌল ও অপরাধভক্ত কাল্পনিক ঘটনাকে ছড়া ও ছবিয় মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে হাজির করেন এই সব সংবাদসেবীরা। দেব-দেবীর পালোঁক নাহাওয়া এবং অব্যক্তদের অপার্থিব দনতায় প্রচবের মাধ্যমে ইতিহাসের নিয়ামক শক্তি যে জেনসাধারণ এবং মামুষ সে কথা জুলিয়ে দেবার খাঁদ পাত। ব্যক্তিগত উন্নতি লোভ-পতা থেকে এই সব জাতীয়তাবাদী, সনাতনবাদী, ঐতিহাসেবী সংবাদসেবীদের জন্ম হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে মানুষ যখন বহন কোনও সৃষ্টির, নতুন কিছু পাবার জন্য সংগ্রাম করে তখন ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র স্বার্থ, অশ্লীল বিকৃতিকে সে চমকে দেয়।

কত উপখ্যান, কত কাহিনী জুতপ্রভ, দাঁতা-দানাকে সংবাদের পৃষ্ঠায় হাজির হতে হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। মরা মানুষের তো নিস্তার নেই-ই। তাঁরা মহত্ত্বের, সত্য্যগীর এবং দেশসেবকের বক্ষল পবে নিত নুতন-ভাবে অবতীর্ণ হচ্ছেন সংবাদপত্রের মস্তে। বান্ধবজীবনে জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রে বা শোষণশ্রেণীর নবজীবনায়নে তাদের ভূমিকা অনেক স্থলেই হাত ছিল প্রতিকূল। কিন্তু সমাজের নবরূপে উন্মেষের জন্য সংগ্রামের ক্ষণে তাদের নবপিতৃ হাজির না হলে উপায় নেই।

নারীদের জন্য নিয়োজিত পুস্তক এরা সূচীকর্মকে, কেশচর্চাকে, বেশভূষাকে, জুবী

হবার কায়দাকে, এবং রম্বন প্রণালীকে ছাড়িয়ে
করে। বংশ, সুদী শিল্পের দ্বারা বা রূপ-
চর্চার দ্বারা পুরস্কার মনোবলন ছাড়া আর
কোন ভূমিকা যে নারী জাতির আছে তার
উপলব্ধি পর্যন্ত রাখা হয় না। অঞ্চল আক্রমণ
দুনিয়াতে দেশরক্ষায়, মুক্তি সংগ্রামে, মহাকাশ
জয়ে নারীর ভূমিকা পূর্বস্বের অধীনতায় নয়।
অর্থনৈতিক সংবাদ বলতে এরা বোঝেন
শেয়ার মার্কেটের খবর। প্রতিষ্ঠা দলতে
ঘন করেন অপরের শ্রম আত্মসাতের পার-
শীতা, মূহুর্দ্দন্দ্যানার কোরামতি বা আমলার
পদের মূহুর্দ্দন্দ্যানা। নাটক-সাহিত্যের নামে
ছাড়িয়ে করে থাকেন নন্দন যৌনতা এবং আবির্ভাব
মানবের জোয়ার। সমকালীন জীবন নাট্যের
প্রতিফলনের জন্য জোয়ার অনার প্রয়াসের
কোনও সম্ভাবনা এঁদের কাছে নেই—থাকে না—
থাকবে না।

পঞ্চাী অঞ্চলে উপাদানের ক্ষেত্রে কথ্যা
করে কিভাবে রাখা হচ্ছে, কিভাবে তার মুক্তি
আসবে, কোন খালে সেই সংগ্রাম চলছে,
কোন সংঘাতের মধ্যে শৃঙ্খলিত উপাদানের
সম্পর্কের মুক্তি ঘটেছে তা চেপে দিয়ে অক্ষ-
বজের সংবাদ বলতে দেব-দেবীর মন্দির,
শোষণশ্রমীর ভোজ্য সম্ভব মিঠাই-এর তথ্য
এবং সর্বোপরি শাসকশ্রমীর নেতাদের সফর
ও বক্তৃতার খবরই ফলাও করে পরিবেশিত
হয়। যে ব্যাপক জনতা ইতিহাসের নিয়ামক
শক্তি তাদের ভূমিকাকে উপেক্ষা করার
ক্ষমতার মধ্যেই এদের সাংবাদিকতার দক্ষতা
লুক্কায়িত। সেই কাজের পারদর্শীতার মাঝেই
শাসকশ্রেণী ও পুরাতন সমাজের কাছে এরা
স্বীকৃতি লাভ করে থাকেন। একমুঠো লোক
এদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে
আছে। তাদেরই এরা সমাজ বলে ভুলে ধরে
এবং তাদের ক্রিয়াকে সমাজের চিত্র বলে
উপস্থাপিত করে। এই একমুঠো লোক আর
অগণিত শ্রমিক, কৃষক, কেরানী, মেহনতিশ্রমী
ও বুদ্ধিজীবীদের বিবোধের মধ্যকার
আপোহীন সংগ্রামের কথা এরা ভুলে যসে
আছে। তাই সংবাদপত্রের পাতা দলীয় সাইন-
বোর্ডকে উঁচিয়ে ধরাব জন্য ব্যবহার করে।
আসলে ব্যক্তিগত লাভলোকসানের নিরিখে এরা
ঘটনার বিচার করে এবং সংবাদ নির্বাচন
করে বা তার বিশ্লেষণ করে। পৈতৃবর্জ্যচার,
নিরক্ষর সংবাদের মান ও নীতি নির্ধারণ
একচেটিয়া অধিকার থাকতে এর অবসান হবে
না।

বড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ থাকে! কিন্তু
নবীন পথিকদের মধ্যেও চেতনার গভীরে
এইসব প্রতিক্রিয়াশীল সাংবাদিকতার শেকড়
ছড়িয়ে আছে। সচেতন সাংবাদিকও সুবিধা-
যাচী প্রতিক্রিয়াশীলতার শিকারে সামিল
হচ্ছেন। এঁরা গ্রাহকদের দোহাই পেড়ে,
বিজ্ঞাপনদাতার মরজির কথা এনে আসলে
বুদ্ধোন্নতদের স্বাধীন সিদ্ধি করে। তাই আজ
বুদ্ধোন্নত পত্রপত্রিকা বলে নিজেদের বাঁচাবার
চেষ্টা বেঁধে করছে, আসলে এরা বুদ্ধোন্নতদের

দুর্ভাগ্য করেই নিজেদের আশ্রয় তৈরীতে
সবাই ব্যস্ত।

সমাজের বিকাশসাধনে, তার গবর্নামেন্টের
নিরীক্ষার রাজনীতির পরেই সাংবাদিকতার
স্থান। রাজনীতি বলতে শ্রেণী-রাজনীতি জন-
গণের রাজনীতিকে বোঝাতে হবে। জনকন্ঠকে
রাজনৈতিক নেতার রাজনীতি নয়। সংবাদ
হবে জনসাধারণের পক্ষে, তাদের বাঁচার
পথের সম্ভাবনা। সাংবাদিকতা হবে জনসাধারণের
জন্য, শ্রমিক কৃষক, মেহনতি মন্দ্র, বুদ্ধি-
জীবির স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে এবং তাদের
উদ্দেশ্যে ও তাদের বাবুজির জন্য সৃষ্টি
হবে।

একজের জন্য সাংবাদিকতার জনতার
ওপর নির্ভর করা, “জনতা খেঁচ জনতা”
পর্যন্ত নীতি, অনুসরণ করা প্রয়োজন। এরই
ফলে সংবাদের উৎসের এই ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে
উৎকর্ষ লাভ করবে এবং সাংবাদিকশ্রেণী
সর্বোত্তমের উপাদানের অঙ্গ হিসেবে উন্নীত
হয়ে উঠবে এবং উৎকর্ষ নিদর্শন ছাড়িয়ে
করা সম্ভব হবে। যখন রাখতে হবে যে,
বুদ্ধোন্নতদের হাতে অসংখ্য সাংবাদিক এবং
তাদের রচনা ও পরিবেশনের ক্ষেত্রও অসংখ্য।
কিন্তু বিকৃত সংবাদের জবাব দাকসের কোটে-
শন নয়, এঙ্গেলসের উদ্ভূতি নয়। শ্রেণী-
সচেতন কিছু সাংবাদিক ঘটনার চরম ও পরি-
বেশনের বস্তুবাদী বস্তুতত্ত্বের প্রয়োগ সরু
না করলে পাঠা নজীর হবে না। এই নজীর
সৃষ্টির পথ সমাজকর্মীরা সংগঠিত করবে
গঠকদের। নব পাঠকশ্রেণী তৈরী করতে হবে
খেতে-খামারে, কল-কারখানায়, আপিস-
আদালতে, গল্পে ও দোকানে। যেখানে ঘটনার
মূল্যায়নের জন্য বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবী উঠবে।
কিশাণ শ্রমিকের অর্থনৈতিক আন্দোলনের
মত তাদের মধ্যে সংগ্রামী আওয়াজে নতুন
জোয়ার আসবে পাঠক আন্দোলন। এর সঙ্গে
থাকবে পাঠা আওয়াজ বরকটের স্লোগান।
ব্যাপক জনতা শৃঙ্খলিত নয়—তাদের সংবাদ,
তাদের জন্য সংবাদ মা থাকলে হালান্না করবে,
প্রকাশনা বন্ধ করে দেবে। বিজ্ঞাপন হচ্ছে,
পুঁজিবাদী সমাজে সংবাদপত্র পরিচালনে
অর্থগণের একটা সূত্র। যে সংবাদপত্র বাপে
না আসবে তার বিজ্ঞাপনদাতার (পেণ্ডার)
শিল্পে গিয়ে হাঙ্গামা হবে বিজ্ঞাপন বন্ধ
করে দিতে হবে। সংবাদপত্রের মালেকা বন্ধন
পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে মুনাকা পাবে না
তখন পরিকা চালানো তাব পক্ষে মুশকিল
হবে উঠবে। তখন বুদ্ধোন্নত সাংবাদিক
ধর্মাবলম্বীকে আর বাকস্বাধীনতা বাদামী
গলায় জুলিয়ে বসে থাকা সম্ভবপর হবে না।
তখন এই (শোষণ) শ্রেণী সাংবাদিকতাকে
খোলাখলিভাবে তাকে সমর্থন করতে হবে
এবং এর বিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে
এগিয়ে আসতে হবে। এইভাবে আন্দোলনে
রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ভন্ডামীর মুখোমুখি
আড়াল আর থাকবে না।

একদল লোক আরছেন যারা বলেন যে,
বুদ্ধোন্নত সংবাদপত্রের ওপর নির্ভরশীল

হলেই হয়। এ হল শাসক-শোষণের যুক্তি।
ভেজাল খাদ্য না কিনলেই হয়, ছাল ওষুধ
ব্যবহার না করে ওষুধের ব্যবহার বন্ধ কর
নিজে ওষুধ তৈরী করে খাও, চোবাবাজের
চাল না কিনে উপোষ করে থাক, ঘুঘু না দিয়ে
কাজ হাসিল হচ্ছে না—কাজ বাতিল কর—
এই যুক্তিও তাই। শোষণশ্রেণী সাংবাদিকতার
জাল-ভেজাল ঘুঘুব জোয়ার এনেছে। তা থেকে
শুচিচারুদ্রবতা বৃদ্ধির মত গা বাঁচিয়ে ধবের
কোড়ে পড়ে থাকা নয়, চাই দুর্বার প্রতিরোধ।
পুরাতন ক্রিয়াকর্ম সমাজের মত, ঘটনাকে
অন্তরাল করার, সংবাদকে বিকৃত করার এই
প্রয়াসের ক্ষেত্রও সর্বোপরি হয়ে আসছে, এরা
নিপুণ ও ক্রিয়াকর্মী।

সাংবাদিকের সামনে থাকছে উন্মুক্ত সমাজের
চিত্র, তার জীবনবোধ ও আদর্শ। সংবাদ-
সেবায় বর্তমানে এক যুগান্তকারী সামা-
জিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের
রথক্ষেত্রে এসে পড়ছেন। এক যুগের সংবাদকে,
বিরোধের অবসানের পক্ষে, সমাজের বিকাশকে
পরিবর্তনকে ঘটনাপরম্পরায় চিত্রায়িত করার
মহান গুরুদায়িত্ব তাদের ওপর এসে পড়েছে।
জনতার লাইন অনুসরণ করে মুষ্টিমেয়
স্বীকৃতি ও প্রশংসার লালসাকে ত্যাগ করে
তাত্ত্বিক গভীরতা নিয়ে ঘটনা নির্বাচন, সংবাদ
পরিবেশন ও প্রকথ রচনার পথ গ্রহণ করার
দিন এসেছে। প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকদের সম্পর্কে
ঘাবড়ানার কিছুই নেই। পুরাতন সমাজ
ব্যবস্থার নদীর কুমিরা নতুন সমাজের প্রজা-
পতি কখনও হতে পারে না। নতুন সমাজের
চন্দ্রবদনের কাছে ওদের জন্য জমা থাকছে শূন্য
ঘুঘা। মতাদর্শ হিসেবে সঠিক সাংবাদিকতা
হবে আগামী সমাজসৌখ্যের অঙ্গ এবং তা
নবীন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও
রাজনৈতিক সংগ্রামের সহায়ক হবে।
এ সাংবাদিকতা হবে ব্যাপক জন-
গণের জীবনের ঘটনাত্ত্বিক তাদের
জীবনের সত্যসংগঠনী। অতএব গণতান্ত্রিক।
এই সাংবাদিকতা মেহনতী শ্রমিক কৃষক
জনতার স্বার্থসেবা করবে এবং ক্রমে তাদের
একবারে নিঃশব্দ হয়ে যাবে। তারাই জাতির
শক্তিকরা ৯৫ ভাগ। জনগণের জীবনের ঘটনা
চরম, তাকে সংবাদের মানে উন্নয়ন ও জনতার
মাঝে ছড়িয়ে দেবার মনস্ব আসবে ঘনিষ্ঠ
সংযোগ। এই সংবাদপত্র হবে জনতার একটি
শক্তিশালী হাতিয়ার। সমাজের গুণগত রূপ
পরিবর্তনের আগে মতাদর্শগতভাবে তার ক্ষেত্র
প্রস্তুত করবে এবং সংঘাতের সময় একটি
অপরিহার্য স্রোতে পরিণত হবে। জনগণই এই
সংবাদের, সাংবাদিকতার এবং সংবাদপত্র পরি-
চালনের হবে অক্ষরন্ত উৎস।

রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি দুস্তর

আদিত্য
ওহদেদার

ভারতীয় পৃষ্ঠা হল রবীন্দ্রনাথের
বালা রচনার খনি। গদ্য-পদ্যে লেখা
নানা জাতের রচনা মাসের পর মাস উক্ত
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সব
রচনার প্রায় সকল ক্ষেত্রে লেখকের নাম
ছাপা হয় নি। কিছু রচনা 'ভানুসিংহ'
এবং 'ভঃ' ছদ্মনামে বের হয়। পরে এই
সব রচনার বেশ কিছু ভাগ কবির
স্বনামে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।
কিছু রচনা কবির জীবদ্দশায় তাঁর লেখা
বলে চিহ্নিত হয় নি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর
পর সেগুলি সংকলিত হয়েছে, বিশেষ
করে কবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কবির
রচনাগুলিতে।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের
বালা রচনার একটা অংশ,
রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুদের জানা আছে,
ভাবতীর পৃষ্ঠায় অজ্ঞাতবাস করছে।
সেগুলিকে চিহ্নিত তথা সংকলিত করার
প্রয়াস অজ্ঞও দেখা দেয় নি। রবীন্দ্র-
গবেষণার এ এক গুরুদায়িত্ব। এই
দায়িত্ব বাতে শীঘ্র পালিত হয় সৈদিকে
আমাদের অবহিত হওয়া উচিত।

আর কিছু রচনা এমন আছে—যা
রবীন্দ্রনাথের বলে চিহ্নিত কিন্তু তা
কোথাও সংকলিত হয় নি। এই শ্রেণীর
একটি রচনা নিয়েই বঙ্গমাণ আলোচনা।
বচনাটির নাম 'নিন্দাতত্ত্ব'। এটি
একটি প্রবন্ধ। ১২৮৬ সালের আশ্বিন
সংখ্যার 'ভারতী'তে রচনাটি মুদ্রিত
আছে। এ লেখা যে রবীন্দ্রনাথের তার
উল্লেখ মাত্র একজায়গায় দেখছি—কবি-
জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সংকলিত একটি গ্রন্থপঞ্জীতে। [দ্রঃ
রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৫ :
রবীন্দ্রনাথের 'বালা'রচনাঃ কালানুক্রমিক

সূচী]। কিন্তু সেখানে নিন্দাতত্ত্বের
শুরু উল্লেখমাত্র আছে—এ রচনার লেখক
হিসেবে কেন রবীন্দ্রনাথকে ধরা হল সে
সম্বন্ধে কোনো বিবৃতি বা টীকা নেই।
এ রচনা যেমন কোথাও রবীন্দ্রনাথের
নামে সংকলিত হতে দেখি নি, তেমনি
দেখি নি এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা।
এমন কি অতি সম্প্রতি প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-
জীবনী'র পরিবর্ধিত প্রথম সংস্করণেও
(৪র্থ সং, ১৩৭৭) এ রচনা সম্বন্ধে
কোনো আলোচনা নেই, এমন কি এর
উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

অথচ রচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বাংলা গদ্যের আলোচনায় এর স্থান
অবশ্য হওয়া উচিত। একে বাদ দিলে
সে আলোচনা হবে অসম্পূর্ণ।

রচনাটি যে রবীন্দ্রনাথের, তার
অকাটা প্রমাণ আছে অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য।
সে আলোচনা পরে করব। আগে
রচনাটির গুরুত্বের কথা বলি।

'রুরোপ প্রবাসীর পত্র' সম্পর্কে
রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে বলেছেন,
"এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে
এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারি নে
কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে
চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।"
হুতোম পাঁচার নকশার কথা মনে
রেখেও রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি
অস্বার্থ বলতে পারি না। কারণ,
হুতোম পাঁচার নকশা যদিও রুরোপ
প্রবাসীর পত্রের আগে লেখা, কিন্তু
হুতোমের ভাষা সর্বতোভাবে সাহিত্যের
বাহন হবার উপযুক্ত নয়। একধরনের
খিস্তি-ঘোষা রম্যরচনা তথা লঘুচটুল
বাঙ্গাবিহীন ও ভাষায় লেখা চলে, কিন্তু
সব রকম চিন্তা, বিশেষ করে 'নিরিয়্যাস'
বা তর্জম্য ভাব প্রকাশের বাহন

হুতোমের চলতি ভাষা হতেই গারে নাও
ও ভাষার জাত হল কবির লজাই তথা
খিস্তি-খেউড়ের ভাষা—সেই ভাষাকেই
পদ্যের বদলে গদ্যে ব্যবহার করেছেন
হুতোম। নকশার যে-কোনো পাতা
খুললেই এ কথার সাক্ষ্য মিলবে। তবু
একটা অংশ তুলে ধরি—

গুরুদাসের মেজাজ আলি হয়ে
গ্যাচে, সূতরাং বাবা ঠিক বলেচ!
আমিও তাই ভাবছিলাম, ভাই! যত
টাকা লাগে, তোমরা তাই করবে একটা
মেয়েমানুষ নে এসো, আমি বাবা তাতে
পেচপাও নই, গুরুদাসের সাদা প্রণাম!
এই কথা বলতে না বলতেই নারায়ণ,
গোপাল, হরি ও ব্রজ নেচে উলেন ও
মাজিরের নৌকো খুলতে মানা বসে দিয়ে
মেয়েমানুষের সম্বন্ধে বরুলেন।

এদিকে গুরুদাস, কৈদার ও আর
আর ইয়ারেরা চিৎকার করে—

যাবে যদি যমুনাপারে ও রুগিণী,
কত দেখাবি মজা রিষড়ের পাটে
শামা বামা দোবানী।

কিনে দেবো মাতা ঘবা.

বারুইপুরের ঘনসি হাসা.

উভয়ের পুরানি আশা

ও নোনোগি॥

গান ধরেচেন, এমন সময় চৌকিটপ
বরন কোম্পানির ইয়ারডে'ব ছুতোরেরা
এক বোট ভাড়া করে রাঁড় নিয়ে আমোদ
কসে কসে মাছিলা, তারা গুরুদাসকে
চিনতে পেরে তাদের নৌকো খেবে—

চপে থাক্ থাক্ থাকরে ব্যাটা
কানায় ভাশন।

গোর চরাস লাগল ধরিস্ এতে
তো'র এত ফনু॥

গাইতে গাইতে হুররে ও হরিবোব দিয়ে

সাই-সাই করে বেরিয়ে গেল; গুরু-মাসেরাও দু'উত্ত ও হাততালি দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর নৌকায় মেয়ে-মানুষ না থাকতে সেটি কেমন ফাঁক ফাঁক বোধ হতে লাগল। এদিকে বোটওয়ালারাও চেপে দু'উত্ত ও হাততালি দিয়ে তাঁরে যথার্থই অপ্রস্তুত করে দে গেল।"

এর পাশে যুরোপ-প্রবাসীর পত্রের ভাষার নমুনা দেওয়া যাক। এই বইয়ের পাতা খুলতেই যে-অংশে চোখ পড়ল তাই তুলে ধরাছি—

"বোধো, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অপ্রম্ভা-হয়েছে। কম্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেন, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিলে না। তাঁর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তাঁর কারণ আছে। আমি যখন বস্ত্রের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতাম তখন দেখতাম, দূর দিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে; কম্পনায় মনে করতেন যে, একবার যদি এ দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি—এ দিগন্তের ঘরানিকা ওঠতে পারি—অর্থাৎ আমার সমুদ্র থেকে এক অকূলে অনন্ত সমুদ্র একে-বারে উথলে উঠবে। এ দিগন্তের পর যে কী আছে তা আমার কম্পনাতেই থাকত। তখন মনে হত না এ দিগন্তের পরে আর এক দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গিঁড়ের মধ্যে বসে আছে।"

এই চলতি ভাষা যে সর্বতোভাবে সাহিত্যের বাহন হবার যোগ্য তা নিঃস্বাধ্য উপলব্ধি করতে পারি। এ ভাষার প্রকাশ শক্তি কিছুমাত্র সীমিত নয়, অর্থাৎ বিশেষ ধরনের ভাব প্রকাশ করার মধ্যেই যে এর সীমা তা নয়। যে-কোনো ভাব, যে-কোনো চিন্তা, গভীর অথবা চটুল, দুরূহ অথবা সরল, সবই এই ভাষার মাধ্যমে সাহিত্যরূপ পেতে পারে। বস্তুত, আজকের চলতি বাংলার যে রূপ সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি তার থেকে যুরোপ-প্রবাসীর পত্রের ভাষার কিছুমাত্র ভেদ নেই। আধুনিক চলতি ভাষার সূত্রপাত তাই যুরোপ-প্রবাসীর পত্র। এবং এ বইয়ের ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এই কারণেই যথার্থ।

৪২৪

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র ভারতী পত্রিকায় 'যুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' শিরোনামায় চার-পাঁচ

কিস্তি বেরিয়েছে সেই সময় নিন্দাতত্ত্ব রচনাটি প্রকাশিত হয়। মনে করতে পারি কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে তখন চলতি ভাষা বেশ একটা প্রভাব বিস্তার করেছে। চলতি ভাষা সাহিত্যের বাহন হতে পারে কিনা সম্ভবত সেটা কিশোর পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই নিন্দাতত্ত্ব রচনাটি লেখা হয়।

প্রশ্ন হবে, তাহলে যুরোপ-প্রবাসীর চলতি ভাষা কি সাহিত্যের বাহন নয়? উত্তরে বলব, এ ভাষা সাহিত্যের বাহন হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বটে, কিন্তু তাকে লেখক সাহিত্যের বাহন হিসেবে দেখেন নি। তাঁর মনের ভাব বা বক্তব্য চিঠিপত্রের আবরণে প্রকাশ করেছেন, এবং সেই আবরণের জন্যেই চলতি ভাষা ব্যবহার করতে পেরেছেন। এখানে চলতি ভাষা একটা বিশেষ প্রয়োজনে বাঁধা। এই রচনা গ্রন্থাকারে যখন প্রকাশিত হয় তখন তার ভূমিকায় লেখক বলেন, "আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনের সহিত মুরোমুখি একপ্রকার ভাষার কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়ালে হইবামাত্র আর এক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।" স্পষ্টই দেখছি যুরোপ-প্রবাসীর পত্রের লেখক এ গ্রন্থের ভাষাকে সাহিত্যের বাহন হিসেবে অবতারণা করেন নি। তা যদি করতেন তাহলে এর ভূমিকাটি সাধু ভাষায় লিখতেন না। তিনি সাধু ভাষায় বাস্তবতা আনতে চেয়েছেন—আমরা যখন কারো সঙ্গে মুরোমুখি কথা বলি তখন ভাষার যে রূপ থাকে সেই ভাষা ব্যবহার করে। কারণ, পত্র এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে লেখার মাধ্যমে কথা বলেন—মুরোমুখি কথা বলার কাজটা অদৃশ্যভাবে ঘটে থাকে। যুরোপ-প্রবাসীর পত্রে তাই চলতি ভাষার ব্যবহার মুরোমুখি কথার বাস্তব রূপ দেবার জন্যে। চলতি ভাষার এর্বাবস্থ ব্যবহার ইতিপূর্বে বাংলা উপন্যাসে কথোপকথনে এবং নাটকে পাট-পাত্রীর ভাষায় দেখা যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নিন্দাতত্ত্ব রচনাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এর গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারি। রচনাটি একটি খণ্ডিত প্রবন্ধ। এর বিষয়-বস্তু লোকনিন্দার মনস্তত্ত্ব। প্রকাশ-ভঙ্গিতে যেমন নিজক চটলতা নেই তেমনি নেই নীরস পশ্চিতিয়ানা। সাহিত্য-পদবাচ্য চিত্তাগর্ভ প্রবন্ধ যেমন হওয়া উচিত এ প্রবন্ধ তাই। কিশোর উদ্ভূতি দিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। রচনার প্রথমেই নিন্দার সংজ্ঞা প্রসঙ্গটি এইরূপ—"নিন্দা কাকে বলে জিজ্ঞাসা করলেই লোকে বলে, পরের নামে দোষারোপ করাকে নিন্দা বলে।

লোকে তাই বলে বটে, কিন্তু লোকে তাই মনে করে না। কে এমন আছে বলি দেখি যে, সে তার জীবনের প্রতিদিনই পরের নামে দোষারোপ না করে? পত্র যতদিন দোষ করতে ক্ষান্ত না হবে, ততদিন দোষারোপেরও যুখ বন্ধ হবে না। যে হিসেবে সকল মানুষই স্বার্থপর, সে হিসেবে সকল মানুষই নিন্দাক। প্রতি মানুষের জীবনের সমস্ত কাজ ভূমি রাশিকৃত করে পরীক্ষা করে দেখ, দেখবে, যে ধনীতে জন্মেছে তার গায়ে তার মাটি লেগে থাকবেই থাকবে। স্বার্থ যখন স্বার্থপরতার সাধারণ সীমা ছাপিয়ে ওঠে, তখন আমরা তাকে স্বার্থপরতা বলি। নিন্দাও ঠিক তাই।"

স্পষ্টই দেখছি নিন্দাতত্ত্ব প্রবন্ধে লেখক চলতি ভাষাকে কোনো আবরণ দিয়ে ঢালাতে চান নি। তাকে সাহিত্যের বাহন হিসেবেই আবাহন করেছেন।

নিন্দাতত্ত্ব রচনাটির একটি বিশেষ গুরুত্ব, সাধু ভাষার সংস্কার যখন ছিল দুর্ভাগ্য তখন সে সংস্কার ভাঙার একটা বৈপ্লবিক সূচনা দেখা দেয় এই রচনায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অত বয়সে সাহসের পরিচয় পাওয়া গেলেও সে সাহসে জেদ ও দৃঢ়তা ছিল না বলে কোনো বিপ্লব ঘটল না। এ একটি প্রবন্ধের পর চলতি ভাষাকে যদি আরও ব্যবহার করা হত তাহলে নিশ্চয় বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আলোড়ন উঠত। এবং তাহলে চলতি ভাষাকে সাহিত্যের বাহন হবার জন্যে প্রথম চৌধুরী তথা সবুজপত্রের অপেক্ষায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর কালক্ষেপ করতে হত না।

নিন্দাতত্ত্ব রচনার আর একটি গুরুত্ব, এটি হল চলতি ভাষায় রচিত প্রথম প্রবন্ধ। হুতোম প্যাঁচার নকশাকে প্রবন্ধ বলা চলে না। ওতে রসিকতার ভিড়ন আছে কিন্তু চিন্তার সেই বুনোন নেই যা রচনাকে প্রবন্ধের রূপ দেয়। তেমনি চিঠিপত্রের আবরণ থাকতে যুরোপ-প্রবাসীর পত্রকে প্রবন্ধ বলা চলে না। নিন্দাতত্ত্ব নির্ভেজাল প্রবন্ধ, এবং সাহিত্যগত রচনা।

১১৩৬

আগেই বলেছি যে নিন্দাতত্ত্ব রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের লেখা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে বটে, কিন্তু এই অনাগা রচনার লেখক কেন রবীন্দ্রনাথ তার কোনো কারণ কোথাও দেখানো হয়েছে বলে জানি না। কবির জীবিত-কালে এই রচনা তাঁকে দেখিয়ে তাঁর স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছিল এমন কথা

[শেষাংশ ২২৫ পৃষ্ঠায়]



লালা রামকিষণ লালের কিছুই ভালো লাগছে না। কিছুদিন হ'ল শিল্প-পাতি রামকিষণ ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এখন আর ব্যবসার কথা, গন্ধ, স্পর্শ কিছুই ভালো লাগে না, কিন্তু এখন কোনো কাজকর্ম হাতে না থাকায় ভারি বিস্ত্রী লাগছে এই একঘেরোমি। অধিকাংশ কোটিপাতির পক্ষে অবসর মানে অনেক বেশি টাকা এক পাশে সরিয়ে রাখা। লাল রামকিষণের পক্ষে অবশ্য তা নয়, কাবণ এখন টাকাকেই তিনি ঘৃণা করেন, টাকায় কিছুই আর মনের মত কেনা যায় না। যা টাকা আছে তার সৌরভ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর দালালরা নতুন নতুন চমকপ্রদ দ্রব্যের সন্ধান নিয়ে আসে না। কোথায় জলের দূরে বিরাট সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে, কোথায় বিরাট দশতারা প্রাসাদ শৃঙ্খল, তাঁর স্পর্শের অভাবে অহল্যার মতো স্থান হয়ে আছে, এ সব খবর আসে না, কিংবা কোনো সুন্দরী রমণীর অসামান্য রূপ-লাবণ্যের পণ্য সম্ভার সাজিয়ে তার মাকড়সার জালে লাল রামকিষণের মত বিরাট শিল্পপাতিকে ঘায়েল করার ভালে আছেন, সেই গোপন তথ্যও কেউ সরবরাহ করে না। এখন সবই বিস্ময়, সব জিনিষেই অরুচি। রাতে একটু হবলিস্স আব প্রাতে হবিনাম। হাস্যে অতীত।

লালা রামকিষণ তাঁর পার্শ্ব স্ট্রীটের সীতাবাম গ্যানসনের চাবতালার ফ্ল্যাটে ডেসকের সামনে বসে আছেন। তাঁর স্ত্রী শকুন্তলাদেবীর বছর চারেক আগে মৃত্যু হওয়ার পুর থেকে এখানেই থাকেন। তিনি ভাবছেন নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারিটা

একেবারে বৃন্দ। এরকম একটা ফাস্ট ক্লাস এম-এ রেখে লাভ কি, অরবিন্দবাবু যদি এই সব ব্যাপারে কোনো মতলব দিতে না পারে তাহলে মিছি মিছি ওর মাইনে দিয়ে কি হবে?

—দেখিয়ে সেক্ সাব। তিনি সেক্রেটারিকে সেক্ সাবই বলেন। আগে ত' এ রকম দুটো-চারটে সেক্রেটারি ছিল, এখন এই একটি। লালাজী বিরক্তিরে বললেন,—সেক্ সাব, কুছ ত' করনা চাইয়ে, হররোজ আমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছি, সব খারাব লাগে, কিছু মনে ভি থাকে না। কোনো কিছু নয়া চীজ রাখার আসে না। তা আপনি কিছু ভাবিয়েছেন?

অরবিন্দবাবু রীতিমত সাহেব। অঙ্গে বিলাতী পোষাক। এয়ার ফোর্সের বৈমানিকদের জু-এ ছুটালো গেলি, মদ্র গম্ভীর।

সে বলল, নতুন কিছুই ত' পাচ্ছি না স্যার। আপনি ত' কত কি নতুন নতুন কান্ড কবেছেন, তার মধ্যে দু-একটা আবার নতুন করে করতে বাধ্য কি।

—না না, এ সব তেমন কাজের কথা নয়। তা ছাড়া আমার আবার সে রকম সব মনেও নেই। একটা ইনজিনের ধাক্কা মন্দ নয়, তবে তার হাঙ্গামাও কম নয়।

অরবিন্দ সোৎসাহে বলে—সে সব ত' আমাকে বলেন নি স্যার।

উৎসাহভাবে লালাজী বলেন—মোস্ট ইনটারেস্টিং! আমি ছোট বয়সের থেকেই ভাবতাম দুটো প্রকাণ্ড ইনজিন যদি মদ্রোমদ্রি ধাক্কা খাষ কেমন মজা হয়। তাই ভেবে ঠিক করলাম এটা করতে হবে।

বিদেশে শুনছি ফাঁড়ের লড়াই নিয়ে ২৩ হৈ-ঠে। তা ছাড়া কি জানো সেক্ সাব! এত খরচা ভি আছে, মোটা টাকা লাগবে। ছোটখাটো ব্যাপার আমার ভালো লাগে না। তাহলে ত' আমি কিছু ঘাড়ু কিংবা আকাশে ছাড়তাম।

সেক্রেটারি পরমোৎসাহে বলে,—ও ত' ঠিক স্যার! আপনার কি আর ছোটখাটো কাজ মানায়। তা কি কবলেন স্যার? লালাজী বললেন—আমি বন্দোবস্ত করলাম। আজো আমার কানে সে না আওয়াজ ভাসছে। আমার বিহার নীক্লেব বাগান বাড়িটা বাহাতুর বিধে জমিনের ওপর। সেখানে একটা রেল লাইন বসালাম, আমার বাগান বাড়ির বারান্দা থেকে সব দেখা যায়। তারপর দুটো পুরানো রেল ইনজিন কিনে ফেললাম। সেখানে সেগনাল ইনজিনীয়াব দিয়ে বসালাম। তারপর দু'দিক থেকে দুটোকে চালু করা হবে ঠিক হল। একটা পার্ট ভি দিলাম, জনকয়েক ফ্রেন্ডকে ইনভাইট করলাম। কিছু মজুরও কাজ পেল। ওদের সঙ্গে দু'জন ড্রাইভার। ড্রাইভাররা স্টার্ট দিয়েই ইনজিন থেকে লাফিয়ে পড়বে। বেশ চালাক লোক চাই। তারপর বিরাট কলিসন, কি আওয়াজ রে বাবা! আজো আমার কানে বাজছে সেই আওয়াজ। একটা মজুর ত' তত্ত্বান হয়ে গেল। লোকটাকে ব্রান্ডি দিবে চাশা কবলাম। অনেকটা ব্রান্ডি খবচ হয়েছিল। না, এ সব হাঙ্গামা আব করতে চাই না, সে দিনকালও নেই।

—এর পর কি কবলেন স্যার।

—ঠিক ইয়াদ নেই, আমার মেমোরিটা

একেবারে গেছে। মনে হয় এর পর আসামের নহরকাটিয়ায় একটা চিড়িয়াখানা বানালাম। আমি একজনকে জানতাম সে বলেছিল যে গন্ডার এনে দিবে। কিন্তু আনলো কটা ভাইব—আমার ভালো লাগে নি সেটা, শেষকালে আমার ওখানকার ম্যানেজারই সব দেখা শোনা করত।

অরবিন্দবাবু এই কথা শুনে বেশ উৎসাহিত হয়ে ওঠে, সে বলে ওঠে—স্যার এটা একটা গ্রান্ড আইডিয়া। জু বানানোই ভালো। ভাইব এক চাঁদ্র আর হাতি অন্য বান্যার। ভাইব তা খাটালেই খা... আপনাদের মত এতবড় শিল্পপতির হাতই ভালো আব তা ছাড়া—

প্রাক্তন শিল্পপতি টাক মাথায় হাত দুনিয়ায় বললেন—কি জানি! হাতের খবর জানি না।

অরবিন্দ বলল—স্যার গোয়ালারা ঐ সব ভাইব-টাইস নিয়ে মাথা ঘামায়। আপনাদের মত এত বড় শিল্পপতির পক্ষে হাতিই ভালো। সবাই বলবে ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট লাগা রামকিষণের কত হাতি, কত বড় হাতিশালা। সত্য, ত্রোতা, শ্যাপরে কেউ এ কাজ করেন নি, হস্তাঙ্গলিন একটা মস্ত কাজ। সারা পৃথিবীতে আপনাদের সূর্য হব। এক শব্দ দেবতাদের রাজা ইন্দ্রদেবের দৃ-একটা হাতি ছিল। শুনছি, তাও ঐ একটা প্রবচনের বা একটা নাম-চাম আছে। কেবল দেখুন খবরের কাগজে কি বিগ পারিসিটি হবে। কোনো বিজ্ঞাপন খরচ নেই, রোজ একটা রাইট-আপ বেরোবে। জানেন তা চিড়িয়াখানার সেই ফুলমালা বলে হাতিটার গল্প কাগজে কতরকম ইনিয়োরিনিয় লিখেছিল। লোক বলে শালা রামকিষণের বদান্যতা, তিনি একটি হাতি নিয়ে সুরু করেছিলেন, আর আজ—!

শালা রামকিষণের বাঁধানো দাঁত আহ্লাদে প্রায় খুলে পড়ার মত হয়ে এল, তিনি হেসে বললেন—সেক্ সাব আপনি ঠিক বলিয়েছেন, হাঁথি ভালো জিনিষ। কিন্তু আমার হাঁথি কোথায়। একটা জেনানা হাঁথি চাই, তারপর আস্তে আস্তে—। কেনা যায়, তবে একটা দিয়ে তা হবে না, ওরা যাতে একটা সনসার বানাতে পারে সেই বন্দোবস্ত করা দরকার। লোকিন হাতির বাচ্চা তা অনেকদিন পরে হবে, যেমন আকাশে ধূমকেতু ওঠে কতদিন পরে—ওরা বড় ঢিলা-ঢালা জাত—।

অরবিন্দবাবু বললেন—আমরা কোনো প্রাইভেট জু থেকে কিনে নেব দৃ-চারটে।

শালা রামকিষণ বললেন—আরে, ওবা পাবে কোথায়, ওদের তা খালি দৃটো-একটা আছে।

দৃটো-একটা খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর

রামকিষণ হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন—ঠিক আছে। আসামে নয়াত মাইশোরে পাওয়া যায়। মাইশোরে তা শুনছি গরীব আদমিরে হাঁথি আছে। ঠিক আছে, বহুৎ বাৎ-এর দরকার নেই। আপনি আজই প্রেনে চলে যান মাইশোর। দৃটো-চারটে হাঁথি সেখান থেকে নিয়ে আসুন। একেবারে খাঁটি হাঁথি চাই।



তিনি হেসে বললেন—সেক্ সাব আপনি ঠিক বলিয়েছেন

অরবিন্দবাবু বললেন, সেই ভালো। আজ স্যার বাজারে পাবো তা! নিশ্চয়ই হাতির একটা মার্কেট আছে।

—সেটা আমি কি করে জানব? আপনাকে তাল্লাস করতে হবে। আমি দো লাখ টাকা ওখানকার ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। হাঁথি জাম্বু ভি লাখ টাকা, মরা ভি লাখ টাকা। আপনি আরো টাকা দরকার হলে ট্রান্সফার করবেন। হাঁথির কথা আপনি তা বলেছেন, কোথাও না পেলেন—কোনো মহারাজার কাছ থেকে লিয়ে লেবেন। ও রকম দৃটো-একটা হাঁথি মহারাজদেব কাছে কিছুই নয়, আর টাকায় কি না হয়—

॥ দৃই ॥

প্রেনে যাওয়ায় আত্মকাল সহজ হলেও বড়ই বিরক্তিকর। চারজন প্যাসেঞ্জার পাশাপাশি ছিলেন। ওদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে মোটা-সোটা একটা পুরো থানই লেগেছে তাঁর সন্টো বানাতে, সেই ভরলোক বললেন—আজ্ঞা, একটা কাজ করলে কি হয়। আমরা কে কি কাজে যাচ্ছি কেউ জানে না! এক কাজ কবা যাক, সবাই একটা কাগজে যে-যার কাজ লিখে বাখ

তারপর এয়ার হোসটেস বিচার করল কান্টা বেশ, ইনটারেস্টিং। যে প্রথম হবে সে পাবে চারশো টাকা। আমরা সবাই একশো টাকা বাজি ধরি।

এই প্রস্তাব সকলের ভালো লাগল না, তবে অরবিন্দবাবু প্রচুর টাকা হাতে নিয়ে বোরিয়েছে, তার ওপর দৃ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে। সে এই প্রস্তাবে লাফিয়ে উঠল। রোগা চেহারার মোটা চশমার লোকটি একটু কঁকড়ে গেল, আব চতুর্থ ব্যক্তি অসজ্জন ভঙ্গীতে একটু স্থান হেসে বলল, আইডিয়াটা মন্দ নয়।

মোটা লোকটি বললেন—রাইট, আমি আমারটা লিখে রাখছি, তা ছাড়া আপনাদের শুনেনও নিন। আমি ওখান থেকে যাবো ত্রিবান্দম, সেখান থেকে সমুদ্রের চিড়ি মাছ চালান দিয়ে বাংলা দেশের মৎস্য-বৃদ্ধি-প্রাণে নতুন আশা সঞ্চার করতে যাচ্ছি। সবাই মাছে-ভাতে থাকবে দেখবেন।

চতুর্থ ব্যক্তি বললেন—তাঁর এক খুড়ো চিচুরে ভামাকের কারবার করতেন, অনেক টাকা এবং বিষয় রেশে মারা গেছেন। সেই সব সম্পত্তি এখন থেকে ওঁরই, তবে কিষ্টিং আইন-আদালতের কারবার আছে, তাই যাচ্ছেন চিচুড়ে।

রোগা লোকটি ঢোক গিলে বললেন—আমি বলছি, এই বলে পকেট থেকে একটা সিগারেট লাইটার বার করলেন, তারপর একটা বোতাম টিপতে আগুনের বদলে বোরিয়ে এল ফিল্মের গান—মেরা নাম হায় চামেলী।

মোটা লোকটি—বাঃ এ আবার কি? গানটা ফাস্ট ক্লাস, তবে আগুন না জ্বললে আবার লাইটার কি?

অপর ভদ্রলোক বললেন—এখনই হবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লাইটারকেই সাধ্য-সাধনা করলে তবে জ্বলে, এই সাধ্য-সাধনার টাইমটার গান বাজবে।

এটা আমার নিজের আবিষ্কার। ভিতরে ট্রানজিস্টার আছে। আমি মাদ্রাজের মার্কেটটা ক্যাপচার করার জন্য যাচ্ছি। ওখান থেকে যাবো যোবাই।

—হ্যাঁ, চমৎকার আইডিয়া। তবে শব্দ এই একটাই গান—অন্য কিছু হবে না?

—যা চাইবেন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, মার্গ সঙ্গীত, রাগসঙ্গীত, পপ সঙ্গ, সব কিছু—এটা এক রকম সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার। যদি দুতলয়ে হয় তাহলে সবাই অসহিষ্ণু হয়ে যাবে, তাই একটু বিলম্বিত লয়ের গানই দিয়েছি। ততক্ষণে লাইটার ক্রিক করে জ্বলে উঠবে। এ একেবারে হে-ই পড়ে যাবে।

মোটা লোকটি কি-একটা বলে তাবপর অনন্যেব ভঙ্গীতে বলে—আমাকে একটা সেল করবেন?

আবিস্কারক কোনো জবাব দেয় না।

এর পর সবাই অরবিন্দবাবুকে প্রশ্ন করে—কই স্যার! আপনার বিজ্ঞেনসটা বলুন এবার—

অরবিন্দবাবু আমতা আমতা করে জালা রামকিষেণ লালের সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে হস্তী ক্রয়ের উদ্দেশ্য আনুপূর্বিক বর্ণনা কর। সবাই অট্ট-হাস্য করে ওঠে। হাতের কারবার। নট ভেরি ইঞ্জি।

সবাই বলল, এয়ার হোসটেস নিশ্চয়ই অরবিন্দের এই বিজ্ঞেনসটাই প্রথম পুরস্কারের উপযুক্ত বলবেন।

হলও তাই—তিনি বললেন, চিড়ি মাছ, খুড়োর টাকা প্রভৃতির চেয়ে এই হাতের কাববারটাই সবচেয়ে ইনটারেস্টিং।

মোট লোকটি বলল, নিশ্চয়ই। আই এগ্রি উইথ দি হোসটেস। যাক্ নামবার সময় পুরস্কার বিতরণ করা হবে। এখন একটু কিপ্রাম করে নিই।

সবাই চুপচাপ। অরবিন্দ কিন্তু আবিস্কারক ভদ্রলোকের সঙ্গে গজ গজ করতে থাকে।

আবিস্কারক বললেন—আমি হাজার টাকার বিনিময়েও দেব না আপনাকে। আমি বর্তমান না, তবে ভবেচ্ছিয়াম যে আমারটাই নিশ্চয়ই ফাস্ট হবে। যাই হোক যা হবার হয়ে যাক।

অরবিন্দবাবু বলে—ওসব ভুলে যান। আপনাকে একশ টাকা দিতে হবে না। আমি বলব পেয়ে গেছি। এই পর্যন্ত—কিন্তু—

—না, না, আমি আমার মূল্য তার শাস্তি গ্রহণ করবো। আপনাকে তাহলে আমি একটা লাইটার দেব। জানেন এটা আমি সহজে দিতাম না, কিন্তু আপনার আগ্রহ ও ভদ্রতার আমি হার মেনেছি।

২ তিন ২

মহীশূরে পৌঁছে অরবিন্দ একেবারে অকলে পড়ল। লালাজী বড় ইনডাস্ট্রি-লিস্ট হলে কি হয়, ওর ধারণা একেবারে ভুল। মহীশূরে পথে-বাটে যে হাতি গিজ্জগিজ্জ করছে তা নয়। মহাবাজের অবশ্য অনেক হাতি, কিন্তু সেখানে মাথা গলার কার সাধ্য। মহীশূরের রাজা ত আর কেউ কেটা নন, কিছু বললে হয়ত মহীশূর থেকে বের করে দেবে গলাধাক্কা দিয়ে। দু-একজনকে হাতি কেনার কথাটা উত্থাপন করতে তারা হেসে উঠল। যাই হোক ভাগ্যদেবী প্রসন্ন, অরবিন্দবাবু গভীর হতাশায় একদিন প্রিন্স বার-এ বসে মদ্যপান করছেন এমন সময় একজন বন্ধু জুটে গেল। লাসের বন্ধু ক্লাসের বন্ধুদের চেয়েও ভাল। এখানে খুলিলে মনের স্বার না লাগে কবাব, সেই ভেঙ্কট-রাও নামক ভদ্রলোকটি একেবারে মাই ডিয়ার। তিনি বললেন—এলিফ্যান্ট আর লাইক এ্যানটস এ্যাট বানদরগড়। অর্থাৎ বানদরগড়ে পিপড়ের সারের মত হাতি পাওয়া যায়। বানদরগড়টা কোথায় একথা জানতে চাইতে ভেঙ্কটরাও হেসেই অস্থির। তিনি বললেন—বানদরগড় একটা ছোট্ট স্টেট বটে, তবে মহারাজা অব

বানদরগড় ছিলেন আগেকার লার্টসাহেব-দের ক্রোজ প্রেন্ড, দেশ স্বাধীন হতে তিনি অবশ্য এখন বন্দর পবেন এবং বড় বড় লডজীর লোগ্ এখন তাঁর দোস্ত। তাঁর স্টেটটা ঠিক সুন্দরগড় তালুকের পাশে, হায়দ্রাবাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

এই বলে ভেঙ্কটরাও অরবিন্দবাবুকে মানচিত্র এঁকে, ট্রেনের যোগাযোগ ব্যতলে, পথঘাট, হোটেল ইত্যাদির পাতা দিলেন। ভেঙ্কটরাও মহারাজকে চিনতেন তাই একটা পরিচয়পত্রও তখনই লিখে দিলেন।

পরদিনই সেই পরিচয়পত্র পকেটে নিয়ে ও গত রজনীর অত্যধিক মদ্যপান-জনিত মাথার যন্ত্রণা মাথায় নিয়ে অরবিন্দবাবু এক সুদীর্ঘ পর্বতসঙ্কুল পথে পাড়ি দিলেন।

বন্দরগড় শহরটি পরিচ্ছন্ন। মহারাজ লোকটি বেশ ভদ্রলোক। এখন স্টেট রাস্তায় হাওয়ায় পর নানাবন্দম ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন। দুটো বড়ো হোটেল বানিয়েছেন একটা বোম্বাই, আরেকটি দিল্লীতে। এ ছাড়া বন্দরগড় ট্রানসপোর্ট কোম্পানী, বন্দরগড় ইলেক্ট্রিসিটি সবই তাঁর। অর্থাৎ রাজ্যগিরি রাজ্যগী গেলেও সব বজায় আছে।

যে সব বলমলে জড়োয়ার গহনা মহা-রাজের শ্রী-অঙ্গে এবং তাঁর মাথায় বিচিত্র পাগড়ীতেই মালম যে তাঁর রুচি বেশ আর্মির। তার গলায় যে হারটি ঝুলছে তার লকেষ্ট্র পাথরখানা দিয়ে

আজ:



১৮৩৮ ১৮ ১৮৩৮ ১৮
১৮৩৮ ১৮ ১৮৩৮ ১৮
১৮৩৮ ১৮ ১৮৩৮ ১৮
১৮৩৮ ১৮ ১৮৩৮ ১৮



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

হেড অফিস : ৪, নবোদয় চক্কর স্ট্রিট, কলিকাতা-১

বোধ হয় সমস্ত পৃথিবীর হাতি কিনে ফেলা যায়।

মহারাজের বয়স বেশি নয়। স্বাধীনতার সময় তিনি মাত্র চোদ্দ বছরের ছেলে। বিলেত যাবেন যাবেন করতাই দেশটা স্বাধীন হয়ে গেল। সেইসব হাঙ্গামে বিলাত যাওয়া হয়ে ওঠে নি, তবে পড়েছেন পাবলিক স্কুলে ভাল ভাল ইংরেজ মাস্টারের কাছে, ফলে তাঁর ইংরিজিটা প্রথম শ্রেণীর।

অরবিন্দবাবু মনের বাসনা ব্যক্ত করতই মহারাজ বললেন—মশাই, আপনি যে এর পর এভাবেই চুড়ার ওপরকার বরফ এক বাগুতী চাইবেন। আপনার লাল। রাম-কিশোরের এসব জানা উচিত—

অরবিন্দবাবু বলে, ওঠে—কিন্তু মহারাজ, আমি ত' আর অমনি চাই না, যথাযোগ্য সম্মান, মূল্য দেব, মানে প্রণামী দেব; অর্থাৎ সব জিনিষেরই ত' একটা মূল্য আছে।

মহারাজ কিছু উত্তর না দিয়ে অরবিন্দবাবুকে হাতটি ধরে ভিতরে নিয়ে চললেন। কি সব, বড় বড় ঘর। কত সব খাদ্য ল'ঠল, আর বিচিত্র ধরনের আসরার-পত্র। অনেকক্ষণ এইভাবে যাবার পর মহারাজ একটি অপেক্ষাকৃত ছোট কামরায় ঢুকলেন, তারপর কোমর থেকে একটি সুপোর চাবি বার করে এক বিচিত্র সিঁদুরের ঢাকা খুলে অরবিন্দবাবুকে বললেন—দেখুন! এই একটা সিঁদুর, আরো দু'একটি আছে, এর পরও কি আপনার রামকিশোরলাল আমাকে টাকা দেবারেন?

অরবিন্দবাবু বিস্ময়ে দেখলেন সিঁদুরে—মটর কড়াই—এর মত কত সহস্র যে হীরা-সহস্রত পড়ে আছে তার পরিমাপ করা যায় না। চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে যায়।

মহারাজ বললেন—রামকিশোরলালের যা আছে এর দাম বোধহয় তারা চেয়েও অনেক বেশি, আর এ ছাড়া আরো দুটো—চারটে সিঁদুর ওপরে আছে সে কথা ত' আপনাকে বলছি।

আশাবাদী হলেও অরবিন্দবাবু একটু বদ্বন্দ্বি খাটিয়ে বলে—যাক, ইওর ম্যাজেস্টি (কি যে, বলা উচিত তা ঠিক করতে না পেরে), ওসব কথা যাক! মহারাজ রামকিশোরলাল সম্পর্কে যা বলেছেন সেটাও ত' বড়োকে গিয়ে শোনানো যাবে। অরবিন্দবাবু মনে ভাবি একটু আনন্দ হয়েছে।

যাই হোক, এর পর বাইরে বারান্দায়, ধসে পর পর অনেকগুলি প্লাস খালি করা গেল। জ্বরগাটি মনোরম। সেই ম্যাগস্টে-সেপ্টেম্বর মাসেই কলকাতার ডিসেম্বরের মত শীত শীত। এ ছাড়া

এখন থেকে অরবিন্দবাবু পাহাড়টাকে দেখা যায়।

রাত গভীর হয়ে এল। দূরে কি ঝিল্লি ডাকও যেন শ্রবণ হয়ে গেল। চারদিক শান্ত। মহারাজ বললেন, আপনি আজ রাতটা প্যালেসে থেকে যান। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।

ঠিক এই সময় সিগারেট ধরানোর জন্য অরবিন্দবাবু লাইটার বার করলেন এবং সেই লাইটারটি যে মেনে উপহার পাওয়া লাইটার তা অবশ্য খেয়াল ছিল না। মহারাজ সিগারেট ধরাবার জন্য মুখটা এগিয়ে দিতে গিয়ে শুনতে পেলেন—‘প্যার কা মৌসুম আয়’—

মহারাজ চারদিকে তাকালেন; কোথা থেকে যে আওয়াজ আসছে তা ধরতে পারলেন না।

একটু রাগের ওপর বললেন—হয়ত হারেমের মেয়েরা গাইছে। কিন্তু এটা ত' গানের টাইম নয়। কাল মনিং-এ আমি ওদের ডেকে ধমক দেব। এ কি! গান ভালো জিনিষ, কিন্তু মাঝরাতে গানের হুজোড় ভালো নয়।

ঠিক এই সময় গান থেমে গেল। মহারাজ তাঁর সিগারেট ইতিমধ্যে প্রজ্বলিত আগুনে ধরিয়ে নিলেন।

অরবিন্দবাবু তখন নিজের সিগারেটটি ধরানোর জন্য লাইটারটার রোভাম টিপতেই আবার শোনা গেল—‘মেয়া নাম হায় চায়েলী’—

মহারাজ বললেন—কি, তাহলে আপনার লাইটারের ভিতর থেকে গান আসছে। আমি জানি বাঙালীরা ম্যাজিসিয়ান। জানেন ঐ কারণে আমি বাঙালীকে চাকরীতে নিই না; কি করবে কখন জানি না। আপনি কিন্তু মহারাজ। এমনভাবে সিগারেট লাইটারে গান আমি কখনও শুনিনি, অথচ আমি বন্দর-গড়ের মহারাজা—

ইতিমধ্যে গান থেমে গেল। অরবিন্দবাবু সিগারেট ধরিয়ে লাইটারটা পকেটে পুরলেন। মহারাজের মূগের শিশুসুলভ হতাশা লক্ষ্যই করল না। মহারাজ জিনিষটা আর একবার দেখতে চাইলেন অনেক অনুময় করে—

শেষ পর্বন্ত হার মেনে অরবিন্দবাবু মহারাজকে লাইটারটি দেখতে দিলেন। মহারাজ ছেলেমানুষের মত বার বার জ্বালালেন—নেভালেন। অরবিন্দবাবু চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সহসা মহারাজ অরবিন্দবাবু হাঁটু ধরে অনুন্দের ভঙ্গীতে বললেন—এটা আমার চাই।

এমন ভঙ্গীতে বললেন যে, সারা জীবন যা চেয়েছেন তা পেয়েছেন। সুতরাং এটা তিনি ছাড়বেন না কিছুতেই।

অরবিন্দবাবু নিদ্রাচ্ছিন্নে তার করে ঘুম ঘুম গলায় বলে, তা যে হয় না হুসেন। হবার নয়।

আমার এটা চাই-ই। শব্দ যে আমার নিজের ভালো লেগেছে তা নয়, সামনের মাসে আমাদের মহারাজদের কন্ফারেন্স আছে দিল্লীতে। আমি সেখানে এটা সবাইকে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেব। তা ছাড়া হাবেমের মেয়েদেরও দেখাব। ওদের আমি বৃথা সন্দেহ করেছি। বন্দ—আপনি কি চান বলুন? যা দাম চাইবেন দেব—

অরবিন্দবাবু তার হুঁচালো গৌফে বেশ খানিকক্ষণ মোড় দিয়ে বলে—একটু আগে মহারাজ; আপনার কাছে একটা আবেদন পেশ করেছিলাম, আমার একটু হাতের প্রয়োজন ছিল—

মহারাজ বাধা দিয়ে বললেন—আরে মশাই! কি যে বলেন! হাত! হাত একটা তুচ্ছ জিনিষ, কটা চান? কাল সকালেই হুকুম দিয়ে দেব, একেবারে ফাস্ট-ক্লাশ হাত। ভালোই হল, এজেন্টটা চমৎকার হল। কিন্তু দেখুন—আমি আরো কিছু দেব। আপনাকে আমি কিছু হীরা-জহরৎ দেব, তবে, এটা আপনার নিজের জন্য, আপনার রামকিশোরলালের জন্য নয়।

এই বলে মহারাজ চলে গেলেন সেই ঘরে যেখানে হীরা-জহরতের সিঁদুর, তারপর মড়ি-মড়িকির মত একমুঠো নানারকমের নানা রঙের হীরা-জহরৎ এনে অরবিন্দবাবুর পকেটে ফেলে দিলেন।

—এ কিন্তু আপনাদের বাঙালীর কাছে সাত রাজার ধন বলতে পারেন। আমি শুনিয়ে বাঙালীরা তাঁর গরীব জাত। থাকবে, এখন চলুন ঘরে গিয়ে শুনতে পড়ুন। কাল সকালেই হাত পাবেন।

১১ তিন

লালা রামকিশোরলাল তাঁর পার্ক স্ট্রীটের চারতালয় এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে বসে একটা চিঠি ডিক্টেট করছেন। যিনি লিখছেন তিনি একজন মডার্ন-গার্ল, মাথার চুল খুচুনি, খাঁচা বাঁধা, ঠোঁটে মূখে অনেক রঙ, আর ভাবভঙ্গীতে অনেক ডব। লালাজীর মেজাজটা আজ সকালে ভালো। সকালের ডাকে খবর এসেছে অনেকদিনের কেনা কিছু পুরানো পাইপ পড়েছিল, সেগুলি প্রায় ডবল দামে বিক্রি হয়ে প্রচুর লাভ হয়েছে। এ পাইপের কোনো হিসাব ছিল না, কাজেই ট্যাক্স দিতে হবে না। টাকাটা দূর সম্পর্কের শালার নামে আসবে। তাকে দু'চার হাজার দিলেই হবে, তবে ট্যাক্সের চেয়ে কম হবে, আর লোকটাও কেনা হয়ে থাকবে, ছাপোঁষা মানুষ।

সব অবসরপ্রাপ্ত কোটিপতির মতই

লালা রামকিষণ এখন কুড়িয়ে-বাড়িয়ে টাকা দু'হাতে লুটছেন। যে টাকা পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের কাছে আলোয়া, সেই টাকা এখানে কত সহজেই পকেটে আসছে।

এমন সময় দরজায় একটি প্রচণ্ড থান্ডা, সেই সঙ্গে অরবিন্দবাবুর প্রবেশ। লালা রামকিষণ এই তরুণী সেক্রেটারিকে উঠে পড়তে ইঙ্গিত করতেই সে উঠে পড়ল, তবে যাবাব আগে নবাগত অরবিন্দকে এক-নজর ভালো করে দেখে নেয়। এর পর লালাজী অরবিন্দের দিকে জঙ্ঘ দৃষ্টি হেনে প্রশ্ন করেন—এই যে সেক্ সাব। এতদিন ছিলেন কোথায়। কাজকর্ম যে ডকে ওঠার যোগাড়।

—আমি তা মাইশোর গিছলাম স্যার।

—বাঃ, বলা নেই কওয়া নেই মাইশোরে মজা লুটতে গিছলেন।

—মজাই স্যার। অনেকখানি পথ, বিশেষ কবে বনদরগড়েব দুর্গম পথ। বাই হোক আমি হাতি পেয়েছি, উপস্থিত দুটি হাতি আসছে, রবিবার সকালে হাওড়ায় ডেলিভারি দেবে।

লালা রামকিষণ রাগে ফেটে পড়লেন—
হাঁথি? হাঁথি কিসের? কি হবে? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

অরবিন্দবাবু তা অবাক। বোটা বলে কি! এক হাতে গোঁফ চুমুরে আর অপর হাতে পকেটের হীরা-জহরৎ গুলিতে একটু সযত্নে হাত বদলিয়ে সে বলে—

—স্যার, আপনি বলতেন আপনার মেমারি হ্যাড গন ফট্, কথাটি ঠিকই, আপনার উচিত ব্রাজীলত নিয়মিত সেবন করা। কিন্তু এমনই আপনার মেমারি যে হাতির কথা ভুলে গেলেন এত সহজেই—

এর পর অরবিন্দবাবু পূর্বের সময় সমস্ত আলোচনা এবং পেনে মহাশয় থেকে হস্তাী ক্রয়ের আদেশ সবই শোনালেন—

লালাজী বললেন—আমি জানি বাঙালী লোগ কেবল কুট বলে। আপনার কথায় আমাব বিসওয়াস নেই একটু। হাঁথি একটা আবার জন্তু, বড় বড় পা, ইয়া চেহারা, দেখলেই আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। আমি যদি আপনাকে আনতে বলেই থাকি তাহলে আমার মনে ছিল না হাঁথি কি রকম দেখতে। আপনাকে কি আমি দুটো হাঁথি আনতে বলছি।

অরবিন্দবাবু বললেন—কিন্তু।

—আর আপনি বলছেন কি না এই

শারদীয় সাপ্তাহিক বঙ্গবতী : ১০৭৭



লালা রামকিষণ এই তরুণী সেক্রেটারিকে উঠে পড়তে ইঙ্গিত করতেই সে উঠে পড়ল

অশ্রুত জন্তু আসছে। কার ঠিকানায় পাঠাবে?

—হাতি কারো ঠিকানায় পাঠানো যায় না। এটা তা পার্সেল নয়। রেলো আসবে। সঙ্গে আসবে দু'জন মাহুত। আপনি যদি ঠিক টাইমে ডেলিভারি না নেন তাহলে অনেক টাকা ডেমারেঞ্জ দিতে হবে।

—কি বলছেন আপনি? হাঁথির সঙ্গে আরো দুটো জন্তু এনেছেন। মাউটটা কি রকম জন্তু।

—স্যার আপনি যাকে মাউট বলছেন তার নাম মাহুত। খোড়ার যেমন সহিস থাকে, হাতির তেমনই মাহুত। তারা জন্তু নয় মানুষ।

—খুব হয়েছে। আপনি যান, আমার টাইমের অনেক দাম। দরজাটা আওয়ার করি বন্ধ করবেন না।

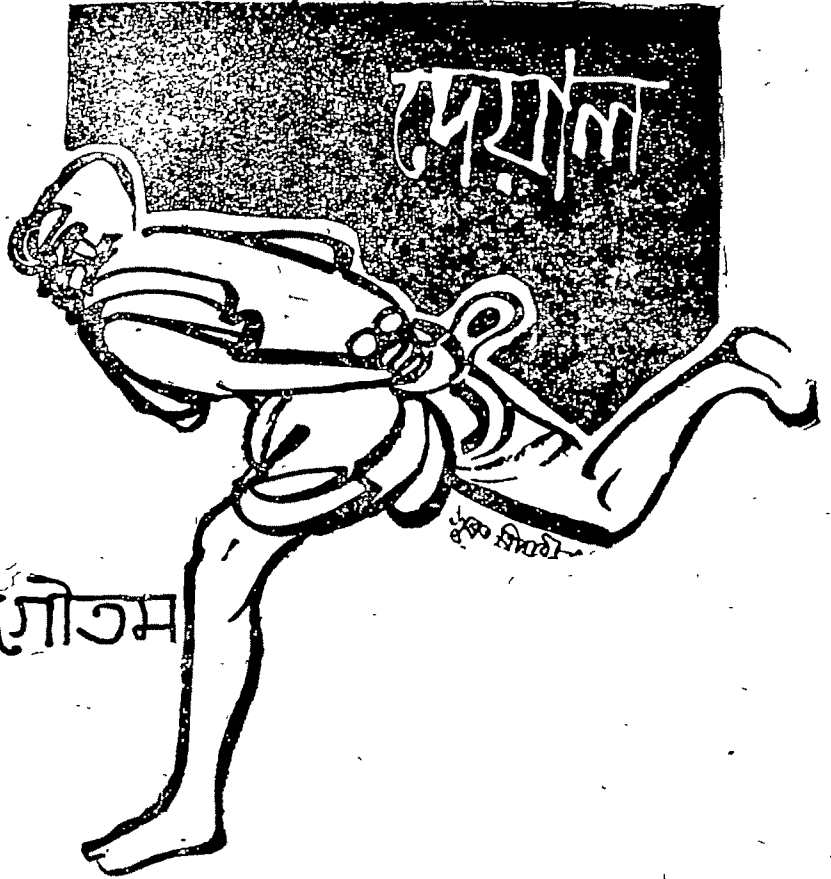
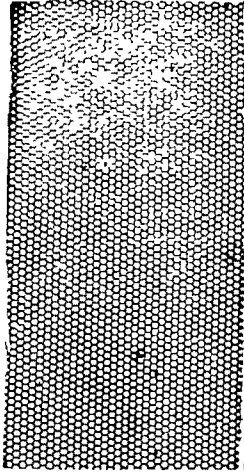
—কিন্তু স্যার হাতির কি হবে?

—হাঁথি! হাঁথি! হাঁথি! মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। চিড়িয়াখানায় বিক্রি করে দিন। যা পাবেন টাকাটার অর্ধেক আমার, বাকীটা আপনার মাইনে-টাইনে

হিসাবে নেবেন। আপনি কোথায় গিছলেন বলে যান নি, তাই আমি মিস্ ফুলটুসী সেনকে সেক্রেটারি এ্যাপয়েন্ট করেছি। তার সঙ্গে দেখা করে আপনার পাওনা-টাওনা বুঝে নিন। আমাকে জ্বালাবেন না।

অরবিন্দবাবু আদেশ পালন করতে প্রস্তুত করে নি। এমনভাবে পাওনা-গন্ডা বুঝে নিল যে লালা রামকিষণের চন্দ্র ছানাবড়া। মিস্ ফুলটুসী সেনের মধ্যে সব শব্দে রামকিষণ বললেন—শালা হাঁথি—

ফুলটুসী বলেছিল এমন সুন্দর চেহারা অরবিন্দবাবু, তায় অত হীরা-জহরতের মালিক, ঐ থেকেই একটা হার আর একটা ভালো আঙুর তড়ার দেওয়া হয়েছে, আরও কিছু তা হাতে থাকবে। সতরাং লাল রামকিষণ শব্দ বললেন—শালা হাঁথি—



নির্মলেন্দু গৌতম

যতো উচুতেই উঠুক, গগনের সামনে কেবল দেয়াল। ইটগুলো পর পর উঠে গগনকে ছাড়িয়ে যায়। গগন সেই দেয়ালের দিকে মূখ রেখে বড়মিস্ত্রী মশলার কড়া তুলে দেয় সারাদিন। দেয়াল যতো ওঠে, পিঠের ওপর মাথাটা যেন ভতো হেলে পড়ে। মাঝে মাঝে ঘাড়ের কাহটা ব্যথা করে গগনের। সে ব্যথা আবার আপনি সেবে যায়।

এই দোভাষা বাড়িতে আরেকটা তলা বাড়ছে। তিনদিন হলো কাজ চলছে এখানে। বড়মিস্ত্রীর সঙ্গে গগনও কাজ বয়ছে এখানে।

আজকে একটু তাড়াতাড়িই কাজ এসেছিল গগন। বড়মিস্ত্রী তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে। ব্যাপারটা তখন ঠিক বুঝতে পারেনি গগন। তাড়াতাড়ি কাজ শুরুর করার ব্যাপারটা ঠিক দু'পূর্ব-বেলায় বুঝতে পারলো। ঘণ্টাখানেকের জন্য বড়মিস্ত্রী কোথায় যেন থাকে। নিশ্চয়ই কোথাও নতুন কোনো কাজের খবর আছে। ভালোই হলো, গগন দেয়ালের ছায়ায় কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারবে।

বড়মিস্ত্রী চলে যাবার পর নির্জন-নিঃসঙ্গ ছাদে একখানা কাগজ বিছিয়ে দেয়ালের ছায়ায় শুয়ে পড়লো গগন। কৌনিক থেকে যেন বাতাস আসছে। ছোট কবে একটা হাই তুললো গগন। তারপর দেয়ালের দিকে

চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলো। কিছু সময় ঘুমিয়ে নেবার কথা ভেবেছে সত্যি, কিন্তু ঘুম আসবে না। এখনও দেয়ালে প্র্যাক্টাইস হয় নি। দু'চারদিনের মধ্যেই শুরুর হবে। ইটের ওপর আলগোছে আঙুল বোলাতে থাকলো গগন।

একটু আগেই চারুটি খেয়েছে গগন। খিদে নেই আর। শরীরে গগন বেশ আরামবোধ করতে থাকলো। একটা ভালো-রকমের ঘুম এলে আরো বেশ ভালো লাগতো। ঘুমের জন্য চোখ বুজলো গগন।

বড়মিস্ত্রী একঘণ্টার জন্য গেছে সত্যি, কিন্তু আরো দেরি হবে তার। এসব কাজ একঘণ্টার কথাবার্তায় হয় না, গগন জানে। এর আগেও তো এমনি একঘণ্টার জন্য গিয়ে দেড়-দু'ঘণ্টা পর ফিরে এসেছে বড়মিস্ত্রী। ইট চূন সুরাকির হিসেব কি সোজা কথা।

গগন একটা হাত বালিশের মতো করে মাথা বতায় দিয়ে আরাম করে শুলো। এমনিভাবে শোয়া গগনের অভ্যাস আছে। বাড়িতে তাকে প্রায় এমনি করেই ঘুমোতে হয়। ছোটো বালিশটা মাথার তলায় দিয়ে ঠিক আরাম হয় না। বালিশের ওপর হাত-খানা এমনিভাবে রেখে ঘুমোয় সে। এবার একটা ভালো দেখে বালিশ কিনতেই হবে।

সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ বাজছে। নীচের তলার সেই ছেলেটা বোধহয় উঠে আসছে। প্রায়ই আসে। দেয়াল গাথা দেখে।

মশলা তোলা দেখে। কখনো জানালার ফাঁকটুকু দিয়ে দূরের মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ির মূণে ছেলেটাকে দেখলো গগন। তার হাতে একটা ক্যামেরার মতো জিনিস। বোধহয় ছবি তুলবে। কিন্তু কার ছবি তুলবে? গগনের ইচ্ছে হলো বলে, আমার একটা ছবি তুলে দাও। কিন্তু গগন তা বললো না। বলতে পারলো না।

ছেলেটা গগনকে শূন্য থাকতে দেখে বোধহয় অবাক হলো। কাছে এসে বললো, 'কি রে, এখানে শূন্যে আঁছিস কেন?'

এখন কাজ বন্ধ যে। বিগ্রাম নিচ্ছি একটু।'

বড়মিস্ত্রী কোথায় গেছে? 'কাজে।'

ছেলেটা আবার কিছু বললো না। সঙ্গে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। দু'চোখ লাগালো ক্যামেরার মতো জিনিসটাতে। ওপরে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোঙের মতো দু'টো জিনিসকে বাড়ালো কমালো। গগন তাকিয়ে সব দেখলো। কৌতুহলে উঠে বসলো জগন্মতেই। ছেলেটা আস্তে আস্তে এদিক-ওদিক দেখতে থাকলো সেই জিনিসটা চোখে লাগিয়ে।

কী দেখছে এমনিভাবে। ছবি তুলছে না নিশ্চয়ই। ওটা নিশ্চয়ই ক্যামেরাও নয়। ক্যামেরা খানিকটা অন্যরকম। গগন অবাক

চোখে ছেলেটাকে দেখতে থাকলো।

ছেলেটা নানাভাবে চারদিক দেখলো অনেকটা সময় ধরে। তারপর হঠাৎ এক সময় গগনের দিকে তাকালো। বললো, 'অমনি হাঁ করে কি দেখাচ্ছিস?'

গগন তার চোখের দিকে তাকিয়ে কেবল হাসল।

ছেলেটা কি ভাবলো যেন। বললো, 'এদিকে আস।'

গগন পদে পদে পারলো না ব্যাপারটা। হাঁ করে তাকিয়ে রইলো ছেলেটার দিকে।

কি রে, শুনতে পাচ্ছিস না নাকি? উঠে আস। সাতস্বস্তি বা দেখিস নি তাই দেখিয়ে দেবো।'

গগন কিছুর না বুঝে উঠে পড়লো। ছেলেটার কাছে এলো পারে পারে।

'এটা কি জিনিস?' জিনিসটা বিস্ময়িত চোখের সামনে তুলে ধরলো ছেলেটা।

উহু! মাথা নাড়লো গগন।

ছেলেটা এবার জানালা দিয়ে তাকালো। অনেক দূরে মাঠের ওদিকে কয়েকটা গরু চরাছিল। সেদিকে আঙুল তুলে বললো, 'ওই যে দূরে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছিস সব চোখের সামনে এসে যাবে—নে দেখ—'

সে নিজেই গগনের চোখে ওপব সেটা ধরলো।

গগন প্রবল কিস্তিরে কৈমন যোকা হয়ে গেলো। দূরের সেই গরুগুলো চোখের সামনে এসে ঘাস খাচ্ছে। তাদের গায়ের রঙ, শিং, কান এমন কি চোখের কালো কাকলটুকুও প্পষ্ট দেখতে পেলো গগন।

কি রে, কি দেখাচ্ছিস?'

'খুব কাছে।' বিস্মিত আবেগে গগনের গলা কেঁপে গেলো।

'নে, দু' মিনিট তোকে দেখতে দিলুম দূরবীন।'

ছেলেটা গগনের হাতে জিনিসটা দিয়ে দিলো।

রাজা হয়ে যাবার আনন্দে গগন ফের অবাক হয়ে ভাবলো, জিনিসটার নাম তাহলে দূরবীন। ভারি মজার জিনিস যাহোক।

গরুগুলোর দিক থেকে দূর দূরবীনের কাছ ফেরালো গগন। আরো দূরকে কাছে এনে দেখলো। তারপর আরো দূরকে। দু' মিনিটে বর্ষাবিক নয়, দশ সহস্র দিক দেখলো। এতো বড়ো আর এতো চমৎকার পৃথিবী যে দেয়ালের ওপকি আছে গগন তা জানতো না। এখানে দাঁড়িয়ে কেবল দেয়ালের ইট দেখেছে সে। একটার পর আরেকটা ইট সাজিয়ে সাজিয়ে, বড়মিস্ত্রী সব আড়াল করে রেখেছে তার চোখের সমুদ্র থেকে। আর সেই দেয়ালের অন্য মশলা তুলে দিয়েছে সে নিজেই।

কি রে, কি প্রকম লাগলো? হাত বাড়িয়ে দূরবীনটা নিয়ে নিলো ছেলেটা।

'খুব ভালো।' গলাটা আগের মতোই আবেগে কেঁপে গেলো।

শারদীয় সাপ্তাহিক বসুমতী : ১০৭৭

ছেলেটা হাসতে থাকলো। নিজের চোখে দূরবীন ধরলো। বললো, 'অমনি আর দেখাচ্ছিস কোনোদিন?'

উহু!'

গগনের সামনে এখন বিশাল পৃথিবীর ছবি। দূরবীনটাকে হাত বাড়িয়ে ছেলেটাব হাত থেকে নিয়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে গগনের। বিরাট পৃথিবীটাকে আরো অনেকবার চোখের সামনে এনে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। গগন হৃৎকাতের মতো সেই দূরবীনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আরো কিছু সময় দূরবীনে চারদিক দেখে ছেলেটা বললো, 'নাহ, এবার যেতে হবে। বলে গগনের দিকে তাকালো। রাজার মতো গলায় বললো, 'তোকে তাহলে একটা নতুন জিনিস দেখিয়ে দিলুম আজকে।'

'হু!'' অস্পষ্ট গলায় বললো গগন।

কায়দা করে একটু হাসলো ছেলেটা। তারপর দ্রুতপায়ে নীচে নেমে গেলো।

সেদিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো গগন। কিন্তু কি যে ভাবলো গগন তা নিজেই ভাবতে পারলো না। দূরবীন, বিরাট পৃথিবী, দেয়াল, বড়মিস্ত্রী—সব যেন একমুহুর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। গগন এখন কি করবে, গগন তা বুঝতে পারছে না। দেয়ালের ছায়ার পেতে রাখা কাগজের দিকে তাকালো গগন। এখন সে ওখানে নিশ্চয়ই ঘুমোতে পারবে না। দেয়ালটাকে দুর্ভেদ্য মনে হচ্ছে। ভরাত চোখে গগন সেই ছায়ার পাতা কাগজের দিকে তাকিয়ে রইলো। কাছ সরতে পারলো না। একটু পরেই বড়মিস্ত্রী আসবে। দেয়ালকে চোখের সামনে রেখে আবার তাকে কড়া ভর্তি করে মশলা তুলে দিতে হবে। আরো উচ্চ করে দেয়াল গাঁথা হবে।

গগনের ইচ্ছে হলো সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত-বেগে এখন নেমে ছেলেটার হাত থেকে দূরবীনটা কেড়ে নিয়ে ছুটতে ছুটতে মাঠ পেরিয়ে চলে যায়। তারপর পুলিশের লাইনের কাছে অনেকতলা বাড়ির সমান উচ্চ সেই চাঁদমারীর চিহ্নের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখবে আরো বিশাল পৃথিবীকে। নদীর ওপারে আরো বড় পৃথিবী আকাশকে ছুঁয়ে ফেলেছে। সেই পৃথিবীকে সে দেখবে।

সিঁড়িতে ফের পায়েল লম্বা। উত্তেজনা-টুকুকে বৃকের মধ্যে নিয়ে সিঁড়ির মুখে তাকালো গগন।

বড়মিস্ত্রী ফিরে এসেছে।

কি রে, অমনি দাঁড়িয়ে আছিস যে? বড়মিস্ত্রী শূন্যলো।

দারুণ ক্রান্তভাবে গগন বললো, 'অমনি!'' 'নে, মশলা রোড়ি কর।' বলে বড়মিস্ত্রী জামা খুললো। টাঙিয়ে রাখলো ভায়া-বাধা বাশের এককোণায়। টিনের কৌটো থেকে একটা বিড়ি বেধ করে লাইটার জ্বালিয়ে ধরালো।

গগন ক্রান্তভাবে বেঁদোলটা তুলে কড়া ভরে মশলা তুললো। খুব চোখে তাকালো দেয়ালের দিকে। দূরবীনটা হাতে থাকলে গগন নিশ্চয়ই দেয়ালের ওদিকের বড় পৃথিবীটাকে দেখতে পেতো। অনেক দূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে আছে সেই পৃথিবী। খানিক আগেই তা দেখেছে গগন। কিন্তু তা আর তার অধিকারের মধ্যে নেই। সেই ছেলেটার অধিকারে সেই পৃথিবী।

অমনি একটা দূরবীন তার নিজের বিনিময়েও হয়তো হবে না। হলে গগন অবলায় বিনিময় করতে পারতো নিজেই। সেই দূরবীনে চোখ রেখেই তো সে আবার ফিরে পেতো নিজেই। সরলভাবে কথা-গুলো মনে এলো গগনের।

বড়মিস্ত্রী কাজ শুরুর করেছে। দেয়াল বাড়ছে ক্রমশ। ক্রমশ যেন আকাশ ছুঁয়ে দিচ্ছে।

মনে মনে ক্রমশ অস্থির হচ্ছে গগন। তার সামনে দেয়াল বাড়ছে। যাবে নাকি, সিঁড়ি বেয়ে নেমে সেই ছেলেটার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আসবে দূরবীনটা? তাদের ঘর চেনে গগন। একনিশ্বাসে পেঁছতে পারবে সে।

গিগোহিলদুম একটা কাজ পাবো বলে। কাজটা হলো না বে! বড়মিস্ত্রী বিড়িটাকে দাঁতে কামড়ে বেধে বললো।

এই মুহুর্তে কাজের কথায় বিভ্রত হলো গগন। কিন্তু কোনো কথা বললো না।

বড়মিস্ত্রী ফের বললো, 'হলে ভারি ভালো হতো। ভালো পয়সার কাজ ছিল ওটা।'

'হয়তো তাই। কিন্তু গগন এখন দেয়ালের ওদিকের কথা ভাবছে।'

সাপ্তাহিক দেয়ালের ওদিকের কথাই ভালো গগন। বিকেলে বাড়িতে ফেরার সময় সেই ছেলেটার ঘরের ভেতর-জানালা দিয়ে উকি দিলো একবার। ছেলেটা নেই। থাকলে কি করতো, গগন অবশ্য তা জানে না। বড়মিস্ত্রীর পেছন পেছন রাস্তা পেয়েলো,

বেতার দ্যান বেই
এম, পি, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী
শালিমার—কোল ডিপো—হাওড়া

জুট পেরুলো, কৃষ্ণচূড়াগাছের সারি পেরুলো।
বড়মিস্ত্রী সংগে না থাকলে এটুকু আসতেই
লগ্ন ভুল করে ফেলতে পারতো গগন। বিরাট
পৃথিবীটাকে দেখলে বোধহয় সব কিছুই
ভুল হয়ে যায়। খোঁয়ার মতো কণাটা মনে
জাসলো গগনের। এই ব্যাপারটাই যে তাকে
আচ্ছন্ন করে রেখেছে স্পষ্টভাবে অনুভব
করবার মতো ক্ষমতা নেই গগনের।

আচ্ছন্ন মতোই বাড়ি ফিরলো গগন।

সব কিছুর বিনিময়ে তাকে সেই
দূরবীনটা পেতে হবে। জীবনটা যেন
অসার্থক হয়ে যাবে না হলে। দূরত্ব
পৃথিবী, বিপুল পৃথিবী-দেবালব ওদিকে
গেছে কি কবে কাটাবে সে।

বাড়িতে বোধহয়, গগনের এই ভাবান্তর-
টুকু কেউ লক্ষ্য করলো না। অথবা লক্ষ্য
করলেও গগনকে কেউ কিছু শুনালো না।
জীর্ণ, ভাঙা ঘরের মধ্যে পুরোনো ছোটো
বালিশ মাথায় দিয়ে গভীর রাতে গগন
ঘুমোলো।

একবারে ছেলেবেলায় একবার বাড়ির
পিছন দিকের মাঠে কারা বেন গাড়ি নিয়ে
এসে সিনেমা দেখিয়ে গিয়েছিল। সারা
মাঠ লোকজনে উপচে উঠেছিল সেদিন।
কী দারুণ ভিড়। গগন তারই মধ্যে সামনের
দিকে জায়গা করে নিয়েছিল। সেই তাম্র
প্রথম এবং শেষ সিনেমা দেখা।

সিনেমা দেখে এসে গগন যেন কেমন হয়ে
গিয়েছিল। চোখ বুজলেই সেই উজ্জ্বল
চেহারাগুলো ভেসে বেড়াতো। তারা যেন
গগনের মতো হয়েও গগনের চাইতে আলাদা।
ঘুমোতে পারতো না গগন। মনটা উড়ে
বেড়াতে কেবল। ভাবতে ভালো লাগতো।
বুকের মধ্যে ধনক্ ধনক্ করতো অস্বস্ত
এক উত্তেজনায়।

গগন সেই ছেলেবেলায় সিনেমা দেখার
উত্তেজনাকেও বেন ছাড়িয়ে এসেছে।

সফলবেলা কাজের জন্য বোরিং হাটতে
হাটতে গগন এসব ভাবলো। একবার নদীর
ধারে সেই চাঁদমারীর চিহ্ন ওপর দাঁড়ালে
গগন কী যে দেখতে পাবে আর যেন তা
ভাবতে পারছে না। গগন পথে নর, এবার
মনের মধ্যে পা ফেলে ফেলে হাটতে থাকলো।

বাড়ির সামনে পেরিয়েই বড়মিস্ত্রীকে
দেখতে পেলো গগন। একটা বিড়ি ঠোঁটে চেপে
আসিছিল সে। গগন দাঁড়ালো। এক-
সঙ্গেই ওপরে উঠবে। আগে উঠে কি লাভ।
বড়মিস্ত্রী কাছে এসে বললো, 'পাইডে
আঁহিস কেনে?'

‘তোমার জন্যে।’

বড় করে একটা টান দিয়ে বিড়িটা
ফেলে দিলো বড়মিস্ত্রী। তারপর বললো,
‘চল।’

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলো তারা।
গগনের সামনে আবার দেয়াল। বোধহয়

আকাশ ছুঁয়েছে আঁহকে। গগন আঁহ
পেছনটাকে প্রায় পিঠ ঠেকিয়ে দেয়ালটাকে
দেখতে চাইলো। পারলো না। আকাশের
সঙ্গে যেন মিশে গেছে।

বড়মিস্ত্রী সার্ট খুলছে। কালি দিয়ে দিচ্ছে
ভার্যার বাঁশে।

‘নে মশলা রেডি কব।’ বড়মিস্ত্রী
বললো ব্যাগ থেকে কাজের জিনিসগুলো বের
করতে করতে।

গগন কাছে হাত লাগালো।

বড়মিস্ত্রী বললো, ‘আজ আরেক জায়গায়
যাবো। একটু বিকেল-বিকেল সময়ে।
কাজটা পেলোও পেতে পারি।’

গগন কিছুর বললো না।

বড়মিস্ত্রী বললো, ‘এ কাজটা আরো
ভালো কাজ। পেলোই টের পাবি।’

গগন সিঁড়িতে পারের শেষ শূন্য
জন্য উৎকর্ষ হয়ে আছে।

বড়মিস্ত্রী একাই কথা বলে যেতে
থাকলো। গগনের মন সিঁড়ি দিয়ে আস্তে
আস্তে নেমে সেই ঘরে উঠে দিলো
সন্তর্পণে। ছেলেটাকে ডাকতে থাকলো।
অসম্ভব বিস্ময় এবং আকুল প্রার্থনায় মতো
শোনালো সেই কণ্ঠস্বর।

ডাকতে ডাকতেই হঠাৎ যেন গগন পায়ের
শব্দ শুনলো সিঁড়িতে। চমকে তাকালো।
ছেলেটা উঠে আসছে। গগন চাবদিকে
তাকালো। অবাধ হলো, কখন যেন বিকেল
হয়ে গেছে। বড়মিস্ত্রী কাজের যোগাড়ের
জন্য চলে গেছে। আজ আর আসবে না।
গগনকে ও চলে যেতে বলেছে। সে যায় নি
ছেলেটা আসবে বলে।

‘কি রে, তুই আঁহিস এখনো!’ ছেলেটা
শুনালো।

গগন বললো, ‘হুঁ।’

একটু থামলো। তারপর সঙ্কুচিত
গলায় বললো, ‘দুখবীনে একটুখানি দেখবো
বলে যাই নি।’

ছেলেটা জোরে হেসে উঠলো। বললো,
‘ওহ, দারুণ সখ তো তোরা। নে, ইচ্ছে-
মতো মাখ।’

ছেলেটা গগনের হাতে দিয়ে দিলো
দূরবীনটা।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো গগনের। দ্রুত
এসে চোখে দূরবীন লাগিয়ে জানালায় পাশে
দাঁড়ালো। আবার সেই দৃশ্য। সেই
দেয়ালের ওদিকে বিশাল পৃথিবী। গগন
দু’ হাতে আঁকড়ে ধরলো দূরবীনটাকে।

ছেলেটা শিস দিতে দিতে ওদিকে গেছে।
গগনের মনের মধ্যে একটা ক্ষুধার বাতাস
কাঁপিয়ে পড়লো। ভাবনা-চিন্তা যা কিছু সব
ওলট-পালট হয়ে গেলো। দূরবীনটাকে
বুকের ভেতর জাপটে ধরে গগন ছুটে সিঁড়ি
দিয়ে নামতে থাকলো। এতো দ্রুত নামতে
থাকলো, যে-কোনো মুহূর্তে পা পিছলে
গাড়ির পড়তে পারে সে। তবু এক-

মুহূর্তের জন্য আঁহালো না তার। পেছনে
কে বেন চোঁচিয়ে উঠেছে—তাও শুনলো না
গগন।

সব সিঁড়ি পেরিয়ে গেটটা তেলে ছুটে
থাকলো মাঠ বরাবর। সোজা চাঁদমারীর
চিহ্নেতে যাবে। সেখানে দাঁড়াবে। তাৎপর্য
একান্ত বড় পৃথিবীকে চোখের সামনে এনে
দেখবে। অবশ্য অস্পষ্ট ছায়াব মতো কথা-
গুলো মনের মধ্যে জ্বলে উঠলো গগনের।

মাঠটা প্রায় পেরিয়েই এসেছিল গগন।
হঠাৎ পেছন থেকে কে বেন সবলে তার
কাঁধটা চেপে ধরলো। প্রবল ভয়ে মুখটা
ফিরিয়ে একটা অপরিচিত হিংস্র মুখ
দেখলো গগন। বুকের মধ্যে দারুণ শক্তিতে
আঁকড়ে ধরলো গগন।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবল একটা ঘূসি
আছে পড়লো গগনের নাকের ওপর।

দু’ হাতে নাক চেপে বসে পড়লো গগন।
চারদিকের পৃথিবী দুলছে। দু’পায়ে
শ্মির থাকতে পারছে না সে। রাশি রাশি
অশ্রুকার কাঁপিয়ে পড়ছে সেই চোখের সামনে।
দেখাল গড়ছে সেই অশ্রুকার। গগন বৌদিকে
তাকালো সৌদিকেই অশ্রুকারের সেই দেয়াল।
গগন দূরবীনটা পাবার জন্য হাত বাড়ালো।
কেবল অশ্রুকারের দেয়ালে ঠেকে ফিরে এলো
সেই হাত।

দোদুল্যমান পৃথিবীতে অশ্রুকারের চাপ-
দেয়ালে বন্দী হয়ে ক্রমশ গগন ভুল যেতে
যেতে, শূন্য হতে হতে কেমন লুপ্ত হয়ে
গেলো।

অনেকক্ষণ পর গগন টেব পেলে সে
ঘাসের ওপব শব্দে আছে। প্রবল কান্না পাচ্ছে
গগনের। শরীর সেই কান্নায় ফুলে ফুলে
উঠতে থাকলো। আস্তে আস্তে চোখ
মেললো গগন। সন্ধ্যার আবছা অশ্রুকার
চারদিকে। গগন আকাশের দিকে তাকালো।
আকাশে একটা স্মিখ। তারা। সন্ধ্যা-
তারা। ভোরে এই তারাটাই শুকরা হাবে।
কণাটা কে যেন বলছিল গগনকে।

গগন সেই তারার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ
বিস্ময়ে আনন্দে কেঁদে ফেললো। দূরবীন
কেড়ে নিয়ে গগনকে ওরা ঠকাতো পারে নি।
গগনের চোখ দুটোই তো আরো বড় দূরবীন।
গগন ভাবতে পারলো এবার। না হলে
অতো দূরত্ব তাকে এমন স্পষ্ট দেখা যায়।
এমনিভাবে তো আব কোনোদিন আকাশের
দিকে তাকায় নি গগন। কেবল দু’ চোখের
সামনে নিজের হাতে মশলা এগিয়ে দেয়াল
তুলতে দিচ্ছে। না হলে সেই দূরবীনটাকে
অবহেলায় ফিরিয়ে দিতে পারতো ছেলেটার
হাতে।

গগন আর বড়মিস্ত্রীর গেঁথে তোলা
আকাশ সমান উঁচু দেয়ালকে ভব পাচ্ছে না।
ঘাসের ওপব শব্দে সেই তারার দিকে তাকিয়ে
বিস্ময়ে আনন্দে গগন কাঁতেই থাকলো।

ভারতীয় সিগারেট শিল্প

বিচার করুন—বাস্তব ঘটনাবলী আর তার সঙ্গে
বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা

ভূমিকা

এই সাংবাদিক সম্মেলনে আপনাদের আশ্রয় স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনারা এসেছেন বলে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সম্প্রতি ভারতে সিগারেট শিল্পের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে; গোয়েন্ডেন টোব্যাকো কোং যে বিরূপ প্রচারণা চালিয়েছে, বহুলাংশে তারই ফল এটি। ভারতে সিগারেট শিল্পের একটি অগ্রণী কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে আমি মনে করি যে, একপেশে প্রচারণায় কিছুক্ষণ না হয়ে এই শিল্পটি সম্পর্কে বাস্তব তথ্যাদি যাতে প্রকাশিত হয় তার জন্য সংবাদপত্র ও জনসাধারণ ও কল্‌পক্ষে দিক থেকে সচেষ্ট হওয়ার সময় এসে গেছে।

ক। শিল্পের প্রতিনিধিত্ব

- ১। সিগারেট শিল্প এখন দেশটি কোম্পানি রয়েছে এবং এই দেশটি কোম্পানিই ১৯৬৭ সালে গঠিত দি সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য—গোয়েন্ডেন টোব্যাকো কোং তাদেরই একটি।
- ২। দি ইন্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন ১৯৭০ সালের ৩রা আগস্টের আগেই গঠিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। আমার যতদূর জানা আছে, আই. সি. এম. এ.-এর প্রবর্তক, প্রধান পরিচালক এবং প্রায় নিঃসঙ্গ সদস্য হচ্ছে গোয়েন্ডেন টোব্যাকো কোং, এবং গোয়েন্ডেন টোব্যাকো কোং-ই তার অধীর ও যোগানদার এবং প্রচারণার মস্ত হিসেবেই তাকে ব্যবহার করছে; তার সাম্প্রতিক কার্যকলাপ—বস্তুতঃ এই সবই তার প্রধান কার্যকলাপ—এ থেকেই তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিভাত হচ্ছে।

খ। গোয়েন্ডেন টোব্যাকো কোং-এর অভিযান—তাদের নিজস্ব কাজকর্ম—প্রচারণার মূল কারণ

১। প্রচারণার বিষয়বস্তু :

গোয়েন্ডেন টোব্যাকো কোং-এর কুৎসামূলক প্রচারণা ব্যবসায়িক বিচারে অসৌজন্যমূলক এবং তার অধিকাংশই বেআইনী, মানহানিকর ও ক্ষতিকারক। এর ভিত্তি হচ্ছে বাস্তব ঘটনাবলীর বিকৃতি ও গোপনতা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং প্রতারণামূলক সিদ্ধান্ত। দেশের কলেক্সজন প্রধান ন্যায়াধিপতির কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, এই অভিযানের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর সুনাম নষ্ট করা এবং জনসাধারণের মনে তার যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে তাকে মসলিগু করা।

২। গোয়েন্ডেন টোব্যাকো কোং—কাজকর্ম :

- গোয়েন্ডেন টোব্যাকো কোং-এর যুক্তি হচ্ছে, কয়েকটি বড় বড় প্রস্তুতকারক রয়েছে বলে এবং যাদের বিদেশী শোয়ারহোল্ডার রয়েছে তারা আছে বলেই তাদের

অগ্রগতি ও উন্নতি হতে পারছে না। এটিই একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ যার থেকে সংবাদপত্র, জনসাধারণ ও কল্‌পক্ষ প্রকৃত ঘটনাবলী অনুমান করতে পারবেন।

(ক) প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীচক্ৰবর্ত্ত্য নারসে স্বয়ং বলেছেন যে, গোয়েন্ডেন টোব্যাকো কোং-এর শত্রু হয়েছিল অতি সামান্য মূলধন নিয়ে অতি সাধারণভাবে।

(খ) সমগ্র শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ ও ১৯৬৮ সালের মধ্যে গোয়েন্ডেন টোব্যাকো কোং-এর বিক্রয়/উৎপাদন কাজকর্ম (সরকারী পরিসংখ্যান) নিম্নরূপ :-

গোয়েন্ডেনের বিক্রয় :

উৎপাদন—লক্ষ সিগারেট শতকরা বৃদ্ধি শতকরা বৃদ্ধি হিসাবে

১৯৪৮	১৯৬৮/৬৯	গোয়েন্ডেন	সমগ্র শিল্প
৭০০	৮০৪০০	১১৫০০%	২২৫%

(গ) গত দশ বৎসরে সমগ্র শিল্পের তুলনায় গোয়েন্ডেন টোব্যাকোর বিক্রয়/উৎপাদন বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ :-

গোয়েন্ডেন	সমগ্র শিল্প	গোয়েন্ডেন—গড়	সমগ্র শিল্প—
১০ বৎসরে	১০ বৎসরে	বার্ষিক	গড় বার্ষিক
% বৃদ্ধি	% বৃদ্ধি	% বৃদ্ধি	% বৃদ্ধি
৫২৬.৪%	১১০.১%	৫২.৬%	১১.০%

(ঘ) গোয়েন্ডেন নিজেরাই বিজ্ঞাপন দেয়—

(১) কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সর্বত্র পাওয়া যায়

(২) এই শ্রেণীর সবচেয়ে বেশী বিক্রীত সিগারেট

(৩) গোয়েন্ডেন টোব্যাকোর আর্থিক কাজকর্ম নিম্নরূপ (৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত বৎসরে) :-

(কোটি টাকায়)

	১৯৬৭	১৯৬৮	১৯৬৯	মূল্য
ইস্ফুত মূলধন (অর্ডিনারী)	৬০	৬০	১০৮০	টাকা ১২০
নিয়োজিত মূলধন	৭০৯	৭০৯	৯০৫	
মোট লাভ	১৯০	২০০	৩০৭	
আর্থিক % অনুপাত				এই শিল্পের
আয়ের % মোট লাভ	৭.৮৫	৭.৭৭	৮.১১	সর্বোচ্চ
ইস্ফুত অর্ডিনারী মূলধনে % মোট লাভ	৩২১.০০	৪১৭.০০	১৭১.০০	—এ—
মোট ইকুইটিতে				
% মোট লাভ	৭১.৪২	৮৬.৫০	৮৩.৯২	—এ—
নিয়োজিত মূলধনে				
% মোট লাভ	২৮.৫৭	৩৫.৮৪	৩৬.০২	—এ—

ভারতীয় সিগারেট শিল্প

(চ) গোয়েডেন টোব্যাকো কোং'এর নিজেদের কথাতেই প্রকাশ, তারা দু'টি বড়রকমের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে এবং অতি সম্প্রতি তাদের বর্তমানের সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির ৫০%-এরও ওপর আর একটি বড়রকমের সম্প্রসারণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

৩। গোয়েডেন টোব্যাকো কোং'এর সম্মুখ-শেয়ারহোল্ডার:

আমি এবং সেই সঙ্গে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো কামনা করে গোয়েডেন টোব্যাকো কোং তার সম্মুখ বাড়িয়ে চলে। বস্তুতঃপক্ষে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি-গুলি সব সময়ই তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং তাদের সাহায্য করতে, অবশ্য যদি বাণিজ্যিক শালীনতা ও ন্যায্যবিচারের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাহায্যের দরকার হয়, তবে এই সাহায্য করতে আগ্রহী। আমরা কামনা করি, গোয়েডেন টোব্যাকো কোং'এর ১০/১৪টি শেয়ারহোল্ডার (এর মধ্যে ১৩ জনই একটি পরিবারের লোক) স্বাধীন সম্মুখ লাভ করুক।

৪। কাজকর্মের সংক্ষিপ্তসার:

উপরে ঘটনাবলী সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত কিংবা তর্কাতীত। এগুলিতে নিঃসন্দেহভাবে ও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, বিদেশী শেয়ারহোল্ডারযুক্ত বা বিহীন কোন প্রস্তুতকারকই গোয়েডেন টোব্যাকো কোং'এর অগ্রগতি ও সম্মুখ বিঘ্নিত বা ব্যাহত করে নি।

৫। সিগারেট শিল্পে গোয়েডেন টোব্যাকো কোং'এর ভূমিকা:

গোয়েডেন টোব্যাকো কোং দাবী করে যে, সিগারেট শিল্পের "দেশীয় ক্ষেত্রে"র স্বার্থ তারাই তুলে ধরেছে। আমি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সংবাদপত্র ও জনসাধারণ এবং কতৃপক্ষের সুবিচারের জন্য উপস্থাপিত করছি:—

(ক) গোয়েডেন টোব্যাকো কোং তাদের বিপুল সম্পদে ভারতীয় জনসাধারণকে অংশীদার হতে দেয় নি,

(খ) গোয়েডেন টোব্যাকো কোং রপ্তানি সম্প্রসারণে কোন সৃজনীয়মূলক ভূমিকা গ্রহণ করে নি,

(গ) গোয়েডেন টোব্যাকো কোং আমদানী প্রতিস্থাপনের উন্নতিবিধানে সৃজনীয়মূলক কোন ভূমিকাই গ্রহণ করে নি,

(ঘ) গোয়েডেন টোব্যাকো কোং তামাক-চাষীদের বাস্তব ও লক্ষণীয় সাহায্যদানে কোন ভূমিকাই পালন করে নি,

(ঙ) গোয়েডেন টোব্যাকো কোং সম্মিটিগত দর কষাকষি ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কোন ভূমিকাই গ্রহণ করে নি।

৬। গোয়েডেন টোব্যাকো কোং'এর প্রচারণার মূল কারণসমূহের বিশ্লেষণ:

আমি সংবাদপত্র ও জনসাধারণ এবং কতৃপক্ষকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানাবো:—

(ক) শিল্পের পক্ষে যা বাস্তব নীতি তার চেয়ে অনেক বেশী চমক-সাগানো হারে বৃদ্ধি ঘটলে একটি কোম্পানি প্রতিযোগিতাকে নিরুৎসাহ করে শিল্পে একচেটিয়া অধিকার লাভ করতে পারে,

(খ) শিল্পের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে অন্যান্য সুসংগঠিত প্রস্তুতকারকদের যদি তাদের

উৎপাদন বাড়াতে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হতে হয়, তবে তার ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থানটির অন্যান্য ও অবাস্তব সুযোগ কোন কোম্পানি নিতে পারে,

(গ) কোন কোম্পানিকেই এ বিষয়টি উপেক্ষা করার সুযোগ দেওয়া যায় না যে, বৃহৎ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট কোন কোম্পানির বৃদ্ধির পক্ষে আবশ্যিক ব্যাপার হচ্ছে জনসাধারণের তাতে অংশ গ্রহণ,

(ঘ) কোন কোম্পানিকেই এই মূল বাণিজ্যিক নীতি অবহেলা করতে দেওয়া যায় না যে, শেষ পর্যন্ত ভোগ্যপণ্যের শিল্পে প্রস্তুতকারকের সাফল্য নির্ভর করবে, ক্ষেত্রদের প্রতি পরিসেবার ওপর এবং তাদের অর্থের সর্বোত্তম মূল্যদানের ওপর।

গ। প্রচারণা—তার বৈধতা

এ কথাটি অনুমান করা ও ধারণা করে নেওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, বিরূপ প্রচারণা নিম্নলিখিত ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে, অবশ্য এগুলো থেকে সংবাদপত্র ও জনসাধারণ এবং কতৃপক্ষ নিজেদের নিরপেক্ষ ধারণা করে নিতে পারবেন যে, এগুলো প্রতারণামূলক কি না, মিথ্যা কি না বা আর কিছুর কি না—

প্রচারণা—দফা নং ১

এই প্রচারণা সত্য না মিথ্যা?

বৈদেশী শেয়ারহোল্ডার আছে বলে বৈদেশিক মদ্যের কেবল অপচয়ই হয়

মিথ্যা

বাস্তব ঘটনা:

১। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো রপ্তানি শুরুর করে সেই ১৯৩৩ সালে। ইন্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ সৃষ্ট হয় ১৯০৮ সালে এবং পুনঃসংগঠিত হয় ১৯২৮ সালে।

২। ১৯৫৮ সাল ও ৩১-৩-১৯৭০ তারিখের মধ্যে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো (এর মধ্যে রয়েছে সহযোগী সংস্থা ইন্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ) বৈদেশিক মদ্যের আয় থেকে লাভাংশ/লাভ বাবদ প্রদেয় অর্থ বাদ দেবার পর নীট ৬৬-১৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মদ্যে অর্জন করে।

৩। যেহেতু ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো নীট বৈদেশিক মদ্যের আয় (অর্থাৎ লাভাংশ বাদে রপ্তানি আয়) বিকশিত করেছে সেই হেতু তা নিম্নোক্তভাবে বাড়িয়ে চলেছে:

কোটি টাকা

১৯৫৯	১৯৬৯
অর্জিত নীট বৈদেশিক মদ্য	টাক: ৪-৭০
	টাক: ৯-৫৬

৪। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো কাউকে কোন রকম রয়ালটি, কলা-কৌশল বা সহযোগিতা ফী দেয় না।

প্রচারণা—দফা নং ২

এই প্রচারণা সত্য না মিথ্যা?

ভারতে সিগারেট শিল্পে একটি বিদেশী বা অন্য রকম একচেটিয়া রয়েছে

মিথ্যা

বাস্তব ঘটনা:

১। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো আইনের দিক দিয়ে বা বাস্তবিকপক্ষে একচেটিয়া হয়ে ওঠে নি।

২। তিনটি কোম্পানির, যাদের বিদেশী শেয়ারহোল্ডার রয়েছে তাদের পারস্পরিক কোন অংশীদারী নেই।

ভারতীয় সিগারেট শিল্প

- ৩। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর ওয়াজির সুলতানে কোন অংশীদারী নেই কিংবা ওয়াজির সুলতানের ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোতে অংশীদারী নেই।
- ৪। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো এবং ওয়াজির সুলতানের মধ্যে কোন আন্তঃ-সংযোগ নেই। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো এবং ওয়াজির সুলতানের মধ্যে একই ডিরেক্টর বা একই পরিচালকমণ্ডলী নেই। স্বাভাবিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া এই কোম্পানিগুলোর মধ্যে একই ব্যবস্থাপনা নেই। প্রধান প্রধান ন্যায়াধিপতিগণ এসব কথা স্বীকার করেছেন। এসব কেবল এই কোম্পানি-গুলোরই বৈশিষ্ট্য নয়।

প্রচারণা—দফা নং ৩

এই প্রচারণা সত্য
না মিথ্যা?

আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর বিক্রিতে
ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো

মিথ্যা

বাস্তব ঘটনা:

- ১। কোন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ভারতে বিক্রীত হয় না, কেবল বেগুলো চোরাপথে আসে সেগুলো ছাড়া, অন্যান্য আমদানীকৃত ভোগ্যপণ্য যেমন হয়।
- ২। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো যেসব ব্র্যান্ড বিক্রী করে তার মালিক তারা নিজেরাই এবং (আইনগতভাবে যেখানেই সম্ভব) ট্রেড মার্ক আইন অনুসারে সেগুলো তাদের নামে রেজিস্টারী-করা, এগুলোর অধিকাংশই কয়েক দশক ধাবৎ নিজেদের অধিকারে রেখে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো ব্যবহার করে আসছে।
- ৩। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো এই সব ব্র্যান্ড/ট্রেড মার্ক ব্যবহার করছে বলে ভারতের ভিতরে বা বাইরে কাউকে কোন রম্মালিটি, কমিশন বা অন্য কোন পণ দেয় না।

প্রচারণা—দফা নং ৪

এই প্রচারণা সত্য
না মিথ্যা?

গত চার দশকে ২০০টি দেশীয় সিগারেট কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে; অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়েছে স্বাধীনতার আগে, ছয়টি স্বাধীনতার পর এবং আর ছয়টি এখন খুঁড়িয়ে চলেছে

মিথ্যা

বাস্তব ঘটনা:

- ১। ১৯৫১ সালের ইন্ডাস্ট্রিজ (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট চালু হওয়ার আগে পর্বন্ত এই শিল্পে কোম্পানিগুলোর কোন রেজিস্ট্রেশন ছিল না। যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা স্বভাবতই বানানো এবং তার উদ্দেশ্য আসল প্রশ্ন গুলিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আগে পর্বন্ত এই শিল্পের মোট বিক্রয়ের মোট পরিমাণ ছিল প্রতি মাসে মাত্র ৫০ কোটি সিগারেটের ধারে-কাছে এবং প্রতি মাসে ৫ কোটি সিগারেটকেও যদি ক্ষুদ্রতম আর্থিক ইউনিট হিসেবে ধরা হয় তবে সেই সময়ে সিগারেট শিল্পে ১০টির বেশী প্রস্তুতকারকের স্থান সম্ভবতঃ দেওয়া যায় না।
- ২। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো তাদের ৬০ বছরের কাজ-করিবারের মধ্যে একটিও দেশীয় সংস্থার সঙ্গে মিলিত হয়নি বা যুক্ত হয়নি বা একটিও দেশীয় সংস্থা

কিনে নেয়নি, এইরকম কোন সংস্থার ব্যবহৃত কারণ হওয়া তো দূরের কথা।

- ৩। স্বাধীনতার আগে সিগারেট শিল্পে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রত মাত্র আটটি দেশীয় কোম্পানি ছিল এবং স্বাধীনতার পরেও সেই আটটি কোম্পানি এখনও আছে এবং তারা ১৯৫১ সালের ইন্ডাস্ট্রিজ (ডেভেলপ-মেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট অধীনে রেজিস্টার্ড।
- ৪। ১৯৬৭/৬৮ সালের দিকে আর একটি ভারতীয় কোম্পানি ব্যবসারে নামে এবং তা বিকাশ লাভ করেছে।
- ৫। আজ সাতটি দেশীয় কোম্পানি সিগারেট শিল্পে কর্মরত আছে।
- ৬। নিছক একটি আঞ্চলিক কোম্পানি আছে, যেটি একটি মালিকানা সংস্থা; যে নগরীতে এটি আছে তার বাজারের আনুমানিক ২৮% তার অধিকারে। এই কোম্পানির গত তিন বছরে মাত্র একটি শহর এলাকাভেই মোট লক্ষী হচ্ছে—

১৯৬৭/৬৮	১৯৬৮/৬৯	১৯৬৯/৭০
৫৪ লক্ষ	৭২ লক্ষ	৯০ লক্ষ

- ৭। আর একটি কোম্পানির ইস্যুকৃত মূলধন হচ্ছে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা এবং ৩১শে আগস্ট, ১৯৬৮ তারিখে যে বছর শেষ হয়েছে সে সময়ে তার লক্ষী ছিল ১.১৮ কোটি টাকা।
- ৮। আরও একটি কোম্পানি বিশেষায়িত পণ্যের কারবার করে এবং নিজস্ব দোকান থেকেই সে বিক্রী করে। তার কাজ-কর্ম অত্যন্ত ভাল এবং তার কাজকর্মে সন্তুষ্টি হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।
- ৯। আরও একটি কোম্পানি ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময় পর্বন্ত বেশ ভাল কাজ করেছে; দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তার ফলে আনুমানিক ৩/৪ মাস লকআউট হয়ে যায়। এই কোম্পানির শেয়ারের বাজার-দর ছিল লিখিত মূল্যের ১-৩ গুণ; কাজ সন্তোষজনক না হলে এইরকম দর সম্ভবতঃ হয় না।
- ১০। একটিমাত্র কোম্পানি, দুর্ভাগ্যক্রমে যার কাজকর্ম ভাল হয়নি, গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর সিগারেটের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় পড়ে তার প্রধান ব্র্যান্ডের সিগারেট বিক্রী করতে পারেনি।
- ১১। আর একটি কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রধানতঃ গোল্ডেন টোব্যাকো কোং কর্তৃক তার সঙ্গে সিগারেট প্রস্তুতের ব্যবস্থাপনার অবসান ঘটানো ফলে।
- ১২। সব শেষে হলেও কম উল্লেখ্য নয়—গোল্ডেন টোব্যাকো কোং নিজেরাই ৩০শে জুন, ১৯৬৭, ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ তারিখে যে তিনটি বছর শেষ হয়েছে তার মধ্যে যথাক্রমে ১.৯৩ কোটি টাকা, ২.৫০ কোটি টাকা ও ৩.০৭ কোটি টাকার মত মোট মুনাফা অর্জন করেছে।

প্রচারণা—দফা নং ৫

এই প্রচারণা সত্য
না মিথ্যা?

শিল্পের সম্পূর্ণ দেশীয় ক্ষেত্রে প্রচুর
ক্যাপাসিটি অলস পড়ে আছে

মিথ্যা

বাস্তব ঘটনা:

- ১। গোল্ডেন টোব্যাকো কোং ১৯৫৯ সাল থেকেই তিন শিফটে কাজ করছে এবং তাদের সংস্থানিত ক্যাপাসিটির পূর্ণ ব্যবহার করছে। ইতোমধ্যেই তারা দুটো বড়

ভারতীয় সিগারেট শিল্প

রকমের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে এবং আরও একটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২। আর একটি কোম্পানি, যার কাজকর্ম মূলতঃ আঞ্চলিক, প্রতি মাসে আনুমানিক ৪ কোটি সিগারেট প্রস্তুত করে, একটি শহরে ও তার আশেপাশে কোম্পানিটি যে পরিমাণ সিগারেট বিক্রী করতে পারে এই সংখ্যাটি তারই অনুসরণ।

৩। আর একটি কোম্পানি শুল্ক বিশেষায়িত সিগারেটই প্রস্তুত করে; ক্রেতাদের চাহিদা পূরোপূরি মিটানোর মত পরিমাণ সিগারেটই তারা প্রস্তুত করছে।

৪। আর একটি কোম্পানি তিন শিফটের ভিত্তিতে শুল্ক তার পুরো ক্যাপাসিটির সিগারেটই তৈরী করছে না, বরঞ্চ সরকারী মঞ্জুরী ছাড়াই ২৫% বেশী তৈরী করে অন্তর্গত দেওয়া আছে তার সুযোগও তারা নিতে যাচ্ছে।

৫। আর একটি কোম্পানি ১৯৬৩/৬৪ সালে তার পুরো ক্যাপাসিটিকে কাজে লাগাচ্ছে। ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে কোম্পানিটি তার রেজিস্টার্ড ক্যাপাসিটির ১১৮% সম্প্রসারণ ঘটায় এবং তার বর্ধিত ক্যাপাসিটির সদ্যবহার করে যাচ্ছে। তবে আগেই বলছি, ১৯৬৭ সালের দীর্ঘ-কালীন লকআউট তার অগ্রগতি ব্যাহত করে। অনুদ্রুদ্ধ হয়ে ইন্ডিয়া টোব্যাকো একে পুনরুজ্জীবনের পথে সাহায্য করছে।

৬। আর একটি কোম্পানির ক্যাপাসিটি রয়েছে প্রতি মাসে আনুমানিক ৮৪ লক্ষ সিগারেট তৈরী। তবে, গোয়েন্দা টোব্যাকো কোং-এর ব্র্যান্ডের সঙ্গে সরাসরি প্রতি-যোগিতার সম্মুখীন হবার সামর্থ্য এর নেই।

৭। আর একটি কোম্পানি, যার সঙ্গে সিগারেট তৈরীর ব্যবস্থাপনার অবসান গোয়েন্দা টোব্যাকো ঘটিয়ে দিয়েছে, প্রতি মাসে প্রায় ৪/৫ কোটি সিগারেট উৎপাদনে সক্ষম এবং সম্প্রতি তারা প্রতি মাসে ২/২ই কোটি সিগারেট তৈরী করছে। অনুদ্রুদ্ধ হয়ে ইন্ডিয়া টোব্যাকো এই কোম্পানিটিকে তার পুনরুজ্জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিচ্ছে।

প্রচারণা—দফা নং ৬

এই প্রচারণা সত্য

বৈদেশিক মূলধন সিগারেট বাজারের মোট মূলধনের ৮০% নিয়ন্ত্রিত করে

না মিথ্যা?
মিথ্যা

বাস্তব ঘটনা:

তিনটি কোম্পানি আছে, যাদের শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিদেশীরাও আছেন। গত আর্থিক বৎসরে ইন্ডিয়া টোব্যাকো ভারতীয়দের যোগদান বাড়িয়ে ২৫.১৮% করেছে এবং আরও বাড়িয়ে একে ৪০% করার অঙ্গীকারও সে করেছে; এই পন্থাটি চলতে থাকবে। আর একটি কোম্পানির ইন্ডপুর্বেই ৩৫% ভারতীয় শেয়ারহোল্ডার রয়েছে এবং সরকারের সঙ্গে তারা একটি প্রস্তাব রেখেছে, যার ফলে ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারের পরিমাণ বাড়িয়ে ৫১% করে এটি পুরোপুরি ভারতীয় কোম্পানি হয়ে উঠবে। তৃতীয় কোম্পানিটিও ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারের পরিমাণ বাড়িয়ে ৪০% করার

অঙ্গীকার দিয়েছে। পরিস্থিতি সংক্ষেপে নিম্নোক্তমত বিশ্লেষণ করা যায়ঃ—

বর্তমান অঙ্গীকারাবদ্ধ/
প্রত্যাশিত

শিল্পে ভারতীয় মূলধনের % অংশ ...	৪২%	৬০%
ভারতীয় মূলধন দ্বারা সৃষ্ট % উৎপাদন	৪৭%	৫৮%

অঙ্গীকার দিয়েছে। পরিস্থিতি সংক্ষেপে নিম্নোক্তমত বিশ্লেষণ করা যায়ঃ—

ভারতীয় মূলধন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত % ক্যাপাসিটি	...	৪৭%	৬০%
ভারতীয় মূলধন দ্বারা আহৃত প্রতিদানের % অংশ	...	৫২%	৬২%

প্রচারণা—দফা নং ৭

এই প্রচারণা সত্য

কয়েকটি কোম্পানির জন্য অপর কয়েকটি কোম্পানি সমৃদ্ধ হতে পারছে না বাস্তব ঘটনা:

না মিথ্যা?
মিথ্যা

১। গোয়েন্দা টোব্যাকো কোং বৃহত্তর ক্ষেত্রের প্রতিনিধি। ৩০শে জুন তারিখে যে বছর শেষ হয়েছে তাতে তার কাজকর্ম নিম্নোক্তমত ছিলঃ

(কোটি টাকার হিসাবে)

	১৯৬৭	১৯৬৮	১৯৬৯
মোট মালিকী মূলধন ...	৩.৪৩	৩.৮৯	৪.৬৭
মোট মূল্য	...	১.৯৩	২.৫০

২। আর একটি কোম্পানি, যাকে মাঝারি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়, ৩০শে জুন তারিখে যে বছর শেষ হয়েছে তার মধ্যে তার অবস্থা ছিলঃ

(কোটি টাকার হিসাবে)

	১৯৬৭	১৯৬৮	১৯৬৯
ইকুইটি (ইস্ট+রিজার্ভ) ...	১.০১	১.৪৪	১.৪৪
মোট মূল্য	...	০.৮০	০.৮৭

আর একটি কোম্পানি, যাকে ধরা যায় ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রের শিল্প, গত তিন বছর তার আয় এবং কেবলমাত্র একটি শহর এলাকাতেই তার সিগারেট বিক্রীর পরিমাণ হচ্ছেঃ

১৯৬৭/৬৮	১৯৬৮/৬৯	১৯৬৯/৭০
৫৪ লক্ষ	৭২ লক্ষ	৯০ লক্ষ

ঘ। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানীগুলোর অবদান

এখন আমি ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোং সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এই কোম্পানির চেয়ারম্যান হতে পেরে ভারতীয় হিসেবে আমি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করছি।

আমি জানতে চাই যে, ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়া টোব্যাকো, দি ইন্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপ-মেন্ট কোম্পানি, ক্যালকাটা কোল্ড স্টোরেজ এবং দি দিল্লী অ্যান্ড ওরিয়েন্ট টোব্যাকো কোং ও তিন ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোং। সাধারণতঃ এই কোম্পানিগুলোর একটিমাত্র গোটা ব্যবসায়িক কাজকর্ম রয়েছে।

১। আমদানী-রপ্তানী—বৈদেশিক মুদ্রা

(ক) ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো সেই ১৯৩৩ সাল থেকেই রপ্তানি করে আসছে। আগেই বলছি, ১৯৫৯ ও ৩১-৩-১৯৭০ তারিখের মধ্যে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো আমদানী ব্যয় ও বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের লাভাংশ বাদ দেবার পর ৬৬.১৪ কোটি টাকার নীট বৈদেশিক মুদ্রা

দারদ্রীয় সামাজিক বস্তুমতী : ১৩৭৭

ভারতীয় সিগারেট শিল্প

পরামর্শাদি দিয়ে, কারিগরী পদ্ধতিকা, ওয়ার্কশপ মেশিনারি, টুল, জিগ্, ফিক্সচার জুগিয়ে, কাঁচা মাল, দক্ষ শ্রমিক, সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং ও ড্রাফটস-ম্যান ইত্যাদি সরবরাহ করে সাহায্য করেছে। মেশিনারি ছাড়াও এখন ভারতে প্রায় ২০,০০০ দফার স্পেসার পাট প্রস্তুত হচ্ছে এবং এর সবগুলির উপকার শিল্পের প্রত্যেকটি সদস্যের ওপর বর্তাচ্ছে।

(৪) মালমসলা:

ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর সহায়তা কারিগরী কলেক্টরাল ও বিশেষায়ণ, গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা, মাল নেওয়ার গ্যারান্টি, কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা, অর্থের যোগান এবং আরও বহুদূরপে আসে; তাদের অগণিত যোগানদার এগুলোর পরীক্ষা করে দেখেছেন। এর ফল হলো: আগে যেসব মালমসলা আমদানী করা হত তার সবগুলি, প্যাকেট তৈরীর জন্য বোর্ড ১৯৪৫ সাল থেকেই স্থানীয়ভাবে পাওয়া যাচ্ছে; সিগারেটের কাগজ পাওয়া যাচ্ছে ১৯৫১ সাল থেকে; অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ১৯৫৪ সাল থেকে; প্যাকেট মোড়বার জন্য স্বচ্ছ ফিল্ম ১৯৫৭ সাল থেকে; মাল পাঠানোর জন্য করগেটেড কার্ডবোর্ড বক্স ১৯৬২ সাল থেকে এবং ফিল্টার টিপ ১৯৬৩ সাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

১৯৫১ সালে যদিও ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোকে ৯২.৭ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী করতে হয়েছিল, তবু তাদের মালপত্র আমদানীর মোট বিলের পরিমাণ বার্ষিক ১২/১৩ কোটি টাকার পরিপ্রেক্ষিতে আজ মাত্র ৩ লক্ষ টাকা। অথচ এগুলোর ব্যবহার এখন কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

৬। ক্ষুদ্রায়তন আনুষঙ্গিক শিল্পের বিকাশ:

মূল মেশিনারি ও মালপত্রের অনেক অনেক যোগানদার ছাড়াও ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো ভারতের বিজ্ঞান রাজ্যের ৪৩টি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশে সহায়তা করেছে।

৭। গবেষণা ও উন্নয়ন:

ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো যে সব গবেষণা করেছে তার শুরু হয় বহুদিন আগে সেই ১৯২৮ সালে—লীফ টোব্যাকোর উন্নতি বিধানই এই গবেষণার বিশেষ লক্ষ্য। কলিকাতায় গবেষণা কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয় ১৯৫২ সালে এবং লীফ টোব্যাকোর গবেষণার জন্য রাজমহেন্দ্রীতে একটি নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ১৯৬১ সালে।

গবেষণা কেন্দ্রের কর্মীর মোট সংখ্যা ৫০; এদের মধ্যে অধিকাংশই সালেন্স গ্রাডুয়েট। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন দক্ষ কৃষিবিজ্ঞানীসহ উচ্চ যোগ্যতা-সম্পন্ন বিজ্ঞানীর সংখ্যা ৭।

একমাত্র রিসার্চ লেবরেটরিগুলোতেই বিনিয়ুক্ত স্থায়ী পরিসম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ২৫ লক্ষ টাকার মত এবং গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বছরে যে পৌনঃপুনিক ব্যয় হয় তার পরিমাণ ৩০ লক্ষ টাকা বা তারও কিছু বেশী।

•গবেষণা রপ্তানি: অনেক কয়টি বছর ধরে যে গবেষণা

ও কারিগরী-বিদ্যা গড়ে তোলা হয়েছে তার রপ্তানি শুরু করা গিয়েছে; ফলে অতি সামান্য পরিমাণে হলেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আর একটি পথ উন্মুক্ত হয়েছে। গবেষণার কাজকর্ম: এই সকল কাজকর্ম আত্ম ব্যাপক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনিক জ্ঞানসম্পন্ন। এর মধ্যে আছে লীফ টোব্যাকোর গবেষণা, ক্রেতা সম্পর্কিত গবেষণা, উৎপন্ন মালের উন্নতিবিধানের গবেষণা, মালপত্রের উন্নতি-বিধানের গবেষণা ও আমদানী প্রতিরক্ষণ গবেষণা ইত্যাদি।

৮। কর্মসংস্থান—কর্মী:

ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর ১২,০০০ স্থায়ী শ্রমিক আছে, এবং যেহেতু তামাক একটি মরসুমী ফসল সেইহেতু আরও ২০,০০০ শ্রমিক মরসুমে কাজ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের কর্মীরা তাদের অত্যন্ত মূল্যবান পরিসম্পন্ন। এদের ট্রেনিং-এর জন্য অনবরত সুযোগ দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাঙ্গালোরে রয়েছে একটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, সবগুলি ইউনিটে আছে ট্রেনিং-এর কর্মসূচী এবং মহাশূরের হুনসুরে আছে ট্রেনিং স্কুল।

ফলে, পল্লিচালকমণ্ডলীর এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে প্রমোশন-পাওয়া ইউনিয়ন পর্ষদের কর্মী; এর জন্য ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো গর্বিত। তা ছাড়া, ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো সুস্থ মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রভু প্রদর্শনের বিরোধী, সমষ্টিগত দরকষাকষিকেই এ ব্যাপারে দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করে। তারা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর বৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দেন এবং তারাই ভারতের প্রথম কোম্পানি যারা নিজেদের ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে দীর্ঘ-মেয়াদী চুক্তি স্থাপন করেছে।

ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর নিজেদের ব্যালেন্সের প্রায় ২৮০,০০০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদনে ১২,০০০ কর্মী নিয়োগ করেছে; তার তুলনায় গোল্ডেন টোব্যাকো কোং বার্ষিক ৮০,০০০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদনে আনুমানিক ১,৩৫০ জন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করেছে। কাজেই দেখা যাবে যে, ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর তুলনায় গোল্ডেন প্রতি দশ লক্ষ সিগারেটে অনেক কম হবে কর্মী নিয়োগ হবে। গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর সাধারণ শ্রমিকদের জন্য একটি ন্যূনতম মজুরী-হার আছে, শুরু হয় মাসে ৩০ টাকা দিয়ে এবং দক্ষ শ্রমিকদের সর্বোচ্চ মূল মজুরী ১০৭ টাকা মত; একজন কেরানীর মূল মজুরী মাসিক ৭০ টাকা। গোল্ডেন টোব্যাকোতে কোন ইউনিয়ন নাই।

৯। বৈদেশিক মুদ্রা—সহযোগিতা—কলেক্টরাল—

রয়ালটি—ট্রেড মার্ক—ব্র্যান্ড:

ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর কোন বৈদেশিক সহযোগিতার ব্যবস্থাপনা নেই, কিংবা নেই কোন কারিগরী কলেক্টরাল এবং/বা গুডউইলের চুক্তি। কাজেই, কোন অর্থই, তা সে টাকাতাই হোক বা বৈদেশিক মুদ্রাতেই হোক ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি-গুলো এই ব্যাপারে ব্যয় করে না। ট্রেড মার্ক বা ব্র্যান্ড ব্যবহারের জন্য ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো কোন রকম রয়ালটি দেয় না; এগুলোর মালিকানা ভারতের

ভারতীয় সিগারেট শিল্প

অর্জন করেছে। বিপরীত দিকে ১৯৬১ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যে একা গোয়েডেন টোব্যাকো কোং-ই দেশের আনুমানিক নীট ১-১৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি করেছে।

- (খ) ১৯৫৯ সাল ও ৩১-৩-১৯৭০ তারিখের মধ্যে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগণের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭৯.১৩ কোটি টাকা এবং ১৯৬৮ সাল ও ৩১-৩-১৯৭০ তারিখের মধ্যে প্রতি বছর গড়ে ১০ কোটি টাকা হিসাবে রপ্তানির পরিমাণ ছিল মোট ৩১.০৪ কোটি টাকা। ১৯৫৯ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যে গোয়েডেন টোব্যাকো কোং-এর রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৯৬১ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যে প্রতি বছর ২১ লক্ষ টাকার আমদানীর পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে মাত্র ৭ লক্ষ।
- (গ) ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগণের ব্যবসা যেমন বেড়েছে রপ্তানি আরও তেমন বেড়েছে। নীচের হিসেব থেকেই তা প্রতীয়মান হবে:

(কোটি টাকার হিসেবে)
১৯৫৯ ১৯৬৯

ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি-
গণের রপ্তানি টা. ৪.৮১ টা. ১০.৯৭
রপ্তানি ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো যে সাফল্য অর্জন করেছে তার জন্য দায়ী তার বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য।

- (ঘ) ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে গড় বার্ষিক আমদানীর হিসেব নিম্নরূপ:

আই-টি-সি গোয়েডেন

নিজস্ব ব্র্যান্ডের সিগারেটের
গড় বার্ষিক উৎপাদন—দশ
লক্ষ হিসেবে ২২,৯১৩ ৫,৩৪৫
গড় বার্ষিক আমদানী—
লক্ষ টাকার হিসেবে ১৩ লক্ষ টা. ২১ লক্ষ টা.

২। ভারতীয় মূলধন—ভারতীয় ইকুইটি

শেয়ারহোল্ডার

(কোটি টাকার হিসেবে)
আই-টি-সি জি-টি-সি

মূল বিনিয়োগ (প্রিমিয়াম
সহ) ৬.০০ ০.০৫
মূল্য থেকে ইস্যুকৃত
মূলধন/ইস্যু ১.৭৫

মোট টা: ৬.০০ টা: ১.৮০

মোট ভারতীয় ইকুইটি

মূলধন টা: ৯.১১ টা: ৩.৬৭
ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারের
সংখ্যা ২১৪৩০ ১৩/১৪

- (১) ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগণের বণ্টিত শেয়ারের সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে ৪০ লক্ষ টাকা। অপরপক্ষে, গোয়েডেন টোব্যাকো কোং তাদের ১৩/১৪ জন শেয়ার-হোল্ডারের মধ্যে সর্বশেষ হিসেবে দেখা যায়,

২৮.৯ লক্ষ টাকা বণ্টিত করেছে; এই শেয়ার-হোল্ডাররা (একজন বাদে) আবার একই পরিবার-ভুক্ত। সিগারেট শিল্পের অন্য যে কোন কোম্পানি থেকে ইন্ডিয়া টোব্যাকো ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বৃহত্তর পরিমাণে মূলধন বণ্টিত করেছে।

- (২) গোয়েডেন টোব্যাকো কোং-এর ১৩/১৪টি শেয়ার-হোল্ডারের ৪.৬৭ কোটি টাকার ইকুইটি/মালিকানা রয়েছে।

৩। পরিচালনা

ইন্ডিয়া টোব্যাকো সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত। ডিরেক্টরদের কার্যরই কোন মালিকানা স্বার্থ নেই।

- ৪। ক্রেতাদের অর্থের মূল্য দেয়—সবরকমের ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন-দের সেবা করে

- (ক) এখানে কতকগুলো প্রাসঙ্গিক অঙ্ক দেওয়া হলো:
১৯৬৭ ১৯৬৮ ১৯৬৯

আই-টি-সি আয়ের মোট

মূল্যফার % ৫.৫০ ৫.৫৯ ৫.৪০

জি-টি-সি আয়ের মোট

মূল্যফার % ৭.৮৫ ৭.৭৭ ৮.১১

- (খ) প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়টি স্মার্তব্য যে, ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগণের বিক্রয়ের ৪৮.৫% হচ্ছে নিম্নতম মূল্যের জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে, অপরপক্ষে গোয়েডেন টোব্যাকো কোং-এর এই শ্রেণীর বিক্রয়ের হার হচ্ছে মাত্র ১৩.৭%। কাজেই ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো ক্রেতাদের অর্থের অধিকতর মূল্য ও সেবা দেয়।

৫। আমদানী প্রতিরক্ষণ

- (১) এখানে উৎপাদনের এবং মালমসলা, স্পেন্সার পাট, মেশিনারি ইত্যাদি সহ সমস্ত রকমের আমদানীর একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হলো (লক্ষ টাকার হিসেবে):

চলতি গড় প্রতি দশ-
উৎপাদন আমদানী লক্ষ সিগা-
(দশ লক্ষে) ১৯৬১-৬৯ রেটে আমদানী

ইন্ডিয়া টোব্যাকো ২৮,৮০০ ১৩ লক্ষ ৪৫.১
গোয়েডেন টোব্যাকো কোং ৮,০০০ ২১ লক্ষ ২৬২.৫

- (২) ইন্ডিয়া টোব্যাকো হালে ১২/১৩ কোটি টাকা মূল্যের মালমসলা (তামাক সহ) ব্যবহার করেছে এবং মালমসলা মোট আমদানীর পরিমাণ বছরে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা। দেশে যেখানে সামান্যতম পরিমাণে কোন কোন জিনিস এখনও পাওয়া যায় না সেখানে দেশীয় প্রস্তুতকারকদের পক্ষে এটি সত্যি উৎসাহব্যঞ্জক।

(৩) মেশিনারি:

ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো দাবি করতে পারে যে, প্রাথমিক (টোব্যাকো প্রসেসিং) ও মাধ্যমিক (মেকিং/প্যাকিং), উভয় প্রকার মেশিনারি এবং স্পেন্সার পাটস সম্পূর্ণ এরই উৎসাহ ও প্রচেষ্টার ফলে এখন দেশেই পাওয়া যাচ্ছে। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো অর্থ, বিশেষজ্ঞ, কারিগরী কলাকৌশল, নিজেদের পেটেন্ট কারিগরী জরিফ/ব্রু প্রিন্ট দিয়ে, ম্যাশিনের ভিতরে ও বাইরে

ভারতীয় সিগারেট শিল্প

ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগলোই। প্রত্যেকটি গ্র্যান্ড ভারতেই তৈরী হয় এবং দেশে ব্যবহারের জন্য সরকার সিগারেট আমদানী করতে না দিয়ে নীচক কাজই করেছেন।

১০। কৃষি অর্থনীতি:

১৯২০ সালে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগলো ভারতে ভার্জিনিয়া স্ট্রু কিওর-করা তামাকের প্রবর্তন করে, চাষ শুরুর করে এবং তারপর দেশে ব্যবহারের জন্য ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে একক চাষীদের দ্বারা এর চাষের উন্নতিবিধান করে। সুতরাং, ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগলো ন্যায়-সঙ্গতভাবেই দাবি করতে পারে যে, তাদেরই পথপ্রদর্শন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের ফলে ভারত আজ শুরুর দেশীয় ব্যবহারের জন্য তামাকের ব্যাপারে স্বল্পমাত্রারই হয়নি, প্রচুর পরিমাণ তামাক তারা রপ্তানিও করে—দেশের অর্থনীতিতে স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে এটি একটি স্থায়ী ও অবিনশ্বর অবদান। তারা আরও যে সব কাজ করে যাচ্ছে তার মধ্যে আছে—

- (ক) নতুন নতুন এলাকার উন্নয়ন ও সেগলোর সম্প্রসারণ।
- (খ) যোগান দিয়ে, যথা ধারে সার দিয়ে, সাহায্য হিসাবে খাঁটি বীজের ব্যবস্থা করে (হালে বছরে প্রায় ৮,০০০ কেজি—১ কেজি ৪০ হেক্টরের পক্ষে যথেষ্ট), কল্লার সরবরাহ, কীটনাশক দ্রব্যাদির সরবরাহ দিয়ে, গোলাব মাগপত্র জুগিয়ে, সুদৃবহীন ঋণ দিয়ে ও ফসলের বীমা করে সাহায্যদান। এই সব কাজে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগলো বছরে ৪০ লক্ষের মত টাকা কাজে লাগাচ্ছে।
- (গ) সমগ্র মরসুমে ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকজন দিয়ে কৃষকদের ফিল্ড-সার্ভিস দান। পরিচালকমণ্ডলীর ১০৬ জন সদস্যই লীফ অপারেশনের কাজে বিশেষভাবে নিযুক্ত।
- (ঘ) বীজ উৎপাদন, প্ল্যান্ট ব্রীডিং/বাছাই, রোগ নিয়ন্ত্রণ, নতুন নতুন জাতের বিকাশসাধন, নতুন নতুন জাতের প্রবর্তন, সার, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ, কৃষি কাজকর্ম, জমি ও জলের বিশ্লেষণ ইত্যাদি সহ গবেষণা সার্ভিস। তা ছাড়া, কৃষকদের জন্য একটি বেশ ব্যাপক অ্যাডভাইসরি সার্ভিসেবও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি-অর্থনীতিতে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগলোর যে অবদান রয়েছে তা সরকারী মূলে সুপরিজ্ঞাত, অন্যেরাও তার প্রচুর প্রশংসা করেছেন।

১১। আন্তর্জাতিক পুরস্কার/জনসাধারণের প্রশংসা:

আমি এবিষয়ে গর্বিত যে, ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগলোই ভারতীয় সিগারেটের আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি স্থাপনের গৌরব অর্জন করেছে। ব্রুসেলসের মাদে সিলেকশনে বিভিন্ন বর্ষায় ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে তাদের তৈরী ইন্ডিয়া কিংস সিগারেট স্বর্ণপদক এবং ১৯৭০ সালে সিমলা ও উইন্ডসর উভয় সিগারেটই রৌপ্যপদক ও লেন্স সিগারেট ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

আমি এবিষয়েও গর্বিত যে, ভারতে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগলো যোগ্যভাবেই পুরস্কৃত হয়েছে। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগলো তাদের উদ্বোধনযোগ্য

রপ্তানি কাজকর্মের জন্য ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রক থেকে সার্টিফিকেট অফ মেরিট লাভ করেছে। তাদের রিপোর্ট ও অ্যাকাউন্টস-এর জন্য এ বছর নয়াদিল্লির ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া প্রথম পুরস্কার প্রদান করেছেন।

১২। মুনাকা—সামাজিক দায়িত্ব:

এই বছর ৬ই আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলাম:
“সুতরাং, আমি প্রথমত আপনাদের এই ধারণা থেকে অবশ্যই বিমুক্ত করবো যে, মুনাকার লক্ষ্যই আপনাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের প্রধান প্রেরণা। আমাদের কাজকর্মের প্রকৃত প্রতিদান, অর্থাৎ আমরা আমাদের সংস্থাকে যে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছি এবং শেয়ারহোল্ডাররা যে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তার ন্যায়সঙ্গত পারিতোষিক হিসেবে তাঁদের যে যথোপযুক্ত প্রতিদানের ব্যবস্থা করেছি সেই দিক বিচারেই আমরা মুনাকা (স্বল্পমোদী ও দীর্ঘমোদী) সম্পর্কে আগ্রহী। আবার আমরা সমগ্র সংস্থাটিরও কল্যাণ সম্পর্কে আগ্রহী, কারণ শিল্প হচ্ছে সমাজের এমন একটি অঙ্গ যার ওপর বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে সম্পদকে উৎপাদন-মূলক করে সুসংগঠিত আর্থনীয়িক অগ্রগতি সাধনের।”
পার্লামেন্টে গোয়েন্দা টোব্যাকো কোং সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে কোম্পানি সম্পর্কীয় বিষয়াবলীর ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৬৭/৬৮ সালে (এই সালের উদ্ভবপত্রই প্রাপ্তব্য সবচেয়ে আগেকার) গোয়েন্দা টোব্যাকো কোং-এর আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ১০ লক্ষ টাকা, অথচ এই কোম্পানির ৩০-৬-১৯৬৮ সালের উদ্ভবপত্রে দেখা যায় কোম্পানিটির পরিসংখ্য ছিল ১২.০৪ কোটি টাকার।

এ কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, গোয়েন্দা টোব্যাকো কোং-এর ক্রমবর্ধমান কুৎসামূলক প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে সেই সময়ে যখন দত্ত লাইসেন্সিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, মনোপলিঙ্ক আইন পাস হয়েছে এবং ভারতে বৈদেশিক পুঞ্জিনিয়োগ সম্পর্কে সরকারী নীতিব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি আমার এই একান্ত কামনা প্রকাশ করছি—এবং সর্বপ্রকার বিনয়ের সঙ্গেই আমি তা পুনরায় প্রকাশ করছি যে, বিভিন্নমুখী নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগলো ভারতের কল্যাণ ও তার সর্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে তাদের প্রতিশ্রুতির ন্যায়দর্শন্যতা সঙ্গতি রেখে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মর্যাদার সঙ্গে তাদের ভূমিকা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যাবে। ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগলো সবকারের আর্থনীয়িক ও শৈল্পিক নীতি অবিচলভাবে সমর্থন করবে। তবে এবিষয়ে নিশ্চিত দেওয়া প্রয়োজন যে, আবহাওয়ার সুযোগ নেওয়া হবে না, যেসব দায়িত্ব সবকারের উপর ন্যস্ত তা অন্যে গ্রহণ করবে না বাণিজ্যিক দঃসাহসীপনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য আমাদের দেশের আর্থনীয়িক অগ্রগতি ও বিকাশকে বিসর্জন দেওয়া হবে না।

গত ৩১শে অগস্ট, ১৯৭০ তারিখে নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান শ্রী এ এন হাকসারের প্রদত্ত বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার।

আনন্দময়ীর আগমনে

অঙ্গীকৃত

বাবোমারী চাঁদা



রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি লুপ্তরত্ন

[২১৬ পৃষ্ঠার পর]

উদ্দেশ্যও তো কোথাও দেখি নি। যাই হোক, লেখাটি যে রবীন্দ্রনাথের তার প্রমাণ আছে লেখাটিরই মধ্যে—আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হিসেবে। এবার সেই কথা বলি। ‘নিন্দাতত্ত্ব’ প্রকাশের বছর দুই আগে ভারতী পত্রিকায় কিশোর রবীন্দ্রনাথের একটি গদ্য রচনা বার হয় যা ছিল মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা। এই সমালোচনায় মেঘনাদবধ সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য করা হয়। তার মধ্যে একটি হল, ঐ কাব্যে রামচন্দ্র বারে বারে নিজেকে ‘ভিখারী’ বলেছেন সেই সম্পর্কে। উক্ত সমালোচনায় লেখা হয়—‘রাম সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। রাম যে কথার কথায় ‘ভিখারী’ রাম ‘ভিখারী রাম’ করিয়াছেন, সেগুলি আমাদের ভালো লাগে না; এইরূপে নিজের প্রতি পরের দয়া উদ্বেক করিবার চেষ্টা অতিশয় হীন প্রকাশ মায়। একজন দরিদ্র বলিতে পারে, ‘আমি ভিক্ষুক, আমাকে সাহায্য কর।’ একজন নিস্তেজ দুর্বল বলিতে পারে, ‘আমি দুর্বল আমাকে রক্ষা কর।’ কিন্তু তেজস্বী বীর সেরূপ বলিতে পারেন না; তাহাতে আবার রাম ভিখারীও নহেন, তিনি নির্বাসিত বনবাসী মাত্র।’

মেঘনাদবধের রামচরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে উক্ত মনোভাবের প্রতিফলন নিন্দাতত্ত্বের একস্থানে অত্যন্ত স্পষ্ট। আত্মনিন্দাকে বিনয়ের পরিচয় বলে ধরা উচিত নয়, এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাস্বরূপ লেখক বলেছেন, ‘আত্মনিন্দা ও বিনয় কেউ যেন এক পদার্থ মনে না করেন। বাঙলা এক মহাকাব্যে মহাকাব্যি রামের মূর্থে অনেক স্থলে ‘ভিখারী’ বলে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। যেমন ‘ভিখারী রাখব; মৃত্যু, বিদিত জগতে।’ বোধহয় কবি রামকে বিনয়ী করবার অভিলাষে এই রকম করে থাকবেন, কিন্তু আমরা একে বিনয় বলতে পারি। ‘আমি দরিদ্র’ একথা বিনয়ে বলা যেতে পারে, কিন্তু আমি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করি একথা বিনয়ের কথা নয়। দারিদ্র্য ঘোষণা নয়, কিন্তু পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ করবার রূচি মনের একটা বিকৃত অবস্থা। কেউ কখনো আমি মিথ্যাবাদী বা আমি জুয়াচোর বলে বিনয় প্রকাশ করে না।’

এখানে মেঘনাদবধ কাব্যকে লক্ষ্য করে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এবং যে তর্ক স্পষ্ট হানা হয়েছে তার মধ্যে মেঘনাদবধ-সমালোচক স্পষ্ট ধরা পড়েছেন। সুতরাং নিন্দাতত্ত্বের লেখক

শুভ্র অপরাধ

[১৭৭ পৃষ্ঠার পর]

গীতি এবার পাশ ফিরতে ফিরতে কিশিৎ আদর মিশ্রিত কণ্ঠে বলল—এসো না, একটু কাছে এসে বসো। মারাটা দিন একা একা থাকি, এত খারাপ লাগে। এতক্ষণে উঠল সে। ‘আন্তে আন্তে এগিয়ে গিয়ে দরজার হুকুকা তুলে দিতেই চমকে উঠল গীতি। মহম্মদে বুঝতে পারল এ তার স্বামী নহ।

লোকটি ততক্ষণে এক পা দু’ পা করে ক্রমশ এগিয়ে আসাছিল। গীতি প্রাণপণে চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু পারল না। পিঁপড়ে কণ্ঠ থেকে অক্ষুণ্ণ হাস্যরূপ চাপা আওয়াজ বেরোল শুধু। সে বাঁ হাতখানা টানটান করে বেড-সুইচ খুঁজল, পেলও। এবং মহম্মদে আলো জ্বলে উঠতেই লোকটির দিকে তাকিয়ে ভীষণ স্তমিত।

গীতি দেখল, যে মানুষটা সহসা মদ্য ঘুরিয়ে নিয়ে হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার গায়ের আলোয়ানটার রঙ অবিকল সুকুমারের নতুন কেনা আলোয়ানটার মতন।

রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

আমাদের আলোচনায় নিন্দাতত্ত্ব রচনাটির গুরুত্ব আশা করি পরিষ্কৃত হয়েছে। ভাবতে বিস্ময় লাগে লেখাটি অজ্ঞ ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপেক্ষিত হয়ে আছে। অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ঘটে থাকে। বহু রচনা লুপ্তরত্ন হিসেবে অবহেলিত থাকে, পরে অনেক ক্ষেত্রে তাদের উদ্ধার করা হয় এবং নব-মূল্যায়নে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

নিন্দাতত্ত্ব রচনাটিও একটি লুপ্তরত্ন। আশা করব আমাদের সুধীমণ্ডলী এ বিষয়ে অবহিত হয়ে রচনাটিকে উদ্ধার করবেন এবং এর যথাযোগ্য মূল্যে একে অভিষিক্ত করবেন।

নেপালীদের শারদোৎসব দর্শন-তিহার

[১৭৮ পৃষ্ঠার পর]

সারা রাত চল দস্যবের দস্যবে ঢেলা গাল।

কার্তিক মাসের শরদাপক্ষের প্রতিপদ্য দিন গোবর্ধন ও বলীপূজা করা হয়। এদিন আরম্ভ হয় দেওসী উৎসব। দেওসী সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত আছে। তবে বলী-রাজার আখ্যানটিই জনস্বীকৃতি পেয়েছে। গ্রীকসকে বলীরাজ বলেছিলেন তোমার পা রাখ আমাব শিরে, অর্থাৎ দাও নর—তার থেকেই এসেছে দেও-শিরে।

চান্দ-পাটজন বা তারও বেশি এক-একটি দল গৃহস্থ বাড়ির দরজার ভাসে। এবং জন মূল গায়ের, আর সবাই ধোয়া ধলে। দলনেতা লাঠি ঠুকে আশ্রয় করে—কিলিমিলি খিলিমিলি—অমোঘা সম্বরে বলে, দেও শিরে। এইভাবে চলতে থাকে ইচ্ছমত টেনে বাড়িয়ে বড় করা যায়। বড়ন এইরকম থাকে—শরৎকালের শূভ আকাশ, মেঘের ঢেউ, অনেক পথ হেঁটে তোমার কাছে এসেছি, নিজেরা আসি নি, বলীরাজা পাঠিয়েছেন—আমাদের দক্ষিণা দও—দু-চার টাকা তো ইন্দুরেও নিয়ে যান—তুমি রাজা-মহারাজা, আমাদের খুশি কর—বলীরাজাই তোমাদের ভাঙার ভরে দেবেন। কখনো দলেব সংগে মাদল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র থাকে, নাচের ব্যবস্থাও থাকে। শ্রমজীবী দিন ভাইটকা বা প্রাতঃস্মিতীয়া। দিদি ছোট-ভাইকে এবং ছোটবোন বড়ভাইয়ের কপালে দি-চন্দন ও কাঞ্চলের ফোঁটা দেয় এইভাবে সাঙ্গ হয় শারদোৎসব দর্শন-তিহার। পূজার্চনাব সংগে থাকে পাশাঢেলা, নাগর-ঢেলা চড়া, বেচাকেনা ইত্যাদি। দর্শন-তিহারের মধ্যমে ক্রান্ত জর্জরিত মনকে সম্বীযিত সন্তজ করে নেয় দার্জিলিঙের নেপালী জনসাধারণ।

বেনারসী সিন্ধু **গিণিসোনার গহনা**

ঠাট বস্ত্র ও ফ্যাণী সাজের **রোপের বাসনাদি**

আমূল্যবান **ও ডায়াল প্রহর**

স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী

২৩৩ বিধান সরণী (৩নং) কলি: ড., ফোন: ৩৪-৩৫৫২

সাত বছর পরে

[৬৪ পৃষ্ঠার পর]

অজ্ঞানতে কতবার যে তোমাকে প্রশ্ন করছি জানো না—

পটল গাঙ্গুলি বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না। হাঁ করে চেয়ে আছে।

—বেশ করেছ মেরেছ, তারপর বলো শুন—

—সেই দুর্বোলের দিনে সামনের গলির মুখে তোমার গাড়ি দেখেই মা-কে দেখতে বেরিয়েছিলাম আমি, তোমার চোখের ওপর দিয়ে বেরিয়েছিলাম কারণ আমি জানতাম তুমি এ সুযোগ ছাড়বে না।

বুই চক্ষু কিস্তারিত পটল গাঙ্গুলির।—তারপর?

—তুমি আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না জেনেও আমি সেদিন তোমার ওই গাড়িতে উঠে বসেছিলাম। আর তারপর—

আরো কি বলতে গিয়েও লক্ষ্যায় দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল অনসী। জোর করে মুখ থেকে তার হাত নামিয়ে দিল আর সেই সঙ্গে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল।—কি তারপর, বলো শিগগির।

—সেই বোমা আর গুলীর শব্দে আসলে আমি একটুও ভয় পাই নি। তোমাকে চিন্তা করতে দেখেই বরং আমার ভয় ধরেছিল।...তোমার মরে যাবার রাস্তা রাখব না বলেই ও-রকম করে তোমাকে জাপটে-জাপটে ধরেছিলাম। পটল গাঙ্গুলি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। মনে হতে লাগল, তার কালো বউয়ের মতো এত রূপ আর অন্তরের এত সম্পদ ব্যক্তি দুনিয়ার আর কোনো মেয়ের নেই।

ভূমিকম্প

[৪৮ পৃষ্ঠার পর]

প্রান্তে তিনকড়িও অতএব বসে গেল। এক টোকা পদ্মভূষণ রাজেন্দ্রলাল সমন্ত এবং তিনকড়ি গুই। জোর কপাল, তাই ভূমিকম্প। তিনকড়ি গোয়াসে গিলে নিচ্ছে।

ভূমিকম্প ধামল। অন্তর-আত্মীয়েরা পিলাপিল করে ঢুকে গেলেন, পদ্মভূষণ সামন্ত মশায়কে ঘিরে ধর্মযোগ্য আসন নিয়ে বসলেন তাঁরা। বাজনা বাজে। কামরা গমগম করছে। ভিনার অন্তে নিয়মমাফিক ভাষণ। রাজেন্দ্র কত গুণ ধরেন, নিমন্ত্রিতেরা একের পর এক বলে যাচ্ছেন। পঞ্চদশ বৃন্দ দুই কান ভরে শুনছেন।

জ্ঞান বৃক্ষের ফল

[৫৬ পৃষ্ঠার পর]

এই কলকাতা শহরই একদিন মার্কিন বা ব্রিটিশ ঘাঁটি হবে?

বাস্তববাদী যারা তাঁরা সকলেই জানেন যে, বিপ্লবের পরের দিন প্রতি-বিপ্লবও হবে আর উত্তরের মধ্যস্থত লক্ষ লক্ষ মানুষের মহতী বিনাশ ঘটবে। সেই মহতী বিনাশও একপ্রকার জুয়া-খেলা। খেলার শেষে হয়তো দেখা যাবে যে প্রতিবিপ্লবই জয়ী হয়েছে। অমন করে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়ে জুয়াখেলার অধিকার কি কোনো একটি দলের বা কোনো একটি প্রেরণীর আছে? অবশ্য এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ একভাবে না একভাবে মরবেই। তেমন এক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে বিপ্লবও একটা বিকল্প। জাপান যেদিন বর্মী দখল করে ভারতের দিকে পা বাড়ায় সেদিন যদি আমাদের বিপ্লবীরা বিপ্লব বাধাতেন তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরত, কিন্তু সে মরণ অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হওয়া সহজ হতো।...আমার জীবনে সেই একটিবার আমি সত্যিকার বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। সেদিন এগিয়ে আসেন গান্ধীজী। মার্জ কিংবা মারকুস না।

তেমন একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে হাতছাড়া হতে দিয়ে অসম্মে বিপ্লবের আবাহন করলে কি বিপ্লব আসবে? যদি আসেই তবে প্রতি-বিপ্লবও আসবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মরণের মুখে বাঁড়াবে। তখন কে জানে তারা কোন দিকে ঝাঁপ দেবে। প্রতিবিপ্লবের দিকেও ঝাঁপ দিতে পারে। যদি তাতে প্রাণ বাঁচে। এত বড়ো একটা দেশের সমস্তটাই রাতারাতি লাল হয়ে যাবে না। মানচিত্রের কতক অংশ লাল হলেও বাকী অংশ হলদে বা কালো হওয়া সম্ভবপর। পশ্চিমবঙ্গ কোণঠাসা হয়ে বৈশিদিন বিপ্লব রক্ষা করতে পারবে না। যদি না চান সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে ও সে আক্রমণ অপ্ৰতিরোধ্য হয়। তেমন কিছু ঘটলে মার্কিনও আক্রমণ করবে ও দেশ হবে যুদ্ধক্ষেত্র। ভগবান আমাদের সুসৃষ্টি দিন।

সকলের সর্বকচ্ছ এলা হয়ে গেলে রাজেন্দ্রের প্রতিভাষণ।

ঃ বসেই বসুন, আপনি সার। সামান্য থেকে ক্রম করে এত বড় হলেন। সবাই শুনতে চাচ্ছে, একেবারে না কপালে হবে কেন। দু-চার কথা বসুন অন্তত।

কিন্তু রাজেন্দ্র নির্লক্ষ্য গম্ভীর। শত অনুরোধেও একটি কথা বের করা গেল

গাছতলার খাঁটি দুধ

[২৪ পৃষ্ঠার পর]

আন্তে আস্তে বললাম, 'নিজে এক ফোটা দুধ খেতে পায় না, কুকুর-বেড়ালকে খাওয়াচ্ছে।'

'অনেক খেয়েছে দাদু, এই জীবনের নীলু দত্ত মানে ঐ বড়ো অনেক খেয়েছে।' যদি আমার দিকে চোখ তুলে আর একবার হাসল। 'আপনি তো পাড়শ নতুন এয়েছেন, মানুষটাকে জানেন না, দুধ খাবে কি, সারাজীবন মানুষের ঘাড় ভেঙে রক্ত চুষে খেয়েছে বেটা।'

সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। একটু পরে ঢোক গিলে বললাম, 'মানুষটার আর আছে কে?'

'ঐ যে।' যদি থুতনি নেড়ে দেখাল, 'পাশাপাশি চারটে নতুন বাড়ি পেছনে ফেলে এলেন, সব বড়োর, চার ছেলেকে চারটে বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে, রোজ দেখেন তো দুপুরে ভাঙ হাতে করে কদমতলায় বড়োর ছেলেরা-রোজ দুধ নিতে আসে।'

আর একবার চুপ থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের চমৎকার বাড়িগুলি দেখলাম। একটু ভেবে নিয়ে যদিও দিকে চোখ ফেরালাম।

'কালোবাজার ব্যবসা-টেবসা আছে ব্যাধি লোকটার?'

'হু, তাও আছে,' যদি মাথা ঝাঁকাল, 'তা ছাড়া সারাজীবন সুদী কারবার করেছে যে নীলু-দত্ত।'

'কিন্তু নিজের এই অবস্থা কেন, ছেঁড়া জামা, খালি পা, বিস্তর মতল একটা ঘরে আছে?'

'ঐ তো মজা দাদু।' যদি আর হাসল না। 'যে উপায় করে সে ভোগ করতে পারে না, নিজের জন্য সাড়ে তিন টাকা দামের একটা জামা কিনতেও বৃক টাটের, প্রপে কষ্ট লাগে।'

'আজ এত চোখের জল ফেলছে কেন বড়ো।'

'বাসস্তীর তিনটে বাচ্চার মধ্যে একটা আজ অকালে মরে গেছে। সেই শোকে নীলু দত্ত কাঁদছে।'

হৃদয় ঘেঁষা রং। সম্ভবতঃ এই কারণেই কুকুরটার বাসস্তী নাম রাখা হয়েছে। মনে মনে হেসে ঘাড় ফিরিয়ে আবার টালির ঘরের দাওয়ার দিকে চোখ রাখলাম।

না। ভূমিকম্প ধামতেই তিনকড়ি ফুড়ুত করে বেরিয়ে নিজস্থানে বসেছে। বর্ষা-পূর্ব সেখান থেকে কাতরানি আসছেঃ অশ্ব-নাচার বাবা, দুটো নরাপয়সী দিয়ে যান—

সূর্যতামসী

[৪৭ পৃষ্ঠার পর]

কেউ রেজিস্ট্রেশন অফিসে উপস্থিত ছিল না।

বিবাহ হয়ে গেল। ওরা তিন জনে অসীমার বাড়িতে এল। একটা বিলাতী হোটেলের তিনটে ডিসের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। তিন জনে মিলে সেগুলির সম্ভাব্য ব্যবহার করলে। প্রচুর হাসি, প্রচুর আনন্দ। বাসরঘর হল অসীমার শয়ন-কক্ষ।

তারপরের দিন অসীমা শব্দরবাড়ি গেল। ডাঃ মহলানবীশের অবিবাহিতের সৎসারে কোন গোছগাছ ছিল না। নলিনী গিয়ে গোছগাছ করলে। এবং রায়ে নবদম্পতীর সঙ্গে আহ্বারাদি করে নলিনী রাত নটার মধ্যে বাড়ি ফিরে এল।

ফুলশয্যার রাতে উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা হল :

অসীমা বললে, তোমাকে একটা কথা বলা হয় নি। কেন বিশ্বতোষ আমাকে ত্যাগ করেছিল?

—আমি জানতে চাই না।

—না. তার দরকার আছে। তোমাকে শুনতে হবে। বিলেত থেকে আমি ধূমপানের অভ্যাস করে আসি। বিশ্বতোষ নিজে ধূমপান করত বটে, কিন্তু স্বয়ীলোকের ধূমপান পছন্দ করত না। স্বামীব অধিকার নিয়ে সে হুকুম করলে, আমাকে ধূমপান ত্যাগ করতে হবে। আমি তাতে রাজী হই নি। এই হল বিচ্ছেদের ইতিহাস। তোমার মত কি বল?

ডাঃ মহলানবীশ হেসে উত্তর দিলেন, বিবাহ ত' হয়ে গেছে। এখন আমার মতামতের মূল্য কি? তবে আমি এই-জন্যে তোমাকে ত্যাগ করব না।

অসীমা বললে, বেশ। তারপরে দু' নম্বর, আমি পতির পরসেবা করবার মত মেয়ে নই। সেটা আশা করো না।

—বেশ, তাও করব না।

—ধন্যবাদ। তারপরে তিন নম্বর. আমি বিবাহ করলাম বটে, কিন্তু আমি আমার বাড়িতে থাকব, তুমি তোমার বাড়িতে থাকবে।

ডাঃ মহলানবীশের মুখ মলিন হল। বললেন, এটা বাড়িবাড়ি হচ্ছে না?

অসীমা বললে, বাড়িবাড়ি হয়ত একটু হচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্যের থেকে বাঁচবার জন্যে এই বাড়িবাড়িটুকু আমাদের দু' জনকেই সহ্য করতে হবে। আমি চাই না, এখনি আমাদের বিয়ের কথাটা জানাজানি হয়ে যাক।

—কোনদিন কি কাউকে জানাব না? চিরদিন গোপন থাকবে?

—না, ততখানি আশা করি না।

করবার কারণও নেই। 'ডাইভোর্স' কেস করলাম, তারপরেই বিয়ে। লোকে বলবে, ডাইভোর্সটা বিয়ের জন্যে।

—প্রথম দিনেই মনোমালিন্য ভাল নয়। আমি মনোমালিন্য করতেও চাই না। যা বলছ, তাই হবে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আমরা কেউ কারো অযোগ্য নই। তবে লক্ষ্যটা আসছে কোথেকে?

—সে তুমি বুঝবে না। মেয়েমানুষ হলে বুঝতে।

এ ব্যবস্থায় ডাঃ মহলানবীশের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাঁর চাকরী নেই। দু' বাড়ির দেখাশুনা করতেও হয় না।

অসুবিধা বিশেষ করে অসীমার। ভোরে উঠে তাকে ডাঃ মহলানবীশের

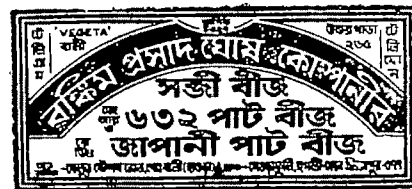
বাড়ি থেকে হাসপাতাল যেতে হয়। হাসপাতালের কাজ করে নিজের বাড়ি। সেখানে খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম করার পরই ডাঃ মহলানবীশ আসেন। দু' জনে একটু বোড়িয়ে এ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে ডাঃ মহলানবীশের বাড়ি যান। সন্ধ্যার আহ্বারটা বেশির ভাগ ডাঃ মহলানবীশের বাড়িতেই হয়।

'কল্' থেকে ফিরে এসে ডাঃ মহলানবীশের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় বাড়িতে অসীমা থাকে। কিন্তু অসীমা থাকে না। বললে বলে, 'কল্' থেকে ফিরে তুমি এই বাড়িতে এসো। তাহলেই আমাকে পাবে।

ডাঃ মহলানবীশ বিরক্তভাবে বললেন, কোনটা আমার বাড়ি?

—দু'টাই।

—না। শাস্ত্রমতে আমার বাড়িটা



তোমার বাড়ি, তোমার বাড়িটা আমার বাড়ি নয়।

—কেন?

—কেন তা জানি না। শাস্ত্র নিয়ম করে দিয়েছে স্ত্রী বধূ স্বামীর অধিকার নেই।

অসীমা হেসে বললে, শাস্ত্র খুব ভাল ত।

—হ্যাঁ, খুব ভাল। আমি ভাবছি, দিল্লী-লাহোর করব কতকাল।

—দিল্লী-লাহোর তুমি আর কোথায় করছ? আগারাই করার কথা, করছিও।

ডাঃ মহলানবীশ জিজ্ঞাসা করলেন, এই তোমার ভাল লাগছে?

—হ্যাঁ, খুব ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, বিয়ে হয় নি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, হয়েছে। দুই অবস্থার আশ্বাস করতে পারছি।

—বেশ, প্রাণভরে আশ্বাস কর। এখন মনে হচ্ছে, তোমার চাকরীটা গেলেই ভাল হত।

হেসে অসীমা বললে, তুমি সেই তালে আছ নাকি?

—নেই। তবে সুযোগ এলে থাকব ভাবছি।

অসীমা হেসে বললে, তুমি সর্বশেষে লোক।

নলিনী চা-খাবার নিয়ে এল।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, এইমাত্র খাবার খেয়ে এলাম।

—এ বাড়িতেও হোক একটু। 'দুটো বাড়ি' থাকার এই ত' সুবিধা। বলে নলিনী খাবারের প্লেটটা ডাঃ মহলানবীশের দিকে এগিয়ে দিল।

ডাঃ মহলানবীশ বললেন, আবার অসুবিধাও আছে নলিনী।

—কি অসুবিধা?

—এ বাড়ি ভাঙতে পারে, ও বাড়িতে খেয়ে এসেছি। ও বাড়ি ভাঙতে পারে, এ বাড়িতে খেয়ে এসেছি। গাণ্ডগোলে খাওয়াই হল না।

ডাঃ মহলানবীশ হা-হা করে হেসে উঠলেন। সেই সঙ্গে অসীমা এবং নলিনীও।

ডাঃ মহলানবীশ জিজ্ঞাসা করলেন,

পোল্ট্রী (ত্রৈমাসিক)

(হাঁস মুরগী পালনের একমাত্র বাঙলা মুদ্রণ)

পোল্ট্রী পুস্তক সংখ্যা (কার্তিকের পরবর্তে) ৬।১০।৭০ তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যার মূল্য ২.৫০ পয়সা (ডাক খরচ ১.২০ পয়সা) পৃষ্ঠা=২০০

প্রাপ্তিস্থান :-

(১) ৫০।এ সুরিন লেন, কলিকাতা-১৪

(২) ৪৬।এ আচার্য জগদীশ বসু রোড কলিকাতা-১৪

আছে নলিনী, তুমি বলত, দুটো এস্টেবলিশমেন্ট রাখার মানে হয়?

নলিনী বললে, দুটো এস্টেবলিশমেন্ট ভাবছেন কেন?

—ত' কি ভাবব?

—ভাবুন একটা নিজের বাড়ি, একটা 'শ্বশুরবাড়ি'।

—ভাবব কি করে? শালী-শালা না থাকলে 'শ্বশুরবাড়ি' মানায়?

অসীমা বললে, শালী-শালা নেই আবার কি? নলিনীনি রয়েছে। সেই ত' শালী।

তিন জনেই হেসে উঠল।

ডাক্তার পাঁচ বাড়ির চিকিৎসা করেন। রোগ সারান। কিন্তু নিজের বাড়িতে চিকিৎসা হয় না। করুণা পাঁচ-ছ' দিন ধরে জ্বরে ভুগছে। সে অবশ্য স্বামীকে ক্লিষ্ট বলে নি। মেয়েরা বলেও না। কিন্তু তার শরুকো মূখ এবং ছলছল চোখে দুটি বিশ্বতোষের চোখে পড়া উচিত ছিল। এমন কি সে যে বিশ্বতোষের সঙ্গে যাচ্ছে না, তাও লক্ষ্য করল না। লক্ষ্য রাখন করলে, তখন রোগ অনেকখানি পেকে গেছে।

তখন বিশ্বতোষ করুণার গায়ে হাত দিয়ে এবং তারপর থার্মোমিটারে টেম-পারচার নিয়ে বলে উঠল, এ কি করেছে। এ ত' একদিনের অসুখ নয়।

করুণা হাসলে।

'বিশ্বতোষ' জিজ্ঞাসা করলে, কতদিন জ্বর হয়েছে?

করুণা উপেক্ষাভরে বললে, কে জানে কতদিন!

বিশ্বতোষ বললে, শোও, শোও। আর ঠান্ডা লাগিও না। বলে তার একজন ডাক্তার বন্ধুকে টেলিফোন করলে। কি বললে, করুণা তা বুঝতে পারলে না। ডাক্তার তখন এসে পড়ল। তারপরে আরম্ভ হল যমে-মানুষে লড়াই।

দু-একদিন পবে বিশ্বতোষ হাস-পাতালে যাওয়া বন্ধ করলে। এবং পাটনার সবচেয়ে বড় যে ডাক্তার, তাঁকে কল দিলে। মর্শকিল হল, করুণার ছোট-ছেলেটিকে নিয়ে। মাত্র দু' বছর তার বয়স। মাকে ছেড়ে থাকে না। তার পরিচর্যা করতে বিশ্বতোষ হিমসিম খেতে লাগল। তার অবস্থা দেখে দাই নিজেই ভার নিলে। কিন্তু বিশ্বতোষ ঠিক বেঁচে গেল না। থোকন বাপের জ্ঞানও মাঝে মাঝে কাঁদে। বিশ্বতোষকে তখন ছেলেকে সঙ্গ দিতে হয়। আবার এসে রোগিণীর শিয়রে বসতে হয়।

মাঝে মাঝে মর্শকিল হয়, থোকা একটু ফাঁক পেলেই মায়ের ঘরে এসে উপস্থিত হয় এবং বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে 'মা, মা' করে কাঁদতে থাকে। তখন তাকে সে ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া

একটা দরসাখা ব্যাপার। দাই পারে না, বিশ্বতোষ নিজে নিয়ে যায় এবং অনেক করে ছুটিয়ে দাইয়ের কোলে দেয়।

রোগ বাঁকা পথ ধরেছে। দিন রাত্তির অধিকাংশ সময় করুণা জ্বরে বেহুশ হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারায়, তখন চক্ষমক করে চারিদিকে চায়। বিশ্বতোষের জ্ঞান, না থোকনের জ্ঞান, না উভয়ের জ্ঞান, কে জানে। তখনই আবার চোখে পাতা বুজছে আসে।

কখনও কখনও থোকনকে করুণার কাছে দিতে হয়। আশ্চর্য, থোকন খানিক পরে বায়না ধরে মায়ের কাছে যাবার জন্যে।

রোগিণীর ঘরে-বাইরে একটা ভিড় সব সময়ে থাকে। বোশির ভাগই বোশিগীর পিতৃগৃহের লোক। বিশ্বতোষের শাসুড়ী যদি থোকনের ভার নিতে পারতেন, বড় ভাল হত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে থোকনের বিশেষ ভাব নেই। করুণা বাপের বাড়ি যেত খুবই, থোকনকেও নিয়ে যেত, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার জন্যে। আবার ফিরে আসত। সুতরাং ভাব হবার অবসর হয় নি।

মোট কথা, রোগিণীকে নিয়ে বিশ্বতোষ যত বিবত, থোকনকে নিয়ে তার চেয়েও বেশি। থোকনকে না দেখতে পেলেও রোগিণী ব্যস্ত হয়। চারিদিকে চায়। চোখের কোণ বেয়ে জল পড়ে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে, 'থোকন নেই?' আবার দেখতে পেলেও থোকন মাঝে মাঝে এমন করে যে, করুণার কণ্ট হয়। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে। কখনও বা হার্টফেল হবার মত হয়।

ডাক্তার বলেছেন, থোকনকে তিন বার করুণার শয্যাপার্শ্বে নিয়ে আসা যেতে পারে। সকালে একবার, দুপুরে একবার ও সন্ধ্যায় একবার। তাহলে রোগিণীও সুস্থ থাকবে। থোকনও সুস্থ থাকবে।

এরপর করুণার বিকার আবম্ভ হল। আবেল-তাবেল বকে। আর মাথার চুল ছেঁড়ে। শেষের দিকে, কি জানি কেন, তার বুলি হল, দাঁদ, দাঁদ।

দাঁদটা কে কেউ বোঝে না। করুণার মা-বাবা পর্যন্ত অবাক। দাঁদ আবার করুণার কোষেকে এল? বিশ্বতোষকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে জানি না।

একদিন বিশ্বতোষের দুটি হাত ধরে করুণা বললে, আমি আর বাঁচব না গো। দাঁদকে দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। তাকে একখানা টেলিগ্রাম কর।

কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিশ্বতোষ বিরক্তভাবে বললে, সে আসবে না।

করুণা বললে, ঠিক আসবে। তুমি টেলিগ্রাম করে দেখো। আমি দেখতে চাইছি শুনলে নিশ্চয় আসবে।

তিন-চারদিন গেল। এ কদিন করুণা দিদির কথা বললে না। বিশ্বতোষ ভাবল, ভালই হল। ভুলে গেছে।

তারপরে কিছু আবার শব্দ হলঃ দিদি, দিদি। সুর এবারে আরো করুণা। কাতরানির মত। মনে হচ্ছে, করুণার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে দিয়ে কাদছে। সে কাতরানি বিশ্বতোষ আর সহ্য করতে পারল না।

বিশ্বতোষ অসীমাকে একটা টেলিগ্রাম করলে, আর্জেন্ট টেলিগ্রামঃ করুণা মৃত্যু-শয্যা, তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে। অসম্ভব না হলে এস।

বিশ্বতোষ টেলিগ্রাম করে দিয়ে তার বিবেককে সান্ধনা দিলে। সান্ধনা দেওয়া ছাড়া আর কি। ক' মাস আগে যে ডাই-ভোস' মামলা এনেছিল, সে কোন কারণেই তার ভূতপূর্ব স্বামীর বাড়ি আসতে পারে না। বিশেষ, তার সতীনের দেখার জন্যে, যে সতীনের কখনও চোখে দেখে নি, কয়েকটা চিঠির আদান-প্রদান করেছে মাত্র।

করুণা একদিন জিজ্ঞাসা করলে, দিদির টেলিগ্রাম করেছে?

—হ্যাঁ।

—টেলিগ্রামের জবাব এসেছে?

জবাব আর কি আসবে? বিশ্বতোষ জানে যে, টেলিগ্রামখানা পেয়ে অসীমা হাসাহাসি করেছে। বললে, না, জবাব আসে নি।

কিন্তু করুণা এই জবাবে দুঃখিত হল। বললে, আসবে দেখো।

এবং সত্য-সত্যি টেলিগ্রাম এল। অসীমার টেলিগ্রাম। লিখেছে, কাল দিল্লী এক্সপ্রেসে পাটনায় পৌঁছাচ্ছি। স্টেশনে উপস্থিত থেকো।

বিশ্বতোষ টেলিগ্রাম পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে উঠল। করুণার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলতে লাগল, শুনছ, তোমার দিদি আসছে। কাল দিল্লী এক্সপ্রেসে। আমি, স্টেশনে আনতে যাব।

কথাগুলো করুণার কানে গেল কি না বোঝা গেল না। সে আপনমনে খানিকটা বিড়বিড় করলে।

বিশ্বতোষের ট্রাইভারটা একটু বাবু। সে পরিষ্কার জানিয়ে দিলে, অত দূরে সে থাকে। ভোর পাঁচটার ট্রেন এ্যাটেন্ড করতে পারবে না।

বিশ্বতোষ তাকে কিছু বললে না। নিজেই গাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হল।

পরদিন ভোরে যখন সে স্টেশনে পৌঁছল, গাড়ি আসার তখনও খানিকটা দেরি আছে। তখনও সূর্য ওঠে নি।

একটু ফিকে অন্ধকার আছে। গাড়ি যখন এল, তখন বিশ্বতোষের বুকের ভিতরটা একটা অজ্ঞাত কারণে চিপচিপ করছে। অনেকদিন দেখে নি। চিনতে পারবে কি না সন্দেহ।

চলতে চলতে দেখলে একটা ফাস্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে একজন স্ত্রীলোক। পায়ে কাছের একটা সুটকেশ নামানো। কাছে যেতে সেই মহিলাটি হাসল, বিশ্বতোষও। পরস্পর পরস্পরকে চিনেছে। না চেনবারও কোন কারণ ছিল না।

অসীমা জিজ্ঞাসা করলে, আমরা চিনতে পারলে?

—যখন বাড়ি থেকে বেরুই, তখন ভয় হয়েছিল। ঠিক চিনতে পারব ত? কাছে এসে দেখলাম, তোমার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। খালি একটু স্থূল হয়েছ।

—তোমার ত' সেটুকু পরিবর্তনও হয় নি।

বিশ্বতোষ অসীমার সুটকেশটা হাতে তুলে নিয়ে চলতে লাগল। পাশে অসীমা। অসীমা জিজ্ঞাসা করলে, করুণা কেমন আছে?

বিশ্বতোষ বললে, ভাল বোধ হচ্ছে না। দু' জনেই গাড়িতে এসে বসল।

দু' জনের কেউ একটা কথা বললে না। বাড়ির কাছ বরাবর আসতে অসীমা জিজ্ঞাসা করলে, ওইটে তোমার বাড়ি, না?

বিশ্বতোষ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ। কি করে বুঝলে বল ত?

—বারান্দার ঘাঁরা বসে আছেন, তাঁদের মুখ দেখে।

বিশ্বতোষের ইচ্ছা ছিল, মুখ-হাত ধুয়ে সূক্ষ্ম হয়ে অসীমা করুণার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু অসীমা জেব ধরলে, করুণার সঙ্গে দেখা না করে সে কিছুই করবে না।

বিশ্বতোষ হাঁকলে, কে এসেছে, দেখ করুণা।

করুণা চোখ মেলে চাইলে। তার মুখে একটুকরো বিষম হাসি ফুটে উঠল। শীর্ণ একখানি হাত অসীমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলে। আর চোখের দুই কোণ বেয়ে দু' ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় খোকন ধূপধূপ কবে এসে অসীমার দুই হাটু জড়িয়ে ধরলে। অসীমা তাড়াতাড়ি ওকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেলে। করুণা সে দৃশ্য দেখে হাসলে।

অসীমা সুটকেশ থেকে বিস্কুট, লজেন্স, অরেঞ্জস, জ্বির বই বের করে খোকনের হাতে দিলে।

অসীমাকে দেখতে ঘরের মধ্যে অনেক লোক ছুটে গেল। খোকন বিরত হল।

তার মাসীমাকে একটোচুয়া করে রাখতে চায়। সে বললে, 'মাসী ওঠ।'

দাইও এসে বললে, গোসল ঘরে আপনার জল দেওয়া হয়েছে। এসে চা খাবেন? না চা খেয়ে খাবেন?

অসীমা তখন বিরত। প্রথমত, খোকনকে নিয়ে। তাবপবে উৎসুক জনতাকে নিয়ে।

জিজ্ঞাসা করলে, চা হয়েছে?

দাই বললে, হ্যাঁ, দিদিমণি। আনব? অসীমা বললে, হ্যাঁ, আন।

আর একদিন।

বিশ্বতোষ আজকেও গাড়ি নিয়ে স্টেশনে এসেছিল। সমস্ত পথ কেউ কোন কথা বলে নি। বাড়তির মধ্যে খোকন, অসীমার কোলে। বিশ্বতোষ খোকনকে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাচ্ছে?

—কলকাতা।

অসীমা বললে, খোকনকে হেড়ে থাকতে প্রথম প্রথম তোমার খুব কষ্ট হবে। কিন্তু কি করা যায়? দাই-এর জিম্মায় ছেলে ছেড়ে আসতে আমার মন সয় না। তাছাড়া খোকনও আমাকে ছাড়ছে না। তুমি মাঝে মাঝে যাবে। গিয়ে খোকনকে দেখে আসবে।

বিশ্বতোষ কিছু বললে না।

প্ল্যাটফর্মের বাইরের দিকে নিঃশব্দ চেয়ে রইল। বোঝা যাচ্ছিল, যন্ত্রণায় তার বুকের ভিতরটা যেন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

হুইশল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল।

ঠুক ঠুক করে বিশ্বতোষ তার গাড়িতে এসে বসল।

করুণা এখন কত দূরে?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—ঋষি দাস	৮-০০
প্রবীণের রূপকথা—ঋষি দাস	৩-০০
বিদেশী গল্প সম্ভ্রম—শিববাম চক্রবর্তী	৩-০০
তেরো পার্বনের গল্প—অমরনাথ বার	২-০০
১। ব্রহ্মচারী অরুণচৈতন্য ৥	
ভাগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	৭-০০
স্বামী অভয়ানন্দের জীবনী ও বাণী	৫-০০
২। ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ৥	
ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	৫-০০
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	৫-০০
ভাগিনী নিবেদিতা	২-৫০
বাবা খান—ঋষিদাস	৬-০০
গল্প বলি গল্প শোনো—শিববাম চক্রবর্তী	৩-৫০
বিদেশী গল্প-সম্ভ্রম	৩-০০
গল্প বলি গল্প শোনো—উপেন্দ্রকিশোর	
রাবচৌধুরী	৩-৫০
গল্প বলি গল্প শোনো—প্রমোদ মিত্র	৩-৫০
গল্প বলি গল্প শোনো—মনীন্দ্র দত্ত	৩-৫০

অ শো ক প্র কা শ ন
এ-৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা বারো

এসে যেত। ১০ নভেম্বর, ১৮৯৫-তে মারহাট্টা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি অতীব চিত্তাকর্ষক সংবাদ এখানে পরিবেশন করতে পারি। মিস মিরিয়াম সিংগলটন নাইট নামক ইংরেজ মহিলা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রতিভার দিক দিয়ে স্যার ওয়ালটার স্কটের চেয়ে বড় বলাতে লন্ডনের ডেইলি নিউজ পত্রিকায় কৌতুক-বিদ্বেষের লক্ষ্য হন। মিস নাইট বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইল ও বিষয়বস্তুর ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন। বঙ্কিমের বিষয়ে 'জৈনিক বাবু' বলেছিলেন, তিনি 'বাংলার ওয়ালটার স্কট'। মিস নাইট বলেন, ওয়েভারলি নভেলের একদা-প্রশংসিত লেখককে এখন পতাকা নামিয়ে দিতে হবে বঙ্কিমের কাছে, যিনি, 'হায়, এ জগতে আর নেই।' মিস নাইট বলেছিলেন, বঙ্কিমকে স্কটের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁকে উপরে তোলা হয় না, বরং কিছুটা নামানো হয়। "চ্যাটার্জির প্রতিভা স্কটের তুলনায় উচ্চস্তরের।" "চ্যাটার্জির উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং বর্ণনাক্ষমতা স্কটের তুলনায় উচ্চাঙ্গের।" "নারীচরিত্র চিত্রণে চ্যাটার্জির স্থান সর্বোচ্চ।"

এইসব উচ্চ প্রশংসা ইংরেজের পক্ষে হজম করা শক্ত। সুতরাং ডেইলি নিউজ মন্তব্য শব্দ করেছিল বিদ্বেষের সুরে, বিপ্লব বিষাদের সুরেও : "হিজ হাইনেস রণজিৎ সিংহজী পরে নভেলের ক্ষেত্রে প্রাচ্য প্রতিভার বিজয় আর যথেষ্ট বিস্ময়কর ঠেকবে না। একজন রাজপুত্র যদি ক্রিকেটে আমাদের মাস্টার হয়ে উঠতে পারে তাহলে একজন বাবুও রোমান্সের কম কঠিন শিল্পে আমাদের পরাভূত করবে, এ আর এমন কি?" বঙ্কিমের উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রসঙ্গে পত্রিকাটি স্কটের অনেকগুলি চমকপ্রদ ঘটনাবলি নভেলের উল্লেখ করে বলেছিল—বঙ্কিমের উদ্ভাবনী ক্ষমতার সৃষ্টি যদি এদের পরাভূত করতে পারে তাহলে অবশ্যই তা উচ্চস্তরের এবং নারীচরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমের স্থান সর্বোচ্চ হবে অবশ্যই উইলিয়ম শেক্সপীয়ার 'গল্ডার রাজহংসের সামনে মাথা নত করবেন।' মিস নাইট বলেছিলেন, বঙ্কিম সরে গেলেও তাঁর ধারায় কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিক আবির্ভূত হয়েছেন—ডেইলি নিউজ ছদ্ম দৃষ্টিতে বলল, "সুতরাং যেচারা স্যার ওয়ালটার স্কট যেমন খাতানি খেয়েছেন, সেইভাবেই মার খাবেন মিস অস্টেন।" তবে ব্যাপারটা সত্যি তো! বঙ্কিমের যে-সুটি মাস্টারপিস মিস নাইট ইতিমধ্যেই অনুবাদ করেছেন, তার

ইউনিভার্সিটি আম'স হোটেলে, ২১ নভেম্বর, ১৮৯৬ তারিখে। ভারতীয় ও ইংরেজের যুক্ত সভা। রীতি অনুযায়ী অনেক 'টোস্ট' প্রস্তাবিত হয়েছিল এবং তাকে সমর্থনও করা হয়েছিল। রাজা-রাণীর স্বাস্থ্য পান' ও 'মাংস ভোজন', রণজিৎ ও চ্যাটার্জির নামে প্রি-চিয়ার্স এবং সম্ভবত গীত 'গুড ওল্ড রণজিৎ, গুড ওল্ড চ্যাটার্জি'—রীতিমত সবই ঘটেছিল এবং অনেকগুলি বহুতাও হয়েছিল।

এই সকল সংবাদ আমরা পেয়েছি, কিন্তু বিবেকানন্দের সঙ্গে রণজির ব্যক্তিগত আলাপ হয়েছিল কি না, যদি হয়ে থাকে তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে কিভাবে দেখেছিলেন, তার কোনো বিবরণ আমরা সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে পাই না—পাওয়া সম্ভবও নয়। অন্য কোনো সূত্র থেকেও ঐ বিষয়ে কোনো সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় নি। যদি আলাপ হয়ে থাকে এবং ব্যক্তিমানুষ হিসাবে বর্ণনা যদি বিবেকানন্দকে খুশি করেও থাকেন, রণজির রাজ-নৈতিক ধারণা অবশ্যই বিবেকানন্দকে আনন্দিত করে নি। ভোজসভার ভারতীয় বক্তারা স্তুতিতে ভারিবে দিয়েছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে। জনৈক এন এইচ এন মোদী 'ভারতের জন্য ইংরেজ কোন মঙ্গল করেছে'—তা বলতে গিয়ে কৃতজ্ঞতায় একেবারে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন এবং এক ভাবী মহাদিনের কম্পনায় তাঁর কণ্ঠ স্বনাতুর্ভব হয়ে উঠেছিল : "সে হবে এক গৌরবের দিন যখন ভারতবর্ষ

দ্বারা মিস নাইটের উচ্চভাষণ অপ্রান্ত প্রমাণিত হবে তো! রণজিৎ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্তু সবাই কি বর্ণিত?

"One of his (Bankim's) masterpieces Krishna Kanta's Will translated by Miss Knight herself, is in existence, and The Poison Tree has also been rendered into our language. Whether the world at large will admire them as much as does the lady who translates them, remains to be seen. Is Bankim Babu really the Ranjit Sinhji of romance, or does his skill correspond to that of the Spanish gentleman famed as 'the best cover-point south of the Pyrenees?'"

বিবেকানন্দ, রণজি, জগদীশ বসু

[১৬-শতাব্দীর পর]

আমোদপ্রমোদের শক্তিময় প্রকাশের দ্বারা পরিচিত। আমি এই দেখে উল্লসিত যে, আমার দেশবাসী আলস্যসূচিকারী খেলা ছেড়ে ফুটবল খেলছে।" কলকাতায় এবং বাংলা দেশের অন্যত্র ফুটবলের ক্রমপ্রসার ও জাতির শরীরগঠনে তার মূল্য সম্বন্ধে চমৎকার একটি চিঠি বেরিয়েছিল 'রইন্ ও রায়' পত্রিকার ২৯ অগাস্ট, ১৮৯৬ সংখ্যায়। পরলেখক মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের সদস্য বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি লেখেন: "ফুটবলদৈত্য কলকাতাকে অধিকার করে ফেলেছে। ভাল হোক, মন্দ হোক, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, বর্তমানে ফুটবল যতখানি আগ্রহের সৃষ্টি করেছে অন্য কিছু তা করতে পারে নি। কোনো পরিষ্কার বিকল্পবেলার ময়দান যে-প্রাণবন্ত রূপ ধারণ করে, তা পথচলুতি দর্শককেও চমৎকৃত না করে পারবে না। যতদূর দেখা যায়, সম্ভাব্য সকল স্থানই ফুটবল মাঠে রূপান্তরিত হয়েছে। ময়দানের মাঠগুলি প্রতিদিন কর্মবস্ত্র-বাস্ত্রধারী যুবকের দল চামড়ার বলে লাথি লাগাচ্ছে—খেলোয়াড় ও দর্শকদের তাতে যা উৎসাহ তা দেখে বুক ভরে যায়।" বাঙালী তরুণেরা "ফুটবল-খ্যাপা"—পরলেখক লিখেছিলেন। "ফুটবলে তরুণ বাংলার তাঁর আগ্রহ—মাননীয় (সুপারিন্টেন্ডেন্ট) বন্দোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনেও তেমন আগ্রহ তাদের মধ্যে কখনো দেখা গিয়েছে কি না সন্দেহ।" বাঙালী ছাত্রদের ফুটবলে আগ্রহের শতকল সম্বন্ধে পরলেখক যা বলেছেন, তার সঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য প্রায় অভিন্ন: "বাঙালী ছাত্রেরা সহসা তাদের জাতীয় আলস্য কেড়ে ফেলে উঠে পড়েছে। সে আর তার মাথাকে সম্ভব-অসম্ভব সকল বিষয়ের খবরে বোকাই করতে চায় না। শরীরের উন্নতি করার জন্য সে সত্যই কিছু করতে চায়।...স্বভাবতঃই ফুটবল এক্ষেত্রে তরুণদের কাছে সবচেয়ে সস্তা অথচ সবচেয়ে উদ্ভাদনাকর ব্যায়াম বলে মনে হয়েছে এবং খেলাটি সময়, স্থান ইত্যাদি দিক দিয়ে সবচেয়ে সুবিধাজনক বলে তারা বুঝেছে।" শেষোক্ত কারণটি ক্রিকেটের তুলনায় ফুটবলকে ভারতীয়দের পক্ষে অধিক গ্রহণযোগ্য করেছিল। কিন্তু বাড়ির ছেলেদের ফুটবলে উৎসাহ তৎকালীন বাঙালী

—প্রমোদ রায়চাঁদ স্বামীজীকে যেভাবে গ্রহণ করা হয়, তার মতো বা ততোধিক উদ্দীপনার সঙ্গে যেদিন বছরের সেরা ফুটবল খেলোয়াড়কে গ্রহণ করা হবে সেদিন বাংলার পক্ষে পরম শুভদিন।"

আলোচ্য পত্রটিকে বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করার কারণ প্রগোষ্ঠ বক্তব্যের সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির অনেক ঐক্য আছে। তবে মনে রাখতে হবে, খেলাখেলা বা শরীর-চর্চাকে স্বামীজী লক্ষ্যলভের উপায়রূপে বিবেচনা করতেন, কদাপি আসল লক্ষ্য বলতেন না। সেইজন্য তিনি শেষ পর্যন্ত খেলা অপেক্ষা ব্যায়ামের উপরে বেশী জোর দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য, শরীর স বল হয়ে কর্মক্ষম হোক, মানদুষ্টি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে সাহসী হোক। খেলার আনন্দের অংশ অধিক, অনেক সময়ে নিজের আনন্দ তা, কিন্তু ব্যায়ামে রয়েছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট প্রযত্ন।

বিচিত্র এই, কোনো ব্যায়ামবিদ বা ফুটবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে স্বামীজীর তুলনা কখনো করা হয় নি, কিন্তু সর্বোত্তম ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজির সঙ্গে তা করা হয়েছিল। দুই বিপরীত জগতের অধিবাসী তারা—এক-জনের কাছে এ পৃথিবী খেলা, অন্যজনের কাছে খেলাটাই পৃথিবী। কিন্তু দুজনেই নিজের জগতে শীর্ষস্থানে আছেন। তাই ইন্ডিয়ান নেশনের সম্পাদকের কাছে সম্যাসী ও খেলোয়াড় তুলনাবোধ্য মনে হয়েছিলেন। ২৪ অগাস্ট, ১৮৯৬-তে তিনি লেখেন:

"এখন ইংল্যান্ডে অবস্থিত সবচেয়ে দৃষ্টি-আকর্ষক দুই ভারতীয় হলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং মিঃ এস রণজিৎ সিংহী। একদিক দিয়ে বলতে গেলে তাঁরা দুই চরম রূপের প্রতিনিধি কিন্তু তা উৎকর্ষেরই চরম রূপ। বিবেকানন্দ আত্মার উদ্ভাবকে উদ্ভীন; রণজিৎ সিংহী এক ধরনের শারীর-কর্মের নিখুঁত রূপকার। নিজ জগতে স্বামীজী অপূর্ব, মৌলিক এবং আলোকোজ্জ্বল। মহান আকার, শিক্ষা এবং আত্মার চৌম্বকশক্তির দ্বারা তিনি ইংল্যান্ডের বহু নরনারীকে মুগ্ধ করেছেন। হিন্দুর ধর্মের বিরুদ্ধে স্থূল ও নীচ পৌত্তলিকতার অভিযোগই কেবল তিনি দূর করেন নি, তাকে এমন উদ্ভেদ ও এমন আলোকে স্থাপন করেছেন যে, তার সম্বন্ধে অপর মানুষেরা প্রাস্থ্যবোধ না করে পারে নি। অপরপক্ষে তরুণ রাজপুত-কুমার নিজ ক্ষেত্রে গৌরবের সঙ্গে প্রথম স্থানধিকারী; প্রতিদ্বন্দ্বীদের

একাগে—এক হৃদয়—এক আত্মা—এক সিংহাসন।" অতি উচ্চ হৃদয়দানিতে এই বক্তব্য সংবর্ধিত হয়েছিল। কোনো কোনো ভাষণে কিছু মন্দ অনুভোগ থাকলেও ভারতীয় রাজাদের সাধাবণ সুর ছিল ঐ। সভায় উপস্থিত ইংরেজেরা অতিশয় তৃপ্তির সঙ্গে ভারতীয়দের এই রাজানুগত্যের খাদ্যপানীয় আস্বাদন করেছিলেন। ভারতে ভরাবহ দৃষ্টিষ্ক চলেছে—তখনো যদি শাসকদের সম্বন্ধে শাসিতরা এহেন ভালবাসায় ভগমগ থাকে, তার চেয়ে সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে অধিক তৃপ্তিকর আর কি থাকতে পারে? স্বেত মানুষের দায়ভার বহন করেও প্রশান্ত মিঃ মরিসার্ট প্রসন্ন কণ্ঠে বলেছিলেন: "গত কয়েক শতাব্দীতে ইংরেজের সৌভাগ্য-পূর্ণ অধিকার এই—সে আমেরিকায় একটি নেশন সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং ভাবতে আর একটি নেশনের জাগরণ ঘটাবার পথে অগ্রসর হচ্ছে।"

ঐ সভায় চূড়ান্ত ইংরেজ ভক্তি দেখিয়েছিলেন ২৫ বছরের তরুণ ক্রিকেটার রণজিৎ সিং। তাঁর মতে, তাঁর ও চ্যাটার্জির সাফল্যের মূলে ইংল্যান্ড (বলাই বাহুল্য; ইংল্যান্ড ক্রিকেটের আবিষ্কর্তা এবং আই সি এস পরীক্ষার প্রবর্তক)—ভারতের অন্যান্য উজ্জ্বিত মূলেও ইংল্যান্ড—সুতরাং রণজিৎ সিং "আশা করেন যে, তাঁর দেশবাসী নিজেদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে গৌরবময়ভাবে যুক্ত বিবেচনা করবে। ইংরেজ ও ভারতীয় উভয়েই যদি সাম্রাজ্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেন এবং নিজেদের স্বার্থকে পরবর্তী স্থানে স্থাপন করেন—তাহলে সেটাই হবে পরম যাক্ষণীয় ব্যাপার।"

রণজির শূভেচ্ছায় যে-উল্লাসরব শোনা গিয়েছিল, তাতে একটি মন ও একটি কণ্ঠ অবশ্যই যোগ দেয় নি। ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের যে ভয়ঙ্কর মনোভাব ছিল—পরে তা বিস্তারিত আলোচনার বিষয় হবে—তাতে সহজেই অনুমান করা যায়, ঐ ধরনের মন্তব্য তাঁর মনে কী গভীর বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছিল। ভারতের নামে 'টোস্ট' প্রস্তাবিত হলে তার সমর্থনে স্বামীজী কতৃতা করতে উঠেছিলেন। কতৃতার মধ্যে ইংরেজ শাসনের পক্ষে তিনি একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। সাম্রাজ্যবাদের শত্রু এই মানদুষ্টির কাছে 'সাম্রাজ্যের স্বার্থই সর্বোচ্চ'—রণজির এই উক্তি ঘৃণা ছাড়া আর কিছু জাগাতে পারে না। স্বামীজীর কতৃতার যে-রিপোর্ট পাচ্ছি, তাতে রণজিৎ সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন এমন দেখছি না। হযত দু-এক কথা বলে-ছিলেন, তা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু সংবাদ-পত্রের বিবরণে অভুল চ্যাটার্জি সম্বন্ধে স্বামীজী যা বলেছিলেন, তাকে পদ্রুত দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল। অভুল চ্যাটার্জির ছিল ইতিহাসে পারদর্শিতা। স্বামীজী তাঁকে জন্মরোষ জানিয়েছিলেন—আপনি ভাবতেন যথার্থ ইতিহাস রচনা করুন—সে ইতিহাস যেন অসদৃশ্য দাস-বোকে যথার্থ আত্মমর্যাদার সৃষ্টি করে। স্বামীজী গভীর কণ্ঠে অধঃপতিত ভারতের রাজভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলছিলেন, ভারতের পতন হয়েছে সত্য, কিন্তু পতনই শেষ কথা নয়—ভারত আবার উঠবে।

সকলের মাঝে অপূর্ব ঐক্য বিবেকানন্দ।

স্বামীজী বলেছিলেন: "অতীতের ভিতর থেকেই ভবিষ্যৎকে আসতে হবে। অতীতের যথার্থ ইতিহাসজ্ঞানের ভিত্তি অপেক্ষা ভবিষ্যতের বৃহত্তর ও স্থায়ী আর কোনো ভিত্তি সম্ভব কি না আমি জানি না। অতীতের অগম্য কারণের কার্যফলের নামই বর্তমান। ইউরোপীয়দের কাছ থেকে অবশ্যই অনেক কিছু আমাদের শিখতে হবে, কিন্তু আমাদের অতীত—ভারতের গৌরবময় অতীত—হবে আমাদের প্রেরণা ও শিক্ষার বৃহত্তর উৎস। সৃষ্টির উত্থান এবং পতন আছে। পৃথিবীর সর্বত্র এই উত্থান পতনের খেলা চলেছে। ভারত আজ পড়েছে কিন্তু নিশ্চয়ই সে আবার উঠবে। এমন একদিন ছিল যখন ভারত বিরাট সব দার্শনিক, বিরাটতর আচার্যদের সৃষ্টি করেছিল। তাঁদের স্মৃতি ভারতকে যেন আশা ও আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ করে। ভারতের ইতিহাসে পতন এই প্রথম দেখা গেল না। নৈরাশ্য ও অধঃপতনের যুগ আগেও দেখা গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতের জয় হয়েছে। ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে আবার উঠবে।"

ইংল্যান্ডের সেই উৎকর্ষ মজলিশে, যেখানে বিলেতী ক্রিকেটে সাফল্যের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসংরক্ষক আমলাসৃষ্টির পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য দুজন ভারতীয়কে সংবর্ধনা জানাতে সমবেত হয়েছিল ভারতীয়রা এবং কিছু ইংরেজ, যেখানে শাসিতরা শাসকদের উদ্দেশ্যে তোষামোদের তুফান তুলেছিলেন—সেখানে, সেই আত্মবিশ্বাসের উল্লাসের মধ্যে একজন মানদুষ্টি ভারতের পক্ষে কথা বলেছিলেন—তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। কতৃতার শুরুর্তে তিনি কৌতুক করে বলেছিলেন, "আমি জানি না আমাকে কেন ভারতের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত টোস্টের সমর্থনে কিছু বলতে বলা হয়েছে! এর একটিমাত্র কারণ সম্ভবপর—আমার গুরুভার আকারের সঙ্গে ভারতের জাতীয় প্রাণীর (অর্থাৎ হাতীর) অশুভ ঐক্য আছে"—তাঁর সেই রসিকতায় সবাই হেসে গড়িয়ে পড়েছিল—তিনি নিজেও হেসেছিলেন—কিন্তু বিবেকানন্দ রসিকতার মধ্যেও সত্য বলেন—সুতরাং সেই সভায় কেবল আকারে নয়, মনে এবং আত্মায় পূর্ণ ভারতবর্ষই উপস্থিত ছিল—বিবেকানন্দের মধ্যে।

লুপ্তিভূত, বিধবস্ত ভারতের পক্ষে কিন্তু সেই মূহুর্তে সুনিশ্চিত উত্থান সম্বন্ধে বিবেকানন্দের আশাবাদে সার দেওয়া সম্ভব ছিল না। অমৃতবাজার পত্রিকার ৮ জানুয়ারী, ১৮৯৭ এবং ২৬ জানুয়ারী, ১৮৯৭ তারিখে দুটি সম্পাদকীয়তে স্বামীজীর উক্ত কতৃতার উল্লেখ করা হয়েছিল। ভারতের সর্বত্র-প্রসারিত নৈরাশ্যের রূপ আকার পরে সম্পাদক যন্ত্রণাময় কণ্ঠে প্রদান করেছিলেন—হে বিবেকানন্দ! আশা তো করব, কিন্তু কি-ভাবে?

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই উত্তর দেবার জন্যই বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

অনুমতির জন্যে

চলেছে কোশী। সকালের রোদ্দুরে নন্দা-
দেবী আর ত্রিশুলের পটভূমিকার আর
চিড়বনে হাওয়া-দেওয়া বরনার মতো শব্দে
মনটা হঠাৎ কেমন উদাস উদাস লাগে।
মনে হয়, কে ফেরে তোমার এ
কোলকাতার।

দাদাকে কথাটা বলতেই, দাদা চুরুটটা
মুখ থেকে বের করে বললেন, আধুনিক
কবিতা পড়?

বললাম, পড়ি, কিছু কিছু, কিন্তু
কেন? জঙ্গলী লোকের আবার কবিতায়
শখ আছে না কি।

দাদা বললেন, বলো কী হে ডায়।
এই মাটিতে বসে কি কবিতা আসে না
কি? দশ হাজার ফিটের ওপর থেকে তো
কবিতার শব্দ। যখন অস্টিমিটারটা সাঁ
ন করে উপরের খবর বলে তখন সেরেফ
সামনে কিংবা নীচে তাকিয়ে থাকো।
সামনে তাকালে দেখবে সমুদ্রটা সাঁতরে
উপরে উঠেছে আর তোমার একলা ফাইটার
জাঁতিরয়ে চলেছে সেই নতুন নীল সমুদ্রে।
নীচে তাকালে দেখবে সারা দুনিয়া বোঝা
সমান। তখন কিরকম একটা নৈবর্তিক
ভাব আসবে বুঝছো। মনে মনে চট
করে কবিতাটা তৈরি করে নিজেই এরা-
জ্ঞানে নেবে রিফ্রেশমেন্ট রুমে সিগারেটের
প্যাকেটে চট করে লিখে ফেল। তারপর
দেখো কি অরিজিনাল কম্পোজিশন।
কোথায় লাগে তোমাদের মতি ছেঁওয়া
ন্যাকাপনা।

চোখ বড় বড় করে দাদার কথা
শুনছিলাম।

দাদা বললেন, শোনো একটা কবিতা
তোমাদের কোলকাতার সম্বন্ধে—

"কোলকাতার দিন, কেমন
করে যায় যে কেটে,
টের পাওয়া কঠিন।
মদের মলিকউল, আর
চন্ডের ন্যাপথলিন
লেগ্যান্ডের বঙ্কনাদে

টের পাওয়া কঠিন।

ঘোলাটে এই রাতে
জান্নোপিশের হিমছাম এক তন্দু
আকাশ-স্বরা এক মূঠো চাঁদ ক্ষীণ।
সে তন্দু আপস কারুর?
স্বপ্ন, সে তন্দু সবার আপন,
গুনে দিও কড়কড়ে নোট তিন;
লেগ্যান্ডের বঙ্কনাদে
স্বপ্ন হবে লীন।
কোলকাতার দিন
কেমন করে যায় যে কেটে
টের পাওয়া কঠিন।"

দাদাকে বললাম, থাকেন ভো
কানপুদ্রে, ইদানীংকার কোলকাতার

কলিজার কথা এমন নিখুঁতভাবে আঁকলেন
কি করে?

দাদা বললেন, ভাই রে, কোলকাতাকে
গালাগালি দিলে কি হয়, ঐ পোড়ারমুখীর
টানেই তো ঘুরে ফিরে তামাম ভারতবর্ষ
থেকে ছুটে আসি। আমায় দেখলে
কোলকাতা বলে—এতদিন পরে ব'ধুয়া
এলে, দেবা না হইত পুরান গেলো।
তারপর মনে-করো সম্মোবেলার আলো
জ্বলা রাসবিহারী এভিনিউ কিংবা দুপুর-
বেলার বই হাতে কলেজ স্ট্রীট। সেই
ইউনিভার্সিটি, সেই কফি হাউস। কত
দূরে—তবু কত কাছে।

বললাম, তবে এত নিশ্চয় করে কবিতা
লেখা কেন?

দাদা বললেন, তুমি দেখছি একটা
আমত আকাট হে।

নিশ্চয় করি, ভালবাসি বলেই না।

আমাসিন্থ চাউল (আতপাশ), একটা
সব্জি, টোম্যাটো আর পেঁয়াজের পিণ্ডি,
খাসা অড়হুকা ডাল, আর খাঁটি আল-
মোড়কী ভুঙ্গা ঝিউ। এই দিশে
দুপুরের খাওয়া সারলাম। নিজের ঘরে
বসেই। তার সঙ্গে পুদিনার চাটনি
আর বড়ো আশুদল সমান একটা কুচকুচে
কাঁচা লঙ্কা। তোফা ভোজ। আজ থেকে
নজর করছি, ঘরে বসে থাকা এক দুঃসহ
ব্যাপার। তোমার কথা মনে পড়ে বলে
নয়। আধ ছটাক ওজনের মক্ষিকা-
বাইনরী উপদ্রবে।

ডি-ডি-টি স্প্রে করেও অবস্থার কোনো
উন্নতি হলো না। অভাব ধ্যানস্থ হবার
চেষ্টা করলাম। এসব জায়গাতে এত
ভাড় কেন? এই জনোই তো? ভগবান
মিলনা এতদা সম্ভা নেহা। এই মাছি
সমুদ্রে ভাসমান হলো কেউ যদি নিবন্ট
মনে কিছু ভাবতে ইচ্ছে করেন, সে
ভগবানের পাদস্পর্শই হোক আর কদলী-
কাণ্ডবং উদ্ভাষিতার কথাই হোক, তাকে
রীতিমত সংযম করতে হবে। সাধনাতে
একেবারে বঁদে হয়ে যেতে হবে।

কানের গহবরে কি আছে তা দেখার
কৌতুহল দমন করতে না পেলে যখন
কোয়ার্টার ডজন মাছি তোমার কানে
চক্রে পড়বে, আর তোমার নাসারশ্রে
সামান্যকায় অনাবিকৃত উদ্ভাবিকাণ্ডব
উন্মাদনার যখন জনাকত প্রবলবেগে নাসা-
বস্ত্রের পথে এগোতে থাকবে এবং বাদবাকি
সবাই তোমার সর্বাঙ্গ ঘিরে নির্বাক হাষ
জাতভাইদের দুঃসাহসিকতা দেখাব আর
মাঝে মাঝে উদ্ভেকনাথ হাততালি দিয়ে
উঠবে, ঠিক সেই অবস্থায় তুমি যদি
ভাবতে পারো এ হতভাগাকে: যদি সত্যি

সত্যিই ভাবতে পারো, তবেই বোঝা যাবে
মনের টান খাঁটি না ঠুনকো। ভগবান
ঠিক বেছে বেছে আমাদের তীর্থস্থান-
গুলোতে তাবৎ দুনিয়ার মাছদের রিকুই-
জিশান করে এনেছেন। এই মাছের
আগুনেই তো তিনি ভক্তদের পুড়িয়ে
নেন।

সে যাক; তোমার প্রতি আমার
আকর্ষণ যে দুনিয়াব এই মক্ষিকা-ঝটিকা
বিক্ষুব্ধ ঘরে বসে তোমাকে লেখা চিঠিই
তার নিদর্শন।

জানালা দিয়ে বাইরে চাইতেই চোখে
পড়ল, সে হৈ হৈ করে একপাল ভেড়ার
মতো ধুলোগুলোকে উড়িয়ে উড়িয়ে,
হাওয়াটা, পাহাড়ী রাখালের মতো পাহাড়ে
পাহাড়ে ছুটোছুটি কবছে। একটা
অতন্দ্র নির্বাক ভাব। বাইরে এখন খুব
গরম না হলেও শীতের শ-ও নেই। অবশ্য,
বেলা তিনটে থেকেই কেমন একটা পীত
শীত ভাব সারা শহরটাকে আচ্ছন্ন করে
ফেলবে।

লেখালেখি শেষ হবে, হোটেলের ঠিক
সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা উঠে গেছে সেটা
দিয়ে চড়াই-এ উঠলাম। একে-বেঁকে
কিছুদূর গিয়েই অপরিচয়, পাথর-
বাঁধানো একটা গলিতে পৌঁছলাম।
গলিটার দু' পাশে কাঠের বাড়ি। বেশির
ভাগই দেড়তলা দু'তলা। নীচে সংসারের
যাবতীয় দুঃ-ছাই নিষ্কণ্ট জিনিস গলিতে
স্তুপীকৃত; নয়তো বিক্ষিপ্ত। একটি-দুটি
ফর্সা-ফর্সা ন্যাটা ছেলে। এখানে-ওখানে
এ জানালায় ও ছাদে দু'-একজন ঘরগণী।
জঙ্গলী আপেলের মতো গায়ের রঙ। কি
যেন একটা আদম-আদম ভাব আছে
সারা শরীরে। একটা কিছু উদগ্র
সংকেতের মতো কি যেন একটা আছে এই
না-গরম, না-ঠান্ডা আলামোড়ী দুপুরের
এই দুর্গন্ধ গলির এ ছাদে ও ছাদে।

কিছু দূর গিয়েই টানেল থেকে ট্রেন
হঠাৎ বাইরে বেরুলে যেমন আলোয় চোখ
ধেঁষে যায়, অমনি এক পসবা শ্রেণীর
সামনে এসে দাঁড়লাম। এ চোখ-ধাঁধানো
নিউ মাকেটের সঙ্গে তুলনীয় নয়। একে
আলমোড়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে।
চওড়া পাথরে বাঁধানো রাস্তা ধাপে ধাপে
উঠে গেছে ভাইনে, আর সে রাস্তাই ধাপে
ধাপে নেমে গেছে বাঁয়ে। শহরের
সমান্তরালে। এই আলমোড়ী কি বাজার।
বাজারের দুই ভাগ। উপরের বাজারকে
বলে মঞ্জিবাজার নীচের বাজারকে বলে
তলিবাজার। দু'ধায়ে নানান রকমের পসরা
সাজিয়ে বসেছে পসারিণী কিংবা কুমায়নী
ছেলেরা। বাজাদের মধ্যে-চোখে একটা
পরিচয় সপ্রতিভতা। বাজারে দেখলাম,
এদের সবার দাঁতই উচ্ছে ফুলের মতো
হরিদ্রা বর্ণ নয়। কাবু কারু চারু দাঁতে
সারা বাজারের রঙীন ছায়া ঝিলিক দিচ্ছে।
কোনো দোকানে পাহাড়ী বাঁশের লাঠি:

লাঠির পরে লাঠি তাহার পরে লাঠি। কেদার বদরী, পিণ্ডারী পোশিয়ান এবং আরো কত কি জায়গার ঘাত্রীরা লাঠি কেনেন এবং দোকান থেকে। কোনো দোকানে বা খাঁটি মৃগনাভি বিক্রী হচ্ছে। কেউ বা বসেছে ঘুরাল, নীলগাই বা চিতাবায় বা হরিণের চামড়া নিয়ে। কোথাও বিচিত্র পাহাড়ী অলংকারের দোকান। নল্ল আঁখি লগনারা ভীড় করে আছেন সে সব দোকানে। কোথাও বা অনামা ফলের মেলা। প্রাম; পীচ, আড়ু খোবাসী, কাউফুল; আপেল, নেশপাতি আরো কত কি অজানা ফল। বেশ একটা রঙীন প্যাটার্ন। আবার এরই মধ্যে চোখে পড়ে পাঞ্জাবী কি মাদোয়ারী মহাজনদের বারিহাম কি অন্য মিলের বস্ত্রসম্ভারে আধুনিক দোকান। কিন্তু এগুলো কেমন বোমানান এই মালিবাজারে। তালিবাজারেও হয়তো বা। মালিবাজার থেকেই গড়াতে নেমে গেছে পথটা তালিবাজারে।

পথের দূর পানেই একতলায় বাজার আর সায়াম্কার ক্ষুদ্র বাতায়নিবিশিষ্ট দোতলায় ব্যবসায়ী শাহ সম্প্রদায়ের বাস। এই শাহরা এ অঞ্চলে কুবেরের জ্যোতি।

গড়ানো পথে নামতে নামতে হঠাৎ একটা বাঁক নিতেই সামনে চোখে পড়লো সামিয়ানা পড়েছে রাস্তা জুড়ে। পথ বন্ধ। সেই খাঁজকাটা পথেই সতরঙ্গি শূন্যেছে। এই সামিয়ানার সঙ্গে ভাড়া করা ডেকেশানের তুলনা চলে না। এ আদি ও অকৃষ্ণম। খাঁটি রূপের জরি বুলেছে আলবেরের মতো। ঝড়লপ্তন কোলানো হয়েছ রাতের জন্যে।

জিঞ্জেস কবে জানলাম এক শাহর সঙ্গে অন্য শাহর মেয়ের বিয়ে কাল। প্রায় তামাস বাজার নিমন্ত্রিত। আজ থেকেই খানাপানা শুরুর বোধ হয়। দু'-একজন কতৃস্থানীয় ব্যক্তি চুড়িদার পাজিমা চাপিয়ে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছে পথের সতরঙ্গিতে। একপাল ছেলে-মেয়ে গুরুত্ব শম্প্রহীন দারোগানের হাতেব অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা বন্দুককে ঘিরে শব উত্তেজক আলোচনা করছে। আর এদিক-ওদিকাব অলিন্দে ঝিলিক দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে বক্ষ্যকেশা শবীবিণী।

সবাই যেমন কবে সতরঙ্গি স্পর্শ না করে চিলতে মত ফাঁকটুকু দিয়ে কায়দা কবে ও পশে যাচ্ছে, আমিও তেমনি চললাম। নিমন্ত্রিত ত' নই।

আরো নীচে নেমে একটা চৌমাথা। দুটা স-ক'চ পানব দোকান। কলেজ স্ট্রীটের পানব দোকানও হাব মানে। পানটা মিষ্টি। একটু বেশিবকম ভালো। পাবে দেখছি, কলমলে সস্তায় এই মিষ্টি পান আব তার স্বেদেও মিষ্টি মূখের আশায় সানা আলমোড়ার স্কুল-কলেজেব চৌমাথা এখানে ভীড় কবে, পান খায়, মিষ্টিমিষ্টি চায়; কেউ না চাপা গলায় গায়।

মানে ভরসখ্যায় ও জায়গাটা রাসবিহারী-ল্যাম্ভাউনের মোড়, মীর্জাপুর কি চাদনীচক, না আলমোড়ী কি তালিবাজার বোঝে কার সাধ্য।

ঘড়ির কাঁটাটা সাড়ে তিন পেরিয়ে চারের দিকে চলেছে কে'পে কে'পে। বেশ শীত শীত এখন, অথচ একদু ঘণ্টা আগেও বেশ গরম ছিল, দিন আর রাত যেন শীতের হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান! দুপুরে রাতে হি হি।

বিকালে দাদা মানে, পাইলট বোস-সাহেবের ওখানে চা-এর নৈমন্ত্য। সকালে ফেরবার পথে বাড়িটা দেখে রেখে-ছিলাম। যখন দরজায় এসে দাঁড়িলাম তখন চারটে। দরজা খুলে দিলো ছোকরা চাকর। পিছু পিছু গিয়ে ঘরে ঢুকতেই অবাক হলাম। এই কী জগলী লোকের নমুনা?

একটা ফেলিঙ খাট। একপাশে হালকা নীল রঙের উপর শাদা আলপনা দেওয়া রেডকভার। দাদা বসে আছেন ইজিচেয়ারে। পরশে একটা সামগ্রিক সুবজ স্ট্রেসিং গাউন, মূখে চুরুট। গোটা তিনেক বেতের তেপায়া আর একটা চেয়ার ঘরে। রাজ্যের বই ছড়ানো-ছিটানো ঘরময়; সবখানে। কি বই যে নেই খুঁজে পেলাম না। বাংলা, ইংরেজী, শান দুই ফরাসীও জট পাকিয়ে আছে। আমার দেখেই হাতের বইটা ছুঁড়ে ফেললেন খাটে, বললেন এসেছো তাহলে। দেখো ত', প্রায় ভুলেই বসেছিলাম। বসো, একদুনি আসছি, বাথরুম থেকে,

বসে বসে বইগুলো নাড়াচাড়া করছিলাম আর ভাবছিলাম এই পাহাড় চুড়োর এতগুলো বই কি সুস্থ মস্তিষ্ক কেউ সঙ্গে নিয়ে আসে? তার উপর ভদ্রলোক পেশা করছেন মৃত্যু বিহগীর আব এঁক নেশা? একটা জাজ্জল্যমান কনট্রোলকশান।

দাদা ফিরতে বললাম এতগুলো বই নিয়ে এখানে এই আলমোড়াতে? এই ঘরোয়া পরিবেশের জন্যেই বুঝি হোটলে না উঠে বাড়ি খুঁজে উঠেছেন?

ঘরেছো ঠিক। দাদা বললেন, আর বইগুলো আমার কর্মস্থানের কোয়ার্টারে কেমন মধু গুঞ্জে থাকে। তাই আমার সঙ্গে ওদেরও মৃষ্টি দিই - ছুটিগুলোতে। সত্যি বলতে কি, ওদের সঙ্গে আমার যা মেলামেশা তা এই ছুটিগুলোতেই।

চা এল একটু পরে, সঙ্গে টা। অববাহিত বয়স্ক ভদ্রলোকের বাড়ি এর চেয়ে ভালো বৈকালিক চা পর্বের আশা কম্পনাতীত। টাটকটাকি নানান গল্প হলো চা-এর সঙ্গে। চা-এর শেষে দাদা বললেন, চলো, তোমায় রামকৃষ্ণ ধামে স্বামীজীর কাছে নিয়ে যাব।

বললাম হঠাৎ? স্বামীজীর কাছে কেন?

নাম গান শোনাও, নাম গান শোনাও নিমন্ত্রণ আছে। রামকৃষ্ণ মিশনে ইনি থাকেন না। যদিও মিশনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিবিড় এবং আগে উনি ওখানেই ছিলেন, এখন নিজে আলাদাভাবে রামকৃষ্ণ ধাম খুলেছেন। আছেন বেশ। মৌমাছির চাষ নিয়ে। বললাম, বেশ ত' বিনি পয়সার দেশ বেড়ানোর 'বাই প্রোডাক্ট', কিছুর ধর্মলাভও হবে।

চা-খাওয়ার পর দাদার সঙ্গে উপরে বাজারে উঠে, বাজার পেরিয়ে খাড়া পাহাড়ের গায়ে আমরা যখন রামকৃষ্ণ ধামের দরজায় পৌঁছিলাম তখন সমস্ত আকাশে ফিকে বেগুনি আর লালের খেলা। পাহাড়গুলো গা-ময় পায়ে-চলা পথের দাগ নিয়ে বিবর্ণ রোগািব মতো পাণ্ডুর চোখে অস্তায়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে।

বগানের দরজার মতো ছোটো দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখলাম ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। ডানদিকে দোতলা কাঠের আশ্রম। আশ সিঁড়ি নামতেই দেখি গেরুয়া বসনাবৃত স্বামীজী। সাদরাহান জানালেন এসে। এঁকে দেখে হঠাৎ অবাক হতে হয় একটু। চেহারায় সন্ন্যাসীসুলভ অসাধারণ কিছু নেই, বরং নিতান্ত সাধারণ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণাঙ্গ বাঙালীর মতোই। শূন্য সূর্যের সন্নিবিষ্ট ভাবটি, পৃথকীকরণের একমাত্র সহায়ক।

দোতলায় দেখলাম নানান লোকের ভীড়। কয়েকটি বাঙালী পরিবারকে দেখে আনন্দ হলো। দাদা বললেন, এদের মধ্যে নিতান্তই অল্পই স্থায়ী বাদবাকী সবাই অস্থায়ী।

কারো সঙ্গে আলোপের সময় তখন ছিল না, কীর্তন শুরুর হবে এখন। সামনের ঘরটিতে রামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের মদ্র সহাস্য ছবি, সৃগম্বি ধূপের গন্ধে সমস্ত ধাম আনন্দময়। বারান্দায় আর ঘরে চাপা গুঞ্জরন। নামগান শুরুর হলো, স্থানীয় দু'জন ভদ্রলোক এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ক'জন সন্ন্যাসী সমস্বরে শুরুর করলেন। সঙ্গে মন্দির আরা খোল। কাঁপা কাঁপা, ভাঙা ভাঙা গলায় রামকৃষ্ণের স্তব ভগবানের স্তব, চিরসুন্দরের স্তব। কেমন গায়ে কাঁটা দেয়, আলমোড়া শহরের এই পারমাণবিক পরিবেশ।

বাইরে চারিদিকে নাগাধিবাজ হিমালয়। অন্ধকারে অল্প কটা তারাদের মদ্র নীলগা আলোয় আরো রহস্যময় আর গম্ভীর। "আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা আনন সে কি? অন্ধকারে হঠাৎ তাবে দেখি।"

প্রায় পৌনে একঘণ্টা চললো গান; দু'লে দু'লে মন্দিরার তালে তালে মনের বাঁগায় বাঁগায়, যখন ধামলো গান অমুরাও সব চুপ, সেই সুরেলা গানের রেশ কেমন

একটা নির্যাত্তিক পরিবেশের সৃষ্টি করছিল।

সভা ভঙ্গ হলো। কিন্তু স্বামীজী দাদার কানে কানে কি যেন বললেন। দাদা বারান্দায় এসে আমাকে বললেন, সঙ্জন-বাবু কি ভজন হোগী ধোরী বাদ। শব্দ উচ্চারণে ভজন শোনার ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠল। বললাম, শোনাই যাক না, কি বলেন?

দাদা বললেন বেশ তো, আমার কি? আমি তো বাউন্ডুলে গোক।

আর সবাই-ই প্রায় উঠলেন, ঘর থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ নাবী এবং পুরুষ বেরিয়ে এলেন।

হঠাৎ দাদা চেঁচিয়ে উঠলেন, ডাক্তার সাহেব।

চমকে, সামনে তাকাতাই চোখে পড়লো এক ছোটখাটো ভদ্রলোক। উল্কা-খুস্কো চুল। কাজের লোক, কাজের লোক চেহারা। কালো জেমের চশমা চোখে; মূখে অভিজ্ঞতার পান্ডুলিপি। বললেন, আ রে বোসসাহেব যে? আপনিও ডুমুরের ফল হলেন দেখছি, সঙ্গে ইনি কে? দাদা আমার পরিচয় দিলেন, তারপর আমাকে বললেন, ডাক্তার সূদ্রপ্রিয় সেন, এখানকার স্বাস্থ্যাদপ্তরে আছেন।

ডাক্তার সেন নমস্কার করে হাসলেন একটু, বললেন; ভালই হল। তাহলে বাইরে চলুন, আলাপ করিয়ে দি। দাদার দিকে তাকাতাই দাদা ইসারাতে যেতে বললেন। সঙ্জনবাবু-কি ভজন না শব্দে বাঁচি না; তবু ডাক্তারসাহেবের সঙ্গে উপরে উঠতে হলো।

ঘামের বাইরে এসে দাঁড়ালাম যখন, তখন সেই হিজিবিজি পাহাড়ী পথ জন-বিরল। একটা চিড়গাছের দীর্ঘ ছায়া আর চিরুনি চিরুনি পাতার কাঁপন সমস্ত পথটাকে সায়ান্থকার করেছে। মোড়ের আপেল ঝোপটার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছেন।

ডাক্তারসাহেব ডাকলেন এই যে, এই শুনছো।

দেখ আকাশী নীল শাড়িতে রজনী-গন্ধার মত এক ভদ্রমহিলা। গায়ে একটা কাশ্মীরী মলিমা। আধেক আলোয়, আধেক কালোয়, চিড়ের ছাওয়ার আর হিমেল হাওয়ায় আম-জাম-নারকালের দেশের মতোকে বড় আপন বলে মনে হলো।

ডাক্তারসাহেব পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার স্ত্রী অনুমতি। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, উনি এসেছেন কোলকাতা থেকে। আমি হাত তুলে নমস্কার করতে দুটি অসম্ভব শাদা হাত এক করে কিস্কিসে গলায় শ্রীমতী জনমতি সেন বললেন, কবে এসেছেন এখানে? আমাদের বাড়ি একদিন আসবেন কিম্বা? এই বিদেশে কোনো বাঙালী



আধুনিক কবিতা পড়?

চোখের আসন এ ছাড়া আমরা আর কিছুই কামনা করি না।

হেসে বললাম, আমি কিন্তু চোখের নই। রোগ ভোগের বিলাস আমার নয় না; আমি এসেছি বেড়াতে, নিছক দেশ দেখতে।

শ্রীমতী অনুমতি অন্ধকারে ফস্-ফরাসের মত মুখ তুলে বললেন, চোখ কি শব্দ রোগভোগেই প্রয়োজন, অন্য কিছুতে না? কি জ্ঞান, জ্ঞান না। সে যাই হোক, এসেছেন দূরদেশে এই ঘর, কারণ দিয়ে আমরা করবো কি? কি ভালোই যে লাগে বাঙালী দেখলে।

ডাক্তারসাহেব বললেন, আমরা আজকে এগুই, আপনার সঙ্জনবাবু-কি ভজন সুরু হলো বলে। শ্রীমতী সেন সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিতরে যান আপনি, একদিন আসবেন কিম্বা আমাদের বাড়ি, বোসসাহেবের সঙ্গে। আপনি তো বাড়ি চেনেন না।

কথা দিলাম যাব, তারপর ওদের টুকরো কথা হাসির হাওয়ার বন্যায় উড়িয়ে দিয়ে ওরা মিলিয়ে গেলেন চিড়ের ছায়ার অন্ধকার হয়ে-থাকা বাকটায়।

আমি নেমে ভিতরে এলাম।

হঠাৎ কেমন খাঁশ খাঁশ লাগলো। ঘরে ঢুকতেই দেখলাম, অল্প কজনই অবশিষ্ট আছেন মেঝের গালিচায়। এক

অল্প ভদ্রলোক চোখে কালো চশমা, তানপুরা কোলে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। আর একটি অল্পবয়সী ছেলে, কালো মত, তার পাশে বসে। ছাত্রই হবে বোধহয়। চোখে মুখে বুদ্ধির প্রসাধন। দাদা আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে।

বাইরেটা অন্ধকার। একতলা থেকে নানান রকম ফুলের গন্ধ আসছে, নীচের খাদের দিকে অন্ধকারে চাইতে ভয় কবে, গনে হয়, বৃষ্টির উপর কি একটা পাথরের মত চেপে গসেছে।

ভিতরে আসতেই স্বামীজী বললেন, আরম্ভ করুন সঙ্জনবাবু, রাতও হলো।

শীর্ণ প্রৌঢ় একটু হাসলেন। অন্ধ গায়ক যখন ভগবৎ চিন্তায় অাকুল, সেই গান-পূর্ব স্ময়ের হাসি তো তুঁতি দেখলে না, অমন বাতে। কি মধুর সে যে হাসি। কী এক চিন্তায়, মনমোহনের চিন্তায়, অনির্বচনীয় চিন্তায় বিভোব হাসি।

তানপুরার কিনিাকনি বেশ আস্তে আস্তে সমস্ত ঘরের অনুপ্রমাণ জুড়ে ফেললে, শব্দ করলেন সঙ্জনবাবু, "ব্যসো মেরে নয়না নোমে নন্দলালা।"

কী অপূর্ব গলা। আস্থায়ী থেকে অন্তরাতে এমন নামলেন সঙ্জনবাবু যে, মনে হলো রূপোলী রাতে চিলকায় রাজহাসি

বুঝি বাগিয়ারি ছেড়ে, জলে নামলো।
কেপে কেপে গাইতে লাগলেন উনি।
অশ্রু গায়কের স্বাভাবিক ভগবৎ প্রেম
আর অসহায় ভাব মিশে সেই সরল সহজ
ভজনে মনে হলো রামকৃষ্ণ ধাম ছেড়ে
আমিও যেন উড়ে চলেছি পাহাড়ে
পাহাড়ে। যেন সন্তজনবাবুরই মত আকুল
গলায় বলছি—‘নন্দদুলাল এসো এসো
আমার ঘবে, আমার বুকের পরে এসো,
আমার চোখের পরে এসো।’

সে গান শেষ হলো। তার পর শব্দ
হল আবার “খোঁজে খোঁজে তুমি
কাহনাইয়া মূখে নামনা ধারে”। নয়নহারা
বলেই বুঝি সন্তজনবাবুর নয়ন দিয়ে
কানাইকে দেখবার অমন আকুলতা, নয়নে
এসে বসবার জন্যে এত আকৃতি। অশ্রুত
গলা সন্তজনবাবুর। অনেক নির্জন সাধনার
পুরস্কার-স্বরূপ।

পরে সেই ছাত্রটি গাইলো। তারও
নিখুঁত গলা। পর্দাগুলোর সঙ্গে সুরের
একটুও অমিল নেই। অবলীলাক্রমে
কণ্ঠের উঠছে গলায়, কিন্তু তা বলে
গুরুত্বের সঙ্গে তুলনীয় নয়। গুরুত্ব ভাবের
রাজ্য। গুরুত্বের গানে রসের আর ভাবের
ফোয়ারা। ছাত্রের গান শুন্দর, তবে গুরুত্ব
সঙ্গে তুলনীয় নয়।

গান তো শুন্দর, রাতও অনেক,
প্রায় সাড়ে এগারটা, স্বামীজীর কাছে
বিদায় নিয়ে উঠলাম দু’জনে। উনি
বললেন, আজ তো আলাপই হলো না
ভীড়ে। সময় করে আসবেন কিন্তু,
আমরা মহা গম্পুরে লোক। সব সময়ই
আপনার জন্যে রাস্তা খোলা।

ভারী ভালো লাগল কথাবার্তা।
সন্ধ্যাসী বলে লোক দেখান ভড়ৎ নেই, তিনি
যে সাধারণ গৃহীর চেয়ে অনেকখানি এবং
ভীষণভাবে স্বতন্ত্র, এমন ভাব দেখানোর
কোনো চেষ্টাই নেই।

বললাম, নিশ্চয় আসব।
আজ ভোর থেকে মোহান সিং নো-
শান্তা,

পাশের দোকানের মদন ছোকরাকে
ডেকে শুধোলাম। কালি পড়ে পড়ে
বেচার মদনের তীরগুলোতে মরচে ধরে
যাচ্ছে, নইলে মদন সার্থকনাম। বুকে
হাত রেখে বলতে পারি, ঐ পাইন শ্রেণীর
আভাষ দেওয়া টানাটানা নরম নরম চোখ
আর গোলাপী ঠোঁটে, আলমোড়ীওয়ালী
ত’ থোরী, কোন কোলকাতাওয়ালীও না
মছে।

মদন বলল, গীয়া হোগা, কুছ কামকা
লিয়ে।

বললাম, সে তো নিশ্চয়ই, লোকিন্
কা কাম কা লিয়ে?

মদন আমদাছে বললো, আন্ডার
মন্ডানেও হতে পারে, আবার নীচের
কোশীর পাড়ে তার বাম্ববীর ঘর,
সেখানেও যেতে পারে। আমাকে অতটুকু

পর্যন্ত ওয়াকিবহাল করেই বললে, চলে
সাব, চাই সের আটাকা ফুলকা বানানা
হোমী আভি।

বেলা আটটা। আলমোড়ার ম্যাল রোডে
অনেক আলো, সোনার আলো; নরম
আলো। সকালটা বেশ হিমেল হিমেল।
বোগানভোগিয়া-ছাওয়া বারান্দায় এসে
বাল্যাপোষ মৃদুে বসলাম ইজিচেয়ারে।

কত রকম লোক চলেছে পথ বেয়ে,
সাধু-সন্ত গেরুয়া বসনে লোটো-কম্বল
কাঁধে। কোথায় না জানি গন্তব্য। কেউ
কেদার-বদ্রী মনিসসরোবর, কেউ নিন্ডারী
শ্বেতসিয়ার, কেউ কেউ বা হিন্সাকাই
রহনোয়ালী।

মেয়েদের কলেজ বোধহয় সকালে।
দলে দলে চলেছে ওরা। দুধ সাদা পায়-
ছামা আর ফুল ফুল জামা। জগলী-
আপেল গাল আর প্লাম-লাল সপ্রতিভ
ঠোঁট। মিষ্টি মিষ্টি; সব মিষ্টি, নরম
রোম্ভেরে। পড়াশুনাতেও এরা আশ্চর্য-
জনক অগ্রণী! বাড়িতে গম্ভীরগিন জামা
গায়ে বাবা-মার সঙ্গে কাজ করছে, গরু
দোয়াচ্ছে, দুধ বেচতে যাচ্ছে, টুকরো-জমির
ফসল বিকোতে চলেছে ভিন্নবাজারে, কিন্তু
তার সঙ্গে কলেজও করছে। কি ছেলে
কি মেয়ে। কোলকাতার মত লন্ড্রী-
সেলুন, কফি হাউস সংস্কৃতি এখনো ঘন
ধরায়নি এদের মস্তায় মস্তায়। ভারী
আনন্দ হয়, এতটুকু শহরের পথঘাটে, বই-
খাতা হাতে এতগুলো আশাবাদী মুখ
দেখলে।

হৃজুর ডেকেছিলেন?
মোহান সিং এসে দাঁড়িয়েছে। চুল
এলোমেলো, চোখ কুঁচফলের মতো লাল।
বললাম, কোথায় ছিলে মোহান সিং?
ডেকে ডেকে সাড়া পাই না। স্নানের জল
দিও।

মোহান সিং কানে হাত দিয়ে বললে,
কসুর মাপ কি জিরে হৃজুর।

ও বলল, ওর নাকি সারা রাত ঘুমই
হয় নি।

হঠাৎ কবে মদনের কাশে শোনা কোশী
নদীর পাড়ে ছোট পাথরের ঘরটি মনের
চোখে কিলিক্ মেয়ে গেল। এখনি না
রোমিও-উপাখ্যান শুনতে হয়।

এহেন অবস্থায় মৃদুত্বের ভাব গম্ভীর
করব না, মৃদু সহানু, করব ভাবছি, এমন
সময় মোহান সিং বললে, শের ভ নেই,
মালুম হোতা জীপগাড়ি। বললাম, বল
কি হে, ব্যাপার কি?

যা ও বলল তার সারাংশ হচ্ছে, কাল
রাতে মোহান বাড়ি গেলেন, নিজের বাড়ি।
কোশীর ধারে বাম্ববীর বাড়ি নয়। রাত
প্রায় এগারটা। খাওয়া-দাওয়া শেষ। বুড়ো
মা-বাবা আর ছোট বোন শব্দে পড়েছে
অনেকক্ষণ। মোহান সিং শব্দে জানালা
দিয়ে, চেয়ে আছে নীচের দিকে, যেখানে
পাহাড়টা একফালি চাঁদের কুপন আলোতে

গড়াতে গড়াতে মিশেছে আরেকটা
পাহাড়ের কোলো। আর ঠিক নীচে দিয়েই
মুগোলী সিঁথির মত কোশী চলেছে
ফরফর করে। কত কাছে; তবু কত
দূরে। পাকদণ্ডী মারলেও তিনক্রোশ পথ।
হঠাৎ নীচে একটা আওয়াজ, একটু ছট-
পটানি রোমশ ছাগলটার করুণ চীৎকার;
আর তার সঙ্গে একটা ভারী শব্দ।

বাবের আগমন হয়েছে। চেঁচামেচি,
সোরগোল, সবগে ঘটী-বাটী নিক্ষেপন,
সব কিছুকে উপেক্ষা করে বাঘ এক
কটকায় শাদার-বাদামীতে মেশানো দীর্ঘ-
কেশা ছাগলটাকে নিয়ে আবছা আলোয়
পাহাড়ী পথেব আপেলগাছের ছায়া
পেরিয়ে নেমে গেল উপত্যকার দিকে।

মোহান বলল, কুছ করনে নোই শেকা
সাব, সাফ্ করাকে দেখা। সাত-পাঁচ
ভাবছি, এমন সময় দাদা এসে উপস্থিত।
বললেন, কী হে? বসে কি? চলো
চলো, ডাক্তার সেনের বাড়ি।

ইতস্ততঃ করে বললাম, এই অবশ্যই?
ওরা অসুবিধায় পড়বেন না তো? এখন
গেলে তো দুপুর না কবে ফেরা যাবে না।

দাদা একটু বিজ্ঞহাসি হেসে বললেন,
অবেশ্য কি হে? রবিবারে দশটা, এ তো
ভোর। রবিবার আটটায় ঘুম থেকে
উঠবে, কেভুর-চোখে বিছানার শব্দে শব্দেই
এক কাপ চা খাবে, তারপর আধ ঘণ্টাটাক
খবরের কাগজ ফরফরাবে। শেষে সাড়ে
নটা নাগদ মূখে চোখে জল দিয়ে একটা
বেগ ঢালা পায়জামায় পা দুটো গলিয়ে
দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। ক্যালেন্ডারে
রোববারটা লাল দেখ না। অন্যন্য দিনে
নিয়মের যে কোন ছুতটা তোমার ঘাড়ে
চেপে বেহুশ কাঁকায়, সেটাকে একেবারে
ঝেড়ে ফেলে, রাম বেনয়মি হবার জন্যেই
না রবিবার। আর তুমি কি না?

আলমোড়ার বিলিয়ার্ড সেলুনের পাশ
দিয়ে যে রাস্তাটি উঠে গেছে বাজার
পেরিয়ে, সেটার কিছুদূর গিয়ে বিলিয়ার্ড
হাওয়া-দেওয়া একটা বাংলোর সামনে
থামলেন দাদা। গেটে ছোট ট্যাবলেট,
তাতে কালোর উপর শাদায় লেখা ডাঃ
সুপ্রিয় সেন, প্রীমতী জনমতি সেন। অন্য
পাশে বাংলোর নাম “পার্বতী।”

ভিতরে ঢুকতেই ছাই-রঙা এ্যালসে-
সিয়ান দৌড়ে এল। দাদার সঙ্গে দেখলাম
বিস্তর অস্তরঙ্গতা। খোলা বারান্দার
চার পাশে টবে অর্কিড-আর নানারকম
ফুলের বাহার। খানকর্য বেতের চেয়ার
আর মোড়া ছড়ানো ছিটোনো। একটা
গোল টেবিল। কাজ করা এ্যাসট্রে।

দরজা ঠেলে সটান ভিতরে ঢুকলেন
দাদা। আমিও পিছ, পিছ।

বসবার ঘর। দেওয়ালে হাতে-
জাঁকা ছবি। শালবনে সকাল হয়েছে
সোনালী রোম্ভেরের চক্কাই সীতাল

५ :

2

100

4

—

1

•

—

•

রামকৃষ্ণধামে মোমাছিদের গুজরণে
একটু ব্যস্ত আছি। শবেফুলে ফুল
মিষ্টি, না আঙুরের, না আলো অনেক
কিছুর সে সংশ্লেষে এবটু ভুলে ফুলক



এলেন কেন কি জানি? কেন, আপনার সঙ্গে এ কীদনেই ত' বেশ অন্তরঙ্গতা হয়েছে, আপনার কি মনে হয় দেখে-শুনে?

অপারগতা করিয়ে বললাম, দেখুন দাদাকে কেমন হেসালী মনে হয়, এই যে হাসি-খুশি সরল প্রাণ লোকটা এর বৃকের মণিকোঠায় কোথায় যেন কি একটা জমে আছে, যার অস্তিত্ব উনি সহজে পারছেন না, মনে হচ্ছে সে ভার লাঘব করার জন্যেই বৃক উনি অমন আত্মমগ্ন হয়ে নিঃশব্দতা খুঁজছেন। আপনাদের সঙ্গেও তো দাদা খুবই অন্তরঙ্গ, আপনি এর কারণ কিছ্ অনুমান করতে পারেন?

চিক্‌চিক্‌ করে উঠলো নারকালের ছায়া-কাঁপা মাধবপাশার দীঘির মতো চোখ দুটো। বললেন, কেমন কাঁপা কাঁপা গলায়—না আমি, মানে, আমি কি করে জানবো বলুন? আমি ত' জানি না কিছ্। আর জানবাব আমার কথাও নয়। এ পর্যন্ত বলছি হঠাৎ কেমন অকারণে রুদ্ধ হয়ে উঠলেন অনুমতি, বললেন, এমনি এসেছেন বেড়াতে,—বাংগালী ভদ্র-লোক সেই সূত্রে যা অন্তরঙ্গতা তাতে কি মনেব খবর জানা যায়? আপনিই বলুন না?

সোজা প্রশ্ন কবলেন অনুমতি আমার—কিন্তু ও'র চোখ দেখে মনে হলো উনি নিজেকেই শূন্যোচ্চেন কথাটা।

আপনিই বলুন, জানা সম্ভব? আবার বললেন উনি, বিশেষ কবে, কোনো বিবাহিতা ভদ্রমহিলাব পক্ষে?

লঙ্কায় মাটির সঙ্গে মিলিয়ে গেলাম আমি। অনেকভাবে বক্সেলাম, আমি তা বলতে চাই নি আদপে।

মনে হলো তিনি বিশ্বাসও করলেন কথাটা।

এরপর অনেক টুকটাকি কথা হলো, কিন্তু কেমন ছেঁড়া ছেঁড়া, অসময়ে অস্থায়ী বৃষ্টির মতো। চা-টা কোনোরকমে শেষ করে উনি বললেন, উঠি তাহলে আজ। আপনি যাবেন কিন্তু আমাদের ওখানে যখন-তখন, বৌদিন-সৌদিন। তুন-তুনের খাবার সময় হয়ে গেল, মণিবন্ধের রেডিয়ামে তাকালেন এক ঝিলিক।

আমি হেসে বললাম, ঠিক আছে। আসবেন কিন্তু আবার বৌদিন ইচ্ছে সময় করে।

হোটেলের দরজা অবধি গিয়ে মৃদু ফেরালেন অনুমতি। বাইরে পাহাড়ি রাস্তাটা চাঁদে ভিজে সুপসুপ করছে। তারপর যাবার সময় একরাশ ক্ষমাব হাসি হেসে বললেন, চল।

তুনতুনের সঙ্গে টারিস্ট অফিসের ঝাঁকটায় মিলিয়ে গেলো শ্রীমতী সেনের শান্তিনিকেতন কান্ড-করা শালখানি।

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম হোটেলের বারান্দায়। দাদার কথাতে

হঠাৎ ওরকম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন উনি? আমারই কি দোষ হলো কিছ্? কোনো ভুল? শোভনতার কোনো লঙ্ঘন? নতুন করে ভাবতে বসলাম।

মোচা ঘণ্ট অনেক খেয়েছি। ঠাকুরাব হাতের, মাব হাতের, ঠাকুরের হাতের, এমন কি, নিয়ামত বাবুচাঁর হাতেরও, কিন্তু এমনিট কোথাও খাই নি। অন্যভাবে বললে বলতে পারি, এমন পরিবেশেও না।

বাইরে হেঁ-হেঁ কবে হাওয়াটা পাঠ-শালার পিণ্ডিতমশায়ের মতো এক পাল ধুলো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জাল-ঢাকা ঘবে সন্নিবাসীবাদের সঙ্গে চাটাইব উপর আসন-পিণ্ডি হয়ে বসে আতপ চালের উপর সুগন্ধি ঘি ছিটিয়ে মোচাঘণ্ট দিয়ে ভাত খাওয়া-ভাবো দেখি-ভেবেই আনন্দে তোমাব গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে।

বললাম, কাঁচা লঙ্কা চাই।

স্বামীজী লঙ্কা আনিতে দিয়ে বললেন দ্যাশ কই?

বললাম, দ্যাশ গ্যাছে।

বললেন, তা মরিচ খাওনেব কাম নাই, পাহাড়ে গ্যাঁদাল পাতাব রস পাওন যাইব না।

অন্যান্যাবা গবম ভাত মুখেই গব্‌গবে গলায় হেসে উঠলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর কাটাফলের শ্রান্ত-শান্তি করে বাঁশের চিক্‌দেওয়া ঘরে দিবা কন্ডল বিছিয়ে শয্যা। স্বামীজী লাইব্রেরী থেকে গোটা দুই দশনের বই দিলেন, বললেন আজকের দুপুরটা নষ্ট করলাম আপনার, আমার কাছে ত' ওয়েস্টার্ন প্রিন্সিপাল নেই।

চারটে নাগাদ চা-এর ডাক পড়লো নীচে, গোল টেবিলে, ঢাকা বারান্দায়। আমাদের চা খাওয়ার মধ্যে দাদা এসে উপস্থিত। আমাকে দেখে অবাক হলেন, বললেন, খাসা গুদুমারা বিদ্যে শিখেছো ত'?

জানা ছিলো না আমার, দাদার নেয়ন্ত্র ছিল গতকাল স্বামীজীর কাছে, যিনি এ ব্যাপারে একেবারেই উদ্বাহু। বাছ-বিচার মোটে করেন না। বাংগালী হলোই হলো। বোহ-নী বোটাঁ আব অড়-হড়কা ডাল গিলে গিলে প্রবাসে এসে রপ্তানীরা তাঁদের পেট গুলোকে যে বাগেশ্বরের রাস্তা বানাবেন, তা তিনি বেঁচে থাকতে ঘটতে দেবেন না আল-মোড়াতে, সকলের পেট লুপ্তিকে তিনি করাবেনই মাঝে মাঝে।

দাদাব সঙ্গে রামকৃষ্ণধামের দবজার বাইরে যখন বেরুলাম, তখন সন্ধ্যা হ'ব হ'ব। আজ কি দুর্দিন? চাঁদটার এখনই স্তর সহছে না?

দাদা বললেন, গ্রানাইট হিল থেকে ত' আলমোড়া দেখ নি চাঁদনী রাতে—চল।

সাবধানে শূকনো পাতার গালিচা ম্যাড়িয়ে আমবা যখন সুনীবিড় চুড়োয় গিয়ে উঠলাম, ততক্ষণ চাঁদে একেবারে জোয়াব এসেছে। বর' বর' শব্দ হচ্ছে হাওয়ায় চড়বনে। আশ্চর্য' সে শব্দ মনে হচ্ছে, স্বর্ণাব পাশে বসে আছি। চিড়েদের চিরুনি-চিবুনি শবীবের বাক দিয়ে নীচের মিটি-মিটি আলমোড়া দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ কে'দে কে'দে চোখ ভিজিয়ে একটা আলোব দিকে চাইলে আলোটা যেমন হাওয়াব হাওয়াব আলো হয়ে গলে পড়ে, আলমোড়া ঠিক তেমনি কবে জোনাকীব মতো জ্বলছে চিড়, আর দেওদাবের ফাঁকে ফাঁকে। অনেক নীচে কোশী সুনবী চুপিসাবে দিঘতের কাছে চলেছে, কিন্তু ধবা পড়ে যাচ্ছে। চাঁদ পিছলে পড়ছে তাব ছিপছিপে শরীরে আর কে'পে কে'পে উঠছে কোশী আনন্দের শীতল দুঃখে।

সূর্য ডুববেছে সেই কতক্ষণ, তবু পশ্চিম দিকের পাহাড়ে পাহাড়ে চাঁদের রূপোতে এখনো একটু আলতার ছোপ। ভারী নিঃশব্দতা, ভারী উদারতা এই সন্ধ্যাবেলার গ্রানাইট হিলে।

দুঃজনে চুপচাপ বসে আছি। হাওয়াটা পাতায় পাতায় ঝর্ণা ঝরিয়ে আমাদের মনেব মধ্যে ঝির্ ঝির্ করছে। দাদা আজ কেমন গম্ভীর গম্ভীর। সেই স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক নেই কথায় কথায়, ছলাফ-কলায়। হঠাৎ দাদা বলে উঠলেন, ভায়া, তুমি গল্প লেখো?

চমকে উঠলাম। বললাম, না ত'। কিন্তু হঠাৎ ও-কথা কেন?

দাদা বললেন, কেমন টেনে টেনে—অনেকটা ও'র ইচ্ছে বিরুদ্ধেই, বললেন, না, যাবা গল্প লেখে, তারা প্রট খোঁজে কিনা, তুমি যদি লেখক হতে, তবে তোমার আমি একটা জ্বলন্ত প্রট দিতাম। একটা ছাই-হওয়া প্রট।—পারতে তুমি আমায় নিয়ে গল্প লিখতে? সোজা আমার চোখে তাকালেন দাদা।

এই প্রথম দেখলাম, প্রথম অনুভব করলাম, দাদার সুপদ্রব মৃদুতা তাঁর সুন্দর, কিন্তু ভারি কবুণ।

এ কীদনে দাদার বে বেরোয়া উদাসীন পরিচয় পেয়েছি, আজ চাঁদ-ভেজা গ্রানাইট হিলে বসে তাব সব কিছ্ ভুলে যেতে ইচ্ছে কবছে। পাইন বনের কাছা দাদার গলাব স্বরে, বন্ধ্যা ডালিম-ঝোপের ব্যর্থতা দাদার চাউনিতে।

দুঃখেব সঙ্গেই বললাম, আমি ত' লিখতে পারি না, তবে আমার এক বান্ধবী লেখেন। আপনি যদি অনু-মতি দেন তবে আমি তাঁর হয়ে আপনার কাছে প্রট কুড়োবো।

দাদা বললেন, কিছ্ মনে করো না ভাই। তুমি আমার ছোটভাইয়ের মতো। আর এ কীদনের ব্যবহারে তুমি আমার

কতখানি আপন হয়েছে সে আমি নিজেই জানি না। তাই তোমাকে সব বলব আজ, কিছু লুকোব না, কারণ কাউকে না বলে আমিও আয় থাকতে পারছি না। কতদিন আর খোলসটাকে বয়ে বেড়াই বল? তারপর একটু থেমে অপ্রকৃতিস্থ গলায় বললেন দাদা, আমার নিজের উপর এক বিশ্রী বিতৃষ্ণা এসেছে—আমার বাঁচতে ইচ্ছে হয় না—এমন একটা অসহায়তা, একটা পঙ্গুতা, এমন একটা অর্থহীনতা—যা আমায় পাগল করে তুলেছে।

নন্দাদেবী আর গ্রিশ্মলের চুড়োতে চাঁদের আলো হীরের মত ঝিকমিক করছিল।

দাদা বলে চললেন, জীবনটাকে গড়ব ভেবেছিলাম এক করে, আর হয়ে গেলো আর এক। তুমি কি ভাব আমি ইচ্ছে করে এমন বাড়িডুলে হয়েছি? ইচ্ছে করে হই নি। ভাবি আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি অনু আমায় আগাগোড়া না-চেনার ভান করে।

অনু? মানে অনুমতি? অবাক গলায় শ্রুখোলাম আমি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ! ঘৃণা করিয়ে বললেন দাদা, তোমাদের অনুমতি সেন।

আচ্ছা, আশ্চর্য না? তুমিই বল? যে মেয়েকে পদটিপেখাফুলের মতো একটি একটি করে পাপাড়ি মেজতে দেখেছি আমি, যে পাপাড়ির গম্ব্ব এখনো আমার সান্না সন্তান, সেই মেয়ে না কি স্বামীর সামনে আমার পরিচয় দিতেও ভয় পায়? ভাতু, ভাতু, ভাতু। ভীষণ এক দুঃখে দাদার মুখটা কুঁচকে উঠলো।

দাদা বলে চললেন, তুমি কি ভাব আমি পারি না ওর সুখের সংসার ভেঙ্গে দিতে? পুরোনো প্রমাণের ডাল নিয়ে? পারি, কিন্তু আমি করি না, কারণ অনুর মতো আমি স্বার্থপর নই। ওর চোখের লেখাতে, আমি বুঝি, ও বলতে চায়, যা চুকেবুকে গেছে তা নিয়ে আবার কেন? কিন্তু কি আমি চেয়েছি ওর কাছে? কিছুই ত' আমি চাই নি। শুধু চেয়েছিলাম প্রথম যৌবনের ভাল-বাসার স্বীকৃতি। যে মেয়ের জন্যে আমার জীবন আজ অবধি আকাশের পাখির মতই নিরুদ্দেশ, সে কিনা আড়ালেও মুখ ফুটে একদিন স্বীকার করতে ভয় পায় যে, সে আমায় ভাল-বেসেছিল। নিজের কাছে নিজেই ও পালিয়ে বেড়ায়।

জানো ভায়া, আমি সব করতে পার-তাম, ওর স্বার্থপরতার, ওর ইচ্ছে করে ডুলে যওয়ার সব দুটি আমি সুদে-আসলে আদায় করে নিতাম, শুধু পারি না তুণতুনের দুঃখ চেয়ে। তুণতুণ আমার কাছে এলেই আমার সব দুঃখ, সব অভিমান, সব দাবী, এমনভাবে দুঃখ লুকোয় যে আমি দেউলের মতো ওকেই

কাছে টেনে নিই—আব চাইনে কিছু। মনে করো না কিছু—তুণতুণকে দেখলেই আমার মনে হয় ও আমার ভাবি আপন কেউ—যেন ও আমার নিজেরই না-হওয়া মেয়ে।

এ অবধি বলে গেলেন দাদা একটানা—তারপর থামলেন যেন হাঁপিয়ে গেছেন বস্ত, তারপর ভাবি লম্বা পেয়ে বললেন, যাক্গে, যাক্গে তুমি নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে একেবারেই নির্বাক থাকবে। কাউকে কখনো কিছু বলবে না।

তারপর অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলাম দু' জনে, সেই কালোয়-রূপালীতে মেশানো পটভূমিকার দুটি অনড় আঙ্গিক হয়ে।

দাদা বললেন, চলো উঠি আজকে। নামতে নামতে বললেন, আমি বিশ্বাস করলাম যে, একদিন চাইতে চাইতে হঠাৎ দেখব পৌছে গেছি পাওয়ার। সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতাম, কিন্তু অনু যে আমার উপর এতখানি অবিশ্বাসী আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি, নিজের মনেই বললেন শেষের কথাটা। তারপর বললেন, আমায় এবং অনুর কতগুলো চিঠি তোমায় আমি দেব—সেগুলো তুমি পড়ে দেখতে পারো। অনুর চিঠিগুলো সব বিয়ের আগে আমায় লেখা, আমারগুলো সব অনুর বিয়ের পর। যার একটাও পোস্ট করা হয় নি, কেবল ওর মুখ চেয়েই। তোমার লেখিকা বাম্শবী চিঠিগুলো থেকেই পাবেন ওঁর গল্পের গুট। যদি উনি লিখতে চান।

বললাম, বেশ, দেবেন। যত করে রেখে দেবো চিঠিগুলো, দেবেন আপনি।

চিন্কা পেটের বাঁকে যখন পৌছ-লাম আমরা, তখন হঠাৎ দাদা বললেন, আমি কালই ফিরবো ঠিক করলাম আলমোড়া ছেড়ে। ভেবে দেখলাম, এই আসা ও আশার কোনো মানেই নেই, আমার এই অপমানের কোনো অর্থই নেই।

একটু থেমে বললেন, আমাদের জীবন সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই হয়ত তোমার। সুন্দরীরা সেখানে অবিশ্বাস্য সস্তা। তাদের নরম শরীরে আমাদের সদাই নিমগ্ন। আর স্কচ হুইস্কী থেকে রাশান ভড্কা; যা চাও বিশ্বাস করো এতদিন আমি আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের মতো দিন কাটিয়েছি। কম-রেডদের টিটকিরির টিপুটপানি সয়েও। কী অস্বস্ত সংযমে বছরের পর বছর কাটিয়েছি যে, নিজের কাছে নিজেই অবাক হয়েছি আমি ভেবে। কিন্তু আজ দেখছি কোনো দরকারই ছিল না এর—কোনো প্রয়োজনই ছিল না নিজেকে এমন করে ঠকানোর, এমন করে রিষ্ট করবার, দিনে দিনে। যাক্গে পুরোনো দিন। পুড়ে ছাই হয়ে যাক

পুরোনো উইং-কমান্ডা বেস। আমি আর ঠকবো না। কালই বাতাস হবো আমি, তারপর দেখবো পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আনন্দ, দেখবো বৃষ্টি, রান, বর্ণ, স্পর্শ, গন্ধের অপার মহিমা

চুপচাপ রাস্তায় হাঁটলাম।

দাদা কিন্তু সত্যি সত্যি যাবার পরে আমায় ডেকে নিয়ে আমার হাতে একটা পোর্টফোলিও গুঁজে দিলেন। আপত্তি না করে নিয়ে এলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর বললাম সেটি নিয়ে। বিশ্বাস করো, সে রাতে আমি এক করি নি চোখের পাতা। সব রাত আমি চিঠিগুলো পড়েছি। বারবার পড়েছি, উল্টেপাল্টে পড়েছি। তুমি সেগুলো হাতে পেলে সে কি মহাকাব্য লিখতে তা আমি ভাবতেই সয় পাচ্ছি। কিন্তু কপাল তোমার, সেগুলো তোমার হাতে পৌছবার আগেই, সেগুলো দিয়ে আমায় একটা জিগিন্যাল পুণর্কর্ম কবতে হয়েছে—সেটা পরেই শুনো। তবুও, সেগুলোর সদগতি করার তগে গোটা-কত চিঠি আমি পর পর শেষ কবছি তোমার কাছে, পড়ে, তুমি সব বদ্বিহি করো তোমার স্বজাতির এন্ড্রেনের হৃদয়হীনতার—

হাজরীবাগ
রাতে

অনুমতি,

দেহটাকে ত' বিকিয়েছ, কিন্তু মন-টাতে ত' হাতুড়ি পড়ে নি। না কি সেটাকেও তুলেছো নীলামে? আমার মনে মনে এখনও ভারী আনন্দ হয় যে শাওয়ার খুলে, এলোচুলে চান করার সময় চানঘরের আয়নার তোমার ঐ রূপালী নরম নরম দেহটর ব্যথার ছায়া ফেলে তুমি আহস্য ভাবছ আনমনে।

আমি এখন শিকারে এসেছি হাজারী-বাগে। কয়েক বছর আগেও কত স্বপ্ন দেখেছি, ট্যারার গাড়িতে তোমার পাশে বসিয়ে জি, টি, রোড ধরে ব্রাইট করে চলছি হাজারীবাগের বাতির দিকে। তাজমহম্মদ টেবিল সাজিয়ে রেখেছে খাবারে। আমি আর তুমি, রোব-লটোনা শোবার ঘর, কলমলে বসবার ঘা আর বেতের চেয়ারে স্বতন্ত্র ঢাক বস্তান্দা। সামনের মোরবা ক্ষেতে বস্টি পর প্রথম রোদ উঠেছে তোমার শনের ভীরা ইচ্ছার মতো।

কিন্তু হায়! সে শব্দ স্বপ্নই হয়েছে। আজকে তাজগু অরুণ, খাবার টেবিলে প্রাচুর্যও আছে, আর সঙ্গে আছে শিকার-পাগল বন্দুয়া। উদ্দাম হয়ে, আমরা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছি সময়কে। জীবনের চাকায় লস খুলে উড়োছি এদিক-ওদিক। স্ট্র-বোজড বুলেটে খানখান করছি হরিণীর নরক বুক।

কিন্তু অনু, এর জন্যে দায়ী কে? তুমি? তোমায় শেষ দিই না। দোষ আমার, অন্তত তোমার চোখে। মৃত্যুর অসাবধানতায় তিলেক অসংযমী হয়েছিলাম, সেই দোষে তুমি আমায় আজীবন মেরেছো।

আজ্ঞা অনুমতি সেন, তোমায় একটা কথা শুনোই, আজ তুমি ডাক্তার সেনের স্ত্রী না হয়ে যদি আমারই স্ত্রী হতে (যা হতো অত্যন্ত স্বাভাবিক) তবে কি ততটুকু অসংযম তুমি সহ্য করতে না? হয়তো তখন তুমি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ইচ্ছে করে অসংযমী হতে বলতে। শব্দ একটা মাস। আগে, আর পরে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় মানুষ কত কী করে, তুমি আমার অতটুকু অসংযম, আমার অতটুকু উত্তেজনা, আমার অতটুকু নির্মমতার আনন্দ ক্ষমা করতে পারলে না? সারা জীবনের মতো আমায় জঘন্য স্বাপদের পর্যায়ে বিচার করলে। মানুষ তো ভুলও করে অনুমতি।

কত মেয়ে এসেছে এ পোড়া চোখে, ছায়া ফেলেছে; সরে গেছে, নীল হৃদে ওজা পাখির মতো। কিন্তু তুমি অনন্যা। অদ্ভুত তোমার জ্বালাধরা রূপ, অদ্ভুত তোমার সংস্কৃতির দৃষ্টি, তোমার পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা আর সংযম-অসংযমের সীমাহীন, সব অদ্ভুত, সমস্ত অদ্ভুত। ধন্য অনুমতি, ধন্য তোমার জীবন ছায়াবাস মন্ত।

ইতি, তোমার হারানো “মন”।

দাদার এ চিঠি লেখার কিছুদিন আগে অনুমতির লেখা শেষ চিঠিখানি শোনাচ্ছি। এ চিঠিতে অনুমতি গেলে ধরেছে নিজে, যদি দিয়ে যাচাই করেছ নিজে, যাচাই করে দাদাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, দাদার সব চাওয়ার শেষ চাইছে অনুমতি।—

ফর্নিকিউ রোড,
কোলকাতা

মন,

এ চিঠি লিখতে কোনোদিন যে হবে দুঃস্বপ্নেও ভাবি নি। তবু লিখতে আমাকে হচ্ছে। কাড়গ্রামে তুমি সে দুপুরে যে অশোভন আচরণ করেছো তা আমাকে মর্মে মর্মে মেরেছে।

হিঃ, হিঃ, এত লোভী তুমি? একটা মাসের অপেক্ষা! শব্দ একটা মাস। এত বছর সইলে, একটা মাস সইতে পাবলে না? আমি তোমাকে কি না দিতাম মন? কি আমার অঙ্গের থাকতো তোমার কাছে? আগার সব আমি তোমায় উজাড় করে দিতাম। আমার শিক্ষা, আমার ধর্ম, আমার মন, আমার দেহ, আমার সর্বস্ব। এত জেনেও তুমি অবাক হলে? অবাক হয়ে হাতের মতো থেকে ঝাঁপিয়ে দিলে আমায় সব-ফোটা

চাঁপার মতো। তুমি ত পুরুষ, তোমার কি? বিশেষ করে তোমার মত সুপুরুষ। তোমার পক্ষে আমায় ভোলা কিছই না। কিন্তু আমি তো মেয়ে, (এবং আমি সুখী যে আমি মেয়ে) আমার পক্ষে তো ভুলে থাকা অত সহজ নয়। তবু ভুলে আমাকে থাকতেই হবে, তোমাকে আমার ভুলতেই হবে— কারণ আদর্শ নিয়ে আমি কারো সঙ্গে মিতালি করি নি এবং করি না মন। সেই নির্জন দুপুরে কাড়গ্রামের শালবনে, আলোছায়ার বুটিকাটা গালচেয়ে তুমি আমায় ছোঁও নি, আমায় নিপীড়িত কর নি, তুমি দলিত করেছো আমার আদর্শকেও, নৃশঙ্ক করেছো আমার স্পর্ধাকে, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছো আমার অহংকারকে, যে অহংকার আমার তেরো বছর বয়স থেকে আমার কিশোরী মনের স্ফূরণ অবধি তোমাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল। লজ্জা করে নি তোমার জোর করে আমার বুকে মুখ লুকোতে? দুর্বল ভীরু পারার মতো আমার বুকে ও মুখ লুকোবে কি করে? ও মুখ লুকোবার জায়গা অত বড় আকাশেও নেই। তুমি ভুল করেছিলে, তুমি খুব ভুল করেছিলে। আমি আধুনিক, কিন্তু জানতে না তুমি যে কৌমাৰ্য্য আমায়ের এমন গর্ব, যে গর্বে প্রাচীন এবং আধুনিকার সমান অধিকার।

এ নিয়ে আর না মন। আমার হাত কাঁপছে। তুমি আমাকে ভুলে যেও। আমিও নিশ্চয়ই ভুলব তোমাকে। জানি, ভোলা বললেই ভোলা যায় না, তবু দেখো তুমি, আমার আত্মসম্মানের দিবা রইলো, তোমায় আমি ভুলবোই। তুমিও ভুলো আমায়।

ভুলে যেও যেদিন আমার পনেরো বছর বয়স, সেদিন আমি প্রথম শাড়ি পরেছিলাম। সজনেগাছেব নীচে দাঁড়িয়ে-ছিলাম ভরদুপুরে। ঝরঝর করে পাতা উড়ছিল বাতাসে, ফুরফুর করে আমার মন উড়ছিল আকাশে। তুমি লাজুক চোখে এসে কি সংকোচেই না বলিছিলে, “অনু, তোমায় শাড়ি পরলে এত ভাল লাগে।”

মন, কেন বাঁচিয়ে রাখলে না সেই আবরণ সেই নৈকট্যের অসীম দরজ, সেই মোহময়-অপার্থিবতা। তোমার এত বিদ্যা, এত ধৈর্য, এত গর্ব নিয়ে তুমি এত নীচে নেমে এলে? কী করে পারলে তুমি? কী আছে আমার? যে মন দিয়ে দীর্ঘদিন তোমায় মনে মনে আদর করছি তোমায় কাছে টেনেছি, তোমায় দেখে করেছি। সেই অনেক বছরের মনের বদলে তুমি একমুহূর্তের দেহটাকেই বড় করলে মন? এই কি তুমি অনুমতির পতিসম্ভব? জানি না তবু জানতে ইচ্ছে করে, সব পুরুষই কি তোমার মত? তোমাদের কাছে মনের

কি কোনোই দাম নেই? শরীরটাই কি সব কিছ?

হয় না মন, হয় না। ভুলে যেও। ভুলে যেও আমায়। ভুলে যেও বখান দিন কাটাচ্ছিলে ইংল্যান্ডে, তখন আমার কলেজ-জীবনের সবচেয়ে রঙীন দিনগুলোকে, সবচেয়ে আপাতমধুর আনন্দগুলোকে অবিশ্বাস্য রকম বিসর্জন দিয়ে তোমাকে বরণাকাঙ্ক্ষার দিন গুলোছি, তোমার কল্যাণকামিনার দিন ভুলেছি। যদুনিফর্ম পরা তোমার ফটো দেখে আমার ছোট বকে গর্ব ধরে নি। কিছু মনে রেখো না মন, সব ভুলে যেও।

আমিও ভুলে যাবো আমার টাইক-স্নেডের সমগ্র রাতের পর রাত তোমার বারান্দার চেয়ারে বসে থাকা। ভুলে যাবো ভোরের আলোর সঙ্গে দবজার দাঁড়িয়ে, পৃথিবীর সমস্ত আশ্রিততাব সঙ্গে তোমার “অনু, আজ কেমন আছো?” শুনানো। তুমি ভুলে যেও যে তোমার সেই তুচ্ছ কুশল-ছিতোসায় সেদিন আমার সব তেতো ওষুধই অমৃত হয়ে উঠতো। জানালা দিয়ে, রঙনের ডালে বুলবুলিকে নাচতে দেখে আমারও নতুন করে জন্মবার ইচ্ছে হতো। বিশ্বাস করো, সেদিন তোমার জন্যেই বেঁচে-ছিলাম।

এম-এ পড়ার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না, তবু তোমাকে খুঁশি কবাব জন্মো, কাকাকে ছেড়ে, শান্তিনিকেতনেই পড়লাম এম-এ। কিন্তু কী হল মন? কি হল? কি হল এত করে?

এতদিনেব প্রস্তুতি, এতদিনের আগমনী গান,—ছিঃ ছিঃ। যার জন্যে বাঁচলাম, সেই তুমি, নিজেই আমাকে নিজে হাতে মারলে। যেখানে বিশ্বাস নেই, যেখানে সংযমের শর্তচিহ্ন নেই, যেখানে নারীশরীরের মর্যাদা নেই, সেখানে অনুমতিকে তুমি আশা করো না, করতে পারো না। ক্ষমা করো মন আমাকে—ক্ষমা করো—আমি ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে।

তোমার জন্যে মনে মনে আমি পর-জন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকবো, পরের জন্মে তোমার দেহ সুপরিচয় কবে তুমি আমায় গ্রহণ করে ধন্য করো, আমায় সুখী কবো, তুমি সুখী হয়ো। কিন্তু এজন্মে এটুকু জেনো, এ পৃথিবীর যে কোনো লোককে (কাকার মতো) আমি বণ করবো। কাণ তার চেয়ে তুমি কোনো অংশে মহৎ হতে অক্ষমতা দেখিয়েছো। বরণ যে তোমার চেয়ে উন্নত, যে জীবনাদর্শেব বড়াই করবে না, যে অপরিচিত, চারদ্রের চটকে আমার চোখ ধাঁধাবে না। সে যা সে তাই হবে। সে তোমার মত নিজেই জিনিস চুরি করার জন্যে অস্থির হবে না।

এই শেষ চিঠি মন। আমার জন্ম-জন্মান্তরের ভালোবাসা তোলা রইল

তোমার জন্যে। কিন্তু বিয়ে আমাদের হলো না। কারণ, বিয়ে শুদ্ধ মনে মনে না, দেহও টানে। তাই, এজন্মে তা হলো না তোমার সঙ্গে। আমার ক্ষমা করো, আমার ক্ষমা করো, আমার ক্ষমা করো॥

ইতি, তোমার অনুমতি, যার অনুমতির অপেক্ষা তুমি করো নি। তুমি ভাবছ অনুমতি বৃদ্ধি বরাবরই এমন ছিল। কিন্তু তা নয়। এদের বিচ্ছেদের বছর দুই আগেকার একটা চিঠি দেখ, বৃদ্ধিও এদের সম্পর্কের মিলিট ঘাঁধি।—

কর্নিফল্ড রোড
কোলকাতা

মন,
কাল আমার বন্ধু সন্মতি এসেছিল। ওরা দেহাদান থেকে এসেছে কদিন হল। কী প্রশংসা যে করল তোমার। ও কিন্তু অজ্ঞানত তোমায় একটু.....।

ইতভাগীর দোষ কি বল? আমার দোষই বা কি? তোমার অমন অজ্ঞান পাইনের মতো চেহারা, অমন ইম্পাতের মতো (কাকার Version-এ) মন, অমন, অমনময়ী চরিত্র আর কার আছে? তার উপর সামাজিকতা, সাহিত্য-রস, স্বেচ্ছা, এতগুলো গুণের সমন্বয় তো আর কারতে দেখি নি। গর্ব হবে না আমার? তুমিই বল। পৃথিবীসমুখ মেয়ে পড়ে থাকতে, আমি স্বেচ্ছাগত যে কি করে তোমার কাছে পড়লাম তাই ভাবি। আমার প্রতি তোমার দুর্বলতাটা, অন্যান্য মেয়েদের বৃদ্ধি সে খোঁচাটা লাগায়, তাতেই আমার আনন্দ যায় শত গুণে বেড়ে। থাকগে, এবার ছুটিতে এসো কিন্তু। এবার যদি স্কটিং করতে গিয়ে আবার ছুটিতে পা ভাঙো তবে কিন্তু আমি ফিরেও তাকাব না। তোমার মা-বাবা বেঁচে থাকলে আমার এত চিন্তা হতো না। তাঁরা স্বর্গে গিয়ে তোমার হাত থেকে খুব বেঁচেছেন, কিন্তু মেরেছেন আমাকে।

ওখানে শীত পড়েছে নাকি? তোমার জন্যে একটা আসমানী নীল টোয়েটার বুনছি। পিঁকি ভালো আছে, মাঝে ওর লোম উঠছিল খুব। আর কি লিখব? আজকে ছুটি দাও। শারীরিক এবং মানসিক কুশল জানিও।

ইতি তোমার স্নিগ্ধ অনুমতি।
আর একটা চিঠি দেখ, এইটা আর শেষ চিঠির মাঝামাঝি সময়ের—

শান্তিনিকেতন

আমার মন,
শিলং থেকে লেখা তোমার চিঠি পেরেছি কাল। তুমি লিখেছ পাইনবন দেখে তোমার আমার কথা মনে হয়। লিখেছ, অজ্ঞান সন্মতি মতো উত্তর পাইন আমার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সৌভাগ্য আমার। তবু হাসালে আমার। শুনছি লোকে প্রেমে পড়লে বোকা হয় আর

কবি হয়। তোমার বেলা সে কথাটাও ত খাটে না। তোমার আমার মধ্যের যা সম্পর্ক তাকে ত সস্তা প্রেমের সংজ্ঞা দিয়ে সীমিত করা যায় না।

সে কথা যাক। তোমার উদার তুলনার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জেনো। চেরা-পুঞ্জী, গেছিলে না কি? গেলে কিন্তু বেশ গুছিয়ে চিঠি দিও। এমন অগোছালো চিঠি দাও তুমি। একটা প্যারাও ত গুছিয়ে লিখতে পারো না; কি করে যে এয়ারফোর্সের কমিশন পেলে তুমি, তাই ভাবি।

পাইন-উড হোটেলের ডাইনিং রুমের, লেকের কানার, গল্ফ লিংকসে যাবার নির্জন রাস্তার কিংবা সতী-স্বর্ণার তুমি এমন সাবলীল বর্ণনা দিয়েছো, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তোমার সঙ্গেই ছিলাম অনুক্ষণ। দু' বেলা নিয়ম করে বেড়িও আর কফিটা একটু কম করে খেও।

আমার জন্যে কিছুর ভাববার দরকার নেই ত' তোমার। সামনেই আমার ফাইনাল, এবার থেকে উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত পাবে। তুমিও চিঠি লিখবে কম করে। তোমার এলোমেলো চিঠির জ্বালায় পারি না। অত জ্বালালে ফাস্ট ক্রাসের দায়িত্ব কিন্তু চাপতে তোমার ঘাড়। রাজী ত'?

আজ্ঞা হামি। কাকাবাবু ভাল আছেন, চিঠি পেরেছি কলকাতা থেকে।

সুভেচ্ছা জেনো।

ইতি তোমার উদ্ভূত পাইনের মতো অনুমতি।

দাদা আলমোড়াতে এসে অনুমতির কাছে ক্ষমা চাওয়া কিংবা অনুমতিকে নিঃসম্মুখে ক্ষমা করা কোনটাই সম্ভবপর নয় দেখে যে ভাইরী গোছের চিঠিটা লিখেছিলেন সেটা দেখে এবারে—

আলমোড়া

অনু,

প্রথম বৈদিক ডাক্তারসাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো সে দিনটির কথা ভুলব না। মনে হল, উনি আমার কতদিনের চেনা, মনে হল আমার জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়জন ডাক্তার সেন এখন তোমার, আমার মধ্যে একমাত্র-সেতু। আমার পঞ্জির-ভাঙা সেতু। তবু নির্দোষ, তাঁর উপর আমার বিন্দুমাত্র রাগ নেই, কারণ তিনি তোমায় সুখী করেছেন।

সেই প্রথমদিন, বসবার ঘরে, আমার দেখে তুমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলে। তোমার অমন ফর্সা গাল চীনে কাগজের মতো পাংশু হয়ে গেল। তুমি উঠে চলে গেলে মাথা ধরার অছিলায়। ডাক্তার সেন বললেন, তোমার নাকি ওরকম প্রায়ই ধরছে মাথা। কিন্তু আমি জানি, তুমি কাদতে গেলে। শীতকালে আলমোড়ায় যখন তুষার ঝরে সেই শীতল সহজ সুরে তুমিও কাদলে অঝোরে।

কিন্তু একটু পরেই চাক্ষুণ্য হাতে কফি দিয়ে যে অনুমতি ফিবে এলো তখন কি অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। সে অনুমতি আমার একেবারে অচেনা। তাকে আমি কোনোদিন চিনতামই না। সে আমার কফিতে ক' চামচে চিনি লাগবে জানে না, সে আমার আপনি ছাড়া ডাকে না। আমার ছোটবেলার অনুমতি তোমার শেষ কাম্মার সংগে, আমার উপলব্ধি ববে তোমার শেষ কাম্মার সংগে, 'নঃশব্দ' তুষারপাতের মতো ঝরে গেল আমাদের আকাশ থেকে, আমাদের চেনা-জানার দিগন্ত থেকে।

সেদিন আমার অবস্থা কি যে হত আমি নিজেই জানি না, যাঁ না তুনতুনকে না দেখতাম। তুনতুনকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আমি তোমায় সব অপরাধ, তখনকার মতো ভুলে গেলাম। কী ভালো যে লাগলো। অবিকল তোমার মত। সেই রঙ, সেই প্রাণ যাদের দু'পুত্রের মতো টানা-টানা চোখ সেই কোঁকড়া-কোঁকড়া মিলিট চুলের ফপাল, এমন কি প্রজাপতির মতো কমল ঠোঁট দুটোও তোমার—হুবহু।

এই দেখো, আবার সেই অগোছালো হিচ্ছ। ভাগ্যে তুমি আর চিঠি লিখব না, সে চিঠির উত্তরে জবাবদিহি করতে হবে আমার অগোছালোমি। ভালোই হয়ছে। বোঁচেছি, সাজানো-গোছানোর দায় থেকে।

আমি শুদ্ধ ভাবি এও কি সম্ভব? এত নাটক-নভেল পড়েছি, এত গল্প শুনছি, কিন্তু কোনো মেয়েই নয় তোমার মতো। আমার বৃদ্ধি আজীবন খান্ডবদাহনের জন্যে দায়ী তুমি, কিন্তু তোমার যে বিন্দুমাত্র অসুখ আছে দেখে ত' বৃদ্ধি না। নেইও হয়তো।

তুমি আমাকে চিনলেই না অনু? নির্জনে কত সুযোগ পেয়েও তুমি সেই পুরোনো কথাতে আসলেই না। আমি ভুলতে গেলেই তুমি পাহাড়ী মবালের মতো এমন হিম-করা চোখে তাকালে মনে হলো আমি যেন ঝাঞ্জামেব দুঃস্বপ্নেরই পুনরাবৃত্তি করছি। এতও পারো তুমি অনু? কিন্তু পাবো কি কবে?

মাঝে মাঝে একলা বাতে তেজদেব বাংলোর সামনে দিয়ে যখন যাট তখন হঠাৎ চোখে পড়ে বসবার ঘবে বসে তুমি গনগনিয়ে গাইল, ডাক্তারসাহেব ম্যাগাজিন

প্রখ্যাত রহিবিশাবর গীর্হরিনরায়ণ চক্রবর্তী বিজ্ঞানভিত্তিক হস্তবৈখা 'বচার করছেন প্রতি ববিবার সকালে/বিকলে।

“শান্তি নীড়”

কাঁকিনাড়া রেল স্টেশনের 'দুর্বে' রাজলক্ষ্মী বালিকা বিদ্যালয়ের নিঃসৃত।

দেখছেন, নয়ত খাবার ঘরে আদর করে খাওয়াচ্ছে ডাক্তারসাহেবকে। আমি নিজেই বুঝতে পারি না কি করে সহ্য করি আমি, কি করে পারি সহ্য করতে? সহ্য-শক্তি যে আমার এত অসীম, নিজেরই জানা ছিল না আগে। সেই সব মূহুর্তে তোমাকে দেখে আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে সব মেয়েই তোমার মত কি না? একজন পুরুষ কতগুলো দুর্বোধ্যা আওয়াজ করে এবং অনেক কাঠের ধুরো দিয়েই কি তোমাকে আমার কাছ থেকে পর করে দিলো? তোমাদের কাছে বিয়ে, বসবার ঘর এবং দৈনন্দিনতার বাঁধন কি এতই বড় যে তোমরা অবহেলায় আমার মত অবস্থা কিন্তু সং পুরুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি, এমন অবহেলায় ছিনিমিনি খেলো? জানি না। সত্যি, জানি না।

কই? তুমি একদিনও তো আমায় নেমস্ত্র করলে না? হ্যাঁ, শব্দ একদিন ডাক্তারসাহেব করেছিলেন, কিন্তু সেদিন সকাল থেকে তোমার মাথাটা এমন ধরে-ছিল যে বিছানা ছেড়ে তুমি উঠতেই পারলে না। তবু তোমায় ধন্যবাদ, খাবার টেবিলে, আমি যা যা ভালোবাসি, সব তুমি পাঠিয়েছিলে। হয়তো তোমার নিজের হাতেই। সেই ফ্রান্সেড-রাইস, সেই পালংশাকের তরকারী, সেই এ্যাসপ্যারাসের চাটনী। বিশেষ কর অন্য, অনেক দিন অমন ভাল রান্না খাই নি অমন দরদী রান্না। মা-বাবা ছুটি নিয়েছেন আমার জন্মলাভ থেকে সেই কতকাল আগে। মেসের বাবুচাঁর ত কি ভালবাসি, কি না বাসি তা নিয়ে ঘুম নেই। আর সে সবার খোঁজ রাখতো এ পৃথিবীতে একজনই, সে এখন ডাক্তার সুপ্রিয় সেনের ঘরপাী।

যাকগে থাক। আমার দুঃখ আমার। অনেক কাতাল হয়েছি, অনেক উল্লেখ করেছি কিন্তু আর না। লজ্জাহিনেরও লজ্জা আছে।

আমি সরে যাব তোমার জীবন থেকে সে ত জানা। আমি শব্দ চেয়েছিলাম একটু বোঝাপড়া, একটু ভাল কমানো। অন্য, তুমি এমন কুপণ, যে সেটুকুও দিলে না। চললাম আমি স্বর্গ ছেড়ে; আলোমোড়ার স্বর্গ। চিড আর দেওদাবেব পাতা হাওয়ায় হাওয়ায় এমনি কাঁদবেই। কিন্তু তুমি আমার জন্য আর কথনা কাঁদবে না। কান্নাকাটি আমি ভালোবাসি না। হাসিমুখ থেকে অন্য, তখনতাকে তোমার মতো করে গড়ে তুলো, ফবিবল তোমার মত, তোমার মতোই গর্বিত। কিন্তু তোমার মত পাপ-পন্থার জ্ঞান যেন তার না থাকে। কিসিসমত কোনো জরুর মনস্তর কোনো পাপাল সবাকব যেন কন্যারসি না করত হয় জীবনভর কন্যার কান্দে যেন সব পাপসও কিছুই না পাপসার দৃষ্ট না সইতে হয় সে

ছেলের আত্মবিন। শুকে আর একটু সহনশীল কোরো অন্য, ওর আদর্শকে তোমার মতো আকাশ-ছোঁয়া হতে দিও না, দোহাই তোমার, অত্যন্ত প্রয়োজনে তা সামান্যতম শিথিল যেন হতে পারে। একজনের জীবন, বোবন, আশা এবং অস্তিত্বের বিনিময়ে তার আদর্শ যেন মাথা তুলে না ওঠে। আমার অনুরোধ তোমার চেয়ে সামান্য করো তাকে। পৃথিবী অত ভালো না পারে সইতে, না পারে খুলোয় ফেলতে।

তুমি একদিন যেমন করে লিখেছিলে, মন এই আমার শেষ চিঠি। আমিও হয়তো বাঙালোরে ফিরে শীগগিরী তেমনি করে চিঠি দেব। সেই চিঠি শেষ চিঠি। দুটো জীবনের শীলমোহর। যমদূত ছাড়া কেউ ভাঙতে পারবে না সে গালা।

ভগবানে যদিও বিশ্বাস করি নি, কখনো, কারণ বিশ্বাস করবার মতো দুর্বল হই নি কোনোদিন। কিন্তু আজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাকে, তুনতুনকে আর ডাক্তার-সাহেবকে ভালো রাখেন। ভদ্রলোক অতি সজ্জন ব্যক্তি। উন্নতি তাঁর হবেই। তোমাদের কারো সম্বন্ধেই আমার কোনো অভিযোগ নেই আর।

তোমার জন্যে, তোমার মত করেই বলি, রইল আমার জন্ম-জন্মান্তরের ভালোবাসা। নরজন্মে যদি তোমার আদর্শকে একটুখানি শিথিল করতে পারো, তোমার সংঘম, অসংঘমের সীমারেখাকে যদি একটু মৃদুতে পারো তবে আবার আমাদের দেখা হবে; আমাদের কথা হবে, আবার আমরা আনন্দের দৃষ্ট পাব।

বিদায় অন্য-অনুমতি, খুশি মনে বিদায় দিও।

ইতি তোমার অমার্জনীয় মন।

পরদিন ভোরেই এলেন দাদা, হৈ-হৈ করে। মদনকে বললেন, চা খাওয়াও বাবা। তারপর মদনের দিকে চেয়ে বললেন, কাঠের আগুনে আগুনে চেহারা-খানা যা করেছো রতিদেবীর বাবার সান্নিধ্য কি তোমায় চেনে।

বড় বড় প্লাসে চা বানিয়ে দিয়ে গেল মদন। দু' চমকু দিয়েই দাদা আমার দিকে ফিরলেন—বললেন, “There was something being sold Mincing fane, which looked like coffee, tasted like cocoa and was told to be tea.”

চা খেলেন, গল্প কবলেন, পাশেব ঘবেব গল্পখাটী ভদ্রলোকের বেহালা শুনলেন, ভাবপর বললেন, চলো একটু কেনাকাটা করে আসি।

টুকটুকাকি কিনতে লাগলেন ঘরে ঘবে। কান্ধাবার দোকানে গিয়ে জবি-গলো চাইলেন। আমি প্রথম বোদিন

ডাক্তারসাহেবের বাড়ি খাই সোনিয়া কতগুলো ছবি তুলেছিলাম আমিরাহন।

তিনি একটা একটা করে অপলক চোখে দেখলেন ছবিগুলো। বারান্দার আইভি-লতার পাশে দাঁড়ান অনুমতির একটি ছবি ভারি সুন্দর হয়েছে। দেখলাম, দাদার লজ্জুক আঙ্গুলগুলো বারবার পরশ নিলো ছবিখানির। তারপর একে একে সবকটি ছবি, নেগেটিভসমূহ, খামি ভরে আমায় দিয়ে বললেন, ওঁদের দিয়ে দিও ভাই। আমার ত' সময় নেই, এগারো-টাঁ বাস ছাড়ছে।

আন্তে আন্তে বললাম, সত্যিই চললেন তাহলে?

দাদা হাসলেন একটু। বুঝলাম, দাদার শেষ আশাটুকুও আলমোড়ার ধূলিমলিন পথে ঝরে পড়লো। বললেন, হ্যাঁ, চলেই যাই; বুঝলে।

তুমি হয়তো বলবে থাকতে বললাম না কেন? আটকালাম না কেন? কিন্তু ও ক্ষেত্রে কিই বা বলি আমি, কিই বা বলতে পারি। দাদার দুঃখের গভীরতা তো জানো না, আমার অনুরোধের লগি তার তল পেতো না।

পকেটে হাত দিয়ে একটি ছবি বের করলেন দাদা—তুনতুনের। নুপুকে নিয়ে মোড়ায় বসে আছে তুনতুন, সকালের রোশ্নারে হাওয়ার চেয়েও হালকা ঢুল উড়ছে তুনতুনের। দাদা বললেন, এ ছবিটা এবং এ নেগেটিভটা আমার। ওঁদের বলো যে, এ দুটো আমি নিয়ে গেছি।

বললাম, বেশ বলব তাই।

বাজার থেকে ফিরে দাদার সঙ্গে এলাম দাদার বাড়ি পর্বন্ত, তারপর বিদায় নিলাম।

আমার হাত ধরে বললেন, এসো কিন্তু ভাই বাঙালোরে। দাদাকে ভুলো না। আর এই চিঠির পোর্টফোলিওটা তুমিই রাখ। আমার কাছে এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তুমি আমার ছোটভাইয়ের মতো—গ্রিভুনে নিজের তো নেই কেউ। চিঠি দিও। কোলকাতা গেলে আমি নিশ্চয়ই উঠবো তোমার ওখানে।

চলে আসছিলাম। ভারি খারাপ লাগছিল। প্রবাসে, মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়ে মানুষ যে কত কাছে আসতে পারে তা বলে বোঝানো যায় না। এই কদিন আগেও যখন দাদা প্রথম উদয় হলেন ধুমকেতুর মতো ছোট্টলের সামনে, তখন তো চিনতামই না। আর আজ দাদা আলমোড়া ছেড়ে নেবে যাচ্ছেন বলে মনটা এত ভারী লাগছে সে কি বলব। বিশেষ করে তিনি নিজেকে আমার কাছে এতটা মেলে ধরেছেন বলেই হয়তো বা এমন করে বাজছে বিদায় বেলায়।

হঠাৎ পিছ ডাকলেন দাদা, একটু সংকোচ করে বললেন, শোনো, তোমার বাম্‌বাই গল্পটা লিখলে আমাকে এককপি কাগজ পাঠিও কিন্তু।

হেসে ওকে আশ্বস্ত করলাম।

আবার বললেন, 'দেখো, নামগুলো

যেন বদলে দিতে বলাও তাঁকে, তারপর গলা নামিয়ে বললেন, আর শোনো, তোমার বান্ধবীকে বলাও, গল্পে যেন আমার সত্যের মত কাঙ্কাল না করেন, সেখানে আমাকেই যেন জিঁতয়ে দেন, একটা কলমের আঁচড় বই ত' কিছুই নয়?

ভারি দৃষ্টি হল দাদার মুখের দিকে চেয়ে, বললাম, আচ্ছা আমি তাই করব।

আর শোনো, দাদা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, এবার আরো নীচ গলায়, যেন নিজের কাছেই নিজে ঢাকতে চাইছেন কথাটা, কাগজটার এককপি অনুকৃতও পাঠিও তুমি। তোমার বান্ধবীর লেখা, সেই সন্ধেও ত' পাঠাতে পারো তুমি?

বললাম, নিশ্চয়ই পাঠাব। অথবা জোর দিয়ে বললাম, আপনি না বললেও পাঠাতাম।

দাদা যেন খুব খুশি হলেন, ছেলে-মানুষের মত হাত তুলে বললেন, বেশ, বেশ!

হোটেলে গিবে বাসি কাগজটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম।

আচম্কা একটা তীর গাড়ির হন' বাজলো হঠাৎ দরজায় জোরে ধাক্কা পড়লো, গুহসাহেব, গুহসাহেব।

লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

দরজা খুলতেই দেখি ডাক্তারসাহেব।

বললাম, আপনি? কখন ফিরলেন টুর থেকে?

এই মাত্র। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, উনি। এসেই আর এক ঝামেলা। একটা মেজর এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে কোশী স্ট্রীজের পাশে, এগারোটার যে বাসটা ছাড়ে সেটা উল্টে পড়ে গেছে একেবারে নদীর নীচে। ড্রাইভারটা নাকি বেদম মদ গিলেছিল। একমুহূর্ত নষ্ট করবাব সময় নেই। যদিও রিলিফ ভ্যান চলে গেছে আগেই, যাবেন ত' শীগগির আসুন।

সমস্ত আলমোড়া শহরটা ঘুরে গেল আমার মাথার মধ্যে। তারপর কি হল মনে নেই। দেখলাম, স্বাস্থ্যদপ্তরের ভ্যানে বসে আছি, বাঁশী বাজিয়ে তীরবেগে চলেছে ভ্যান নীচের দিকে। সঙ্গে নার্স, ডাক্তার, ইনজেকশান, আরো অনেক, অনেক কিছু। মাথাটা কিম্বিকম্ব করছে ওষুধের গন্ধে। বৃকের ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ।

ডাক্তারসাহেব হেসে বললেন, আপনি ত' আচ্ছা নাভাস লোক মশাই? এ্যাকসিডেন্টের নাম শুনেই এই স্পটে গেলে না কি করবেন?

বাধা দিয়ে মৃদু গলায় বললাম, মৃদু তুলে, না তার জন্যে নয়। দাদা মানে.....

আমার ঠোঁট কাঁপছিল। ডাক্তারসাহেব সোজা তাকালেন আমার মুখের দিকে, মোটা ফ্রেমের চশমাটা অক্সকক করতে লীগলো আমার চোখ জুড়ে।

আবার বললাম, দাদা এ বাসেই গেছেন। মানে বাসসাহেব।

ভীষণ জোরে হাতটা চেপে ধরলেন ডাক্তারসাহেব আমার, দাঁত চেপে বললেন, আপনি ঠিক জানেন?

বললাম, আমাকে ত' তাই বলেছিলেন।

না! না! নিজে নিজেই চোঁচিয়ে রায় দিলেন ডাক্তারসাহেব—উনি যান নি, আর বাসসাহেব এত তাড়াতাড়ি না বলে-কয়ে যাবেনই বা কেন হঠাৎ?

বাদবাকী পথ কথা হলো না কোনো। কোশীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ভ্যান।

নামতেই চোখে পড়লো বাসটা অনেক নীচে, কোশীর ধারে, খয়েরী হিমালয়ের বৃকের এক রক্তাক্ত ক্ষতের মতো দগ্ধগ করছে দুপুন্দের রোদ্দুরে। আশেপাশে সামনের কাটারমল গ্রামের বাসিন্দারা।

কি করণ চাঁৎকার, নারী, পুরুষ, শিশুর। কখনই বা বেঁচে আছে, তবু কি তাদের করুণ আর্তি। দক্ষ হিমালয়ের পাথরেও সে কালোয় জল করে।

আগের রিলিফ ভ্যান গিয়ে পৌঁছনো সত্ত্বেও বাড়ী পাহাড়ের বাধার জন্যে কাজ খুব এগোয় নি মোটেই। পাকদণ্ডী দিয়ে আমরা প্রায় দৌড়ে নামতে লাগলাম। অনেকখানি পথ।

ডাক্তারসাহেব পৌঁছতেই একটা উলসাহ এসো সবাব মধ্যে। নার্স, অন্যান্য ডাক্তাররা সবাই তাঁদের অভ্যস্ত কর্ম-কুশলতায় তৎপর হয়ে উঠলেন। স্ট্রেচার উঠতে লাগলো এক এক করে উপরে।

কোথায় দাদা? বাসের চার পাশ খুঁজলাম আমরা। ভেতর থেকেও সব আহত এবং মৃতদেহ বের করা হয়েছে। কই? নেই।

আহতদের কাজ একটু এগোতেই ডাক্তারসাহেব বললেন একটা পাথরে, সিগারেট ধরালেন একটা—তারপর বললেন, কোথায় দাদা এখানে? উনি আসেনই নি। প্রথম থেকে বর্গিছ আমি যে হঠাৎ উনি আসতেই বা যাবেন কেন? কি চিন্তাটা যে হিজিল এতক্ষণ, উঃ বাঁচলেন আপনি। বিশ্বেস করবেন না, দেখুন আমার পাগলশটা।

—ডাগ্গার সাব! কুর্গিশ জানালো কুঁসার সিং। ডাক্তারসাহেবের আদর্শ। উধার সে একঠো লাস মিল্য।

কাঁহা, ছিটকে উঠলেন ডাক্তারসাহেব। উঁহা নম্শীকা একদম কিনারমে।

সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দৌড়লেন ডাক্তারসাহেব, পিছন গিছন আমি।

বাসটা থেকে প্রায় হাত পাঁচশেক দূরে একটা জংলী-আপেলের কোপের আঁড়ালে একটা দেহ দেখা যাচ্ছে।

ডাক্তারসাহেব আগে আগে দৌড়ে গিয়ে ধমকে দাঁড়ালেন। দেখলাম দাদা চিত হয়ে শুয়ে আছেন। বড় বড় চুল-ওয়ালা মাথাটা অর্ধেক জমে। হাত দুটো

এমন করুণভাবে জড়ো করা মনে হচ্ছে শেষ সময়েও একটু করুণা চাইছেন দাদা। কিন্তু করুণা কার কাছে? ভগবানের কাছে? যে ভগবান উনি কোনোদিন বিশ্বাস করেন নি তার কাছে? না এই রুদ্ধ হিমালয়ের মতোই নিস্বপ্নে অনন্মতির কাছে?

ডাক্তারসাহেবের সহায়তায় সোস্ট-মর্টমের ঝামেলা থেকে রেহাই গেলেন দাদা।

আমরা তার চিতা সাজালাম কটায়-মল পাহাড়ের গায়ে। দাউদাউ করে জ্বলে উঠলে চিতাটা।

ধীরে ধীরে অন্ধকার গ্রাস কালো চারদিক। তারাদের ছায়া কাঁপতে থানলো কোশীর খল জলে। কোশীকে এতদিন সুন্দরী ভাবতাম, আজ হু-হু কয়া চিতার পাশে দাঁড়িয়ে কোশীর কান্দিন্দী রূপ চোখে পড়লো। এত কুৎসিত বদী আগে আর দেখি নি।

ডাক্তারসাহেব ছাড়লেন না কিহুতেই, ধরে নিয়ে গেলেন ওঁর বাড়িতে। পথে আমরা বললেন, অনন্মতির কাছে নোস-সাহেবের কথা বলবেন না যেন, যাই হোক এ কদিন যাওয়া-আসা, গম্প-গম্প বোধ বিনষ্টতা হয়েছে ত'। কেন যে অচনা মানুষ মায়া বাড়াতে আসে!

সে সময়েও হাসিই এল আমার। ভাবলাম মায়া বাড়াতে আসে, না ছাড়াতে? তাছাড়া দাদা আর অনন্মতব ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে কিই বা ধারণা আছে ডাক্তারসাহেবের। দাদা ত' ছিটকে পড়েচল হাজার ফিট উপর থেকে। দাদার শব্দ শুনলে শিল্প-এর উদ্ভতা পাইনের মতো অনন্মতি এত নীচে আছড়ে পড়বেন যে সে পতনের পরিমাপ ফিটে, গজে, কুগোয় না, যার পরিমাপ অনন্মতর সমস্ত জীবন দিয়ে। তবু আমি বললাম, ঠিকই তো! এখন বলা ঠিক হবে না। আপনিই বঝ সময় বুঝে কথাটা বলুন।

অনন্মতি উদ্ভবন হয়ে সময় কুণ-ছিলেন, আমাদের দেখে আশ্বস্ত হলেন। বড় বড় চোখ মেলে শূন্যলেন, নারা গৈছে অনেক, না? বেসনে হাত ধতে ধতে ডাক্তারসাহেব বললেন, অনেক।

খেতে পারলাম না কিছু, শুধু এক-কাপ কফি।

অনন্মতি হেসে বললেন, আপনাব দেখছি আমার ধাত, এসব দেখা কি বহু হয়, বাবাঃ, গা শিবশির করে।

হোটেলে ফিরলাম অনেক রাত। এ্যাকসিডেন্টের খবরটা শহ-ময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে। মোহন সিং আব মদর এসে যখন দাদার কথা শুনলো তখন থরথর করে কেঁদে ফেললো।

ভোবের আলো ভালো করে ফুটত-না-ফুটতে ডাক্তারসাহেব এসে হাসিল। বললেন চেয়ারটা টেনে।

মদন চা এনে দিলো।

রাতে অনুকে বললাম, 'বুঝলেন, দাদার কথা।

ভাবী আর চিন্তিত গলায় ডাক্তার-সাহেব বললেন, এতটা আপসেট হয়ে পড়বে ভাবি নি। তবে বাইরে কিছু প্রকাশ নেই, প্রথমে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদল অনেকক্ষণ, মেয়েদের মায়া তা আমাদের চেয়ে বেশি অনেক, আমারই পাচ্ছিল কান্না। কিন্তু এখন কেমন স্টিফ হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে শকুটা খুব লেগেছে, ভাবছি না বললেই ভাল করতাম। একে ওব মাথাটা ধবীছল দিনকতক, এর ওপর এই সিবীয়াস শকু একটা গোলমেলে কিছু না হয়ে বসে।

আমিও মনে মনে ভাবছিলাম পাগল না হয়ে যায় অনুমতি, ডাক্তারসাহেব ত' শব্দ স্টিফ হওয়াটাই দেখেছেন অনু, অনুমতির বৃকের সবখানি জুড়ে যে হাহাকার উঠছে, পরমপর্যবে শেষ প্রত্যাখ্যানের যে প্লানির গরল উঠছে, তার কি জানেন ডাক্তারসাহেব? কতটুকু জানেন?

ডারি খারাপ লাগছিল আমারও। সেই মূহুর্তেই আলমোড়া থেকে পালাতে ইচ্ছে করছিল, মনে হচ্ছিল দৌড়ে পৌঁরিয়ে যাই কাটারমল পাহাড়ের এলাকা। কোশী প্রেতিনীর অশ্রুহাসি আর আমি সইতে পারবো না। কিন্তু তখনো একটা কাজ আমার বাকী। দাদার চিতাশাস্তি তো করছি, কিন্তু অনুমতির পাঞ্জর-গুলো দিয়ে নতুন করে চিতা ত' সাজাই নি। সেই ক্রিমিনাল পুণ্যকর্ম আমাকে করতেই হবে। কঠিন যদিও খুবই তবু নিরুপায়। সম্পূর্ণ নিরুপায় আমি।

একটু পবেই উঠলেন ডাক্তারসাহেব, বললেন, পাবলে একবার যাবেন আমাদের ওখানে, আমার এখুনি আর একবার যেতে হবে স্পটে, পুর্লিশ-সুপারের সঙ্গে।

আচ্ছা। বললাম আমি।

ডাক্তারসাহেব যাবার পর সেই সকালেই ঠান্ডা জলে স্নান সারলাম। গরম স্নেন কয়ে না আর, তালুতে আগুন, কান আগুন, সারা শরীরটা একটা অগ্নি-কুণ্ড হয়ে উঠেছে। জ্বিনিসপত্র সব গোছ-গাছ করে, মদনকে খাবার তৈরি রাখতে বলে বৌরিয়ে পড়লাম।

ডাক্তারসাহেবের বাংলায় ঢুকতেই এ্যালসেশিয়ানটা তেমনি দৌড়ে এলো, দাদা সঙ্গে থাকতে কোনোদিন আমায় হুক্কেপও কবতো না, আজ কিন্তু তার-স্বরে চাইকাব কবে উঠলো। দাদা যে নেই, এ কথাটাই ধাক্কা দিতে লাগলো মাথার মধ্যে, আর খানখান হয়ে গেলো বাংলোর নিঃশব্দ বিষন্নতা।

বসবার ঘরে দেখলাম অনুমতি সোজা হয়ে বসে, চুলটা খোলা, সকালের রোদটা

এলো চুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃথা সাস্থনা দেবার চেষ্টা করছে। চোখদুটো দিয়ে আগুনের হলুকা বেবুছে। তুনতুন অতান্ত অবাক হয়ে কিন্তু বেশ ভয় পেয়ে একলা মেঝেব ঘুবালের চামড়ায় বসে অপলকে মার দিকে চেয়ে আছে।

ঘরে ঢোকার অনেক পরে আমার নজর কবলেন শ্রীমতী তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'কী যে হল'।

একটু হাসিব সে কি মর্মান্তিক অভিনয়। প্রাগ-ঐতিহাসিক কাল থেকে আজ অবধি আলমোড়ার চিড়েরা যত কান্না কেঁদেছে সব কান্না আজ অনুমতির এই একটি হাসিতে কেন্দ্রীভূত হয়ে ঝরে পড়লো। নিঃশব্দে বসলাম আমি—বললাম, কী হল? আর সইতে পারছেন না, না মিসেস সেন?

আমার কথায় বিদ্রূপ হয়তো একটু ছিল—অনুমতি আব একবার তাকালেন আমার মুখে, তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

বুঝলাম কান্নার এই শব্দ, ষড়দিন বাঁচবেন অনুমতি, ততদিন এই কান্নাকেই সার করবেন।

তবু মুখে বললাম, দেখুন কেঁদে কী করবেন, দাদা ছিলেন অস্পৃশ্য, পাগলামী করে বেড়াতেন, ও'ব মৃত্যু একটু অস্বাভাবিক হওয়া ত' বিচিত্র নয়। যাক কাটারমল যাওয়া তাঁর হল শেষ পর্যন্ত।

ডুকবে কেঁদে উঠলেন এবার অনুমতি।

কিছুক্ষণ পব বললাম, আমি, আজ দুপুরেই ফিরে যাচ্ছি, বুঝলেন?

অনুমতির কানে বোধহয় পৌঁছল না সে কথা, চোখদুটোতে এমন একটা উদাসীন ভাব, কাছে থেকেও এত দূরব ছায়া সে চোখে, যে কোনো কথা অনু-ধাবন করা তখন প্রায় অসম্ভব অনু-মতিব পক্ষে। উঠলাম আমি, পকেট থেকে একটা খাম বেব কবে বললাম, আপনাকে লেখা বোসসাহেবের চিঠি-গুলো রইলো, পড়ে দেখবেন—যদি ক্ষমা করতে পাবেন সেই কাগজকে। যদি বা পারেনও তাব লাভ কি এতে? বড় দৌর করে ফেললেন যে।

মনে মনেই বললাম শেষেব কথাটা।

সোজা বৌরিয়ে এলাম 'পার্বতী' ছেড়ে। আমার সমস্ত সস্তা দিয়ে অনুভব করছিলাম সে অনুমতির মন। দীনা হতভাগিনীর মতো বলছে 'কাগজ! আমার কাগজ কবেহো'।

বুঝলাম যে চোখ দিয়ে অনর্গল লক্ষ্যের হাসতেন অনুমতি সে চোখ দিয়ে পালিয়ে যাওয়া আমার পিছনে তাঁব লক্ষ প্রশ্ন ধাওয়া কবেছে ঘণী-হাওয়া মতো।

বাস স্ট্যান্ড থেকে যখন আমার বাসটা ছাড়ল তখন কেন জানি মনে হলো আল-মোড়ার সম্পূর্ণ অনাস্থ্য এই আমার বৃকের আধখানা এই আলমোড়াতেই পড়ে রইল ছিড়ে-খুঁড়ে। মদন আর মোহান সিং তুলে দিতে এসেছিল। নোংরা জামাকাপড় পরা মদনের অপরিষ্কার গাধা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

ঘুরে ঘুরে বাসটা নামতে লাগলো নীচে, তেমনি গোষ্ঠাতে লাগল এজিনটা, আসবার সময় মনে হচ্ছিল বাসটা রাণী মৌমাছির মত নিজের আনন্দে নিজে গুনগুন করে উঠছে কিন্তু ফেরাব পথে মনে হলো, এ ত' বাস নয়, এ বৃকি অনুমতি সেনেব মন। দাদাব চিঠিগুলো পড়তে পড়তে অনুমতি যেমন ক'রিয়ে কেঁদে উঠছে গুমরে গুমবে, মূচড়ে মূচড়ে, সহনশক্তি প্রান্তদীপ্যমান—আমাদের বাসটাও তেমনি—অবিকল সেই সূবে কাঁদতে কাঁদতে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে নামছে নীচেব দিকে।

অনুমতি সেনের হাতে যে খামটা দিয়েছি তাতে শব্দ দাদার চিঠিগুলোই ছিল। অনুমতিব লেখা সবক'টি চিঠি আমার কাছেই আছে, তোমার হাঙে তুলে দেবার ইচ্ছে।

বাসটা টোল স্টেশনে পৌঁছল।

পিছন ফিরে শেষবারেব মতো আল-মোড়াকে দেখে নিলাম। শানা, লাল, উচু, নীচু, তুলিতে আঁকা ছবিব মতো। মনটা এত ভাল লাগছিল। অপসূ-মাণ, পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো-ছিটানো আলমোড়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখেব কোণ জলে ভিজে এল।

ততক্ষণে বাস কোশীর কাছে এসে পৌঁছেছে। সংগী বাত্রীরা ঝুঁকে পড়ে দেখছে কালকেব এ্যাকসিডেন্টেব ভস্মাবিশিষ্ট। অনেক নীচে, দেখলাম ডাক্তার-সাহেবের বাদামী-হাটা সাদুট পুর্লিশ-সুপারের সঙ্গে। আবো অনেক লোক।

বাসটা যখন কোশীর ঠিক উপরে, রীজের ডেউ-এব নীচে, তখন হঠাৎ একটা কান্ড করে বসলাম, যা পূর্ব মূহুর্তেও কববো বলে স্বপ্নে ভাবি নি—পকেট থেকে অনুমতির চিঠিভবা খাম-খানি বেব কবে ছুড়ে দিলাম কোশীতে।

অনেক নীচে, কোশী প্রেতিনী অশ্রু-হাসি হেসে চলেছে, কাটারমল পাহাড়ের পাশে দাদার চিতার কাছ দিয়ে, এই খরদ্রোতা কোশীতেই ভাসিয়ে দিলাম অনুমতির চিঠি, চিতাভস্মের পিছ পিছ অনুমতির জন্ম-জন্মান্তরের ভালোবাসাব বাহক হয়ে যদি কোনোদিন পৌঁছয় গিয়ে মহাসাগরে, যদি কোনোদিন বিলীন হয় অনুমতির বিশুদ্ধ প্রেম দাদার চিতাভস্মে সেই আশায়।

মৃণাল সেনের ছবিতে সমসাময়িক ঘনো

কল্পতরু সেনগুপ্ত

মৃণাল সেনের শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার লাভ এবং তাঁর হিন্দী ছবি 'ভুবন সোম'-এর স্বর্ণপদক লাভ বাংলা চলচ্চিত্র জগতে বেশ একটা সন্তুষ্টির কারণ হয়েছে। বিশেষ করে চলচ্চিত্র জগতের তরুণরা উৎসাহিত হয়েছে। এই সন্তুষ্টি এবং উৎসাহের কারণ মৃণাল সেন পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পে প্রগতিশীল পরিচালক বলে গণ্য হয়ে থাকেন। তাঁর ছবি আধুনিক বিষয়বস্তু নিয়ে গঠিত এবং তাতে সমসাময়িক চিন্তার প্রভাব দেখা যায়। মেরুপ অধ্যবসায় নিয়ে মৃণাল সেন চলচ্চিত্র শিল্পে স্থান করে নিয়েছেন তা অন্যদের কাছে প্রেরণার বিষয়। অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী মানুষকে সকলে ভালবাসে; বিশেষ করে তিনি যদি প্রগতিশীল হন। মৃণাল সেন প্রথম চলচ্চিত্র শিল্পে এসেছিলেন ১৯৪৩ সালে সাউন্ড রেকর্ডিং বিভাগে, অনেকটা কৌতূহলবশে। কলেজ জীবনে ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য থাকাকালীন আলাপ-আলোচনায় সাহিত্য, শিল্প সম্পর্কে তাঁর কিছুটা ঝোঁক ছিল। এই ঝোঁক নিয়েই চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন দিক তিনি পরীক্ষণ করেছেন, বইপত্র পড়েছেন। এই অনুরাগে উৎসাহ পেয়েছেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে, যাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি সব সমস্ত শিল্প-সাহিত্যের প্রেরণা জোগায়, সৃজনশীল প্রতিভাকে বিকাশের পথ করে দেয়। পৃথিবীর সব দেশেই নতুন প্রতিভার বিকাশের পথে এই অভিজ্ঞতা দেখা যায়। তার কারণ মার্ক্সবাদ একটি বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শন।

জীবনের বহু অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়ে মৃণাল সেন চলচ্চিত্র শিল্পে দাঁড়াবার মত জায়গা করে নিয়েছেন। কখনো খবরের কাগজের অফিসে, কখনো প্রকাশকের দোকানে প্রুফ দেখার কাজ করেছেন। স্বাধীনতা, নতুন সাহিত্য, পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকায় চলচ্চিত্র, সাহিত্য

ইত্যাদি নিয়ে লিখেছেন। সময়ে সময়ে আধা বেকার থেকে পুরো বেকার হয়েছেন, আবার গৃহশিক্ষকতার কাজ জুটিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছেন। এই অবস্থার মধ্যে থেকেই একটি চেকো-স্লোভাক উপন্যাস অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। বইটি ক্যারেল চাপেকের 'চীট'। আর চার্লি চ্যাপলিনের ছোট একটি জীবনী লিখেছেন। বাংলায় চার্লি চ্যাপলিন সম্পর্কে এটিই প্রথম বই। অনেক ছবি ও চার্লির পরিচয়ে সে সময়ে



মৃণাল সেন

এই বইটি খুবই সমাদৃত হয়েছিল। সাংগঠনিক দিক থেকে তিনি যুক্ত ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে। বাস্তববাদী শিল্পসৃষ্টির শিক্ষা ও প্রেরণা পেয়েছেন তিনি গণনাট্য সঙ্ঘের কাজ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নাটক ও সংগীতে সীমাবদ্ধ কাজের মধ্যে থেকেও ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই সঙ্ঘের বেশ কিছু অবদান রয়েছে। বাংলা দেশে যেমন ঋষিক ঘটক, মৃণাল সেন এবং অন্যান্য পরিচালক গণনাট্য সঙ্ঘের

অভিজ্ঞতার চলচ্চিত্র শিল্পে এসেছেন, রোম্বাইতেও কার্যকরী আজনী, প্রেমখা-ওয়ান, সলিল চৌধুরী, বলরাজ সাহনী, খাজা আব্বাস প্রমুখ গীতিকার, সুরকার চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

স্টুডিও চয়রে ঘুরতে ঘুরতে মৃণাল সেন কখনো সে যুগের প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক ডি জি (ধীরেন গাঙ্গুলী), কখনো অন্যদের কাছে হাতে-কলমে কাজ শেখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জীবন-সংগ্রাম তখন এমন চরম হয়ে উঠে যে, শিল্পের জগৎ থেকে তাঁকে সরে আসতে হয় চাকরীর সন্ধানে। একটা ওষুধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরী নিয়ে চলে যেতে হলো উত্তর প্রদেশে। কিন্তু মনটা ত' পড়ে রয়েছে স্টুডিওর ভিতরে, শিল্পের জগতে, কলকাতার বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে। ফিরে এলেন বাংলায়। আবার শুরুর হলো সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্যে দুটি কাজ করে ফেললেন, যা ভাবতে আশ্চর্য মনে হতে পারে; কিন্তু এই তো জীবন। প্রথমত বিয়ে করলেন; সে সময়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্টা এক মহিলাকে, তাঁর নাম গীতা সেন। দ্বিতীয়ত, ১৯৫৬ সালে একটা চর্চা করতে পারলেন। মৃণাল সেনের এই প্রথম ছবির নাম 'রাতভোর'। ছবিটি কাঁচা হাতের। দর্শকরা গ্রহণ করে নি। প্রথম ছবিতে ব্যর্থ হয়ে প্রায় হাল ছেড়ে দেবার মত আবার চাকরীর চেষ্টায় লাগলেন। কিন্তু শিল্পের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না। আশা-নিরাশার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে, মিটিং-মিছিলে সামিল হতে হতে, অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ১৯৫৯ সালে হেমন্ত মুখার্জীর প্রযোজনায় 'নীল আকাশের নীচে' ছবিটি শেষ করলেন। ছবিটি কলকাতা প্রবাসী এক চীনা ফোর্গওয়ালকে নিয়ে, দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের বাণীবাহক। তখন



সত্যজিৎ রায়ের
নির্ভীক ছবি!



পরবর্তী আকর্ষণ

মিনার - বিজলী - ছবিঘর

দেশের অবস্থা ছিল এই ছবির সম্পূর্ণ অনুকূল। দেশবাসী সানন্দে এই ছবি গ্রহণ করলো। মৃণাল সেন পরিচালক হিসাবে স্বীকৃত হলেন, অভিনন্দিত হলেন। এই থেকে চলচ্চিত্র শিল্পের একজন হয়ে গেলেন।

তা বলে ছবি করার পথ যে সুগম হয়ে গেল এমন নয়। এদেশে কোন পরিচালকের একটা ছবি করতে যে পরিশ্রম ও কাঠখড় পোড়াতে হয় তা কোন কোন সময় আত্মসম্মানে লাগে। টাকাওয়ালা লোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রযোজক যোগাড় করা, ছবির মূর্তির জন্য পরিবেশক যোগাড় করা ইত্যাদি কাজগুলি বড় জটিল। কোন পরিচালকের এখানে কাজের নিশ্চয়তা নাই। নিজের খুশিমত ছবি করবো সে পথও প্রায় বন্ধ। প্রযোজক-প্রবিশেকচক্র ইচ্ছা করলে যে কোন পরিচালককে বাতিল করে দিতে পারে, তা তিনি যতবড় প্রতিভাই হোন। এখানে শিল্পকে মুনাকার মানদণ্ডে মানা হয়। অনুকূল পরিস্থিতি এবং স্বাধীন শিল্পসৃষ্টির সুযোগ না থাকার মধ্যে মৃণাল সেন এ পর্যন্ত 'নীল আকাশের নীচের' পরে আটটি ছবি করেছেন। এই ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে : 'বাইশে শ্রাবণ' (১৯৬০); একজন সাধারণ মানুষের জীবনের অনুভূতি ও বিশেষ এক মুহূর্ত নিয়ে এই ছবি। এই ছবিতে প্রথম মাধবী মুখার্জী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসিত হন। মাধবী মুখার্জীকে চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় করানোর কৃতিত্ব মৃণাল সেনের। একই বছরে তাঁরা দু' জনাই রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেলেন, একজন পরিচালনায়, আর একজন অভিনয়ে; এবং মাধবী মুখার্জী আজ বাংলার শ্রেষ্ঠা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। 'পদুমচ' (১৯৬১) ছবিতে মৃণাল সেন মধ্যবর্তী শ্রেণীর মানসিকতা ও পারিবারিক জটিলতার মধ্যে এক প্রেমের কাহিনী উপস্থাপন করলেন। এই ছবিতে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া গেল। তার পরের ছবি 'অবশেষে' (১৯৬৩)। ১৯৬৪ সালে তাঁর 'প্রতিনিধি' ছবিতে এক বিধবা জননীর পুনর্বিবাহের প্রশ্ন তুলে ধরেন। একদিকে প্রেম আর একদিকে সন্তানের মানসিকতা নাটকীয় মূল্য সৃষ্টির সার্থকতার এটি তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি। পরবর্তী ছবি 'আকাশ কুসুম' (১৯৬৫), এইটি বিদ্যুৎ দর্শকদের প্রশংসালভ করতে পারে না। তার প্রধান কারণ ছবির বক্তব্যে স্পষ্টতার অভাব। টিকেট ঘর আর শিল্প দুয়ের মধ্যে আপোষের জন্য দুর্বল দৃষ্টিভঙ্গিতে ছবিটি পরিচালিত হয়েছে—এই সমালোচনা তখন শোনা গেছিল। এই ছবির পরে তাঁকে কিছুটা সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কারণ ছবিটি টিকেট ঘরের

আনুকূল্য না পাওয়ায় প্রযোজকদের আগ্রহ কিছুটা কমে আসে। একদিক থেকে এই পারিস্থিতি আশীর্বাদের কারণ হয়। তিনি ওড়িশার বিখ্যাত সাহিত্যিক কালীন্দীচরণ পানিগ্রাহীর 'মাটির মনিষ' উপন্যাসটির চিত্ররূপ দেবার দায়িত্ব পান। ১৯৬৬ সালে 'মাটির মনিষ' মুক্তি লাভ করে। ওড়িশার মাটি ও মানুষকে নিয়ে ছবি। এই ছবিতে তাঁর কম্পনশক্তি ও শিল্পদৃষ্টির পরিচয় চিত্ররসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাষ্ট্রপতি চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রতিযোগিতায় এই ছবিটি আঞ্চলিক পুরস্কার অর্থাৎ প্রশংসাপত্র লাভ করে। এর পরে ১৯৬৭ সালে মৃণাল সেন কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের একটি শিক্ষামূলক ছবি করার দায়িত্ব পায়। ছবিটি ৪৫ মিনিটের রঙিন ছবি—“মুভিং পারস্পেকটিভ”। পাঁচ হাজার বছরের ভারতবর্ষের ইতিহাসকে এই ছবিতে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে যুদ্ধ-বিবোধী বক্তব্য নিয়ে। আগ্রহ থাকলেও এই ছবিটি আমার দেখা হয় নি। সম্ভবত 'মাটির মনিষ' এবং 'মুভিং পারস্পেকটিভ' এই দুটি ছবির মাধ্যমে বাংলার বাইরের ছবির জগতের সঙ্গে মৃণাল সেনের পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। তারই একটি ফলশ্রুতি 'ভুবন সোম' (১৯৬৯)। সাহিত্যিক বনফুলের একটি ছোট গল্প এই ছবির অবলম্বন। মানুষের জীবন-বিচ্ছিন্ন এক মেজাজী অফিসার, আর তার বিপরীতে এক সরল গ্রাম্য বালিকা। মাটি থেকে উপরে কাচের ঘরে বসা এই দাম্ভিক মানুষটির মনে গ্রাম্য বালিকার সরলতা কিভাবে নাড়া দিল তারই এক ছোট ঘটনাকে মৃণাল সেন শিল্পরসে পূর্ণ করে পরিবেশন করেছেন। ছোট কাহিনীটি যে-কোন সময়ের হতে পারতো, কিন্তু পরিচালক তাকে যুগচেতনা নিয়ে গঠন করেছেন—এ কালের ঘটনাবলীর সঙ্গে মিশিয়ে। এই ছবিটি তাঁকে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান দিল, এই ছবিটি ১৯৬৯ সালের শ্রেষ্ঠ ছবিরূপে পুরস্কৃত হলো। এই স্বীকৃতি এবং পুরস্কারের মধ্যে যেমন মাধবী মুখার্জীর জন্য আনন্দিত, তেমনি 'ভুবন সোম'-এর সরল গ্রাম্য বালিকাবৎ সুহাসিনী মূলের কথা আমাদের মনে পড়ছে। 'ভুবন সোম'-এর পরে মৃণাল সেন 'চিলড্রেনস' ফিল্ম সোসাইটি প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 'ইচ্ছাপূরণ'-এর চিত্ররূপ দিয়েছেন। ছবিটি মুক্তি লাভ করেছে। আর একটি হিন্দী ছবির জন্য তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

মৃণাল সেনের ছবির বৈশিষ্ট্য যুগচেতনা। মাঙ্গবাদে শিক্ষা থাকার জন্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের তিনি চেষ্টা করেন, সময়ের গতিবেগের প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি

কর্ষণের চেষ্টা করেন। একটা আদর্শ-
দ তাঁর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ব্যবসা-
ভিত্তিক ছবির বাজার, ধনীদেব- টাকার
পর ছবির নির্ভরশীলতা এবং ধন-
মিত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক ও সাম্রাজ্য-
দী শক্তির সঙ্গে আপোষে চলার নীতি
সরকারের সেখানে মানিয়ে চলার
নাভাব তাঁর শিল্পভাবনাকে অনেকটা
যন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণ বা নিজের
বধা তাঁর ছবিগুলিতে প্রকাশ পায় বলে
শ্রুতিতে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে
। তাঁর 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে
কটা স্পষ্টতা ছিল যদিও কারিগরী
কতা যেন ছিল না। পরবর্তী ছবি-
লিতে কারিগরী দক্ষতা ক্রমে ক্রমে
ডুবে, কিন্তু বিষয়-বস্তু তার
সুসারী হতে পারে নি। কিন্তু সেটা
ন পূরণ করতে চেয়েছেন সমসাময়িক
না সংযোগ করে। যেমন কোন ছবিতে
বঙ্গীর ট্রাফিক জ্যাম, কোন ছবিতে
তার অচল কলকাতা, কোথাও হাওড়া
লে অফিসগামীদের ভিড়, কখনো
ক্ষুধা কলকাতা—পুলিশের গুলী আর
তিরোধের ঘটনা। এ দৃশ্যগুলি
বিশিষ্টাঙ্গ নশ্বর। এ থেকে বুঝা যায়
সমসাময়িক ঘটনাকে ছবিতে উপস্থিত
রা এবং তা দিয়ে বস্তু প্রকাশের সচেতন
ছা তাঁর আছে, অর্থাৎ রাজনৈতিক
টনাবলীকে আড়াল না করে চিত্রনাট্য
রার মত সত্যতা তাঁর আছে। কিন্তু
তমাস সরকারী অভিভাবকত্ব, সেন্সর
গাডের রাস সৃষ্টি এবং প্রগতিশীল
গবনার প্রযোজকের অভাব এ পথে
শ্রিতবন্ধক। এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্নান্তরে
তিনি বলেছেন : “ছবিতে চন্দ্রনকে
literalise করাটাই যথেষ্ট নয়। যেটা
বিচেয়ে আগে দরকার তা হলো রাজ-
নীতিকে Literalise করা। সেন্সর
গাডের কতারা যদি এই উপকারটা
বতে পারেন তবে ভারতীয় ছবির
টাকার মূল্যি ঘটবে।”



সন্ধ্যা রায়

মৃণাল সেনের শিল্পভাবনায়
ভয়েট চলচ্চিত্র নির্মাতা আইজেন-
নের প্রভাব গোড়াতে ছিল। মাস্ক-
দ বিশ্বাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার
ন সোভিয়েট চলচ্চিত্র সম্পর্কে তিনি
খট ওয়াকিবহাল; এবং পুডোভকিনের
কলকাতা আগমনে বাংলার স্টুডিও-
গতে যে আলোড়ন হয়েছিল তাতে
তিনিও উদ্বেগ হয়েছিলেন। সত্যজিৎ
রায়ের মধ্যেও গোড়াতে আইজেনস্টাইন
রুদ্ধের বাস্তববাদী শিল্পরীতির প্রেরণা
থাকা গেছে। কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠার
বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সত্যজিৎ রায়
রাজতান্ত্রিক শিল্পরীতির জগৎ থেকে
এমসেছেন। বর্তমানে তাঁর মধ্যে
রাজনৈতিক বুদ্ধোন্মাদ বাস্তববাদের
প্রকাশ দেখা যাচ্ছে—এটাই নাকি তাঁর

নিজস্ব শিল্পরীতি। উজ্জ্বল অথচ
চিন্তাহীন, অর্থহীন জীবনযাপন যারা
করে তারাই আজ তাঁর ছবির নায়ক-
নায়িকা। গোড়ার দিকে মৃণাল সেনের
ছবিতে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পরীতির
প্রভাব মনে হলেও আসলে দু' জনার
মধ্যেই ছিল সোভিয়েট বাস্তববাদী
শিল্পরীতির প্রভাব। মৃণাল সেনও ক্রমে
ক্রমে শিল্পব্যক্তির লাভ করেছেন, তাঁর
নিজস্ব ভাবনা জগৎকে রূপ দেবার মত
বিশ্বাস লাভ করেছেন। সমাজতান্ত্রিক
বাস্তবতার শিল্পরীতির প্রভাব অবশ্য
ততটা নয়, যতটা নিওরিয়ালিজম।
'ভুবন সোম' দেখে আমার তাই মনে
হয়েছে। তবে এখনো আশার কথা—
মৃণাল সেনের নায়ক-নায়িকারা প্রায়
সকলে মাটির কাছে মানুষ। নিম্ন-
মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যার মধ্যে তাদের
জীবন। তাদের জীবনে বেঁচে থাকার
সংগ্রাম আছে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে
ক্রোধ আছে। মানুষের প্রতি ভালবাসা
আছে। জীবনসত্যকে শিল্পের আঙ্গিকের
চেতনার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার শিল্প-
কুশলতা তাঁর ছবিতে দেখা যায়। এখানেই
তার শিল্পমাধ্যমের যথোপযুক্ত উপলব্ধি।
বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পের কাছে মানুষের
চাহিদা হলো বলিষ্ঠ ও উদ্দেশ্যময়
প্রেরণা সৃষ্টি, যা মানুষকে জীবন-
সংগ্রামের প্রেরণা দেবে। রাষ্ট্রপতি
চলচ্চিত্র পুরস্কার পাবার পর মৃণাল
সেনের জগৎ আরো প্রসারিত হলো।
শাসকদের অনেক কাছে তিনি যেতে

পারছেন। সুতরাং তাদের অস্বা-
বুদ্ধোন্মাদপ্রণীর ভাবজগৎ তাঁর উপর
প্রভাব সৃষ্টি করতে যে পারে না এমন
মনে করার কারণ নেই। বুদ্ধোন্মাদপ্রণী
কখনো টাকা দিয়ে, কখনো পুরস্কার
দিয়ে প্রতিভাকে কিনে দেয়; মনে বিধা
জাগিয়ে তোলে। এরকম দৃষ্টান্ত অসংখ্য।
এর জবাব আর কেউ দিতে পারে না,
একমাত্র মৃণাল সেনই দিতে পারেন তাঁর
শিল্পের মাধ্যমে। একদিন যাদের অভাব
ও দুঃখের শরিক হয়ে তিনি পথচলা শুরু
করেছিলেন, যে আদর্শবোধ ও যাদের
সংগ্রাম তাঁকে উদ্বেগ করেছিল, অন্তরের
তাগিদে সভা, মিছিল, হরতালে সামিল
হয়ে জীবনকে দেখেছেন, আশা করবো
সেই মানুষের জগতে, মাটির জগতে তিনি
থাকবেন। কারণ মাটি ও মানুষ থেকে
বিচ্ছিন্ন হলে পরাজয় অনিবার্য। গ্রীক
উপকথার হারিকিউলিসের গল্প থেকে
নিশ্চয় আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

মৃণাল সেন বর্তমানে যে বাংলা
ছবিটি করছেন সেই ছবির নাম 'ইন্টার-
ভিউ'। একদিনের কলকাতার ঘটনা.....
সকাল থেকে বিকেল। এই ছবিতে
কলকাতার জীবনকে এককলক দেখার
মধ্যে হয়ত অনেক কথা উপলব্ধি করা
যাবে; বাস্তবকে দেখা যাবে, সে বাস্তব
যতই রুঢ় হোক, তা যেন ব্যক্তির উজ্জ্বল
অপেক্ষা সংগ্রামের উজ্জ্বল্যকেই প্রকাশ
করে। এই আশাই করছি। কারণ মৃণাল
সেন বর্তমানে ভারতের অন্যতম শক্তি-
শালী এবং প্রগতিশীল পরিচালক।

আবার নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গে আবার নির্বাচন হবে। কবে নির্বাচন হবে সেই কথা এখনও ঠিক হয় নি। নির্বাচনে রাজ্যের রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী জোট কি হবে, সেটাও পরিষ্কার নয়—কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা ভোট দেন, তাদের কাছে এই প্রশ্ন এখনই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে, সেই প্রশ্ন হল নির্বাচন তো হবে কিন্তু জয়ী হবে কে? এই জয়ী হবে কে এই প্রশ্ন এইবার যে গুরুত্ব দিয়ে দেখা দিয়েছে, অতীতে কখনও এত গুরুত্ব দিয়ে দেখা দেয় নি। কারণ ১৯৫২ সালের নির্বাচনে বা ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে অথবা ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কে বা কোন দল জয়ী হবে এই প্রশ্ন কারো মনে দেখা দেয় নি। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত নির্বাচনে লড়াই যেভাবে হোক, যাদের সঙ্গেই হোক, জয়ী যে কংগ্রেস হবে এই সম্পর্কে কারো মনে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ দেখা দেয় নি। সকলেই জানতেন ঘটনা যা হোক না কেন জয়ী কংগ্রেস হবে—কমতায় কংগ্রেসই ফিরে আসবে।

কংগ্রেস কমতায় ফিরে আসবে কেন এই প্রশ্নের প্রধান জবাব ছিল এই যে, কংগ্রেসকে পরাজিত করার ক্ষমতা কারো নেই বলে। এই সঙ্গে আর এক মনোভাব ছিল সেটা হল যারা বরাবর শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীহেমন্ত বসু ও শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীকে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করেছেন—এই কথা জেনেই করেছেন যে সরকার গড়বে কংগ্রেস আর এই সব নেতারা বিরোধী দলের নেতায়গেই জনগণের কথা বলবেন। '৬২ সাল পর্যন্ত কেউ এই কথা ভেবে শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীহেমন্ত বসু বা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীকে ভোট দেন নি যে ওরা সব মন্ত্রী হবেন, মন্ত্রী হয়ে তাদের সেবা করবেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে ভোট দিতে যেরে মানুষের মনে প্রথম সংশয় এল এই বলে যে, কংগ্রেসের অবস্থা ভাল না। কংগ্রেসের অবস্থা যে ভাল না, সেটা কিন্তু শব্দ, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির কারণে নয়, সারা ভারতে কংগ্রেসের ইস্পাতকঠিন দুর্গে ফাটল ধরেছে, চিড় ধরেছে। সেই ফাটল ও চিড় দেখে সকলে ভাবলো হয়ত এইবার কংগ্রেসদুর্গ ভেঙে পড়বে। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি কিন্তু কংগ্রেসের পতনের পক্ষে আরো অনুকূল ছিল কারণ রাজ্যের ব্রিটিশনাল বাসগোষ্ঠী শক্তি দীর্ঘদিন কংগ্রেসের কেশাঙ্গ স্পর্শ করতে পারছিল না। ১৯৬৬ সালের শাদা আন্দোলন এবং শ্রীঅজয় মুখার্জী, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ কংগ্রেস থেকে বোয়িয়ে এসে কংগ্রেসকে যে আঘাত করেন, সেই আঘাতে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সম্ভাবনা দেখেই সাধারণ মানুষ ভাবতে শুরু করে এবার পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পরাজয় হতে পারে এবং কংগ্রেস-

বিরোধী শক্তি জয়লাভ করতে পারে। যত '৬৭ সালের নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসতে লাগলো, তত মানুষের মনে রাজ্যে কংগ্রেসের পতন সম্পর্কে আশা জাগতে লাগলো। এবার নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হবে এই আশা কংগ্রেস-বিরোধীদের মূখের কথায় বা বক্তৃতায় হাল না, মানুষ কতকগুলি বাস্তব লক্ষণ দেখেই নিজেরা কংগ্রেসের পরাজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হল।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস জয়ী হবে না—এই কথা ১৯৫২ সাল থেকে স্বর্গত ডঃ শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জী বলেছিলেন, কংগ্রেস ত্যাগ করে এসে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, স্বর্গত ডঃ সুরেন্দ্র দ্যানার্জী বলেছিলেন। কিন্তু কোন

জাঙ্কিয়ে কোন দায়িত্বই কংগ্রেস পরাজিত হয় নি। এইবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে মানুষ নিজে থেকেই কংগ্রেসের পরাজয় সম্ভাবনা দেখতে পেল।

আগেই বলেছি শ্রীঅজয় মুখার্জী আর অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। এই দুই ব্যক্তির কংগ্রেস ত্যাগ শব্দ ব্যক্তিবিশেষের কংগ্রেস ত্যাগ হল না এঁরা দুইজন কংগ্রেসের প্রকৃতপক্ষে দুইখানি শক্তিশালী ডান্ডা ভেঙে দিলেন। এই দুইজন কংগ্রেস ত্যাগ করার ফলে জেলায় জেলায় যাই কংগ্রেসী কংগ্রেস ত্যাগ করলো এবং সকলেই ঘোষণা করলো—আমরাই হলাম আসল কংগ্রেসী। অতীতে যারা কংগ্রেস ত্যাগ করেন তাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করে কংগ্রেসকে ধ্বংস করারই যত্ন নিতেন। কিন্তু শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কবীর কংগ্রেস ধ্বংসের যত্ন নিতেন না এঁরা দুইজন যত্ন নিতেন কংগ্রেসের আদর্শ খারাপ নয়—কংগ্রেসকে খারাপ করছে শ্রীঅতুল ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। ওরা আসল কংগ্রেসী নয়—আসল কংগ্রেস হলাম আমরা। যারা কংগ্রেস দখল করে আছে তারা অনাচারী-দুরাচারী দেশপ্রেমহীন। যারা কংগ্রেসভুক্ত তাঁদের একটা বিরাট অংশ দেখলো তাগে নির্ভর্য দেশপ্রেমে অন্যায়ের জীবনযাত্রার শ্রীঅতুল ঘোষ, শ্রীশচীন চৌধুরী অপেক্ষা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের মধ্যে কংগ্রেসের আদর্শ অনেক বেশি প্রতিফলিত। এই অবস্থায় কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কংগ্রেস সমর্থকরূপে এক বিরাট অংশ কংগ্রেস থেকে বোয়িয়ে এসে শ্রীঅতুল ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের কংগ্রেসকে আঘাত হানলো। এই আঘাত কত জোরদার সে কথা অন্য ভাষায় বলবার আগে একটা সামান্য তথ্য দিয়ে নিতে চাই। এই তথ্য হল ১৯৬২ সালে কংগ্রেসের মনোমানে নির্বাচন বিধানসভা সদস্যদের মধ্যে ৪৬ জন সদস্য কংগ্রেসের মনোনয়ন না নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়ালো। অবশ্য বেশ কিছু কংগ্রেসকর্মী বরাবরই কংগ্রেস মনোনয়ন না পেয়ে কংগ্রেস-বিরোধী দাঁড়ান—যেমন ১৯৬২ সালে এই রকম দুই জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, এই দুই জন হলেন শ্রীমেনোবজ্ঞন বসু ও শ্রীমহান হালদার।

'৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসে বিপর্যয়ের মূলে আরো অনেকগুলি কারণ কাজ করেছিল। যেমন কংগ্রেসের রাজ্যে কমতায় অধিষ্ঠিত থাকবার অন্যতম শর্ত মত ছিল সংখ্যালঘুসম্প্রদায়। রাজ্যে সংখ্যালঘুসম্প্রদায় ভয়ভীতিসহ অনেক কারণে সব সময় কংগ্রেস তথা শাসন পাটিকে সমর্থন করে আসছিল। কিন্তু '৬৭ সালে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো রাজ্যের কংগ্রেসের কমতায় অধিষ্ঠিত থাকার মূলে সংখ্যালঘুসম্প্রদায় কি পরি-

শক্তি যোগাত তার হিসাব পাওয়া যায় বিভিন্ন জেলায় সংখ্যালঘু ভোটার সংখ্যা। মার্কিনীদ্বাদে মোট ভোটারের শতকরা ৫৫ জন, মালাদহে শতকরা ৩৭ জন, পশ্চিম দিনাজপুরে শতকরা ৩০ জন, ২৪ পরগনার শতকরা ২৫ জন, নদীয়ায় শতকরা ২০ জন সংখ্যালঘু ভোটার। এই সংখ্যক ভোটাররা কমপক্ষে ২৮ জন সদস্য নির্বাচিত কবে থাকেন। ১৯৬২ সালে এইরকম সংখ্যালঘু আধিক্যে নির্বাচিত ২৬ জনের মধ্যে ২৫ জনই ছিলেন কংগ্রেস দলের। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেস-বিরোধী হয়ে গেল। কংগ্রেস-বিরোধী এই সংখ্যালঘুসম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দেন প্রধানত কবীর চাট্‌স্বরয় শ্রীহামায়ন কবীর, শ্রীজাহাঙ্গীর কবীর, মহম্মদ মাল্লাজান, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, সেকেন্দার মোল্লা প্রমুখ।

কংগ্রেসের বিশ বৎসর ক্ষমতায় থাকায় মূলে দুটো জেলার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। এই দুটি জেলা মেদিনীপুর ও চাঁদপুর। ২৪ পরগনা জেলায় ৪২টা আসন আর মেদিনীপুরে ৩২টা আসন রাখার বংগ্রেসকে সবচেয়ে শক্তি জুগিয়েছে। ১৯৬২ সালে ২৪ পরগণার ৪২টা আসনের মধ্যে ৩০টা আসন কংগ্রেস পার আর মেদিনীপুরে ৩২টা আসনের মধ্যে ২৭টা আসন কংগ্রেস দখল করে। অর্থাৎ বাজ্যের মোট বিধানসভা সদস্যের মধ্যে ৭৪টা আসনের ৬০টা আসন কংগ্রেস দখল করলো এই দুই জেলা থেকে। এই দুই জেলাতে কংগ্রেসের ভরসাভাবই হয়েছিল—তার মূলে ছিল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহামায়ন কবীরের কংগ্রেস ত্যাগ। মেদিনীপুরে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও ২৪ পরগণা জেলায় শ্রীহামায়ন কবীর কংগ্রেসকে পরাস্ত করলেন। ২৪ পরগণা মেদিনীপুরে কংগ্রেস হাত ছাড়া হওয়ায় আজাই কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে গেল।

১৯৬৭ সালে কংগ্রেস পরাজিত হল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে পরাজয় কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ ছিল তা হল না। কারণ '৬৭ সালের নির্বাচনেও বাজ্যের বামপন্থী শক্তি তথা কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি একাবাক্য হয়ে লড়াই করে নি। এক আত্মঘাতী রাজনীতির রূপে উঠলো ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে। এই আত্মঘাতী রাজনীতির একটা লক্ষ্য দেখা গেল যে কল হ'ল কংগ্রেসের পতনের জনসমর্থন প্রতিষ্ঠা পায় গেল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিকল্প কি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানাবই মানুষ খুঁজে পেল না, তবে কংগ্রেস-বিরোধী ভোট বা এতদিন ছড়িয়ে পড়ল, বিক্ষিপ্তভাবে ছিল তারা বেশ কিছুটা সাজা লাইনে এল। কংগ্রেস যে গড় জনসমর্থন হাবায় নি তার প্রমাণ হল চারটি নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোটের হার।

১৯৫২ ১৪১ আসন ভোট ৩১ শতাংশ
১৯৫৭ ১৫২ " ভোট ৪৬-১৪ "

১৯৬২ ১৫৭ " ভোট ৪৫-১
১৯৬৭ ১২৭ " ভোট ৪১-১০
১৯৬৯ ৫৭ " ভোট ৪০-৪২ "

কাজেই ভোটের হার কিন্তু কংগ্রেসের কি ১৯৬৭ সালে কি ১৯৬৯ সালে খুব বেশি হ্রাস পায় নি। যাই হোক ১৯৬৭ সালের কথাতেই ফিরে আসা যাক। ১৯৬৭ সালে প্রকৃতপক্ষে বাজ্যের তিনটি শক্তি তাদের নিজস্ব শক্তির একটা পরিচয় দিল। এই শক্তি তিনটি হল কংগ্রেস, সংযুক্ত বাম-পন্থী ফ্রন্ট (ইউ এল এফ) সংযুক্ত বামপন্থী গণফ্রন্ট (পি ইউ এল এফ) সংযুক্ত ফ্রন্টে ছিল সি পি এম, আব এস পি, এস এস পি, এস ইউ সি, ওয়ার্কার্স পার্টি, আর্ম-বাদী ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর সি পি আই। সংযুক্ত গণফ্রন্টে ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি, বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক, বঙ্গশৈলিক পার্টি। নির্বাচনী সংগ্রামে কংগ্রেস সি পি এমকেই তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য করলো। আর মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য করলো সি পি আই ও বাংলা কংগ্রেসকে। সি পি এম নেতা যখন সি পি আই দলের কোন নেতার জামানত জব্বের পণ গ্রহণ করেন তখন মূল শত্রু গোণ হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালে বামপন্থী শক্তি দুই ফ্রন্ট হয়ে একদিকে আত্মঘাতী সংগ্রাম করলো অপবাদকে কংগ্রেস গোণ শত্রু হিসাবে গ্রহণ করলো এর ফল হল এই কংগ্রেসের যে বিপর্যয় '৬৭ সালে হওয়া বাস্তবসম্মত ছিল তা না হয়ে কংগ্রেস লাভবান হল। সেই দিন যদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা ফ্রন্ট হত তবে কংগ্রেস ১২৭টি আসন অপেক্ষা আরো ৫৭টি আসন কম পেত। আর যদি সি পি এম বা অন্য শক্তিও কংগ্রেস-বিরোধী জোটে সামিল হত তবে কংগ্রেস ৫০টির বেশি আসন পেত না। অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচনে বামপন্থীরা একজোট হয়ে কংগ্রেসকে যেখানে নামিয়ে এনেছিল ১৯৬৭ সালেই সেখানে আনতে পারতো। ১২৭টি আসন থেকে কংগ্রেস মধ্যবর্তী নির্বাচনে ৫৭তে নেমে এসেছিল এই ক্ষেত্রে যদি '৬৭ সালেই কংগ্রেস ৫০টি আসন পেত তবে মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস কোনরকমেই ২৫টির বেশি আসন পেত না। '৬৭ সালের আত্মঘাতী রাজনীতির মধ্যে বামপন্থী দলের যে চিত্র পাওয়া গেল সেটা বেশ শিক্ষণীয়। যেমন '৬৭ সালে মোট ভোট প্রদত্ত হল ১ কোটি ২৪ লক্ষ। এই ভোটের মধ্যে কংগ্রেস পেল ৫১,৯৮,৭৪০, সি পি এম পেল ২০,১৭,২৪৬, বাংলা কংগ্রেস পেল ১০,২৫,০১০, সি পি আই পেল ৮,২২,০৫০, ফরোয়ার্ড ব্লক পেল ৪,৯১,৬০৪। এ হল মাত্র বড় চারটি দলের হিসাব। এই হিসাবে সমস্ত মনে রাখা দরকার কংগ্রেস ২৮০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ওপরের ভোট পেয়েছে অন্যরা কেউ

কংগ্রেসের তিন ভাগের কেউ দশ ভাগের একভাগ কোন প্রার্থী দিয়ে এই ভোট পায়। এর মধ্যে চারটি দল কংগ্রেস থেকে প্রায় ৭০ লক্ষ ভোট বেশি পায়। সমগ্র ভোটের মধ্যে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট পেয়েছে ৩০ লক্ষ ভোট, বামপন্থীগণফ্রন্ট পেয়েছিল ২৫ লক্ষ ভোট।

দুই ফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে ত্রিকোণ প্রতি-স্বস্তিতার ৪১টি কেন্দ্রে কংগ্রেসের পরাজয় হয়। সংযুক্ত ফ্রন্ট কংগ্রেস ও গণবামফ্রন্টকে পরাজিত করে জয়লাভ করে ২৩টা আসনে। কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টকে পরাজিত করে গণবামফ্রন্ট জয়যুক্ত হয় ১৭টি আসনে। ত্রিকোণ প্রতিস্বস্তিতার সি পি এম পরাজিত করে ৮ জন সি পি আই, ৫ জন বাংলা কংগ্রেস ও ৬ জন ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থীকে। সি পি এম পরাজিত হয় সি পি আই-এর কাছে ৪টি আসনে, ফরোয়ার্ড ব্লকের কাছে ৪টি আসনে এবং বাংলা কংগ্রেসের কাছে ৫টি আসনে। এই দুই ফ্রন্টে সি পি এম, জনসংঘ ছিল না। সি পি এম ২৬টি আসনে প্রতি-স্বস্তিতা করে সাতটি আসন লাভ করে অবশিষ্ট ১৯টি আসনে বামপন্থী ভোট নষ্ট করে, জনসংঘ ৫৮টি আসনে প্রার্থী দিয়ে একটি আসনে জয়লাভ করে অবশিষ্ট ৫৭টি আসনে বামপন্থী ভোট নষ্ট করে।

বামপন্থী শক্তির অনৈক্যের ফলে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ২৯টা অতিরিক্ত আসন লাভ করে। কংগ্রেস তার নিজস্ব অবস্থার মধ্যেও ২৯টা অতিরিক্ত আসন লাভ করেছিল সে শত্রু বামপন্থী অনৈক্যের ফসল হিসাবে। সি পি এম ১০৫টি আসনে প্রতিস্বস্তিতা করে ৪০টি আসনে জয়লাভ করে—কিন্তু জামানত হারায় ১৭টি আসনে। কম্যুনিস্ট পার্টি ৬২টি আসনে লড়াই করে ১৬টি আসন লাভ করে কিন্তু জামানত হারায় ২০টা আসনে। কিন্তু মধ্যবর্তী নির্বাচনে যখন বামপন্থী একা হল তখন চিঠটা একেবারে ঘুরে গেল। সি পি এম ১৭টি আসনে প্রতি-স্বস্তিতা করে ৮০টি আসন লাভ করে, কম্যুনিস্ট পার্টি ৩৬টা আসনে প্রার্থী নিয়ে ৩০টি আসন পেয়েছেন। এই দুই পার্টির কোন প্রার্থীরই জামানত জব্ব হয় নাই। শত্রু কম্যুনিস্ট পার্টি নয়, বাংলা কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকও একইভাবে লাভবান হয়।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আশো কিছু লক্ষণীয় ঘটনা আছে যেমন আগেই বলেছি কংগ্রেসের আসন হ্রাস পেলেও ভোটের হার হ্রাস পায় নি। সেই সত্ত্বেও কংগ্রেস অনেক আসন হারিয়েছে কিন্তু ২৩টা নতুন আসন লাভ করেছে। ভোটের দিকে কংগ্রেস পুরুলিয়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও মার্কিনীদ্বাদ জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় ৪৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২২টা, যুক্তফ্রন্ট ২১টা আসন লাভ করে। তপশীলী

১. সংরক্ষিত ১৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট মাত্র চারটি আসন লাভ করে। আর একটি লক্ষণীয় দিক হল, প্রগতিশীল মুসলীম লীগ ও জনসংঘসহ কিছু শক্তি কিছু বেশ মাথা উঁচু করবার শক্তি পেয়েছে '৬৯ সালের মধ্যবর্তী' নির্বাচনে। আই এন ডি এফ একটি, মুসলীম লীগ তিনটি আসন দখল করে। জনসংঘ মুসলীম লীগ মালদহ, মুন্সিরাবাদ জেলার বেশ ভাল ভোট পায়। জনসংঘ প্রার্থী জলপাই, জগন্নাথপুরে ১০ হাজারের ওপর এবং ইংলিশ বাজারে ৫ হাজার ভোট পায়। মুসলীম লীগ গড়ে প্রতি আসনে ৫১২০টা ভোট পেয়েছে।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে জেলাওয়ারী নির্বাচনী চিত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, ২৪ পবনা, মেদিনীপুর, নদীয়া জেলা ছাড়া পশ্চিম বাংলার বাকী ১৩টি জেলার কংগ্রেসের শক্তি ও আসন প্রায় অপরিবর্তিত। উপরের তিনটি জেলা বাদ দিলে বাকী জেলাগুলির মোট ১৮২টি নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে কংগ্রেস ৯৯টি আসন লাভ করেছে। আর মেদিনীপুর নদীয়া ও ২৪ পরগনা জেলার ৯৯টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ২৮টি আসন। এই তিন জেলায় সি পি এম, সি পি আই ও বাংলা কংগ্রেস পেয়েছে মোট ৫৭টি আসন।

এই দীর্ঘ বিবরণ ও হিসাব-নিকাশের মধ্যে রয়েছে আগামী নির্বাচনের ভবিষ্যৎ। ১৯৬৭ সালে রাজ্যের বামপন্থী শক্তি দ্বিধাবিভক্ত ও ছিন্নমস্তা রূপ নিয়ে একটা ফলাফল লাভ করেছিল আর ১৯৬৯ সালে সেই রাজনীতি অস্থিরতা থেকে স্থিরতার দিকে যাত্রা করে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচন ও ১৯৬৯ সালের রাজনীতির যে গুণগত পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তন দেখা ধবেই পাওয়া যাবে আগামী দিনের নির্বাচনী ফলাফলের হৃদিস।

১৯৬৭ সাল ও ১৯৬৯ সালের রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাসের মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে যে পরিবর্তন নির্বাচনী ফলাফল পরিবর্তন আনবে। এই পরিবর্তনের প্রথম হল ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে দুইটি নির্বাচনেই দুটো ধর্নি প্রধান ছিল—এক পক্ষের ধর্নি ছিল কংগ্রেসকে শেষ কর নিম্নল কব, কংগ্রেস হল প্রগতির শত্রু প্রতিজ্ঞা-শীলতার বাহন। অপর পক্ষের ধর্নি ছিল সি পি এমসহ বামপন্থীরা হল প্রগতি ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাজ প্রতিষ্ঠার শত্রু। অর্থাৎ দুই পক্ষের মূল শত্রুনির্ণয়ে ক্ষেত্রে একটা সঠিক বক্তব্য ছিল। কিন্তু এইবার কে কার শত্রু কে কাকে নিম্নল করবে সেই প্রশ্নেই মস্তবড় ছট পাকিয়ে আছে। কংগ্রেস যদি মূল শত্রু হয়—তবে সেই কংগ্রেস কি আজ শক্তিশালী দুর্বল বাহ্য-রাজনীতিতে খর্ব-প্রভাব। বরং কংগ্রেসের শক্তিই একমাত্র বড় শক্তি নয়—কংগ্রেসই তো অন্যের ঢালের নীচুতে আশ্রয় খুঁজছে। বরং কংগ্রেস থেকে অন্য আরো বড় শক্তি রয়েছে তারাও যখন

ঘোষণা করেছে। আর কংগ্রেস বলেও আজ আর নির্দিষ্ট একটা শক্তি নেই—সেই খানেও দুটো কংগ্রেস পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। শত্রু শত্রু আমার মিত্র এই থিয়োরী মত একটা কংগ্রেস তো নিশ্চয়ই পরোক্ষ বশু শক্তিতে পরিণত হবে। আবার বামপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে স্বেচ্ছাও এই একই প্রশ্ন দেখা দেবে। মূল শত্রু কোন বামপন্থী শক্তি আজ তো একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বামপন্থীদের এক শত্রু-রূপে ব্রাহ্মণ করা যাবে না। তাই আজ কংগ্রেস বলতেও যেমন কোন একটা শত্রুকে চিহ্নিত করা যাবে না তেমনি বামপন্থী বা কংগ্রেস-বিরোধী বলেও একটা শত্রুকে চিহ্নিত করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে লড়াইটা হবে সকলের বিরুদ্ধে সকলের। এব ফলে কংগ্রেসের একটা অংশ যেমন কোন একটা কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির সঙ্গে মিতালিতে আবদ্ধ হবে তেমনি বামপন্থীদের ভাগ কোন-না-কোন কোন না-কোন কংগ্রেসকে মিত্রশত্রু হিসাবে গ্রহণ করবে। এটা যে লিপিতভাবে বা কোন চুক্তি করে হবে এমন নয় পদাঙ্গু আড়ালে অথবা পরোক্ষ কার্যকরণে এই শত্রুর শত্রুর সঙ্গে এক এক পক্ষের মিতালি হবে।

এইবার আরো একটা পরিষ্কারভাবে রাজনৈতিক দলের সর্বশেষ শক্তি সমাবেশ ও জোটবন্দীরূপ কি হতে পারে সেটা হিসাব করে দেখা যাক। এই শক্তি সমাবেশের মধ্যেই ভবিষ্যৎ লড়াই ও সাফল্যের সম্ভাবনাটা আংশিকভাবে হলেও ধরা পড়বে।

কংগ্রেস ও তার ভবিষ্যৎ

কংগ্রেস বলতে আজ আর কংগ্রেস নয়—কংগ্রেস বলতে আজ দুটো আলাদা সংগঠন হয়ে গেছে। কিন্তু ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ দুই সংগঠনেরই এক। আগামী নির্বাচন সে যে দিন হোক সেই দিন এই দুই কংগ্রেসের লড়াই খুব আকর্ষণীয় হবে। রাজ্যের বিধানসভার সর্বমোট ২৮০টি আসনে প্রার্থী দেবার ক্ষমতা এককভাবে কোন কংগ্রেসের নেই—তাই দুই কংগ্রেসই রাজ্য ভিত্তিতে অথবা অঞ্চল ভিত্তিতে অন্য দলের সঙ্গে মিতালি করবে। বাজ্যের শাসক কংগ্রেসের লক্ষ হল বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি করা আর সংগঠন কংগ্রেস সেই কারণেই বাংলা কংগ্রেস বা আট পার্টি জোটের বিরোধী শক্তির সঙ্গেই সমঝোতা করবে। দুই কংগ্রেসের সমঝোতা কিন্তু লিপিত-পাণ্ডিতভাবে অথবা কেবল-খাঁচে পশ্চিমবঙ্গে হবার সম্ভাবনা খুবই কম। পশ্চিমবঙ্গে যেটা হবে সেটা হল আট পার্টি জোট ও বাংলা কংগ্রেস হয়ত কিছু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে শাসক কংগ্রেসকে ছেড়ে দেবে সি পি এম-ও নিষ্কট কংগ্রেসকে কিছু আসন ছেড়ে দেবে। তবে দুই ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গে এই সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে। কোন কংগ্রেসের সঙ্গে কোন ফ্রন্টের সমঝোতা না হবার প্রধান কারণ হল এই যে, কোন এক কংগ্রেস যদি

আসন ছেড়ে দেয় তবে আসনে আর এক কংগ্রেস প্রার্থী দেবেই। যেমন শাসক কংগ্রেস আট পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করলো যে, তারা ৫০টা আসনে প্রার্থী দেবে অবশিষ্ট ২৩০টি আসনে আট পার্টি জোট বাংলা কংগ্রেস কংগ্রেসকে সমর্থন করবে। তখন দেখা যাবে ঐ ২৩০টি আসনই সংগঠন কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে এবং ঐ সব এলাকার শাসক কংগ্রেস রাতারাতি সংগঠন কংগ্রেস হয়ে গেছে। একইভাবে সংগঠন কংগ্রেস যদি ৫০টা আসন নিজেদের বেখে সি পি এম বা ছয় পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করে তবে একইভাবে সংগঠন কংগ্রেসের ছেড়ে দেওয়া আসনে নব কংগ্রেস প্রার্থী দেবে এবং সংগঠন কংগ্রেসের লোকেরা রাতারাতি নব কংগ্রেস হয়ে যাবে। ফলে, বামপন্থীদের যে জোটই হোক না কেন এক কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করলে আর এক কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েই। আব সেই সমস্ত কংগ্রেস সমর্থকরা কখনই বিচার করবে না কে কে শাসক কংগ্রেস, কে সংগঠন কংগ্রেস। কিন্তু এ ছাড়াও রাজ্যের কোন কংগ্রেসের সঙ্গেই কোন বামপন্থী ফ্রন্টের সমঝোতা হতে পারে না। কেবলবে খাঁচেও না। তাব কারণ হল—পশ্চিমবঙ্গে এখনও নির্বাচনী মেজাজ সংগঠিত হবে কংগ্রেস-বিরোধী হবে। কেবলে সি পি এমের নেতৃত্বে ফ্রন্ট হিসাবে একটা শক্তি ক্ষমতায় বসেছিল, সি পি আই-এর নেতৃত্বেও ফ্রন্ট রাজ্য শাসন করেছে। কংগ্রেস সেখানে ক্ষমতা দখলের শক্তি নয়—মাত্র গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে সে নির্দিষ্ট শক্তি ক্ষমতায় আসতে না পারে তার জন্য মদত জুগিয়েছে মাত্র। যেমন শাসক কংগ্রেস সি পি আই-এর সঙ্গে জোট বেঁধেছিল এই কারণে যে, সি পি এম নেতৃত্বে গঠিত ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসতে না পারে আবার সংগঠন কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংগঠনের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল এইভাবে যে, সি পি আই-মুসলিম লীগ শক্ত জোট ক্ষমতায় আসতে না পারে। নির্বাচনের পরে কি হবে এই সম্পর্কে বেশ যোগায়ে অকণ্ঠা বেখে নির্বাচন হল। অপব একটা বড় কথা পশ্চিমবঙ্গে হল এই যে, কোন জোটেরই কংগ্রেসকে কোন আসন ছেড়ে দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। যেমন শাসক কংগ্রেস এর বর্তমান ৪৫টা দখলের আসন সে দখলে রেখেই অন্য দলের সঙ্গে সমঝোতা করবে সংগঠন কংগ্রেসও তার দলের ১২ জন নির্বাচিত সদস্যের আসন হাতে বেখে অন্যের সঙ্গে সমঝোতা করবে। কিন্তু দুই কংগ্রেসের কোন আসনই কি কোন বাম জোটের ছাড়া সম্ভব হবে? কখনই নয় যেমন কোচবিহারে গত নির্বাচনে আট আসনের মধ্যে ছয়টি আসন কংগ্রেস দখল করেছিল ফরোয়ার্ড ব্লক, সি পি এম পশ্চিমবঙ্গ করে। তাই ফরোয়ার্ড ব্লক

শাসক কংগ্রেসের গত নির্বাচনে জয়ী সদস্য শ্রীঅনিমেষ মুখার্জীর জন্য শ্রীকমল গুহের আসন ছেড়ে দেবে না শ্রীসন্তোষ রায়ের জন্য কোচবিহার সফরের শ্রীদীপক সেনগুপ্তের আসন ছেড়ে দেবে। আবার একইভাবে কি সংগঠন কংগ্রেসের শ্রীফজলুর রহমানের আসন কি সি পি এম ছেড়ে দেবে বা হিমিশ-চন্দ্রপুর আসন ইলিয়াসবাজীকে সংগঠন কংগ্রেসের শ্রীবীরেন সৈয়দ ছেড়ে দেবে। কাজেই সেখানে নির্বাচিত সদস্যর আসনই ছাড়া কোন পক্ষের সম্ভব হবে না। সেখানে অন্য আসনের প্রশ্ন আসতেই পারে না। তবে হ্যাঁ কোন কোন আসনে প্রার্থী না দিয়ে পরোক্ষ সমর্থন করা হতে পারে মাত্র। যেমন বরাহনগরে সংগঠন কংগ্রেসের প্রার্থী থাকলে শ্রীজ্যোতি বসুমতি বিবৃতিতে সেখানে প্রার্থী না দিয়ে অথবা তমলুকে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী না দিয়ে অন্য প্রার্থীকে সমর্থন করা যেতে পারে মাত্র। সেটাও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে খুব বেশী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন সম্ভব হবে না। যা হোক, পশ্চিমবঙ্গে দুই কংগ্রেসের সংগে রাজ্যের আগামী দিনের বাজ্যের দুই বাম-পন্থী প্রবর্তন কোন স্থায়ী জোটবন্দী বা সমঝোতা হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু ফ্রন্টে না যেয়ে দুই কংগ্রেস কতটা সফল্য অর্জন করতে পারে সেটা বিচার করে দেখা যাক। গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে বা ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস শতকরা প্রায় ৪০টা ভোট পেয়েছিল কিন্তু এইবার সেই কংগ্রেস নেই। রাজ্যে দুই কংগ্রেসের অবস্থা হল এই এরা দুইভাগে ভাগ হয়েছে। একদিকে আছে গ্লামার আর একদিকে আছে কিছু সংগঠন। শাসক কংগ্রেস পেয়েছে গ্লামার কিন্তু প্রকৃত সংগঠন এখনও অনেকটা হাওয়ার ওপর শাসক কংগ্রেস ঘুরে বেড়াচ্ছে। দল গঠিত হবার পর দলকে সংগঠিত করার যে সম্ভাবনা এসেছিল সেই সম্ভাবনা একেবারেই কাজে লাগানো হয় নি। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, শ্রীভরদ্বাকান্তি ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শাসক কংগ্রেসের নেতৃত্বে থেকে সংগঠনের ভীতে মজবুত করতে দু'বৎসরে পাবেন নি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জয়গান গেয়ে তারা সংগঠনকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সত্য কিন্তু যে দৃঢ়তা দিয়ে সংগঠন কংগ্রেসের কাজ থেকে সংগঠন কেড়ে নেওয়া বা বাজ্যে কংগ্রেসের যে হাউ কোর আছে তাকে দখল করা সেটা কোন প্রকারেই সম্ভব হয় নি। পবিত্র যে সব নেতৃবৃন্দ শাসক কংগ্রেসকে মজবুত করতে পারেননি

শ্রীগোপালদাস নাগ, জলপাইগুড়ির শ্রীপীযুষ মুখার্জী, মুর্শিদাবাদের শ্রীআবদুস সাত্তার পশ্চিম দিনাজপুরের জয়নাল আবেদিন, মালদেহের শ্রী এ বি খানচৌধুরী, নদীয়ার শ্রীস্মরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার শ্রীবলাই পাল প্রমুখ ব্যক্তিরা কেউ খুব বড় নেতা নন সত্য কিন্তু ৬৯বি চৌরঙ্গী রোডের কংগ্রেস ভবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে এরাই ছিলেন আগ্রণী সৈনিক। কিন্তু কংগ্রেস ভাগ হবার পর এই নেতাদের অনেকে বসে পড়ছেন, অনেকে নামকোয়ান্ডে আছেন কেউ কেউ আবার সংগঠন কংগ্রেসে ফিরে গেছেন। একথাও কেউ প্রতিবাদ করতে পারেন কিন্তু বাস্তবে সত্য।

সংগঠন কংগ্রেসের অবস্থা কিন্তু শাসক কংগ্রেস থেকে কিছু ভাল নয়। সংগঠন কংগ্রেস দলের হাতে সত্যি সংগঠন ছিল কিন্তু সেই সংগঠন আজ আর কোন কাজেই লাগাবার সুযোগ নেই। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের দুই দুর্গ গড়ে তুলতে যার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী যার নেতৃত্বে কংগ্রেসকে ক্ষমতা দখল ও ভোগের সাফল্য বার বার নিয়ে গেছে তিনি ছিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। যুগের হাওয়া ও কালের গতি বদলি চলবার মত কাণ্ডজ্ঞান শ্রীঅতুল্য ঘোষের মত খুব কম নেতারই আছে। তাই শ্রীঘোষ অনেকদিন আগে থাকতেই মৃত্যু বশ্য কবেছেন। শ্রীমুখ বশ্য নয়—কংগ্রেস ভবনের সেই ফ্ল—সেই ঘোরানো চেয়ার সেই এয়ারকুলার সেই লিফট সবেরই মাথা ত্যাগ করেছেন। বলকাতায় তিনি থাকেন কম আর্থ থাকলেও কথা বলেন আরো কম আর কথা বললেও কাগজে লিখতে ব্যরণ করেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অবশ্য এখনও চলে-ফিরে বেড়ান, সংগঠনের কাজ করার চেষ্টা করেন কিন্তু বাজ্য কংগ্রেসের ডুবন্ত তরী ভাসিয়ে তোলায় ক্ষমতা শ্রীসেনের একার নেই। এই অবস্থায় দুই কংগ্রেস ভাগ হবার পর আর একটা লক্ষণীয় ঘটনা ঘটেছে সেটা হল বিধানসভার বেশীর ভাগ বিজয়ী প্রার্থীরা চলে এসেছেন শাসক কংগ্রেসে আর পরাজিত প্রার্থীরা ঘরে গেছেন সংগঠন কংগ্রেসে। আগামী নির্বাচনে দুই কংগ্রেসই চেষ্টা করবে অপেক্ষ শক্তিকে হ্রাস করতে আর খণ্ডভাবে কোন মিতালী হলেও সেটা হবে ঐ দৃষ্টি-কোণ থেকে। ফলে, দুই কংগ্রেসই লড়াই করে তাদের ভাগের শতকরা ৪০টা ভোট ভাগ করে দেবে অন্যকে। এইটুকু কংগ্রেসের শতকরা ৪০টা ভোট কেন পড়তো—এই ভোট-দাতারা সকলে নীতি আদর্শের ভিত্তি এমন

(৪) কেন্দ্রে কংগ্রেস শান্তিশালী, কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকাব যখন থাকবেই তখন রাজ্যে কংগ্রেস থাকলে ভাল হবে। আজ কিন্তু এই চারটি বৃত্তিই অচল ও অকাজে হ'য়ে গেছে। স্থায়ী সরকার গঠনের একক দল হিসাবে আর কোন ক্ষমতা কংগ্রেসের নেই, কম্যুনিষ্টদের মোকাবিলা করার ক্ষমতাও দল হিসাবে কংগ্রেসের নেই ব'লে সেই ক্ষমতা অন্য আরো অনেক দলের বৈধী বিগত দুই-এক বৎসরে সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। কেন্দ্রেও কংগ্রেস আজ আর একক গণিত শান্তিশালী দল নয়। এছাড়া আজ কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট বিরোধিতাকে খণ্ড বিরোধিতা নাম দিয়ে এনেছে। শাসক কংগ্রেস যতটা সি পি এমের খাপ দেবেন ততটা খাবার সি পি আইকে দেখেন না ব'লে বহুক্ষেত্রে সি পি আই শাসক কংগ্রেসের বশ্য। কেবলে কংগ্রেসকে পুনঃসংগঠন দিল সি পি আই। আবার সংগঠন কংগ্রেসের কাছে সি পি আই যতটা খাপ দেবে সি পি এম ততটা নয় লোকসভার অস্থায়ী প্রস্তাবের ভোট বা কেবলের নির্বাচনে সেটা নান্যভাবে দেখা গেছে। অতএব, কম্যুনিষ্টদের বিরোধিতায় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতীকার যে বিকল্প ধর্মান্ত এতদিন এক-প্রণয়ী জনগণকে আকর্ষণ করতো সেই আকর্ষণ কমে গেছে এবং বহু ক্ষেত্রেই দুই কংগ্রেসই দুই কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে এক পাকি ভোজের শরিক হয়েছে। কাজেই রাজ্যে শ্রীমুখ কম্যুনিষ্ট বিরোধিতার জন্য কংগ্রেসকে বিকল্প শক্তি মনে করতে আজ তাবা আব সেই কথা ভাবতে পারবে না বা সেই কথা ভেবে ভোট দেবে না। কংগ্রেসকে ভোট দেবার আর একটা মানসিক কাগজ এতদিন কাগজ করেছে—সেটা হল ১৯৪৭ সালের পর দীর্ঘ ২০/২২ বৎসর সকলেই এই কথা ভেবে এসেছে যে, নির্বাচনে যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসবে কংগ্রেস। চেন-গণের একটি অংশ যারা কংগ্রেসকে ভোটের শতকরা ৪০টি ভোট দিয়েছে তারা ভাবতো কংগ্রেসই ক্ষমতায় আসবে কিন্তু আর আর সেই ভাবনা কোন কাজ করবে না। কংগ্রেস, গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার যত্নে হ'ল আর যেই আসক কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসবার সম্ভাবনা যথেষ্ট নেই—কাজেই যে শক্তি ক্ষমতায় আসবে না তাকে কেন ভোট দেব—তাবা ভোট তাকেই দেবে যারা ক্ষমতার আসনে এবং যারা মাঠে-ময়দানে বা সর্বত্র কম্যুনিষ্ট-দেব মোকাবিলা করতে পারবে। কংগ্রেসের শতকরা ৪০টি ভোটের একটি বড় ভাগ এই কারণেই এইবার অন্তর চলে যাবে।

কংগ্রেস ও কংগ্রেস-সি পি এম বিরোধী

ফ্রেমের অভিযাণ

ভারতবর্ষে রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন গত ২০ বৎসরে হয়েছে কিন্তু এই পরিবর্তনের চাকা এখনও ঘুরছে এক জায়গায়

ফুটবল বিশ্বকাপ

অনুদেখা

দল

অনুদেখা

বিশ্ব

গত বিশ বছরে বিশ্বের সেরা ফুটবল দল বাছতে হলে আপনি কোন এগারোজনকে ভোট দেবেন? অবিকল এই প্রশ্নটি রাখা হয়েছিল পর্যাট্রাটি বিভিন্ন দেশের আশীজন ক্রীড়া-সাংবাদিকদের সামনে।

শুনে তো প্রথমেই সবাই মাথা চুলকোতে আরম্ভ করেন। বিশ বছর! বড় কম সময় নয়। অগুনিত আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ হয়েছে এই সময়ে। সাংবাদিকেরা এই অবকাশে কতটা জ্ঞাত খেলোয়াড়কেই তো স্বাক্ষরে দেখেছেন! নাবী, দামী খেলোয়াড় সবে এক-এক ধরনের বৈশিষ্ট্যে এক-একজন খলমল করছেন তাঁদের মনের ফুটুরে। কাকে ফেলে কাকেই বা রাখা যায়। প্রশ্ন শুনে সত্যিই ক্রীড়া-সাংবাদিকেরা প্রথম প্রথম ধুড় ফাঁপরে পড়েছিলেন।

কিন্তু প্রশ্নের চ্যালেঞ্জ যখন সামনে তখন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় উত্তর তো দিতেই হবে। অতএব আশীজন সাংবাদিক কলম বাগিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসলেন টেবলের ওপর। খসখস করে লিখলেন কাগজের ওপর। লিখলেন এবং কতবার যে কাটাকুটি করলেন তার ইয়ত্তা কি।

কালির এক আঁচড় কেটে দিয়ে নতুন আঁচড়ের ছবি যে তাঁদের কেন আঁকতে হলো, তা বুঝে ওঠা কঠিন নয়। চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণে তাঁরা যে কাকে রাজা সাজাবেন, আর কাকেই বা ফাঁকির বানাবেন, সমস্যা তো সেইটাই! তবে এই সমস্যা সমাধান করতে পারেন, এমন সাধ্য কি একজন সাংবাদিকেরও ছিল?

ছিল না। তাই আশীজনের একজনও বিশ বছরের সেরা ফুটবল দলে জায়গা পাওয়া এগারোজনকে বেছে নিতে পারেননি। জনচরিত্র নির্বাচিত এগারোজনের বড়জোর লঙ্কাকে চিনে নিতে পেরে-

আশীজন সাংবাদিকের মধ্যে দু'জনও পুরো দল মনোনয়নে একমত হতে পারেননি এবং তা পারেননি বলেই ভোটাভুটির মাধ্যমে সেরা দলের এগারোজনকে বেছে নেওয়া হয়।

বিশ বছরের সেরা ফুটবল দল বাছার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ব্রিটিশ ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের মধ্যপন্থ 'ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস'-এর পক্ষ থেকে। মাসিক পত্রিকা 'ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস'-এর এক সংখ্যাতেই ভোটাভুটির ফলাফল প্রকাশ করা হয়। যে পর্যাট্রাটি দেশের ক্রীড়া সাংবাদিকদের ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক অভিমত আহ্বান করা হয়েছিল সে দল কটি হলো:-

আর্জেন্টিনা (৩), অস্ট্রিয়া (৩), ব্রেন্সল, বেলজিয়াম (৩), বুলগেরিয়া (২), কানাডা, চিলি (৩), কলোম্বিয়া (৩), ডেনমার্ক (৩), চেকোস্লোভাকিয়া (৪), পূর্ব জার্মানী, পশ্চিম জার্মানী (৫), ইংল্যান্ড (৩), ইকোয়েডর, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স (২), গ্রীস (২), নেদারল্যান্ডস (৪), হাঙ্গেরী (৪), ইজরায়েল, ইতালী (২), উত্তর আয়ারল্যান্ড, মেক্সিকো (২), নরওয়ে, পোল্যান্ড (৩), পর্তুগাল (২), রুমিনিয়া, স্কটল্যান্ড (২), স্পেন (৩), সুইডেন, সুইজারল্যান্ড (৪), তুরস্ক, আমেরিকা (৩), রাশিয়া (২) ও যুগোস্লাভিয়া (৪)।

আশীজন সাংবাদিকের অভিমত যাচাই করে যে এগারোজন আনুপাতিক হারে বেশ ভোট পেয়েছেন তাঁদের নিয়ে বাছাই দল গড়লে দশটিই এই রকম দাঁড়ায়:-

গোলরক্ষক লেভ (৬৯ ভোট); ফুলবাং ব্রেন্সল (৫৭ ভোট); ফেচেরি, ইতালী, বোশেফ

বেকেনবার্গার, পশ্চিম জার্মানী (৪৪ ভোট); ফরোয়াহর্ড স্ট্যানলি ম্যাথুজ, ইংল্যান্ড (৪০ ভোট), পেলে, ব্রেন্সল (৩৬ ভোট), আলফ্রেড ডি স্টিফানো, আর্জেন্টিনা (৩৮ ভোট), ফেরেন্স পুসকাস, হাঙ্গেরী (৪৪ ভোট) ও বিবি চার্লটন, ইংল্যান্ড (৩৭ ভোট)।

নির্বাচিত এগারোজনকে সাবেকী প্রথা (১+২+৩+৫) অনুসারে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে বটে। তবে আধুনিক ফুটবলের চাহিদা অনুযায়ী এই এগারোজনকে ৪+২+৪ বা ৪+৩+৩ অথবা অন্য যে কোনোভাবেই খেলানো যেতে পারে। নির্বাচিত এগারোজন যে কোনো পদ্ধতি অনুসরণেই ওস্তাদ।

মনোনীত দলের গঠনবিন্যাস বদলাবার চেষ্টা করা হলেই বিবি রাইটকে স্টপারের, চার্লটন বা ডি স্টিফানোকে মাস্কমার্চের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হবে এবং দরকারে বোভি আর্চওপিছিয়ে পড়তে পারেন।

যে এগারোজনের বিশ বছরের সেরা ফুটবল দলে জায়গা হয়েছে দু'নিয়ার ফুটবল অনুরাগী মাত্রই তাঁদের কিস্তারিত পরিচয় জানেন। কারণ আজকের এই জেট যুগে আগেকার এতোবড় পৃথিবীর পরিধি ক্রমশই সংকুচিত হয়ে উঠছে। তবু ফুটবল দু'নিয়ার নামকদের সম্পর্কে জানা কথাগুলি সংক্ষেপে আর একবার আলিয়ে নেওয়ায় আপত্তিই বা কি? কিন্তুই না। অতএব এগারোজনকে আর একবার চিনে নেওয়া যাক।

নয়। শ্রুতি রিয়াল মাদ্রিদেব লক্ষ্য করিয়া
স্ট্রিফানো ৪৬৬টি গোল (৫৬৫টি ম্যাচে)
করেছেন।
ফুটবল দুনিবার 'গ্যালিং ফেডারেশন'
কেবেস্ক পদসকাস নিজেই পাবার
করেছেন যে, তিনি 'এক ঠেও খেলাঘর'
—ডান পাটি যেন কাঠের তৈরী, এদু
দাঁড়াতেই সাহায্য করা ছাড়া তাই বসে
কাজই নেই! কিন্তু প্রতিভা এমন! বসে
যে একটি মারাত্মক পাসের (ব)।
কল্যাণেই তাঁর কালে তিনি পিচের
বিবেচনায় সবচেয়ে মারাত্মক ব্যক্তি
বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাঁর
ববপদ ফেরেস্ক পদসকাসের ডান পা
প্রয়োজনই দেখা দিতো না—এবং পদ
পা-টি) তাঁর ক্ষেত্রে একমুখ্য! পদ
হাঙ্গেরীয় পক্ষে চুবানীটি আলো
ম্যাচে পচাশীটি গোল করে।
১৯৫৬ সালে দেশ ছেড়ে তিনি
চলে যান এবং খেলোয়াড় জীবনে
কবছর বিয়াল মাদ্রিদ দলে কাটান।

ববি চালটন ১০৬টি আন্তর্জাতিক
ম্যাচে ইংলন্ডের প্রতিনিধিত্ব করে
রেকর্ড গড়েছেন। এগিয়ে থাকা উইং
ফরোয়ার্ড হিসেবে যেমন তেমন পিচের
পড়া ফরোয়ার্ড হিসেবে মারাত্মক খেলা
গুস্তাদ। ম্যাগেস্টার ইউনাইটেড দলের এই
খেলোয়াড়টি ১৯৫৮ সালে চিটিন্থে
বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন সেই
দুর্ঘটনায় দলের অনেকেই মারা যান।
কিন্তু ববি দুর্ঘটনায় শোক ভুলে সোঁদন
থেকেই যেন পারিণত হয়ে যান। ববি চালটন
এফ এ লীগ ও কাপ, ইউরোপীয় কাপ এবং
বিশ্বকাপ বিজয়ী দলেও খেলেছেন।

গত বিশ বছরের সেবা ফুটবল
দলটিকে আপাততঃ বাছাই করা গেল।
এখন প্রশ্ন, বাছাই দল খেলার কব
সঙ্গে? তেমন তেমন প্রতিবন্ধী না হলে
খেলা জমতেই পারে না। এবার যদি
গন্ডা গন্ডা গোল দেয় তাহলে নতুন
মিনিটের অনুষ্ঠানটি সত্যিই এক জোরে।
ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অতএব বিশ্ব দলেব
বিবদ্যে খেলার জন্য আর একটি কনফারেন্স
দলও নির্বাচন করতে হয়।

যে আশীর্জন ক্রীড়া-সাংবাদিক খেলো-
য়াড় নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের
নতুন করে পেলের পরিচয় রাখার কোনো
দরকারই নেই। কারণ, দুনিয়ার ফুটবলে
ব্রেক্সলের এই 'কালো মানিক' সবচেয়ে
পরিচিত ও প্রচারিত চরিত্র। সতেরো বছর
বয়সে পেলের ব্রেক্সলের ন্যানটোন দলের
পক্ষে খেলতে মাঠে নামেন। সেই বছরেই
বিশ্বকাপ খেলতে এসে বিশেষজ্ঞদের
দৃষ্টি তিনি তাঁর দিকেই টেনে নেন। সেই
থেকেই (১৯৫৮) ফুটবল দুনিয়ায় পেলের
যুগের সূচনা। আজও যে যুগ ফুরিয়ে
যায় নি। এখনও পেলের ফুটবল
সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। সত্যেই উনিশ
—এই বারো বছরে পেলের প্রথম শ্রেণীর
ফুটবলে এক হাজারেরও বেশি গোল (যা
আজ পর্যন্ত কেউ নি) করেছেন করেছেন
এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলে জাতীয়
দলের প্রতিনিধিত্ব করায় সেন্টুরী করতে
চলেছেন। বিশ্বকাপে খেলেছেন চারবার,
তার মধ্যে ব্রেক্স জর্লোবিয়ে কাপ
পেয়েছেন তিন তিনবার। যে কোনো
মুহুর্তে যে কোনো দলের রক্ষণভাগকে
ডচনচ করে দিতে পারেন। তাই অনেকের

১৩৭৭

(অস্ট্রিয়া) ও বর্ষ মর (ইংল্যান্ড)।
কনস্টান্টিনোপল (ব্রেজিল), ডিডি
(ব্রেজিল), ইউসেবিও (পতুগাল), জর্জ
বেস্ট (উত্তর আয়ারল্যান্ড) ও ফ্রান্সিসকো
জেটো (স্পেন)।

বিশ বছরের সেরা দলের সঙ্গে
দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ দলের খেলা যদি হতো
তাহলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াতো?
মানুষ তো কেন্দ্র হার, কবি স্বর্গ থেকে
সেতাবাও নামে এসে আগেভাগে
সেই মর্যাদা অসমাপ্ত দখল করে
নিশ্চয়।

তবে ওই খেলাটি দেখতাকেন
কবিসম্পদের ভেতরে তোলা থাক। আসলে
প্রত্যয়িত ম্যাক্স বখন নিহত কংগ্রেস
ব্যাপার, তা হলে মর্যাদা মানুষের
কোনো মোহও চাই। সেও থাকত যদি
দুই দল নির্বাচিত কাইডেন সমসাময়িক
কালের খেলোয়াড় হতেন।

তাই বলাইকাম, ওই খেলা তো হবার
নয়। ওই অনুষ্ঠান কং আমাদেব খবরই
থেকে দাখ।

আবার নির্বাচন

[২৫৩ পৃষ্ঠার পর]

অনেক কাল ছুড়বে। সাধা ভাষের মধ্যে
পরিবেশের অবস্থা সব দিকেই স্বাভাবিক
রান করে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাহ্যনীর
বাহ্যনীর পাঁচটা রাজ্য অপেক্ষা বেশী
মিষ্ণু স্বভাব ধারণ প্রবাহিত হয়। আগামী
দিনে পশ্চিমবঙ্গে এই স্বাভাবিকমণী রাজ্য
নীরতির আধা বেশ কিছু স্বাভাবিক ও নতুন ধারা
দেখা দেবে। এখ প্রধান কারণ হল পশ্চিম-
বঙ্গে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের প্রভাব

পরিবেশ
অন্য পি, সি

স্বাধীন নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত আমাদের
একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েকটি মজোবান
প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা দ্বারা দায় সাপ্তাহিক
বন্দুতমতীতে প্রকাশ করা সম্ভব হল না
বলে অভ্যন্তর দর্শিত।

এই বিশেষ সংখ্যার রচনা-সংগ্রহ
এবং সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেছেন
দুর্গাদাস সরকার ও দিলীপ চক্রবর্তী।

—সম্পাদিকা

নিম্নে সি পি এম অর্ধেক শক্তিতে নামিয়ে
এসেছে কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে ফেরাবিশেষ
কাঁধে ও মাথায় বসিয়ে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে
ঠিক কেন্দ্রের ফরমুলা চলবে না। কেন্দ্রের
মত পশ্চিমবঙ্গেও সি পি এমকে একইভাবে
কাট টু সাইজ করার ইচ্ছা বা বাসনা সকলের
ধাক্কাধেলও কংগ্রেসের সহযোগিতায় সেই কাজ
কবার সাধ্য বা সম্ভাবনা ঐ দলগুলির নেই।
তাই মূলত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে
এককালের কংগ্রেস-বিরোধীরা দুইটি শিবিরে
ভাগ হয়ে যাবে। যদি কেউ ভাগ্যতো ১৯৬৭

পাসপোর্ট বদল হয়ে যাবে। এক পাস
ধারী হবে কংগ্রেস হল মূল শত্রু তাকে
করতে হবে। আর এক পক্ষের ধারী
কংগ্রেস শত্রু বটে তবে পশ্চিমবঙ্গে
শত্রু হল সি পি এম অতএব কংগ্রেস
সি পি এমকেও খতম করতে হবে।
পক্ষের ধারী হবে সি পি এমই হল
শত্রু তাকে খতম করতে হবে। পশ্চিম
রাষ্ট্রনীতিতে, যে শক্তি সমাবেশ হোক
এই তিনটি ধারী নিয়ে নির্বাচন হবে
ধারী দেবে সি পি এম দ্রুত বিবর্তিত
দেবে সি-পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস
দ্রুত তৃতীয় ধারী দেবে কংগ্রেস দ্রুত।
মূল ধারী তিন দ্রুতের কে জিতবে সেট
করবে শত্রু বাছাই-এস ওপর। যদি
ওঠে যে, কংগ্রেসই মূল শত্রু, তবে সি
দ্রুত জয়যুক্ত হবে। যদি-হাওয়া
কংগ্রেস ও সি পি এম দুই দেশের
ভবে ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি
হবে আর যদি হাওয়া ওঠে যে, সি
দেশের একমাত্র শত্রু তবে কংগ্রেস
জয়ী হবে। এই জোটগুলি কেমন
এখনও পাবিস্কার নয় তবে
তিনটি মূল ধারী নির্ভর
গঠিত হবে।



সম্পাদিকা-জয়ন্তী সেন। বসুদত্তী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
বসুদত্তী প্রেস, হাইড্রেট প্রিন্স কুমার গুহমঙ্গলদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।